শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

গৃহস্থ

মাসিক পত্র

পঞ্চম খণ্ড

—০—

প্রথম ভাগ

(সন ১৩২০ সালের কার্ত্তিক হইতে ১৩২০ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত)

ইণ্ডিয়া প্রেস—২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা হইতে
শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

১। আলোচনা

প্রবন্ধ

মফঃস্বলের বাণী

পরিশিষ্ট

চিত্রসূচী

শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথ

INDIA PRESS, CALCUTTA

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

গৃহস্থ

পঞ্চম খণ্ড

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ ॥

"যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কামধর্ম্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে, তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। দুই-ই তোমাদের হাতে। এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্ত্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যদি তোমাদের না থাকে, তবে বৃথায় আমি বকিয়া মরিতেছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র

৫ম খণ্ড ৫ম বর্ষ	কার্ত্তিক, ১৩২০	১ম সংখ্যা

আলোচনা

১। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার

'গৃহস্থে'র আর এক বৎসর চলিয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে আমরা ভারতের গৃহস্থগণের নিকট নানাবিধ প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি। আমাদের 'আলোচনা', 'মফঃস্বলের বাণী', 'প্রবন্ধ' ও 'পরিশিষ্টে'র ভিতর দিয়া নানা সমস্যার মীমাংসা করা হইয়াছে। সকল দিক হইতে বর্ত্তমান যুগের গৃহস্থ-ধর্ম্ম বুঝাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে। এ বৎসরও আমরা যথাসাধ্য সেই চেষ্টাই করিব।

এই পৃথিবীতে আমরা শক্তিরই খেলা দেখিতেছি। অনলে ভূতলে, পর্ব্বতে জলে,

জীবে মানবে, সমাজে রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই শক্তির কার্য্য অহরহ চলিতেছে। ভাঙ্গনে গড়নে, বিনাশে বিকাশে আমরা শক্তির পরিচয় পাই। সমগ্র বিশ্বজগৎ শক্তিময়ের রঙ্গভূমি, শক্তিমান্ ভগবানের ক্রীড়াক্ষেত্র—শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত, শক্তিদ্বারা পরিচালিত।

শক্তির এই বিরাট কেন্দ্র হইতে যে যত অংশ নিজের আয়ত্ত করিতে পারে. সে-ই তত মানুষ-নামের অধিকারী। জগতের শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে সম্মুখ-সমর—ইহাই মানবের একমাত্র ধর্ম্ম। মানবের জীবন এই সংগ্রামেই বিকাশ লাভ করে। পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিতে পাও, সকলই মানবশক্তি ও বিশ্বশক্তির যুঝাযুঝি ও বুঝাপড়ার বিভিন্ন ফল। বিজ্ঞান বল, ধর্ম্ম বল, রেলগাড়ী বল, ঐশ্বর্য্য বল, সুখভোগ বল, সাম্রাজ্য বল, "স্বারাজ্যসিদ্ধি" বল—সকলই এই সম্মুখসমরে জয়লাভের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। যুগযুগান্ত ধরিয়া মানুষ পৃথিবীকে এইরূপে নিজ বশে আনিতেছে—জগতের শক্তিপুঞ্জকে নিজের কাজে লাগাইতেছে—বিশ্বশক্তিকে যথাসম্ভব হজম করিয়া নানাবিধ মানবীয় শক্তি-কেন্দ্র গঠন করিতেছে। পৃথিবীকে এইরূপে ভোগ করা—সংসারের সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিয়া তাহার উপর মানবের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করা—এই সকল কাজকে সাধারণ লোকেরা ভুল বুঝিয়া বলিবে—বীরত্ব। সত্য কথা বলিতে গেলে—এই সব মানবধর্ম্ম মাত্র। 'মানবত্ব' ও 'বীরত্ব' প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিশব্দ। মানবমাত্রেই বীর, সংসারের শক্তিনিচয় করতলগত করিবার জন্যই তাহার জন্ম—বিশ্বে প্রতিষ্ঠালাভই তাহার ধর্ম্ম। প্রাণ-বিজ্ঞান ও মানব-বিজ্ঞানের ইহাই একমাত্র স্থিরীকৃত সত্য।

কিন্তু নিজের প্রকৃতি, নিজের ধর্ম্ম কয়জনের মনে থাকে? ভাবুক কবি বলিয়াছেন:—"Our birth is but a sleep and a forgetting". আমরা দিন দিন কেবল ভুলিয়াই চলিয়াছি। মানুষ তাহার মহত্ত্ব, তাহার দেবত্ব, তাহার অসীমতা, তাহার বিশালতা কখনই স্মরণে রাখে না। জন্ম, জরা, মায়া, মোহ, পৃথিবী, সংসার সবই মানুষকে সর্ব্বদা 'কাবু' করিবার জন্য প্রস্তুত; মানুষকে নানা উপায়ে ছোট, হীন, ক্ষুদ্র, পঙ্গু, জড়, দুর্ব্বল করিয়া রাখিতে চেষ্টিত। সংসারের এই মায়া-বিভীষিকা ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য, মানুষের স্বাভাবিক উচ্চতা বুঝাইবার জন্য, মানবকে দেবত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারতের মহাপুরুষগণ প্রচার করিয়াছেন—'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' এবং 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। ভারতের ধর্ম্মপ্রচারকগণ মানুষকে দেবতা করিয়া তুলিতে প্রয়াসী—জগতে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের লক্ষ্য। তাই তাঁহাদের সরলবাণী এই—"যিনি বীর তিনিই বসুন্ধরা ভোগ করিবেন—যিনি বলবান্ তিনিই প্রকৃত আত্মার উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনিই দেবত্ব প্রাপ্ত হইবেন—মুক্তিলাভ করিবেন।" শক্তির মাহাত্ম্য এরূপ জোরের সহিত আর কোন দেশে প্রচারিত হইয়াছে কি? আর কোন সমাজ মোহান্ধ মানবকে তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহার প্রকৃতিগত কর্ত্তব্য এত স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছে কি? ভারতের গৃহস্থ, নানা কণ্ঠে, নানা ইতিহাসে যুগে যুগে তুমি এই বীরত্বের গাথাই শুনিয়া আসিয়াছ। 'নানা উপায়ে শক্তি অর্জ্জন কর,' তোমার মুনিঋষিগণের ইহাই এক মাত্র উপদেশ। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার তোমার জন্ম-জন্মান্তরের মূলমন্ত্র।

২। ভারতীয় গৃহস্থের ধর্ম্ম

আমরা বলিলাম—মানুষ স্বভাবতই বীর; এবং হিন্দুধর্ম্ম ভারতবাসীকে মহত্ত্ব, বীরত্ব ও দেবত্বের দিকে লইয়া যাইতে চাহে। আমাদের ঋষিগণের বাণী এই যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি সকল প্রকার মহত্ত্ব ও দেবত্বের আধার, তিনি তিন প্রকারে তাঁহার বীরত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। "ব্রহ্মত্বে সৃজ্যতে লোকান্ বিষ্ণুত্বে পালয়ত্যপি। রুদ্রত্বে সংহরত্যেব তিস্রোঽবস্থাঃ স্বয়ম্ভুবঃ॥" যিনি ঈশ্বর যাঁহার শক্তি অসীম তিনি ব্রহ্মা-রূপে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে পালন ও রক্ষা করেন এবং রুদ্ররূপে সংহার ও বিনাশ করেন। ভাঙ্গা, রাখা ও গড়া—যাহা নাই তাহাকে গড়িয়া তোলা, যাহা আছে তাহাকে বজায় রাখা, অথবা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন আকার দেওয়া—এইগুলি মহাবীরের, জগদীশ্বরের কার্য্য। আমরা মানুষের মধ্যে এই ঐশ্বরিক শক্তি দেখিতে চাই। ভারতবাসী মানুষ কি না তাহার পরিচয় পাইতে হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করিব—ভারতবাসী নূতন কোন একটা জিনিষ খাড়া করিতে পারে কি না, ভারতবাসী নূতন নূতন কর্ম্মকেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে পারে কি না, ভারতবাসী নূতন নূতন বাসনারাশি সৃষ্টি করিতে পারে কি না। আমরা জিজ্ঞাসা করিব—ভারতের নরনারী স্বকীয় যত্নে ও উৎসাহে কোন প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনকে সুন্দররূপে চালাইতে পারে কি না, ভারতের নরনারী নিজ মাথা খাটাইয়া কোন সমাজতত্ত্ব, দর্শনবাদ বা কর্ম্মকেন্দ্রের পরিপুষ্টি বিধান করিতে পারে কি না, ভারতবাসী স্বধর্ম্ম ও স্ব-সমাজের উন্নতি ও বিস্তৃতিকল্পে সময় ও অর্থব্যয় করিতে উৎসাহী হয় কি না। আমরা জিজ্ঞাসা করিব—ভারতবাসী পুরাতন-গুলিকে প্রয়োজনমত বদলাইতে সাহসী হয় কি না, ভারতবাসী আবর্জ্জনারাশি দূর করিতে কৃতসংকল্প কি না, ভারতবাসী নিজহাতে গড়া জিনিষকেও যথাসময়ে ওলট পালট করিয়া দিতে প্রস্তুত ও অভ্যস্ত কি না।

যদি এরূপ ভাঙ্গাগড়ার ক্ষমতা ভারতবাসীর না থাকে, তবে তাহা অর্জ্জন করাই ভারতীয় গৃহস্থের একমাত্র ধর্ম্ম। তাহার শিক্ষার উদ্দেশ্য ইহা ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতবাসী ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রকে ভাল করিয়া চাষ করিবে, পঞ্চনদ, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা সকল প্রদেশের চিন্তা-স্রোতে ও কর্ম্মস্রোতে স্নান করিয়া যথোচিত স্বাস্থ্য অর্জ্জন করিবে, মারাঠী হিন্দী বাঙ্গালা তামিল ভাষায় সুদক্ষ হইয়া ভারতের অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত হইবে। ভারতবাসী সকল স্থানেই নিজ নিজ বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন পাইতে অভ্যস্ত হইবে, ভারতের সর্ব্বত্র নিজ নিজ কর্ম্ম ও চিন্তার প্রভাব বিস্তৃত করিবে। ভারতের নদনদী, চন্দ্র-সূর্য্য, তরুলতা, আকর-সাগর, প্রান্তর-পর্ব্বত ভারতবর্ষকে নানা প্রাকৃতিক শক্তির অধীশ্বর করিয়াছে, ভারতবাসী সেইগুলিকে নিজ বিদ্যাবলে, ও নিজ চরিত্রবলে আয়ত্ত করিবে, সেইগুলি হইতে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করিবে, তাহার দ্বারা ভারতবর্ষকে ধনে ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, সাহসে উদ্যমে জগতের শ্রদ্ধাস্পদ করিয়া তুলিবে। ভারতবাসীর যদি এই আশা না থাকে তাহা হইলে তাহার শিক্ষালাভের আর প্রয়োজন নাই। শিক্ষিত হইয়া তাহার মনুষ্যত্ব লোপ

পাইতেছে, বলিব। যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসী প্রকৃতির শক্তিগুলি লইয়া ছেলে খেলা করিবে, সমাজের শক্তিগুলি লইয়া 'দাবাবড়ে'র চাল চালিবে, সর্ব্বত্র 'হাঁ'কে 'না' করিবে, 'না'কে 'হাঁ' করিবে।

চরিত্রবান্ ভারতবাসীর এই ভাঙ্গাগড়া ভারতবর্ষেই আবদ্ধ থাকিবে না। ভারতবর্ষের বাহিরে একটা বিশাল জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে। সেটাকে তুচ্ছ করিয়া ভারতবাসীর চলিবার উপায় নাই। সুতরাং ভারতের শক্তিমান্ পুরুষগণকে সেই বিশাল জগতেও প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। যদি ভারতবাসী তাহার 'সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার'-শক্তি ভারতবর্ষের বাহিরেও প্রকটিত করিতে পারে, তাহা হইলেই বুঝিব, সে তাহার মুনি-ঋষি-নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতেছে, তাহা হইলেই বুঝিব ভারতের গৃহস্থগণ স্বকীয় ধর্ম্ম পালন করিতেছে—তাহা হইলেই বিশ্বাস হইবে শিক্ষার দ্বারা ভারতে মানুষ তৈয়ারী হইতেছে। জগতের মধ্যে চিন্তার উৎস, কর্ম্মের কেন্দ্র, জীবনের আধার, মৌলিকতার প্রস্রবণ নানা স্থানে নানা ভাবে কাজ করিতেছে। জগতের শিল্পাগারগুলি, জগতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, জগতের মন্ত্রণা-সভাগুলি, জগতের ধর্ম্মমন্দিরগুলি, জগতের বিদ্বৎ-সমিতিগুলি, জগতের বিজ্ঞানশালাগুলি বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তিসমূহকে নানা আকারে কেন্দ্রীকৃত ও পুঞ্জীভূতভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে। ভারতবাসী সেই সকল কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিয়া প্রকৃত জীবনীশক্তির সম্মুখীন হইবে এবং তাহার সঙ্গে বুঝা-পড়া করিয়া নিজ জীবনের স্বার্থসিদ্ধি করিবে, নিজের প্রয়োজন অনুসারে সেই কর্ম্মকেন্দ্র ও চিন্তার আধারগুলিকে ব্যবহার করিবে। স্বস্থ ভারতবাসী তাহাদের চাপে অভিভূত হইয়া পড়িবে না, শক্তিমান্ ভারতবাসী তাহাদের আড়ম্বরে, বিশালতায় ও চাকচিক্যে হতপ্রভ ও নির্ব্বাক হইয়া থাকিবে না, শিক্ষিত ভারতবাসী স্থির ও গম্ভীরভাবে সেই সমুদয়ের সাহায্যে নিজ জীবনেরই চরমলক্ষ্য সাধন করিবে, স্বকীয় সাহিত্যের পুষ্টি-বিধান করিবে, স্ব-সমাজের প্রভুত্ব বিস্তার করিবে, স্বধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিবে, জগৎকে ভারতবর্ষের কর্ম্মভূমিতে পরিণত করিবে।

বিশ্বজগতের শক্তিপুঞ্জকে ভারতবাসীর খেলার সামগ্রীতে পরিণত করা, পৃথিবীর বাধাবিঘ্ন এবং সংসারের মায়া-মোহ-চঞ্চলতার সঙ্গে যুঝাযুঝি করা, প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সকল প্রকার শক্তি আহরণ করা, পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচিত্র উপায়ে স্বকীয় সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-শক্তির পরিচয় দেওয়া, অসুবিধা-গুলিকে চরিত্রবলে সুবিধায় রূপান্তরিত করা, বিশ্বশক্তিকে নানা কৌশলে ভারতমুখী করা ও ভারত-সমাজের অনুকূল করা ইহাই বৈদিক যুগ হইতে রামকৃষ্ণের যুগ পর্য্যন্ত ভারতবাসীর একমাত্র ধর্ম্ম। ভারতের গৃহস্থ অন্য কোন কর্ত্তব্য জানে না, ইহাই তাহার স্বধর্ম্ম।

৩। প্রাচ্য জগতের আটবৎসর

সাধারণ হিসাবে ১৯০১ সালে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ, কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে ১৯০১ সালের কোন বিশেষত্ব নাই। মানবজাতি ১৯০৫ সালকেই তাহার নবযুগ—তাহার বিংশশতাব্দীর প্রথম বর্ষ মনে করিবে। দিন আসে দিন যায়, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, সবগুলিরই কি মূল্য থাকে?

সবগুলিই কি আমরা মনে রাখি? যে দিন বা যে বৎসর কোন একটা বিশেষ ভাব-তরঙ্গ বা চিন্তাপ্রবাহ বা অন্য কোনরূপ প্রভাব লইয়া আমাদের সম্মুখীন হয়, সেই দিনই একটা দিনের মত দিন, সেই বৎসরই একটা স্মরণীয় বর্ষ। সেই ক্ষণ, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমরা দিন গণিয়া থাকি, যুগ মাপিয়া থাকি। ১৯০৫ সাল পৃথিবীর মধ্যে, সমগ্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে —এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকায়—সকলের পক্ষেই এইরূপ একটা বর্ষ। এই বর্ষ যে সকল প্রবাহ ও প্রভাব লইয়া জন্মিয়াছে তাহা অনেক প্রকারেই ব্যাপক ও সুদূরবিস্তৃত। এই প্রবাহ ও প্রভাব সমগ্র মানবজাতির ভিতর একটা নূতন তত্ত্ব, নূতন সমস্যা, নূতন প্রশ্ন আনিয়া দিয়াছে। সেই সকলের মীমাংসা করাই এবং তাহাদের চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়াই বিংশশতাব্দীর কার্য্য হইবে।

১৯০৫ সালটাকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বৎসর এবং একটা নবযুগের নববর্ষ বলিতেছি কেন? তাহার কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে যাহা ঘটিয়াছে, এই নবযুগে তাহা আর ঘটিবে না, তাহার ফলমাত্র দেখিতে পাইব। অথবা এই নবযুগে যাহা ঘটিতেছে ও ঘটিবে, তাহা পূর্ব্বযুগে ঘটে নাই, পূর্ব্বযুগে তাহার কারণ-স্বরূপ উপাদানগুলি ছিল। মোটের উপর পূর্ব্ব যুগে এবং নবযুগে অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাইব, তাহাতে এই দুই যুগকে এক গোষ্ঠীভুক্ত করা যায় না—দুইএর মূল মন্ত্রে অনেক প্রভেদ। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, হাবভাব, আদর্শ, চিন্তা, সমাজ, রাষ্ট্র, ইত্যাদি সকল বিষয়ে দুই যুগের মধ্যে অসংখ্য বৈষম্য থাকিবে—একের সঙ্গে অন্যের সাদৃশ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই দুই যুগের সন্ধিস্থল আমরা ১৯০৫ সালে ফেলিতেছি।

১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত যে ভাব-তরঙ্গ মানব-জাতিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাহার উৎপত্তি কোথায়? সেই যুগের লক্ষণগুলিই বা কি ছিল? আমরা বলিব—সেই প্রবাহের জন্ম ১৮০১ সালে নয় ১৮১৫ সালে। অর্থাৎ ১৮১৫ হইতে ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত এই ৯০ বৎসরই বর্ত্তমান মানবের পূর্ব্ব যুগ, মানবেতিহাসের উনবিংশ শতাব্দী। যে দিন ওয়াটালুর সংগ্রামে নেপোলিয়ানের পরাজয়, যে দিন ভিয়ানা-নগরে কংগ্রেসে ইউরোপের মানচিত্রে নূতন নূতন গণ্ডীর সীমার নির্দ্দেশ, সেই দিন প্রাচীনের অবসান, নবীনের অভ্যুদয়। পদার্থ-বিজ্ঞানের বিস্তৃতি, শিল্প-কারখানার আধিপত্য-লাভ, ব্যবসায় বাণিজ্যে বিপ্লবসাধন, কর্ম্মজগতে প্রকৃতিপুঞ্জের স্বায়ত্তশাসন, ইংলণ্ডের বিশ্ব-সাম্রাজ্য, ভারতবাসীর অধীনতা এই সকলের উদ্বোধন করিয়া ১৮১৫ সাল মানবজগতে দেখা দিল। তাহার পর নব নব চিন্তার আবির্ভাব, বিপ্লববাদ ও সাম্যবাদের প্রবর্ত্তন, ধর্ম্মে নাস্তিকতা, পাশ্চাত্য জগতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার, সাহিত্যে ভাবুকতা, জার্ম্মান্ ও আমেরিকান দর্শনবাদে বেদান্তের ক্ষীণ-আলোকবিস্তার, শিল্পজগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জার্ম্মান্-সাম্রাজ্য গঠন, ফরাসী-বিপ্লব, ইতালীর স্বাধীনতা, তুরস্কের ভঙ্গপ্রাণতা, রুশিয়ার বিস্তার, আমেরিকার গৃহবিবাদান্তে বিশ্ববিজয়-লিপ্সা, নবাভ্যুদয়প্রাপ্ত জাতিপুঞ্জের বাণিজ্য-ও-সাম্রাজ্য-প্রতিযোগিতা, সকল জাতিরই প্রাচ্য জগতে ভোগস্বত্বাধিকারের প্রবল প্রয়াস, এসিয়ায় ও আফ্রিকায় বৃহত্তর জার্ম্মাণি, বৃহত্তর ইতালী, বৃহত্তর আমেরিকা, ও বৃহত্তর রুশিয়া প্রতিষ্ঠার উদ্যম—এই সকল কর্ম্ম ও চিন্তা পাশ্চাত্য জগতের দৈনন্দিন জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে।

এই সময়টা প্রাচ্য জগতের পক্ষে—সমগ্র এসিয়া ও আফ্রিকার পক্ষে—পাশ্চাত্য প্রভাবের যুগ। ১৮১৫ সালে যেদিন ইউরোপে ইংলণ্ডের আধিপত্য ঘোষিত হইল, তাহারই কিছুকাল মধ্যে ভারতখণ্ডে মহারাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লুপ্ত হইল এবং ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য যথাসম্ভব নিষ্কণ্টক হইল। এইরূপে ইংরাজজাতির বিশ্বসাম্রাজ্য গঠিত হইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগৎকে একসূত্রে গ্রথিত করিল। ১৮১৫ সালের ঘটনা এসিয়া ও ইউরোপের সুদৃঢ় মিলনব্যাপারের প্রথম ঘটনা। প্রাচ্য জগতে ও পাশ্চাত্য জগতে ভাববিনিময়, কর্ম্মবিনিময় ও আদর্শবিনিময় এই দিন হইতে নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল। এইজন্য ১৮১৫ সাল প্রাচ্য জগতের পক্ষে—বিশেষতঃ ভারতবাসীর পক্ষে—এক নবযুগের নূতন বর্ষ। এই নবযুগে নব নব ভাবের উন্মেষণ, প্রাচ্য-প্রতীচ্য-সম্মিলন, বিশেষরূপে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রভাব-প্রতিষ্ঠা, চীনে জাপানে, ভারতে ও পারস্যে পরানুকরণ, পরানুবাদ, ও পরকীয় আদর্শে অত্যধিক আস্থা-স্থাপন, সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষা, পাশ্চাত্য-পূজা, এক কথায় বিদেশীয় আদর্শে জীবন-গঠন, প্রাচ্যের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের অহঙ্কার, ইউরোপের দাম্ভিকতা, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-শক্তি, ইউরোপের রাষ্ট্রশক্তি প্রাচ্যজগতের সর্ব্বত্র বীরদর্পে প্রকটিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্যের হস্তে প্রাচ্যের জীবন-সংশয় উপস্থিত হইল—তাহার প্রতাপে মানবজাতির কোন অংশ জগতে টিকিতে পারিবে কি না—এই সন্দেহ প্রাচ্যের সর্ব্বত্র মানুষকে অভিভূত করিয়া রাখিল। মোটের উপর এই ঊনবিংশ শতাব্দীকে—১৮১৫সাল-প্রসূত যুগধর্ম্মের কালকে—ইউরোপীয় প্রভাবের যুগ, জগতের পাশ্চাত্য কাল, পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যুদয়ের সময় বলিলে ইহার যথাযথ বর্ণনা করা হয়।

প্রাচ্যকে গ্রাস করিবার জন্য, প্রাচীন জগতের আদর্শ, সভ্যতা, শিল্প ও সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিবার জন্য, পুরাতনের প্রভাব অভিভূত করিবার জন্য ১৮১৫ সাল ইউরোপের হস্তে দিগ্বিজয়ের পতাকা দান করিল। ইউরোপীয় মানব 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করিয়া মত্ত ঐরাবতের ন্যায় জগৎকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু ১৮১৫ সালই মানবজাতির একমাত্র বর্ষ নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীই তাহার সভ্যতা-প্রবাহের একমাত্র যুগ নয়। আবহমান কাল হইতে, যুগযুগান্ত হইতে, কত শতাব্দী আসিয়াছে, কত শতাব্দী গিয়াছে, কত যুগ আসিবে, কত যুগ যাইবে, তাহার সংখ্যা ত কেহ করে নাই—তাহার প্রভাব ত কেহ গণে নাই। ১৮১৫ সালের মানব এরূপ দূরদৃষ্টি লইয়া ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাই সে ১৯০৫ সালে এক অভূতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, স্বপ্নাতীত, চিন্তার বহির্ভূত ঘটনায় থমকিয়া দাড়াইল। সেই ঘটনা হিন্দু-বৌদ্ধ সভ্যতার উত্তরাধিকারী ও মানবজাতির সর্ব্বপুরাতন সন্তান এসিয়াবাসীর জাগরণ, প্রাচ্যজগতের জীবন-স্পন্দন।

প্রাচ্যের এই জীবন-স্পন্দন দেখা দিল ক্ষুদ্র জাপানের সামরিক শক্তির বিকাশে। তাহার পর হইতে প্রাচীনের বিজয়-ঘোষণা, প্রাচ্য আদর্শের মহিমা-কীর্ত্তন, হিন্দুজগতে, মুসলমানজগতে ও বৌদ্ধজগতে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্ম্ম, স্বায়ত্তপ্রয়াস, পাশ্চাত্যমোহ-নিবারণ, পাশ্চাত্য প্রভাবের গতিরোধ, স্বকীয় আদর্শের বিকাশ-চেষ্টা,

পাশ্চাত্যজগতে প্রাচ্যভাবের সমাদর-বর্দ্ধন, বিশ্বের চিন্তারাজ্যে এসিয়াবাসীর বিজয়-লাভেচ্ছা, ভাবজগতে ভারতের সাম্রাজ্য-বিস্তার—এই সকল লক্ষণ জাপান, চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য প্রাচ্যের সর্ব্বত্র মানব-জীবনকে অনুশাসিত করিতেছে। পাশ্চাত্য জগৎ এখন প্রাচ্যকে বুঝিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতেছে। রাষ্ট্রীয় আলোচনায় প্রাচ্য-জাতির অধিকার লাভ, জাপানকে একটি প্রধান রাষ্ট্রশক্তিরূপে ইউরোপীয় মন্ত্রণা-সভায় আসন-প্রদান, চীনের প্রতি লোলুপদৃষ্টির কথঞ্চিৎ সঙ্কুচন, মুসলমান জাতির আকাঙ্ক্ষায় সম্মান-প্রদর্শন, ভারতীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য ও দর্শনে অনুরাগ—ইত্যাদি নানা ভাবে প্রাচ্য আদর্শ, প্রাচ্য প্রভাব, প্রাচ্য চিন্তা, প্রাচ্য প্রবাহ ইউরোপীয় মানবের উপর আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সময়ের ফেরফারে ইউরোপ আজ এসিয়ার ভাবে অনুপ্রাণিত—এসিয়ার প্রভাবে কথঞ্চিৎ অভিভূত। ইউরোপ এসিয়াকে আর কেবলমাত্র ভোগ্য বস্তু মনে করিতে পারিবে না, ইউরোপকে এসিয়ার সমকক্ষ হইয়া চলিতে হইবে ; এসিয়া এসিয়ার নিজস্ব রক্ষা করিবে, প্রয়োজন হইলে ইউরোপকে উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিবে। ইহাই ১৯০৫ সালের বাণী।

এই সকল কথা বুঝাইবার জন্যই আমরা এক সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম—"আমরা আমাদের জগদীশচন্দ্রকে কেবল একজন বৈজ্ঞানিক বা আবিষ্কারক বা চিন্তাবীর মাত্র-রূপে দেখি না। আমরা তাঁহাকে হিন্দুর মূলমন্ত্রগুলির প্রচারকস্বরূপ মনে করি। তিনি ভারতের মর্ম্মকথা আধুনিক জগৎকে শুনাইয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার আব্‌হাওয়ার মধ্যে হিন্দু সভ্যতার চরম উপদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাণী—হিন্দুর হিন্দুত্ব—তাহার বিজ্ঞানালোচনার ভিতর দিয়া বিংশশতাব্দীর নরসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহ এই উপায়ে ভারতের বৈশিষ্ট সাধনার দ্বারা আলোকিত হইল। বৈজ্ঞানিক সংসার এই উপায়ে হিন্দুর ভাবে প্রভাবান্বিত হইল। এই উপায়ে হিন্দুর জাতীয় বিজ্ঞান বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করিল। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ সকলেই একভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইউরোপ-বিজয়ের ইহারাই প্রথম সেনাপতি।"

জগতে প্রাচ্য ভাবের বিকীরণ অতি সহজে সাধিত হইবে না। গত আট বৎসরে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু অনতিদূর ভবিষ্যতে মানবজাতির সম্মুখে প্রধানতঃ তিনটি সমস্যা উপস্থিত। বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় কার্য্য হইবে ইহাদের মীমাংসা। সেই মীমাংসা হইয়া গেলে এই যুগের তৃতীয় কার্য্যাবলীর সূত্রপাত হইবে।

প্রথমতঃ, পাশ্চাত্য খাল কর্ত্তনে পৃথিবীর ব্যবসায় ও রাষ্ট্রশক্তির ভারকেন্দ্র আমূল পরিবর্ত্তিত হইবে। তাহার ফলাফল এখন কিছুই ইয়ত্তা করা যাইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, চীনের ভবিষ্যৎ। মুসলমান জগৎ আবার কিছু কালের জন্য হতবল হইয়া থাকিল। সম্প্রতি সমগ্র ইউরোপ এবং এমন কি জাপানও চীনের ব্যাপার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহই কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই, চীনের প্রজাতন্ত্র-শাসন টিকিয়া গেলে পৃথিবীতে এক যুগান্তর সৃষ্ট হইবে। পরন্তু চীনের অন্তর্বিদ্রোহ প্রজ্বলিত হইলে সমগ্র

মানবসমাজ এই অগ্নিময় পাকের মধ্যে গিয়া পড়িবে।

তৃতীয়তঃ, ইউরোপের গৃহ-বিবাদ ও সামাজিক অশান্তি। পাশ্চাত্যজগতে ধর্ম্মের কোন প্রভাব নাই, সমগ্র খ্রীষ্টান সমাজে ঐক্য নাই। তাহা বেশ প্রমাণিত হইয়াছে। অধিকন্তু এসিয়া ও আফ্রিকায় বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তার লইয়া পরস্পর কামড়াকামড়ি বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহার উপর প্রত্যেক দেশেই অর্থ-বৈষম্যে সমাজ জর্জ্জরিত—যে অর্থের প্রভাবে ইউরোপের দিগ্বিজয়, সেই অর্থই তাহার সমাজকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার আভ্যন্তরীণ বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া সুকঠিন।

* *
*

৪। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ

জগতে প্রাচ্যভাব বিস্তারের জন্য বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাব। এই প্রাচ্য প্রভাবের যুগ তাহার আট বৎসর সম্পূর্ণ করিল। এই আট বৎসরে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির, নবাভ্যুদয়ের এক অধ্যায় সমাপ্ত হইল। স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়াই ভারতে প্রাচ্য জগতের নবীন বাণী প্রচারিত হইতেছে। একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, যে বৎসরকে আমরা সমগ্র মানবজাতির নূতন শতাব্দীর প্রথম বৎসর এবং প্রাচ্য জগতের নবযুগের নববর্ষ ধরিয়াছি সেই বৎসরই ভারতেও নবযুগের নূতন মন্ত্র, স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম দিয়াছে। এই স্বদেশী আন্দোলন যে প্রবাহ লইয়া দেখা দিয়াছে তাহার এক স্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—আমরা সম্প্রতি দ্বিতীয় স্তরে পদার্পণ করিতেছি। ১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসে 'স্বদেশী'র জন্ম, ১৯১৩ সালের আগষ্ট মাসে বাঙ্গালী জাতির আটবৎসর বয়সে স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ। আমরা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি।

স্বদেশী আন্দোলন যে মন্ত্রে আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছে, তাহার সুফলগুলি আমরা লাভ করিয়াছি। এই আন্দোলনের ফলে সমগ্র সমাজের উপর দিয়া একবার নব-জীবনের ধারা বহিয়া গিয়াছে। তাহাতে সকল ক্ষেত্রে ন্যূনাধিক পরিমাণে সাড়া প্রদত্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ অঙ্কুরের জন্য বীজ উপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলন যতদিক হইতে যে আদর্শে উপস্থিত হইয়াছিল, ৪।৫ বৎসরের ভিতরই তাহার চরম সীমা দেখিতে পাইয়াছিলাম। ১৯১০।১১ সাল হইতেই আমরা তাহার ক্ষীণতা অনুভব করিতেছিলাম। প্রথম অধ্যায়ের শেষ হইয়াছে, অথচ দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ হয় নাই—গত ২।৩ বৎসর আমাদের এইরূপ সন্ধিস্থলে কাটিয়া গেল।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রধানতঃ চারি স্তম্ভ (১) বঙ্গবিভাগের প্রতিরোধ, (২) স্বায়ত্ত-শাসন, (৩) স্বদেশীয় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের 'সংরক্ষণ', (৪) জাতীয় শিক্ষা। বাঙ্গালীর অধ্য-বসায়ের ফলে ১৯১১ সালে বঙ্গভাষাভাষি-গণকে লইয়া একটা নূতন বঙ্গপ্রদেশ গঠিত হইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত করিবার একটি প্রধান লক্ষণ।

দ্বিতীয়তঃ, স্বায়ত্তশাসন লইয়া সমগ্র ভারত-বাসী এবং বাঙ্গালীরা অতি চড়া সুরে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন—সে সুর টিকিল না। তবে স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ এখন কেবল বঙ্গে কেন, সমগ্র ভারতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই নয়, শিক্ষাবিভাগ বল, আইন-বিভাগ বল, ব্যবস্থাপক

সভা বল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা বল—সর্ব্বত্রই ভারতবাসী এখন অধিকতর অধিকারের দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতীয় রাজকর্ম্মে ভারতবাসী মন্ত্রী, সচিব, রাজকর্ম্মচারী, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, পরিচালক ইত্যাদি নিয়োগের জন্য আজকাল ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার সবিশেষ বিকাশ স্বদেশী আন্দোলনেই সাধিত হইয়াছে

অল্পদিনের ভিতরই আন্দোলন বন্ধ হইল বটে, কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা রহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গবিভাগসম্পর্কে বাঙ্গালী জাতির বিজয়লাভে ভারতের সর্ব্বত্র এই আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়াছে। কোন তথাকথিত আন্দোলনকারী বা দু'দশজন স্বদেশী বক্তা বা পাণ্ডার মধ্যে আর গণ্ডীবদ্ধ নয়— ইহা এখন দেশের জলবায়ুর সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। অধিকন্তু দেশবাসিগণ গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা মাত্রেই আবদ্ধ না থাকিয়া স্বায়ত্ত-কর্ম্মের নানা প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেছেন।

তারপর কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। এদিকেও যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ, কষ্ট-স্বীকার, গোলমাল, হুজুগ হইয়াছে। কলকারখানা-প্রতিষ্ঠা, বক্তৃতা, প্রচারকার্য্য, বিদেশ-গমন, শিল্পশিক্ষা ইত্যাদি কতদিকে কত কার্য্য হইল। তাহার অনেকগুলিরই সুফল ও স্থায়িত্ব হয় নাই। কিন্তু যখন হইতে কেবলমাত্র উচ্ছ্বাস-প্রসূত কর্ম্মরাশির ব্যর্থতা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিলাম, তখন হইতেই 'স্বদেশী'র নাম-মাত্রে আনন্দ প্রকাশ বন্ধ করিয়া গম্ভীরভাবে ভবিষ্যতের জন্য চিন্তান্বিত হইলাম। বিফলতায় অভিজ্ঞতা লাভ হইল, চোখ ফুটিতে আরম্ভ করিল। এই অবস্থা আমাদের গত ২।৩ বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই জন্য স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ চলিয়া গিয়াছে—আমরা বলিতে বাধ্য। এখন স্বদেশীর জন্মোৎসব ৭ই আগষ্ট হয় না। 'স্বদেশী মেলা' যে কোন তিথিতেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সেই দিন-ক্ষণের প্রতি মমতা কমিয়া আসিয়াছে। এখন আমরা 'স্বদেশী' আন্দোলনে পাণ্ডাগিরি না করিয়াও স্বদেশী। দেশীয় শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায়ে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা এখন আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল

স্বদেশী আন্দোলনের চতুর্থ স্তম্ভ—জাতীয় শিক্ষা। মাতৃভাষায় সকল শিক্ষা, অল্প বয়স হইতে শিল্পশিক্ষা, স্বদেশীয় লোকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার পরিচালনা, শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্বার্থত্যাগ ও জীবনোৎসর্গ ইত্যাদি আদর্শ লইয়া সমগ্র বঙ্গে এবং মহারাষ্ট্রে ও আন্ধ্রে একটা প্রচেষ্টা হইয়াছিল। তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় প্রয়াস। কিন্তু যে উচ্চ সুরে এই স্বায়ত্ত-শিক্ষার ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইল, তাহা দেশের জনসাধারণ হজম করিতে পারিল না। শেষ দুই এক বৎসরের মধ্যে দেখা গেল— জাতীয়শিক্ষার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত তাঁহার দান তুলিয়া লইলেন। সেদিন জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি [illegible] রাসবিহারী ঘোষও পুরাপুরি স্বায়ত্ত-শিক্ষালয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অন্যত্র অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া কি জাতীয় শিক্ষার আদর্শ দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে? তাহা নহে, মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা ভারতবাসীর চিন্তায় আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। শিল্পশিক্ষার আয়োজনের জন্য সকলেই ব্যগ্র। বিজ্ঞান-শিক্ষাকে কার্য্যকরী করিবার ইচ্ছা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই পোষণ

করিতেছেন। হিন্দুসাহিত্য-প্রচার এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদির উদ্ধার-সাধন সমগ্র সমাজেই এখন আদৃত।

কেবল জাতীয় শিক্ষার গণ্ডীর মধ্যেই নহে, এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া রাজপুরুষ ও জনসাধারণ নানা স্থানে নানা প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেছেন। তাহার উপর, বিদ্যালয়ের পরিচালনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন, নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গঠন প্রভৃতি ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় এবং স্বায়ত্তকর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা দেশবাসীর মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-বর্জ্জনব্যাপারে ও মহারাষ্ট্রের ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপকগণের স্বাধীনতানাশমূলক সরকারী আদেশের তীব্র প্রতিবাদে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, পঞ্চনদের গুরুকুল, হিন্দুস্থানের প্রেম-মহাবিদ্যালয়, আন্ধ্রপ্রদেশের কলাশালা প্রভৃতি খাঁটি স্বায়ত্ত-প্রতিষ্ঠানগুলি, এবং বোলপুর, পুণা, বরিশাল, দৌলতপুর, পাচাপ্পা ইত্যাদি কথঞ্চিৎ স্বাধীন শিক্ষালয়গুলির প্রতি সকলের সস্নেহ দৃষ্টি পড়িয়াছে।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, স্বায়ত্তশাসন ও শিল্পের ন্যায় শিক্ষাব্যাপারেও লোকেরা অত্যুচ্চ আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া কিছু নরম সুরে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেদিন হইতে চড়া সুরের পরিবর্ত্তে সমগ্র সমাজ একটু নরম ভাবে অগ্রসর হইল, যেদিন হইতে ৭ই আগষ্ট, ১৬ই অক্টোবর, জাতীয় বিদ্যালয় ইত্যাদির মায়া কিছু কিছু কাটিল, সেইদিন হইতে স্বদেশীর প্রথম যুগ শেষ হইল, এবং দ্বিতীয় যুগের জন্য পথ প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই সন্ধি-সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রবল ধারা দুইটি কথঞ্চিৎ পুরাতন আন্দোলনের সবিশেষ পুষ্টিতে নিয়োজিত হইল:—(১) ধর্ম্ম-ও-সমাজ-সেবার আন্দোলন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশন উনবিংশ শতাব্দী হইতেই কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু ১৯১০-১১ সাল হইতেই অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগের অবসানকালে ইঁহাদের যথার্থ প্রতিষ্ঠালাভ। বঙ্গে ত্যাগধর্ম্ম জাতীয়শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকল্পেই সবিশেষ আত্মপ্রকাশ করে। ধনবানগণের অর্থ-দান এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিদ্যাদানের জন্য জীবনোৎসর্গ দ্বারা জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন বাঙ্গালার জেলায় জেলায় প্রসার লাভ করে। এই বিদ্যালয়সমূহের পরিচালক, ছাত্র ও শিক্ষকগণের নেতৃত্বে দেশময় সেবাধর্ম্মের কর্ম্ম আরব্ধ হয়। অর্দ্ধোদয়-যোগে এবং স্বদেশী আন্দোলনের অন্যান্য অনুষ্ঠানেও এই সেবা-পরোপকার-ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যখন চারি পাঁচ বৎসরের কর্ম্মাভ্যাসে বঙ্গসমাজে স্বার্থত্যাগ, পরোপকার ও কষ্টস্বীকারের প্রবৃত্তি সুবিস্তৃত ও সুগভীর হইল তখন বাঙ্গালার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশনের প্রতি বাঙ্গালীর বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। গত দুই তিন বৎসরের ভিতর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশন বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে

(২) সাহিত্যের আন্দোলন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎও উনবিংশ শতাব্দী হইতেই কর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবেই ইঁহাদের কার্য্যের প্রকৃত বিকাশ ও বিস্তার সাধিত হইয়াছে। স্বদেশীর প্রভাবে বাঙ্গালায় একটা স্বাধীন চিন্তা আসিয়াছে, এবং দেশের অতীত ও বর্ত্তমান ভাল করিয়া

বুঝিবার প্রবৃত্তি জাগিয়াছে। অধিকন্তু জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ শিক্ষাব্যাপারে মাতৃভাষাকে প্রথম স্থান এবং ইংরাজী ভাষাকে দ্বিতীয় আসন প্রদান করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। নানা কারণে সাহিত্য-সংসারে বহু সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-পরিপোষকের আবির্ভাব হইয়াছে। ফলতঃ এখন বঙ্গীয় সাহিত্যে সম্রাট্, ধুরন্ধর বা মহারথী পদবাচ্য এক হিসাবে কেহই নাই—আর এক হিসাবে অনেকেই আছেন। বঙ্গসাহিত্য এখন বঙ্গীয় জনসাধারণের সম্পদ, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব ও গতিনির্দ্ধারক।

স্বদেশী অন্দোলনের প্রথম যুগ চলিয়া গিয়াছে—সেই যুগের আদর্শ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা এখন আর আমাদিগকে কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করা যায় না। সেই যুগের প্রভাবে আমাদের জাতীয় চরিত্র যতখানি গঠিত হইবার হইয়াছে। এখন আমরা নূতন প্রভাবের অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমাদের বিশ্বাস—দামোদরের বন্যা হইতে আমাদের দ্বিতীয় যুগ পরিষ্কার-রূপে আরম্ভ হইল। এই বন্যাই আমাদের সন্ধিকালের শেষ ঘটনা। সমগ্র জাতির ভিতর একটা বিশেষ সাড়া দিবার জন্যই রুদ্রদেবের এই তাণ্ডব।

এই আলোচনা হইতে আমরা বুঝিলাম যে, ১৯০৫ হইতে ১৯১০ এই পাঁচ বৎসর 'স্বদেশী'র প্রথম যুগ। যে সকল অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়া এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বদেশী আন্দোলন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই সময়ের মধ্যে সেই সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। প্রধানতঃ সেই সকলের সাহায্যেই লোকের স্বদেশী প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইত। ইহাদের সঙ্গে সকলের একটা মায়ার বন্ধনও ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ১৯১১ হইতে ১৯১৩ এই আড়াইবৎসর কাল দ্বিতীয়যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ধি-সময়। এই সময়ের মধ্যে প্রথমযুগের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি কিছু শিথিল ও ক্ষীণ হইল। স্থানে স্থানে বিফলতা দেখা দিল। এই শিথিলতা, ক্ষীণতা ও বিফলতায় আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশব্যাপী সংশয় উপস্থিত হইল—লোকের হৃদয়ে নৈরাশ্য আসিল। নৈরাশ্য আসিল বটে, কিন্তু একেবারে অবসন্ন করিল না। নূতন অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা করিবার জন্য অনেকেই অগ্রসর হইলেন, অনেক নূতন লোক কর্ম্মে নামিলেন। চড়া সুর পরিত্যাগ করিয়া, যাহা টিকিবে যাহা ভবিষ্যতে জনসাধারণ সহজে বুঝিতে ও ধরিতে পারিবে, সেই দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। লোকের চিত্ত সংযত হইতে লাগিল, নিজ নিজ চরিত্র-বিশ্লেষণ, দোষ-নিবারণ, সার্থকতার উপায়-উদ্ভাবন ইত্যাদি শক্তি সমাজে কাজ করিতে লাগিল। প্রথম যুগের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের গণ্ডীর মধ্যেই আর 'স্বদেশী', 'স্বায়ত্তশাসন', 'জাতীয় শিক্ষা' বেশী আবদ্ধ থাকিল না। সেই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ছাপাইয়া উঠিয়া ইহাদের অন্তর্নিহিত ভাবগুলি দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রসার, সেবাধর্ম্মের প্রচার, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশনের প্রতিষ্ঠা, দিল্লীতে রাজধানী-প্রবর্ত্তন, বাঙ্গালী জাতির রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে জয়লাভ ইত্যাদি কতিপয় নূতন শক্তি আসিয়া সমাজে দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত করিল। তাহারই শেষ নিদর্শন দামোদর-বন্যায় বঙ্গবাসীর কার্য্যতৎপরতা। এখন হইতে দ্বিতীয় যুগের নব নব কার্য্য দেখিতে পাইব।

* *
*

৫। স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশনের প্রতিষ্ঠালাভ, বঙ্গসাহিত্যের মর্য্যাদাবৃদ্ধি, বঙ্গভাষাভাষীর ঐক্যবিধান, তারকনাথ-রাসবিহারীর দান এবং দামোদরের বন্যা, এই কয়েকটি নূতন ঘটনা গত দুই তিন বৎসরের বিশেষ লক্ষণ। এই সকল কার্য্যফলে যে যুগ আরম্ভ হইল তাহার লক্ষণগুলি নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

(১) বাঙ্গালীর সাহিত্যে বিজ্ঞান-বিভাগ উন্নতি লাভ করিবে। প্রথম আট-বৎসরে বাঙ্গালায় ইতিহাস-চর্চ্চার ভিত্তি গভীর ও বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গে ঐতিহাসিক-সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা যুগপৎ জাগরিত হইয়াছে। এজন্য বঙ্গে ইতিহাস-চর্চ্চা বলবতী। কিন্তু জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবসাশিল্পকৃষিবিজ্ঞানাদির প্রভাব কম, এজন্য বৈজ্ঞানিক-সাহিত্য এখনও অল্প। যাহা হউক সাময়িক লক্ষণগুলি দেখিয়া আশা হইতেছে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, আকর-তত্ত্ব, রসায়ন, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ঔষধপ্রস্তুত-করণ, ইত্যাদি পদার্থবিজ্ঞানের নানাবিভাগ এখন হইতে বিশেষভাবে বঙ্গসাহিত্যে মর্য্যাদা লাভ করিবে। বাঙ্গালী লেখক ও পণ্ডিতগণ পদার্থ-জগতের বিজ্ঞানাবলী লইয়া অনুসন্ধান, গবেষণা, অনুবাদ, আবিষ্কার, প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি-প্রণয়ন, সমালোচনা প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষরূপে মনোযোগী হইবেন।

উচ্চ অঙ্গের দর্শন-সাহিত্যেও আমাদের যথেষ্ট অভাব আছে বটে—কিন্তু তাহার অভাব শীঘ্র পূরণ হইবার আশা নাই। জীবনের গতি-নির্দ্ধারণ এবং কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ করিবার জন্যই দর্শনের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য নূতনভাবে বুঝাইবার সময় শীঘ্র আর আসিবে না। কেবল বাঙ্গালীর কেন, সমগ্র ভারতেরই চরম আদর্শ স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে—সকলেই শেষ-লক্ষ্যের সন্ধান পাইয়াছেন। কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে রামমোহন-প্রবর্ত্তিত চিন্তাপদ্ধতিদ্বারা সকল প্রকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন, বেদান্ত ও পদার্থবিদ্যার সমন্বয়-সাধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার পরিসমাপ্তি বা শেষ অধ্যায় বা চরম synthesis হইয়াছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত বিংশশতাব্দীর যুগধর্ম্মে।

এই কর্ত্তব্যপ্রদর্শক synthesisএর বা সমন্বয়-সাধনের, অর্থাৎ এই বিংশশতাব্দীর মানবোপযোগী গীতাধর্ম্মের মূলমন্ত্র তিনটি—প্রথমতঃ ব্যক্তিগত জীবনে বৈরাগ্য অবলম্বন এবং কামকাঞ্চনকীর্ত্তি-বর্জ্জন, দ্বিতীয়তঃ সামাজিক জীবনে পরোপকার ও মানবসেবার কর্ম্মযোগ, তৃতীয়তঃ সংসারে ও গার্হস্থ্যাশ্রমে এই বৈরাগ্য ও কর্ম্মযোগের যথোচিত প্রবর্ত্তন। এই যুগধর্ম্মের কর্ম্ম যতদিন না পরিসমাপ্ত হয়, ততদিন আর নূতন কোন দর্শনবাদ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। ধর্ম্ম-প্রচারক, সমাজ-সংস্কারক ও শিক্ষাপ্রচারকগণ কর্ত্তৃক যাহা কিছু নূতন মৌলিক তত্ত্ব স্বাধীনভাবে প্রচারিত হইবে তাহাও নূতন প্রণালীতে সেই চিন্তা-স্রোতকেই পুষ্ট করিবে। সকলই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দর্শনবাদেরই কুক্ষিগত হইয়া যাইবে এবং নানাদিক হইতে তাহাকে

বিশদ ও স্পষ্টীকৃত করিবে। এই তত্ত্বের প্রচার, প্রয়োগ, ব্যাখ্যা ও উপলব্ধিই আগামী বঙ্গীয় জীবনের একমাত্র কার্য্য থাকিবে। সুতরাং দর্শন-সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয় বাঙ্গালায় শীঘ্র হইবে না—জীবন-গঠনোপযোগী নূতন কোন তত্ত্বের উদ্ভব এখন অসম্ভব।

তবে কতকগুলি পারিভাষিক দর্শনসাহিত্য, কলেজ-পাঠ্য দর্শন-গ্রন্থ, মনোবিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান ইত্যাদির অনুবাদ বা সঙ্কলন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানের দিকেই এখন কিছু কাল বাঙ্গালী চিন্তাবীরগণের দৃষ্টি থাকিবে।

(২) এই বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যপুষ্টির কারণ ও উপাদানগুলির সবিশেষ প্রাধান্য নবযুগের দ্বিতীয় লক্ষণ হইবে। অর্থাৎ শিল্পের উন্নতি, বাণিজ্যের প্রসার, কৃষিকর্ম্মে মনোনিবেশ ও স্বাধীন অন্নের উপায়-উদ্ভাবন বঙ্গীয় জীবনকে প্রভাবান্বিত করিবে। বাঙ্গালার মধ্যবিত্তশ্রেণী—তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজ -দারিদ্র্যের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হইবে। কিন্তু যৌথ-কারবার, সমবেত-ব্যবসায় ইত্যাদি বৃহৎ ব্যাপারে লোকে ঝুঁকিবে না। ব্যক্তিগত ব্যবসায়েরই আদর হইবে। শিক্ষিত বাঙ্গালী ওকালতি, কেরাণীগিরি, মাষ্টারীগিরির প্রতি যথেষ্ট উদাসীন হইতে থাকিবে। কুলীমজুরের সঙ্গে মিশিতে বেশী অপমান বোধ করিবে না। চাষ-আবাদে, সূত্রধর-কর্ম্মকারের কার্য্যে, কুটিরশিল্পে, ছোটখাট কারখানায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়-বাণিজ্যে লাগিয়া যাইবে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে স্বাধীন অন্নের প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র সংক্রামিত হইয়াছে, স্বাধীন অন্ন-সংস্থানের উপায়ও অল্পাধিক মাত্রায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু দেশের বেশী লোক ঐ সকল উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে অগ্রসর বা সমর্থ হইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাবে, নৈতিক-চরিত্র-হীনতায়, আলস্য ও-বিলাসপ্রবণতায়, এবং সাধুতার অভাবে পূর্ব্ব যুগে নানা অনিষ্ট ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় যুগে দেখিতে পাইব—বাঙ্গালী সমাজের বহু শিক্ষিত পরিবার স্বাধীন অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে। চক্ষু-লজ্জার খাতিরে কোন বিখ্যাত ব্যক্তিকে ব্যবসায় বা শিল্পের পরিচালক করা হইবে না। অসাধু ব্যক্তিগণকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করা হইবে। মোটের উপরে ব্যবসায়-জগতে প্রকৃত দায়িত্ব-বোধ জন্মিবে।

(৩) এই দ্বিতীয় যুগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান লক্ষণ হইবে—অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজী-অনভিজ্ঞ ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিষ্ঠালাভ প্রকৃত প্রস্তাবে মান-সম্ভ্রম, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, শিক্ষালাভ ইত্যাদির মাপকাঠিও বদলাইয়া যাইবে। প্রথম যুগে আমরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর, ইংরাজীশিক্ষিত সমাজের কার্য্য-ফলই বিশেষরূপ ভোগ করিয়াছি। পোষাকী দেশ-সেবার পরিবর্ত্তে শিক্ষিত লোকেরা 'দেশের মাটি'কে চিনিতে ও ভালবাসিতে শিখিয়াছে। ইহাই প্রথম যুগের প্রধান সুফল। ধনী সম্প্রদায় এবং অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণী অনেক সময়ে পথপ্রদর্শক হইয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রধানতঃ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সহায়ক মাত্র এবং সহযোগীরূপেই কর্ম্ম করিয়াছেন। প্রথম যুগকে আমরা "মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুগ" বলিতে পারি। আগামী দ্বিতীয় যুগকে আমরা "জনসাধারণের যুগ" নামে অভিহিত করিব।

জনসাধারণের চরিত্রবত্তা, তথাকথিত 'অশিক্ষিত' লোকের স্বার্থত্যাগ এবং

উদারতা, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যথার্থ নেতৃত্ব-গ্রহণের ক্ষমতা ইতিমধ্যে সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। দারিদ্র্যবশতঃ মধ্যবিত্তশ্রেণীও ইতিমধ্যেই অশিক্ষিত সমাজের নিম্নে পড়িয়াছে এবং তাহার সঙ্গে মিশিতে বাধ্য হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার কোন জেলায় এখন তথা-কথিত দুই চারিজন উকীল-নায়কের দিন নাই। বঙ্গসমাজে কলিকাতার ধুরন্ধরগণের একাধিপত্য অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। মফঃস্বলের বাণী অগ্রাহ্য করিয়া কাহারও চলিবার উপায় নাই। জেলার প্রধান সহরগুলিও পল্লীগ্রামকে অবজ্ঞা করিয়া চলিতে পারে না। বাঙ্গালীর চিন্তা ও কর্ম্ম জাতিনির্ব্বিশেষে, শিক্ষা-নির্ব্বিশেষে অসংখ্য স্থানে অসংখ্য উপায়ে সমাজের উচ্চ-নিম্ন, ধনী-নির্ধন সকল স্তরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার ফলে বিজ্ঞানে, সাহিত্যক্ষেত্রে, সমাজ-সেবায়, শিক্ষার আন্দোলনে নানা ধুরন্ধর, নানা কর্ম্মবীর, নানা চিন্তাবীরের আবির্ভাব হইয়াছে। দেশের প্রকৃত "লোকসংখ্যা" সত্য সত্যই বাড়িয়াছে। দশ বিশ পঞ্চাশ জনের অভাবে বা চরিত্রহীনতায় বা অহঙ্কারে বা মতিভ্রংশে সমাজের উন্নতি কিছুমাত্র রুদ্ধ হইবে না। বিরাট জাতীয় আবর্ত্তের মধ্যে ব্যক্তিগত কর্ম্ম কোথায় লুকাইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। "ব্যক্তি" অপেক্ষা জাতি যে কত বড়, তাহা আমাদের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইবে। কোন তথাকথিত বিজ্ঞান-বীর, সাহিত্য-রথী, শিক্ষাপ্রচারক বা জননায়কের ক্ষমতা ও বিচারশক্তি তৃণবৎ অবজ্ঞা করিয়া জনসাধারণের মহতী শক্তি বীর পরাক্রমের সহিত দেশে আধিপত্য লাভ করিতে থাকিবে। তাঁতী জোলা কামার স্বর্ণকার মাঝি দর্জ্জী ইত্যাদি ব্যবসা' সমাজ এবং মাতাপিতার অকৃতী সন্তান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেল-হওয়া ছাত্র, ইত্যাদি তথাকথিত অনুন্নত লোকের আদর্শে উচ্চশ্রেণী, সভ্য-সমাজ এবং 'ভাল ছেলেরা' অনেক বিষয়ে জীবন গঠন করিতে শিখিবে। কেতাবী শিক্ষা ও "ডিগ্রি" অপেক্ষা চরিত্রবত্তা, কর্ম্মতৎপরতা ও স্বাধীনচিন্তাই সবিশেষ আদৃত হইবে। তাহার ফলে সমগ্র সমাজকে মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে দেখা হইবে—তাহাতে অর্থে ও বিদ্যায় হীন ব্যক্তিও সামাজিক সম্মানে উচ্চশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িবে।

(৪) বাঙ্গালী সমাজের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম প্রান্ত জমাট বাঁধিবে। নানা উপায়ে নানা দুর্বুদ্ধির বশবর্ত্তিতায়, নানা স্বার্থের প্ররোচনায় বঙ্গসমাজের সর্ব্বত্র সমানভাবে চিন্তা-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে পায় নাই। সমাজদেহের তাপমান-যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইব তাপের মাত্রা সর্ব্বত্র সমান নহে। আগামী যুগে এই সমতার পরিচয় পাইব। অধিকন্তু হিন্দুকে মুসলমান ভাল করিয়া বুঝিবে। বাঙ্গালীর হৃদয় না বুঝিয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসিগণ তাহাকে অযথা নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু আগামী যুগে মহারাষ্ট্র, পঞ্চনদ, দ্রাবিড় সকলেই বুঝিবে যে বাঙ্গালীর চিন্তায় প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাদেশিকতা ও সঙ্কীর্ণতা নাই। বাঙ্গালীও ভারতবর্ষের মর্ম্মকথা বুঝিবার জন্য সমধিক যত্ন করিবে।

বাঙ্গালার জলপ্লাবনে আমরা উপরি-উক্ত শেষ লক্ষণ দুইটির সবিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। জনসাধারণের শক্তি এবং জাতীয় ঐক্য ইহাতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। এই সেবাকার্য্যে কোন তথাকথিত সেবা-সমিতি বা শিক্ষা-

পরিষৎ বা মিশন বা নামজাদা ও ধনবান জননায়কগণের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া দেশের জনসাধারণ তাহার গণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছে। কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজই মহত্তর, কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কর্ম্মকেন্দ্র বা সাহায্য-সমিতি অপেক্ষা দেশের জনগণই অধিক প্রতাপ-শালী। দেশের মাটির পরেই সকলকে মাথা ঠেকাইতে হইবে—এই শিক্ষা প্রদান করিয়া দামোদরের বন্যা আমাদিগকে আশান্বিত হৃদয়ে দ্বিতীয় যুগের কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছে।

"আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে
ভাসাও ধরণী।"

আর ঐ দেখ

"গৌরবময় পুণ্য দৃশ্য
উচ্ছ্বাস ভরে স্তব্ধ বিশ্ব।"

সুতরাং "ভরা বিশ্বাসে শক্তি-শিষ্য
ধরায় লুটাও স্বশরীর।"

* *
*

৬। বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্য

অল্পদিনের ভিতর আমাদের সাময়িক সাহিত্যে একটা নূতন প্রাণ আসিয়াছে। কতকগুলি নূতন মাসিকের উৎপত্তিই ইহার একমাত্র লক্ষণ নয়। সাহিত্য-জগতের সুরই উন্নত হইয়াছে—বেশ বুঝিতে পারা যায়। সাহিত্য-সেবিগণের আলোচ্য বিষয়-গুলিও আজকাল সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ধন-বিজ্ঞান ও সমাজ-তত্ত্ব এই দুইটা ঘরে আমাদের যথেষ্ট শূন্যতা ছিল। গত দুই এক বৎসরের মধ্যে এদিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহা সুলক্ষণ।

একটা ক্ষণিক উন্মাদনা ও প্রতিযোগিতার ভাব মাসিক সাহিত্যকে আক্রমণ করিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা ইতিমধ্যেই সুফল ফলিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনর্থক অর্থব্যয় কত হইতেছে বিচক্ষণ সম্পাদকগণ ভাবিয়া দেখিবেন। অর্থের আড়ম্বর ব্যতীত সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অন্য কোন অভিব্যক্তি আছে কি না সাহিত্যের ধুরন্ধরগণ বিচার করিবেন। সাহিত্যসাধনা স্বদেশসেবারই এক অঙ্গ—ইহা বুঝিলে কোন্ দিকে কি প্রণালীতে কিরূপ আকারে প্রতিযোগিতার আবশ্যক সকলেই অনায়াসে নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

আমাদের পাঠকগণকে সাময়িকসাহিত্য-পাঠ সম্বন্ধে একটা অনুরোধ করিতেছি। কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালাদেশে মাতৃ-ভাষার প্রতি সমাদর অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়াছে—আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবন এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে ইহা বিশেষ আশাপ্রদ। আমরা মাতৃভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা-প্রদানেরই পক্ষপাতী—একদিন তাহা হইবে ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। কিন্তু বিদেশীয় ভাষাগুলি আমরা ত্যাগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ ইংরাজীসাহিত্যে আমাদিগের পাণ্ডিত্য চিরকালই প্রয়োজনীয় থাকিবে। আমরা ইংরাজীকে আমাদের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা মাত্র মনে করি—ইহা দ্বিতীয় ভাষাই থাকিবে। কিন্তু ইহার অনুশীলনে আমাদের ত্রুটি হইলে অশেষ ক্ষতি।

দুঃখের বিষয় ইংরাজীর প্রতি আদর একটু কমিয়াছে মনে হইতেছে। কারণ জানি না, কিন্তু চট্টগ্রাম হইতে বাঁকিপুর পর্য্যন্ত কলেজগুলির অধ্যাপক মহাশয়গণ সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে আজকালকার ছেলেরা—গ্র্যাজুয়েটগণও—ইংরাজী ভাষার অতি সামান্য সামান্য নিয়মগুলিও আয়ত্ত করে না,

ইংরাজীতে লিখিতে বা পড়িতে হইলে তাহাদের বিশেষ কষ্টবোধ হয়।

ইহা নিবারণের উপায় অবশ্য বিশেষজ্ঞগণ বিবেচনা করিবেন। আমরা এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। সাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে Modern Review, Dawn এবং Collegian এই তিনখানা কাগজ সকলেরই পাঠ করা উচিত। "মডার্ণ-রিভিউ" পত্রিকায় গত আট বৎসরে যে সকল প্রবন্ধ বাহি হইয়াছে তাহা আমাদের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষাপ্রণালী, সমাজ ও অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে অতি সুবিচারিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। যাঁহাদের সুবিধা আছে তাঁহারা এই মাসিক পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলি ক্রয় করিয় text book-এর ন্যায় পাঠ করিলে বিশ্ববিদ্য লয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার ফল অপেক্ষা বেশী ফল লাভ করিবেন।

"ডন" পত্রিকায়ও ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব নানা উপায়ে বুঝান হইয়াছে। ইহারও পুরাতন সংখ্যাগুলি সকলেরই অবশ্যপাঠ্য। Modern Review ও Dawn এই দুই পত্রিকার প্রবন্ধগুলি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিবার জন্য কোন প্রকাশক বা পুস্তক-বিক্রেতা অগ্রসর হইলে, দেশের লোক-শিক্ষা প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন।

Collegian শিক্ষাবিষয়ক পাক্ষিক পত্র। বাঙ্গালাদেশে ইহাই একমেবাদ্বিতীয়ম। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরেও ইহা সুপ্রচলিত। শিক্ষাজগতের কোথায় কি ঘটিতেছে বিশেষভাবে এই সংবাদ প্রদান করাই কলেজিয়ান পত্রিকার উদ্দেশ্য। আজকাল শিক্ষাসম্বন্ধে তথ্য ও তত্ত্ব পাইবার জন্য দেশবাসীর আগ্রহ জন্মিয়াছে। আশা করি, তাঁহারা এই পত্রিকা-খানি পাঠ করিবার জন্য ব্যগ্র হইবেন।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা-দেশের বিভিন্ন জেলা হইতে কয়েকখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে। সময়ের লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে— প্রায় সকল জেলাতেই সাহিত্যানুশীলনের এরূপ পরিচয় অনতিবিলম্বে পাওয়া যাইবে। অনেকে এই সমুদয় সাময়িক বা ক্ষণিক উদ্যমের সার্থকতা দেখেন না। কিন্তু আমরা মনে করি—নানা উপায়ে জনসাধারণের কর্ত্তৃত্বাভিমান, দায়িত্ব-জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব বাড়াইয়া দিবার ইহাই একমাত্র উপায়। সুতরাং ইহাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও আমরা সকল জেলার সাহিত্যসেবিগণকেই এই উপায়ে সাহিত্য-প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইতে আহ্বান করিতেছি।

স্থানীয় উদ্ভিদাদির বিবরণ, শিল্প-বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা, বৈষয়িক ও সামাজিক তথ্য-সংগ্রহ, শব্দতত্ত্ব, লোক-সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় জেলার মাসিকপত্রিকাগুলিতে বিশেষরূপেই আলোচিত হইবে। ইহাদের সাহায্যে অনেক নূতন লেখক, কবি ও শিল্পী বাঙ্গালার সাহিত্য-সংসারে পরিচিত হইবেন। কিন্তু আলোচনার ক্ষেত্র কথঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ হইল বলিয়া সকল বিষয়ে ক্ষুদ্রত্ব, সঙ্কীর্ণতা এবং অনর্থক প্রতিযোগিতার প্রশ্রয় দেওয়াই স্থানীয় পত্রিকাগুলির উদ্দেশ্য থাকিবে না। সমগ্র বঙ্গীয় সাহিত্যের গভীরতর ও বিস্তৃততর অনুশীলনের উদ্দেশ্যেই নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বস্বপ্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল মাত্র—এই আদর্শে জেলার মাসিক পত্রগুলির সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভাবে উদারতার সহিত শ্রমবিভাগ-নীতির অনুসরণ করিলে বঙ্গজননীর বাণীমূর্ত্তি একদিকে বিচিত্রতা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে, অন্যদিকে ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইবে।

বাউল-সম্প্রদায়

[দেশের রাজপরিবর্ত্তন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির সুপ্রণালী-বদ্ধ ধারাবাহিক বিবরণকে আমরা দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলিয়া মনে করি। যাহাদের শয়নে, ভোজনে, জাতকর্ম্মে, বিবাহে, সামাজিকতায়, রাজনীতিতে ধর্ম্মের দৃঢ় বন্ধন আছে, তাহাদের ইতিহাস কেবল রাজপরিবর্ত্তন ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদির ইতিহাস নহে। তাহাদের ইতিহাস খুঁজিতে হইলে তাহাদের দেশে ও সমাজে যত প্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, উপাসনাপদ্ধতি এবং সামাজিক রীতিনীতি প্রচলিত আছে, তাহার ইতিহাস খুঁজিতে হয়। বাঙ্গালার ইতিহাস খুঁজিতে হইলে, বাঙ্গালাদেশের ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে খুঁজিতে হইবে।

কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ কার্য্যে বড় বহু লেখক অগ্রসর হন নাই। যদিও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলন নিমিত্ত বহু দিন হইতে পরিশ্রম করিতেছেন, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় তাঁহার "আদ্যের গম্ভীরা" পুস্তকে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায় প্রকটিত করিয়াছেন, তথাপি এখনও বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, এখনও বহু অনুসন্ধান ও আলোচনার প্রয়োজন। সেই জন্য এইরূপ কর্ম্মে যাঁহারা ব্রতী হইবেন, তাঁহারাই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। সেই হিসাবে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বর্ত্তমান প্রবন্ধটী লিখিয়া আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

বাউল-সম্প্রদায় বাঙ্গালার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে একটী। ইহারা দেখিতে মুসলমান ফকিরের ন্যায়, সামাজিক আচার-ব্যবহারে কতকটা বৈষ্ণব-বৈরাগীর ন্যায়; কিন্তু ভাবে, ভাষায় ও সাধন-তত্ত্বে সম্পূর্ণ পৃথক্ পন্থার পথিক। অতি মোটামুটি রকমে ইহারা বৈষ্ণবের শ্রেণীভেদ বলিয়াই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। এ পর্য্যন্ত ইহাদের সম্প্রদায়গত বিশেষত্বগুলি জানিবার জন্য সমাজে কোনরূপ আগ্রহ দেখা যায় নাই। ইতিহাস-প্রিয় বিদ্বৎ-সমাজ এ বিষয় জানিবার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাউল-সম্প্রদায়ের জীবন বিষয় সংগ্রহের জন্য "কৃষ্ণবিনোদিনী স্বর্ণপদক" পুরস্কার ঘোষণা করেন। ১৩১৭ ও ১৩১৮, এই দুই সালে ঐ বিষয়ে উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। ১৩১৯ সালে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন, সেই প্রবন্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পুরস্কার-প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় ১৩১৯ সালে এ সম্বন্ধে যতগুলি প্রবন্ধ আসিয়াছিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়-লিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলেন,—

"Well written. The writer has worked much and has collected much valuable information. I have no hesitation to recommend the prize, whatever the amount be, to him."

অর্থাৎ—"প্রবন্ধটী সুলিখিত। লেখক বহু পরিশ্রমে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। যে কোন মূল্যেরই হউক না কেন, ইঁহাকে পারিতোষিক দিতে আমি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করি না।"

অতঃপর নলিনীবাবু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উনবিংশ বাৎসরিক অধিবেশনে "কৃষ্ণবিনোদিনী স্বর্ণপদক" (১০০ টাকা মূল্য) প্রাপ্ত হন।

মিত্রকুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত অম্বিকেশ মিত্র প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গের ১৩১৫ সালে মাতৃবিয়োগ হয়। মাতৃভক্ত সন্তানেরা ধার্ম্মিক মাতার নাম বঙ্গসাহিত্যে স্মরণীয় করিবার জন্য প্রতি বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের হস্তে 'কৃষ্ণবিনোদিনী স্বর্ণপদক' নামে পুরস্কার বিতরণের ভার অর্পণ করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তৎসম্পর্কের পুরস্কার-প্রবন্ধ ঘোষণা করিয়া থাকেন।

নলিনী বাবুর এই পুরস্কৃত প্রবন্ধ আমরা খণ্ডশঃ প্রকাশ করিব এবং ইহা অতি শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

উপক্রমণিকা

বাউল বাঙ্গালার একটি উপধর্ম্ম-সম্প্রদায়। অনেকে ইহাকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া মনে করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত, রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে না।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া ধর্ম্মের বিপ্লব চলিয়াছিল, এক ধর্ম্মের পতন, অন্য ধর্ম্মের উত্থান, পুনরায় নব ধর্ম্মের পতন—এইরূপে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া, নানা সময়ে আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ ধর্ম্মমতের সৃষ্টি হইয়াছিল; এবং এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ও প্রকরণ-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া নানা সময়ে বঙ্গদেশে যে সকল নব নব ধর্ম্মমত প্রচলিত হয়, বাউল তাহাদের অন্যতম।

এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে বহুদিন হইতে লক্ষিত হইলেও, ইহাদের রহস্য ও ইতিহাসানুসন্ধানে কাহাকেও বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত ইতিহাস এখনও শিক্ষিত-সমাজের অগোচর রহিয়াছে।

ইহার এক মাত্র কারণ, বাউল-সম্প্রদায়-ভুক্ত না হইলে, এই সম্প্রদায়ের বিবরণ ও রহস্য জানিবার কোন প্রকৃষ্ট উপায় নাই। আর যে দুই একজন কৃতকর্ম্মা ব্যক্তি বাউল-দিগের গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া এই সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত উদ্‌ঘাটন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহারাও উক্ত গ্রন্থাদিতে লিখিত শব্দসমূহের রহস্যাবৃত গূঢ় অর্থাদি হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্যক সমর্থ হন নাই।

বড় বেশী দিনের কথা নয়, গত ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ লিখিতে গিয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বাউলদিগের একখানি পুঁথির উল্লেখ করেন। এই পুঁথি-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তিনি লিখিয়াছিলেন, "এই সকল অর্থের ঐতিহাসিক আলোচনা আবশ্যক। ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা প্রকাণ্ড পরিচ্ছেদ এই আলোচনা হইতে উদ্ঘাটিত হইবে।"

এই সাম্প্রদায়িক লোকেরা তাহাদিগের সাধন-প্রণালী ও আচার-ব্যবহারের কথা গুহ্যাতিগুহ্যবোধে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করে না। আর এই জন্যই ইহারা সাধারণতঃ বলিয়া থাকে—

"আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা,
আপনাকে হইবে আপনি সাবধান।"

ইহাদের বিশ্বাস যে, নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন অন্য কাহারও নিকটে নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস বা ভজন-প্রণালী প্রকাশ করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়।

বোধ হয় এই সকল কারণেই নিম্নলিখিত জাতি এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ লিখিতে গিয়া ঐতিহাসিকগণ বাউলদিগের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই,—

Hindus by F. De. W. Ward.

Hindu Tribes and Castes by Rev. M. A. Sherring

এবং প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ উইলসন্ সাহেবও (H. H. Wilson) বাউল প্রভৃতি গোপ্য-সম্প্রদায়ের ইতিহাস উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার প্রণীত "Hindu Religions"

অভিধেয় গ্রন্থে বিশেষ দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক লিখিয়াছেন,—

"The remaining divisions of the Bengal Vaishnavas allow nothing of themselves to be known; their professions and practices are kept secret, but it is believed that they follow the worship of *Sakti*, or the Female Energy, agreeably to the left-handed ritual."

আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, উইলসন্ সাহেব সহজিয়া, নেড়ানেড়ী, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিবরণী তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গদেশের এই প্রসিদ্ধ বাউল-সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ মাত্র করেন নাই। কেবলমাত্র উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যটুকু প্রকাশ করিয়া বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির বিষয়ে নীরব থাকিয়া গিয়াছেন।

উইলসন্ সাহেবের সমসাময়িক স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখারূপে এই বাউল-সম্প্রদায়ের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। বাউল-সম্প্রদায় সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রথমে তিনিই বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন ব্যক্তি বাউল সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে দত্ত মহাশয়ের অভিমতের সারাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—

"ইহারা মহাপ্রভুকে আপন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। * *

"ইহাদের মতানুসারে পরম-দেবতা অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলরূপে মানব-দেহের মধ্যেই বিরাজমান আছেন; অতএব নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র তাঁহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। * *

"ফলতঃ কেবল ঐ পরম-দেবতা কেন, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থই মনুষ্যের শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নিমিত্ত এ সম্প্রদায়ের মত দেহ-তত্ত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। * *

"প্রকৃতি-সাধনই ইহাদিগের প্রধান সাধন। ইহারা এক একটি প্রকৃতি লইয়া বাস করে এবং সেই প্রকৃতির সাধনেতেই চিরদিন প্রবৃত্ত থাকে। ঐ সাধন-পদ্ধতি অতীব গুহ্য ব্যাপার। * *

"কামাদিপুর উপভোগের প্রকরণ-বিশেষ দ্বারা উহার শান্তি-সাধন করিয়া চরমে পরম পবিত্র প্রেম মাত্র অবলম্বন করা ঐ সাধনের উদ্দেশ্য। ইহাদের মত এই যে, যখন ঐ প্রেম পরিপক্ব হয়, তখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে নিতান্ত আত্মবিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উভয়ের লীলাতে কেবল শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামাত্র অনুভব করিতে থাকে। * *

"ঐ প্রকৃতি-সাধনের অন্তর্গত 'চারি-চন্দ্রভেদ' নামে একটি ক্রিয়া আছে। লোকে ঐ ক্রিয়াকে অতিমাত্র বীভৎস ব্যাপার মনে করিতে পারে, কিন্তু বাউল মহাশয়েরা উহা পরম পবিত্র পুরুষার্থ-সাধন বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা কহেন, লোকে ঐ চারিটি চন্দ্রকে অর্থাৎ শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র এই চারিটি দেহনির্গত পদার্থকে, পিতার ঔরস ও মাতার গর্ভ হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব উহাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া পুনরায় শরীর-মধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহাদের ঘৃণা-প্রবৃত্তি পরাভবের অন্য অন্য লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। * *

"ইহাদের মতে, বিগ্রহ-সেবা ও উপবাসাদি করা আবশ্যক নহে। কোন কোন আখ্ড়া-ধারী বাউল বিগ্রহ স্থাপন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সেটি বাউল-মতানুসারে দূষ্য ও নিন্দনীয়। * *

"ব্রজ-উপাসনাতত্ত্ব, নায়িকা-সিদ্ধি, রাগময়ী-কণা ও তোষিণী প্রভৃতি ইহাদের অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ আছে। ঐ সকল গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। * *

"ইহাদের ধর্ম্ম-সঙ্গীতের মধ্যে দেহ-তত্ত্ব ও প্রকৃতি-সাধন-সংক্রান্ত অনেকানেক নিগূঢ় ভাব সাঙ্কেতিক শব্দে সন্নিবেশিত থাকে, এই নিমিত্ত সহজে তাহার অর্থবোধ হয় না। হইলেও প্রকাশ করিতে গেলে অত্যন্ত অশ্লীল হইয়া পড়ে।"

—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়,
১ম ভাগ, ১৭১-১৭৬ পৃষ্ঠা।

অনেকে মনে করেন, ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উইলসন্ সাহেবের "Hindu Religions" নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়" প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা যে প্রকৃত নয়, তাহা এই বাউলের বিবরণ হইতেই বুঝা যায়। উইলসন্ সাহেবের গ্রন্থে বাউলের নাম গন্ধ নাই, কিন্তু দত্ত মহাশয়ের উপাসক-সম্প্রদায়ে বাউলের যথেষ্ট প্রামাণিক বিবরণ বিদ্যমান। এইরূপ পার্থক্যের কারণভূত একটু রহস্যও আমাদের শুনা আছে। কোন শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচীন সাহিত্যিকের নিকট শুনিয়াছি যে, সেকালের একজন তীর্থ-পর্য্যটক বাঙ্গালী ভারতের সকল প্রধান স্থান ভ্রমণ করিয়া নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সম্বন্ধে বহুতর তথ্য সংগ্রহ করেন। মহর্ষি ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত "তত্ত্ববোধিনী সভায়" তিনি যাতায়াত করিতেন। সেই সূত্রে তাঁহার সহিত ৺অক্ষয়কুমারের আলাপ হয় এবং তিনি অক্ষয়কুমারের নিকট সেই সকল সংগৃহীত তথ্য ও বিবরণ বিবৃত করেন। এই পর্য্যটকের সহিত উইলসন্ সাহেবেরও আলাপ ছিল এবং তিনি উইলসন্ সাহেবকেও ঐ সকল তথ্য ও বিবরণী জানাইতেন। ইহার ফলে একই সময়ে একই ব্যক্তির নিকট হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, উইলসন্ সাহেব প্রথমে ইংরেজিতে Asiatic Research পত্রিকায় "A sketch of the Religious Sects of the Hindus" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে ও পরে তাঁহার লিখিত "Hindu Religions" নামক গ্রন্থে এবং ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থে বঙ্গভাষায় ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিবরণ প্রকাশ করেন। অক্ষয়কুমার ও উইলসন্ সাহেবের মধ্যে যিনি যতটুকু বিবরণ কথোপকথনের ছলে পর্য্যটকের নিকট জানিতে পারিয়াছিলেন, তিনি তত অধিক বিবরণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক উইলসন্ সাহেবের ও অক্ষয়কুমারের গ্রন্থদ্বয় মিলাইয়া পাঠ করিলে আমাদের এই কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন।

তারপর রিজ্লে সাহেব (H. H. Risley) তাঁহার The Tribes and Castes of Bengal নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে এই বাউল সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

Baola (Sansk. Vayula, crazed or inspired), a generic term including a number of disreputable mendicant orders which have separated from the main body of Vaishnavas,

and are recruited mainly from among the lower castes. They call themselves Nitya, Chaitanya, and Hari Das Baolas, after the great Vaishnava teachers. Differing from each other in minute points of ceremonial and social observance, the Baola sects agree in regarding pilgrimage to Vaishnava shrines as a sacred duty, and reverence the Gosains as their spiritual leaders. Flesh and strong drink are forbidden, but flesh is deemed lawful food, and Ganja is freely indulged in. Baolas never shave or cut their hair, and filthiness of person ranks as a virtue among them. Ladu-Gopal, or the child Krishna, is the favourite object of worship; but in most akharas the charan or wooden pattens of the founder are also worshipped. Baolas as a class are believed to be grossly immoral, and are held in very low estimation by respectable Hindus.—Page. 347

নদীয়ার পণ্ডিত-সভার সভাপতি ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, ডি, এল্, মহাশয় যদিও তাঁহার প্রণীত "Hindu Castes and Sects" নামক সুবৃহৎ ইংরেজি গ্রন্থে, নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিশেষ ও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি বাউল-সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্যের অবতারণা করেন নাই।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত 'বিশ্বকোষ নামক অভিধানে, ৺নন্দনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয় তাঁহার "বৈষ্ণব-দর্পণে" এবং শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় তৎপ্রণীত "বঙ্গের সামাজিকতা" নামক গ্রন্থে এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন নাই। এই সকল পুস্তকে প্রায় একই ভাবের আলোচনা দেখিতে পাই।

তদ্ভিন্ন "নব্যভারতে" ৺ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়, "সাহিত্যে" ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় এবং "সজ্জনতোষিণী" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ মহাশয় তৎপ্রণীত "Bengali Language and Literature" নামক গ্রন্থেও বাউলের বিষয়ে যৎসামান্য লিখিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও অসীম অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ "Archaeological Reports of Mayurbhanja" ও "Modern Buddhism" নামক গ্রন্থদ্বয়ে এই সম্প্রদায়সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা যথাসময়ে সে বিষয়ের উল্লেখ ও আলোচনা করিব; কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহাদের মধ্যে কেহই বাউলের বিস্তৃত ইতিহাস বা বিবরণী প্রকাশ করেন নাই।

আর এই বাউল-সম্প্রদায়ের ইতিহাস অপ্রকাশিত থাকিবার অন্যতম কারণ, এখনকার শিক্ষিত-সম্প্রদায় এই সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালী ও ক্রিয়াকলাপ সকল বীভৎস ও জুগুপ্সিত বোধে ঘৃণা করিয়া থাকেন। এই

সকল কারণে প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বাউল-সম্প্রদায়ের প্রকৃত ইতিহাস আজিও অজ্ঞাত রহিয়াছে।

বাস্তবিকই বাউল-সম্প্রদায়ের রহস্যোদ্ঘাটন করিয়া ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। যে গ্রন্থের সাহায্যে এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে, সেরূপ কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। এই সম্প্রদায়ের বহু আখড়ায় এবং বহু প্রাচীন বাউলের কাছে অনেক হস্তলিখিত কড়চা ও পুঁথি আছে। এই সকল গ্রন্থে বাউলদিগের সাধন-ভজন ও রীতি-নীতির কথা সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রদায়-বহির্ভূত কোন ব্যক্তির ঐ গ্রন্থগুলি দেখিবার কোন সুবিধা বা সুযোগ নাই। যখন বাউলগণ তাহাদের পুঁথি পাঠ করে, তখন যদি কোন অসাম্প্রদায়িকলোক সেই স্থানে উপস্থিত হয়, তবে তাহারা তৎক্ষণাৎ গ্রন্থের "ডোর" বন্ধ করিয়া আগমনকারীকে তথা হইতে বিদূরিত করিয়া দেয়। আমাদের মত লোকের পক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার পক্ষে এইরূপ আরও অনেক অন্তরায় আছে।

এতদ্ব্যতীত বহু চেষ্টায় কোন ক্রমে ইহাদের সাম্প্রদায়িক কোন গ্রন্থ সংগৃহীত হইলেও, গ্রন্থ-লিখিত বহু হেঁয়ালীপূর্ণ বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না; এমন কি, তাহাদের তত্ত্বকথাপূর্ণ সঙ্গীতগুলিও এরূপ দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালী-পূর্ণ যে, সেগুলির অর্থও সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারে না। আর এই সকল গানের ও গ্রন্থনিহিত অংশের আধ্যাত্মিক অর্থ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির দ্বারা বুঝাইয়া লইলেও, তাহা এত অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট যে, সাধারণে প্রকাশের অযোগ্য।

আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তির সাহায্যে নিম্নলিখিত অমুদ্রিত পুঁথিগুলি আলোচনা করিয়াছি :—

(১) স্বরূপ দামোদরের কড়চা
(২) স্বর্ণটীকা
(৩) চন্দ্রকলিকা বা চম্পককলিক
(৪) শ্রীলবঙ্গচরিত্র
(৫) মীরাবাইয়ের কড়চা
(৬) দিলকিতাব
(৭) ভাবামৃত
(৮) পঞ্চতত্ত্ব
(৯) আত্মতত্ত্ব
(১০) রসসার

তদ্ভিন্ন এই সম্প্রদায়সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত মুদ্রিত গ্রন্থগুলিও আলোচনা করিয়াছি :—

(১) বিবর্ত্ত-বিলাস
(২) স্বরূপ দামোদরের কড়চা
(৩) মীরাবাইয়ের কড়চা
(৪) আত্মতত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্ব
(৫) শ্রীরসকদম্বকলিকা
(৬) রসতত্ত্বসার

এই বাউল-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার এবং এই সঙ্কলন-কার্য্যের কতগুলি অন্তরায় আছে এবং পদে পদে কিরূপ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, এই সকল বিষয়ের আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। এই সকল অন্তরায় এবং নানা বাধাবিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও আমি এই কার্য্যে কতকটা সফলকাম হইতে পারিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস। বাউল-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় আমি যে সকল বিষয় ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, নিম্নলিখিত বিষয়-বিভাগে সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করিব।

বিষয়-বিভাগ

বাউল-শব্দের অর্থ

"বাউল" এই শব্দটীর অর্থ লইয়া বিশেষ গোল আছে। প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে "বাতুল" শব্দের প্রাকৃত রূপ "বাউল" হয়। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের "লোপাহনাদ্য-যুগ্মগাদি তৃতীয়ে"—এই সূত্রানুসারে "বাতুল" শব্দ হইতে বাউল শব্দের বুৎপত্তি স্থির করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সংস্কৃত বাতুল শব্দ হইতে হিন্দী "বাউর" শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। কেরী প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রাচীন অভিধান-কারগণ "বাতুল" অর্থে বাউল লিখিয়াছেন। * এমন কি প্রথম ইংরাজী-বাঙ্গালা-অভিধানকার ফরেষ্টার সাহেব বাউলকে বাতুল শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দী ভাষায় এই শব্দটি "বায়ালো," "বাওল," "বাওলী" প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অশিক্ষিত লোকেরা "বাভলে," "বাউরা," "বাউরী" ইত্যাদি রূপেও ব্যবহার করিয়া থাকে।

অভিধান প্রভৃতি হইতে আমি যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা এই—উন্মত্ত, বাত-বিকারপ্রাপ্ত, পাগল, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়বিশেষ ইত্যাদি।

এখন দেখা যাউক, এই সম্প্রদায়কে কি কি কারণে "বাউল" নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণতঃ এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের পাগলের ন্যায় অপূর্ব্ব বেশভূষা, হাবভাব, চালচলন এবং নৃত্য-গীতের ভঙ্গী প্রভৃতি, ইহাদিগের "বাউল" নামকরণে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। আবার কেহ

* (ক) বাউল (from বাতুল mad)—mad, insane. A person who shouts or proclaims the name of a God.—A Dictionary of Bengalee Language by W. Carey, D. D., 1825.
(খ) বাউল—(বাতুল-শব্দজ)—বঙ্গদেশের গৌরাঙ্গভক্ত ভিক্ষুকবিশেষ ইহারা গান করিয়া ভিক্ষা করে।
—Barat's Pronouncing Dictionary.

কেহ ইহাদিগের ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত উন্মাদ-লক্ষণ দেখিয়া ইহাদিগকে বাউল নামে অভিহিত করিত। এইরূপে সাধারণ লোকে ইহাদিগের বেশভূষাদি বাহ্য লক্ষণাদি লক্ষ্য করিয়া, এবং ভগবদ্ভক্ত লোকে ইহাদিগের বাতুলবৎ প্রকৃত হৃদ্গত প্রেমোন্মত্ততা লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগের "বাউল" নামকরণ করিয়াছেন।

এই সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকটি প্রবীণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার অন্য একটি সুন্দর নূতন অর্থ অবগত হইয়াছি। তাঁহারা বলেন, এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রাচীন নাম "বায়ুর"। এই বায়ুর শব্দ হইতে ক্রমে "বাউল" শব্দের উৎপত্তি। "রলয়োরভেদঃ" এই সূত্র এখানেও প্রযুজ্য। ভক্ত যখন বায়ুর মত ভগবানে মিশিয়া যাইতে পারে, তখনই তিনি প্রকৃত বায়ুর বা বাউল নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত। বায়ু যেমন নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া, সকল স্থানে সর্ব্বাবস্থায় যাবতীয় পদার্থের সহিত মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে, লোকে যখন আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া তেমনই ভাবে ভগবানে বিলীন হইতে পারে, তখনই সে প্রকৃত বাউল-পদবাচ্য হইবে।

বাউল এই শব্দটি অল্প রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বিভিন্ন অর্থে প্রচলিত আছে। ঢাকা জেলায় "বেরী" অর্থে "বাউলী" এবং ময়মনসিংহ জেলায় "ঘরবাড়ীশূন্য" এই অর্থে "বাউল্লিয়া" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত "বাউল্লিয়া" শব্দের অর্থ হইতে আমরা আর একটি নূতন কথা জানিতে পারিতেছি। বাউল-সম্প্রদায়ের লোকেরা কেহই গৃহী নহেন, সকলেই ঘরবাড়ীশূন্য ত্যাগী পুরুষ। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘরবাড়ী-শূন্য বলিয়াও বোধ হয় ইহাদিগকে "বাউল্লিয়া" বলিয়া অভিহিত করিত।

বাউল শব্দ "বাতুল" এবং বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এই উভয় অর্থেই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের নানা স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমি পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে প্রাচীন সাহিত্য হইতে ঐ সকল প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া "বাউল" শব্দের অর্থ অধিকতর সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

প্রাচীন সাহিত্যাদিতে বাউল শব্দের উল্লেখ

বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি প্রাচীন গ্রন্থসকল আজিও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং যে দুই চারিখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বাউল শব্দ আছে কি না জানি না। তবে যতগুলি মুদ্রিত গ্রন্থ আমি অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে চণ্ডীদাসের পদাবলীর পূর্ব্বে লিখিত কোন গ্রন্থে বাউল শব্দের প্রয়োগ পাই নাই। বিদ্যাপতির সমগ্র পদাবলীর মধ্যে বাউল শব্দ নাই। তবে

"তোমার বিরহ বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।"

(বিদ্যাপতি ১০৩ পৃষ্ঠা—কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের সংস্করণ)

এই পদে বাউর শব্দ বাতুল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলীর মধ্যে তিন স্থানে বাউল শব্দের উল্লেখ আছে।

(১) "প্রেম ঢল ঢল যেমন বাউল
বনের হরিণী তারা।"

(২০৫ পৃষ্ঠা)

—রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণ।

(২) "**বাউল** হইয়া মিলাইছে শিলা
শুনি সে মুরলী গীত।"
(৩৯৬ পৃঃ)

(৩) "শুন মাতা ধর্ম্মমতি **বাউল** হইনু অতি
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী।"
(৪৫৩ পৃঃ)

এই উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে প্রথম স্থলে **বাউল** শব্দের অর্থে "বায়ুগ্রস্ত" বুঝায়। ৺রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় তৎসম্পাদিত চণ্ডীদাসে এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় স্থলে "পাগল" এবং তৃতীয় স্থলে ক্ষিপ্ত বা ব্যাকুল অর্থে বাউল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

চৈতন্য-চরিতামৃতে "পাগল" অর্থে বহু স্থানে "বাউল" শব্দের উল্লেখ আছে। নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ দিলাম :—

(১) দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি
মহা**বাউল** নাম ধরি।

(২) আমি ত **বাউল** এক কহিতে আন কহি,
কৃষ্ণের তরঙ্গে আমি সদা যাই বহি।

(৩) তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস,
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ।

মাধব দেব কৃত অসমিয়া রামায়ণের আদি-কাণ্ডেও "পাগল" অর্থে বাউল শব্দের উল্লেখ আছে।

সেহি সূর্য্য বংশে তুমি নৃপতি প্রধান,
স্ত্রীতে [illegible] **বাউল** চিন্তা নাহি আন।

কাশীরাম দাসের মহাভারতেও ক্ষিপ্ত অর্থে বাউল শব্দের প্রয়োগ আছে :—

কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান,
বাউল হইল কিম্বা করি অনুমান।
(আদিপর্ব্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ)

এতদ্ব্যতীত বহু প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাগল বা ক্ষিপ্ত অর্থে বাউল শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রদায়বোধার্থক বাউল শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় না। তবে প্রথিতযশা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্প্রতি ময়রভঞ্জ হইতে "শূন্যসংহিতা" নামে কোন উৎকলীয় পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পুঁথির দুই স্থলে বাউল সম্প্রদায় অর্থে "বাউলী" শব্দের উল্লেখ আছে।

"[illegible] নিদা। বীরসিংহ আজ্ঞা,
[illegible] বাউলী প্রতিজ্ঞা।"
"[illegible] সন্ন্যাসী নামক বীরসিংহ,
[illegible] বাউলা কপিল যেতে সঙ্গ।"

অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বোধ হয় যে, এই পুঁথি ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে বাউল সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া 'বাউল' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

পাণিনি-কার্য্যালয়ের হিন্দুসাহিত্য-প্রচার

হিন্দু সভ্যতা, সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার সহিত পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু নানা কারণে অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীই সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ। অথচ এই দেবভাষাতেই আমাদের পুরাতন জাতীয় সভ্যতার ইতিহাস ও নিদর্শন আবদ্ধ। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দর্শন লইয়াই আমরা সমগ্র জগতের নিকট গৌরব ও গর্ব্ব করিয়া থাকি। ব্যাকরণকার পাণিনির ব্যাকরণ আজ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণের আদর্শ-স্থল। কিন্তু কয়জন শিক্ষিত ভারতসন্তান

মনে করেন, সেই সব ভারতীয় মনীষীগণের, যাঁহাদের দরুণ এই দুর্দ্দিনেও আমাদের পুরাতন ঠাঠ কিয়দংশ বজায় রাখিতে পারিয়াছি, তাঁহাদের সহিত তাঁহারা পরিচিত আছেন! তবে তাঁহাদের এই পরিচয় বিদেশিগণের অর্দ্ধশুদ্ধ এবং অশুদ্ধ অনুবাদের ভিতর দিয়াই হইয়াছে। তাঁহারা মসজিদের প্রাঙ্গণ দিয়া মন্দিরের ভিতর ঢুকিয়াছেন। এই ভাব দূর করিতে হইলে দুইটি জিনিষের প্রয়োজন। প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য সুগম পথ নির্দ্ধারণ ও দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতে সুপণ্ডিত ও সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত যথাযথ পরিচয় করাইয়া দেওয়া। এই দুই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে পাণিনি-কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইতে হইলে এবং এই ভাষার এবং এই ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির সম্বন্ধে গবেষণাদি করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণে খুব বেশী রকম দখল থাকা দরকার। যেমন চক্রহীন রথ পথ চলিতে পারে না, সেইরূপ ব্যাকরণজ্ঞানহীন ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষার দুর্গম পথ কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না। সাধারণ সংস্কৃত সাহিত্যের সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেদ পড়িতে হইলে পাণিনির সহিত ভাল রকম পরিচয় থাকা অত্যাবশ্যক, এমন কি পাণিনি না জানিলে বেদ পড়া হইতেই পারে না বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এইজন্য পাণিনি-প্রচারকল্পে এই কার্য্যালয় প্রথমেই পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সটীক অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই জগৎখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদক পাণিনি-আফিসের অন্যতম প্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় স্বয়ং। এই অনুবাদ এতদূর ঠিক ও প্রাঞ্জল হইয়াছে যে, জগৎপ্রসিদ্ধ ভাষাবিৎ ও পণ্ডিত ভট্ট মোক্ষমূলর দুঃখ করিয়া অনুবাদককে লিখিয়াছিলেন যে এই পুস্তক ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যদি প্রকাশিত হইত তাহা হইলে তাঁহার অমূল্য সময়ের অনেকখানি অংশ অযথা ব্যয় হইত না। ভট্ট মোক্ষমূলর এই পুস্তক সম্বন্ধে যে দুইখানি পত্র অনুবাদককে লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই এই পুস্তকের উৎকর্ষতা প্রমাণিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন—

"* * From what I have seen of it it will be a very useful work. What should I have given for such a work forty years ago when I puzzled my head over Panini's Sutras and the Commentaries. * * I hope you may succeed in finishing your work."

"* * Allow me to congratulate you on your successful termination of Panini's Grammar. It was a great undertaking, and you have done your part of the work most admirably. I say once more what should I have given for such an edition of Panini when I was young and how much time would it have saved me and others. Whatever people may say, no one knows Sanskrit, who does not know Panini."

ইউরোপের ও আমেরিকার অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণও পুস্তকখানির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এই পুস্তক প্রকাশিত

হিন্দু সাহিত্য প্রচারক

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ

হওয়াতে উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত অধ্যয়নের পক্ষে কত বেশী সুবিধা হইয়া গিয়াছে তাহা অধ্যাপক হুইট্‌নি, পিশেল, জলি, ফৌসবয়েল প্রভৃতির পত্র হইতে বেশ বোঝা যায়। ইওরোপ এবং আমেরিকার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক চতুষ্টয়ের অভিমত নিম্নে দেওয়া গেল।

Professor T. Jolly, Ph. D., Wurzburg (*Germany*), *23rd April*, 1893.—"* * Nothing could have been more gratifying to me no doubt, than to get hold of a trustworthy translation of Panini's Ashtadhyayi, the standard work of Sanskrit Literature, and I shall gladly do my best to make this valuable work known to lovers and students of the immortal literature of ancient India in this country."

Professor W. D. Whitney, New Haven, U. S. A., 17th June, 1893.—"* * The work seems to me to be very well planned and executed, doing credit to the translator and publisher. It is also, in my opinion, a very valuable undertaking as it does give the European student of the native grammar more help than he can find anywhere else. It ought to have a good sale in Europe (and correspondingly in America)."

Professor V. Fausboil, Copenhagen, 15th June, 1893.—"* * It appears to me to be a splendid production of Indian industry and scholarship and I value it particularly on account of the extracts from the Kashika."

Professor Dr. R. Pischel, Halle (*Saale* *27th May*, 1893.—"* * I have gone through it and find it an extremely valuable and useful book, all the more so as there are very few Sanskrit scholars in Europe who understand Panini."

এই পুস্তকের কিয়দংশ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের এম্, এ পরীক্ষাতে পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হয়। ইতিপূর্ব্বে কোন আধুনিক ভারতবাসীর পুস্তক কোন ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং উচ্চ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। শুনা যাইতেছে অধ্যাপক ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের একখানি পুস্তক ফ্রান্সের প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হইয়াছে।

ডাঃ গোল্ডষ্টুকার সত্যই বলিয়াছেন যে, যিনি যাহাই বলুন না কেন, পাণিনি না জানিলে সংস্কৃত ভাষাই জানা হয় না। বঙ্গদেশে পাণিনির প্রচার পূর্ব্বে ছিলই না; সেইজন্য বেদ প্রভৃতির চর্চ্চা বঙ্গদেশে এক প্রকার ছিল না বলিলেই হয়। সে হিসাবেও ইহা কম গৌরবের কথা নয় যে একজন বঙ্গ সন্তানের ভাগ্যে ইহার প্রচার-কার্য্য পড়ে। পাণিনি মুনি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত প্রদেশের শালাতুর নামক এক নগরে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার জন্মের প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পরে গঙ্গাযমুনার সঙ্গম-স্থান তীর্থরাজ প্রয়াগে এই পুস্তক প্রকাশিত

হওয়ায় তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

পাণিনি-কার্য্যালয়ের দ্বিতীয় কার্য্য ভট্টজী দীক্ষিত প্রণীত সিদ্ধান্তকৌমুদীর ইংরাজী অনুবাদ। ইহাতে ভট্টজী দীক্ষিত পাণিনির সূত্রগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন এবং সেই সূত্রগুলিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাণিনির সহিত আলাপ পরিচয় বেশীর ভাগ পণ্ডিতগণের ইহার ভিতর দিয়াই হইয়া থাকে। কিন্তু অধ্যাপনার দোষে এই পুস্তক আয়ত্ত করিতে ছাত্রগণের দশ বার বৎসর বৃথা অতিবাহিত হয়। পাণিনি আফিস কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অনূদিত গ্রন্থ দ্বারা এখন আশা করা যায় যে অর্দ্ধেকের অধিক অল্প সময়ে এবং তদপেক্ষা অল্প আয়াসে এই কঠিন পুস্তক ছাত্রগণ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে। মান্দ্রাজের 'হিন্দুপত্রিকা' কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ন মিরর' এবং এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান পিপল' এই পুস্তক সমালোচনা করিবার সময় লিখিয়াছিলেন, "প্রায় ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের 'অরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউসন ফণ্ড' এই পুস্তক হোরেস্ হেমান উইলসন কর্ত্তৃক অনূদিত করাইয়া প্রকাশ করিবেন এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় পুস্তকখানি অধিক কঠিন হওয়ায় তাঁহারা সে সঙ্কল্পটি আর কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই; কারণ বিজ্ঞাপিত অনুবাদটি আর কখন প্রকাশিত হয় নাই।" সিদ্ধান্তকৌমুদী সমস্ত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার এম্, এ পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত। তাঁহারা সকলেই এই বিশদ অনুবাদের দ্বারা যে কত উপকৃত তাহা বলা যায় না।

কিন্তু পাণিনি-আফিসের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কার্য্য Sacred Books of the Hindu[s]। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থাদি সমুদায় প্রায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং নানা কারণে শিক্ষিত ভারতবাসী সে সব গ্রন্থ মূল সংস্কৃত ভাষায় পড়িয়া উঠিতে অক্ষম। ইহার প্রবর্ত্তকগণ বুঝিয়াছিলেন, সভ্যজগতের সম্মুখে হিন্দুদিগের এই অমূল্য গ্রন্থরাজির দ্বার না উদ্ঘাটিত করিয়া দিলে ভারতবর্ষ কখন অন্যান্য সভ্য জাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জ্জন বা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না। এমন কি পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুগণও যতদিন নিজেদের জাতীয় গৌরবের যথাযথ নিদর্শন না পান, ততদিন তাঁহারা নিজেদের ধর্ম্মের কিম্বা জাতির প্রতি কখন আস্থাবান হইতে পারেন না। বিদেশিগণ কর্ত্তৃক বিকৃত অনুবাদের ভিতর দিয়া অনেক সময়ে তাঁহাদের হিন্দুশাস্ত্রের পরিচয়। তাহাতে অনেক সময় বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক হিন্দু সাহিত্যের অনুবাদের প্রধান দোষ সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানের ও হিন্দুভাবের সহিত সহানুভূতির অভাব। তাঁহারা সময় সময় সংস্কৃত ভাষা সম্যক্‌রূপে না জানার দরুণ এমন অদ্ভুত অদ্ভুত ভুল করিয়া থাকেন যে তাহা পাঠ করিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু-চিন্তা-প্রণালীর সহিত সহানুভূতির অভাবের দরুণ এবং অনেক সময়ে তাহা সম্যক্‌রূপ বুঝিতে না পারার জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের ভাব অনেক সময়ে ঠিক ঠিক ধরিয়া উঠিতে পারেন না এবং তাহা না বুঝিতে পারিয়া হিন্দুজাতি এবং হিন্দু সাহিত্যের সম্বন্ধে নানা অভিমত প্রচার করিয়া বসিয়া থাকেন। অনেক শিক্ষিত হিন্দুও সেই সব পণ্ডিতগণের

সহিত একমত হইয়া হিন্দুজাতি, সাহিত্য ও ধর্ম্মের উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা বিচার করিয়া থাকেন। এই অভাব দূর করিতে হইলে, শাস্ত্রীয় গ্রন্থের মধ্যে প্রধান প্রধান গুলিকে ইংরাজীতে শুদ্ধভাবে—অর্থাৎ কেবল ভাষাগত শুদ্ধ হইলেই হইবে না, ভাবগত শুদ্ধতা যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, রক্ষা করিয়া—অনুবাদ করাইয়া সভ্য জগতের সম্মুখে প্রচার করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে পাণিনি-আফিসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই অমূল্য গ্রন্থাবলী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। অদ্যাবধি ইহাতে ১৪ খানি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। এই গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে ঈশ কেন প্রভৃতি ছয়খানি উপনিষৎ মাধ্ব ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হয়। এই ভাষ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। উপনিষদ, বেদান্ত প্রভৃতির ভাষ্যের কথা উঠিলেই শাঙ্কর-ভাষ্যের কথাই স্বতঃ মনে উদয় হয়। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে পূর্ব্বোল্লিত গ্রন্থগুলির শাঙ্করভাষ্য ব্যতীত অন্যান্য আচার্যগণকৃত তুল্যপ্রসিদ্ধ ভাষ্য প্রচলিত আছে। আচার্য্য শঙ্কর কেবল অদ্বৈতবাদের এবং জ্ঞানের দিক দিয়া ঐ গুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে জ্ঞানমার্গের সহিত সমভাবে ভক্তিমার্গও রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। জ্ঞানমার্গের পথিকদিগের পক্ষে যেমন শঙ্কর পূজনীয় ও প্রয়োজনীয়, সেইরূপ ভক্তিমার্গানুসরণ-কারীদের পক্ষে মধ্বাচার্য্যও মাননীয় ও অনুসরণীয়। শ্রীমৎ চৈতন্যদেব ইহার শিষ্য।

[illegible]র দ্বিতীয় খণ্ডে রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় কৃত যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির মিতাক্ষরা টীকা ও বালমভট্টিকৃত ভাষ্যের ইংরাজি [illegible] অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার তৃ[illegible] [illegible] খণ্ডে ছান্দোগ্য উপনিষৎ মাধ্ব ভাষ্য [illegible] রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশ[illegible] [illegible]ক অনূদিত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডে [illegible] কৃত যোগসূত্রের ব্যাসের টীকা এবং [illegible] মিশ্রের ভাষ্যের সহিত ইংরাজীতে অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার অনুবাদক [illegible] রামপ্রসাদ এম্, এ। তিনি যোগ সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি লিখিয়া ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার এই দর্শন সম্বন্ধে বিশেষরূপ [illegible]লোচনা ও চর্চ্চা আছে। সুতরাং তাঁহার কৃত এই গ্রন্থখানি যে খুব উপাদেয় হইয়াছে [illegible] বলাই বাহুল্য। পঞ্চমখণ্ডে বলদেব কৃ[illegible] টীকা সহিত ব্যাসের বেদান্ত-সূত্রের ইং[illegible] অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার অনুবাদক রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু। ভাষ্যকার বলদেব। চৈতন্যের ভক্ত ও বাঙ্গালী বলদেবের ভাষ্য হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বেদান্ত সূত্র কেবল জ্ঞানমার্গীদের একচেটিয়া দর্শন নহে, ইহা ভক্তিমার্গের পথিকদেরও প্রধান গ্রন্থ। আর এক কারণেও বলদেবের ভাষ্যের খুব মূল্য আছে; বেদান্ত সূত্রের টীকাকারদিগে[illegible] [illegible]ধ্যে বলদেবের ন্যায় বেদে পণ্ডিত কেহ ছিলেন না। বেদান্ত-দর্শন হিন্দু-দিগের প্রধান দর্শন এবং ইহার অনেক ভাষ্য বর্ত্তমান; বলদেবের ভাষ্যও তাহাদের মধ্যে একটি, কিন্তু ইহাতে এমন অনেক বিশেষত্ব আছে যাহা অন্য টীকায় নাই। দ্বিতীয়তঃ ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রদেশে একটা অযথা অপবাদ আছে যে, বাঙ্গালীদের ন্যায়-দর্শন ছাড়া অন্যান্য দর্শনে বিশে[illegible] নাই। তাঁহারা বাঙ্গালী বলদেব কৃত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য পাঠ করিলেই এই অপবাদের চরম উত্তর পাইবেন।

ষষ্ঠ খণ্ডে বৈশেষিক দর্শন শঙ্কর মিশ্রের টীকার সহিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল সিংহ এম্, এ, বি, এল্ কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার স্থানে স্থানে জয়নারায়ণ-কৃত ভাষ্যও অনুবাদ করা হইয়াছে। ইহাতে নারদসূত্র, শাণ্ডিল্যসূত্র ও বিষ্ণুপুরি-কৃত ভক্তিরত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকত্রয়ের অনুবাদক যথাক্রমে শ্রীযুক্ত নন্দলাল সিংহ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল বি, এ, বি, এল্ এবং জনৈক অবসরপ্রাপ্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী সংস্কৃতাধ্যাপক। এ গ্রন্থগুলি এত প্রসিদ্ধ যে এগুলি সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। অষ্টম খণ্ডে গৌতমকৃত ন্যায়-সূত্র প্রকাশিত হইতেছে। ইহার টীকাকার ও অনুবাদক কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ ভাষাবিৎ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়। ইহাতে তিনি নিজের টীকা দিতেছেন।

নবম খণ্ডে গরুড়পুরাণের ইংরাজী অনুবাদ আছে। দশম খণ্ডে মুইর সেণ্ট্রাল কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার গঙ্গানাথ ঝা কর্ত্তৃক জৈমিনী-কৃত মীমাংসা-সূত্রের এক নূতন টীকার সহিত ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদক ও টীকাকার মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার গঙ্গানাথ ঝার ন্যায় মীমাংসা-শাস্ত্রে পণ্ডিত আজকাল ভারতবর্ষে বিরল। একাদশ খণ্ডে সাংখ্য-প্রবচন-সূত্রের অনিরুদ্ধ-কৃত বৃত্তি, বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য এবং মহাদেব বেদান্তী-কৃত বৃত্তিসার হইতে সংকলন সহিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল সিংহ কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

দ্বাদশ খণ্ডে বরাহমিহির-কৃত বৃহজ্জাতক নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে অনুবাদক স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিষ্য। ইঁহার গার্হস্থ্য আশ্রমের নাম শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি, এ, এল্, সি, ই। ইনি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগে ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়র ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় জল-সরবরাহের কারখানা নামক পুস্তক লিখিয়াছেন। বঙ্গভাষায় জল-সরবরাহের সম্বন্ধে ইহাই প্রথম পুস্তক, ইহা এই কার্য্যালয় হইতেই প্রকাশিত হয়। বঙ্গভাষায় ইনি সূর্য্য-সিদ্ধান্তের টীকা ও অনুবাদ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থাবলীর ত্রয়োদশখণ্ডে জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের শুক্রনীতিনামক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শুক্রনীতি অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত। যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে হিন্দুগণ কেবল আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন এবং সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন, তাঁহারা বোধ হয় হিন্দু সাহিত্যে অর্থশাস্ত্রের অস্তিত্ব জ্ঞাত নহেন, কারণ অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকিলে তাঁহারা এইরূপ অবিবেচকের ন্যায় কথা বলিতেন না। বিনয় বাবুর পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হিন্দুদিগের রাজ্যতন্ত্র কিরূপ উচ্চ ধরণের ছিল। হিন্দুদিগের বিচারালয়, দুর্গ, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতির বিবরণ পাঠ করিলে এক কালে বিস্ময়াপ্লুত হইয়া যাইতে হয়। আধুনিক যুগের সহিত তুলনা করিলেও ঐ সব বিষয়ে হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হয়। অনুবাদক কর্ত্তৃক এই পুস্তকের এক অতি-বিস্তৃত ভূমিকা লিখিত হইতেছে। এই

ভূমিকায় লেখকের হিন্দু-সমাজ-তন্ত্র সম্বন্ধে অতি মূল্যবান গবেষণা সমুদায় লিপিবদ্ধ হইবে। এই ভূমিকাটি প্রকাশিত হইলে যে, অতি মূল্যবান হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থাবলীর চতুর্দ্দশ খণ্ডে বৃহদারণ্যক নামক উপনিষদের মধ্বাচার্য্যকৃত টীকার সহিত ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। এই গ্রন্থাবলীর উপনিষৎগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, যাঁহারা উপনিষৎ লইয়া বিশেষ আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে এইগুলি যেমন উপকারী, আবার যাঁহারা উপনিষৎ পড়িতে নূতন আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষেও এইগুলি তুল্য উপকারী ও লাভজনক। উপনিষৎ ও দর্শনগুলির প্রত্যেক মন্ত্র ও সূত্র প্রথমে দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃতে ছাপা হইয়াছে। পরে সেই মন্ত্র ও সূত্রগুলির পদচ্ছেদ ও সেই শব্দগুলিকে রোমানেতে অক্ষরান্তরিত করা হইয়াছে এবং তৎপার্শ্বে শব্দগুলির ইংরাজী প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে যাঁহারা সংস্কৃত একেবারেও জানেন না, তাঁহারাও এই কঠিন পুস্তক সমুদায় অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থাবলীর এক অতিরিক্ত খণ্ডস্বরূপ হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী সমাজ-সংস্কারক ও ভূতপূর্ব্ব জজ রায় বাহাদুর লালা বৈজনাথ সাহেব কর্তৃক অধ্যাত্ম রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থাবলী প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হয়, প্রতি মাসে ইহাতে এক শত পৃষ্ঠা কারয়া থাকে। এই গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে অধিক কিছু না বলিয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে হিন্দুগণ যদি জগদ্‌গুরু হইবার আশা রাখেন এবং বেদান্তধর্ম্মকে জগতের ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিবার ইচ্ছা করেন এবং হিন্দুগণ যদি মানব-জাতির আদর্শস্থল বলিয়া পরিগণিত হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তাহা হইলে হিন্দুগণের যেরূপ শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন হইবে তাহা এই পুস্তকাবলীর দ্বারা যেরূপ সাধিত হইবে, আমাদের মতে তাহা অন্য কোন পুস্তকাবলীর দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। হিন্দুগণের জগদ্‌গুরু হইবার আশা কিছু দূরাকাঙ্ক্ষা নহে। বেদান্তের সহিত পরিচিত হইয়া পাশ্চাত্য মনীষীগণের চিন্তা যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হিন্দু-দর্শন পাশ্চাত্য জাতিদিগের জীবন-প্রবাহের গতি যেরূপ অন্যদিকে ফিরাইয়া দিয়াছে এবং ক্রমশঃ ভারতবর্ষের প্রভাব অন্যজাতিদিগের উপর যেরূপ অধিকার বিস্তার করিতেছে, তাহাতে হিন্দুগণের জগতের গুরুত্ব লাভ করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আশার বাণী বজ্রনিনাদের ন্যায় পাশ্চাত্য জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে শ্রুত হইয়াছে। হিন্দু বিবেকানন্দ আজ পাশ্চাত্য জগতকে অন্য প্রকারে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। হিন্দু কবি রবীন্দ্র-নাথের কাব্য ইউরোপীয় ভাবসাগরে যেরূপ আলোড়ন উৎপাদন করিয়াছে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। হিন্দুরা ইচ্ছা করিলেই এই পদে বৃত হইতে পারেন। তবে আমাদিগকে এই পদের উপযুক্ত হইবার জন্য সম্যক ভাবে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন এবং তাহার জন্য হিন্দু সভ্যতাকে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং তাহার জন্য এইরূপ অমূল্য গ্রন্থরাজির— যাহাতে ঐ সকল লিপিবদ্ধ আছে—সাহায্য অতিশয় আবশ্যক। এই গ্রন্থাবলী কেবল ভারতবর্ষেই প্রশংসিত নহে, পরন্তু ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, শ্যামদেশ প্রভৃতি দূর-দেশেও ইহার উপকারিতা প্রভূত ভাবে উপলব্ধ হইয়াছে। জর্ম্মাণির প্রসিদ্ধ সংস্কৃতাভিজ্ঞ

ওয়ার্জবিয়ার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক ডাক্তার জে, জলী, পি, এইচ, ডি, এই গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,

"I take a special interest in this new series of the Sacred Books of the Hindus, trusting that it will be as successful as Maxmuller's series of the Sacred Books of the East has been, yours, I gather, is an essentially patriotic undertaking. It will help to promote the interest in things Indian, in Indian learning and Indian religion, both in your country and in Europe."

অর্থাৎ "আমি আপনাদের সেক্রেড্ বুক্‌স অব দি হিন্দুস্' নামক গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি। আমার বিশ্বাস মোক্ষমূলরের গন্থাবলী—সেক্রেড বুক্‌স অব দি ইষ্টের ন্যায় আপনাদের গ্রন্থাবলীও সাফল্য লাভ করিবে। আপনাদের গ্রন্থাবলী দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা মুখ্যতঃ দেশহিতৈষণার দিক হইতেই প্রকাশিত হইতেছে। ইহা আপনাদের নিজের দেশে এবং ইউরোপে ভারতীয় বিষয়, ভারতীয় বিদ্যা এবং ভারতীয় ধর্ম্মের প্রতি আগ্রহ ও যত্ন বিস্তার করিতে সাহায্য করিবে।"

স্যর জি, এ, গ্রিয়ারসন, কে, সি, আই, ই, পি, এইচ, ডি, পেন্সন প্রাপ্ত সিবিলিয়ান এবং লিঙ্গুয়িষ্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, সম্পাদক মেজর বামনদাস বসু মহাশয়কে লিখিয়াছেন,—

"May I write to express my appreciation of the Sacred Books of the Hindus" appearing under your editorship. They form a most valuable and useful series of documents."

অর্থাৎ "আপনার সম্পাদকত্বাধীনে প্রকাশিত সেক্রেড বুক্‌স্ অব দি হিন্দুস্ নামক গ্রন্থাবলী আমার নিকট অতি প্রশংসনীয়। এই পুস্তকগুলি অতিশয় মূল্যবান।"

এই পুস্তকাবলীর পরিবর্ত্তে ইউরোপ, আমেরিকা ও এসিয়ার অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সভা ও সমিতি তাঁহাদের নিজেদের প্রকাশিত পুস্তক সমুদায় দিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের ব্রিটীশ মিউজিয়ম পাণিনি-কার্য্যালয়ের পুস্তকের পরিবর্ত্তে নিজেদের প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক দিয়াছেন। আমেরিকার জগৎপ্রসিদ্ধ স্মিথ সোনিয়ান ইনষ্টিটিউট তাঁহাদের প্রায় সমুদায় পুস্তক—যাহার মূল্য পঞ্চ সহস্র মুদ্রারও অধিক—এই কার্য্যালয়ের প্রকাশিত পুস্তকের সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমেরিকার ওরিয়াণ্টাল সোসাইটির সহিতও ইহাদের পরিবর্ত্তন চলে। শ্যামদেশের নৃপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক সমুদায়ও ইহারা নিজেদের পুস্তকের পরিবর্ত্তে পাইয়া থাকেন। তা ছাড়া, অনেকে এই কার্য্যালয়ের এইরূপ সুন্দর কার্য্য দেখিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্যালয়কে অনেক পুস্তক অমনি উপহার দিয়া থাকেন। ভারতীয় রাজসচীব (Secretary of State for India), ভারত সরকার (Government of India) এবং অন্যান্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ইহাদের প্রয়োজনীয় ও উপকারী যে সব পুস্তক তাঁহাদের অধীনে প্রকাশিত হয় সে সব ইহাদিগকে উপহার দিয়া থাকেন, এবং অনুরূপ বহুবিধ সাহায্যও করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের অনেক হিন্দু রাজন্যবর্গও ইহাদের উপরোক্ত

হিন্দু সাহিত্য প্রচারক

শ্রীযুক্ত মেজর বামনদাস বসু

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

প্রকারে সাহায্য করিয়া থাকেন। বরোদা, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশীয় রাজগণ তাঁহাদের প্রকাশিত হিন্দুসাহিত্য সম্বন্ধীয় সমুদায় পুস্তকই ইঁহাদিগকে দিয়া থাকেন। মাদ্রাজ ও বঙ্গে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রকাশিত সমুদায় সংস্কৃত পুস্তক ইঁহাদিগকে দিয়াছেন। সেগুলির মূল্য সহস্রাধিক মুদ্রা। আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট ইঁহাদিগকে, আর্কিওলজিক্যাল রিপোর্টস, কর্পাস, ফ্লিটস্, গুপ্ত ইনস্ক্রিপশন্, আর্কিটেকচার অব জোনপুর, কেভ টেম্পলস অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি অতি মূল্যবান পুস্তক ইঁহাদিগকে দিয়াছেন। এইরূপে এই কার্য্যালয়সংশ্লিষ্ট পুস্তকালয়টি গবেষণাদি কার্য্যপক্ষে অতি উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে।

এই কার্য্যালয় অধুনা "Sacred Laws of the Aryas" নামক হিন্দুস্মৃতি সম্বন্ধে এক নূতন গ্রন্থাবলী ১৯১৩ খৃঃ অব্দ হইতে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপ পুস্তকের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে অধ্যাপক Jolly, Sir Henry Sumner Maine ও রায় বাহাদুর শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই পণ্ডিতত্রয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিলা দিলেই যথেষ্ট হইবে—

Professor Jolly in his Tagore Law Lectures says :—

"In modern times, after the establishment of the British rule in India, the hold of the early native institutions over the Indian mind was found to have remained so firm that it was considered expedient to retain the old national system and option amidst the most sweeping changes which had been introduced in the administration of the country and in judicial procedure. It was the desire to ascertain the authentic opinions of the early native legislators in regard to these subjects which led to the discovery of the Sanskrit literature. European Sanskrit philology may be said then to owe a debt of gratitude to the memory of the ancient Sanskrit Lawyers of India."

Sir Henry Sumner Maine says.

"India may yet give us a new science not less valuable than the science of language and folk-lore. I hesitate to call it comparative jurisprudence, because if it ever exists, its area will be so much wider than the field of law. For India not only contains (or to speak more accurately, did contain) an Aryan language older than any other descendant of the common mother tongue and a variety of name of natural objects less perfectly crystallised than elsewhere into fabulous personages, but it includes a whole world of Aryan institutions, Aryan customs, Aryan laws, Aryan ideas in a far earlier stage of growth and development than any which survive beyond its boundary."

Rai Bahadur Saratchandra Das, C. I. E., says :—

"It was the administration of Law to Hindus according to their customs and usages which made the judicial officers of the East India Company study Sanskrit. A few works on Hindu Law, *e. g.*, Manu,

a portion of the Mitakshara and some others were therefore translated into English. But there are many Hindu law books which are not translated into English and so their contents are not known to those who are not acquainted with Sanskrit. I suggest that the translations of Hindu law books should be undertaken under the supervision of the Hindu Judges of the High Courts in India. Properly qualified European Judges may also help in this work."

দুঃখের বিষয় হিন্দুস্মৃতি এত প্রয়োজনীয় ও ইহার এত উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও হিন্দু ব্যবহারজীবিগণ যে ইহার বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। অধিকাংশ ব্যবহারজীবিগণ হিন্দুস্মৃতি সম্বন্ধে মূল পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করেন না এবং সেই জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হিন্দু আইনের পুস্তক নাই বলিলেও হয়। এই জন্য হিন্দু স্মৃতি সম্বন্ধে আধুনিক বিচারালয় হইতে অতি অদ্ভুত মীমাংসা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে হিন্দুস্মৃতি সম্বন্ধে যে অধিক চর্চ্চা হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবং আশা করা যায় যে হিন্দুগণ আধুনিক বিচারালয় সমূদায়ের অদ্ভুত মীমাংসার হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে পরিত্রাণ পাইবে। আরও আশা করা যায় যে আইনের তুলনামূলক চর্চ্চা—যাহার সূচনা প্রথমে হিন্দুস্মৃতি হইতেই পাওয়া গিয়াছিল—অধিক পরিমাণে হইবে।

ইহার প্রথম খণ্ডে যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির প্রসিদ্ধ টীকা মিতাক্ষরার প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়ের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই কার্য্যালয় হইতেই রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় কর্ত্তৃক Daily Practice of the Hindus নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। আনন্দ কুমার স্বামী এই পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন। "This unpretentious little volume is one of quite remarkable interest and importance, for the first time it is made easy for the outsider to understand from an actual acquaintance with the daily ritual of a devout Hindu of the old School, the meaning, the method and the depth of Hindu spiritual culture ; we should recommend this little book to all interested in mental culture or who wish to know more of Hinduism as it really is (Ceylon National Review).

অর্থাৎ "এই আড়ম্বরহীন ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অতি বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় ও উপকারী। এই পুস্তকের দ্বারাই সর্ব্ব প্রথমে হিন্দু সমাজের বহির্ভূত ব্যক্তিগণ প্রাচীন শ্রেণীর নিষ্ঠাবান হিন্দুর দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ হইতে হিন্দুদিগের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের গভীরতা, প্রণালী ও উদ্দেশ্য সহজে বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা হিন্দুদিগের মানসিক উৎকর্ষ জানিবার জন্য আগ্রহবান এবং যাহারা যথার্থ হিন্দুধর্ম্মকে আরোও ভালরূপে জানিবার জন্য উৎসুক তাঁহাদিগকে এই পুস্তকখানি পড়িতে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করি।"

পাণিনি-কার্য্যালয়ের অন্যান্য ছোট পুস্তকের মধ্যে শিবসংহিতা এবং দত্তাত্রেয়কৃত তত্ত্বত্রয়ের ইংরাজী অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগে যিনি বেদান্তধর্ম্ম প্রচারের

প্রথম উদ্যোগী সেই রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সমুদায় পুস্তকগুলি ইঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা Private Journal of the Marquis of Hastings, Max Muller's History of Sanskrit Literature, Idylls from the Sanskrit প্রভৃতি গ্রন্থের পুনর্মুদ্রনও করিয়াছেন। সেখচিল্লি (ওরফে রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু) কৃত Folk-tales of Hindustan নামক গ্রন্থের প্রকাশকও ইঁহারা। এই পুস্তকের গল্পগুলিকে 'রিভিউ অব রিভিউ' নামক প্রসিদ্ধ পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক উইলিয়ম্ ষ্টেড আরব্যোপন্যাসের গল্পগুলির সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিলাতের প্রসিদ্ধ Folk Lore পত্রিকা এই পুস্তককে Swiftএর পুস্তকের সহিত সমান বলিয়াছেন। এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা, হিন্দি, মারহাঠী প্রভৃতি অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

আর একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধটি শেষ করিব—Indian Medicinal Plants (ভারতীয় ভৈসজিক বৃক্ষাবলী) নামক পুস্তকখানির পরিচয় গৃহস্থের পাঠকগণ পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাইয়াছেন। এই বৃহৎ পুস্তকে যে সকল ভারতীয় বৃক্ষরাজি—যাহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়—তাহাদের চিত্র, প্রায় সমুদায় ভারতীয় ভাষায় তাহাদের নাম, তাহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় যাহা পূর্ব্বে কখন কোন পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই, থাকিবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত উদ্ভিদগুলির ব্যবহারের প্রথম বাধা যে গাছগাছড়াগুলির স্বরূপ নিরূপণ করা কঠিন। এই পুস্তকে প্রায় ১৩০০ শত বৃক্ষলতা প্রভৃতির ছবি থাকিবে, ছবিগুলি ছাপা হইয়া গিয়াছে। ছবিগুলির ছাপা এবং চিত্রণ-কার্য্য একজন সুদক্ষ জর্ম্মাণ শিল্পীর তত্ত্বাবধানে প্রয়াগস্থ 'ইণ্ডিয়ান প্রেসে' হইয়াছে। এই পুস্তকের মুদ্রণের ব্যয়ভার স্বরূপ বঙ্গের বিক্রমাদিত্য দানবীর বিদ্যোৎসাহী মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় ১০,০০০ টাকা দিয়াছেন। এই পুস্তকের লেখক ও সম্পাদক কর্ণেল কির্ত্তিকর, মেজর বামনদাস বসু, জনৈক সিভিলিয়ন (অবসরপ্রাপ্ত) এবং জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধ্যাপক ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইঁহারা সকলেই বৈজ্ঞানিক জগতে বিশেষ পরিচিত। এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে বহুদিনের একটি অভাব ঘুচিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত Humanity and Hindu Literature নামক ক্ষুদ্র পত্রিকা এই কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার দ্বারা পাশ্চাত্য জগতে হিন্দুসাহিত্যের প্রতি সমাদর আকৃষ্ট করা হয়।

এই কার্য্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা এই কার্য্যালয়টিকে ব্যবসা-হিসাবে স্থাপন করেন নাই এবং ব্যবসার দিক হইতে চালাইবার চেষ্টাও করেন না। ইহাতে প্রবর্ত্তকগণের প্রায় ৬০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। স্বার্থত্যাগের ইহা এক জলন্ত দৃষ্টান্ত।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ,
অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর।

—

আদার চাষ *

(আদা—L. Gingiber officinale. E. Ginger. N. O. Zingiberaceae or Scitamineæ.)

ইহা আদা, হলুদ বা কদলী (কলা) পরিবার-ভুক্ত মূলজ উদ্ভিদ। এই সর্ব্বজনপরিচিত এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন উদ্ভিদের বিস্তৃত পরিচয় দিবার প্রয়োজন অতি অল্প। তথাপি ইহার সামান্য পরিচয় এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই আদা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মিশর দেশেও প্রাচীন কালে বহুল পরিমাণে ইহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। জর্ম্মাণী ও স্পেনেও ইহা অতিশয় আদৃত হইত। পর্টুগালে আদা দ্বারা উৎকৃষ্ট সুরা প্রস্তুত হয়। পোর্ট নামক মদিরাতেও আদার ভাগ আছে। পর্টুগালে ব্যঞ্জনেও আদার ব্যবহার হইয়া থাকে। পলিনেশিয়াতে ইহা অতিশয় পবিত্র পদার্থ বলিয়া গণ্য হয়। তথাকার লোকের বিশ্বাস আদাতেই পবিত্রাত্মা বাস করেন। ফ্রান্সেও খাদ্য-দ্রব্যে বহুল পরিমাণে আদার ব্যবহার হইয়া থাকে। আদা হইতে একরূপ তরল পদার্থ প্রস্তুত হয়। উহার নাম আর্দ্রক-সুধা (gingerade). চাটনী, আচার ও মোরব্বা ইত্যাদিতেও আদার ব্যবহার হয়।

ইহার জন্মস্থান এসিয়া-খণ্ড। অধুনা উষ্ণকোটীমণ্ডলস্থিত দেশমাত্রেই ইহার আবাদ হইতেছে। ইহার গুণ, ব্যবহার ও চাষ-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নামের পরিচয় দিতেছি। ইহা সাধারণতঃ আদা, আর্দ্রক ও শুঁঠ নামে পরিচিত। শুঁঠ আদার ঠিক নাম নহে। শুষ্ক আদাকেই শুঁঠ বলা যায়। ইহার সংস্কৃত নাম আর্দ্রক, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও আদ্রিকা।

"আর্দ্রকং শৃঙ্গবের স্যাৎ
কটুভদ্রং তথার্দ্রিকা।"

ইহার বিশ্বভেষজ প্রভৃতি আরও কয়েকটী নাম আছে। দেশভেদে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত—তৈলঙ্গে অল্লং; হিন্দুস্থানে আদ্রক্, আরবে জিঞ্জিবিলভা; মহারাষ্ট্রে আলে; কর্ণাটে অর্দ্রকা; গুজরাটে আদু ও সিংহলে ইন্‌গুরু বা ইঞ্জি; ইংরেজী ভাষায় ইহাকে জিঞ্জার, ইটালী ভাষায় জেঞ্জিয়ারো, নেপাল দেশের ভাষায় জেঞ্জিবর, ফ্রেন্স ভাষায় জিঞ্জেম্বি, লেটিন্ ভাষায় জিঞ্জিবার, গ্রিক্ ভাষায় জোঞ্জবেপস্ ও পারস্য ভাষায় জেঞ্জিবিল্ কহে।

আদা প্রণত বা শায়িতকন্দ (Rhizomous) বিশিষ্ট মূলজ উদ্ভিদ। ইহার নিবাট কন্দই আদা ও শুষ্ক কন্দই শুঁঠ। শুষ্ক আদা শুঁঠ, সেঁঠে, সুঠ, শুণ্ঠী, শুণ্ঠ ও শোঁঠী নামে পরিচিত।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এবং অধুনা আমেরিকার কোন কোন স্থানেও আদার চাষ হইয়া থাকে। মানবজাতির নিকট আদার ন্যায় ব্যবহার্য্য উদ্ভিদ অতি অল্পই আছে। বঙ্গদেশে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও বেহারে প্রচুর পরিমাণে আদার চাষ হইয়া থাকে।

* লেখকের উদ্ভিদের বিশ্বকোষ নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য হইতে উদ্ধৃত

অধুনা এই দেশ হইতে ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে আদা রপ্তানি হইয়া থাকে। পুনরায় উহা ঔষধ ও অন্যান্য আকারে এদেশেই প্রত্যাগমন করে। আদার ন্যায় উপকারী উদ্ভিদ কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়।

ইহা পাচক, ভেদক, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-কারক, কটু, মধুর, রুক্ষ, কফ ও বাতনাশক। নিয়মিত রূপে ইহা ব্যবহার করিলে মন্দাগ্নি-রোগ কখনই হইতে পারে না। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশের অধিকাংশ লোক প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইবার পরেই লবণ-সংযোগে আদা খাইত। তাহারা অধিকাংশ সময়েই নীরোগ, সবলকায় ও দীর্ঘজীবী হইত। এখনও কোন কোন পল্লীগ্রামে এই রীতি প্রচলিত আছে। আহারের পূর্ব্বে সৈন্ধব লবণ সংযোগে আদা ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার আছে। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি করিয়া আহারে রুচি জন্মায়। ব্যঞ্জনে, পোলাউ (পল্লান্ন) ও নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যেও আদার ব্যবহার হয়।

আদা দ্বারা চাটনী, আচার ও মোরব্বা প্রভৃতিও প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন নানাবিধ মিঠাই প্রস্তুত করিতেও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। অধুনা বিদেশেও বহুল পরিমাণে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। চীনদেশে আদার চাটনী ও আচার অধিক পরিমাণে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা একপ্রকার সুরা (wine) প্রস্তুত হইয়া থাকে। আদার ব্যবহারে বিশেষ উপকার না থাকিলে কেহ ইহা ব্যবহার করিত না। আদা অশেষগুণ-সম্পন্ন। আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা ভূরি ভূরি রোগের মহৌষধ।

ইহা অর্শ, অতিসার, মূত্রনালী হইতে রক্ত-স্রাব, শোথ, উদররোগ, আমাশয়, সান্নিপাত-জ্বর, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, উরুস্তম্ভ, হৃদ্রোগ, শিরোরোগ, কাশ, বিষম জ্বর, বমন, বিসূচিকা, অজীর্ণ, গুল্ম ও হিক্কা প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

আধুনিক অর্থাৎ ডাক্তারী মতে ইহার রূপ নিম্নলিখিত মত নির্দ্দিষ্ট হয় :—

ইহার মূল ৩.৭ ইঞ্চি দীর্ঘ; ঈষৎ পীতবর্ণ, সদগন্ধযুক্ত ও ঝাল। ইহাতে শুণ্ঠীর গন্ধযুক্ত পীতবর্ণ বায়বীয় তৈল (volaltile oil), ধূনা ও শ্বেতসার আছে। ইহা বহুবর্ষজীবী, নিবাট কন্দযুক্ত উদ্ভিদ। ইহা বিপর্য্যস্ত-পত্রক। ইহার শিরা সকল সমান্তরাল, এবং পত্র সকল কাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া থাকে। পুষ্প হরিদ্রাভ পীতবর্ণ, ভায়োলেট বর্ণের রেখা বিশিষ্ট।

ইহা আগ্নেয়, উত্তেজক ও বায়ুনাশক। অধিক মাত্রায় পাকাশয়ের উগ্রতা জন্মায়। চর্ব্বণ করিলে লালা নিঃসারণ হয়। বাহ্য প্রয়োগে চর্ম্মের উগ্রতা সাধন করে। ইহা স্নায়ুরোগ, উদরাধ্মান, শূল, শিরোরোগ, দন্তশূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। ইহার শুঠ নানা রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশজাত আদা অধিকাংশ সময়ে শুঠ রূপে ব্যবহৃত হয় না। বেহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আদাই শুঠ রূপে অধিকাংশ সময়ে ব্যবহৃত হয়। ইহা সাধারণতঃ পাটনাই শুঠ নামে পরিচিত। পাটনাতে যে আদা জন্মে উহা গুণে উৎকৃষ্ট ও আকারে বঙ্গদেশীয় অপেক্ষা বৃহৎ। পরিপক্ক আর্দ্রককন্দ সংগ্রহ করিয়া উহা জলে ধৌত করিয়া পরে ঝুড়িতে রাখিয়া ঝাঁকিলেই উহার ছাল আংশিক উঠিয়া যায়, পরে উহা মৃদু সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করিলেই উহার শুঠ প্রস্তুত হয়। ত্বকহীন শুঠই গুণে উৎকৃষ্ট ও

দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। পশ্চিম দেশে ইহা ভুগুরী শুঁঠ নামে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যেও আদার চাষ হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের আদার মধ্যে কলিকট্ (Calicut) ও কোচিনের আদাই উৎকৃষ্ট। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যত্রও ইহার চাষ হইয়া থাকে। মালবার ও কানাড়া প্রদেশেও ইহার চাষ হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে রংপুর জেলায়ই আদার চাষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। রংপুরেই বহুল পরিমাণে আদার চাষ হইয়া থাকে, বঙ্গের অন্যত্রও অল্প বা অধিক পরিমাণে ইহার চাষ হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় আদার মধ্যে রংপুরের আদাই গুণে উৎকৃষ্ট।

আদা প্রণত বা শায়িত কন্দ (Rhizomous) জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার কন্দমূলই ইহার প্রকৃত কাণ্ড (stem)। ইহা হইতেই ডালপালা বহির্গত হইয়া থাকে। ইহারা দেখিতে কাণ্ড সদৃশ হইলেও আসল কাণ্ড নহে। মূল রোপণের পরে মূলের গাত্রস্থ চক্ষু হইতেই এই সকল ডালপালা বহির্গত হয়। মূল পরিপক্ক হইলেই এই সকল ডালপালা মরিয়া যায়। সুতরাং ইহারা প্রকৃত কাণ্ড নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। ইহার মূলই কাণ্ড। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহার পার্শ্বদেশ হইতে নূতন কাণ্ড বা কন্দমূলের উৎপত্তি হয়। ইহার বীজ হয় না। মূল হইতেই ইহার বংশ বৃদ্ধি হয়। ইহার ফুল হয়, কিন্তু পুষ্প পরাগ প্রাকৃতিক উপায়ে উর্ব্বরতা (fertilisation) প্রাপ্ত না হওয়ায় ইহার বীজ হয় না। ইহার মূলই ব্যবহারযোগ্য। সুতরাং যে উপায়ে মূলের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, কৃষকের সেই দিকেই বিশেষ দৃষ্টি থাকার প্রয়োজন।

আদার চাষে কিরূপ ভূমি ও জলবায়ুর প্রয়োজন

আদার চাষে সমোষ্ণ (equable) ও আর্দ্রজলবায়ুবিশিষ্ট স্থানই বিশেষ উপযোগী। সুতরাং উষ্ণকোটী-মণ্ডল (Tropics) স্থিত অধিকাংশ স্থানই ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী। এই স্থানের জলবায়ু সমোষ্ণ ও আর্দ্র (humid), এই জন্যই পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী। স্থূলতঃ বিষুবরেখার (equator) উভয় পার্শ্বস্থ কর্কট ও মকর ক্রান্তির মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহই ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী।

এই স্থানে উষ্ণতার ও আদ্র তার পরিমাণ সমানহেতু এই স্থানের ভূমি আদার চাষের পক্ষে উপযোগী। আংশিক ছায়াযুক্ত স্থান, উৎকৃষ্টরূপে কর্ষিত বোদ (humous) ও দোআঁশ মৃত্তিকাই আদার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ছাই-মিশ্রিত ভূমিতেও আদার চাষ হয়। উননের ছাই যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়, ঐ স্থানের মৃত্তিকার সহিত ছাই ভালরূপে মিশিয়া গেলে উহাতেও আদার চাষ হইয়া থাকে। সমুদ্রোপকূল হইতে তিন চারি হাজার ফুট উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশেও আদার চাষ হয়।

যে ভূমিতে আদার চাষ করিতে হইবে উহা সমোষ্ণ হওয়া প্রয়োজন। ২।৩ বৎসরের পতিত ভূমি ইহার চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট। পলিভূমি অর্থাৎ বর্ষাবিধৌত চড়া-ভূমি ইহার চাষের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু ঐরূপ ভূমিতে বর্ষার জল দাঁড়াইলে উহাতে আদার চাষ হইতে পারে না। দীর্ঘকাল জল স্থায়ী হইলে আদার মূল সকল পচিয়া যায়। সরস ভূমি আদার চাষের পক্ষে উপযোগী হইলেও অধিক রসযুক্ত স্থান ইহার পরম শত্রু। মেঘের জল আদার চাষের পক্ষে বিশেষ

উপকারী। মেঘের জলে আদার মূল সত্বরই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অন্য প্রকার জল ইহার পক্ষে তত উপকারী নহে।

মিঃ উড্ বলেন সসার-ভূমি আদার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মিঃ ফার্ম্মিঞ্জারও এই মতের পক্ষপাতী। কিন্তু কোন্ সার ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী সে বিষয়ে উভয়েই নীরব। আমার মতে অধিক সারযুক্ত ভূমি ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী নহে। কেননা সার দ্বারা অধিকাংশ সময়েই পাতার, ফুলের ও ফলের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। কন্দ ও প্রণত কন্দ জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে অধিক সার ব্যবহার বিধেয় নহে। পতিত ভূমিতে স্বভাবতঃ উদ্ভিদাদির মূল ও পাতা পচিয়া যে সার উৎপন্ন হয়, উহাই উহার আবাদের পক্ষে যথেষ্ট। পলি ভূমিতে বর্ষার সঞ্চিত যে স্বাভাবিক সার উৎপন্ন হয়, আদার চাষের পক্ষে উহাই যথেষ্ট। ঐরূপ ভূমির অভাবে অন্যত্র পাতার বা গোবিষ্ঠার সার সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়। সময় সময় নূতন মৃত্তিকার সহিত ঐ সার মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করাই সঙ্গত। নিম্ন ভূমি যাহাতে বর্ষার জল দাঁড়ায় বা যাহা সর্ব্বদা সেঁতসেঁতে উহা আদার চাষের পক্ষে উপযোগী নহে। উচ্চ ভূমিই আদার চাষের পক্ষে উপযোগী। যে ভূমিতে আদার চাষ করিবে, উহা হইতে জল নির্গমনপথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে। এদেশে কলা বাগানে ও তদ্রূপ ছায়াযুক্ত স্থানে আদার চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ চাষের মুখ্য উদ্দেশ্য আদার চাষ নহে কলার চাষ। উপফসল রূপে উহাতে আদার চাষ করা গৌণ উদ্দেশ্য। বারুইর বরজের ফাঁক স্থানেও উপফসলরূপে আদার চাষ হইয়া থাকে। বরজজাত আদাও উৎকৃষ্ট।

ভূকর্ষণ ও ভূমি প্রস্তুত করিবার প্রণালী

যে ভূমিতে আদার চাষ করিতে হইবে, মাঘ ফাল্গুন মাসে উহা কোদালী দ্বারা একবার কোপাইয়া দিবে। তৎপর লাঙ্গল দ্বারা উহা পুনঃ পুনঃ চাষ ও মই দিয়া ভূমি সমতল করিবে। ভূমিতে ঘাস, জঙ্গল, খোলা, খাপরা ইত্যাদি থাকিলে তখনই উহা বাছিয়া ফেলিয়া ভূমি পরিষ্কার করিবে। উহা মৃত্তিকাতে থাকিলে মূল বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত হইবে। মৃত্তিকার ঢিলা (clods of earth) মুগুর দ্বারা ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকাকে ধূলিবৎ চূর্ণীকৃত করিবে। মূলার চাষে যে ভাবে মৃত্তিকা প্রস্তুত করিতে হয়, আদার চাষেও তাহাই করিবে। বৃষ্টিপাত দ্বারা মৃত্তিকা অধিকাংশ সময়ে কঠিন হইয়া যায়। আদার চাষে অন্যান্য মূলজ উদ্ভিদের চাষের ন্যায়, মৃত্তিকা কোমল থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে উহার মূল পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতে পারে। কঠিন মৃত্তিকায় আদার চাষ করিলে উহার গঠনও সুন্দর হয় না এবং উহা ইচ্ছানুরূপ বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। অতএব আদার চাষের মৃত্তিকা কোমল রাখার জন্য উহাতে সামান্য পরিমাণ গোবিষ্ঠার ভস্ম বা উননের ছাই মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়।

যে ভূমি আদার চাষের উপযোগী নহে, উহাতেও আদার চাষ হইতে পারে। উহাতে ক্ষেত্রময় একহাত পাশ ও একহাত খাই নালী করিয়া উহার দোআঁশ দিক পলিমাটী দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলে উহাতেও আদার চাষ হইতে পারে। ইহা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এইরূপ চাষে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা নাই।

রোপণ-প্রণালী ও রোপণের সময়

যে ক্ষেত্রে আদা রোপণ করিতে হইবে উহাতে ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যের বা প্রস্থের লম্বালম্বি ভাবে লাইন করিবে। দুই ফুট অন্তর অন্তর এই সকল লাইন (সারি) করিতে হইবে। লম্বা রশি দ্বারাই লাইন করার কার্য্য সাধিত হয়। এই কার্য্যের জন্য একরূপ রশি বাজারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার দুই প্রান্তে লৌহ খুঁটী সংলগ্ন থাকে। ইহাকে রিল ও লাইন (garden reel and line) কহে। ক্ষেত্রে লম্বালম্বিভাবে রশি ধরিয়া কোদাল দ্বারা নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত সারি (লাইন) গুলি দাগাইতে (চিহ্নিত করিতে) হইবে। তৎপর এই সকল লাইনের মৃত্তিকা

সারি

ঐ

ঐ

কোদালি বা খুরপী দ্বারা আলগা করিয়া ২।৩ ইঞ্চি মৃত্তিকার নীচে আদার মূল রোপণ করিবে। মূলগুলি ঘনভাবে রোপণ করিতে হইবে না। তাহা হইলে আদা গাছের পাতা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া গাছের গোড়ায় উত্তাপ, আলো ও বায়ু প্রবেশের পথ রোধ করিবে। উত্তাপ, আলো ও বায়ুর অভাবে গাছগুলি দুর্ব্বল হইবে। সুতরাং ইহার চাষে আশানুরূপ ফল পাইবে না। সেই জন্য মূলগুলি অন্ততঃ ১৫ ইঞ্চি দূরে দূরে রোপণ করিবে। রোপণের সময় চক্ষুগুলি উপরের দিকে রাখিয়া রোপণ করিবে। কোন কোন স্থলে আদার মূল রোপণের পরে উহাদিগকে কলার বা অন্য গাছের পাতা, খড় বা সর্ষপের খোসা (husk) দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—কোমল অঙ্কুরকে প্রখর সূর্য্যকিরণ হইতে রক্ষা করাই ইহার উদ্দেশ্য। এইরূপে রক্ষিত অঙ্কুর অতি তেজের সহিত বহির্গত হয়। রোপণের পরে ১৫।২০ দিন মধ্যেই গাছ জন্মিয়া থাকে। গাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলে মাঝে মাঝে দুই লাইনের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে মৃত্তিকা লইয়া উহার গোড়ায় বেদী বাঁধিয়া দিবে। এইরূপে বেদী বাঁধার নাম কেয়ারী প্রস্তুত (earthing up) করা। বেদী দ্বারা গাছগুলির মাথা যাহাতে ঢাকিয়া না যায় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। মাথা ঢাকা গেলে উত্তাপ আলো ও বায়ুর অভাবে কোমল গাছগুলি মরিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। রোপণ কালে বৃষ্টির অভাব হইলে সময় সময় ইহাদের গোড়ায় অধিক পরিমাণে জল দিবে। বর্ষাকালে জল দেওয়া আবশ্যক হয় না। গাছগুলি লাগিয়া গেলে সময় সময় ইহার গোড়ায় মৃত্তিকা দেওয়া ও জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার আর অন্য পাইট নাই। আর পাতাগুলি সর্ব্বদা পরিষ্কার করিবে। সময় সময় গাছের গোড়ার মৃত্তিকা কোপাইয়া দিবে। বৈশাখ মাসই আদা রোপণের পক্ষে উৎকৃষ্ট সময়। জ্যৈষ্ঠ মাসেও ইহা রোপণ করা যায়। পার্ব্বত্য ও নিম্ন প্রদেশে একই সময়ে আদার মূল রোপণ করিতে হয়। আদাক্ষেত্রে জল দাঁড়াইলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা, আদার মূল কোমল, জল দাঁড়াইলে উহার মূল পচিয়া যায়। সেই জন্য আদা-ক্ষেত্র হইতে জল নিষ্কাষণ জন্য নালী রাখিতে হয়।

পারিবারিক ব্যবহারের জন্য এদেশে অনেকেই গৃহপ্রাঙ্গণে বা বাড়ীর পালানে * সামান্য পরিমাণে বারমাসই আদার মূল রোপণ করিয়া থাকে।

বীজ-নির্ব্বাচন

আদার মূলই ইহার বীজের কার্য্য করে। পূর্ব্ব বৎসরের সংগৃহীত ফসল হইতে সুস্থ ও সবল মূল বীজের জন্য বাছিয়া রাখিয়া অবশিষ্টাংশ বিক্রয় বা নিজ কার্য্যে ব্যবহার করিতে হয়। যদি বীজ খরিদ করিয়া রোপণ করিতে হয়, তবে ঐরূপ বীজই বাজারে খরিদ করিবে, নিকৃষ্ট বীজে উৎকৃষ্ট ফসল কখনই প্রদান করিবে না। সুতরাং বীজ-নির্ব্বাচন-সময়ে উপরোক্ত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ফসল সংগ্রহের পরে চোখ্ (eye) যুক্ত আদার মূলকে চক্ষুসহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে। পরে উহাই ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলগুলিকে না কাটিয়া চক্ষু সহ আস্ত মূলই রোপণ করিতে হয়। মূলগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবার পরেই রোপণ করিবে না। ঐরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া উহাদিগকে ২।১ দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তৎপরে ঘরের ভিতরে খড় বা বালি বিছাইয়া উহার উপরে খণ্ডীকৃত মূলগুলিকে গাদা (heap) করিয়া রাখিবে।

ঐ গাদা যেন এক ফুটের অধিক উচ্চ না হয়। অধিক উচ্চ হইলে কোন কোন খণ্ড চাপে পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কিয়ৎকাল এইরূপে ঘরে রাখিলে উহার ক্ষতস্থানগুলি শুষ্ক হইয়া সুস্থতা প্রাপ্ত হইবে। আদার ফসল মাঘ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয়। সুতরাং অবস্থানুসারে কখন কখন এক, দেড় কি দুইমাস কালও বীজ ঘরে রাখিবার আবশ্যক হইতে পারে, এই জন্যই ইহাদিগকে কিয়ৎকাল যত্নের সহিত ঘরে রক্ষা করিতে হয়। বীজের উপরেই ভাবী ফসলের আশা-ভরসা নির্ভর করে। আদার রিপু কদাচিৎ দেখা যায়। আদা অতিশয় উগ্রগন্ধ ও কটুস্বাদবিশিষ্ট বলিয়া কীটপতঙ্গাদি অধিকাংশ সময়েই উহাকে স্পর্শ করে না। শোলা পোকা জাতীয় কোন কোন কীট ইহার মূল কখন কখন খাইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর উহাদিগকে আদার ফসল নষ্ট করিতে দেখা যায় না।

ফসল-সংগ্রহ ও মজুত করার প্রণালী

আদার মূল পরিপক্ক হইলে উহা সংগ্রহ করিতে হইবে। যখন দেখিবে যে আদার গাছগুলি মরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে উহার মূল পরিপক্ক হইয়াছে। স্থান অবস্থা বিবেচনায় মাঘ মাস হইতে ফাল্গুন মাস মধ্যেই ফসল সংগ্রহ করিতে হয়। মূল রোপণের পরে দশ মাস মধ্যেই আদার মূল পরিপক্ক হয়। আদার মূলের চাপকে (সমগ্র মূলকে) কেহ কেহ হাতা বলিয়া থাকে। মূলগুলি চাপে চাপেই তোলা উচিত। এমন ভাবে তুলিবে যে উহা যেন কোনরূপে ভাঙ্গিয়া না যায় বা অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত না হয়। মূল সংগ্রহ করিবার অব্যবহিত পরেই অগ্রে পূর্ব্বোক্ত রূপে বীজমূল মজুত করিতে হইবে। তৎপর অবশিষ্ট মূল বিক্রয় বা ব্যবহারের জন্য রাখিবে। কেহ কেহ বলেন মূল উঠাইবার পরে উহার চক্ষু ছুরি দ্বারা ছুলিয়া ফেলিয়া তৎপর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মজুত করিতে হইবে। আমি এ মতের পক্ষপাতী নহি।

* গৃহ প্রাঙ্গণস্থ যে স্থান শাকসব্জী রোপণ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, উহাকে পালান কহে।

চক্ষু ছুলিয়া ফেলিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে অবস্থায় মূল সংগৃহীত হয় ঐ অবস্থায়ই উহা শুষ্ক করিয়া মজুত করা উচিত। মূলগুলিকে মাচার উপর মজুত করাই সঙ্গত। মৃত্তিকার উপরে রাখিলে মৃত্তিকার আর্দ্রতা দ্বারা উহা পচিয়া যাইতে বা অসময়ে অঙ্কুরিত হইতে পারে।

চাটনী, আচার ও মোরব্বা প্রভৃতি প্রস্তত করিতে হইলে অর্দ্ধপক্ক মূলই সংগ্রহ করিতে হইবে। অর্দ্ধপক্ক মূলই এই কার্য্যের উপযোগী।

সিংহলে রপ্তানির জন্য যে আদা মজুত করা হয় উহা দুইটি প্রণালীতে প্রস্তত। প্রথম প্রণালীতে মূলের বাকল চাঁছিয়া ফেলিয়া ও দ্বিতীয় প্রণালীতে উহার বাকল রাখিয়া শুষ্ক করা হয়। প্রথমোক্ত প্রণালীতে বাকল ফেলিয়া উহা জলে সিদ্ধ করা হয়। দ্বিতীয় প্রণালীতে বাকলযুক্ত মূলকে জলে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মজুত করা হয়। প্রথম প্রণালী অবলম্বনে যে মূল প্রস্তত হয় উহাকে ত্বকহীন (peeled or coated) মূল ও দ্বিতীয় প্রণালীতে যে মূল প্রস্তত হয় উহাকে ত্বকযুক্ত মূল (unpeeled or uncoated) কহে।

আদার চাষে কিরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা

আদার চাষে যে বিশেষ লাভ আছে, তাহা নিম্নলিখিত বচনটি দ্বারাই উপলব্ধি হইবে—

"যদি পুঁতলি আদার গুমো,
তবে নাকে তেল দিয়ে ঘুমো।"

অর্থাৎ যদি আদার গুমো (মূল) একবার মৃত্তিকাতে রোপণ করিতে পার, তাহা হইলে সমস্ত বৎসর নাকে তেল দিয়া ঘুমাইলেও তোমার অন্নকষ্ট হইবে না।

আজকাল এদেশ হইতে বিদেশে প্রচুর পরিমাণ আদা রপ্তানি হইয়া থাকে। ইংরাজী ১৯১১-১৯১২ সনে ভারতবর্ষ হইতে বিশ লক্ষ বিয়াল্লিস হাজার টাকার আদা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। সাধারণতঃ ছালা বা কাঠের পিপায় আদার মূল বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

প্রতি বিঘায় ২০০০ পাউণ্ড হইতে ২৫০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৫/ মণ হইতে ৩০/ আদা জন্মিয়া থাকে। কোন জমিতে ৪০/ পর্য্যন্তও জন্মিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট আদা প্রতিমণ ৫৲ হইতে ৭॥০ টাকা দরে বিক্রয় হয়। গড়ে প্রতি বিঘায় ২৫/ মণ উৎপন্ন ধরিলে ১২৫৲ টাকা হইতে ১৮৭॥০ টাকার আদা উৎপন্ন হয়। উহা হইতে চাষের ব্যয় নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

ব্যয়ের হিসাব

১।	ভূমির খাজনা ১/ বিঘা	২৲
২।	চাষের ব্যয়	১৭৲
৩।	বীজ আদা ৬/ মণ প্রতিমণ ৭॥০ টাকা দরে	৪৫৲
৪।	ফসল-সংগ্রহের ব্যয়	৩৲
৫।	উহা শুষ্ক ও মজুত করার ব্যয়	৩৲
		৭০৲

হিসাব মত ৭০৲ টাকা বাদ দিলে প্রতি বিঘায় নিট লাভ ৫৫৲ টাকা হইতে ১১৭॥০ টাকা হইতে পারে। লণ্ডনে এক হণ্ড্রেট-ওয়েইট্ অর্থাৎ ১।৪ (একমণ চৌদ্দ সের) আদার মূল্য ৩০৲ হইতে ৫০৲ টাকা হইয়া থাকে। সুতরাং বিদেশে ইহার রপ্তানীর বন্দোবস্ত করিতে পারিলে প্রভূত লাভের সম্ভাবনা। অধুনা জ্যামেকা দ্বীপে বহুল পরিমাণে আদার চাষ হইতেছে।

জ্যামেকার আদা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। জ্যামেকার ন্যায় ক্ষুদ্র দ্বীপ হইতে প্রতি বৎসর ২।৩ লক্ষ টাকার আদা বিদেশে রপ্তানি হয়। এরূপ লাভজনক কার্য্যের দিকে এদেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এরূপ লাভজনক কার্য্য থাকিতেও ভারতবাসী পরের গোলামী করিতে কিছুই লজ্জা বোধ করে না, ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়! যাহার ২০/ বিঘা জমি আছে সে অনায়াসে তদুৎপন্ন ফসল দ্বারা ঘরে বসিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে সক্ষম। যদি এ কার্য্যও ভারতবাসীর ভাল না লাগে তবে তাহাদের চিরদুঃখ অবশ্যম্ভাবী।

এদেশে আরও ২।৩ জাতীয় আদা দৃষ্টিগোচর হয়। উহাদের চাষ-প্রণালীও উপরোক্ত জাতির ন্যায়। উহারা কোন বিশেষ কার্য্য সাধন করে না। তথাপি উহাদের নাম উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণ আদা—Gingiber Nigra—Black Ginger—ইহার গাছ ও মূল আদার ন্যায়। পাতা ও কাণ্ড ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। মূলের অভ্যন্তরও কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ। ইহার চাষ-প্রণালীও আদার ন্যায়। এদেশে কেহ ইহার চাষ করে না। কেননা ইহার ব্যবহার নাই। এদেশের বন-জঙ্গলে ইহা স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে। ইহা কখন কখন ঔষধে ব্যবহৃত হয়। আমি গো-চিকিৎসায় দেশীয় অবধৌতিক কবিরাজদিগকে ইহা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। ইহার ফলন অত্যধিক। অন্য একরূপ কৃষ্ণ আদা আছে, উহার গাছ দেখিতে হলুদ গাছের ন্যায়। কিন্তু মূল আদার ন্যায়। মূল ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। প্রকৃত পক্ষে ইহাকে কৃষ্ণ আদা না বলিয়া কৃষ্ণ হলুদ বলাই সঙ্গত। ইহাও কোন কোন সময় ঔষধে ব্যবহৃত হয়। মূল-বিভাগ দ্বারা ইহার গাছ উৎপন্ন হয়।

আমাদা—Mango-scented Ginger—ইহার দেশীয় নাম আমাদা; হিন্দী নাম অম্বিয়া হলদা; গুজরাটী নাম আম্বা হলদর্; কর্ণাটী নাম ভলী আরসিন্; তৈলঙ্গী নাম কাটপাসুপু ও মারহাট্টি নাম আম্বে হল্লদ্। ইহার সংস্কৃত নাম আম্রগন্ধিহরিদ্রা। ইহার গাছ ও মূল হলুদের ন্যায়। পাতাও হরিদ্রার ন্যায়। ইহার গন্ধ কাঁচা আমের গন্ধের ন্যায়। মূলের মধ্যের বর্ণ ঈষৎ হলুদে। কেহ কেহ ইহাকে আমহলুদ নামেও অভিহিত করেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা হলুদজাতীয় গাছ। অম্বলে ও মিঠাই সুগন্ধ করার জন্য ইহার মূল ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ দাল ডালনাতেও ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার মূল দ্বারা প্রস্তুত সন্দেশের নাম আম-সন্দেশ। ইহার চাষ-প্রণালী হলুদের ন্যায়।

ইহা তিক্তাম্ল কষায় রস, রুচিপ্রদ, লঘু, অগ্নিদীপক, উষ্ণবীর্য্য ও সারক। ইহা কফ, উগ্র ব্রণ, কাস, শ্বাস, হিক্কা, জ্বর, মুখরোগ, রক্তদোষ, বাত ও শূলরোগনাশক। মূল-বিভাগ দ্বারা ইহার গাছ উৎপন্ন হয়।

রাঙ্গাপত্র আদা—Zingiber Variegata—Variegated Ginger—ইহার পাতা আদার ন্যায়। পাতা আদা অপেক্ষা বড় ও আদার পাতা অপেক্ষা বিস্তার-বিশিষ্ট। পাতা শ্বেতাভ স্বর্ণ বর্ণে চিত্রিত। সখের জন্য ইহার চাষ হয়। ইহা টবে চাষের উপযোগী। গাছ দেখিতে বড়ই সুন্দর। ঘরে, ঘরের বারান্দায় ও রোয়াকে ইহা রমণীয় শোভা ধারণ করে। মূল বিভাগ দ্বারা ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে ইহার ব্যবহার আমি অবগত নহি। আমার বাগানে ইহা জঙ্গল গাছের ন্যায় জন্মিতেছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

প্রাচীন কথা

('উপাসনা' হইতে উদ্ধৃত)

বাঙ্গালীর বীরত্বগাথা এক্ষণে উপকথায় পরিণত হইয়াছে। ইংরাজের বঙ্গাধিকারের পর লর্ড মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র অত্যন্ত নিকৃষ্ট বর্ণে চিত্রিত করেন। তদবধি বাঙ্গালীরা শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন মনুষ্যপদবাচ্য বীরজাতির নিকট ঘৃণার্হ হইয়াছেন। হতভাগ্য আমরা সেই কলঙ্কমোচনের কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া অধিকন্তু মেকলে বর্ণিত অপবাদের পোষকতা-মূলক ভীরুতার পরিচয়ই অনেক সময়ে প্রদান করিয়া থাকি।

কেবল মেকলের কথাই বা বলি কেন? লর্ড মেকলে হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড কর্জ্জন পর্য্যন্ত আমাদিগের গ্লানি করিতে ত্রুটি করেন নাই। বাঙ্গালীর ভীরুতা এক্ষণে যেন প্রবাদস্বরূপ যথা তথা প্রচারিত হইয়াছে। আমাদিগের দুর্ব্বলতার ও ভীরুতার কথা অবগত হইয়া দূরাগত কাবুলীরাও বঙ্গের নগরে, গ্রামে এবং পল্লীতে পল্লীতে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিতেছে। এ কলঙ্ক বুঝি আর ঘুচিবার নহে।

বস্তুতঃই আমরা দুর্ব্বল, ভীরু ও কাপুরুষ হইয়াছি। আমাদের শরীরে শোণিত নাই, বাহুতে বল নাই, হৃদয়ে তেজ নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ-পীড়িত দারিদ্র্যদুঃখক্লিষ্ট, ত্রিতাপে সন্তাপিত আমরা—জগতের মধ্যে যেন ঘৃণ্যজীবের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। যাহারা পদভরে দাঁড়াইতে পারে না, পরের সাহায্য না পাইলে আত্মরক্ষা করিতে চাহে না, তাহাদিগের জীবনে ধিক্। শক্তিধর, মহানুভব ইংরাজরাজ যদি আমাদিগের রাজা না হইতেন, তাহা হইলে আমাদিগের বোধ হয় দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। ঐ যে কাবুলী দেশদেশান্তর অতিক্রম করিয়া দলে দলে বঙ্গে আসিতেছে কেন তাহা জান? ভারতের এত দেশ থাকিতে উহাদিগের লোলুপদৃষ্টি বঙ্গের উপর পতিত হইয়াছে কেন তাহা জান? মান্দ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, যুক্ত ও মধ্যপ্রদেশ এবং বিহার প্রভৃতি প্রদেশের কোন স্থানে না যাইয়া বাঙ্গালায় তেজারতি করিতে কেন আইসে, তাহা জান? আমরা ভীরু কাপুরুষ বলিয়া।

কিন্তু চিরকাল এমনই ছিল না। আবহমান কাল আমরা এবংবিধ কাপুরুষতার ভাব প্রদর্শন করি নাই। এমন দিন ছিল, যে দিন বিদেশীও বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে আমাদিগের বল, সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবত্তার প্রতি চাহিতে বাধ্য হইয়াছিল। হায়, সেদিন কোথায় গেল, কেন গেল?

বাঙ্গালী যে চিরদিন এমন ছিল না, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুসলমান-রাজত্বকালে,—দেশে যখনই অরাজকতা উপস্থিত হইত—তখনই যে বাঙ্গালী লড়াই করিয়াছে, কামানের গোলা বুক পাতিয়া ধরিয়াছে, তাহার বহুল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল মুসলমান-শাসনকালই বা বলি কেন, তাহার বহুপূর্ব্বেও বাঙ্গালী যুদ্ধ করিয়া প্রথিতনামা হইয়াছিল। ইহা আমাদিগের স্বকপোলকল্পিত কথা নহে, ইতিহাস-বর্ণিত অভ্রান্ত সত্য ঘটনা।

কেহ হয়ত এমন প্রশ্ন করিতে পারেন যে, বঙ্গ বলিতে বর্ত্তমানকালে যে বাঙ্গালাদেশ বুঝা যায়, তাহাই প্রকৃত কি ? হিন্দুশাস্ত্রে বঙ্গদেশের যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দেশবাসীকে বাঙ্গালী বলাই সম্ভবপর। সুতরাং সে বাঙ্গালীর সহিত এ বাঙ্গালীর অনেক পার্থক্য আছে। এ বাঙ্গালী যে বীরজাতি ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায় ?

এখন দেখা যাউক, শাস্ত্রে বঙ্গের সহিত কোন্ কোন্ দেশের উল্লেখ ছিল। শব্দকল্পদ্রুমে "বঙ্গম" শব্দের অর্থে লিখিত আছে "দেশবিশেষে পুংভূম্নি। ইতি মেদিনী। স তু প্রাচীদেশান্তর্গতদেশবিশেষঃ। যথা। অঙ্গবঙ্গামদ্গুরকা অন্তর্গিরিবহির্গিরাঃ। ইত্যুপক্রম্য। শাল্বা মাগধগোনর্দ্দাঃ প্রাচ্যাং জনপদাঃ স্মৃতাঃ। ইত্যন্তং মৎস্যপুরাণম্। মতান্তরং যথা। আগ্নেয্যামঙ্গবঙ্গোপবঙ্গত্রিপুরাকোষলাঃ। কলিঙ্গৌড়ান্ধ্র কিষ্কিন্ধ্যাবিদর্ভশবরাদয়ঃ। ইতি জ্যোতিস্তত্ত্বধৃতকূর্ম্মচক্রবচনম্। তস্য সীমা যথা। রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তর্গতং শিবে। বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ। ইতি শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে ৭ম পটলঃ।"

প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্, পরমপণ্ডিত, গ্রিয়ারসন সাহেব "ভারতবর্ষীয় ভাষা সমীক্ষণ" * নামক পুস্তকে বঙ্গভাষার আলোচনাকালে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন। "ইহা নিম্ন বঙ্গ বা ব-দ্বীপের ও তৎসংলগ্ন প্রদেশের ভাষা। সংস্কৃতে পূর্ব্ব ও মধ্য বঙ্গই বঙ্গ নামে প্রখ্যাত, কিন্তু অধুনা যতদূর বঙ্গভাষা কথিত হয়, সেই সমস্ত স্থানকেই বাঙ্গালা বলে। ইংরাজী "বেঙ্গল" হইতে "বেঙ্গলী" সৃষ্টি হইয়াছে। "বঙ্গলম্" শব্দ তাঞ্জোর হইতে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ একটি প্রশস্তিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই আরবিক ভাষার "বাঙ্গালার" উৎপত্তি। আরবিক হইতে পারস্য ভাষায় ইহা প্রবেশ লাভ করে। আইন-আকবরীতে আবুল ফজল লিখিয়াছেন 'নামি আস্লি বাংলা বঙ্গ' অর্থাৎ বাঙ্গালার আসল নাম বঙ্গ।"

সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে যখন 'বঙ্গম' শব্দ পাওয়া যাইতেছে, তখন বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল ? আবুল ফজলের মতে বঙ্গের চতুর্দ্দিক তখন "আল" বা উচ্চভূমি দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিল বলিয়া "বঙ্গাল" শব্দ উদ্ভূত হয়। বাঙ্গালা তাহারই অপভ্রংশ।

আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা কিন্তু আবুল ফজলের এই স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে বঙ্গ + আলয় হইতে বঙ্গালয় উৎপন্ন হয়। তাহার অপভ্রংশ বাঙ্গালা সম্বন্ধী বলিয়া বাঙ্গালী হইয়াছে।

এই ত গেল "বঙ্গের" কথা। তাহার পর গৌড়ের কথা ধরুন। শব্দকল্পদ্রুমে গৌড় অর্থে লিখিত আছে "স্বনামখ্যাতদেশঃ। তদ্দেশস্থে পুংভূম্নি। ইতি জটাধর॥ তদ্দেশসীমা যথা—বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে। গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥ ইতি শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে সপ্তমঃ পটলঃ। পঞ্চ গৌড়া যথা—সারস্বতাঃ কান্যকুব্জাঃ গৌড় মৈথিলকোৎকলাঃ। পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ, ইতি স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণের মতে সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল পঞ্চ গৌড় নামে

* Linguistic Survey of India, Vol. V, Part I, edited by G. A. Grierson, C. I. E.

আখ্যাত। কিন্তু ইতিহাসে পঞ্চ গৌড় ভিন্ন-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগরি এবং মিথিলা।

যাহা হউক, আমরা এ প্রবন্ধে পঞ্চ গৌড়ের মীমাংসা করিতে বসি নাই। পঞ্চ গৌড় যে ছিল, তাহা কেবল রাজতরঙ্গিণীতেই প্রকাশিত নহে, বিদ্যাপতিও এই পঞ্চগৌড়ের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কবিতার ভণিতায় তিনি লিখিয়াছেন—

"চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি
বিদ্যাপতি ভণে॥"

এখন দেখা যাউক, বিদ্যাপতি কত দিনের। তিনি যে বিসপীগ্রাম পাইয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাশ, উভয়ে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে তিনি বঙ্গে মুসলমান-আগমনের পরে যে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। গ্রীক ঐতিহাসিক টলোমী ও ষ্ট্রাবো তদীয় গ্রন্থে সেলুকাসের অভিযান-বর্ণনায় গৌড়ের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিয়াঙ্‌সাং গৌড় ভ্রমণ করিয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে জয়াপীড় কর্ত্তৃক পঞ্চগৌড়-জয়ের কথা লিখিত আছে।

হণ্টার সাহেব বলেন, "Gour is of primeval antiquity, as is shown by the existence and traditional dignity of the Gouriya Brahmans; but it is probable that the name was more stricly applicable to the kingdom than to the city." *

ব্যালফরের 'সাইক্লোপডিয়া অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে † লিখিত আছে, গৌড়ের নামোল্লেখ মহাভারতে এবং নবম শতাব্দীর ঐতিহাসিক গ্রন্থনিচয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গৌড়সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক হুইলার বলেন, ‡ প্রয়াগ হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড গৌড়রাজ্যভুক্ত ছিল।

প্রাচীন শাস্ত্রাদি ও তদপেক্ষা আধুনিক ইতিহাস-পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, গৌড়বাসীরা ইতিহাসবিশ্রুত বলবীর্য্যসম্পন্ন সভ্যজাতি ছিলেন। নতুবা গৌড়দেশের নাম শাস্ত্রাদিতে ও ইতিহাসাদিতে স্থান পাইত না।

বাঙ্গালীর বীরত্বের কথা পাশ্চাত্যজগতে ১৫৫২।৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচারিত হয়। পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে বারোস সাহেবের যে পুস্তক § প্রকাশিত হয়, তাহাতে লেখা আছে,

"In the defence of the bridge died three of the king's captains and Tuam Bandam, to whose charge it was committed, a Bengali (Bengala) by nation and a man sagacious and crafty in stratagem."

ইহার মর্ম্মার্থ, "সেতুরক্ষার্থ রাজার তিনজন সেনানী এবং তুয়ামবন্দম নামক জনৈক কৌশলী ও চতুর বাঙ্গালী (ইঁহারই হস্তে সেতুরক্ষার প্রধান ভার অর্পিত হইয়াছিল) মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

পর্ত্তুগীজলেখক বাঙ্গালীর নামোচ্চারণ করিতে গিয়া একটা অদ্ভুত নামের সৃষ্টি

* Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. VII.
† Cyclopædia of India by Balfour, Vol. I, Page 1183.
‡ Wheeler's History of India, Vol. IV, Part I, P. 45.
§ Barros, Vol. VI, III.

করিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই। তুয়াম্ শব্দের অর্থ বোধগম্য হইল না। বন্দ্যম শব্দ হইতে অনুমান করা যায় তিনি সম্ভবতঃ "বন্দীঘাটীয়" ব্রাহ্মণ ছিলেন।

তাহার পর কহ্লন-কৃত রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গে ললিতাদিত্যের ও জয়াপীড়ের রাজত্বকালে গৌড়জয়ের কথা লিখিত আছে। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্ত রাজতরঙ্গিণী হইতে শ্লোকগুলি এবং তৎসমুদায়ের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"তিনি (ললিতাদিত্য) পরিহাসকেশব নামক বিগ্রহটিকে প্রতিভূস্বরূপ রাখিয়া ত্রিগ্রাম্য দেশে উগ্রসৈনিকের সাহায্যে গৌড়াধিপকে বধ করিয়াছিলেন। সে সময়ে গৌড়পতির অনুচরবর্গের অদ্ভুত বিক্রম পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাহারা পরলোকগত রাজার শোক বিস্মৃত হইতে না পারিয়া রাজার হত্যার প্রতিশোধ-প্রদানার্থ কাশ্মীর-সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। প্রথমে উহারা (গৌড়ীয় সৈন্যগণ) শারদা দেবীকে দর্শন করিবার ছলে কাশ্মীরে প্রবেশ করে এবং সকলেই এককালে মধ্যস্থ পরিহাসকেশবের মন্দিরটি আক্রমণ করিয়াছিল। কাশ্মীরপতি দূরদেশে আছেন, এই সুযোগে প্রভুহত্যাজনিত ক্রোধে অন্ধ গৌড়বাসীরা পরিহাসকেশবকে কাড়িয়া লইতে প্রবেশ করিতেছে দেখিতে পাইয়া তথাকার পূজকেরা পরিহাসকেশবের মন্দির-দ্বার বন্ধ করিয়া ফেলিল। তখন বিক্রমশালী গৌড়ীয়েরা রজতময় রামস্বামী-বিগ্রহকেই পরিহাসকেশব ভ্রমে আক্রমণ করিল এবং তাহাকে উৎপাটন পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। ঐ সময়ে কাশ্মীর-সৈন্যেরা নগর হইতে বাহির হইয়া উহাদিগকে নানাবিধ কঠিন প্রহারে বধ করিতে থাকিলে উহারা রামস্বামীবিগ্রহকে তিল তিল করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করত চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিল। সেই কৃষ্ণকায় গৌড়বাসীরা কাশ্মীর-সেনার হস্তে নিহত হইয়া যখন রক্তাক্ত কলেবরে ভূপতিত হইতে লাগিল, তখন বোধ হইতে লাগিল যে, গৈরিকাদি ধাতুর রসে রঞ্জিত অঞ্জন-গিরির সুবৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডগুলি খসিয়া পড়িতেছে। তাহাদিগের দেহনিঃসৃত শোণিতপ্রবাহ তাহাদিগের অতুলনীয় রাজভক্তিকে অধিকতর সমুজ্জ্বল করিয়াছিল, এবং ধরণীকে অধিকতর শ্রীসম্পন্না করিয়াছিল। বজ্রমণি হীরক হইতে বজ্রপাতজনিত বিপদ দূর হয়; পদ্মরাগমণি হইতে কেবল সম্পদই প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং গরুড়মণি হইতে নানাপ্রকারের বিষই নষ্ট হয়। এই রত্নগুলি বিধাতার নিয়োজিত স্ব স্ব শক্তির প্রভাবে এক একটি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু অনুপম মহিমশালী পুরুষরত্নেরা সংসারে কোন্ অদ্ভুত কর্ম্ম যে সাধন না করেন, তাহা বলা যায় না। ভাবিয়া দেখ দেখি, গৌড় হইতে কাশ্মীর কত সুদীর্ঘকালের পথ! আর মৃতপ্রভুর প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগই বা কিরূপ! সুতরাং তৎকালে গৌড়বাসীরা যাহা করিয়াছিল, তাহা বিধাতারও অসাধ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তৎকালে রাজাদের ঐ প্রকার ভৃত্যরত্ন প্রায়ই মিলিত। ঐ সকল ভৃত্য প্রতি কর্ম্মেই অলৌকিক প্রভুভক্তির পরিচয় দিত। সেই রাক্ষসের ন্যায় ভীষণ গৌড়বাসীদের সহিত তুমুল যুদ্ধকালে কাশ্মীরনাথের অতিপ্রিয় ভগবান পরিহাসকেশব রামস্বামী-বিগ্রহের বিনিময়ে রক্ষিত হইয়াছিল। অদ্যাপি রামস্বামীর মন্দিরটি

যেমন একদিকে দেবতাশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে, তেমনই সেই গৌড়ীয় বীরদিগের অদ্ভুত যশে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ রহিয়াছে।" *

ললিতাদিত্যের পর কাশ্মীরপতি জয়াপীড় যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করেন, তখন জয়ন্ত গৌড়ের অধিপতি। কহ্লন জয়ন্তের শাসন-বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন—

"তস্মিন্ গৌরাজ্যরম্যাভিঃ
প্রীতঃ পৌরবিভূতিভিঃ।
লাস্যংস দ্রষ্টুমাবিশৎ
কার্ত্তিকেয়-নিকেতনম্॥"

ইহার মর্ম্মার্থ "তথায় সুশাসনের ফলস্বরূপ অসাধারণ ঐশ্বর্য্য-লাভ হইয়াছিল, তদ্দর্শনে জয়াপীড় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন এবং নৃত্য দেখিবার নিমিত্ত কার্ত্তিকেয়ের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।"

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তখন জয়ন্তের রাজধানী ছিল। গৌড়ে পাঁচজন নরপতি ছিলেন।

রাজতরঙ্গিণীর বিবরণ পাঠে উপলব্ধি হয়, গৌড় সে সময়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। গৌড়বাসীরা কেবল যে নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত, উদ্যমশীল, অধ্যবসায়ী, কষ্টসহিষ্ণু ও বুদ্ধিমান ছিলেন। বাঙ্গালীর এত গুণ এক্ষণে কোথায় বিলুপ্ত হইল ?

তাহার পর লক্ষণ সেনের সময়ের অবস্থা কিরূপ ছিল দেখুন। বক্তিয়ার খিলিজী দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কান্যকুব্জ তাঁহার প্রতাপে ধ্বংসপথে পতিত হইল। সকলেই থরহরি কম্পমান। এহেন পরাক্রান্ত মুসলমান যোদ্ধ্‌পুরুষ কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে রণসাজে গৌড়ে প্রবেশ করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি অশ্বব্যবসায়ীর ন্যায় ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া অকস্মাৎ প্রচ্ছন্নভাব পরিহার করিলেন। এই আকস্মিক বিপদে চকিত প্রহরীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে কাননমধ্যে লুক্কায়িত মুসলমান-সৈন্য দলে দলে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন অশীতিপর নরপতির পলায়ন ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু ইহার পরেও—বক্তিয়ারের গৌড়াধিকারের বহুবৎসর পরেও—পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু নরপতি আপনাদিগের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে

* "দত্ত্বাপি সং স যত্রাস্থঃ শ্রীপরিহাসকেশবম্ জঘান তীক্ষ্ণপুরুষৈস্ত্রিগ্রামং গৌড়পার্থিবঃ॥
গৌড়োবাজীবিনামাসীৎ সত্ত্বমত্যদ্ভুতং তদা। জঙ্ঘনে জীবিতঃ ধীরা পরোক্ষস্য প্রভো কৃতে॥
শারদাদর্শনমিষাৎ কাশ্মীরান্ সম্প্রবিশ্য তে। যত্রাস্থদেবাবসথং সংহতাঃ সমাচষ্টয়ন্॥
দিগন্তরস্থে ভূপালে প্রবিবিক্ষুনবেক্ষ্য তান্ পরিহাসহরিং চক্রুঃ পূজকাঃ পিহিতার্গলম্॥
তে রামস্বামিনং প্রাপ্য রাজতং বিক্রমার্জ্জিতাঃ। পরিহাসহরিভ্রান্ত্যা চক্রুৎপাটিরেণুশঃ॥
তিলঃ তিলং তং কৃত্বা চ চিক্ষিপুর্দিক্ষু সর্ব্বতঃ। নগরান্নির্গতৈঃ সৈন্যৈর্হন্যমানাঃ পদে পদে॥
শ্যামলারক্তসংসিক্তাস্তেঽপতন্ নিহতা ভুবি। অভ্রজম্ভাদ্রিদৃষৎখণ্ডা ধাতুস্যন্দোজ্জ্বলা ইব॥
তদীয় রুধিরাসারৈঃ সমভূদুজ্জ্বলীকৃতা। স্বামিভক্তিরসামান্যা ধন্যা চেয়ং বসুন্ধরা॥
বজ্রাদ্বজ্রকৃতং ভয়ং বিরমতি শ্রীঃ পদ্মরাগান্তরেণানাকারমপি প্রশাম্যতি বিষং গারুত্মতাদশ্মনঃ।
একৈকং ক্রিয়তে প্রভাবনিয়মাৎ কর্ম্মেতি রত্নৈঃ পরং পুংরত্নৈঃ পুনরপ্রমেয়মহিমোন্নদ্ধৈর্ন কিং সাধ্যতে॥
ক্ব দীর্ঘকাল লঙ্ঘ্যোঽধ্বা শাস্তে ভক্তিঃ ক্ব চ প্রভৌ। বিধাতুরপ্যসাধ্যং তদ্ যদ্ গৌড়ৈর্বিহিতং তদা।
লোকোত্তর-স্বামিভক্তিপ্রভাবাণি পদে পদে। তাদৃশানি তদাভূবন্ ভৃত্যরত্নানি ভূভৃতাম্॥
রাজ্ঞঃ প্রিয়োরক্ষিতোঽভূদ্ গৌড়রাক্ষসবিপ্লবে। রামস্বাম্যুপহারেণ শ্রীপরিহাসকেশবঃ॥
অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদম। ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ॥

সমর্থ হইয়াছিলেন। বক্তিয়ারের শাসন-সময়েও কামরূপপতির বলবিক্রম অটুট ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মুসলমানদিগের দীর্ঘকাল শাসনের ফলেও বাঙ্গালী হীনবীর্য্য হয় নাই। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি তাহার পরিচয়স্থল। বার-ভূঞার কীর্ত্তি এখনও বিস্মৃতির অতলজলে নিমজ্জিত হয় নাই। তাহার পর ইংরাজের আমলের প্রারম্ভাবস্থা। বৈষ্ণব-বিদ্রোহের সময়েও বাঙ্গালী-বীর্য্যের শেষ স্ফুলিঙ্গ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

এখন ক্রমে ক্রমে সমস্তই বিলুপ্ত হইতেছে। ইংরাজের সুশাসন-গুণে সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজিতা। বলপ্রকাশের কাহারও কোন আবশ্যকতা হয় না। ইহার উপর পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষাসম্ভূতা বিলাসিতা আমাদিগের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। তজ্জন্যই আমরা ক্রমশঃ আপনাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিতে বসিয়াছি।

যে গুণে আজি ইংরাজ পৃথিবীপূজিত, সর্ব্বজনমান্য, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা ইংরাজের সে গুণ-গ্রহণে আদৌ সচেষ্ট নহি। ইংরাজের ন্যায়পরতা, আর্ত্তোদ্ধারব্রত, সৎসাহস, তেজস্বিতা, উদ্যমশীলতা আমরা অনুকরণ করিতে শিখি নাই। স্বর্গীয় ডি এল্ রায়ের কথায় বলিতে হয়, আমরা ইংরাজিধরণে কাসি, বিলাতিধরণে হাসি, হ্যাটকোট পরিয়া বাঁদর সাজি, বাবু বলিলে চটি, কিন্তু ইংরাজের সৎগুণের এক কণারও অধিকারী হই না। যে স্বাবলম্বনের বলে ইংরাজজাতি আজি মান্য, গণ্য, বরেণ্য, সে স্বাবলম্বন আমাদিগের আছে কি? তাই বলি, যতদিন না আমরা বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে শিখিব, আত্মনির্ভরতা অনুশীলন করিব, জাতীয় সম্মান ও মনুষ্যত্বের পূজা করিব, ততদিন আমাদিগের লুপ্ত যশের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভারতের নিজস্ব শিল্প-পদ্ধতি *

আমাদের দেশে এখন একটা শিল্প-বিপ্লবের যুগ চলিতেছে। ভারতের নেতৃবর্গ জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্ত মস্তিষ্ক চালনা করিতেছেন। প্রতিভাবান বিদ্বানেরা ভারতীয় সমাজের উন্নতিকল্পে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। প্রায় সকলেরই উদ্দেশ্য একদিকে প্রধাবিত। ভারতবর্ষকে একটা শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত করিতে অধুনা তাঁহারা অত্যন্ত ব্যগ্র। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে অনেক যুবক শিল্প-শিক্ষার জন্য বিদেশ গমন আরম্ভ করিয়াছেন। দেশের স্থানে স্থানে নূতন নূতন কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। নূতন নূতন শিল্প-বিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এই সময় একটা কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। কথাটা এই—ভারত ও ইউরোপের আদর্শ এক

* ইংরাজী মাসিকপত্র "Dawn"এ প্রকাশিত Major Keithএর প্রবন্ধ অবলম্বনে।

নয়; ইউরোপের প্রদর্শিত পথে ভারতাত্মার অভিব্যক্তি অসম্ভব। সুদূর আমেরিকার অনুকরণও আমাদের চলিবে না। সুতরাং কোন একটা বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে ইউরোপ বা আমেরিকার ছাঁচে নিজেকে গড়িয়া তোলা কি সমীচিন? উত্তরে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহার অনুমোদন করিবেন এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। এখন প্রশ্ন, বর্ত্তমানে যে ভাবে শিল্পের আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে, তাহা কি প্রতীচ্যের অনুকরণে নয়? অষ্টাদশ-শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডেও এইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহার ফলে, পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল; কৃষি-প্রধান ইংলণ্ড শিল্প-প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ভারতেও ক্রমশঃ সেইরূপ ঘটিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে নূতন নূতন অভাব সৃষ্ট এবং তাহার নিরাকরণার্থে নব নব শিল্প-প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতন শিল্পের এখন আর আদর নাই। এদিকে বহির্বাণিজ্যের ফলে দেশের প্রধান খাদ্য-শস্য বিদেশে নীত হইতেছে; দেশের লোক অনাহারে মৃতকল্প। সুতরাং কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি দেশীয় শিল্পীরা জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া নবীন শিল্পের সহায়তা-সাধনে যত্নবান। এমন কি, কৃষককুলও এই সমস্ত শিল্পোপযোগী দ্রব্য-উৎপাদনেই মনোনিবেশ করিতেছে। জাতীয় শিল্প ত ধ্বংসোন্মুখ। কিছুদিন পরে অন্ন জুটাও ভার হইবে। ১৩০৪ সালেও বাঙ্গালা-দেশে টাকায় বিশ সের চাউল বিক্রয় হইত। এখন তাহা আমাদের নিকট উপন্যাসের গল্প মাত্র। সায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণের কথা ত স্বপ্নাতীত হইবেই। তাই বলিতেছিলাম—এটা শিল্প-বিপ্লবের যুগ।

কোন বিদেশীয় পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিতে না পারিলে এখন কোন বিষয়ে আমাদের আস্থা জন্মে না। এমনই আমাদের আত্মবিশ্বাস! সুতরাং বর্ত্তমান ভারতের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে মেজর কীথ নামক জনৈক ইংরাজের মত উদ্ধৃত করিতেছি। ইনি ভারতবর্ষীয় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগে বহুদিন কাজ করিয়া গিয়াছেন।

কীথ সাহেব বলেন,—

"ইংরাজেরা ভারতবর্ষের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন। তাঁহারাই মারাঠা দস্যু-গণের হস্ত হইতে এদেশ মুক্ত করিয়াছেন, চুরি ডাকাইতি নিবারণ করিয়াছেন। ইংরাজ-রাজত্বের পূর্ব্বে লোক-সংখ্যা এত বেশী ছিল না, প্রজাগণও স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত না। তাহাদিগকে নানা করভারে সর্ব্বদা পীড়িত থাকিতে হইত। ক্রমে ক্রমে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। জাতিসমূহের মধ্যে বেশ সদ্ভাবের সঞ্চার হইতেছে; শিল্প-চর্চ্চা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, শিক্ষাও প্রসার লাভ করিয়াছে। মোটের উপর গভর্ণমেণ্ট এখন মনে করিতে পারেন যে, প্রজাবৃন্দ বেশ সুখে আছে। কিন্তু এক দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তুলনার ভিত্তিতেই ভুল রহিয়াছে। মুসলমান-রাজত্বের পূর্ব্ব-যুগের দিকে আমরা একবার লক্ষ্য করি না কেন? আমার মনে হয়, দশম শতাব্দীর সেই হিন্দুর গৌরবযুগের শিল্পের সহিত আধুনিক যন্ত্রজাত শিল্পের তুলনা হয় না। তখন প্রত্যেকেই এই ব্যাপারে কিছু না কিছু সাহায্য করিয়াছিল। সেকালে বাঁধ, খাল ও

পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জলমোচনের বন্দোবস্ত হইত। ভারতের খনিজ-ধাতু ফিনিসিয়ার ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্য আনয়ন করিত। দাক্ষিণাত্যের তাম্রবিমণ্ডিত কাষ্ঠ-মন্দির তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মধ্যভারত, মহীশূর ও উড়িষ্যা অঞ্চলে বিপুল লৌহকর্ম্ম প্রচলিত ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক প্রভৃতিতেও প্রচুর আয় হইত। এখানকার ব্যবসায়-বাণিজ্য তখন ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ইটালি পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কথিত আছে, রোমে এক পাউণ্ড রেশমের বিনিময়ে এক পাউণ্ড স্বর্ণ পাওয়া যাইত। রোম-সম্রাট মন্ত্রদাতাগণের মতানুযায়ী ভারতজাত দ্রব্যাদি হইতে নিজের বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করিতেন। সমালোচকেরা রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ধ্বংস হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করিত। দরায়ুসের সামন্ত-রাজ্যগুলির মধ্যে কেবল ভারতবর্ষই তাঁহাকে স্বর্ণমুদ্রায় রাজকর দান করিত। অতি পূর্ব্ব-কালে ভারত যে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহা শিলালিপি ও অতীতকালের লোকপ্রিয় বড় বড় নগরসমূহ দেখিয়া ধারণা করা যায়। বর্ত্তমানের সহিত অতীত ভারতের তুলনা করিতে গেলে মধ্যভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। সেখানে হিন্দুগৌরবের নিদর্শন আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমানেরা তাহা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হন নাই। সাঁচি-স্তূপ, ভারত-স্তম্ভ প্রভৃতিতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ হইতে ২০০ অব্দের বিস্তর কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। বৃহৎ বৃহৎ নগরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে আমরা ইহার পরিচয় পাইয়া থাকি। এই সমস্ত নগরের প্রাচীর প্রায়ই বিশ মাইল পরিধি-বিশিষ্ট। মধ্যযুগের ধর্ম্মক্ষেত্র-রাজধানীগুলিও অতীতের কত কীর্ত্তিকাহিনী জ্ঞাপন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলিয়া গিয়াছেন, মামুদ যখন ১০১৬ অব্দে কনৌজ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন, তখন তিনি (মামুদ) এক অতুলনীয় ও অভ্যুন্নত সহর দর্শন করিয়াছিলেন। উহা দৃশ্য ও গঠন গৌরবে সেকালে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সমস্ত স্মৃতি-স্তম্ভ, অট্টালিকা, মন্দিরাদি ধনী বা নৃপতিবর্গের অর্থে নির্ম্মিত হয় নাই, পক্ষান্তরে উহারা প্রজাবর্গের সমৃদ্ধির নিদর্শন। জনসাধারণের চেষ্টায় হিমালয় পর্ব্বতের উপরিভাগে নগরকোটের যে মন্দির গঠিত হইয়াছিল, ফেরিস্তা বলেন, সুলতান মামুদ তাহা লুণ্ঠন করিয়া এত স্বর্ণ-রৌপ্য ও ধনরত্ন অপহরণ করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর কোন রাজকোষেও তত অর্থ ছিল না। মামুদ ৭০০ মণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের রেকাব, ২০০ মণ সোণার তাল, ২০০০ মণ রূপা, ২০ মণ অন্যান্য রত্নাদি এবং ৭০০০ মণ 'দিনার' * নামক স্বর্ণ-মুদ্রা লইয়া যান। মথুরা ও সোমনাথের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে কনিংহাম, এলফিন্‌ষ্টোন্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরাও ঐরূপ অনেক কথা বলিয়াছেন।"

মেজর সাহেবের মতে—"বর্ত্তমান সময়ে ভারত-সাম্রাজ্যের ঋদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহারা ধনাগমের কারণ তাহারা ইহার অতি অল্পাংশই ভোগ করে। ভারতের প্রকৃত ধনার্জ্জনকারী—শিল্পী ও কৃষক-সমাজ। তাহাদের আজ দুরবস্থার সীমা নাই। হিন্দুগণ চিরকাল

* ৭৫ গ্রেণ = ১ দিনার

হস্তশিল্পে পারদর্শী। নূতন যুগের শিল্পবিদ্যা তাহারা কিছুই জানে না। সুতরাং যতই কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততই তাহাদের অন্ন মারিবার ব্যবস্থা হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত শিল্পও উঠিয়া যাইতেছে। ফ্যাক্টরী, কারখানা প্রভৃতিতে যতই কেন দ্রুত এবং পরিষ্কার কাজ হউক না, যতই কেন অত্যাবশ্যক অভাব পূরণ করুক না, পুরাকালের শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে তাহারা সম্পূর্ণ অক্ষম। পৃথিবীতে এমন কোন বয়ন-যন্ত্র কি আছে যাহাতে ঢাকার মসলিনের ন্যায় একখানা মসলিন প্রস্তুত হইতে পারে? যন্ত্রের দ্বারা জীবনশূন্য কৃত্রিম শিল্প আবিষ্কৃত হয়; পুরাতন শিল্পে নূতন সৌন্দর্য্য-দানের ক্ষমতা তাহার নাই। কাষ্ঠ ও প্রস্তর-খোদাই ও ধাতুনির্ম্মিত বাসনে নানাবিধ ছবি অঙ্কনের ন্যায় প্রকৃত শিল্পকর্ম্ম কোনদিন কলে সাধিত হইবে না।" দেশীয় রাজন্যবর্গ, ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ যদি চেষ্টা করেন, তবে এই সমস্ত শিল্পদ্বারা যথেষ্ট ধনাগম সম্ভব। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে; তাহাদের মধ্যে প্রধান কথা এই যে, যাহা এককালে হিন্দুদের পরম গৌরবের বিষয় ছিল সেই হস্তশিল্প, যন্ত্র ও ইঞ্জিন প্রচলিত হওয়াতে, উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। কোন দেশের শিল্প যাহাতে স্বাভাবিক উপায়ে ও জাতীয় প্রণালীতে বিকাশ লাভ করে, তাহার জন্য আপামর সাধারণ সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। ভারত-গবর্ণমেণ্ট হয়ত মনে করিয়াছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এদেশের জনসাধারণের জাতীয় স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে এবং কালে এখানে পাশ্চাত্য শিল্পও প্রসার লাভ করিবে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এটা তাঁহাদের ভুল ধারণা। অশিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যেও অনেকে বেশী মূল্যে দেশী বস্ত্র ক্রয় করিয়া থাকে। বিলাতির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা অতি অল্প।

কীথ সাহেব হিন্দুসমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে হিন্দুর কলা ও শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন,—

"হিন্দুদের শিল্প তাহাদের জাতীয় চরিত্রের অনুযায়ী। হিন্দুরা একত্রে পরিবারবদ্ধ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভাল বাসে এবং সহসা অসতর্কভাবে কোন পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহে; সমস্ত বিষয়েই ধর্ম্মের সহিত যোগ রাখিয়া চলিতে তাহারা অভ্যস্ত। বারাণসী, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধর্ম্মক্ষেত্রে সেই জন্যই বাণিজ্য-কেন্দ্র গঠিত হইয়াছিল। তাই শিল্পও এদেশে জাতিগত হইয়া পড়িয়াছে। এখন ইচ্ছা করিলেই কোন হিন্দু যেমন স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে গিয়া বসবাস করিতে পারে না, তেমনি ইচ্ছা হইলেও জাতি-ব্যবসায় ত্যাগ করা তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। প্রাচীন গ্রীসের সহিত ভারতের এই চিত্রের কিছু সাদৃশ্য আছে। বর্ত্তমান ইউরোপ বা আমেরিকার সহিত কোন তুলনাই হয় না, বরং পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশসমূহের লক্ষ্য ও আদর্শ ব্যক্তিগত পার্থিব স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কোন মুহূর্ত্তে স্থানত্যাগ, ভিন্নব্যবসায়-অবলম্বন তাহাদের পক্ষে সম্ভব। প্রত্যেক পাশ্চাত্য দেশবাসীর বিশ্বাস, যত দ্রুত কাজ সমাধা করা যায় ততই পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গল, ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহাদের দেশও তদনুরূপ কলের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। বিখ্যাত নায়াগ্রার জলপ্রপাত পর্য্যন্ত তদুদ্দেশ্য সাধনে

সহায়তা করিতেছে। হিন্দুরা জানে তোমার আমার চেষ্টায় বিশেষ কিছুই ফল নাই; ধীরে যাও, দ্রুত যাও, পথ চিরকালই অনন্ত; অতএব ধীরে ধীরে সমগ্র শক্তির সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীগুলি মন্থর গতিতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতে তাহাদিগকে এই শিক্ষাই দিতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা এতই বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে, একটিকে যদি কোন দ্রুতগামী পার্ব্বত্যনির্ঝরের সহিত তুলনা করা হয়, তবে অপরটি সমতলস্থিতা 'ধীরগামিনী' নদীর সহিত তুলনীয়। একটি ক্ষণপ্রভ বিদ্যুৎ, অপরটি স্থিরজ্যোতিঃ ধ্রুব-নক্ষত্র। একদিকে প্রতীচ্য শিল্প যেমন ব্যক্তিত্ববাদের (Individualism) উপর দণ্ডায়মান, প্রাচ্যও তেমনি জাতিগত প্রথার (communalism) একান্ত পক্ষপাতী। ফ্রান্সের অর্থনীতিবিদ্ মিষ্টার লেপ্লেও এই প্রথা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মত যে, কোন একটা পরিবার বংশানুক্রমে একটা নির্দ্দিষ্ট শিল্প বা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকিলে, সেই ব্যবসায় বা শিল্প ক্রমশঃ বিকাশ ও পুষ্টিলাভ করে। পুত্র পিতাকে যতটা সাহায্য করিতে পারে, বেতনভোগী মজুর দ্বারা ততটা পাওয়া যায় না; এদিকে পুত্রও ক্রমশঃ শিক্ষালাভ করিতে থাকে এবং অবশেষে এই বিদ্যায় নিপুণ হওয়া তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আয়াসসাধ্য হইয়া পড়ে। ভবিষ্যৎ জীবন কোন্ পথে চালাইবে, সে জন্য আর তাহাকে উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। বংশগত বহুদর্শিতার ফলে শিল্প বা ব্যবসায়ও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।"

হিন্দু সভ্যতার বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য কীথ সাহেব লিখিয়াছেন—"অধুনা মানবজাতি 'উন্নতি ও সংস্কার' লইয়া এত ব্যস্ত যে, উপরোক্ত কথাগুলি আলোচনা করিবারও তাহার অবসর নাই। ডাক্তার জেমস্ গিকি তাঁহার Fragments of Earth Lore নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, প্রত্যেক ভারতবাসী ইংরাজ (এংগ্লো ইণ্ডিয়ান) পরিশেষে একদিন নীচ জাতিগত (racial) কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া পারিপার্শ্বিকের প্রভাব স্বীকার করিবেন। আমরাও বলি, যদি তাঁহারা ভারতের ভৌগোলিক অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন, যদি বিভিন্ন সময়ে ভারতের জল-বায়ু ও অতীত যুগের ভারতবাসীর অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেন, যদি এখানকার নানাবিধ জীবজন্তু, উদ্ভিদাদি ও খনিজপদার্থের ইতিহাস পাঠ করিতেন, যদি বুঝিয়া দেখিতেন যে, ভারতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহার মনস্তত্ত্ববিদ্গণের মনে এক বিশেষ ভাব দান করিয়াছিল এবং যদি বিশ্বাস করিতেন যে হিন্দুরা কোন দিন কাহারও অনুকরণ করে নাই, বরং জগতের সকল প্রকার শক্তি ব্যবহারপূর্ব্বক চিরকাল স্বীয় বিশেষত্ব অটুট রাখিয়া চলিয়া আসিতেছে ও তাহারা শুধু চিন্তা করিয়াই বিরত নহে, পরন্তু ইউরোপীয়-গণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রণালীতে জীবন অতিবাহনের পথও আবিষ্কার করিয়াছে, তবে এতদিন পৃথিবীর দৃশ্য অন্যরূপ হইত, তাঁহারাও অনেক কলঙ্কের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন। তাহা হইলে মাঞ্চেষ্টারের উপকারার্থে ভারতশিল্পেরও সর্ব্বনাশ সাধন হইত না।"

বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কীথ সাহেবের মত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে,—

"ইদানীং যে অবস্থায় আমরা উপনীত হইয়াছি, তাহাতে শিল্প-সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন

করা নিতান্ত আবশ্যক। যাহাতে পুরাতন ও নূতন শিল্পের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনয়ন করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। আর দেখা উচিত, ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গে অঙ্গে এই 'সংরক্ষণ' ভাব জড়িত ছিল। আমরা এতদিন তাহার অনাদর করিয়াছি, কাজে কাজেই সে সুফল প্রসব করে নাই। এখন বুঝিতে পারিতেছি, শিল্পী ও কৃষকেরা তাহাদের অভাব দূরীকরণার্থে আমাদের দ্বারে উপস্থিত। ইংরাজ-শাসনের প্রতি অত্যন্ত আস্থা ছিল; ইহা তাহাদিগের স্বার্থরক্ষা করিতে যে একান্ত দুর্ব্বল, এ কথা জানিতে তাহাদের আর বাকি নাই। সকলেই ভাবিতেছে, আমরা সরল ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করি; আমাদের মূল্যবান বেশভূষা নাই, অতিরিক্ত গৃহসজ্জা নাই, কোন ব্যয়সাধ্য খাদ্য আমরা গ্রহণ করি না, বিবাহ-শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন কাজে আমাদের ব্যয়বাহুল্য নাই, তবে কেন আমরা চিরদিন এমন দরিদ্র থাকিব? অতি প্রত্যূষকাল হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত আমরা পরিশ্রম করি, তিলেকের জন্যও আমরা বিরাম চাহি না, তবে কেন আমরা এমন দরিদ্র থাকি? মানবের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী-সম্ভার আমরাই সরবরাহ করি, তবে আমরা কেন অন্নাভাবে মারা যাইব? অনেকের বিশ্বাস, কৃষক ও শিল্পীরা বেশ সুখে আছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীই যত কষ্ট ভোগ করিতেছেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু কৃষক, শিল্পী ও শ্রমজীবীরাও সুখী নহে। যেমন দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের সভ্যতার মাত্রা কথঞ্চিৎ কমাইয়া কর্ম্মে অগ্রসর হওয়াই মধ্যবিত্তগণের পক্ষে যুক্তিযুক্ত। তাঁহারা যদি স্বকপোলকল্পিত সভ্যতার আশ্রয় ত্যাগ পূর্ব্বক শিল্পী ও কৃষকগণকে লইয়া একযোগে দেশের উন্নতি-বিধান ও অভাবদূরীকরণার্থে নিয়োজিত হন, তবেই দেশের ও নিজেদের যথার্থ উপকার করিতে পারিবেন।

"গভর্ণমেণ্টও যদি এই সময় একটা শিল্পানুসন্ধানের (Industrial Survey) অনুষ্ঠান করেন, দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারেন। প্রজাদিগের বিশেষত শ্রমজীবী ও শিল্পীদিগের প্রকৃত উন্নতির পন্থা আবিষ্কারই ইহার উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল, হিন্দুজাতির বিশেষ কোন রূপান্তর দেখা যায় না, ইহা সম্যক অবধারণা করিয়া সরকার দেশবাসীর সমাজ-বদ্ধ জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিতে অগ্রসর হউন, ইহা আমরা অন্তরের সহিত কামনা করি। শিল্পী ও শ্রমজীবিগণের আকাঙ্ক্ষা কি, জ্ঞাত হওয়া উক্ত শিল্পানুসন্ধানের প্রথম কর্ত্তব্য; কারণ, তাহারাই নিজেদের অভাব-অভিযোগ ও তাহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ। তাহাদের মধ্যে সামাজিক উন্নতির যে সমস্ত রীতি-নীতি প্রচলিত আছে, সেগুলি লিপিবদ্ধ করা অনুসন্ধানের দ্বিতীয় কাজ। ইহা দ্বারা এ দেশের শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-আচার, আইন-কানুন কেমন হওয়া দরকার জানা যাইবে। গভর্ণমেণ্ট আরও জ্ঞাত হইতে পারিবেন, এ জাতির ক্ষমতা কতদূর। ইহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ, শিল্পবিদ্যালয় প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করার আবশ্যকতা আছে কি না।"

উপসংহারে বাঙ্গালার কর্ম্ম-ও-চিন্তাবীরগণকে উদ্দেশ করিয়া কীথ সাহেব বলিয়াছেন, তাঁহারা যেন স্থিতিশীলতার চরম উক্তি মনে করিয়া ইহাকে দূরে নিক্ষেপ না করেন। এখন

আমাদের যে দুর্দ্দিন উপস্থিত, তাহাতে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। কিসে দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব প্রত্যেক দেশহিতৈষী একবার নিভৃতে বসিয়া চিন্তা করিবেন। হিন্দু সমাজকে অনতিদূর ভবিষ্যতে কোন্ দিকে লইয়া যাইতে হইবে তাহার বিচার হওয়া উচিত। অন্ধের মত যে সে উপায় অবলম্বন করিয়া শক্তিক্ষয়, অর্থব্যয় ও জীবন নাশ করিবার অবসর আমাদের নাই। জাতীয় জীবনের ধারা না ধরিতে পারিলে উন্নতি হইবে না। সুখের কথা, দেশের লোক তাহা বুঝিয়াছেন। এই জন্যই হিন্দু-সাহিত্য-প্রচার, প্রাচ্য-শিল্প-কলার প্রবর্ত্তন, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ, প্রাচীন-পুঁথি-সংগ্রহ ও হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা। স্বদেশী আন্দোলনের কথঞ্চিৎ বিফলতায়ও আমরা নিজেদের জাতিগত বিশেষত্ব ও নিজস্ব শিল্পপদ্ধতি অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইব, আশা হইতেছে।

মুরশিদাবাদ জেলায় বাল্মীকি-আশ্রম

(১)

অল্পদিন হইল আমি রঘুনাথগঞ্জে গিয়াছিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম মহর্ষি বাল্মীকি মুনির আশ্রম অতি নিকটে আছে। উহা রঘুনাথগঞ্জের সন্নিহিত বালিঘাটা গ্রামে অবস্থিত। মনে বড় কৌতূহল জন্মিল। বৈকালে একজন স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাল্যবন্ধুসহ তদ্দর্শনে বহির্গত হইলাম। তিনি এখানকার একজন শ্রেষ্ঠ উকীল। অল্পক্ষণ পরেই আমরা উভয়ে শান্তিপূর্ণ, পুণ্যময়, তপোময় পবিত্রাশ্রমে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বস্মৃতি মনে জাগরিত হইল। মনে মনে কহিলাম ইহা কি সেই পবিত্রাশ্রম যেখানে 'মা নিষাদ' বলিয়া বিশুদ্ধাত্মা তপোবলসম্পন্ন বাল্মীকি ক্রৌঞ্চমিথুনবধে ব্যাধকে নিবৃত্ত করিয়া জগতে প্রথম কবিতা-সুধা উদ্গীরণ করিয়াছিলেন! রামায়ণরূপ কাব্যনির্ঝরিণীর অমৃতপ্রবাহে জগতের শোকতাপপাপবিদ্ধ মনুষ্যগণের জীবন সুশীতল করিয়াছিলেন! যুগে যুগে সেই কবিতামৃত পান করিয়া দুস্থ ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে। মানসনেত্রে দেখিলাম এই স্থানে বালক লবকুশ মহারাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্বকে বন্ধন করিয়া উঁহার সৈন্যকটককে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিলেন। [illegible]পত্রে যে অদ্ভূত গল্প ঘটিয়াছিল, সমস্তই মনে স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইল। হায় সেই পুণ্যশ্লোক বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষি কোথায়? তিনি অনন্তের ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত রহিয়া জগতের নশ্বরত্বের সাক্ষ্য দান করিতেছেন। তবে তাঁহার বিমলকীর্ত্তি তাঁহাকে অমর ও মানব মনোমন্দিরের অতি পবিত্র স্থানে সংস্থাপিত করিয়া প্রতিদিন প্রেমসলিলে তদীয় শ্রীপাদপদ্ম বিধৌত করিবে। কাল সকলকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যায়। তবে মহাত্মাগণের পবিত্র কীর্ত্তি-সৌধকে সে আপাততঃ বিচূর্ণ করিতে না পারিলেও, উহাও কোন একদিন তদীয় বজ্রমুষ্টির কঠিন আঘাতে রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া যায়। জগতে মান, যশ, কীর্ত্তি, বীরত্ব কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। প্রলয়-পয়োধিজলে ভাসিয়া গিয়া কোন্ অনন্তের কূলে স্থান প্রাপ্ত হয় তাহা সেই লীলাময়ই অবগত আছেন। ক্ষুদ্র

মানব-বুদ্ধি উহা কল্পনায় আনিতেও অক্ষম।

মহাত্মা বাল্মীকির সে কবিকুঞ্জ আশ্রম-পালিত শুক সারিকার মধুর সঙ্গীতে আর মুখরিত হয় না। ময়ূর-ময়ূরী আর উন্মত্ত নৃত্যতে চন্দ্রক-কলাপ বিস্তার করে না। হরিণ-হরিণীগণ আর যজ্ঞবেদিকায় সমাহৃত কুশগুচ্ছ ভক্ষণ জন্য লোলুপদৃষ্টিতে নেত্রপাত করে না। হোম-ধেনুর পবিত্র দুগ্ধধারার মধুর শব্দ শ্রুতিবিবরে প্রবেশলাভ করে না। বেদগানের উদাত্তস্বরে ভারতাকাশ প্রতি-ধ্বনিত ও যজ্ঞধূমে জলদপটলের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি হয় না। তপোবনের সতেজ বৃক্ষলতা বারমাস সমান ভাবে ফুল-ফল প্রদান করে না। ঋষিকন্যাকুল আপনাদের তপো-তেজোজ্জ্বল পুণ্যের পবিত্র দ্যুতিপূর্ণ সুকোমল বরাঙ্গকে কঠিন বল্কলবাসে আবৃত করিয়া হস্তে জল-কলস লইয়া বৃক্ষের আলবালে জলসেচনে নিযুক্তা নহে। আর সেই ইঙ্গুদি-তৈলপ্রদীপ তপোবনের অন্ধকাররাশি বিনষ্ট করিবার জন্য সন্ধ্যার সময় ঋষিকন্যাদিগের করপদ্মে দ্যুতি প্রকাশ করে না। গঙ্গার পবিত্র উপকূলে ঋষিগণের পর্ণকুটীর পরিদৃষ্ট হয় না। সবই কালের প্রবল তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে। কোথাও কিছুমাত্র নাই। আছে কেবল সেই সুদূর অতীতের পবিত্র পুণ্যময়ী স্মৃতিরেখা। আর আছে বিষ্ণুপাদপদ্মনিঃসৃতা কলুষবিনাশিনী ভাগীরথী, তাঁহার ক্ষীণ কলেবর এখনও কালের কুক্ষিগত হয় নাই। অতি ধীরে ধীরে ত্রিকালের স্মৃতিরাশিকে জাগ্রত করিয়া পুণ্যময়ী সাগরসঙ্গমে ছুটিতেছেন!

(২)

বাল্মীকি-আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলাম উহার অধিকাংশ ভূমির উপর এখন এণ্ডারসন সাহেব একটি বিশাল রেশম-কুঠী প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার উত্তরে আম্র ও বটবৃক্ষ-সংমিলিত একটি তরুমণ্ডপ এখনও পবিত্র ভূমিকে একটু সুশীতল ছায়াদান করিয়া অতীতের স্মৃতিকে জাগরিত রাখিয়াছে। উহাই বাল্মীকি মুনির আশ্রম। এ স্থানটি নিকটস্থ ভূমি অপেক্ষা এখনও সমুন্নত। গ্রামবাসিগণ ঐ সুপবিত্র ভূমিকে এখনও ভক্তির সহিত দর্শন করেন। এবং দর্শককে দেখাইয়া থাকেন উহাই বাল্মীকি মুনির পবিত্র আশ্রম-ভূমি। যে স্থানে লব-কুশ মহারাজ রাম-চন্দ্রের যজ্ঞ-অশ্ব ধৃত করিয়া বন্ধন করেন তাহা এক্ষণে "ঘোড়শালা" নামে কথিত। অশ্ব-উদ্ধার জন্য শ্রীরামের সৈন্যগণের সহিত যে যুদ্ধ হয় উক্ত যুদ্ধে সেনাপতি হনুমান বন্দী হন। যে স্থানে তিনি বন্দী হইয়াছিলেন উক্ত স্থান এখনও "বীরবন্দ" নামে অভিহিত হয়। রামায়ণের অনেক স্থানে হনুমান বীর হনুমান নামে কথিত হইয়াছেন!

উপসংহারে বক্তব্য এই—এই স্থানটি যে প্রকৃতই বাল্মীকি-আশ্রম তাহা নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণ করিবার উপায় কি? তবে তাঁহার পবিত্র আশ্রম গঙ্গাতীরে ছিল তাহা বাল্মীকির মূল রামায়ণে লিখিত আছে। গঙ্গা কি ভাগীরথী তীরে উক্ত আশ্রম ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। কারণ রামায়ণের অনেক স্থলে ভাগীরথী গঙ্গা নামে ও গঙ্গা ভাগীরথী নামে কথিতা হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত স্থানটি ভাগীরথীর তীরে, ছাপা-ঘাটির মোহনার তিন চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এ অঞ্চলের সকলেই উক্ত স্থানটিকে বাল্মীকি-আশ্রম বলিয়া বিশ্বাস করেন। আট দশ ক্রোশের লোকমুখে শুনিলাম উক্ত আশ্রমটি প্রকৃত বাল্মীকি-আশ্রম।

বীরবন্দ ও ঘোড়াশাল নামক স্থান দুইটীও উক্ত আশ্রমের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বাল্মীকি-আশ্রম হইতে বালিঘাটার নামকরণ হইয়া থাকিবে। যখন এই স্থানে সাহেবদের কুঠী নির্ম্মিত হয় নাই, তখন বহুতর সাধুসন্ন্যাসী উক্ত ঋষির আশ্রম-দর্শন-মানসে গমনাগমন করিতেন, অনেক সময়ে অনেক সাধুসন্ন্যাসী এখানে বহুদিন ধরিয়া থাকিয়া যাইতেন। কুঠীনির্ম্মাণের পর তাঁহাদের আর পূর্ব্বের ন্যায় তত যাওয়া-আসা নাই। অতিবৃদ্ধগণ বলেন এ স্থানে প্রতিমাসেই "রামলীলা" গান হইত। এখনও কোন কোন সময় হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে বহুদিন ধরিয়া "রামায়ণ" পালা-ক্রমে গীত হইত, এখনও যে হয় না তাহা নহে। ফলতঃ উক্ত স্থানটী যে রামগুণ-গানে সর্ব্বদা মুখরিত ছিল, তাহার শত শত প্রমাণ গ্রামবাসিগণ প্রদান করিলেন।

আশ্রমটী যে গঙ্গা, বা ভাগীরথী তীরে ছিল, তাহা মহর্ষি-প্রণীত রামায়ণ-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। সরস্বতীর বরপুত্র, কবি কালিদাস রঘুবংশে বাল্মীকির পদাঙ্কই অনুসরণ করিয়াছেন, পয়ার-লেখক কীর্ত্তিবাস উক্ত আশ্রম যমুনাতীরে ছিল বলিয়া রামায়ণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং চিত্রকূট পর্ব্বতেও যে তাঁহার অপর এক তপস্যাক্ষেত্র ছিল তাহাও লিখিয়াছেন। মুনিদিগের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম থাকা স্বতঃই মনে উদিত হয়। বাল্মীকির মূল রামায়ণ, রঘুবংশ ও কীর্ত্তিবাসী পয়ার হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম। উহা দ্বারা প্রকাশিত হইবে বাল্মীকি-আশ্রম গঙ্গা বা ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত। মহাকবি কালিদাস তাঁহার প্রধানকাব্য রঘুবংশে বাল্মীকি-আশ্রম গঙ্গাতীরে ছিল বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

রথাৎ সযন্তা নিগৃহীতবাহাং
তাং ভ্রাতৃজায়াং পুলিনেঽবতার্য্য।
গঙ্গাং নিষাদাহৃত নৌবিশেষ
স্তুতার সন্ধ্যামিব সত্যসন্ধঃ।৫২॥

আশ্বাস্য রামাবরজঃ সতীং
তাং আখ্যাত বাল্মীকি নিকেতমার্গঃ।
নিঘ্নস্য মে ভর্ত্তৃনিদেশ রৌক্ষং
দেবি! ক্ষমস্বেতি বভূব নম্রঃ।৫৮॥

কীর্ত্তিবাস বাল্মীকি-আশ্রম যমুনাতীরে ও অতিদূর চিত্রকূট পর্ব্বতে উল্লেখ করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ বলেন সীতা না হও ব্যাকুল
হের দেখ আইলাম যমুনার কূল।
পার হইয়া যান বাল্মীকির তপোবন,
আগে সীতা দেবী যান পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
তিন জনে গেল তারা যমুনার তীরে
তিন দণ্ড কাটিলেন দুই সহোদরে।
তাহাতে আনিয়া কাষ্ঠ জ্বালিলা অনল
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল।
চিত্রকূট পর্ব্বতে বাল্মীকি তপোবন,
দেখিয়া অগ্নির ধূম বিচলিত মন।
মুনি বলে লবকুশ পাড়িল প্রমাদ।
দেখিল চলিল মুনি করিয়া বিষাদ।
ছমাসের পথ এল চক্ষুর নিমেষ
তিনজনে দেখে অগ্নি করিছে প্রবেশ!

ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে কীর্ত্তিবাসের মতে বাল্মীকি মুনির যমুনা-আশ্রম এবং চিত্রকূট পর্ব্বতে আর একটী তপঃকুঞ্জ ছিল, যাহা এই স্থান হইতে ছয় মাসের পথ।

কবিবর মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে তাঁহার পবিত্র আশ্রম গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল বলিয়াই কথিত হইতেছে। নিম্নে তাঁহার কাব্যের বঙ্গানুবাদ লিখিত হইল।

—"বিশালাক্ষী সীতা ধীমান্ সুমন্ত্র ও লক্ষণ সমভিব্যাহারে পাপহারিণী গঙ্গার তীরে অবতীর্ণ হইলেন।

* * * *

"অনন্তর লক্ষণ অর্দ্ধ দিবস গমন করিয়া ভাগীরথীর জলপ্রবাহ অবলোকন পূর্ব্বক দুঃখিত চিত্তে মহাশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।"(১৪—২৩)

ইহা কি ছাপাঘাটী হইতে গঙ্গা পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীর উপরিস্থিত স্থলপথে, তথা হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী বাল্মীকি-আশ্রমে আগমন করা বোধ হইতেছে না? যেখানে বালীঘাটা গ্রামে বর্ত্তমান বাল্মীকি-আশ্রম আছে উহা কি সেই ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী বাল্মীকি-আশ্রম নহে?

"লক্ষ্মণ পবিত্র গঙ্গাতীরে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং সাবধানে গঙ্গার পারে যাইতে লাগিলেন।"

ভাগীরথীও রামায়ণের অনেক স্থলে গঙ্গা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই ভাগীরথীর বা গঙ্গার পরপারেই বাল্মীকি-আশ্রম, পূর্ব্ব-দিক হইতে গঙ্গাপার হইলেই পশ্চিম দিকে বাল্মীকি-আশ্রম বালীঘাটা পাওয়া যায়। ছাপাঘাটীর মোহনা হইতে স্থলপথে ভাগীরথীর কূলে কূলে আসিয়া এখানে ভাগীরথী পার হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ সীতা সহ পদব্রজে এখানে আসিতে লক্ষ্মণের অর্দ্ধ দিবস লাগিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত অংশেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

এখানে আসিয়া লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে বলিতেছেন, "গঙ্গাতীরে মহর্ষিগণের এই তপোবন। ইহা অতি রমণীয় ও পবিত্র। মহাযশা মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি মদীয় পিতা মহারাজ দশরথের পরম বন্ধু। অতএব দেবি! আপনি সেই মহাত্মার পাদ-মূলে উপনীত হইয়া একাগ্রচিত্তে উপাসনা করতঃ সুখে বাস করুন।"

পরে সীতাকে বনবাস দিয়া লক্ষ্মণ অযোধ্যার রাজসভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীরামের চরণযুগল গ্রহণ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া একাগ্রচিত্তে করুণ স্বরে বলিলেন, "আর্য্যের আজ্ঞানুসারে জনকদুহিতাকে গঙ্গাতীর-সন্নিহিত যথোদ্দিষ্ট বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।"

অতএব মহর্ষি বাল্মীকির মতে সীতা গঙ্গা-তীরে তদীয় আশ্রমে রক্ষিতা হইয়াছিলেন, তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। কীর্ত্তিবাস কিন্তু অন্যপথে গিয়াছেন। কীর্ত্তিবাসের লেখা অপেক্ষা বাল্মীকির লেখাই সমধিক বিশ্বাস্য!

এইরূপ নানা দিক দিয়া দেখিলেও এই স্থানটী বাল্মীকি-আশ্রম নহে তাহা কি করিয়া বলা যায়? অন্যত্র তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম থাকিলেও উক্ত আশ্রমটী তাঁহার অন্য একটী তপস্যাশ্রম হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

শ্রীরামতারণ রায়।

দানপত্রাবলি

অস্মদ্দেশে বিদ্যা-ও-ধর্ম্ম-সংরক্ষণ-নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণের সমস্ত প্রয়োজনাদি পুরাকালে সমস্ত সমাজ কর্ত্তৃক কিরূপ ভাবে গভীর ভক্তির সহিত লোকহিতার্থ উহ্যমান হইত, তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। যদিও ঋষিগণাধ্যুষিত এই পুণ্য-দেশে কালপ্রবাহ সমাজ-রক্ষক ব্রাহ্মণগণের সহিত সমাজের সেই শুভবন্ধন ক্রমশঃ শিথিল করিয়া ভারত-সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধনই করিয়াছে, তথাপি সেই পুণ্য-প্রথার বিলোপসাধন-সংঘটন বর্ত্তমানে যেরূপ ঘৃণ্যাকার ধারণ করিয়াছে, কিছুদিন পূর্ব্বে, মুসলমানগণ এই দেশে আগমন করিবার বহুপরেও, সেরূপ অধোগতি প্রাপ্ত হয় নাই। ঐরূপ সময়েও অস্মদ্দেশীয় রাজন্যগণ যেরূপ ভাবে মুক্ত হস্তে কবি ও পণ্ডিতগণকে অর্থসাহায্য করিতেন, আমরা ক্রমশঃ কতকগুলি তাৎকালিক দানপত্র-সাহায্যে তাহা প্রতিপাদন করিব।

মহারাজ ভোজ ও তাঁহার পিতামহ

মহারাজ ভোজ ভারতের অতি প্রাচীন দানবীর ও বিদ্যোৎসাহী নৃপতি। যাহারা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, ভোজ-বৃত্তান্ত তাঁহাদের কাহারও অবিদিত নহে। এই ভোজরাজ সম্বন্ধে নানাভাবে নানারূপ কিম্বদন্তী অদ্যাপি প্রচলিত।

কোনও স্থানে ভোজরাজের এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়—ইনি মালবদেশের অধীশ্বর ছিলেন। ইঁহার রাজধানী ছিল সুপ্রসিদ্ধ ধারানগরী। ভোজরাজের প্রবল পরাক্রম সমস্ত দেশেই বিশ্রুত ছিল। মহাবীর মাহমুদ গজনী যখন কালঞ্জর অবরোধ করেন, সেই সময় ইনি যবন-সেনাকে পুনঃপুনঃ পরাভূত করিয়াছিলেন। চালুক্য-রাজগণ ইঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইনি তাঁহাদিগকে বারবার সমরে পরাস্ত করেন, কিন্তু ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে অবশেষে চালুক্য-রাজগণ গুজরাটরাজ ভীমদেবের সহিত মিলিত হইয়া মালব আক্রমণ করিলে ইনি যুদ্ধে পরাজিত হন। ধারানগরী ভীমদেবের হস্তগত হয়। ইনি শেষজীবনে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলেন। ১০৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি কাল-গ্রাসে পতিত হন।

রাজা ভোজ নানা গুণে ভূষিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ইঁহার নামও ভারতবর্ষের জনমাত্রেই অবগত ছিল। ইনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ও নিজে সুকবি ও সদ্-গ্রন্থকার ছিলেন। পাতঞ্জল-দর্শনের রাজ-মার্ত্তণ্ড-নামক ভোজরাজকৃত টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ অত্যন্ত আদরের সহিত অধীত হইয়া থাকে। অলঙ্কার, দর্শন, যোগ, স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা বিষয়ের বহুসংখ্যক গ্রন্থ ইঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বত্রিশসিংহাসন উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ভোজপ্রবন্ধ-নামক সংস্কৃতগ্রন্থে আমরা যেরূপ ভোজরাজের বিবরণ দেখিতে পাই, সংক্ষেপতঃ তাহা প্রদান করিতেছি।

ধারারাজ্যে সিন্ধুল নামক একজন রাজা ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে তাঁহার একটি পুত্র জন্মে;

তিনিই রাজা ভোজ। ভোজের যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন বৃদ্ধ সিন্ধুল নিজের আসন্ন মৃত্যু জানিতে পারিয়া অনুজ মুঞ্জকে রাজ্য অর্পণ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে কুমার ভোজকে সমর্পণ করেন। তাহার পর মুঞ্জ রাজ্য প্রতি-পালন করিতে থাকিলে, একদা একজন দৈবজ্ঞ ভোজকে দেখিয়া

"পঞ্চাশৎপঞ্চবর্ষাণি সপ্তমাস দিনত্রয়ং।
ভোজরাজেন ভোক্তব্যঃ সগৌড়ো দক্ষিণাপথঃ।"

এইরূপ নির্দ্দেশ করেন। এই দৈবজ্ঞোক্তিতে বিশ্বাস করিয়া রাজ্যলোভী মুঞ্জ ভোজের বধে কৃতসঙ্কল্প হন। তদনন্তর মুঞ্জের আজ্ঞায় কুমার ভোজ বধ্যভূমিতে নীত হইয়া পিতৃব্যের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিলেন এবং সেই সময় নিম্নের শ্লোকগুলি বলিয়াছিলেন :—

রামে প্রব্রজনং বলের্নিয়মনং
পাণ্ডোঃ সুতানাং বনং
বৃষ্ণীনাম্ নিধনং নলস্য নৃপতে
রাজ্যাৎ পরিভ্রংশনম্।
কারাগারনিষেবনঞ্চ বরণং সঞ্চিন্ত্য লঙ্কেশ্বরে
সর্ব্বং কালবশেন নশ্যতি নরঃ কো বা
পরিত্রায়তে॥

লক্ষ্মী কৌস্তুভ পারিজাত সহজঃ সূনুঃ
সুধাম্ভোনিধেঃ
দেবেন প্রণয়প্রসাদ বিধিনা মূর্দ্ধ্না ধৃতঃ
শম্ভুনা।
অদ্যাপ্যুজ্ঝতি নৈব দৈববিহিতং ক্ষৈণ্যং
ক্ষপাবল্লভঃ
কেনান্যেন বিলঙ্ঘ্যতে বিধিগতিঃ
পাষাণরেখা সখী॥

বিকটোর্ব্ব্যামপ্যটনং শৈলারোহণমপাং
নিধেস্তরণং।
নিগড়ং গুহাপ্রবেশো বিধিপরিপাকঃ
কথং ন সন্তার্য্যঃ॥

অম্ভোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং
ধূলিলবঃ শৈলতাং
মেরুর্মৃৎকুলতাং তৃণং কুলিশতাং
বজ্রং তৃণপ্রায়তাং।
বহ্নিঃ শীতলতাং হিমং দহনতামায়াতি
যস্যেচ্ছয়া
লীলাদুর্ললিতাদ্ভুতব্যসনিনে দেবায়
তস্মৈ নমঃ॥

এবং—

মান্ধাতা চ মহীপতিঃ কৃতযুগালঙ্কার-
ভূতো গতঃ
সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিতঃ
ক্বাসৌ দশাস্যান্তকঃ।
অন্যেচাপি যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ো যাতা
দিবং ভূপতে?
নৈকেনাপি সমং গতা বসুমতী মুঞ্জ ত্বয়া
যাস্যতি॥

এই শ্লোকগুলি বটপত্রে অঙ্কিত করিয়া ঘাতকের নিকট মুঞ্জকে প্রদান করিবার জন্য অর্পণ করেন। উক্ত শ্লোকগুলি কুমার ভোজের গভীর পাণ্ডিত্যের ও জ্ঞানের সাক্ষী-স্বরূপ, বিশেষতঃ চতুর্থ শ্লোকটী বড়ই হৃদয়-গ্রাহী!

তাহার পর নানা কারণে ঘাতক কুমারকে হত্যা না করিয়া কোন গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত রাখে এবং শিল্পীদিগের দ্বারা সুকুণ্ডল স্ফুরদ্বক্ত্র নিমীলিতনেত্র ভোজ-কুমার-মস্তক নির্ম্মাণ করাইয়া রাজার নিকট প্রেরণ করে। এইরূপে কুমার ভোজের জীবন রক্ষিত হয়। তদনন্তর মুঞ্জ আত্মদোষ বুঝিতে পারিয়া মর্ম্মাহত হন, এবং কুমারকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক বনগমন করেন। এই গেল ভোজের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা। ইহার পর আরও অনেক কথা বর্ণিত আছে।

প্রবন্ধ-বিস্তৃতিভয়ে তাহা আমরা উল্লেখ করিব না; তবে ভোজনৃপতির দানবীরতা ও বিদ্যোৎসাহিতা সম্বন্ধে দুই একটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

একদা শঙ্কর-নামক একজন প্রসিদ্ধ কবি ভোজরাজ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,

রাজন্নভ্যুদয়োঽস্তু।

রাজা—শঙ্কর কবে কিং পত্রিকায়াং লিখিতং

কবি—পদ্যং

রাজা—কস্য

কবি—তবৈব ভোজনৃপতে

রাজা—তৎ পঠ্যতাম্

কবি—পঠ্যতে

এতাসামরবিন্দসুন্দরদৃশাং দ্রাক্-
চামরান্দোলনাৎ।

উদ্বেল্লদ্ভুজবল্লিকঙ্কণঝনৎকারঃ
ক্ষণং বার্য্যতাম্॥

কবির এই কবিতায় মুগ্ধ হইয়া ভোজ রাজা দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার প্রদান করেন।

মহাকবি কালিদাসের সহিত ভোজ রাজার নানারূপ কবিতায় নানারূপ ভঙ্গীতে আলাপ হইত এবং কালিদাসের সহিত ভোজরাজের বিশেষ মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাও ভোজপ্রবন্ধে দৃষ্ট হয়।

একদা কয়েকজন পণ্ডিত নৃপতির নিকট কবিতা বলিয়া পুরস্কার লইবেন এই আশায় ভোজসভায় উপস্থিত হন, কিন্তু তাহারা তাদৃশ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের একজন রচনা করিলেন—

ভোজনং দেহি রাজেন্দ্র

আর একজন রচনা করিলেন—

ঘৃতসূপসমন্বিতং

উত্তরার্দ্ধ কাহারও স্ফূরণ হইল না, তখন কালিদাস—

মাহিষঞ্চ শরচ্চন্দ্রচন্দ্রিকাধবলং দধি

এইরূপ উত্তরার্দ্ধ পূরণ করিয়া দেন। তদনন্তর মহারাজ তাঁহাদের উক্ত কবিতা শ্রবণ করিয়া "উত্তরার্দ্ধস্য কিঞ্চিৎ দীয়তে ন পূর্ব্বার্দ্ধস্য" এই বলিয়া প্রভূত পুরস্কার প্রদান করেন।

বররুচি, বাণ, ময়ূর, রেবান, হরি, শঙ্কর, কলিঙ্গ, কর্পূর, বিনায়ক, মদন, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, তারেন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ ভোজরাজের সভায় ছিলেন। এরূপও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভট্টগোবিন্দ সুত প্রভৃতিকে যে সকল দানপত্র দিয়াছেন তাহাও ভোজরাজের দানশীলতার স্পষ্ট প্রমাণ। সে সকল দানপত্র আমরা পরে আলোচনা করিব।

ভোজরাজ সম্বন্ধে উল্লিখিত বিবরণ আমরা অবগত হইয়াছি, কিন্তু ভোজরাজের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সত্য তথ্য লুপ্ত ইতিহাসের তমোময় গর্ভে লুক্কায়িত। ভোজরাজের পিতামহ শৈববানৃপতি রাজদেবের একখানি দানপত্র হইতে তাঁহার বিবরণ আমরা কিছু জানিতে পারিয়াছি এবং সকলের অবগতির জন্য তাহারই সংক্ষিপ্তসার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

এই বাক্পতি রাজদেবের আর একটী নাম অমোঘবর্ষদেব। রত্নমালা-নামক গ্রন্থের প্রণেতা এক অমোঘবর্ষের পরিচয় আমরা পাই, যথা—

বিবেকাত্ত্যক্তরাজ্যেন রাজ্ঞেয়ং রত্নমালিকা।
রচিতামোঘবর্ষেণ বিদুষাং সদলঙ্কৃতিঃ॥

এই অমোঘবর্ষ ও ভোজপিতামহ অমোঘ-বর্ষ একই ব্যক্তি কি না, তাহা আমরা নিশ্চিত রূপে বলিতে পারি না। দশরূপাবলোকে চতুর্থ পরিচ্ছেদে—"প্রণয়কুপিতাং দৃষ্ট্বা দেবীং"

ইত্যাদি শ্লোক বাক্‌পতিরাজ প্রণীত বলিয়া সমুদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু আবার উক্ত পুস্তকেই উক্ত শ্লোকটী মুঞ্জরচিত বলিয়াও ধৃত হইয়াছে এবং পিঙ্গলসূত্রবৃত্তিতে হলায়ুধ—

ব্রহ্মক্ষত্রকুলীনপ্রলীন সামন্তচক্রনুতচরণঃ।
সকল সুকৃতৈকপুঞ্জঃ শ্রীমান্‌মুঞ্জশ্চিরং জয়তি॥
জয়তি ভুবনৈকবীরঃ সীরায়ুধতুলিতবিপুল-
বলবিভবঃ।
অনবরত বিত্তবিতরণনির্জ্জিত-চম্পাধিপো মুঞ্জঃ॥
স জয়তি বাক্‌পতিরাজঃ সকলার্থিমনোরথৈক-
কল্পতরুঃ।
প্রত্যর্থিভূত পার্থিব লক্ষ্মীহরণদুর্ললিতঃ॥

এইরূপে একই ব্যক্তিকে বাক্‌পতিরাজ ও মুঞ্জ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং আমাদিগের মনে হয় বাক্‌পতিরাজের মুঞ্জও একটী নাম ছিল, এবং ভোজপিতৃব্য মুঞ্জের নাম মুঞ্জ তাহার পিতৃনাম অনুসারে হইয়াছিল।

বাক্‌পতিরাজের দানপত্রের অনুবাদ

মঙ্গলাচরণ

শ্রীকণ্ঠের সেই সকল কঠোর কণ্ঠকান্তি আপনাদিগের মঙ্গল পোষণ করুন। যে গুলি মহাফণিগণের উদ্দৃপ্ত বিষানলের সহিত মিলিত হইয়া ধূম্রাকার ধারণ করিয়াছে, যে গুলি শিতিকণ্ঠের শিরোদেশে বিলসিত শশিকলার সহিত সম্মিলিত হইয়া রাহুর অনুকরণ করিতেছে, ও যে গুলি গিরিরাজ-দুহিতৃ-কপোল-লুলিত হইয়া কস্তুরীর বিভ্রম প্রকাশ করিতেছে।

মুররিপুর রাধা-বিরহাতুর শীর্ণবপু আপনাদিগকে রক্ষা করুন। লক্ষ্মীবদন-চন্দ্রমা যে বপুকে "সুখিত" করিতে পারে নাই, জলনিধির জল যাহাকে শীতল করিতে পারে নাই, স্বকীয় নাভি-সরসী-পদ্মের দ্বারাও যাহা শান্তি লাভ করে নাই, এবং অনন্তের সহস্র-ফণা-নির্গত শ্বাসও যাহাকে আশ্বাসিত করিতে পারে নাই।

পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণরাজদেবের পদধ্যানপরায়ণ, পরম··· ··· শ্রীবৈরিসিংহদেব পাদধ্যানপরায়ণ, পরম··· ··· শ্রীসীয়কদেব পদধ্যানপরায়ণ, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীমৎ অমোঘবর্ষ-দেবাপরনামক শ্রীমদ্বাক্‌পতিরাজদেব পৃথ্বীবল্লভ শ্রীবল্লভ নরেন্দ্রদেব কুশলাবস্থায় শ্রীনর্ম্মদাতটে পিপ্পরক নামক তড়ারে সমুপাগত সমস্ত রাজপুরুষদিগকে ব্রাহ্মণোত্তর প্রতিবাসী পট্ট-কিলজনপদাদিকে জানাইতেছেন—আপনারা জানুন যে স্থানের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সীমা—

পূর্ব্বদিকে অগারবহলা সীমা, উত্তর দিকে চিখিল্লিকাশংকগর্ত্ত, পশ্চিমে গর্ভনদী, দক্ষিণে শ্রীপিশাচদেবতীর্থ, এইরূপ চতুঃপার্শ্বসীমাবিশিষ্ট তড়ার-নামক স্থান বর্ত্তমান ১০৩১ সংবৎসরে ভাদ্রের শুক্লচতুর্দ্দশীরূপ পবিত্র পর্ব্বাহে শিব-তড়াগ জলে স্নানান্তর চরাচরগুরু ভগবান্ ভবানীপতিকে অর্চ্চনা করিয়া সংসারের অসারতা জানিয়া—

"বাতাভ্রবিভ্রমমিদং বসুধাধিপত্য-
মাপাতমাত্রমধুরো বিষয়োপভোগঃ।
প্রাণাস্তৃণাগ্রজলবিন্দুসমানরাণাম্
ধর্ম্মঃ সখা পরমহো পরলোকযানে॥
ভ্রমৎসংসারচক্রাগ্রধারা ধারামিমাং শ্রিয়ম্।
প্রাপ্য যেন দদুস্তেষাম্ পশ্চাত্তাপঃ পরং ফলং॥

এইরূপ জগতের সমস্তকে বিনশ্বর উপলব্ধি করিয়া উপরিলিখিত তড়ার, সীমা তৃণকাষ্ঠ যুতিগোচর পর্য্যন্ত সহিত, বৃক্ষমালা সহিত, স্বর্ণস্থান সহিত, পরিকর সহিত, সর্ব্ব আদায় সহিত, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন শ্রীধনিক পণ্ডিত

পুত্র শ্রীবসন্তাচার্য্যকে মাতাপিতার এবং নিজের পুণ্য-যশের বর্দ্ধনের নিমিত্ত, অদৃষ্টফল স্বীকার করিয়া, যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য-পৃথিবী থাকিবে, ততদিনের জন্য, পরমভক্তিপূর্ব্বক দান-পত্র সহকারে উৎসর্গীকৃত হইল—ইহাই মনে করিয়া উক্ত স্থাননিবাসী জনগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট দেয় কর ও সুবর্ণাদিসমূহ, মদাজ্ঞা-বশবর্ত্তী হইয়া, উক্ত বসন্তাচার্য্যের নিকট উপনেয়।

এই পুণ্যফলকে সামান্য মনে করিয়া, আমার উত্তরবংশীয় নৃপতিগণ, আমার প্রদত্ত এই ধর্ম্মাদায় অনুমোদন ও পালন করিবেন।

ইহার পর পুনরায় কতকগুলি শ্লোক আছে। সেই শ্লোকগুলি প্রতিদান-পত্রের শেষেই উল্লিখিত হয় বলিয়া অপ্রয়োজন-বোধে উল্লেখ করিলাম না। এই দানপত্রের তারিখ সং ১০৩১ ভাদ্রপদ সুদি ১৪ শুক্র চতুর্থী।*

হস্তাক্ষরও স্বয়ং বাকপতিরাজের।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভক্ত রবিদাস †

ভক্ত বলিয়াছেন, "আমি দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিলাম, কিন্তু আমারই বুদ্ধির দোষে এই জীবন বৃথা হইয়া গেল। ভগবানে যদি আমার রতি না জন্মিল, তাহা হইলে আমি ইন্দ্রের সিংহাসন পাইলেই কি কিংবা রাজ-প্রসাদ লাভ করিলেই বা কি? হায়, সমস্ত সুখলালসা ভুলিয়া আমি নাম-রসে মজিতে পারিলাম না। যাহা আমার জানা উচিত ছিল, তাহা জানিলাম না, আমি উন্মত্ত হইয়াছি, যাহা আমার চিন্তনীয় তাহা ভাবিলামই না,

* এই দানপত্রের [illegible] অনেকস্থানে [illegible]

উক্ত রাজবংশাবলি

শ্রীকৃষ্ণ রাজদেব	ভোজ রাজদেব
শ্রীবৈরিসিংহদেব	উদয়াদিত্য
শ্রীসীয়ক দেব	নরবর্ম্ম
শ্রীবাক্‌পতি দেব	যশোবর্ম্মা
	অজয়বর্ম্মা
শ্রীসিন্ধুরাজ দেব	বিন্ধ্যবর্ম্মা
	সুভট বর্ম্মা
শ্রীভোজরাজ দেব	অর্জ্জুন ভূপতি

† ব্রহ্মবাদী হইতে উদ্ধৃত।

ওদিকে আমার দিন তো শেষ হইয়া আসিল ! হায়, ভাবি এক, করি আর ; সাংসারিক সুখ-কামনা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল ! হে প্রভো, তোমার দাসের হৃদয় এই বেদনায় কাতর হইয়াছে। তুমি তোমার দাসকে দূরে রাখিয়া দুঃখ দিও না, তাহাকে করুণা কর।"

এই উক্তিটির মধ্যে পরম ভাগবত রবিদাসের সাধন-জীবনের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। সাধু রবিদাসের বাসভূমি কোথায়, কে তাঁহার পিতা, কে তাঁহার মাতা আমরা তাহা অবগত নহি। সে সংবাদ না জানিয়া আমাদের কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মহাত্মা কবীর সাধুবন্দন-কালে বারংবার বলিয়াছেন, সাধুদের মধ্যে সাধু রবিদাস। ভক্ত রবিদাস ভক্ত-সমাজের বন্দনীয় পরম ভক্ত, ইহাই তাঁহার যথার্থ পরিচয়। তিনি, যে পিতার ঘরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই ঘরে দীর্ঘকাল বাস করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই, তিনি স্বভাবতঃ বিরাগী ছিলেন এবং সাধুর পরিতোষের নিমিত্ত মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন বলিয়া তাঁহার সংসারী পিতা তাঁহাকে স্বগৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি বাসের নিমিত্ত একখানি কুটীর পাইলেন মাত্র, পিতার ধন-সম্পদের অংশ হইতে বঞ্চিত হইলেন।

ইহাতে রবিদাসের কোন দুঃখ হইল না, সম্পদের প্রতি তাঁহার কখনও লোভ ছিল না। তিনি জাতিতে মুচি ছিলেন। প্রত্যহ দুই জোড়া পাদুকা প্রস্তুত করিতেন, এক জোড়া বিনা মূল্যে সাধু-বৈষ্ণবের চরণে পরাইয়া দিতেন, অপর জোড়া বিক্রয় করিয়া যাহা পাইতেন তদ্দ্বারা প্রসন্নচিত্তে সস্ত্রীক দিনাতিপাত করিতেন। তা'ছাড়া তিনি বৈষ্ণবের ফাটা জুতা বিনা পয়সায় মেরামত করিয়া দিতেন। শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থের অনুবাদক শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"দুই জুড়ি জুতা প্রতি দিন বানাইয়া
এক জুড়ি দেন তিনি বৈষ্ণব দেখিয়া
এক জুড়ি বেচি করে দেহ-নির্ব্বাহণ
বৈষ্ণবের ফাটা জুতা বানাইয়া দেন।"

বাহিরের এই দীন-দরিদ্র মানবটি অন্তরের সম্পদে কত বড় ধনী ছিলেন, পাপতাপ-দম্ভা-হঙ্কারকলুষিত সাধারণ মানব তাহা বুঝিবে কেমন করিয়া ? রত্নের মূল্য বোঝে সে, যে প্রকৃত জহুরী। এইরূপ কথিত আছে যে, সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া মহাত্মা রামানন্দ ভাবাবেশে উন্মুক্ত পথে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমাঞ্জনলিপ্ত দিব্য নয়নে অনেক শক্তিশালী ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছিলেন। রবিদাস ইহাদের অন্যতম। রবিদাস তাঁহার কুটীরের সম্মুখস্থিত রাস্তার আবর্জ্জনা ঝাঁট দিতেছিলেন, এমন সময়ে পথিক সাধু রামানন্দ তাঁহাকে হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কে ?" বিস্মিত রবিদাস তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "আমি এক অধম মুচি।" রামানন্দ কহিলেন, "তোমাকে সাধনা করিতে হইবে।" রবিদাস কহিলেন "আমি অতি নীচ, আমার পক্ষে কি ইহা সম্ভব ?" রামানন্দ কহিলেন "দেখ, রবিদাস, তোমাকে কেবল মাত্র বাহিরের রাস্তার আবর্জ্জনা ঝাঁট দিলে চলিবে না, ধর্ম্মের পথে অনেক জঞ্জাল জমিয়া উঠিয়াছে, সাধনাদ্বারা তোমাকে সেই জঞ্জাল দূর করিতে হইবে—তুমি আর বিলম্ব করিও না, তোমার ডাক পড়িয়াছে।" সম্ভবতঃ পরম ভাগবত রামানন্দের প্রেমকিরণ-সম্পাতে রবিদাসের চিত্ত-শতদল এই সময়ে বিকশিত হইয়াছিল। চুম্বকস্পর্শে লৌহ চুম্বকত্ব লাভ করিয়াছিল।

রবিদাসের বাহিরের জীবন-কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত। ভগবানের গভীর ধ্যানে ও সাধু-সেবায় তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত। দরিদ্রতা তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইল। কষ্টে-স্যষ্টে কোন মতে তাঁহার জীবিকা চলিয়া যাইত। ভগবানের অনুগ্রহে উপবাস করিতে হইত না, এই মাত্র। এই দীন দরিদ্র যে ভগবানের অতি প্রিয়পাত্র, লোকে তাহা জানিত না, সাধারণ লোকে তাঁহাকে উপেক্ষাই করিত। শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

"রুই দাস বলি নাম লোকেতে কহয়।
হরির কৃপার পাত্র কেহ না জানয়।"

পরীক্ষার তীব্র অনলে পোড়াইয়া ভগবান্ তাঁহার ভক্তের প্রেম বিশুদ্ধ করিয়া থাকেন। ভক্ত রবিদাসকেও সেইরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এক দিন এক সাধু তাঁহার ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিলেন, রবিদাস সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার সেবা করিলেন। সাধু একখণ্ড স্পর্শমণি বাহির করিয়া তাহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া রবিদাসকে উপহার দিতে চাহিলেন; তিনি কিছুতেই সেই দান গ্রহণ করিবেন না, সাধুও ঐ স্পর্শমণি তাঁহাকে না দিয়া ছাড়িবেন না। অবশেষে রবিদাস বিরক্তিসহকারে কহিলেন "আপনার অভিরুচি হইলে আপনি উহা ঐ চালের তৃণের মধ্যে গুজিয়া রাখিয়া যান।" রবিদাস মণি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি একটি সঙ্গীতে কহিয়াছেন—"ভগবানের নামই তাঁহার সেবকদিগের পরম সম্পদ; সেই সম্পদ দিনের পর দিন বাড়িতে থাকে, কিছুতেই তাহার ক্ষয় হয় না। কি দিনে কি রাত্রে কেহ ইহা হরণ করিতে পারে না। এই সম্পদের যিনি অধিকারী, তাঁহার কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই, তিনি নিরাপদে আপন ঘরে ঘুমাইতে পারেন। হে পরমেশ্বর, যাঁহাকে তুমি এই ধনের অধিকারী করিয়াছ, মণিতে তাঁহার কোন্ প্রয়োজন?" এই প্রসঙ্গে শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থে মন্তব্য করা হইয়াছে—

"প্রেমানন্দ-রঙ্গে যেই মগন আছয়।
প্রাকৃত মণিতে কি তাহার মন ভায়॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অষ্টাদশ সিদ্ধি।
দৃক্‌পাত না করে যাথে অতি তুচ্ছ বুদ্ধি॥
সে কি বস্তু জ্ঞান করে পরশরতন।
নিত্যানন্দে পূর্ণ যার সদানন্দ মন॥"

তের মাস পরে সেই সাধু রবিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন রবিদাসের দারিদ্র্য বিন্দুমাত্র দূর হয় নাই, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় কাঙ্গালই আছেন। তিনি রবিদাসকে প্রশ্ন করিলেন "সেই স্পর্শমণি কি করিয়াছ?" রবিদাস কহিলেন—"আমি উহা স্পর্শ করিতে ভীত, আপনি উহা যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন সেইখানেই আছে।" সাধু বিস্মিত হইলেন, তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন রবিদাসের হৃদয়ে ধনলালসা কিছুতেই স্থান পাইতে পারে না।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে, রবিদাস এক দিন ঠাকুরের আসনতলে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিলেন; তিনি ঐ অর্থের কি করিবেন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে ভগবানের আদেশে ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব-সেবায় ব্যয় করেন। এই সময়ে তিনি এক ধনী ভক্তের নিকটে প্রভূত অর্থ পাইলেন এবং উক্ত অর্থদ্বারা তিনি ঠাকুর-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যহ বৈষ্ণব-সেবার ব্যবস্থা করিলেন। রবিদাসের দারিদ্র্য দূর হইল। তাঁহার পুণ্য-ভবনে এখন—

"সদা গান নৃত্য বাদ্য যাত্রা মহোৎসব।
কৃষ্ণকথা বিনে আর নাহি অন্য রব॥"

সাধনে ভজনে কীর্ত্তনে ধ্যানে মহোৎসবে রবিদাসের দিন কাটিতে লাগিল। রবিদাসের এই হঠাৎ বৃদ্ধি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দাম্ভিক ও জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণের দল এই মুচির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণদল কাশীর রাজার নিকটে রবিদাসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থাপন করিল যে—মুচি হইয়া সে স্বহস্তে ঠাকুর পূজা করে; শাস্ত্রানুসারে সে এই অধিকার পাইতে পারে না এবং এই দাম্ভিকতার জন্য তাহার দণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য।

রবিদাস কাশীর রাজার সমীপে আহূত হইলেন। তিনি অসঙ্কোচে অবিচলিত ভাবে আপন মত নিবেদন করিলেন; তাঁহার যুক্তি-যুক্ত বাণী শ্রবণ করিয়া কাশীরাজ তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া অব্যাহতি দিলেন। অভিমানী ব্রাহ্মণদলের চাতুরী ব্যর্থ হইল।

রবিদাসের খ্যাতি শুনিয়া চিতোরের রাণী ঝালি ভক্তিনম্রচিত্তে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সাধুকে দর্শন করিয়া রাণীর চিত্ত দ্রব হইল এবং তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। রাণী ঝালি স্বামী ও অনুচরগণ সহ তীর্থযাত্রায় কাশীধামে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহচর ব্রাহ্মণগণ রাণীর চিত্তবৈকল্য দর্শনে একান্ত বিস্মিত হইল এবং মুচি-সন্তান রবিদাসের নিকট তাঁহাকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে বারংবার বারণ করিতে লাগিল। রাণী তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না, তিনি কহিলেন—"যিনি শ্রীহরির শ্রীচরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাকে নীচ বলিলে অপরাধ হয়। সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত আছে হরিভক্ত চণ্ডালও ভুবনপাবন।" ব্রাহ্মণ অনুচরগণ রাণীর বিরুদ্ধে রাণার নিকটে অভিযোগ করিলেন। রবিদাস রাণাকে এই একটী মাত্র বাক্য বলিলেন—"ভগবান মানুষের হৃদয় দেখেন, জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না।" রাণা রবিদাসের সাধুতায় মুগ্ধ হইলেন। রাণী রবিদাসের আনুগত্য স্বীকার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

রবিদাস তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তিপ্রভাবে প্রাণমন ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া তাহাকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তিনি যাহা লাভ করিয়াছিলেন তাহার নিকটে স্পর্শমণি অতি নগণ্য। তিনি বলিতেন— "তোমাতে আমাতে কি প্রভেদ? তুমি সুবর্ণ, আমি কঙ্কণ; তুমি জল, আমি তরঙ্গ।" রবিদাসের অমূল্য বাণী ও সঙ্গীত মানবের চিত্তের অন্ধকার ও সংশয় দূর করে। তাঁহার বহু সঙ্গীত (শব্দ) শিখদের ধর্ম্মপুস্তক গ্রন্থ-সাহেবে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীশরৎকুমার রায়।

প্রেসের চাকুরী ও শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়

বহুদিন পূর্ব্বে ভারতগবর্ণমেণ্টের সুবৃহৎ প্রেসের অধ্যক্ষ মিঃ উইলিয়ম্ রস্ দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,

"In Europe, typographic printing is considered a highly respectable profession, and youths who enter

it have generally received a fair education. But this is not the case in India, where natives who have been educated in the English language prefer to work as Copying Clerks on small salaries rather than become Compositors and earn better wages."

অর্থাৎ ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য অতি সম্মানজনক কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বহুশিক্ষিত যুবক এই বিভাগে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যে সকল এদেশবাসী ইংরাজীভাষা শিক্ষা করে, তাহারা অত্যল্প বেতনে সামান্ত কেরাণীগিরি খুব পছন্দ করে, কিন্তু কম্পোজিটার হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে সম্মত নহে। সেইজন্য এদেশে ব্যবসায়ের উপযুক্ত লোক পাওয়াও অত্যন্ত কঠিন।

সে আজ অনেক দিনের কথা। মিঃ রসের মন্তব্য প্রকাশের পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও কেহ এদেশে ছাপাখানায় চাকুরী করে শুনিলেই তাহাকে আমরা বিদ্যালয়-তাড়িত লক্ষ্মীছাড়া মনে করি ও সর্ব্বথা কৃপার পাত্র অনুমান করিয়া লই। এই অর্দ্ধশতাব্দীতে অন্যান্য দেশের কত উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু অমন একটা বিষয় আজিও আমাদের চক্ষে কত হেয় হইয়া রহিয়াছে। ছাপাখানার অপরাধ কি? ছাপাখানার কাজ এত নিন্দিত কেন?

মুদ্রাযন্ত্র শিক্ষাবিস্তারের প্রধান সহায়। সে একদিন ছিল, যখন লোকে চিরজীবন বসিয়া একখানা পুস্তক কণ্ঠস্থ করিত। মুখে মুখে যে বিদ্যার প্রচার, তাহার অনুশীলন বহু কালসাধ্য ও অনেকস্থলে ব্যয়সাধ্যও বটে। পরন্তু অনেক বিদ্যার্থী এক সময়ে এক পুস্তক পাঠ করিতে পারে না। তৎপর কালসহকারে একই গ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষের রুচি অনুসারে পরিবর্ত্তনের জন্য বহু পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। মুদ্রিত পুস্তকে এ সকল দোষ ঘটিতে পারে না। তুলট কাগজে বা তাল-পত্রে লিখিত সাংখ্য, পাতঞ্জল, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজি কেবল এক শ্রেণীর লোকেরই অধিগম্য ছিল। ভারতবর্ষের যাহা লইয়া গৌরব, ভারতীয় মনীষিগণের সাধনার যাহা অত্যুৎকৃষ্ট ফল, যে সকল মহারত্নের নিমিত্ত ভারতবর্ষের নাম পৃথিবীর সুধীসমাজে আদৃত, সেই সুবৃহৎ জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি কেবল এক সম্প্রদায়ের হস্তেই আবদ্ধ ছিল। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় ও ইউরোপীয় প্রভাবের অনুগ্রহে প্রাচীন হিন্দুর বেদ-বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যেন নূতন আলোকে ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের কি ছিল, পৃথিবীর অন্য জাতির সহিত আমাদের কি পার্থক্য বুঝিতে পারিতেছি; এক্ষণে যাঁহার যে বিষয় ইচ্ছা অনায়াসে পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছেন।

মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা দেশ কতদূর উপকৃত হইয়াছে, এ বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখা যাইতে পারে। এ স্থানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এ দেশের এমন গ্রাম অল্পই আছে, যেখানে একখানিও মুদ্রিত পুস্তক দৃষ্ট হইবে না। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে জনসাধারণে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বহু ভাবে বহু চেষ্টা হইতেছে। আমাদের ছাপাখানার অবস্থা যত ভাল হইবে, যত অল্পমূল্যে পুস্তক ছাপাইয়া সাধারণে প্রচার করা যাইবে, দেশের পক্ষে

তাহা ততই মঙ্গলজনক হইবে। শিক্ষায় বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হয়, চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়; সদসদ্‌বিচার-ক্ষমতা জন্মে। দেশের লোক যত অধিক শিক্ষালাভ করে, দেশের পক্ষে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ততই শুভসূচক। এ বিষয়ে. মুদ্রাযন্ত্র প্রচুর পরিমাণে সহায়তা করিতে সমর্থ।

যে সকল বাঙ্গালী যুবক বি. এ. পাস করেন তাঁহারা প্রায় সকলেই আইন পড়িয়া উকিল হইয়া থাকেন। আজিকালি প্রতি জেলার বারেই (Bar) স্থানাভাব, তথাপি ইউনিভার্সিটি ল কলেজ প্রভৃতি আইন কলেজগুলি হইতে দ্বিসহস্রাধিক ছাত্র আইনের উপাধির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। যাঁহারা উকিল হইবেন না, তাঁহারা শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। যে কার্য্য শ্রমসাধ্য, যাহাতে আরামের সম্ভাবনা অল্প, এমন কর্ম্ম-গ্রহণে ইঁহাদের কিছুমাত্র স্পৃহা দেখা যায় না।

মহাজনগণের অবলম্বনীয় পথই প্রকৃত পথ শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে মহাজনগণ গতানুগতিক হওয়াতে, এক পথে বড় অধিক ভিড় হইয়াছে। চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আরও দুইচারিটি নূতন পন্থা আবিষ্কার করা প্রয়োজন হইয়াছে। এই অসুবিধার সময়ে মুদ্রণবিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিলে অনেক শিক্ষিত যুবকেরও অন্নের সংস্থান হয়, সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানার চাকুরীরও অখ্যাতি দূর হয়।

এক্ষণে বড় বড় প্রেসে কর্ম্মচারিগণের জন্য যে নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, তাহা দেখিয়া কোন শিক্ষিত ব্যক্তি এই বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিতে সাহস পান না। এখানে প্রাতঃকালে সাড়ে সাতটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত রীতিমত অবিশ্রান্ত কায হয়, মধ্যে অতি অল্পক্ষণের জন্য টিফিনের ছুটি হয় মাত্র। সাধারণ নিয়ম দশটা হইতে পাঁচটা। এই সময়ের অতিরিক্ত যাহারা কাজ করে, তাহারা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পায়। এতদ্ভিন্ন যখন “মরসুম” পড়ে, তখন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাজ চলে, কখনও কখনও সমস্ত রাত্রিই অতিবাহিত হইয়া যায়। সাধারণ মনুষ্যদেহে এরূপ ভয়ানক পরিশ্রম সহ্য হওয়া অসম্ভব। কাজেই শরীর যখন গুরুতর শ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, অথচ তখনও বহুকার্য্য করিতে হইবে, তখন তাহাকে অস্বাভাবিক উপায়ে উত্তেজিত করিবার প্রয়োজন হয়। ফলে অনেকেই মদ্যাদি পান আরম্ভ করে। তাহার কি বিষময় ফল হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহার উপর কথায় কথায় অর্থদণ্ড, বেতন-কর্ত্তন, লঘুপাপে গুরুদণ্ড, বিতাড়ন। ছুটি নাই। অবিশ্রান্ত অত্যধিক পরিশ্রমে জীবনী-শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়, নানারূপ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি শরীর অধিকার করিয়া বসে। দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষিত ব্যক্তি দূর হইতেই ছাপাখানাকে নমস্কার করিয়া অন্যপথ ধরেন।

এই সকল নিয়মের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টের কৃপায় Factory Actএর অনুগ্রহে আজিকালি রবিবার কাজ করিতে হয় না। ঐ একটি দিনের বিশ্রাম কর্ম্মক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত শরীরে নববল আনয়ন করে। ছাপাখানার এই সকল অসুবিধার প্রতি আমরা সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমাদের দেশে প্রথমে যখন ছাপাখানা খোলা হইয়াছিল, তখন যে শ্রেণীর লোক

ইহাতে কাজ করিত, তৎকালে দেশে শিক্ষার প্রচলন তেমন না থাকায়, তাহারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য তেমন বুঝিত না, সেই সকল ব্যক্তির নিকট হইতে যথাযথ কাজ আদায় করিতে যাইয়া কর্তৃপক্ষ অনেক সময়ে কঠিনতা অবলম্বন করিতেন। কিন্তু দেশে শিক্ষা-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যে পূর্ব্ব নিয়মের পরিবর্ত্তন আবশ্যক, কেহ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন না। ফলে, একই শ্রেণীর লোক ছাপাখানায় কাজ করিতে লাগিল। দেশের যাঁহারা শিক্ষিত ভদ্রসন্তান তাহারা ওদিকই ছাড়িয়া দিলেন। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক লইয়া কার্য্য করায় প্রভেদ অনেক। শিক্ষিত ব্যক্তি যাহা অনায়াসে সম্পন্ন করেন, অশিক্ষিত ব্যক্তির তাহাই বুঝিতে বহু সময় ব্যয়িত হইয়া যায়। তৎপর উভয়ের কার্য্যের ফলেরও তারতম্য দৃষ্ট হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিকে বাদ দিয়া প্রেস কিরূপে সমধিক লাভবান্ হইবে বুঝিতে পারি না।

এক্ষণে যাহারা প্রেসে কাজ করে, তাহারা জানে যে চেষ্টা করিলেও বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। গৃহে অভাবও কমিবে না, হাতে টাকাও জমিবে না—কোনও ক্রমে দিন কাটিয়া গেলেই হইল। এ সব লোকের জীবন এক ভাবেই কাটে। নতুবা মন যাহার সবল, পরিশ্রমে যে কাতর নহে, কর্ত্তব্যসাধনে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বহু লোক লইয়া কাজ করিয়াছি, বহু লোকের সহিত কাজ করিতেছি, নিজের বলিয়া কাজ করিতে দুই একজনকে দেখিয়াছি মাত্র। তাহাদের উন্নতিও হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দোষের অবধি নাই। যে একটু শিখিল, একটু কাজের লোক হইল, অমনি তাহার মেজাজ বদলিয়া গেল, শ্রমবিমুখতা আসিল, বিলাসিতা দেখা দিল, উন্নতির আশারও অবসান হইল।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট আমরা ইহার বিপরীত আশা করি। তাঁহারা উন্নতি চাহেন না; কিন্তু শ্রম ভিন্ন যে কোন কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না, ইহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। যিনি উন্নতি-প্রয়াসী, যিনি সমাজে বড় হইতে চাহেন, যিনি দশের একজন হইবেন বলিয়া মনে মনে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে হইবে। শ্রমবিমুখ ব্যক্তি সংসারে কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারে না। পৃথিবীতে কর্ম্মবীর বলিয়া যাহাদের নাম প্রখ্যাত, তাহারা সকলেই নিরালস্য, কষ্টসহিষ্ণু ও শ্রমপটু।

আমাদের জাতীয় জীবন বহু দোষ-ত্রুটিতে পরিপূর্ণ। সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রতি আমাদের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। ব্যবসায়ীর নিকট "Time is Money," ইহা আমরা মোটেই বুঝি না। চরিত্রবান্, নিরালস্য ও কষ্টসহিষ্ণু শিক্ষিত যুবকগণ ছাপাখানায় কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনার ভাবিয়া কর্ম্ম করিলে তাঁহাদেরও উন্নতি হইবে, ছাপাখানার কর্ম্মের যে নিন্দা তাহাও দূর হইবে।

এ স্থলে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, মুদ্রাযন্ত্রের কি উপকারিতা, ইহাদ্বারা দেশ কি পরিমাণে উপকৃত, তাহা আমাদের কখনও বিবেচনা করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। নতুবা কত Technical School, Short-hand Typewriting School, কত Medical School দেশে স্থাপিত হইয়াছে; পরন্তু প্রেসের কায, যাহার এত উপকারিতা, এত প্রয়োজনীয়তা তাহা শিখিবার আমাদের কোন ব্যবস্থা নাই। এদিকে আজ পর্য্যন্ত কাহারও দৃষ্টিও আকৃষ্ট হইল না!

শুনিতে পাই আমাদের ভিতরে অনেকের ব্যবসায়-কুশলতা আছে। এই মুদ্রণ-ব্যবসায়ে কুশলী বাঙ্গালাতে ত কাহাকেও দেখিতে পাই না। বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত প্রেসের সংখ্যা কলিকাতায় ও সমগ্র বঙ্গদেশে অসংখ্য। একটাও ভাল হৌক। আমরা একটা ভাল ছাপাখানার দিকে তাকাইয়া তুষ্টি লাভ করি। দুই একটি ভিন্ন আমাদের প্রায় সমস্ত ছাপাখানারই অবস্থা শোচনীয়। যেন কোনরূপে দিন কয়েকটা কাটিয়া গেলেই হইল। আমরা যাহা বলি তাহা করি না। আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পৌছিতে আমাদের ধৈর্য্য থাকে না। অনেক আয়োজন করিয়া অগ্রসর হই, দুইচারি পা পরেই সব উদ্যম ও কর্ম্মপটুতা বাষ্প হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়। কত রকমের হ্যাণ্ডবিল ও বিজ্ঞাপন দ্বারা কি করিব পূর্ব্বেই প্রচার করিয়া দিই, অথচ কখনও প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হই না। বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত প্রেসগুলি দেখিলেই এ সকল কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। (ক্রমশঃ)

প্রেসের এক কর্ম্মচারী।

বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা

যে দিন হইতে আমরা বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরানুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই দিন হইতে আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে। পরানুকরণ করিতে গিয়া বিদেশীয় জাতিগণের গুণগুলি ত গ্রহণ করিতে পারিই নাই—লাভের মধ্যে স্বকীয় জাতীয় জীবনের বিকাশের ধারা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছি। কৃষিকে "চাষার কাজ" মনে করিয়া, শিল্প ও ব্যবসায়কে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক গবেষণাকে অসম্ভব ঠাওরাইয়া, দর্শন ও সমাজতত্ত্বে কাণ্ট-স্পেন্সারের মতবাদের উপর কলম-চালানকে "বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দেওয়া ভাবিয়া"—একমাত্র কেরাণীগিরির লেখনীপেষাকেই জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞানে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি। জাতির জীবন যেন আফিস-আদালতেই, মানুষের মনুষ্যত্ব যেন বৈঠক-ঘরের বিস্রম্ভালাপেই, ভদ্রলোকের ভদ্রতা যেন গাত্রফুৎকারে আর উচ্চনীচ ভেদজ্ঞানে। অবশেষে নিতান্তই নিরুপায় হইয়া আমাদিগকে গৃহাভিমুখী হইতে হইয়াছে। সুখের বিষয় এখন আমরা জীবনের কর্ম্মগুলিকে কর্ত্তব্য-বোধে সমাদর করিতে শিখিতেছি—বিভিন্ন ক্ষেত্রে একক ও মিলিতভাবে নানা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি; দেশের কাজে বিদ্বান্ ও ধনবান্ নিজ নিজ সম্বল বিদ্যা ও ধন উৎসর্গ করিতেছেন। কিন্তু তথাপি, শিক্ষা-বিষয়ক বিবিধ স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সমাজের বিবিধ অভাব মোচন জন্য ও দেশবিদেশলব্ধ বিচিত্র জ্ঞান ও কর্ম্মরাশিকে বিশাল সমাজশরীরে সঞ্চিত রাখিবার জন্য উপযুক্ত উদ্যম দেখা যায় না। দেশের অসংখ্য লোক মৃত শিল্প ও নীরস মাটি কামড়াইয়া থাকিয়া শীর্ণদেহে ও জীর্ণপ্রাণে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায় কোমর বাঁধিয়া উঠিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ইহার একমাত্র প্রতীকার শিক্ষার সাধনা ও প্রচার—শিল্পশিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, ব্যবসায়শিক্ষা,

বিজ্ঞানশিক্ষা, সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা। অনেক সময় শিক্ষার বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে অস্পষ্ট জ্ঞান ও ভ্রান্ত ধারণাও আমাদের অধিকাংশ শ্রম পণ্ড করিয়া দেয়। সুতরাং আজকাল এ সব বিষয়ে যত দিক দিয়া যত প্রকারের আলোচনা হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আশা করি, দেশহিতেচ্ছু শিক্ষা-প্রচারকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার দুই দিক

কৃষিশিক্ষা নাম দিয়া এই যে আমরা একটী স্বতন্ত্র বিষয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি, তাহার দুইটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, বালকগণের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিবিধানের জন্য অদ্যাবধি বিদ্যালয়ে যে সমস্ত বিষয় অবশ্যপাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিরই কিছু কিছু উপকরণ কৃষিসংক্রান্ত বিষয়গুলিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ কৃষিশিক্ষা দ্বারা বহুল পরিমাণে সাধিত হইতে পারে। এখানে আমাকে কেহ যেন ভুল না বুঝেন—কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি আর আর বিষয়গুলিকে বিদ্যালয়ের চতুঃসীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, অথবা তাহাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়া একমাত্র কৃষিশিক্ষারই একাধিপত্যের কথা বলিতেছি। না—আমার সে মতলব আদৌ নাই। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে সমাজের বহু অভাব মোচিত হইতে পারে। কৃষিই পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের—জীবন ধারণের প্রথম ও প্রধান উপায় এবং কৃষিই অন্যান্য শিল্পবাণিজ্যের ভিত্তি। সুতরাং ইহার উন্নতিসাধনপূর্ব্বক সমাজের বহু অভাব মোচন করিতে হইলে, অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার ন্যায় বিদ্যালয়ে ইহারও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

(ক) কৃষিবিজ্ঞান ও সাধারণ শিক্ষা

প্রথমে প্রথম কারণটী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্—দেখা যাক্ কৃষিশিক্ষা দ্বারা সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ কতদূর সাধিত হইতে পারে। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ ও দার্শনিকগণ যুগে যুগে শিক্ষার নানা উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই-গুলির একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেকটীর মূল্য বিচার করিয়া দেখা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও, অনাবশ্যক মনে করিতেছি। শিক্ষার যে উদ্দেশ্যগুলি লইয়া অদ্যাপি বিভিন্ন দেশের শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রচারকগণ মস্তক সঞ্চালন করিতেছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সেইগুলিরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া, কৃষির সহিত তাহাদের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। প্রধানতঃ শিক্ষার সেই উদ্দেশ্যগুলি এই :—(১) জীবিকা অর্জ্জন, (২) জ্ঞানার্জ্জন, (৩) মানসিক বিকাশ, (৪) সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ, (৫) শিষ্টাচার-লাভ ও সৌন্দর্য্য-বোধ, (৬) বহুমুখীন জ্ঞানলাভ, (৭) নৈতিক উন্নতি, (৮) সমাজের সহিত ব্যক্তির মিলন-সাধন, (৯) সমাজসেবায় যোগ্যতালাভ।

(১) কৃষিশিক্ষা ও জীবিকা-অর্জ্জন

অন্নবস্ত্রের সংস্থান শিক্ষার মহান্ উদ্দেশ্য না হইলেও, ইহা যে একটী মূল উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যাহারা

দরিদ্র ও অনশন-প্রপীড়িত এবং যাহারা হাতে-কলমে কাজ করিয়া সাধারণ জীবনের কেবল মোটা অভাবগুলি মোচনে সচেষ্ট, তাহাদের নিকট শিক্ষার এই উদ্দেশ্যটি অত্যন্ত রুচিকর। অন্নচিন্তাই যাহাদের নিকট চমৎকারিণী, তাহাদের নিকট শিক্ষার এই উদ্দেশ্যটি ত প্রীতিকর হইবেই এবং যে শিক্ষা স্বাধীনভাবে উদরান্নের সংস্থানে যোগ্যতা প্রদান করিতে পারে, তাহাকে ত তাহারা সাদরে শিরে ধারণ করিবেই। সংসারের নানা বিড়ম্বনা স্বীকার পূর্ব্বক স্বীয় সন্তানগণকে দশবৎসর-কাল বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াও যদি দরিদ্র পিতা-মাতা তাহাদের নিকট হইতে সাংসারিক বিষয়ে কোনও সাহায্য না পায়, বরং তৎ-পরিবর্ত্তে নিজেদেরকেই বিদ্যালয়প্রত্যাগত 'লেখাপড়া-জানা' পুত্রের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহারা কোন মুখেই বা সেই শিক্ষার প্রশংসা করিবে এবং কেনই বা স্বীয় সন্তানগণকে পুনরায় সেই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া অভাবগ্রস্ত পরিবারের অভাব আরও বর্দ্ধিত করিবে? কিছুকাল পূর্ব্বে জনসাধারণের অবস্থা সচ্ছল ছিল, মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের জন্য কাহাকেও বড় বেশী ভাবিতে হইত না। ছেলেরা জমি-দারের গোমস্তা, পুলিস ও উকীল মোক্তারের সহিত ভদ্রভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে, খাজনা ও মোকদ্দমার কাগজপত্রগুলি বুঝিয়া লইতে, ক্রয় ও বিক্রয়কোবালাগুলি লিখিতে ও গৃহে বৃদ্ধবৃদ্ধাগণকে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মপুরাণ-শাস্ত্রগুলি পড়িয়া শুনাইতে পারিলেই—সকলে তাহাদের উপর সন্তুষ্ট হইত এবং তাহাদের লেখাপড়ার প্রশংসা করিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিন চলিয়া গিয়াছে—তেমন অনায়াসে আর জীবিকালাভ হয় না। সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যালয়-গুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থা সেই প্রাচীন ধরণেরই রহিয়া গিয়াছে। আজকাল বিদ্যালয়ের শিক্ষা এরূপ শ্রেণীর বালকগণকে জীবিকা-অর্জ্জনে যোগ্যতা প্রদান না করিয়া বরং অকর্ম্মণ্যই করিয়া তোলে। এই কারণেই আমাদের গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলির উন্নতিসাধন বা সংখ্যাবৃদ্ধি ত হয়ই নাই, বরং অনেকগুলির অস্তিত্ব একেবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। পিতামাতা শিক্ষিত পুত্রের অকর্ম্মণ্যতার চেয়ে অজ্ঞ পুত্রের কর্ম্মকঠোরতাকেই সহাস্য-বদনে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থায় আরও এমন কিছু থাকা উচিত, যাহাতে এরূপ শ্রেণীর লোকেরও অভাব মোচিত হইতে পারে। আর আমা-দের দেশে এই শ্রেণীর লোকই ত বেশী। বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলে ইহাদের অভাব বহু পরিমাণে মোচিত হইতে পারে এবং বিদ্যালয়ও সেই সঙ্গে তাহাদের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে।

(২) কৃষিশিক্ষা ও জ্ঞানার্জ্জন

যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, যাঁহাদিগকে অন্নবস্ত্রের জন্য বড় বেশী ভাবিতে হয় না, তাঁহাদের নিকট শিক্ষার এই উদ্দেশ্যটি অধিকতর প্রিয়। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, "জ্ঞানই শক্তির আধার" এবং এই শক্তির আধার জ্ঞানলাভের জন্য স্বীয় সন্তানগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। কথাটা সত্য, কিন্তু এই জ্ঞান ও শক্তি সম্বন্ধে অনেক সময় তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণাও দেখিতে

পাওয়া যায়। যাহাই হউক, বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলে, তাঁহাদের বালকবালিকাগণের জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া, বরং বিপুল ও বিস্তৃতভাবে চরিতার্থই হইতে পারে। প্রকৃতির মূল শক্তিরাশির সহিত প্রকৃত পরিচয় এই কৃষিবিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারাই লাভ করিতে পারা যায় এবং বিশাল পল্লীসমাজ-জীবনের অন্তরতম প্রদেশে ইহারই সাহায্যে প্রবেশলাভ হয়। সত্য সত্যই ইহার মধ্যে এত জ্ঞানের বিষয় লুক্কায়িত আছে যে, জীবনব্যাপিনী সাধনা দ্বারাও ইহার কিনারা পাওয়া যায় না।

(৩) কৃষিশিক্ষা ও মানসিক বিকাশ

শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে ভেদ লক্ষিত হয়, তাহা বুঝিবার ও ভাবিবার শক্তির তারতম্য। যাঁহাদের মধ্যে আমরা স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন বিচারের শক্তি দেখিতে পাই, আমরা সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে শিক্ষিত ও জ্ঞানী বলিয়া থাকি; আর যাঁহাদের মধ্যে এই গুণগুলি দেখিতে পাই না, তাঁহাদিগকে অশিক্ষিত ও জ্ঞানহীন বিশেষণে বিশেষিত করি। এই ভাবের প্রাবল্যবশতঃই মানসিক বিকাশ শিক্ষার একটী প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। জ্ঞানের অর্জ্জন, ভাবপ্রকাশের ক্ষমতালাভ, নিপুণ সমালোচনার শক্তি প্রভৃতি এই উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। কৃষিবিজ্ঞান যতকাল শিক্ষার নব নব বিষয় আবিষ্কার করিয়া শিক্ষার্থিগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবে, ততকাল ইহা তাহাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও মন বিকশিত করিতে থাকিবেই।

(৪) কৃষিশিক্ষা এবং শিষ্টাচার ও সৌন্দর্য্য-বোধ

শিক্ষার আর একটী উদ্দেশ্য মানুষকে শিষ্টাচারী করিয়া, সভ্য সমাজের উপযোগী করিয়া তোলা ও তাহার সৌন্দর্য্যবোধ বিকশিত করিয়া দেওয়া। কৃষিতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা মানুষ এই গুণগুলি বিস্তৃতভাবে লাভ করিতে পারে। উদারচিত্ততা, বদান্যতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, নির্ভীকচিত্ততা, সমবেদনা, বিনয়শীলতা প্রভৃতি দুর্লভ মানবীয় গুণরাশির জন্য পৃথিবীতে যে সমস্ত লোক খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, তাঁহাদের অধিকাংশেরই প্রথম জীবনের শিক্ষা পবিত্র পল্লীসমাজে ও মুক্তপ্রকৃতির মধ্যেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। স্রোতস্বতীর কল্লোলে, তারাখচিত সুনীল আকাশে, বৃক্ষলতাপুষ্প-শোভিত বিশাল পল্লীপ্রান্তরের মনোহর চিত্রে, মুক্তপাখীর আকুল তানে, গাভীর হাম্বারবে, কুটীরবাসী কৃষকের সহজ সরল ভক্তির গানে বিশ্বপ্রকৃতির শক্তিরাশির যে সমস্ত অভিনয় চলে, তাহাদের সহিত সহৃদয় সখ্য স্থাপন করিয়া মানুষ যৌবনের প্রারম্ভে যে এক বিশেষ শিষ্টাচার ও সভ্যতা লাভ করে, তাহা আর অন্য কোন উপায়ে লাভ হইতে পারে না। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে বালকবালিকাগণ যৌবনের প্রারম্ভেই মানবহৃদস্ফুরণকারী বিশ্বপ্রকৃতির এই শক্তিরাশির সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পায় এবং তাহাদের বাল্যাবস্থার নিখুঁত ভাবগুলির সহিত বিজ্ঞানের যোগ সাধিত হইয়া তাহাদের প্রথম শিক্ষাজীবন প্রশস্ত ও গভীর করিয়া তোলে। কৃষিবিজ্ঞান ও পল্লীর সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে পল্লীসমাজের অবলম্বন ও বিকাশের দিক দিয়া শিক্ষা দিলে বালকবালিকাগণের কোমল অন্তঃকরণে এমন এক ভাব চিরতরে বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, তাহারা নিজেদেরকে বিশাল সমাজের কুটুম্ব মনে

করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে পারে।

(৫) কৃষিশিক্ষা ও সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ

শিক্ষার আর একটী উদ্দেশ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানবত্বলাভ। শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞগণ ইহাকেই শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সত্য সত্যই ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা ছাত্রের দেহ-মন-নীতি সমভাবে পুষ্ট করিয়া, মানুষকে প্রকৃত মানবত্ব প্রদান করে। প্লেটো শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া যখন বলিয়াছিলেন, "প্রকৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীর দেহ, মন ও আত্মা সুন্দর ও পরিপূর্ণ করিয়া তোলে," তখন তাঁহার অন্তরে শিক্ষার এই উদ্দেশ্যই বর্ত্তমান ছিল। যদি সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশসাধনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে বালকগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে কৃষি-বিজ্ঞানের বন্দোবস্ত আরও সুন্দররূপে করা উচিত, নচেৎ তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হইবে না। কৃষির বিষয়গুলি এত বিচিত্র যে, ইহা জীবনের সমস্ত দিকই স্পর্শ করে এবং এগুলি এত বিস্তৃত যে সর্ব্বতোমুখিনী অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য ইহাদের মধ্যে অসংখ্য উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষি-বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনও একটী শিক্ষণীয় বিষয়ে ছাত্রের দেহ-মন-নীতির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি-সাধনের জন্য এত অধিক উপকরণ পাওয়া যায় না।

(৬) কৃষিবিজ্ঞান ও বহুমুখীন জ্ঞানলাভ

স্বাভাবিক নিয়মে মানবসমাজ ক্রমশঃই অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হইতেছে। এই ক্রমোদ্বর্ত্তনের ফলে সমাজে বহুবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যজাতিই তাহাদের বিদ্যালয়গুলিতে বহুকাললব্ধ এই জ্ঞানরাশির শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্বীয় সন্তান-সন্ততিগণকে শিক্ষিত ও সভ্যসমাজের উপযোগী করিয়া তোলে। সামাজিক উদ্বর্ত্তনের এই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া তাহাদের জ্ঞানরাশি জাতীয়ভাবে বিকাশলাভ করিতে থাকে। এই সমস্ত জ্ঞানরাশির সহিত পরিচিত হইয়া নবজ্ঞানের অনুশীলনে ও আবিষ্করণে প্রস্তুত হইতে পারিলেই, আমরা মানুষকে শিক্ষিত ও জ্ঞানী বলিয়া থাকি। সত্য সত্যই শিক্ষার এই উদ্দেশ্য দ্বারা বিচার করিলে, প্রত্যেক শিক্ষিত ও সভ্য ব্যক্তিকেই সমাজলব্ধ জ্ঞানরাশির সহিত ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিচিত হইতে হইবে। এই সমাজলব্ধ জ্ঞানরাশির বৃহদংশ কৃষি ও পল্লীজীবনের অন্তর্গত। সুতরাং যে ব্যক্তি এতৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ তাহাকে শিক্ষিত বলা যাইতে পারে না—তিনি রসায়ন-শাস্ত্রে নব পরমাণুবাদ প্রতিষ্ঠিতই করুন, আর গণিতশাস্ত্রে নব প্রণালীর আবিষ্কারই করুন। সহরের কোনও ছাত্র আহারে বসিয়া যদি আশ্চর্য্যের সহিত পাচক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—"ঠাকুর ধানগাছ কত বড়? ধানগাছের কি তক্তা হয়?" তবে তিনি দর্শনশাস্ত্রে যতই প্রতিষ্ঠালাভ করুন না কেন, তাঁহার শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ, এ কথা বলিতেই হইবে। আজকাল অনেকেই বলিতেছেন যে প্রকৃতরূপে শিক্ষিত হইতে হইলে, কোনও এক বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে, অন্যান্য অনেক বিষয়ের সহিত অল্লাধিক পরিমাণে পরিচিত হইতে হইবে। যদি শিক্ষিত ব্যক্তির সংজ্ঞা ইহাই হয়, তবে অন্যান্য অনেক বিষয়ে অল্লাধিক পরিমাণে জ্ঞানলাভে কৃষিবিজ্ঞান যে যথেষ্ট সাহায্য করিবে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। একমাত্র ইহারই

আলোচনায় রসায়ন-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, জন্তু-বিজ্ঞান, কৃষক-সমাজ, কৃষিবিষয়ক ধন-বিজ্ঞান, পল্লীনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় ও তাহাদের বিবিধ ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক জ্ঞানলাভ হইয়া যায়।

(৭) কৃষিশিক্ষা ও নৈতিক উন্নতি

অরিষ্টটল্ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক ব্যক্তির নৈতিক জীবনের চিহ্ন তাহার দৈনন্দিন জীবন-যাপনে পরিলক্ষিত হয়। এই উদ্দেশ্যসাধন-কল্পে শিক্ষা মানব-চরিত্র এমনভাবে গঠিত করে যে, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে নৈতিক সম্বন্ধ থাকা উচিত, তাহা সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।" জার্ম্মাণীর বিখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষা-তত্ত্বজ্ঞ হার্ব্বার্ট এই মতেরই সমর্থন করেন। পল্লীজীবন-যাত্রার একটী প্রধান অবলম্বন ও নির্দ্দিষ্টধারারূপে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা দিলে ছাত্রগণকে নিয়ত পল্লীসমাজের সংস্রবে আসিতে হয় এবং এইরূপে শিক্ষাজীবনের প্রথমভাগেই সমাজের বিচিত্র ভাব ও নীতি তাহাদের চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়া যায়। কৃষি কেবল বিজ্ঞানই নয়, ইহার অনুশীলনের সহিত সামাজিক জীবনের অভাব-অভিযোগও প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। বিজ্ঞানের সহিত ব্যবহারের সংযোগ ছাত্রের নৈতিক জীবন দৃঢ় ও পুষ্ট করিয়া তোলে। মানবীয় কর্ম্মের যতগুলি ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষি-বিজ্ঞান ব্যতীত আর কোনটীতেই ছাত্রের নৈতিক-উৎকর্ষ-সাধনের জন্য এত অধিক সুযোগ ও উপকরণ পাওয়া যায় না এবং সম্ভবতঃ আর কোন ক্ষেত্রেই এত অধিক নীতিশিক্ষার প্রয়োজন হয় না। পল্লীপ্রকৃতির ধ্যানে এবং সমাজ-জীবনের বিবিধ বৈচিত্র্য ও প্রতিষ্ঠানগুলির পর্য্যালোচনায় ছাত্রের নৈতিক চরিত্র দৃঢ় ও প্রশস্ত হয় এবং শিক্ষার্থী বালক, তাহার যে অন্তরতম ভগবান পল্লীপ্রকৃতির বিচিত্র শক্তিপুঞ্জের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহার সহিত আত্মার নিগূঢ় সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। জীবন তখন বিচিত্রভাবে পূর্ণ হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়—তখন সে মানব-জীবনের উচ্চতর ও বিস্তৃততর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। শূন্যে বসিয়া নৈতিক জীবনের উন্নতি-সাধন ও ধর্ম্ম-জীবনের মাধুর্য্য-উপভোগ সম্ভব হইলেও—নিষ্ফল। এরূপ নীতি ও ধর্ম্মের সুখ-সৌধ কর্ম্মজীবনের ঘাতসঙ্ঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়।

(৮) কৃষিশিক্ষা ও সমাজের সহিত ব্যক্তির মিলন-সাধন

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক মানুষকেই তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জগতের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। ব্যক্তির সুখদুঃখ তাহার পারিপার্শ্বিক শক্তি-পুঞ্জদ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে এই শক্তিরাশির সহিত মৈত্রী স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদের সদ্ব্যবহার করিতে পারে, প্রত্যেক শিক্ষানীতিরই সেই উদ্দেশ্য থাকা উচিত। যে ব্যক্তি সুন্দররূপে এই মিলন সাধন করিয়া তাহার নিজের ও অন্যান্য সকলের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত করিতে পারে, তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত বলা যাইতে পারে। সমাজ-জীবনের অর্থ এই মিলন-সাধনের ক্ষমতা। কোন মানুষই এই ক্ষমতা লইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হয় না। চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাজ-জীবনের সহিত এই মিলনসাধনের ক্ষমতা-লাভের সঙ্গেই তাহার প্রকৃত শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয় এবং আজীবন স্থায়ী হয়। বাল্যে ও যৌবনে বিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া প্রত্যেক সভ্যজাতিই নিজ নিজ বালকবালিকা-

গণকে সমাজ-জীবনের উপযোগী করিয়া তোলে। ইহা খুবই সন্দেহের বিষয় যে, কোনও মানুষ পল্লীসমাজের কৃষিশিল্প, রীতি-নীতি, অভাব-অভিযোগ, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া এই সামাজিক জীবন-যাত্রার উপযোগী হইতে পারে। অধিকন্তু, যাহাদিগকে পল্লীসমাজেই জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, তাঁহারা এই মিলনসাধনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিনিয়তই অনুভব করে। এই শ্রেণীর লোকগণের অভাব-মোচন জন্য বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা আরও আবশ্যক। এই শিক্ষা তাহাদিগকে প্রকৃতি, প্রাকৃতিক নিয়ম ও পল্লীসমাজের সহিত সুখ-সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক জীবনযাপনে যোগ্যতা প্রদান করে।

(৯) কৃষিশিক্ষা ও সমাজ-সেবায় যোগ্যতালাভ

সমাজ-সেবায় যোগ্যতালাভ বর্ত্তমানকালে অনেকে সর্ব্ববিধ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই সেবার উপযোগী হইতে হইলে প্রথমে প্রত্যেককেই সর্ব্ববিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে হয়। কিন্তু অন্যের উন্নতির পথে বিঘ্নের কারণ না হইয়া স্বাবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় জীবনযাত্রা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলেই মানুষের সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায় না। মানব নামের অধিকারী হইবার জন্য তাহাকে সমাজের উন্নতিকল্পে বহুবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়—নানা প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিতে হয়। কৃষি ও শিল্পকে সামাজিক জীবনের বিকাশের ধারারূপে শিক্ষা দিলে বালকগণ সমাজসেবায় নিপুণতা লাভ করিতে পারে। আমাদের দেশের $\frac{৪}{৫}$ অংশ লোকই কৃষিজীবী এবং তদধিক পল্লীবাসী; সুতরাং ইহাদিগকে সুন্দররূপে পল্লীজীবন-যাপন ও পল্লীসমাজের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় কৃষি ও শিল্প-শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকা উচিত। অবশ্য সমাজসেবার আরও অনেক পথ উন্মুক্ত আছে; কিন্তু যে দেশের $\frac{৩}{৪}$ অংশ লোকই কৃষিজীবী ও পল্লীবাসী, তাহাদের উন্নতির চেষ্টা ফলবতী করিতে হইলে প্রত্যেক সমাজসেবকেরই পল্লীজীবন ও পল্লীর কৃষি-শিল্পের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে পরিচিত হওয়া উচিত। নচেৎ বক্তৃতা দেওয়ার সঙ্গেই তাঁহার সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইল, এরূপ ভাবিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

যে কৃষক প্রকৃতির শক্তিনিচয়ের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া রসনার তৃপ্তিকর বহুবিধ দ্রব্য উৎপন্ন করে, সেও শিল্পীর সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য। বিশাল প্রান্তর কৃষকের চিত্রপট এবং মাটি ও মূর্ত্তিমতী প্রাকৃতিক শক্তিরাশি তাহার চিত্রের উপকরণ। শিল্পী মানবচিত্তের সৌন্দর্য্য-বাসনার তৃপ্তি সাধন করে; কৃষিজীবী অক্লান্ত শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক উদরের ও চিত্তের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বহুবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন করতঃ মানব-সমাজে সুখস্বাচ্ছন্দ্য অটুট রাখিয়া ধন্য হয়।

(খ) কৃষিশিক্ষা ও পল্লীসমাজ

এখন একবার বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার সহিত পল্লীসমাজের সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি, অভাব-অভিযোগের সম্বন্ধ সংক্ষেপে বিচার করিয়া দেখা যাক্। অবশ্য, কৃষি-শিক্ষার সহিত সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া ইহা অবান্তর ভাবে কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

তথাপি পরিষ্কার বোধের জন্য ইহাকে আর একটু বিস্তৃত ভাবে দেখা দরকার। ইহা সহজেই বোধগম্য যে, পল্লীসমাজের সুখ-দুঃখ কৃষির উন্নতি-অবনতির উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে। শুধু পল্লীসমাজ কেন, দেশের সমস্ত সমাজের সুখ-দুঃখ এই কৃষির সহিত বহু পরিমাণে জড়িত। কৃষি-বিজ্ঞানের চর্চ্চার অভাবে আমাদের দেশের কৃষক-সমাজ এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য সমাজ অতীব শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। এই দুরবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে দেশমধ্যে কৃষি-শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবেই এবং কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শস্যাদি উৎপন্ন করিবার শিক্ষা দিতে হইবে। এখন প্রশ্ন এই—কিরূপে কৃষকদিগের কৃষি-শিক্ষা অল্পব্যয়সাধ্য ও লাভজনক করা যাইতে পারে? পুষা-কলেজে প্রচুর অর্থব্যয়ে কৃষি সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান চলিতেছে, দেশমধ্যে কৃষিসংক্রান্ত কয়েকখানি পত্রিকাও দেখা দিয়াছে, প্রতি বৎসর জেলায় জেলায় কৃষি-প্রদর্শনীও খোলা হইতেছে। এ সব দেখিয়া শুনিয়া অনেকেই আশান্বিত হইয়াছেন যে, এরূপ আরও দুই-একটি কলেজ, দুই-একখানি পত্রিকা ও ঘন ঘন কৃষি-প্রদর্শনী দেখা দিলে, অচিরেই কৃষির উন্নতি সাধিত হইয়া দেশের ধনাগমের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে—দুর্ভিক্ষ দূরে পলায়ন করিবে। কিন্তু সত্য কি তাই? একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এরূপ আশা অমূলক। এই অনুষ্ঠান-গুলির দ্বারা যে কৃষির কোনই উন্নতি সাধিত হইতেছে না, এমন কথা আমি বলিতে চাহি না। আসল কথা এই যে, ইহাদের পরিচালন জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও শক্তি ব্যয়িত হইতেছে, তদনুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না। ইহার কারণ বাহির করিবার জন্য বেশী কষ্ট করিতে হইবে না, ইহা সহজেই বোধগম্য। গুরু শিষ্যকে বহু কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক মন্ত্র মুখস্থ করাইয়াও যদি তাহাকে তাহার প্রয়োগবিধি হইতে বঞ্চিত রাখেন, তবে তাঁহাদের সমস্ত শ্রম যেমন ব্যর্থ হয়—অথবা তৃষ্ণাতুর জল-তৃষ্ণা নিবারণ মানসে জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়াও যদি তীরে অবরোহণ করিতে না পারে, তবে তাহাকে যেমন তৃষ্ণার্ত্তই থাকিতে হয়; আমাদের কৃষি-শিল্প-ব্যবসায় সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানগুলিরও সেই দশা হইতেছে। একে ত আমাদের দেশে এ সমস্ত বিষয়ের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টাই হয় না, সৌভাগ্য-ক্রমে যেটুকু হইতেছে, তাহাও পরিচালক ও উদ্যোক্তৃগণের দূরদর্শিতা, ধৈর্য্য ও একাগ্রতার অভাবে আশানুরূপ ফলপ্রদান করিতেছে না। ব্যাপকভাবে ও দূরদৃষ্টিতে দেখিবার শক্তি না থাকিলে আজকাল কোন বিষয়েই স্থায়ী উন্নতিলাভ করিতে পারা যাইবে না—শিক্ষাই হউক, শিল্পই হউক, ব্যবসায়ই হউক আর কৃষিই হউক। কোনও বিষয় অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত করিবার সময়, পারিপার্শ্বিক শক্তি-রাশির সহিত ইহার প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য উপযুক্ত চিন্তা ও শক্তি প্রদান করি না বলিয়া অনেক সময় আমাদের সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হয়। অবশেষে নিরাশপ্রাণে বলিতে হয়, "হায়, কেবল ঘামানই সার হ'ল।"

কৃষি-শিল্পের উন্নতি ও প্রচারের চেষ্টা করিতে গিয়াও আমাদের তদ্রূপ অবস্থা হইতেছে। কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার অনুসন্ধান-ফল বুঝিবে কে? পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু ইহা পড়িবে কে? প্রদর্শনী খোলা

হইতেছে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবে কে? অবোধ চাষা নিরক্ষর শিল্পী! সুতরাং ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান ও আয়োজনগুলির জন্য যে অর্থ ও যে শক্তি ব্যয়িত হইতেছে, তাহা সার্থক করিতে হইলে, সর্ব্বসাধারণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। আজকাল অনেকে বলিতেছেন যে, প্রচারকগণ পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া কৃষিশিল্পের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলি সাধারণকে বুঝাইয়া দিলে অনেক সুফল ফলিবে। কিন্তু এরূপ বিক্ষিপ্ত প্রণালীতে কিছু ফল ফলিলেও, সম্পূর্ণ ফললাভ হইবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে শিক্ষা-প্রদানের আমরা পক্ষপাতী। শিল্পী ও কৃষকগণ বিজ্ঞানের মূল নিয়মগুলির সহিত শৃঙ্খলা-বদ্ধভাবে পরিচিত না হইলে এবং পুস্তক ও পত্রিকা পড়িয়া তাহাদের প্রয়োগ-বিধি বুঝিয়া লইতে না পারিলে প্রচারকগণের চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে, বুঝিতে পারি না। প্রচারকগণও প্রত্যহই কৃষকের সহিত মাঠে যাইবেন না অথবা চিরদিনই কৃষকগৃহে বাস করিবেন না। এই বিদ্যালয়গুলিতে পল্লী-বালকগণ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের সহিত কৃষিশিল্প-ব্যবসায়ের মূল কথাগুলি ও তাহাদের প্রয়োগবিধি হাতে-কলমে শিক্ষা করিবে। অন্ততঃ চারি পাঁচটী গ্রাম লইয়া এরূপ এক একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে। এই বিদ্যালয়গুলিতে কেবল অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণই নিয়মিতরূপে শিক্ষালাভ করিবে এমন নয়—অবকাশমত যাহাতে গ্রামের বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শিখিতে পারে এবং গ্রামের হিতকর বিবিধ বিষয়গুলির আলোচনা করিতে পারে, তাহারও বন্দোবস্ত থাকিবে। সহরস্থ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, এমন কি কলেজের অধ্যাপকগণও, মধ্যে মধ্যে এই বিদ্যালয়গুলিতে গমন করিয়া নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দ্বারা এবং অন্যান্য অনেক উপায়ে এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতি-কল্পে ও উৎসাহ-বর্দ্ধনে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। এইরূপে পল্লী ও সহরের মধ্যে ঘন ঘন ভাব-বিনিময় দ্বারা জাতীয় জীবনপ্রবাহ শুষ্ক ও আবিল না হইয়া, কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবাধে অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে। আর যদি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় পল্লীতে পল্লীতে এরূপ বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা নিতান্তই কষ্টসাধ্য হয়, তবে অন্ততঃ পক্ষে আপাততঃ প্রত্যেক জেলার কেন্দ্রস্থানগুলিতে এক একটী আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। এরূপ বিদ্যালয় আমাদের প্রত্যেক জেলায় পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান্ আছে। জনসাধারণের উন্নতির জন্য যদি আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই বিদ্যালয়গুলির মামুলি প্রথার উন্নতি সাধন করিয়া ইহাদিগকে সমাজশক্তি ও বিশ্বশিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তুলিতে পারা যায়। অনেক বয়োপ্রাপ্ত কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকেও নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের জন্য অনেক সময় আমরা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির দ্বার সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয় বলিয়া এবং বিদ্যালয়গুলিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জন্য বিবিধ শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই বলিয়া, তাহাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় না। কিঞ্চিৎ জ্ঞানের আলোক পাইতে কার না প্রাণ চায়?

অতএব আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, কৃষি কলেজ, কৃষিপত্রিকা ও কৃষিপ্রদর্শনীর চেষ্টাসমূহ

ফলবতী করিতে হইলে, যাহাতে কৃষকবালকগণ ও কৃষকযুবকগণ কিছুকাল বিদ্যালয়গুলিতে অবস্থিতি করিয়া কৃষিবিজ্ঞানের মূল নিয়মগুলি ও তাহাদের ব্যবহার-বিধি শিখিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। নতুবা যতই কলেজে অনুসন্ধান চলুক, যতই পত্রিকা প্রকাশিত হউক এবং যতই প্রদর্শনী খোলা হউক, কৃষি ও কৃষকের অবস্থা যেমন ছিল, প্রায় তেমনই থাকিয়া যাইবে।

প্রথমতঃ এরূপ ব্যবস্থা হয়ত অনেকের নিকট অপরূপ ও অসম্ভব ঠেকিবে। অনেকে আশ্চর্য্যের সহিত প্রশ্ন করিবেন, "এরূপ ব্যবস্থা আর কোনও দেশে আছে কি?" এরূপ প্রশ্ন কিন্তু আশাজনক। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহাদের নানা কথা জানিবার ও ভাবিবার ইচ্ছা হইতেছে। এরূপ ব্যবস্থা আর কোনও দেশে আছে কি না, আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখি নাই। দেশের কৃষি, কৃষক ও পল্লীর দুরবস্থা দেখিয়া শুনিয়া অনেক সময় অনেক কথাই মনে আসিত, আজ সেইগুলিই প্রকাশ করিলাম। আশা—দেশবাসী ও দেশের গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আর যদি কোনও দেশে এরূপ অবস্থা না-ও থাকে, তবে নূতনভাবে কোন কথা ভাবিতে দোষ কি?

এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থার চেষ্টা গভর্ণমেণ্টের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, দেশের অভাব-অভিযোগ এক রকমের এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাগুলি আর একরকমের, অনেক বিষয়ে ত গভর্ণমেণ্ট একেবারে নিশ্চেষ্ট— দেশবাসীও তদ্রূপ। কিন্তু এমনভাবে আর ক'দিন চলিবে? গভর্ণমেণ্ট যদি দেশের বিজ্ঞ ও দায়িত্ববোধযুক্ত লোকগণের সহিত একযোগে চেষ্টা করেন, তবে অল্পব্যয়ে ও অল্পায়াসে অনেক সুফল পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের কর্ত্তারা এ বিষয়ে এত উদাসীন কেন, কিছুই বুঝা যায় না। জনসাধারণের প্রদত্ত করের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ তাহাদের উপযোগী শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হওয়া উচিত। সকল সভ্য দেশেই এ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়—কেবল আমরাই কি অসভ্য বর্ব্বর? আর যদি আমরা তাহাই হই, তবে গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে আরও বেশী মনোযোগ প্রদান করা উচিত। অনেক সময় অর্থাভাবের অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। আর সমস্ত কাজে অর্থের অপ্রতুল হয় না,—অনেক সময় অনেক বাজে কাজেও জলের মত অর্থব্যয়িত হইতে দেখা যায়—কেবল দেশের প্রকৃত হিতকর কাজ জনসাধারণের শিক্ষার বেলায় অর্থাভাবের অভিযোগ। যদি ভারতের মত শস্যশ্যামল, প্রকৃতির লীলানিকেতন, ধনজনপূর্ণ দেশেও অর্থাভাবে ও লোকাভাবে জনসাধারণেক অজ্ঞ নিরক্ষর থাকিয়া দুর্ভিক্ষে নিষ্পেষিত হইতে হয়, তবে জানিনা পৃথিবীর আর কোন্ দেশে ইহাদের সদ্ভাব ঘটিতে পারে? যদি ইহাই হয়, তবে বলিতে হইবে যে, ধনবিজ্ঞান, রাজস্ববিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি সমাজের হিতকরী ও শৃঙ্খলাকারী বিজ্ঞানগুলির কোন মূল্যই নাই। আমরাই বিজ্ঞানগুলি আলোড়ন করিয়া, হিসাব খতাইয়া, অঙ্ক কষিয়া দেখাইব যে, মানবসমাজে এ সবের অভাবের দিন আসিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে অথবা এমন দিন বহুপূর্ব্বেই অতীত হইয়া গিয়াছে। যখন আমাদের দেশে সময় ও শ্রম সংক্ষেপের জন্য রেল ছিল না, মেশিন ছিল না, তখনও জনসাধারণের শিক্ষার জন্য এ সব কিছুরই অভাব

হইত না। য়ুরোপ ও আমেরিকাতে, এ সবের অভাব হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, অভাব আর কিছুরই নয়—অভাব কেবল সদিচ্ছার ও সাধু চেষ্টার। দেশবাসীর প্রদত্ত কর যদি দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতির জন্য দেশমধ্যেই ব্যয়িত হয়, তবে অর্থাভাব হয় কেমন করিয়া ?

কিন্তু আর দুঃখ ও অনুতাপ করিয়া লাভ নাই। নিশ্চেষ্ট ও তন্দ্রাভিভূত হইয়া বসিয়া থাকিলেও কিছু হইবে না। সকলকে মিলিয়া মিশিয়া দেশবাসীর অবস্থার উন্নতির জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, নানা আয়োজন ও বিবিধ প্রতিষ্ঠানের জন্য উদ্যম করিতেই হইবে। সম্প্রতি আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, বঙ্গের শাসনকর্ত্তা উদারহৃদয় লর্ড কার-মাইকেল দেশের শিক্ষাবিষয়ক বিবিধ প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিয়াছেন—বহু অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যই ত এই। এজন্য আমরা তাঁহার মহনীয় নামের উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দেশের তত্ত্বকথা, সমাজের অন্তরতম বিষয়গুলি যদি গবর্ণমেণ্ট নিজে বুঝিয়া উঠিতে না পারেন, তবে এই সমস্ত কার্য্যের ভার বিজ্ঞ ও দায়িত্ববোধপূর্ণ দেশ-বাসীর উপর অর্পণ করিলে, দেশ-শাসন, সমাজোন্নতি, শিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইতে পারে।

সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবীর দুইটী শ্রেষ্ঠ জাতির সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহ কাহাকে জানিল না, বুঝিল না। উহারা কেবল সাম্রাজ্যমদেই মত্ত রহিলেন—আর আমরা কেবল ভয়সঙ্কোচেই কাটাইলাম উভয়ের নিকট উভয়েরই অনেক শিখিবার ছিল, বুঝিবার ছিল। কিন্তু সে শিক্ষা হইল না—সে মিলন ঘটিল না। দেড় শত বৎসর বৃথাই কাটিয়া গেল। কিন্তু এই মহামিলনের উষা-কিরণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, বোধ হয় আর কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

শিক্ষাপ্রচার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নূতন কর্ত্তব্য

কয়েক বৎসর হইতে দেশের যুবকবৃন্দ বিদেশে যাইয়া বহু অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক শিল্প, বিজ্ঞান ও কৃষি সম্বন্ধে নানা প্রকারের শিক্ষালাভ করতঃ দেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন নিয়মেই শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইতেছেন, কেহ কেহ বা ব্যক্তিগতভাবেই জীবিকা অর্জ্জনে মনোনিবেশ করিতেছেন। এক দল নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিলে কেমন হয়? এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতি-সাধনের জন্যও ত বহুবিষয়াভিজ্ঞ বহু লোকের প্রয়োজন। মান্ধাতার আমলের গুরুমহাশয়গণ দ্বারা ত এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। আর যদি এরূপ ব্যবস্থায় "যুদ্ধের অশ্বকে দিয়া ময়লার গাড়ী টানা" হয়, তবে শিক্ষাপ্রচারের আরও অনেক পথ উন্মুক্ত আছে। তাঁহাদের কিঞ্চিৎ সাধু ইচ্ছা ও স্বার্থ-ত্যাগের বাসনা থাকিলেই বিদেশগমনের কষ্ট ও অর্থব্যয় সার্থক হয়। সহরের বড় বড় কলেজে ও ফ্যাক্টরীতে বিবিধ বিষয়ের শিক্ষা-প্রদান ও কর্ম্মপরিচালনে নিযুক্ত থাকিয়াও, ইচ্ছা থাকিলে, দেশমধ্যে শিক্ষাপ্রচারের জন্য তাঁহারা কিঞ্চিৎ সময় ও শক্তি সার্থকভাবে ব্যয় করিতে পারেন। অবকাশের সময় সহরের উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে মফঃস্বলের বিদ্যালয়-

গুলির শিক্ষকগণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলে, শিক্ষাপ্রচারের কার্য্য অনেক অগ্রসর হইয়া যায়। তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে বন্ধের সময় মফঃস্বলের বিদ্যালয়গুলিতে গমন করিয়া, নিজ নিজ বিষয়সম্বন্ধে বক্তৃতা দ্বারা ও অন্যান্য অনেক উপায়ে বিদ্যালয়গুলির শৃঙ্খলা ও উন্নতিসাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে দেশের খ্যাতনামা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশবাসীর নিকট কেবল কল্পনার জিনিষ অথবা নামমাত্র না থাকিয়া প্রত্যক্ষ অনুভূতির সামগ্রী হইতে পারেন এবং শিক্ষিত নগরবাসী ব্যক্তিগণও দেশবাসীকে দূর, অসম্পর্কিত, অবজ্ঞার পদার্থ ও কিম্ভূত-কিমাকার জীব না ভাবিয়া আপন বলিয়া চিনিয়া লইবার সুযোগ পাইতে পারেন। এইরূপে শিক্ষিতের সহিত অশিক্ষিতের এবং সহরের সহিত গ্রামের শিক্ষা ও সমাজঘটিত নানা বিষয়ের ভাব-বিনিময় হইতে পারে এবং এইরূপে সকলেরই দেশভ্রমণ, তীর্থপর্য্যটন ও সহরপল্লীদর্শনের বাসনা যথার্থরূপে পরিতৃপ্ত হইতে পারে। আমেরিকার কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি, খ্যাতনামা অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও এঞ্জিনিয়ারগণ আমেরিকাবাসীদের নিকট কেবলমাত্র কল্পনার বস্তু বা ভীতির সামগ্রী নহেন; জনসাধারণও ইঁহাদের নিকট গো-পাল অথবা মেষদলের ন্যায় অবজ্ঞা বা অবহেলার জিনিষ নয়। কর্ম্মক্ষেত্রে ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক মেশামিশি, ঘেঁসাঘিসি হইতে দেখা যায়—সকলেই সকলকে মানুষের মত বুঝিয়া লইবার, চিনিয়া লইবার সুযোগ পায়। তাই বলিতেছিলাম, কোনও রকম ব্যবস্থা না করিয়া, কেবল শূন্যে চীৎকার, নীরবে অশ্রুপাত অথবা উদ্দেশ্যহীন ফাঁকা বক্তৃতা দ্বারা কোন দেশই কোন কালে বড় হয় নাই—আমাদের দেশও হইবে না।

দেশবিদেশে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের বিচিত্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এইরূপে প্রচারের ব্যবস্থা না করিয়া দিলে বিশাল সমাজের ঘোর অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত হইবে কি উপায়ে? এবং এই গুলিকে শিক্ষাবিষয়ক বিবিধ প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্য দিয়া সমাজশরীরে ধরিয়া না রাখিলে দেশ-বিদেশের জ্ঞানলাভ সার্থক হইবে কেমন করিয়া? এসব বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে যতকালই বিদেশ-গমনের আন্দোলন তুমুল-বেগে চলুক না কেন, তাহাতে দেশের ক্ষতি বই বৃদ্ধি হইবে না এবং শিক্ষালাভের জন্য বিদেশগমন কোন কালেই বন্ধ হইবে না। বিদেশগমনের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু স্বদেশকে জ্ঞানে গুণে উন্নত করিবার জন্য বিদেশ-গমন এক রকমের, এবং কেবলমাত্র পুত্র-পরিবার লইয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার যোগাতালাভের জন্য বিদেশ-গমন আর এক রকমের। দেশ যদি দরিদ্র, অজ্ঞ ও অনুন্নতই থাকিয়া যায়, তবে এই সুখময় জীবন-যাপনও বেশী দিন স্থায়ী হয় না। আর কেবল জ্ঞানের আদানের জন্য নয়, জ্ঞানের প্রদানের জন্যও বিদেশে যাইতে হয়। জ্ঞানলাভের জন্য আমরাই কেবল বিদেশে যাইব, কেবল এরূপ না ভাবিয়া, বিদেশীয়-গণও সেই জ্ঞানলাভের জন্য আমাদের দেশে আসিতে পারে, এরূপ ধারণাও ত করিতে পারা যায়। তারপর, আজকাল য়ুরোপ ও আমেরিকায় বিশ্বভ্রাতৃত্ববর্দ্ধনের আন্দোলন চলিতেছে—এই আন্দোলনে অন্যান্য জাতি-

গণকেও ত একদিন যোগ দিতে হইতে পারে। এ সমস্ত কেবল তখনই সম্ভব, যখন পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান আরম্ভ হইবে, এবং এই আদান-প্রদানের সূত্রপাত তখনই হইবে, যখন প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ দেশ মধ্যে বিবিধ উপায়ে শিক্ষাপ্রচারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নানা শক্তিশালী লোক প্রস্তুত করিতে থাকিবে। কে জানে, হয়ত ধোপা-নাপিত, জোলা-তাঁতী, সা-শুড়ীর মধ্য হইতে কত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া জগতের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে। য়ুরোপ ও আমেরিকা বহুদিন হইতেই তাহাদের কাজ আরম্ভ করিয়াছে। এখন আমাদের পালা।

বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষার প্রকৃতি ও বিষয়

বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলাম, এবং ইহার প্রচারে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করিলাম। এখন একবার এই শিক্ষার প্রকৃতি ও বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্—দেখা যাক্, কি পরিমাণ কৃষির বিষয় ফলপ্রদভাবে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। অবশ্য, এই শিক্ষার বিবিধ সূক্ষ্ম বিষয়, পাঠের ক্রম ও শিক্ষাপ্রদাননীতি বিশেষজ্ঞগণ স্থিরীকৃত ও শৃঙ্খলিত করিবেন। আমি এস্থলে ইহার স্থূল বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইব। আমি নিজে কৃষিবিদ্ নই অথবা কৃষিবিজ্ঞানের ছাত্রও নই—কেবল কৃষক-পল্লীতে জন্ম বলিয়া ও কৃষকসম্প্রদায়ের দুরবস্থার সহিত প্রত্যক্ষভাবে কিঞ্চিৎ পরিচিত মনে করিয়া, জোর করিয়া ইহার আলোচনা নিজ অধিকারের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিলাম। একমাত্র আশা—কৃষিশিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞ মহোদয়গণ ও দেশহিতৈষী শিক্ষাপ্রচারকগণ এতৎ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশের বিদ্যালয়-গুলিতে বালকগণকে কেবল লিখিতে, পড়িতে ও অঙ্ক কষিতেই শিক্ষা দেওয়া হইত। বিবিধ বিজ্ঞান ও তাহাদের ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা-প্রদানের কোনই বন্দোবস্ত ছিল না—এ সম্বন্ধে ভাবিবারও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নবযুগের নূতন শিক্ষা ও নূতন জীবনসমস্যা আমাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পতিষ্ঠানগুলিকে নানাভাবে আন্দোলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধীরে ধীরে বিদ্যালয়গুলির পাঠ্য-তালিকার মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জন্তুবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানগুলিও স্থান লাভ করিতেছে। অনতিবিলম্বে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ও যে স্থান পাইবে, তাহারও পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা যে খুব সুলক্ষণ ও সমাজের জীবনীশক্তির পরিচয়, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষার বিষয়গুলি স্বাভাবিক গতিতে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হউক, এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে, এই প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যাইতেও পারে। সুতরাং শিক্ষানায়কগণের কর্ত্তব্য, বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগদ্বারা শিক্ষা ও সমাজের অসংখ্য অভাবগুলি ধীর ও সংযত-ভাবে বুঝিয়া লইয়া, তাহাদের মোচনের জন্য বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া।

অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় কৃষিকেও প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে

পারে—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চবিজ্ঞান-মূলক। তৃতীয় বিভাগটি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমার বক্তব্য কিছুই নাই। তবে এস্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এখানে উন্নত প্রণালীর উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জন্তুবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানগুলির গভীর তত্ত্বগুলির সহিত পরিচয় ও কৃষির উন্নতিকল্পে তাহাদের প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ হয়। কৃষিবিষয়ে নানা অনুসন্ধান ও আবিষ্কার এই বিভাগেই আশা করা যাইতে পারে।

প্রাথমিক কৃষি-বিজ্ঞান

সাধারণ উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতির ন্যায় বিদ্যালয়ে কৃষি-বিজ্ঞানেরও একটী বিশেষ উদ্দেশ্য ও স্থান আছে। অন্যান্য বিজ্ঞানের মূল ও প্রাথমিক নীতিসমূহের ন্যায় এই কৃষিবিজ্ঞানেরও নিত্যপ্রয়োজনীয় মূল তথ্যগুলির সহিত প্রত্যেক বালক ও যুবকের পরিচিত হওয়া উচিত। সেই তথ্যগুলি এই :—কৃষিসংক্রান্ত উদ্ভিদ্‌গুলির প্রকৃতি ও বৃদ্ধির নিয়ম; বিবিধ শস্যাদি এবং তাহাদের রোপণ ও কর্ত্তনের সময়; বিবিধ জাতীয় বীজের অঙ্কুরোৎপাদন-রীতি; বিভিন্ন প্রকারের ভূমির প্রকৃতি; সারের উপকারিতা ও তাহার ব্যবহারপ্রণালী; কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রাদির গঠন ও ব্যবহার; দুগ্ধের রক্ষণ ও তাহা হইতে ঘি-মাখন প্রস্তুত-প্রণালী; গো-পালন; এবং আরও অন্যান্য অনেক বিষয়। উপযুক্তরূপে দৃষ্টিশক্তি সঞ্চালিত করিতে পারিলেই এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ হইতে পারে; সুতরাং যাহাতে অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণ এই শক্তিলাভ ও তাহার ব্যবহার করিতে পারে, প্রাথমিক কৃষিশিক্ষায় তৎপ্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। কৃষিসংক্রান্ত এই প্রাথমিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রয়োজন হয় না; অনেক গ্রাম্য বালক এইগুলি জানে ও ভালবাসে। এই বিভাগে বালকগণ প্রকৃতির স্থূল জিনিষগুলি ও কৃষিব্যাপারে তাহাদের প্রয়োগপ্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে ও সরলভাবে শিক্ষা লাভ করিবে। এখানে সূক্ষ্ম ওজন, পরিমাপ বা অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কেবল বালকগণের উৎসাহ ও আমোদ-বর্দ্ধনের জন্য শিক্ষক মহাশয় মধ্যে মধ্যে এই যন্ত্রের ব্যবহার করিতে পারেন এবং বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি পরীক্ষা (experiment) দেখাইতে পারেন। এই শিক্ষায় যথেষ্ট পুস্তকের ব্যবহার ত্যাগ করিতে হইবে অথবা ইহার স্থান অতি গৌণ রাখিতে হইবে। শিক্ষক মহাশয়কে দৈনিক শিক্ষার বিষয় পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিতে হইবে; তাহা না হইলে শ্রেণীতে গিয়া গোলমাল করিতে হয়। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে এই 'গোলমালে'র প্রাদুর্ভাব বড় বেশী। শিক্ষাবিষয়ে এটী ভয়ানক জিনিষ। একদিকে ইহা যেমন অনেক সময় বৃথা নষ্ট করে, অপরদিকে ইহা তেমনই আবার সর্ব্ববিধ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে। প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এই কৃষিশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিবে। এজন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সংশ্রবে একটী করিয়া উদ্ভিদ্-উদ্যান ও কৃষিপরীক্ষাগার থাকা উচিত। শিক্ষক মহাশয় সুবিধামত বালকগণকে নিকট-বর্ত্তী কৃষিক্ষেত্রে, কৃষকগৃহে, প্রান্তরে ও জঙ্গলে লইয়া গিয়া কৃষিসংক্রান্ত বিষয়গুলি সরলভাবে বুঝাইয়া দিতে পারেন।

মাধ্যমিক কৃষি-বিজ্ঞান

মাধ্যমিক কৃষিবিজ্ঞান উপরোক্ত দুই সীমার মধ্যে অবস্থিত। যে সকল ছাত্র কৃষিবিজ্ঞানের মোটা কথাগুলির সহিত পরিচিত হইতে চাহে এবং যাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে অন্যপথ অবলম্বন করিবে, তাহাদিগকে সংক্ষেপে পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের মূল নিয়মগুলির সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া কৃষি-বিষয়ে তাহাদের ব্যবহার-প্রণালী শিখাইলেই চলিতে পারে। এই সঙ্গে তাহাদিগকে তাহাদের পঠনীয় কৃষিবিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া পল্লী-সমাজের ও পল্লীজীবন-যাত্রার মূল ধারাগুলির সহিত পরিচিত করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে সকল ছাত্রকে নানা কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই তাহাদের লেখা-পড়া শেষ করিতে হইবে এবং যাহারা বিদ্যালয় ত্যাগ করার পর তাহাদের অধীত বিষয়গুলি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া সুফল পাইতে চাহে, তাহাদের পঠনীয় বিষয়গুলি অধিকতর বিস্তৃত ও ব্যবহারমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহাদের জন্য যে পরিমাণ কৃষি-বিজ্ঞান নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহার মধ্যে অন্ততঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যথাসম্ভব বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও ব্যবহারপ্রণালী থাকা উচিত। বিষয়গুলি এই :—উদ্ভিদের দেহতত্ত্ব, উদ্ভিদের খাদ্য, বিভিন্ন প্রকার ভূমি ও জলবায়ুর সহিত বিভিন্ন জাতীয় শস্যের সম্বন্ধ-বিচার, ফল-বৃক্ষাদি পালনের নিয়ম, বিভিন্নপ্রকার ভূমির চাষপ্রণালী, বিভিন্নপ্রকার সারের ব্যবহার-প্রণালী, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন শস্যের উৎপাদন-প্রণালী ও ভূমির উৎপাদিকা শক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ, গোজাতির পালন ও উন্নতিপ্রণালী, পশুখাদ্য, দুগ্ধ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঘি-মাখন-প্রস্তুতকরণ, উদ্ভিদের রোগ ও তাহার নিবারণ-প্রণালী, কৃষিযন্ত্রাদির বিবরণ, কৃষিগৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালী। এই গুলির পাঠ সমাপ্ত হইলে ছাত্রদিগকে পল্লীসমাজজীবনের মূলধারাগুলির সহিত পরিচিত করিয়া দিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে কৃষি ও কৃষকজাতির উন্নতিকল্পে সম্প্রতি যে নূতন পল্লী ও কৃষিবিষয়ক ধনবিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারও সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিতে হইবে। বলা বাহুল্য, বিদ্যালয়ের সংশ্রবে এক একটী উদ্ভিদ্-উদ্যান, কৃষি-পরীক্ষাগার ও বিভিন্নপ্রকারের শস্যাদি উৎপাদনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকখণ্ড ভূমি থাকিবেই। কৃষিশিক্ষার বিষয় ও পাঠের ক্রমগুলি স্থির করিবার সময় বালকগণের মানসিক বিকাশের স্তর ও ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন শস্যের প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কোন কোন ছাত্র ও অভিভাবক যদি নিতান্তই মনে করেন যে, এরূপ ব্যবস্থায় তাহাদিগকে 'চাষা' করিয়া তোলা হইবে এবং অন্যান্য উচ্চতর জ্ঞানলাভের পথে বাধা প্রদান করা হইবে, তবে না হয় তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষার দায় হইতে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন গ্রাম হইতে অনেক উৎসাহী বালক ও যুবক এই শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে আগমন করিতে পারে, তাহাদের শিক্ষার জন্য ও বিশেষরূপে বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বিবিধ কর্ত্তব্য ও সামাজিক দায়িত্ব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত; সুতরাং এখন আর বিদ্যালয়ের গণ্ডী সঙ্কীর্ণ রাখিলে চলিবে না। ইহাকে বিশ্বশিক্ষা ও সমাজশক্তির কেন্দ্র করিয়া তুলিতেই হইবে।

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস।
আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা।

মফঃস্বলের বাণী

১। ভাব-সাধন

প্রতীচ্য চিরকাল ভাব-প্রবণ, কিন্তু কদাচ মুখর ছিল না। পাহাড়ে কন্দরে গহনে বনে জীবনব্যাপী সাধনায় নিযুক্ত মহাপুরুষ এই ভারতীয় জাতি গঠন করিয়াছেন—সাধনাহীন সিদ্ধিলাভে তাহারা কদাচ লোলুপ হন নাই। কিন্তু সেই দেশে আজ ভাবুকতার অভাব ঘটিয়াছে। কর্ম্ম—কেবল কর্ম্ম—পাশ্চাত্য অনুকরণে কর্ম্ম—জীবনের সারধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, তাই ভারতীয় জাতিসমূহ পল্লবগ্রাহী হইয়া পড়িয়াছে। আজ পল্লীগ্রাম শূন্য, সহর লোকে লোকারণ্য। সহরে পাকা রাস্তা, চঞ্চল সমাজ, দুর্লভ খাদ্য, কৃত্রিম সভ্যতা, স্বার্থ সাধনা, সুলভ প্রশংসা জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু ইহাতে জীবন গঠিত হয় না। যে দৃঢ়ভিত্তি ভারতীয় সমাজ গঠন করিয়াছিল তাহা আজ ক্ষয়িত হইয়াছে।

কিন্তু এই ভাবে এ জাতি গঠিত হইবে না, ইহা টিকিবে না, অথচ প্রকাণ্ড মহাদেশ-স্বরূপ বিরাট ভারতবর্ষের ৩৩ কোটী লোক একদিনে বা দশ দিনে ধ্বংস হইবে না, প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবেই। তাই চিন্তাশীল প্রশস্তদৃষ্টি ব্যক্তি মাত্রই এই সমস্যা পূরণ করিতে যত্নপর না হইয়া পারেন না। তাই মনে হয়, এতগুলি লোকের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করিতে সাধক দরকার। আমরা আজ আর সাধক নহি, আমরা আজ শিক্ষক, স্বয়ং অসিদ্ধ অপরকে সিদ্ধ করিতে অভিলাষী!

এই শিক্ষা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে—এই জীবন—এই হিন্দুর জীবন—সাধনক্ষেত্র করিতে হইবে। বিশ্বাস করিতে হইবে এই জীবনই শেষ জীবন নহে, আমাকে আবার এই ভারতে আসিতে হইবে, বিচ্ছিন্ন কার্য্যগুলির একটা হিসাব হইবে, পরিত্যক্ত কার্য্য পরিসমাপ্তির জন্য আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই ধারণা ভারতবাসীর হৃদয়ে বদ্ধমূল, জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্রগ্রহণের ন্যায় এক জন্মের জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর নব-দেহ ধারণ করিতে হইবে—ইহা ভারতীয় শাস্ত্র-কথা। সেই দেশে একদিনে এক বক্তৃতায় কাজ সারিয়া নাম কিনিবার সম্ভাব্যতা কে শিক্ষা দিল—এ শিক্ষা সার শিক্ষা নহে।

তাই বলিতেছিলাম, জীবনকে কার্য্যক্ষেত্র কর, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অবধি সাধন কর; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সাধন কর। কেমন করিয়া তাহা করিবে জিজ্ঞাসা কর? যাহারা সুদূর পল্লীগ্রামে একটি পরিবার গঠন করিতেছে তাহারাও সাধক। এই পৃথিবীতে একটি উপযুক্ত লোক গঠনে যিনি সহায়তা করেন তিনিই প্রকৃত কার্য্য করেন। প্রত্যেকের জীবনে বিরাট ব্যাপার সংসাধন সম্ভবপর নহে। মহৎ আদর্শ লইয়া ক্ষুদ্র কার্য্য করিলেও তাহাতেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারা উচিত, ভগবান ঐ একনিষ্ঠ সাধককে ভাবী জীবনে মহৎ কার্য্যের যোগ্য করেন। যিনি ক্ষুদ্রাকারে আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি আজ জগৎ সমক্ষে নমস্য, কিন্তু কে জানিত এই ক্ষুদ্র প্রারম্ভ এমন মহামহীরুহে পরিণত হইবে। আর তিনি

আজ নশ্বর দেহে এ জগতেও নাই! তেমনি যিনি খাসিয়া পাহাড়ে অসভ্য নিরক্ষরদিগকে ভাষা দানে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার কার্য্য শত বক্তা, শত নেতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আজ দেশে অবৈতনিক শিক্ষা-প্রদানের কথা শ্রুত হইতেছে—কৈ এদেশে কি দশটী প্রাণী এখনও সেকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন! কেহ কি অনাড়ম্বর পল্লীগ্রামে গিয়া আপন জীবনব্রত সাধন জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া বসিয়াছেন? ঐরূপ করিতে আজকাল অনেকের ইচ্ছা হয় না—কারণ তাহাতে সহজে সংবাদপত্রে নাম ওঠে না, উহার ফল সদ্য দেখা যায় না; বিশেষ কথা উহাতে তেমন অর্থাগম হয় না এবং উহা করিতে গেলে জুতা মোজা পায় দিয়া, পাকা সড়কে হাটিয়া বেড়ান যায় না! সদ্য ফল-লাভের অসম্ভবতা আমাদিগকে ঐ প্রকার দীর্ঘকাল-ব্যাপী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেয় না। তাই বলিতেছিলাম, দেশ হইতে ভাবুকতা লোপ পাইতেছে, আজ আমরা প্রত্যেকেই Practical অর্থাৎ স্বার্থ—ক্ষুদ্র স্বার্থানুসন্ধানে তৎপর। কিন্তু ভবিষ্যৎ সাধককে এইগুলি বর্জ্জন করিতে হইতে। নীরব কর্ম্মে আত্মনিয়োগ কর, বিন্দু পরিমাণ কাজ করিয়া পত্রিকাগাত্রে মুদ্রিত নামের পশ্চাতে বক্ষস্ফীতি জন্মাইও না।

বিলাসিতা বর্জ্জন করিতে হইবে, অপরের পোষাকের জাকজমকের দিকে চাহিও না; সাদা দেহে, সাদা মনে, সাদা পোষাক গ্রহণ কর, স্বল্পব্যয়ে বহিঃসৌন্দর্য্য সাধন কর। দারিদ্র্যে ঘৃণা করিও না—দারিদ্র্যে ঘৃণা জাতীয় পতনের মূলীভূত কারণ। ক্ষুদ্র জীবন যাপন কর, কিন্তু মহানাদর্শ অনুসরণ করিও, লোকে আমায় জানিল না বলিয়া অধীর হইয়া উঠিও না। পাঁচটী গ্রামের অভিযোগ দূর করিবার চেষ্টা কর, তোমার ক্ষুদ্র প্রাণ ধন্য হইবে।

এই নীরব সাধনা, অনাড়ম্বর জীবন, একনিষ্ঠতা, প্রচাররাহিত্য ভিন্ন কার্য্য হইবে না। ত্যাগে বড় হও, ভোগে নহে। তোমার স্পৃহারাহিত্যের আদর্শে আর দুইটী লোক তৈয়ারী কর দেখিবে দেশে ত্যাগী লোকের অভাব হইবে না। এই বিশ্বাস-ঘাতকতা, প্রতারণা, স্বার্থপরতার দিনে এমন আদর্শ সৃজন ও পোষণ করার আবশ্যকতা আছে, ইহাই ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন-গঠনের মূল ভিত্তি—নান্যপন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

বরিশাল-হিতৈষী

২। উপার্জ্জনোপযোগী শিল্পশিক্ষা

নিম্নলিখিত উপায়ে মাংস রাখিলে দশ বার দিবস উত্তমরূপ তাজা থাকে,—কোন পাত্রের মধ্যে মাংস রাখিয়া তাহাতে ননীতেলা দুগ্ধ এরূপভাবে ঢালিয়া রাখুন যেন মাংস ডুবিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে দুগ্ধ নষ্ট হইবে, কিন্তু মাংস দশ বার দিন টাটকা থাকিবে। মাংসে তৈল মাখাইয়া রাখিলে তিন দিনেও অখাদ্য হয় না।

লেবুর রস টাটকা রাখা—প্রথমে লেবুগুলিকে দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া চাপ দিয়া রস বাহির করুন। পরে এই রস ফ্লানেলে ছাকিয়া বোতলের মধ্যে পুরিয়া দৃঢ়ভাবে ছিপি বন্ধ করুন। অনন্তর এক খানি কড়াতে জল গরম করিয়া বা জলপূর্ণ বোতল তাহার মধ্যে রাখিয়া অর্দ্ধঘণ্টা জাল দিন, পরে শীতল হইলে বোতল নামাইয়া রাখুন। এই রস অনেক দিন টাটকা থাকিবে। লেবুর রসের সহিত দশ ভাগের

এক ভাগ ভিনিগার বা এলকোহল মিশ্রিত করিলেও ঐ রস নষ্ট হয় না।

মাখন তাজা রাখিবার উপায়—২ ভাগ লবণের সহিত এক ভাগ চিনি এবং এক ভাগ সোরা মিশ্রিত করুন। এই মিশ্রিত দ্রব্য মাখনে দিলে উহা খারাপ হয় না। এক পাউণ্ড পরিমাণ মাখনে এক আউন্স উক্ত মিশ্র দ্রব্য দেওয়া বিধি। যদি মাখনে দুর্গন্ধ হয় তবে ১ ড্রাম সোডা দিবেন। এইরূপ প্রিজার্ভ করা মাখন বিলাত ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী হয়।

বাসী ফুল তাজা রাখা—জলে লবণ মিশাইয়া সেই জলে ফুলের বোঁটা ডুবাইয়া রাখিলে শীঘ্র শুকাইয়া যায় না।

ডিম্ব রক্ষা—(১) ডিম্বের উপর আরবী গদ বা চর্ব্বি তুলিকা দ্বারা লাগাইয়া শুকাইয়া লইবেন। (২) পল্লীগ্রামের গৃহস্থগণ তুষের (ধান্যের) মধ্যে রাখিয়া ২০।২৫ দিন এমন কি দেড় মাস পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় তাজা রাখেন।

লবণের মধ্যে রাখিলেও না কি অনেক দিন তাজা থাকে।

দুগ্ধ রক্ষা—কাঁচা দুগ্ধের মধ্যে কয়েকটী খুব ঝাল লঙ্কা ভাঙ্গিয়া রাখিলে শীঘ্র টকিয়া যায় না, কিছু সোডা দিলেও অবিকৃত থাকে বলিয়া শুনিয়াছি।

কর্পূর—কর্পূর বড় উদ্বায়ী দ্রব্য, সহজ বাতাসে উড়িয়া যায়, কিন্তু একটা শিশির মধ্যে কর্পূর রাখিয়া তাহাতে কিছু গোলমরিচ দিলে অনেকটা ঐ দায় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

কমলা টাটকা রাখা—একটা বড় কাঠের বাক্স সংগ্রহ করুন। কতকগুলি বালু বেশ পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লউন। পরে বাক্সটীর নীচে বালু বিছাইয়া একটীর গায়ে আর একটী না লাগে এরূপভাবে কতকগুলি কমলা সাজাইয়া রাখুন, উপরে আবার বালু দিন (বালু প্রায় ৪।৫ আঙ্গুল পুরু করিয়া দিবেন)। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে বালু ও কমলা দ্বারা বাক্স পূর্ণ করতঃ উপরে এক স্তর বালু দিয়া ভাল করিয়া বাক্সটীর ডালা বন্ধ করিয়া রৌদ্র অথবা ঠাণ্ডা না লাগে এরূপ স্থলে রাখিয়া দিন। আমি এইরূপে গত মাঘ মাসের ২রা ২০০ কমলা রাখি এবং এই জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩রা তারিখে খুলিয়া ঐ সমস্তগুলি বেশ অবিকৃত অবস্থাতেই আছে। ৩৲ টাকার কমলা এইরূপে ১২ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে।

কয়েকটী আচার

আমের মিষ্ট আচার—কাঁচা আম কুড়িটা, রাই সরিষা এক ছটাক, মরিচ ২ তোলা, মেথি ২ তোলা, জিরা ২ তোলা, হরিদ্রা ১ তোলা, কালাজিরা ১ তোলা, লবণ ৩ তোলা, চিনি ৴১ সের, তৈল বা ইক্ষুরসের সির্কা ৴৸০ সের। প্রথমে আম লম্বা লম্বা করিয়া ২ বা ৪ খণ্ডে বিভক্ত করিবে। পরে তাহাতে লবণ ও সরিষা বাটা মাখাইয়া ২ দিন পর্য্যন্ত রাখিবে। ২ দিবস পরে দেখা যাইবে তাহা হইতে জল নির্গত হইতেছে। এখন আম্র খণ্ডগুলি তুলিয়া পরিষ্কার তিনতারবন্দ চিনির রসে চব্বিশ ঘণ্টা রাখিবে। পরে তাহাতে তৈল কিম্বা সির্কা ঢালিয়া দিয়া কিছুদিন রাখিলেই মিষ্ট আচার হইল।

কিসমিসের আচার—কিসমিস ৴১ সের, আঙ্গুর অথবা ইক্ষুর উত্তম সির্কা ৴৪ সের, গোলমরিচ চূর্ণ ১ ছটাক, কাল ও সাদা জিরা ১ ছটাক, সৈন্ধব লবণ ৩ ছটাক, বড় এলাচ চূর্ণ আধ ছটাক, আদা এক পোয়া। প্রথমে

সির্কা জ্বালে চড়াইবে এবং টক্‌বক্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিলে লবণ আদা কিসমিস তাহাতে ফেলিয়া দিবে। জ্বালে ৴১ সের পরিমাণ রস থাকিতে জিরা, গোলমরিচ এবং এলাচচূর্ণ দিয়া পরে অল্পমাত্র জ্বাল দিয়া নামাইয়া লইবে, তাহা হইলেই কিসমিসের আচার প্রস্তুত হইবে।

জারক লেবু—পাতি বা কাগজি লেবুগুলি প্রথমে পরিষ্কৃত করিবে, পরে যে পরিমাণ লেবু তাহার সিকি পরিমাণ ওজনে লবণ মাখাইয়া ২১ দিন রাখিবে। চারিটী লেবু জারা করিতে হইলে একটীর যত ওজন হইবে, লবণও সেই পরিমাণে ওজন করিবে। কিছুদিন ঐ অবস্থায় রাখিলে লেবু জারিয়া আসিবে। আস্ত লেবু জারা করিতে হয়।

খোর্ম্মার আচার—খোর্ম্মা বা ছোয়ারা ৴১ সের, সির্কা ৴১ সের, আদা ৴।০ পোয়া, লবণ ৴৵০ পোয়া। প্রথমে আদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কুচাইয়া রাখিবে এবং খোর্ম্মাগুলির বীচি ছাড়াইয়া লম্বাভাবে চারিখণ্ড করিবে। এখন সির্কা জ্বালে চড়াইয়া দেও এবং উত্তমরূপে ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে সমস্ত উপকরণগুলি ফেলিয়া দেও। জ্বালে ৴১ সের আন্দাজ থাকিতে নামাইয়া রাখ। তাহা হইলেই ছোয়ারার আচার পাক হইল—আচারে বিচার নাই। আরব ও তুরস্কাদি দেশের শুষ্ক খর্জ্জুরই ছোয়ারা বা খোর্ম্মা বলিয়া পরিচিত।

জাগরণ

৩। হেতমপুরে গৌরাঙ্গ-মঠ

ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজকুমার শ্রীযুত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের যত্নে ও উৎসাহে শ্রীগৌরাঙ্গ-মঠ প্রতিষ্ঠাকল্পে বিগত ২৩শে শ্রাবণ হেতমপুর কলেজ-প্রাঙ্গণে বিরাট সভার অধিবেশন ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র সোম মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অবিরাম ঝড় বৃষ্টি আদি দৈবদুর্য্যোগের প্রবলতা সত্ত্বেও সভায় যথেষ্ট জন-সমাগম হইয়াছিল। মঠের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর স্বাভাবিকজলদ স্বরে সুললিত ভাষায় মঠের মহৎ উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার ভাব-প্রবাহে সকলে এরূপ উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, সভাস্থলেই এই সদনুষ্ঠানের জন্য অনেক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং অনেক প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়াছে এবং এই মঠের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেকেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের অভাব বহুবিধ, তন্মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষার অভাবই শীর্ষস্থানীয় এবং সেই অভাবনিবন্ধনই সনাতন হিন্দুধর্ম্মে আমাদের অনাস্থা হইয়াছে; হিন্দু সমাজের অধঃপতন ঘটিয়াছে। জাতীয়তার এই পতনোন্মুখ মুহূর্ত্তেও সকলের সমবেত চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইয়া ধর্ম্ম-শিক্ষা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। সামাজিক বিপ্লবের এই দুর্দ্দিনে এইরূপ মঠ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় যে কিরূপ মহৎ উপকার সাধিত হইল তাহা হিন্দু-ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন। এই মঠের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য—পুরাকালের আর্য্য-ঋষিকুমারগণের আদর্শে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বালককে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম-শিক্ষা ও তাহাদের চরিত্র গঠন করা। এইরূপ দ্বাদশ বর্ষ কাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে রাখিয়া বিদ্যার্থীদিগকে উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত বিদ্যা ও তৎসহ পাশ্চাত্য প্রণালীতে গণিত, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে; কারণ শিক্ষা সময়োপযোগী করিতে

হইলে রাজভাষা ইংরাজী শিক্ষা অত্যাবশ্যকীয়; এরূপ সমন্বয়ে মণি-কাঞ্চন যোগ হইয়াছে। সিউড়ি জজ কোর্টের উকীল বাবু মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বি, এল্, মহাশয় তাঁহার সারগর্ভ সংযুক্ত বক্তৃতায় এরূপ শিক্ষার সারবত্তা সাধারণকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বিদ্যাশিক্ষার্থিগণের মঠে অবস্থানকালের যাবতীয় ব্যয়ভার ও ব্রাহ্মণ কুমারগণের উপনয়ন-সংস্কারের ব্যয় মঠ হইতে দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় কার্য্য—ব্যাধিপ্রপীড়িত নিঃসহায় ও নিঃস্ব ব্যক্তিগণকে ঔষধ পথ্য, আশ্রয় এবং সেবা-শুশ্রূষার জন্য এই মঠের আনুসঙ্গিক ইনডোর হাঁসপাতালও প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। অবশ্য এরূপ আশ্রয়ের অভাব না থাকিলেও মফঃস্বলে ইহার সংখ্যা অতি বিরল। তৃতীয় কার্য্য—পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকবালিকাদিগকে আশ্রয়-দান, অসহায়া বিধবাগণের অভাব মোচন এবং অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি অক্ষম ব্যক্তিদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য-প্রদান। এই মহৎ অনুষ্ঠানে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও যোগদান বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এই মঠের স্থায়ী সভাপতি হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর। শ্রীযুক্ত দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত নশিপুরের মহারাজ বাহাদুর ও উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সি, আই, ই, এবং বীরভূম জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্টর রায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র সি, এস্, মহোদয় প্রভৃতি দেশস্থ গণ্যমান্য মহোদয়গণ ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মানুরাগের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর সম্পাদক ও সিউড়ির সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত রায় সাহেব কালিকানন্দ মুখোপাধ্যায় সহকারী সভাপতি ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক এবং বাবু সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ইহার মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায় যে, এই মঠের স্থায়িত্ব ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, হেতমপুরের মহারাজকুমার সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই মঠের জন্য বিস্তৃত ভবন এবং অধ্যাপক, পরিদর্শক এবং হাঁসপাতালের চিকিৎসক, ঔষধ এবং পথ্যাদির ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সভাভঙ্গের পর হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন সহকারে সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলী সংস্থাপিত মঠ ও হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে দুইটী বিদ্যার্থী বালক গৈরিক বসন পরিধান করিয়া গুরুর সহিত উপবিষ্ট থাকায় কি যে এক অভিনব দৃশ্য উৎপাদন করিয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব। আমরা কায়মনোবাক্যে এই মঠের স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

বীরভূম-বার্ত্তা

কয়েকটী প্রাচীন বিষয়

প্রথম গির্জ্জা

বাঙ্গালাদেশে হুগলী জেলার অন্তর্গত ব্যাণ্ডেল সহরে প্রথম গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। ১৫৯৭ সালে ভিল্লালোবস্ নামে একজন পর্ত্তুগীজ হুগলীর এক মাইল উত্তরে ব্যাণ্ডেল সহরে প্রার্থনা করিবার জন্য প্রথম গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন।

প্রথম টানা-পাখা

আজ কাল "ইলেট্রিক ফ্যান" না হইলে চলে না; কিন্তু ইউরোপীয়েরা যখন প্রথম বাঙ্গালাদেশে আসেন তখন হাত-পাখা দ্বারাই গ্রীষ্ম অপনোদন করিতেন। চুঁচুড়া সহরে টানা-পাখার প্রথম প্রচলন হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ডাচ্ গভর্ণর সাহেব একদিন ব্যারাকের গৃহে বসিয়া আছেন; হঠাৎ বাতাসের একটা ঝাপটা আসিয়া একখানি খবরের কাগজকে কড়িকাঠে তুলিয়া দোলাইতে থাকে! এ ঘটনা দৃষ্টে তাঁহার মাথায় টানা-পাখার মত একটা কিছু করিবার খেয়াল উঠে। তিনিই পরে টানা-পাখার সৃষ্টি করেন।

প্রথম মুদ্রাযন্ত্র

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী সহরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সার চার্লস্ উইলকিন্স (Sir Charles Wilkins) সাহেবই এ বিষয়ের অগ্রণী। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হালহাড সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশ করিবার জন্য স্বহস্তে বহুদিন পরিশ্রম করিবার পর কাঠের খোদাই বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। এ কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য তিনি পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তিকে খোদাই-কার্য্য শিখাইয়া লইয়াছিলেন। ইনি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের আনুকূল্যে সর্ব্ব প্রথম গীতার ইংরেজী অনুবাদ করেন।

প্রথম ছাপা

বাঙ্গালা দেশে বেসি হালহেড নামক এক জন সাহেবের লিখিত ব্যাকরণই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন। এই পুস্তকের মলাটের শীর্ষস্থানে বোপদেবের মুগ্ধবোধের প্রারম্ভের অনুকরণে লিখিত আছে:—

"বোধ প্রকাশং শব্দ শাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থ ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী"। মলাটের মধ্যস্থলে স্বারস্বত ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্লোক,—"ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ। প্রক্রিয়াস্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নরঃ কথং" উদ্ধৃত হইয়াছে।

এ পুস্তক কোন মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নাই, তবে ইংরাজিতে Printed at Hugly in Bengal 1778 লিখিত আছে। বইখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত, বৈয়াকরণিক নিয়মগুলি বুঝাইবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর হইতে উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এ গুলি বাঙ্গালা অক্ষরে। এই পুস্তকের একটি উদাহরণও গ্রন্থকার নিজে দেন নাই।

পল্লীবার্ত্তা

৪। ভারতের উদ্ভিদ

(আঁশ-পর্য্যায়)

আকন্দ—বঙ্গের নানা স্থানে অবহেলা-অশ্রদ্ধায় জন্মিয়া থাকে। অথচ ইহার প্রতি সাধারণের তেমন দৃষ্টি নাই। ইহাকে হিন্দিতে মদর, দাক্ষিণাত্যে অক্র, সংস্কৃত ভাষায় অর্ক্ক বলে এবং ইহার ল্যাটিন নাম "ক্যালোট্রপিস্ যাইগ্যানশিয়া।" আকন্দের তুলার বালিশ প্রভৃতি ব্যবহার অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু এই তুলা ধুনিয়া যে সূক্ষ্ম-সূত্র তৈয়ারী হয়, তদ্বারা "ফ্লানেলের" ন্যায় উপকারী বস্ত্র বয়ন করা যাইতে পারে। আকন্দের ডাঁটা হইতে যে আঁশ পাওয়া যায়, তাহা হইতে খুব মজবুদ দড়ী তৈয়ারী হইয়া

থাকে—এই জন্য এই আঁশ-নির্ম্মিত সূত্র "ধনুগুর্ণ-সূত্র" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই আঁশ নির্ম্মিত একগাছি আধ ইঞ্চি মোটা দড়ী ঐ পরিমাণে মোটা শোন, পাট, কার্পাস, কোঁয়া এবং কাতা দড়ী অপেক্ষা পরীক্ষায় অধিক ভার বহনে সক্ষম হইয়াছে। আকন্দের তুলা, কাগজ তৈয়ারীর উপকরণ মধ্যে গণনীয়। আকন্দের ডাঁটা জলে ভিজাইয়া রাখিলে পচিয়া যায়, সুতরাং পাট পচান প্রথায় ইহার আঁশ বাহির করা যায় না। সেই জন্য ইহা জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া আঁশ ছাড়াইয়া লইতে হয়। আকন্দের আঁশ হইতেও কাগজ তৈয়ারী হইতে পারে। ভারত-গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব বন-বিভাগের কর্ম্মচারী জি, ডবলু ষ্টেটেল সাহেব, এবং বোম্বাই মিউজিয়ামের কিউরেটার, এই আঁশকে কাগজ প্রস্তত-করণের উৎকৃষ্ট উপকরণ বলিয়াছেন; কিন্তু কটলেজ সাহেবের ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লিখিত "কিউ" বিবরণীতে ইহার বিরুদ্ধ মত প্রকটিত হইয়াছে। তিনি অবশ্য আকন্দের তুলা ও আঁশকে কাগজের উপকরণরূপে গণ্য করিয়াছেন, তবে ইহা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ এ কথা স্বীকার করেন নাই। মাদ্রাজ প্রদেশের বেলারী নামক জেলায় এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ফরক্কাবাদ এবং মিরাট অঞ্চলে এবং পাঞ্জাব প্রদেশের স্থানে স্থানে আকন্দের আঁশ হইতে কাগজ তৈয়ারী হইত এরূপ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শত বুড়য়া বা শতপুর—এই বৃক্ষ হিমালয়ের সর্ব্বত্র জন্মিয়া থাকে। হিন্দি নাম শেত বুড়য়া, বা শতপুরা। নেপাল দেশে ইহা গণ্ডী ও কাঘুটি নামে প্রসিদ্ধ; ভুটিয়ারা ইহাকে দয়সিং বলে। ল্যাটিন নাম "ড্যাফনে প্যাপিরেসিয়া"। এই বৃক্ষের ত্বক হইতে চিরপ্রসিদ্ধ "নেপালী কাগজ" তৈয়ারী হয়। খাসিয়া ও নাগা পর্ব্বতেও এই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এই পার্ব্বত্য স্থানের অধিবাসীরা কাগজের ব্যবহার অবিদিত বলিয়া, এই বল্কলের আঁশে দড়ী তৈয়ারী করিয়া থাকে।

বট বৃক্ষ—বট বৃক্ষের ত্বক ও ঝুরি হইতে স্থানে স্থানে মোটা দড়ী তৈয়ারী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আসাম প্রদেশে বট-বল্কল হইতে প্রচুর পরিমাণে কাগজ তৈয়ারী হইত বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ব্বে আসাম প্রদেশের লক্ষ্মীপুর নামক স্থানে, এবং মাদ্রাজ প্রদেশের বেলারী নামক জেলায় এই কাগজের দেশীয় কারখানার অস্তিত্ব ছিল, এমন পরিচয় ওয়াট সাহেবের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

পদ্ম— পদ্মের মৃণাল বা ডাঁটা হইতে একরূপ সূক্ষ্ম হরিদ্রাভ আঁশ বাহির হইয়া থাকে। আঁশে দেব-মন্দিরের দীপ জ্বালিবার শলিতা ভারতের নানা স্থানে তৈয়ারী হইয়া থাকে। এই আঁশ ও অন্য আঁশের সংযোগে লণ্ঠনের পলিতা ও ল্যাম্পের পল্‌তে তৈয়ার করিয়া শিল্প-কর্ম্ম চালাইতে পারা যায় কি না তাহার পরীক্ষা করা উচিত।

অশ্বত্থ—অশ্বত্থ বৃক্ষের ত্বক হইতে আঁশ বাহির করা যায়। পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে এই আঁশ হইতে সূত্র নির্ম্মিত হইত ও সেই সূত্রে যে বস্ত্র তৈয়ারী হইত, তাহাতে ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ ছত্র নির্ম্মিত হইত। এখন এ ব্যবসায় ব্রহ্মদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। চীন দেশবাসীরা এখন এই শ্রেণীর ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

আনন্দ বাজার

মুন্সীগঞ্জে ব্রাহ্মণ সভা।

আমাদের জনৈক বিশ্বস্ত ও প্রত্যক্ষ দর্শক সংবাদ-দাতার নিকট অবগত হইলাম ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার যে ব্রাহ্মণ মহা সম্মিলনী নামে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন মাত্র। কলিকাতার ইংরাজী সংবাদপত্র সমূহে যে টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে সংবাদ প্রেরকের তিন সহস্র লোকের সমাবেশের কথা লিখিয়াছেন এবং বঙ্গের প্রতি

জেলা হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া ছিলেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আমাদের সংবাদদাতা বলেন সভায় ছয় সাত শত লোকের বেশী উপস্থিত হয় নাই এবং মুন্সীগঞ্জের সন্নিহিত স্থানসমূহ ব্যতীত বঙ্গের অন্য জেলা হইতে কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েন নাই। সংবাদপত্র স্তম্ভে এরূপ অমূলক সংবাদ প্রকাশ করিবার সার্থকতা কি, আমরা বুঝিতে পারি না।

তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর বারাণসীর মহাধর্ম্মমণ্ডলে স্থান না পাইয়া বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজ সংস্কার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর স্কন্ধে চাপিয়া এই সভার সংগঠন করিয়াছেন বলিয়া আমাদের সংবাদদাতা প্রকাশ করিয়াছেন। মুন্সীগঞ্জের যে স্থানে এই সভা হইয়াছিল আমরাও সেস্থান একবার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছি। সেই টিনের ঘরে এবং তৎসংলগ্নে সাবিয়ানার তলে তিন সহস্র লোকের সমাবেশ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। তিন সহস্র হউক বা তিন শত হউক লোক সংখ্যার অল্পতা বৃদ্ধিতে আমাদের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সভায় যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আমাদের দুই চারিটী কথা বলা প্রয়োজন।

সভায় যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে তাহার মধ্যে বিদেশ প্রত্যাগত হিন্দুদিগকে সমাজে পুনগ্রহণ করা যায় কি না ইহাই আমাদের নিকটে সর্ব্বপ্রদান বলিয়া অনুমিত হয়। সভা এ সম্বন্ধে নাকি এই স্থির করিয়াছেন যে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও অখাদ্য ভোজীদিগকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আমরা এই সকল ব্রাহ্মণ সমাজ সংস্কারকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যাহারা দেশে থাকিয়া, সমাজের বক্ষের উপর বসিয়া অখাদ্য ভক্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে কি শাস্তি প্রদান করিবেন? আর এই সকল অখাদ্য ভোজী হিন্দুর বাড়ীতে যে সকল ব্রাহ্মণেরা ফলাহার করিতেছেন মাতৃ পিতৃ শ্রাদ্ধে দানগ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদেরই বা কি শাস্তির ব্যবস্থা হইবে? বঙ্গবাসী পত্রিকার পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বিদেশ প্রত্যাগতদিগকে সমাজে গ্রহণ করা যায় কি না এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন—তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহার কি হয় আমরা তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। শশিশেখরেশ্বর কি মনে করিয়াছেন যে তিনি সমাজের গতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবেন? গঙ্গানদীর স্রোত ফিরাইয়া হিমালয়ের দিকে লইতে চেষ্টা করা এবং আধুনিক হিন্দু সমাজেই পুনরায় মনুসংহিতা বা রঘুনন্দনের শাসনে আনয়ন করিতে চেষ্টা করা একই কথা। এরূপ বৃথা চেষ্টায় উদ্যম ও অর্থের অপব্যয় করিয়া দেশের ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই।

ব্রাহ্মণ সমাজ, অধ্যাপক এবং পুরোহিতগণের উন্নতির চেষ্টায়, সংস্কৃত শিক্ষা প্রসার, সমাজের দূষনীয় আচার ব্যবহারের প্রতিবিধান, এ সকল চেষ্টায় কেনা সহানুভূতি প্রকাশ করিবে? ব্রাহ্মণ সমাজ যদি অন্য সমাজের প্রতি আইন জারি না করিয়া স্বীয় সমাজকে উন্নত করিতে চেষ্টা করেন তবে ব্রাহ্মণ সমাজ এবং সমগ্র হিন্দু সমাজের উপকার হয়। আমরা ইহাও অবগত হইলাম ব্রাহ্মণের অন্যান্য জাতির সামাজিক উন্নতির চেষ্টায় বাধাপ্রদান করাও এই সভার অন্যতর উদ্দেশ্য। আমরা আশা করি, এই সংস্কার চেষ্টায় হিন্দু সমাজের কোনও ক্ষতি হইবে না। এরূপ সাময়িক অভ্যুত্থানের চেষ্টা মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে এবং তাহা জলবুদবুদের ন্যায় অল্পকাল মধ্যেই বিলীন হয়। কালের গতিতেও অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের বিধানে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতেছে ও হইবে তাহা তিন শত বা তিন সহস্র মনুষ্যের চেষ্টায় কখনও ব্যর্থ হইবে না।

পরিচারক।

পরিশিষ্ট।

নিরয়ণ তাৎকালিক রবি ২।১৬।৫।৪৩ ; ২ রাশি অর্থাৎ মেষ আর বৃষ গত হ'য়ে মিথুনের ১৬।৬ গত হ'য়েছে। অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্ন-খণ্ডায় দেখ—

মিথুনের মান ৩৩০ পলে ৩০ অংশ; সুতরাং ১৬ অংশ ৬ কলাতে কত পল ?

৩০ : ১৬।৬ : : ৩৩০ : কত ?

= ১৬।৬ × ৩৩০ / ৩০

= ১৬।৬ × ১১ = ১৭৭ পল

+ জন্ম সময় উদয়াবধি = ১৩৮৬ পল

সমষ্টি ১৫৬৩ পল

− মিথুন ৩৩০ ,,

১২৩৩ ,,

− কর্কট ৩৩৯ ,,

৮৯৪ ,,

− সিংহ ৩৩১ ,,

৫৬৩ ,,

− কন্যা ৩২৮ ,,

বাকী ২৩৫ তুলার

তুলার মান ৩৩৬ পলে ৩০ অংশ

∴ ৩৩৬ : ২৩৫ : : ৩০ কত ?

= ২৩৫ × ৩০ / ৩৩৬

= ৭০৫০ / ৩৩৬ = ২০ অংশ ৫৯ কলা

∴ নিরয়ণ লগ্ন ৬।২০।৫৯ অর্থাৎ তুলার কুড়ি অংশ উনষাইট কলা।

এই যে বেশী হলো, সেটা ঐ অয়নাংশ বেশী স্বীকার করার ফল মাত্র।

আমি। এইবার আমি অপর কয়টি লগ্ন করি।

গুরুদেব। তা পার, কিন্তু আগে সচরাচর কোষ্টীতে যেরূপ জন্মকুণ্ডলী লিখিত হয়, এই লগ্ন সাহায্যে সেইরূপ একটি চক্র করা মন্দ নয়।

আমি। আমি সেরূপ চক্র উদ্ধার করতে পারি।

গুরুদেব। আচ্ছা কর দেখি ?

আমি। এই চক্র এঁকে, প্রথমে নিরয়ণ লগ্ন, তুলায় বসালাম তা'র পর আষাঢ় মাসের রবি মিথুনে দিলাম পাঁজীতে ঐ তারিখের পার্শ্বে লেখা আছে ৬৸ সুতরাং রবির পাশে ৬ বসালাম, তা'র পর চন্দ্র বৃষে বসিয়ে, কৃত্তিকার ভোগ্য ২০।২৬ দণ্ডাদি ব'লে, চন্দ্রের পাশে ৪ বসাইলাম।
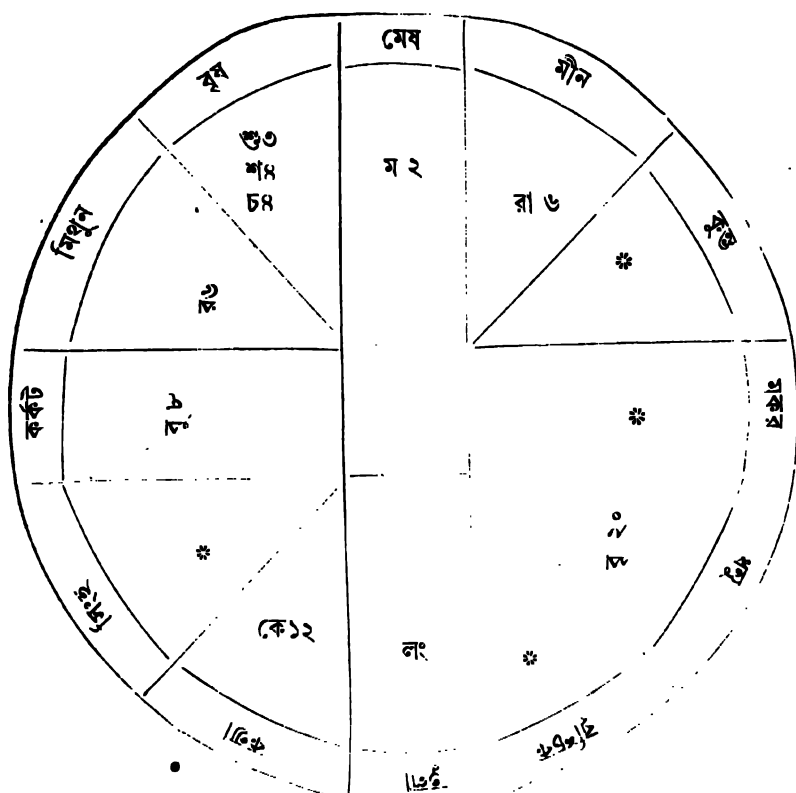
তা'র পর এই পঞ্জিকার ১২৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত কুজাদি গ্রহের রাশ্যাদি সঞ্চারে দেখ্‌চি ১৭ই তারিখের পূর্ব্বে শুক্র বৃষে (৩), মঙ্গল ২ ভরণীতে, এবং বুধ ৮ পুষ্যাতে গেছেন, বাকী সব সংক্রান্তির দিনের মতই আছে, সুতরাং চক্র অনুসারে গ্রহ ও তাহাদের আশ্রয় নক্ষত্র নির্দ্দেশ কল্লাম।

শুরুদেব। ঠিক হ'য়েছে।

আমি। ভাবচক্র কিরূপে প্রস্তুত ক'র্ত্তে হয়, সেটা শিখিয়ে দিন।

শুরুদেব। তুমি দু'একটা লগ্ন কর; তা'র পর দশম নির্ণয় ক'রে, কেমন ক'রে দ্বাদশ ভাব ও ভাবসন্ধি নির্ণয় ক'র্ত্তে হয় এবং বিভিন্ন দেশে চক্র আঁকবার রীতিই বা কি রূপ তা দেখিয়ে দিব।

আমি। যে আজ্ঞা। লাহোরের অক্ষাংশাদি ৩১।৩৪উ তদনুসারে পলভা হয়েছে ৭ অঙ্গুল ২২ ব্যঙ্গুল। এই অঙ্ককে যথাক্রমে ১০,৮ ও ১০/৩ দিয়ে গুণ করে মেষের ৭৪, বৃষের ৫৯ এবং মিথুনে ২৫ চরার্দ্ধ পল স্থির করলাম।

৭।২২	৭।২২	৭।২২
১০	৮	১০
৭৩।৪০	৫৮।৫৬	৩)৭৩।৪০
		২৪।৩৩

গুরুদেব। কোন কোন জ্যোতিষাচার্য্য গুণ করলে ৬০ দিয়ে ভাগ দিতে বলেন, কিন্তু বচনানুসারে সেরূপ কোন প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে না।

আমি। এখন মেষের লঙ্কোদয় ২৭৮ থেকে ৭৪ বাদ দিয়ে পেলাম ২০৪, বৃষের ২৯৯—৫৯ ২৪০ এবং মিথুনের ৩২৩—২৫=২৯৮ পল হ'লো। তা'র পর কর্কটের ৩২৩+২৫=৩৪৮, সিংহের ২৯৯+৫৯=৩৫৮ এবং কন্যার ২৭৮+৭৪=৩৫২ পল এই গুলিই ব্যুৎক্রমে তুলাদির মান। সুতরাং লাহোরের জন্য প্রাচীন লগ্ন খণ্ডা হ'লো—

৩১।৩৪ উ অক্ষাংশাদি সন্নিহিত দেশের লগ্নখণ্ডা।

রাশি	মেষারম্ভ হইতে অংশ পরিমাণ	মেষারম্ভ হইতে উদয়পল পরিমাণ	ভোগ্য
১ মেষ	৩০	২০৪	২৪০
২ বৃষ	৬০	৪৪৪	২৯৮
৩ মিথুন	৯০	৭৪২	৩৪৮
৪ কর্কট	১২০	১০৯০	৩৫৮
৫ সিংহ	১৫০	১৪৪৮	৩৫২
৬ কন্যা	১৮০	১৮০০	৩৫২
৭ তুলা	২১০	২১৫২	৩৫৮
৮ বৃশ্চিক	২৪০	২৫১০	৩৪৮
৯ ধনু	২৭০	২৮৫৮	২৯৮
১০ মকর	৩০০	৩১৫৬	২৪০
১১ কুম্ভ	৩৩০	৩৩৯৬	২০৪
১২ মীন	৩৬০	৩৬০০	২০৪

এখন সেই পূর্ব্বনির্ণীত তাৎকালিক রবি অবলম্বন ক'রে ক'স্‌বো কি?

গুরুদেব। তা হ'বে কেন? কলিকাতায় যখন সূর্য্যোদয় হয়, লাহোরে তা'র অনেক পরে সূর্য্যোদয় হয়। তখন লাহোরের ২টা ৩৫ মিনিটে কলিকাতার ২টা ৩৫ মিনিটের সমান স্ফুট হ'বে কি ক'রে?

আমি। তবে স্বতন্ত্র ভাবে নির্ণয় করতে হ'বে। লাহোরের অক্ষাংশাদি ৩১.৩৪ আর কলিকাতার ২২।৩৩, উভয়ের অন্তর ৯ অংশ ১ কলা। ১৫ অংশ ১ ঘণ্টার তুল্য সুতরাং ৯ অংশ ১ কলাতে প্রায় ৩৬ মিনিট হ'বে সুতরাং লাহোরে যখন ২টা ৩৫ মিনিট, তখন কলিকাতায় ৩টা ১১ মিনিট হ'বে; সুতরাং ৩টা ১১ মিনিটের সময় কলিকাতায় যে স্ফুট তাই লাহোরের ২টা ৩৫ মিনিটের স্ফুট হ'বে। কি বলেন?

গুরুদেব। হাঁ তা' হ'লে ঠিক হ'বে।

আমি। তবে কলিকাতার ৩টা ১১মিঃ সময়ের রবিস্ফুট করি। ২৪ ঘণ্টায় ঐ দিন রবির গতি পেয়েছি ৫৬।৫১ ; কলিকাতার ঐ দিন সূর্য্যোদয় ৫।২১ মিঃ সময়ে সুতরাং—

১২।০ – ৫।২১ + ৩।১১ = ৯ঘঃ ৫০ মিনিটের গতি নির্ণয় ক'ত্তে হ'বে।

২৪ : ৯।৫০ :: ৫৬।৫১ : কত ?

$$= \frac{৫৯০ \text{ মিঃ} \times ৫৬।৫১}{১৪৪০} = ২ \text{ কলা } ১৯.৭ \text{ বা } ২০ \text{ বি}$$

∴ ২।১৫।৪৩।৫০ + ০।০।২।২০ = ২।১৫।৪৬।১০ তাৎকালিক রবি

গুরুদেব। ৫৬।৫১-র পরিবর্ত্তে ৫৭ কলা নিলেও ঐ ফল হ'তো।

আমি। লাহোরের সূর্য্যোদয় কস্‌তে হ'বে—২।১৫।৪৬ + ০।২১।৪৭ = ৩,৭।৩৩ সায়ন সূর্য্য সুতরাং টেবিল (৪২ পৃ) অনুসারে ক্রান্তি ২৩।৯উঃ ; লাহোরের অক্ষাংশাদি ৩১।৩৪, দিবার্দ্ধ ও রাত্র্যর্দ্ধ সারিণী (২০ পৃঃ) সাহায্যে—

২২।২৮ ক্রান্তি ৩০ অক্ষ = ৬।৫৮ ও ৪০ অক্ষ = ৭।২১
২৩। ০ " " = ৬।৫৭ " = ৭।২৩
২৮ " " ০। ১ " ০। ২

২৮ কলা : ৯ কলা :: ১মিঃ : কত ?

$$= \frac{৯ \times ৬০}{২৮} = ১৯ \text{ সে}$$

∴ ২মি = ৩৮ সেঃ

∴ ৩০ অক্ষে ২৩।৯ ক্রান্তিতে ৬।৫৭।১৯
৪০ " ২৩,৯ " ৭।২৩।৩৮
১০ অক্ষে ২৬।১৯

১০ অংশে : ১।৩৪ :: ২৬।১৯ : কত ?

$$= \frac{৯৪ \times ২৬।১৯}{৬০০} = ৪।৭$$

∴ ৩১।৩৪ অক্ষে ২৩।৯ ক্রান্তিতে ৬,৫৭।১৯ + ০।৪।৭ = ৭।১।২৬ অস্তকাল, এবং ৪।৫৮।৩৪ উদয় কাল ; তা'তে কালসমীকরণাঙ্ক ২ মিঃ যোগ ক'রে ৫টা উদয় কাল পেলাম। সুতরাং সূর্য্যোদয়ের পর ৭।০ + ২।৩৫ = ৯ ঘণ্টা ৩৫ মিঃ সময়ের লগ্ন করতে হ'বে।

৯।৩৫মি = ২৩।৫৭ দণ্ডাদি = ১৪৩৭ পল।

৩০ : ৭।৩৩ :: ৩৪৮ : কত ?

$$\frac{৭।৩৩ \times ৩৪৮}{৩০} = ৮৭$$

তাৎকালিক রবির ৩ রাশি = ৭৪২
৭।৩৩ = ৮৭
উদয়াবধি = ১৪৩৭
মোট ২২৬৬
৭ তুলা পর্য্যন্ত = ২১৫২
বৃশ্চিক ১১৪ ভুক্ত

বৃশ্চিক = ৩৫৮

∴ ৩৫৮ : ১১৪ :: ৩০ : কত ?

$$= \frac{১১৪ \times ৩০}{৩৫৮} = ৯^\circ - ৬'$$

∵ সায়ন লগ্ন ৭।৯।৬

অয়নাংশ ০।২১।৪৪

নিরয়ণ লগ্ন = ৬।১৭।১৯

এস্থলেও তুলা লগ্ন, সুতরাং জন্মকুণ্ডলী পূর্ব্ববৎ হ'বে।

গুরুদেব। তবে তুমি প্রক্রিয়াটি বেশ বুঝেছ দেখ্‌চি. এখন আর মান্দ্রাজের লগ্ন না ক'রে, মেলবোর্ণের লগ্ন কর। ঐটিতে একটু বিশেষত্ব আছে।

আমি। দক্ষিণ অক্ষে অবস্থিত ব'লে ?

গুরুদেব। হাঁ!

আমি। আচ্ছা কস্‌চি। মেল্‌বোর্ণের অক্ষাংশ ৩৭।৫০ দঃ। দেশান্তর গ্রীণীচ পূর্ব্ব

১৪৪ – ৫৯ বা ১৪৫ = ৯ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

৩৭ অংশ ৫০ মিঃ ট্যান = ৯.৮৯০২০৪০

গুরুদেব। ওটা যে লগারিথিমিক ট্যান। ওকে ১২ দিয়ে গুণ ক'ত্তে হ'লে ১২ র লগ্ অঙ্ক বা চারাঙ্ক ১.০৭৯১৮১২ ওর সঙ্গে যোগ ক'রে ফলের লগ্. বাহির ক'ত্তে হ'বে ?

আমি। যোগ ক'র্‌চি—

৯.৮৯০২০৪০
১.০৭৯১৮১২
১০.৯৬৯৩৮৫২ হ'লো

তা'র পর ?

গুরুদেব। ও ১০ ছেড়ে দিতে হয়। এখন গ্রন্থে ৯৬৯৩৮ ইত্যাদি খুঁজে বার কর। চেম্বসের টেবিলের ১১২ পৃষ্ঠায় ৯৬৯৩৮ = ৯৩১৯৪ পাওয়া গেল সুতরাং ৯.৩১৯৪ অঙ্গুল হ'লো পলভা আর আমি স্বাভাবিক ট্যান সাহায্যে কসেছিলাম ৩৭।৫০এর স্বাভাবিক ট্যান (৩১৩পৃ) .৭৭৬৬১১৮ তারে ১২ দিয়ে গুণ কর, ফল হবে ৯.৩১৯৩৪১৬ দুই প্রকারেই এক ফল হ'লো।

আমি। লগারিথিম্‌টা আমায় বুঝিয়ে দিন।

গুরুদেব। ঐ বইয়ের প্রথম ৪২ পৃষ্ঠায় যা লেখা আছে, তা পড়্‌লেই সহজে বুঝ্‌তে পার্‌বে; যদি একান্ত কোন জায়গা কঠিন বোধ হয়, পরে জিজ্ঞাসা ক'রো।

তবে এখন চর নির্ণয় করি। আপনার শেষাঙ্কের ৪ পদ দশমিক পর্য্যন্ত নিয়ে যথাক্রমে ১০, ৮ ও ১০ দিয়ে গুণ ক'রে মেষাদি রাশির চর যথাক্রমে ৯৩, ৭৪ ও ৩১ পল পেলাম এখন টেবিল করি। মেষ ২৭৮ তা থেকে ৯৩ বিয়োগ ক'ল্লে—

৯.৩১৯৩	৯.৩১৯৩	৯.৩১৯৩
.১০	.৮	১০
৯৩.১৯৩	৭৪.৫৫৪৪	৩।৩১.১৯৩
		৩১.০৬৪

গুরুদেব। এখানে বিয়োগ হবে না। দক্ষিণ গোলার্দ্ধস্থিত দেশে মকরাদি ছয় রাশি তুলাদি ছয় রাশি অপেক্ষা দূরে অবস্থিত, এজন্য ঐ গুলির উদয়কাল বর্দ্ধিত হ'বে সুতরাং বিয়োগের পরিবর্ত্তে যোগ করতে হ'বে আর তুলাদিতে যোগের পরিবর্ত্তে বিয়োগ কর্ত্তে হ'বে।

আমি। তাই করছি—

৩৭।৫০ দ অক্ষাংশাদি সন্নিহিত দেশের লগ্নখণ্ড।

রাশি	লঙ্কোদয় মান	± চর	= প্রাচীন মান পল	মেষারম্ভ হইতে পল	ভোগ্য
১ মেষ	২৭৮	+ ৯৩	= ৩৭১	৩৭১	৩৭১
২ বৃষ	২৯৯	+ ৭৪	= ৩৭৩	৭৪৪	৩৫৪
৩ মিথুন	৩২৩	+ ৩১	= ৩৫৪	১০৯৮	২৯২
৪ কর্কট	৩২৩	− ৩১	= ২৯২	১৩৯০	২২৫
৫ সিংহ	২৯৯	− ৭৪	= ২২৫	১৬১৫	১৮৫
৬ কন্যা	২৭৮	− ৯৩	= ১৮৫	১৮০০	১৮৫
৭ তুলা	২৭৮	− ৯৩	= ১৮৫	১৯৮৫	২২৫
৮ বৃশ্চিক	২৯৯	− ৭৪	= ২২৫	২২১০	২৯২
৯ ধনু	৩২৩	− ৩১	= ২৯২	২৫০২	৩৫৪
১০ মকর	৩২৩	+ ৩১	= ৩৫৪	২৮৫৬	৩৭৩
১১ কুম্ভ	২৯৯	+ ৭৪	= ৩৭৩	৩২২৯	৩৭১
১২ মীন	২৭৮	+ ৯৩	= ৩৭১	৩৬০০	৩৭১

এইবার রবিস্ফুট। কলিকাতা ৮৮।৩৩ মেলবোর্ণ ১৪৪।৫৯ উভয়ের অন্তর ৫৬°।২৬′ —(১৫°=১ ঘণ্টা হিসাবে) ৩ ঘ ৪৫ মি ৪৪ সে বা ৩ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট। ২৪ ঘণ্টায় ঐ দিন রবির গতি পেয়েছি ৫৭ কলা—

$$\therefore\quad ২৪ : ৩।৪৬ :: ৫৭ : কত?$$

$$= \frac{৩।৪৬ \times ৫৭}{২৪} = ৯।১৩$$

$$\therefore\quad ২।১৫।৪৩।৫০ - ৯।১৩$$

$$= ২।১৫।৩৪।৩৭$$

$$+ অয়নাংশ\ \ ২১।৪৭$$

$$৩।\ ৭।২২$$

এইবার উদয়কাল। ক্রান্তি = ২৩।৯ উ, অক্ষ = ৩৭।৫০ দ

৩৭° অক্ষ ২৩° ক্রান্তি = ৭।১৫ ; ২৩°।২৮′ ক্রান্তি = ৭।১৬
৩৮° অক্ষ „ = ৭।১৭ „ ৭।১৯
১′ = ৬০″ ২′ = ১২০″ ৩′ = ১৮০″
∵ ৫০′ = ১০০″ ১৫০″

এবং ৩৭।৫০ অক্ষ ২৩ ক্রান্তি = ৭।১৬।৪০
„ ২৩।২৮ = ৭।১৮।৩০
অন্তর ০।২৮ = ০। ১।৫০

এখন ২৮ : ৯ :: ১।৫০ : কত ?

= (৯ × ১।৫০) / ২৮ = ০ ৩৫

∴ ৩৭।৫০ অক্ষ ২৩।৯ ক্রান্তি = ৭।১৭।১৫
কালসমীকরণ :- ৪
৭।২১ উদয়কাল

∴ ১২।০ − ৭।২১ + ২।৩৫ = ৭।১৪ ঘণ্টাদি
ঘ ৭।১৪ মি = ১৮ দণ্ড ৫ পল
= ১০৮৫ পল

সায়ন সূর্য্য = ৩।৭।২২, কর্কট ভোগ্য ২৯২

∴ ৩০ : ৭।২২ :: ২৯২ : কত ?

= (৭।২২ × ২৯২) / ৩০ = ৭২ পল

৩ রাশি = ১০৯৮ পল
৭।২২ = ৭২ পল
উদয়াদি ১০৮৫ পল
২২৫৫ পল
৮ বৃশ্চিক = ২২১০ পল
ধনু ভুক্ত = ৪৫ পল

∵ ধনু ভোগ্য = ২৯২ পল
∴ ২৯২ : ৪৫ :: ৩০ : কত ?

= (৪৫ × ৩০) / ২৯২ = ৪ অংশ ৩৭ কলা

অতএব সায়ন লগ্ন ৮। ৪।৩৭
− অয়নাংশ ২১।৪৭
৭।১২।৫০ নিরয়ণ লগ্ন।

বৃশ্চিকের প্রায় ১৩ অংশ লগ্ন হ'লো যে ?

গুরুদেব। তা ত হ'বেই। দক্ষিণ অক্ষে ওরূপ হ'বার কথা। এখন একটা স্থূল রাশি চক্র অঙ্কিত করি। এ রাশি চক্রে একটি বিশেষত্ব আছে। এটি আমাদের দেশের বিপরীত ক্রমে অঙ্কিত করবার রীতি আছে। আমরা দক্ষিণ দিকে সম্মুখ ক'রে রাশি চক্র দেখি ব'লে, মেষের বাম দিকে বৃষ দেখি। এ জন্য রাশিচক্রেও তাই লিখি। কিন্তু রাক্ষসাবাস;

নিরক্ষ বৃত্তে অবস্থিত; তথায় ও তাহার দক্ষিণে যা'রা বাস করে তা'রা উত্তরমুখী হ'য়ে রাশি চক্র দর্শন ক'রে ব'লে, মেষের দক্ষিণে বৃষ ইত্যাদি দেখে ও রাশিচক্রেও সেই রূপ লেখে। দাক্ষিণাত্যের জ্যোতিষীরা সেই পন্থা অবলম্বন করেন ব'লে এইরূপ রাশিচক্র লিখেন—

মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট
মীন			সিংহ
কুম্ভ			কন্যা
মকল	ধনু	বৃশ্চিক	তুলা

সুতরাং এদেশের জন্য—

ম	শু চ শ	র	বৃ
রা	জন্মকুণ্ডলী। মেলবোর্ণ। অক্ষ ৩৭'৫০ দ দেশান্তর ১৪৪:৫৯ পূ সন ১৩২০ সাল ১৭ই আষাঢ় সময় ২টা ৩৫ মি: অপরাহ্ণ		×
×			কে
✓	বু	লং	×

এইরূপ রাশিচক্র হ'বে। আমাদের দেশের মত ক'রে আঁকা হ'বে না।

পাত্রাণাঞ্চমসানাঞ্চ বারিণা শুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৬ ॥
তাম্রায়ঃকাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুষঃ সীসকস্য চ।
শৌচং যথার্থং কর্ত্তব্যং ক্ষারাম্লোদকবারিণা ॥ ৭ ॥
তথায়সানাং তোয়েন গ্রাব্ণঃ সঙ্ঘর্ষণেন চ।
সস্নেহানাঞ্চ ভাণ্ডানাং শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা ॥ ৮ ॥
শূর্পধান্যাজিনানাঞ্চ মুষলোলূখলস্য চ।
সংহতানাঞ্চ বস্ত্রাণাং প্রোক্ষণাৎ সঞ্চয়স্য চ ॥ ৯ ॥
বল্কলানামশেষাণামম্বুমৃচ্ছৌচমিষ্যতে।
তৃণকাষ্ঠৌষধীনাঞ্চ প্রোক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ১০ ॥
আবিকানাং সমস্তানাং কেশানাঞ্চাপি মেধ্যতা।
সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন তিলকল্কেন বা পুনঃ ॥ ১১ ॥
সাম্বুনা তাত ভবতি উপঘাতবতাং সদা।
তথা কার্পাসিকানাঞ্চ বিশুদ্ধির্জলভস্মনা ॥ ১২ ॥
দারু-দন্তাস্থি-শৃঙ্গাণাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।
পুনঃপাকেন ভাণ্ডানাং পার্থিবানাঞ্চ মেধ্যতা ॥ ১৩

চমসাদি পাত্র সব শুদ্ধিযোগ্য হ'লে,
ধৌত করি' লইবেক সুবিমল জলে।
তাম্র কাংস্য রৈত্য ত্রপু সীসক সে আর,
এ সব ধাতুর দ্রব্য করি' ব্যবহার,
শুদ্ধিযোগ্য হ'বে যবে করিয়া যতন,
ক্ষারাম্ল-জলেতে তবে করিবে মর্দ্দন।
লৌহময় দ্রব্য শুধু ধৌত কর জলে,
পাষাণ মর্দ্দন কর সলিল বিমলে,
স্নেহযুক্ত পাত্র যবে শুদ্ধিযোগ্য হয়
উষ্ণ জলে ধৌত তা'রে করিবে নিশ্চয়। ৬-৮
শূর্প, ধান্য, অজিন, মুষল, উলূখল,
সংহত-বসন, শুদ্ধ কর দিয়ে জল।
সর্ব্ববিধ বল্কল শোধিত হয় জলে,
তৃণ, কাষ্ঠ, ওষধি, সে প্রোক্ষণের ফলে।
মেষরোমজাত বস্ত্রচয় কেশ আর
তিল বা সর্ষপ কল্ক জলে শুদ্ধি তা'র। ৯-১১।
কার্পাস নির্ম্মিত দ্রব্য শুদ্ধিযোগ্য হ'লে
শোধন করিবে তাহা ভস্মযুক্ত জলে। ১২।
দারু, দন্ত, অস্থি, শৃঙ্গ করিতে শোধন,
উচিত, জানিও বৎস, করিতে তক্ষণ।
মৃন্ময় পাত্রের শুদ্ধি করিবার তরে
পুনরায় দগ্ধ কর অগ্নির ভিতরে। ১৩।

শুচির্ভৈক্ষ্যং কারুহস্তং পণ্যং যচ্চপ্রসাবিতম্।
যোষিন্মুখং বালমুখমাত্মবৃদ্ধমুখং তথা।
রথ্যাগতমবিজ্ঞাতং দাসবর্গাদিনাহৃতম্॥ ১৪॥
বাক্‌প্রশস্তং চিরাতীতমনেকান্তরিতং লঘু।
অতিপ্রভূতং বালঞ্চ বৃদ্ধাতুরবিচেষ্টিতম্॥ ১৫॥
কর্ম্মান্তাঙ্গারশালাশ্চ স্তনন্ধয়সুতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
শুচিন্যশ্চ তথৈবাপঃ স্রবন্ত্যোঽগন্ধবুদ্‌বুদাঃ॥ ১৬
ভূমিবিশুধ্যতে কালাদ্দাহ-মার্জ্জন-গোক্রমৈঃ।
লেপাদুল্লেখনাৎ সেকাদ্বেশ্ম সম্মার্জ্জনার্চ্চনাৎ॥ ১৭॥
কেশকীটাবপন্নে চ গোঘ্রাতে মক্ষিকান্বিতে।
মৃদম্বুভস্মনা তাত প্রোক্ষিতব্যং বিশুদ্ধয়ে॥ ১৮॥
ঔদুম্বরাণামম্লেন ক্ষারেণ ত্রপু-সীসয়োঃ
ভস্মাম্বুভিশ্চ কাংস্যানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্য চ

ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আর কারুজীবীকর,
পণ্যদ্রব্য, নারীমুখ শুদ্ধ নিরন্তর।
বাল-মুখ, বৃদ্ধ-মুখ, আত্ম-মুখ আর,
সহজে সতত শুদ্ধ জেন ইহা সার।
রথ্যাগত, অবিজ্ঞাত, ভৃত্যের আহৃত,
বহু পুরাতন কিম্বা বহু অন্তরিত,
অতি লঘু দ্রব্য আর প্রভূত প্রমাণ
বাল বৃদ্ধ আতুরের কর্ম্ম শুদ্ধ জান।
শুদ্ধ বলি' গ্রহণ করিলে শুদ্ধ হয়—
শাস্ত্রের বচন ইথে না কর সংশয়। ১৪-১৫
কর্ম্মশেষে শুদ্ধ সে অঙ্গারশালা হয়,
স্তনন্ধয়সুতানারী শুদ্ধা সুনিশ্চয়;
গন্ধবুদ্‌বুদাদিশূন্য স্রোতস্বিনি-জল,
অতীব সুশুদ্ধ বলি' বলে জ্ঞানীদল। ১৬।

কালান্তর ঘটিলেই ভূমি শুদ্ধ হয়
দাহ সম্মার্জন আর গোক্রমে নিশ্চয়।
লেপনোল্লেখন সেক সম্মার্জন আর
অর্চ্চনায় শুদ্ধ গৃহ, সন্দ নাহি তা'র। ১৭।
কেশকীটযুক্ত কিম্বা গোঘ্রাত হইলে,
শুদ্ধ করি' ল'বে, আর মক্ষিযুক্ত হ'লে,
মৃত্তিকা সলিল ভস্ম, করিয়া গ্রহণ,
অবশ্য করিবে ইথে শুদ্ধি-সংসাধন। ১৮।
উদুম্বর-বিনির্ম্মিত যত দ্রব্যচয়
অম্লের যোগেতে বৎস সদা শুদ্ধ হয়।
ত্রপু আর সীসক নির্ম্মিত দ্রব্য যত
ক্ষার যোগে শুদ্ধ করি' ল'বে অবিরত।
কাংস্য দ্রব্য শুদ্ধ হয় ভস্ম আর জলে,
দ্রবদ্রব্য শুদ্ধ হয় ঢালিয়া লইলে। ১৯।

অমেধ্যাক্তস্য মৃত্তোয়ৈর্গন্ধাপহরণেন চ।
অন্যেষাঞ্চৈব তদ্দ্রব্যৈর্বর্ণগন্ধাপহারতঃ ॥ ২০ ॥
চণ্ডালৈরন্ত্যজৈশ্চৈব ম্লেচ্ছৈরস্পৃশ্যজাতিভিঃ।
স্পৃষ্টমক্ষালিতং ধান্যমনর্হং সর্ব্বকর্ম্মণি ॥ ২১ ॥
দ্রোণাদধস্তু যদ্ধান্যং তস্যায়ং বিধিরুচ্যতে।
দ্রোণাদূর্দ্ধন্তু যদ্ধান্যং প্রোক্ষণাদেবশুধ্যতি ॥ ২২ ।
রথ্যাসু পতিতং ধান্যং দৃষ্ট্বা যত্নেন বন্দয়েৎ।
উদ্ধৃত্য মূর্দ্ধ্না চাদদ্যাল্লক্ষ্মীর্নশ্যতি চান্যথা ॥ ২৩ ।
শুচি গোতৃপ্তিকৃৎ তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্।
তথা মাংসঞ্চ চণ্ডাল-ক্রব্যাদাদিনিপাতিতম্ ॥ ২৪ ।
রথ্যাগতঞ্চ চেলাদি তাত বাতাচ্ছুচি স্মৃতম্ ॥ ২৫
গজোঽগ্নিরশ্বোগৌশ্ছায়ারশ্ময়ঃ পবনো মহী।
বিপ্রুষো মক্ষিকাদ্যাশ্চ দুষ্টসঙ্গাদদোষিণঃ ॥ ২৬

অমেধ্য সংযুক্ত দ্রব্য করি' পরিষ্কার
মৃত্তিকা সলিলে কর গন্ধনাশ তা'র ;
অন্য দ্রব্যে গন্ধ আর বর্ণ দূর করি'
শুদ্ধ করি ল'বে, এই শাস্ত্র-বাক্য ধরি'। ২০।
চণ্ডালাদি অন্ত্যজ সে ম্লেচ্ছ জাতি আর,
অস্পৃশ্য ইহারা এই শাস্ত্র বাক্য সার ;
এদের আনীত ধান্য ক্ষালিত না হ'লে,
কর্ম্মের অযোগ্য এই সর্ব্বশাস্ত্রে বলে। ২১।
দ্রোণ পরিমাণ হ'তে অল্প যদি হয়,
তা'র পক্ষে এই বিধি জানিও নিশ্চয়।
দ্রোণ পরিমাণ হ'তে অধিক হইলে
হইবেক শুদ্ধ, মাত্র জল ছিটাইলে। ২২।
পথেতে পতিত ধান্য করি দরশন,
মস্তকে ধরিবে তাহা করিয়া যতন
এরূপ বন্দনা যদি না কর, নিশ্চয়
লক্ষ্মী ত্যজিবেন, ইথে নাহিক সংশয়। ২৩।
গোগণের তৃপ্তি লাভ হয় যেই জলে,
অবিকৃত যেই জল, আছে মহীতলে,
অতীব বিশুদ্ধ তাহা জানিও নিশ্চয়,
শাস্ত্রের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
ক্রব্যাদ চণ্ডাল আদি বিনাশিল যায়
হেন ভক্ষ্য মাংস শুদ্ধ সন্ধ নাহি তা'য়। ২৪
রথ্যাগত চেল আদি বায়ু পরশনে
সুনিশ্চয় শুদ্ধ হয় জেনো বৎস মনে। ২৫।
গজ, অগ্নি, অশ্ব, গরু, ছায়া, রশ্মি আর,
বায়ু, ভূমি, জল-বিন্দু, আর মক্ষিকার,
দুষ্ট দ্রব্য স্পর্শ করি' অশুদ্ধি না হয়,
শাস্ত্রের বচন ইথে নাহিক সংশয়। ২৬।

অজাশ্বৌ মুখতো মেধ্যৌ ন গোর্বৎসস্য চাননম্।
মাতুঃ প্রস্রবণং মেধ্যং শকুনিঃ ফলপাতনে ॥ ২৭ ॥
আসনং শয়নং যানং নাবঃ পথি তৃণানি চ।
সোমসূর্য্যাংশুপবনৈঃ শুধ্যন্তে তানি পণ্যবৎ ॥ ২৮ ॥
রথ্যাবসর্পণ-স্নান-ক্ষুৎপান-স্নানকর্ম্মসু।
আচামেচ্চ যথান্যায়ং বাসো বিপরিধায় চ ॥ ২৯ ॥
স্পৃষ্টানামপ্যসংসর্গো বিরথ্যাকর্দ্দমাম্ভসাম্।
পঙ্কেষ্টরচিতানাঞ্চ মেধ্যতা বায়ুসঙ্গমাৎ ॥ ৩০ ॥
প্রভূতোপহতাদন্নাদগ্রমুদ্ধৃত্য সন্ত্যজেৎ।
শেষস্য প্রোক্ষণং কুর্য্যাদাচম্যাদ্ভিস্তথা মৃদা ॥ ৩১ ॥
উপবাসস্ত্রিরাত্রস্তু দুষ্টভক্তাশিনো ভবেৎ।
অজ্ঞাতে জ্ঞানপূর্ব্বস্তু তদ্দোষোপসমেন তু ॥ ৩২ ॥
উদক্যা শ্ব-শৃগালাদীন্ সূতিকান্ত্যাবসায়িনঃ।
স্পৃষ্ট্বা স্নায়ীত শৌচার্থং তথৈব মৃতহারিণঃ ॥ ৩৩ ॥

ছাগমুখ, অশ্বমুখ শুদ্ধ সুনিশ্চয়,
গোবৎসের মুখ কিন্তু পবিত্র না হয়,
গাভীর পুরীষ মূত্র সুপবিত্র অতি,
পক্ষির পাতিত ফলে শুদ্ধ রাখ মতি। ২৭।
আসন, শয়ন, যান, নৌকা, আদি আর
পথেতে পতিত তৃণ, শুদ্ধি হয় তা'র
চন্দ্র আর সূর্য্য রশ্মি করি' পরশন,
আর বায়ুস্পর্শে শুদ্ধ শুন বাছাধন,
পণ্যদ্রব্য সম যে সে এই সমুদয়
সহজেই শুদ্ধ হয় নাহিক সংশয়। ২৮।
পথপর্য্যটন, স্নান, ক্ষুৎ, পান আর
মলমূত্র বিসর্জ্জন অন্তেতে সবার,
গ্রহণ উচিত হয় অপর বসন,
পরেতে করিবে যথাবিধি আচমন ২৯।
পথ, আর কর্দ্দম, সলিল শুদ্ধ হয়
বায়ুর স্পর্শনে ইহা জানিও নিশ্চয়।
পঙ্ক আর ইষ্টকে নির্ম্মিত দ্রব্য যত
বায়ুর স্পর্শনে শুদ্ধ রহিবে সতত। ৩০।
রাশিকৃত অন্ন যদি দোষযুক্ত হয়,
দুষ্ট অংশ ত্যাগ করি' লইবে নিশ্চয়,
অগ্র ত্যাগ করি' শেষে করিবে প্রোক্ষণ
জল আর মৃত্তিকায়' করি' আচমন। ৩১।
দুষ্ট অন্ন না জানিয়া করিলে ভোজন
তিন রাত্রি উপবাস শাস্ত্রের লিখন;
জ্ঞানপূর্ব্ব হেন কার্য্য করিলে নিশ্চয়
শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করা যোগ্য হয়। ৩২।
রজঃস্বলা নারী আর কুক্কুর শৃগাল
সূতিকা, শববাহক আর সে চণ্ডাল
এ সবারে স্পর্শ যদি করে কোন জন
স্নান করি' শুদ্ধ হ'বে শাস্ত্রের লিখন। ৩৩

নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাতঃ শুধ্যতি মানবঃ ।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা ॥ ৩৪ ॥
ন লঙ্ঘয়েৎ তথৈবাস্থক্‌ষ্ঠীবনোদ্বর্ত্তনানি চ ।
নোদ্যানাদৌ বিকালেষু প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন ॥ ৩৫
ন চালপেজ্জনদ্বিষ্টাং বীরহীনাং তথা স্ত্রিয়ম্ ।
গৃহাদুচ্ছিষ্টবিণ্মূত্র-পাদাম্ভাংসি ক্ষিপেদ্বহিঃ ॥ ৩৬ ॥
পঞ্চ পিণ্ডাননুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিণি ।
স্নায়ীত দেবখাতেষু গঙ্গা-হ্রদ-সরৎসু চ ॥ ৩৭ ॥
দেবতা-পিতৃসচ্ছাস্ত্র-যজ্ঞ-মন্ত্রাদিনিন্দকৈঃ ।
কৃত্বা তু স্পর্শনালাপং শুধ্যেতার্কাবলোকনাৎ ॥ ৩৮ ।
অবলোক্য তথোদক্যামন্ত্যজং পতিতং শবম্ ।
বিধর্ম্মি-সূতিকা-ষণ্ড-বিবস্ত্রান্ত্যাবসায়িনঃ ॥ ৩৯ ॥
সৃতনির্যাতকাশ্চৈব পরদাররতাশ্চ যে ।
এতদেব হি কর্ত্তব্যং প্রাজ্ঞৈঃ শোধনমাত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

স্নেহযুক্ত নর-অস্থি যদি স্পর্শ করে,
শুদ্ধ হ'বে তবে, স্নান করিবার পরে।
স্নেহশূন্য অস্থিস্পর্শ ঘটিবে যখন
গোস্পর্শ করিবে আর সূর্য্যের দর্শন।
অথবা কেবল যদি করে আচমন
বিষ্ণু স্মরি' শুদ্ধ হ'বে শাস্ত্রের লিখন। ৩৪।
অসৃক ষ্ঠীবন আর উদ্বর্ত্তন চয়
কোনো দিন কাহারো লঙ্ঘন-যোগ্য নয়।
বিকাল হইলে পরে, জ্ঞানবান জন
উদ্যান আদিতে না রহিবে কদাচন। ৩৫।
নিন্দিতা রমণী আর, অবীরার সনে
আলাপ না করিবেক কভু হেন ক্ষণে।
উচ্ছিষ্ট, পুরীষ, মূত্র, পাদ ধৌত-বারি
গৃহের বাহিরে সদা ত্যজ ত্বরা করি। ৩৬।
পঞ্চ পিণ্ড উদ্ধার না করি' বাছাধন
পরকৃত খাতে স্নান না কর কখন।
দেব-খাতে, আর বৎস জাহ্নবী সলিলে
হ্রদে, কি সরিতে স্নান কর অবহেলে। ৩৭।
যেই জন দেব আর পিতৃ নিন্দা করে
সচ্ছাস্ত্র নিন্দয়ে, নিন্দে যজ্ঞে মন্ত্রাক্ষরে।
হেন জন সনে নাহি কর আলাপন
যদি দৈবে ঘটে তা'র আলাপ স্পর্শন,
তবে আচমন করি সূর্য্যেরে দেখিলে,
শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে অবহেলে। ৩৮।
রজঃস্বলা নারী আর অন্ত্যজ মানব,
পতিত মানব আর সর্ব্ববিধ শব,
বিধর্ম্মী, প্রসূতানারী আর ষণ্ড নর,
বিবস্ত্র, অন্ত্যাবশায়ী, পরস্ত্রীতৎপর,
সৃত নিন্দাকে আর করি দরশন,
করিবেন আত্মশুদ্ধি সদা প্রাজ্ঞজন। ৩৯-৪০।

অভোজ্যং সূতিকা-ষণ্ড-মার্জ্জারাখু-শ্ব-কুক্কুটান্।
পতিতাবিদ্ধচণ্ডাল-মৃতহারাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ ॥ ৪১ ॥
সংস্পৃশ্য শুধ্যতে স্নানাদুদক্যা-গ্রামশূকরৌ।
তদ্বচ্চ সূতিকাশৌচ-দূষিতান্ পুরুষানপি ॥ ৪২ ॥
অতঃপরং শৃণুষ্ব ত্বং স্ত্রীধর্ম্মান্যনুবিস্তরাৎ ॥ ৪৩ ॥
উদুম্বরে বসেন্নিত্যং ভবানী সর্ব্বদেবতা।
ততঃ সা প্রত্যহং পূজ্যা গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥ ৪৪ ॥
অশূন্যা দেহলী কার্য্যা প্রাতঃকালে বিশেষতঃ।
যস্য শূন্যা ভবেৎ সা তু শূন্যং তস্য কুলং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥
পাদস্যস্পর্শনং তত্র অসংপূজ্য চ লঙ্ঘনম্।
কুর্ব্বন্নরকমাপ্নোতি তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৪৬ ॥
প্রাতঃকালে স্ত্রিয়া কার্য্যং গোময়েনানুলেপনম্।
প্রত্যহং সদনে তস্মান্নৈব দুঃখানি পশ্যতি ॥ ৪৭ ॥
স্পৃশন্তি রশ্ময়ো যস্য গৃহ সম্মার্জ্জনাদৃতে।
ভবন্তি বিমুখাস্তস্য পিতরোদেবমাতরঃ ॥ ৪৮ ॥

অভোজ্য, সূতিকা, ষণ্ড, ইন্দুর, মার্জ্জার,
কুক্কুর, কুক্কুট. সে পতিতাবিদ্ধ আর,
চণ্ডাল, মৃতকহারী করি' পরশন,
স্নানেতে হইবে শুদ্ধ কহে প্রাজ্ঞগণ;
রজঃস্বলা নারী গ্রাম্যশূকর সে আর
সূতিকা-অশৌচ-দুষ্ট-দেহ সে যাহার
এদেরো স্পর্শনে সদ্য দেহাশৌচ হয়
স্নানেতে হইবে শুদ্ধ নাহিক সংশয়। ৪১-৪২।
এবে শুন বিস্তারিয়া বলিব তোমায়
নারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম যেবা শাস্ত্রে গায়। ৪৩।
দেহলীতে নিত্য বাস করেন ভবানী
আর যত দেবগণ এই মত জানি;
গন্ধ পুষ্প অক্ষতে পূজিবে নিত্য তাঁ'য়,
মঙ্গল হইবে ইথে সন্দেহ কি তা'য়। ৪৪।
দেহলী অশূন্য কর পরম যতনে—
বিশেষ প্রভাতকালে—রেখো ইহা মনে।
দেহলী হইলে শূন্য কুল শূন্য হয়
শাস্ত্রের বচন এই নাহিক সংশয়। ৪৫।
পূজা না করিয়া তাহে পদের স্পর্শন
কভু না করিবে—না করিবে উল্লঙ্ঘন,
এই বিধি যেই নারী না করে পালন,
নিশ্চয় তাহার ভাগ্যে নরকে গমন। ৪৬।
প্রভাতে ভবনে নিত্য গোময় লেপন,
নারীর প্রধান কার্য্য শুন বাছাধন।
এই কার্য্য প্রতিদিন যেই নারী করে,
না থাকে দুঃখের লেশ তাহার অন্তরে। ৪৭।
গৃহে সম্মার্জ্জনী দান করিবার আগে,
দিনকর প্রকাশ হইয়া পূর্ব্বভাগে

নিশায়াঃ পশ্চিমে যামে ধান্যসংস্করণাদিকম্।
কুরুতে যাতু মোহেন বন্ধ্যা জন্মনি জন্মনি ॥ ৪৯ ॥
সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে মার্জ্জনং ন করোতি যা।
ভর্ত্তৃহীনা ভবেৎ সা তু নিঃস্বা জন্মনি জন্মনি ॥ ৫০ ॥
অকৃত-স্বস্তিকাং যা তু কামলিপ্তাঞ্চ মেদিনীম্।
তস্যাঃ স্ত্রিয়া বিনশ্যন্তি বিত্তমায়ুর্যশস্তথা ॥ ৫১ ॥
মার্জ্জনী-চুল্লিকা-ষ্ঠীব-দৃষদশ্চোপলস্তথা।
নাক্রমেদঙ্ঘ্রিণা জাতু পুত্রদারনধক্ষয়াৎ ॥ ৫২ ॥
উলূখলঞ্চ মুষলং তথাচৈব তু ঘর্ষণম্।
পদাক্রমণাৎ পাপী যা নাপ্নোত্যুত্তমাতাং গতিং ॥ ৫৩
ভিন্নাসনং যোগপট্টং তথৈব মৃগচর্ম্ম চ।
কৃষ্ণাবিকং তথা তাত বর্জয়েৎ পুত্রবান্ গৃহী ॥ ৫৪ ॥
দক্ষিণাভিমুখো যস্তু বিদিক্‌সংমুখ এব চ।
কেশান্ সংস্কুরুতে মর্ত্ত্যো ধননাশঞ্চ বিন্দতি ॥ ৫৫ ॥
অনূঢ়স্তু ন কুর্ব্বীত ভুক্ত্বা দন্ত-বিশোধনম্।
পাদুকারোহণঞ্চৈব তিলৈশ্চাপি স তর্পণম্ ॥ ৫৬ ॥

যদি নিজ করে গৃহ করেন স্পর্শন,
তবে সেই গৃহ ত্যজি' যত দেবগণ
পিতৃগণ আর যত মাতৃকা নিকর
বিমুখ হইয়া যান, তাহারে সত্বর। ৪৮।
রজনীর শেষ যামে ধান্য সংস্করণ
করে যেই নারী বন্ধ্যা হয় যেই জন।
জন্ম জন্ম বন্ধ্যা রয় কহিনু নিশ্চয়
শাস্ত্রের বচন ইথে না কর সংশয়। ৪৯।
সন্ধ্যাকালে নাহি যেবা করে সম্মার্জন,
জন্ম জন্ম ভর্ত্তৃহীনা নিঃস্বা সেই জন। ৫০।
অকৃত স্বস্তিকা যথা কামলিপ্তা ধরা,
বিত্ত আয়ু যশ হীনা হয় যেই ত্বরা। ৫১।
সম্মার্জ্জনী চুল্লী ষ্ঠীব, দৃষদ, উপল
পদস্পর্শে হরে পুত্র ধন আর বল। ৫২।
উলূখল মুষল ঘর্ষণ যন্ত্র আর
পদে স্পর্শ করিলে বাড়য়ে পাপ ভার। ৫৩।
ভগ্ন সে আসন, যোগপট্ট, মৃগচর্ম্ম,
কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্ম রাখা নহে গৃহীধর্ম্ম। ৫৪।
বসিয়া দক্ষিণমুখে কিম্বা কোণ মুখে,
কেশের সংস্কার করি না পড়িও দুঃখে।
এইরূপে কর যদি কেশ প্রসাধন,
ধননাশ হবে তাহে শুন বাছাধন। ৫৫।
ভোজনের পরে নিজ দন্তের শোধন
কভু নাহি করিবেক অনূঢ় যে জন।
কিম্বা পদে না করিবে পাদুকা ধারণ,
তিল সহযোগে নাহি করিতে তর্পণ। ৫৬।

ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাদর্দ্ধকক্ষোত্তরীয়কম্।
দর্শশ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত দর্শস্নানং কথঞ্চন ॥ ৫৭ ॥
পাদুকারোহণঞ্চৈব যোগপট্টকমেব চ।
ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাদ্‌গয়াশ্রাদ্ধং তথৈব চ ॥ ৫৮ ॥
দীপভাণ্ডময়ীচ্ছায়া বিভীতক-কুরণ্টজা।
বর্জনীয়া সদা পুত্র যদি জীবিতুমিচ্ছসি ॥ ৫৯ ॥
অধোবস্ত্রেণ যো বায়ুং কুরুতে শিরসি দ্বিজঃ।
স্থালেন ধর্ম্মশূর্পাভ্যাং সুকৃতং তস্য নশ্যতি ॥ ৬০ ॥

অলর্ক উবাচ।

ভবত্যা কীর্ত্তিতাভোজ্যা য এতে সূতিকাদয়ঃ।
অমীষাং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতো লক্ষণানিহ ॥ ৬১ ॥

মদালসোবাচ।

ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণস্তেহ যাবরোধত্বমাগতা।
তাবুভৌ সূতিকেত্যুক্তৌ তয়োরন্নং বিগর্হিতম্ ॥ ৬২ ॥
ন জুহোত্যুচিতে কালে নাশ্নাতি ন দদাতি চ।
পিতৃদেবার্চ্চনাদ্ধীনং ষণ্ড স পরিগীয়তে ॥ ৬৩ ॥

জীবৎপিতৃক যেবা সে জন কখন,
অর্দ্ধকক্ষউত্তরীয় না করে ধারণ।
দর্শশ্রাদ্ধ না করিবে কিম্বা দর্শস্নান,
পদেতে পাদুকা না ধরিবে মতিমান,
যোগপট্ট ব্যবহার কভু না করিবে,
গয়াশ্রাদ্ধ হেন জন, অবশ্য ত্যজিবে।৫৭-৫৮।
প্রদীপের ছায়া, বিভীতক বৃক্ষ ছায়া,
কুরণ্টক বৃক্ষ ছায়া সদা বর্জনীয়া।
আয়ুঃ শক্তি ক্ষয় হয়, এ সব ছায়ায়
শাস্ত্র বাক্য এই—নাহি সন্দেহ তাহায়।৫৯।
পরিধেয় বস্ত্রে কভু মস্তকে ব্যজন,
নাহি করিবেন, বৎস, ব্রাহ্মণ যে জন;
চর্ম্ম আর শূর্পযোগে করিলে ব্যজন
সকল সুকৃতি নাশ শাস্ত্রের বচন।৬০।
অলর্ক বলেন, মাগো, জিজ্ঞাসি তোমায়,
সূতিকাদি তত্ত্ব বল বিস্তারি আমায়।৬১।
মদালসা বলে বৎস, করহ শ্রবণ
অবরোধ গত যেই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ,
সূতিকা শব্দেতে বাচ্য উভনে নিশ্চয়,
তাহাদের অন্ন, বৎস, কভু গ্রাহ্য নয়।৬২।
যথাকালে যেই জন হোম নাহি করে
সময়ে ভোজন দান যেবা পরিহরে।
পিতৃদেবার্চ্চনা হীন হয় যেই জন,
ষণ্ড বলি শাস্ত্রে তারে করেন কীর্ত্তন।৬৩।

দিগ্বিজয়ী সাহিত্য-বীর

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
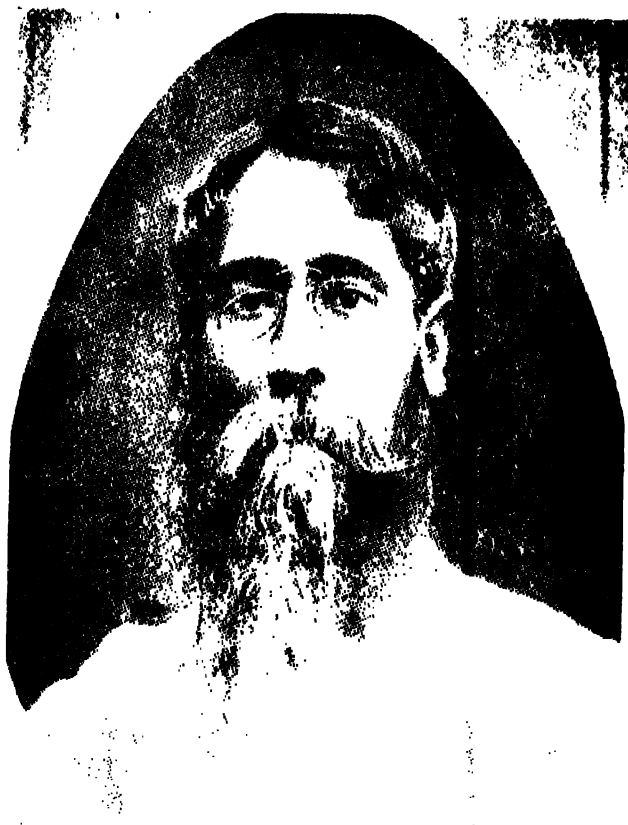
"বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ সকলেই একভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইউরোপ বিজয়ের ইঁহারাই প্রথম সেনাপতি।"

India Press, Calcutta.

"একেকে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই একেকে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্ম্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা— নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ

"বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদিশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ সকলেই একভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইউরোপ-বিজয়ের ইহারাই প্রথম সেনাপতি।"

৫ম খণ্ড	অগ্রহায়ণ, ১৩২০	২য় সংখ্যা
৫ম বর্ষ		

আলোচনা

১। রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়

"রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশনের প্রতিষ্ঠালাভ, বঙ্গসাহিত্যের মর্য্যাদা-বৃদ্ধি, বঙ্গভাষাভাষীর ঐক্যবিধান, তারকনাথ-রাসবিহারীর দান এবং দামোদরের বন্যা—এই কয়েকটি নূতন ঘটনা গত দুই তিন বৎসরের বিশেষ লক্ষণ। এই সকল কার্য্যফলে যে যুগ আরম্ভ হইল" তাহাকে গত সংখ্যায় আমরা ভারতে "স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ" নামে অভিহিত করিয়াছি। "সাহিত্যের প্রসার, সেবাধর্ম্মের প্রচার, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠা, দিল্লীতে রাজধানী-প্রবর্ত্তন, বাঙ্গালী জাতির

রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে জয়লাভ ইত্যাদি কতিপয় নূতন শক্তি আসিয়া সমাজে দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত করিল। তাহারই শেষ নিদর্শন দামোদর-বন্যায় বঙ্গবাসীর কার্য্যতৎপরতা। এখন হইতে দ্বিতীয় যুগের নব নব কার্য্য দেখিতে পাইব।"

বাঙ্গালী জাতির আট বৎসর বয়সে সমগ্র দেশের ভিতর বিশেষ সাড়া দিবার জন্য রুদ্রদেব দামোদরের বন্যার ভিতর দিয়া একটা তাণ্ডবের আয়োজন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ভারতে নবজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় উন্মুক্ত হইল। দ্বিতীয় যুগের এই আবাহন সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই আমরা একজন বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীর বিশ্বসাহিত্যে শীর্ষস্থান-লাভের সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত-সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীকে "এসিয়ার রাজ-কবি" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। বঙ্গসরস্বতীর বরপুত্রের যথোচিত সমাদর করা হয় নাই—ইহা বুঝাইবার জন্যই যেন আজ ভারতের রবীন্দ্রনাথকে জগতের একটি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-কলা-সাহিত্য-পরিষৎ ইউরোপের মুখপাত্ররূপে সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার * দান করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ১৯১৩ সালে পৃথিবীর সাহিত্যভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ বিবেচিত হইয়াছে। এই বৎসরের জন্য বাঙ্গালীর রবীন্দ্রনাথ সহিত্য-জগতের "একমেবাদ্বিতীয়ং" জ্ঞানে বিশ্ববাসীর পূজা প্রাপ্ত হইলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই দিগ্বিজয় ভারতের নবযুগে নবীনজাতিগঠনে কতখানি সহায়তা করিবে, আমরা ভবিষ্যতে তাহা আলোচনা করিব। রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য ও ভারতবাসীর চিন্তাশক্তি জগৎকে কি পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিবে তাহা অল্পদিনের ভিতরই নিতান্ত অজ্ঞ ও অন্ধ লোকেরাও বুঝিতে পারিবেন। কতকগুলি ঘটনাচক্রের প্রভাবে হিন্দু চিন্তাবীরকে—একটি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার আজীবন সেবককে,—প্রাচ্যজগতের তথা-কথিত অর্দ্ধসভ্যজাতিপ্রসূত মানব-সন্তানকে পাশ্চাত্যজগৎ বৈঠকে বসিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সম্মান ও পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন্। কি কি কারণে ইউরোপীয় সুধীবর্গ প্রাচ্যজগতের একজন চিন্তাবীরকে এরূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়া সম্মান ও গৌরব বোধ করিলেন, তাহার আলোচনা করিবার জন্য অনতিদূর ভবিষ্যতেই দার্শনিক ও ঐতিহাসিকগণ আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হইবেন। অধিকন্তু, ইতিহাস-বিজ্ঞানের কোন্ নিয়মানুসারে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসম্পদই মানবজাতিকে ভারতীয় সাহিত্য ও জীবন-ধারার অন্যান্য বিভাগ বুঝাইবার উপায় ও কেন্দ্রস্বরূপ হইল—তাহার বিশ্লেষণও অল্প-কালের ভিতরই দেশবিদেশের পণ্ডিত-সমাজে আরব্ধ হইবে।

আমরা এখন বাঙ্গালীকে ও ভারতবাসীকে কয়েকটি কথামাত্র স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। প্রথমতঃ, এত উচ্চসম্মান-লাভ অন্য কোন এসিয়াবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই—এমন কি জাপানেরও এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি এই দুর্লভ যশঃ-প্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই। বাঙ্গালীর সম্বর্দ্ধনায় সমগ্র এসিয়া-খণ্ডের, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-সভ্যতার উত্তরা-ধিকারী প্রাচ্য মানবের সম্বর্দ্ধনা হইল।

* নোবেল-পুরস্কারের মূল্য নগদ ১২০,০০০৲ টাকা।

১৯০৫ সালে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রুশিয়াকে সম্মুখ-সমরে পরাজিত করিয়া জাপান বিশ্বের রাষ্ট্রীয় জগতে এক নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছেন—প্রকৃত প্রস্তাবে মানবেতিহাসের বিংশ শতাব্দীরই উদ্বোধন করিয়াছেন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ জগতের সাহিত্য-সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়া সেই নবযুগেরই ক্রম-বিকাশে সহায়তা করিলেন। পাশ্চাত্য সমাজে প্রাচ্যপ্রভাব-প্রতিষ্ঠার পথ আরও প্রশস্ত হইল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেখিতেছেন যে, জাপানের জয়লাভ এবং রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয় মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে তুল্যপ্রভাবসম্পন্ন ও সমগোষ্ঠীভুক্ত—দুই ঘটনা একই শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি—একই ঘটনার বিভিন্ন মূর্ত্তি।

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় "স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি"রূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ভারতবর্ষের ভূতভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের উপর বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিলেন। তাহার ফলে মানবজাতি রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ও পথপ্রদর্শক করিয়া ভারতের আপামর জনসাধারণের যুগযুগান্তরব্যাপী ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, চরিত্র-মনুষ্যত্ব, সভ্যতা-আদর্শ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিবে। পরে ক্রমশঃ যখন কথঞ্চিৎ গভীর ও পরিষ্কারভাবে সভ্যজগৎ ভারতবর্ষের বাণী এবং ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্মকথা বুঝিতে অভ্যস্ত হইয়া ভারতীয় চিন্তাপ্রবাহের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইতে থাকিবে, তখন তাহারা বুঝিবে যে, রত্নপ্রসবিনী ভারতমাতা রবীন্দ্রনাথকে দৈবক্রমে প্রসব করেন নাই, রাম-মোহন-রাণাডে-দয়ানন্দ-রামতীর্থ-ভূদেব-বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের লীলাভূমি ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের জন্ম আকস্মিক ঘটনা বা প্রকৃতির খেয়াল মাত্র নয়, রবীন্দ্রনাথ আমাদের গরীয়সী জন্মভূমির অসংখ্য বীরসন্তানের অন্যতম মাত্র—একমেবাদ্বিতীয়ং নহেন। তখন তাহারা নবযুগের প্রবর্ত্তক বিবেকানন্দের ধর্ম্মপ্রচারের প্রকৃততত্ত্ব বুঝিতে পারিবে,—তখন তাহাদের ধারণা জন্মিবে যে, "বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ সকলেই একভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইউরোপ-বিজয়ের ইঁহারাই প্রথম সেনাপতি।" তখন তাহারা সত্যসত্যই বুঝিতে পারিবে—কেন ভারতের অমরকবি দ্বিজেন্দ্রলাল—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়।

একদা যাহার অর্ণবপোত
ভ্রমিল ভারত সাগরময়॥

সন্তান যার তিব্বত চীন
জাপানে গঠিল উপনিবেশ॥"

—এই গাহিয়া নব্যবঙ্গকে বঙ্গজননীর প্রকৃত মূর্ত্তির ধ্যান করিতে শিখাইয়াছেন। তখন চিন্তা-জগতের পক্ষপাতদোষশূন্য সমদর্শী দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালার উদীয়মান শিশুকবি সত্যেন্দ্রনাথের—

"বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই,
নাগেরি মাথায় নাচি।

*   *   *   *

একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি,
মোগলেরে আর হাতে।
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে
দিল্লীনাথে।

*   *   *   *

কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি'
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল দেশে
যশের মুকুট পরি।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে
'বরভূধরের' ভিত্তি,
শ্যামরাজ্যেতে 'ওঙ্কার-ধাম'—
মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
মন্বন্তরে মরিনি আমরা,
মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশীষে
অমৃতের টীকা পরি'।

দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি'
আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদের এই কুটিরে দেখেছি
মানুষের ঠাকুরালি।

* * * *

বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগতময়,
বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।
তপের প্রভাবে বাঙ্গালী সাধক জড়ের
পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনের বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙ্গালী দিয়েছে বিয়া
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙ্গালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের
গান,
বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনম, বিফল নহে
এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা ভরা
আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙ্গালী ধাতার
আশীর্ব্বাদে।

* * * *

অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে
হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙ্গালীর
গৌরবে।"

—ইত্যাদি জাতীয় গৌরবদৃপ্ত উচ্ছ্বাসবাণীর অভ্যন্তরে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নাই।

তৃতীয়তঃ,—রবীন্দ্রনাথ চিরকাল বঙ্গ-ভাষারই সেবা করিয়াছেন। বঙ্গসরস্বতী তাঁহার এই একনিষ্ঠ সাধকের সম্বর্দ্ধনায় বজ্র-নিনাদে দেশবাসীকে অভয়বাণী প্রচার করিতেছেন:—"যে ভাষায় গান গাহিয়া, কবিতা লিখিয়া, প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিজয়ী বীর হইতে পারিলেন, যে ভাষার অনুবাদ মাত্র পাইয়া জগৎ নবভাবে অনুপ্রাণিত হইল, সেই ভাষা আর বেশী দিন সরকারী শিক্ষাবিভাগের বিধানে দেশবাসীর দ্বিতীয় ভাষা মাত্র থাকিবে না। বাঙ্গালীর মাতৃভাষায় অত্যুচ্চ বিজ্ঞান, অত্যুচ্চ দর্শন, অত্যুচ্চ ইতিহাস রচিত হইতে পারে কি না, এ বিষয়ে যাঁহারা সন্দেহ করিবেন তাঁহারা জগতের পণ্ডিত-সমাজে পাগল বলিয়া পরিচিত হইবেন। সুতরাং অল্পকালের ভিতরই দেশীয় সন্তান-সন্ততির সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাপ্রদানের জন্য তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্যই গ্রহণ করা হইবে। বিদেশীয় ভাষাগুলিকে শিক্ষার ব্যবস্থায় দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিয়া ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বাভাবিক ও জাতীয় পদবাচ্য হইয়া উঠিবে। সুযোগ, সুবিধা ও উৎসাহের অভাবে দেশীয় জনসাধারণের মাতৃভাষা তাহার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য্য ও সামর্থ্য প্রকটিত করিতে পারিতেছে না। অচিরেই সেই সকল অভাব ও বিঘ্ন মোচন করিবার যথোচিত ব্যবস্থা হইবে। ভারতবর্ষের মাতৃভাষাগুলি ও প্রাদেশিক সাহিত্যসমূহ অতি সত্বরেই শিক্ষার ব্যবস্থায় তাহাদের প্রকৃত মর্য্যাদা লাভ করিয়া নানা উপায়ে ভারতবাসীর মনুষ্যত্ব-গঠনের সহায় হইবে।"

* *
*

২। বাঙ্গালীর "গোবর"

বঙ্কিমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন "তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম"। বঙ্কিমের উদ্বোধন সার্থক হইয়াছে।

বাঙ্গালী বিলাতে যাইয়া সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় সমস্ত পৃথিবীর লোককে বিদ্যায় পরাস্ত করিয়াছিল। সে আজ বেশী দিনের কথা নয়। সে কথা বেশী লোকের মনে নাই, কিন্তু বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-প্রচারক আমেরিকার চিন্তারাজ্যে নবযুগ আনিয়া দিয়াছে—তাহা কেহ কোন দিন ভুলিবে না—বরং যত দিন যাইবে ততই দেশবিদেশে তাহার প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট হইতে থাকিবে। অধিকন্তু, বাঙ্গালীর বক্তা, বাঙ্গালীর কবি, বাঙ্গালীর সাহিত্যসেবী ইংরাজ-সমাজে ও ইংরাজী-সাহিত্যে অতুলনীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী চিন্তা-প্রবাহের ইতিবৃত্ত লিখিবেন, তাঁহারা বাঙ্গালী জাতির ইংরাজী ভাষায় লিখিত রচনাগুলি ভুলিয়া যাইবেন না। ইংরাজী ভাষার বাঙ্গালী লেখকগণকে ভুলিয়া গেলে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। এতদ্ব্যতীত, বাঙ্গালীর বিজ্ঞানবীরও পৃথিবীর বিদ্যা-রাজ্যের একটা নূতন বিভাগ খুলিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা এখন বিশ্ববিশ্রুত। আর আজ জননী বঙ্গভাষার একজন শ্রেষ্ঠ সাধক "জগৎ-কবি-সভার মাঝারে" প্রধান আচার্য্যের অর্ঘ্য লাভ করিয়া এক অভিনব উপায়ে ভারতবাসীর প্রতি মানবজাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন।

বাঙ্গালী-সন্তান জগতের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্য-ভাণ্ডারের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে—সরস্বতীর এই আশীর্ব্বাদ লইয়াই যেন বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর শারীরিক শক্তি ও বাহুবল সম্বন্ধে ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাহিরের অন্যান্য জাতির মধ্যে একটা নিন্দা ও অখ্যাতি প্রচারিত ছিল। দেখিতেছি জগজ্জননীর কৃপায় এই নিন্দা নিবারিত হইতে চলিয়াছে। অল্পদিনের ভিতর আমরা আমাদের জাতির মধ্যে স্বাস্থ্য ও সবলতার পরিচয় পাইতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের চোখের সম্মুখে একটা কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্য ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলায় বাঙ্গালী সন্তান উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে দেখিয়া "ইংলিশম্যান" ইতিমধ্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। গত বৎসরে "মোহনবাগানের জয়লাভ" বাঙ্গালীর ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা। অর্দ্ধোদয় যোগে এবং এখনকার জলপ্লাবনেও বাঙ্গালী যুবকের কর্ম্মপটুত্ব, শৃঙ্খলাজ্ঞান ও নেতার আজ্ঞাপালনক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহারা বর্ষা-রৌদ্রের প্রভাব উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছে, এবং অনাহার-অনিদ্রার অপেক্ষা করে না। বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই সমুদয় অতি আশাপ্রদ পূর্ব্বলক্ষণ। সেদিন বাঙ্গালী বালক শ্রীমান্ "গোবর" বিলাতে যাইয়া কুস্তির উপাধি লাভ করিয়াছে। আজ সে পৃথিবীর সর্ব্ববিখ্যাত পালোয়ানকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিবার জন্য আমেরিকায় চলিল। "বাহুতে তুমি মা শক্তি"—এই মন্ত্রও সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিতেছি।

* *
*

৩। ভারতে পাশ্চাত্য পণ্ডিত

পাশ্চাত্যেরা যখন ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন ভারতসমাজ তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। সেই সমাজের রীতিনীতি, আইনকানুন বুঝিবার জন্য বিদেশীয় শাসনকর্ত্তারা যত্ন লইতে বাধ্য

হইয়াছিলেন। তাহার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের "আবিষ্কার" হয়—এবং কতকগুলি স্মৃতিগ্রন্থ পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত হয়। সে আজ প্রায় ১০০।১৫০ বৎসরের কথা। তাহার পর বিদেশীয়গণের পক্ষে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, নীতি, সাহিত্য, কলা, শিল্প, সভ্যতা কিছুই সম্মান করিবার বা বিশেষরূপে আদর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। পাশ্চাত্য জগৎ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্যজগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এ কথা স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় তাঁহাদের সমাজে প্রচারিত ছিল। তুলনা-মূলক সমাজ-বিজ্ঞানের খাতিরে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বা বিদ্বৎসমিতি ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্য্যালোচনা করিতে কিছু কিছু মাথা ঘামাইতেন। কিন্তু জাতীয় অভিমান এবং স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধ খর্ব্ব করিয়া প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের ন্যায় বেশী লোক এজন্য কষ্ট স্বীকার করেন নাই। কিছু দিন হইতে পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় সাহিত্য, সমাজ, চিত্রকলা, দর্শন প্রভৃতির গৌরবপ্রচারক জুটিয়াছেন। এই সকল "ভারত-বন্ধু"গণের মধ্যে অনেকেরই একটা মুখ্য উদ্দেশ্য পুস্তকাদি বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ-সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছু নয়।

আমরা গত সংখ্যায় বলিয়াছি—সম্প্রতি প্রাচ্যজগতের জীবনবত্তার পরিচয় পাইয়া পাশ্চাত্য জগতের সত্যসত্যই ভাব-পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিগত ৭।৮ বৎসর হইতে তাহারা প্রাচ্যকে গভীর ভাবে, সত্য ভাবে এবং বৈজ্ঞানিকের চোখে বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এজন্য ২।৩ বৎসর হইল বিলাতে Universal Races Congress বা বিশ্ব-মানব-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে অবজ্ঞা না করে, সাহিত্যা-লোচনা ও বিজ্ঞানালোচনার ভিতর দিয়া যথাসম্ভব সেই চেষ্টা করাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য। তাহার ঢেউ ভারতে পৌঁছিবে—কথঞ্চিৎ পৌঁছিয়াছে। সময়ের লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে—ভারতবর্ষের মর্ম্মকথা, ঘরের কথা, সামাজিকতার কথা, ধর্ম্মকর্ম্মের কথা ইত্যাদি ভারতীয় অন্তর্জ্জগতের বিচিত্র রহস্য-গুলি দখল করিবার জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, গুজরাতী ইত্যাদি সকল প্রকার ভাষা শিখিবেন। এই সকল ভাষাভাষী লোকেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পাশ্চাত্য সুধীগণ ভারতীয় ভাষাতেই কথা বলিতে অভ্যাস করিবেন—প্রয়োজন হইলে, ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে নানা উপায়ে পরিপুষ্ট করিতেও সাহায্য করিবেন। আমরা দেখিতে পাইব ভারতের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া ভারতের প্রত্নতত্ত্ব, গ্রাম্য-কথা, ভাষাতত্ত্ব, মূর্ত্তিতত্ত্ব, তরু-লতা, কৃষিশিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিবেন।

***

৪। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর সংগ্রাম

ভারতবর্ষের বাহিরে অনেক স্থানে ভারতীয় হিন্দুমুসলমান ব্যবসায়াদি উপলক্ষে বাস করিতেছেন। তাহার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা একটি প্রধান উপনিবেশ। উপনিবেশ বটে, কিন্তু একদিন "সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ"—এ সে উপনিবেশ নয়। এ উপনিবেশ সাধারণতঃ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ভারতসন্তানের বনবাসেরই নামান্তর। সুতরাং এখানে দুঃখ দৈন্য লজ্জা ক্লেশের সীমা নাই। অধিকন্তু বিশেষ

পরিতাপের কথা এই যে, ভারতভূমি হইতে যাহারা অন্নচিন্তায় অস্থির হইয়া দেশদেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের খবর লওয়া পর্য্যন্ত আমরা আমাদের গৃহস্থধর্ম্মের মধ্যে গণ্য করি নাই। নীচাশয়তা ও সঙ্কীর্ণতা আর কাহাকে বলে?

গত বৎসর মহারাষ্ট্র-জননায়ক শ্রীযুক্ত গোখলে মহোদয় দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি সে স্থানে আমাদের স্বজাতীয়দিগের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় জনগণের কথা ভারতবর্ষে কথঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছে। কিন্তু তাহারা যে ভারতসমাজেরই এক অংশ, এ ধারণা আমাদের হৃদয়ে এখনও বদ্ধমূল হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসিগণ যে সকল সমস্যার মীমাংসা করিতেছেন তাহাতে ভারতবর্ষেরই মান-সম্ভ্রম, জগতে প্রতিষ্ঠালাভ এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি যে নির্ভর করিতেছে তাহা এখনও আমরা বুঝি নাই। তাঁহারা যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা আমাদেরই জীবন-সংগ্রামের এক অধ্যায় মাত্র, তাহাদের জয়-পরাজয়ে আমাদের বিকাশ-বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সে তত্ত্ব এখনও আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই।

সেখানে আমাদের স্বজাতীয়েরা কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আজ তাহারা ঘোরতর দুর্দ্দৈব ভোগ করিতেছে। ভারতমাতার স্ত্রীপুত্রকন্যাগণ সেখানে দলে দলে কারাবাসে প্রেরিত হইতেছে এবং প্রাণ দান করিতেছে। ভারতে যে সকল জনকজননীগণ রহিয়াছেন তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আজ দক্ষিণ আফ্রিকার হিন্দু-মুসলমান নরনারী জীবনের মায়া ত্যাগ করিতেছে, পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিতেছে, ভ্রাতাভগিনীর স্নেহ উপেক্ষা করিতেছে। শত শত দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয় সন্তান ভারতমাতার 'ইজ্জৎ' রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাহারা ঢাল-তরওয়াল, বন্দুক, গুলিগোলা লইয়া লড়াই করিতে চাহে না, আইনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাহারা হস্ত উত্তোলন করে না, কাহারেও না। অন্যায় আইন যত দিন না সংশোধিত হয়, ততদিন নিজেরা সকল প্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিবে, জেলে পচিবে, শাসন কর্ত্তাদের হাতে প্রাণ দিবে, তথাপি অপমানসূচক আইন স্বীকার করিয়া জীবন যাপন করিবে না, ইহাই তাহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ইহাই তাহাদের সংগ্রামের মূলমন্ত্র। এ এক বিচিত্র সংগ্রাম—সংগ্রামকারিগণ কাহাকেও আঘাত করে না, কেবল নিজেরাই নিরুদ্বেগে বিনা বাক্যব্যয়ে সর্ব্ববিধ যন্ত্রণা সহ্য করে। এই সংগ্রাম একমুখো।

ভারতবাসী সুধীগণ, এই যে শত শত লোক অবলীলাক্রমে কারাগৃহে যাইয়া, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া তোমাদের মুখ রক্ষা করিতেছে ইহারা কোন্ শ্রেণীর লোক, জান? যাহাদিগকে তোমরা অশিক্ষিত, মূর্খ, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাক, ইহারা সেই শ্রেণীর লোক। ইহাদের মধ্যে ধনবিজ্ঞানের-সূত্র-মুখস্থ-করা, এম্-এ-ডিগ্রীধারী পাণ্ডিত্যাভিমানী, বিজ্ঞানবীর, সাহিত্যরথী, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী একজনও নাই। প্রায় সকলেই মুদী, দোকানদার, ফেরিওয়ালা, সোজা কথায়, "চাষা" অর্থাৎ mass-পদবাচ্য। ভারতীয় মূর্খ জনসাধারণের চরিত্রবত্তার

এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের আর কোন পরিচয় চাহ কি ?

তোমরা ইহাদের জন্য কি করিবে—পৃথিবীর লোক তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক। জানিয়া রাখিও, এই নীরব রক্তহীন সংগ্রামের ফল জার্ম্মাণি, আমেরিকা, চীন, জাপান, ইংলণ্ড সকলেই অধীরভাবে দেখিতেছে। ভারতবর্ষের প্রাণ আছে কি না, মায়ামমতা, ঐক্য-দৃঢ়তা, স্বজাতিপ্রিয়তা আছে কি না, ভারতবাসী নিজ আত্মীয়-স্বজন সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করিতে শিখিয়াছে কি না—এই বিচিত্র ধর্ম্ম-সংগ্রামে তাহারই পরীক্ষা হইতেছে। ভারতবাসীর দৌড় কতদূর—সমস্ত পৃথিবী আজ তাহা দেখিবে।

ভরসা আছে, ভারতবর্ষ একটিমাত্র ভারত-সন্তানের জন্যও আর উদাসীন থাকিবে না। ভারতবর্ষ জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছে, সেখানে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হইবে না। যে সকল পিতামাতা ও কর্ম্মঠ পুত্রকন্যাগণ পরিবারের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া সহাস্যবদনে কারাগারে প্রবেশ করিতেছে, এবং মৃত্যুকে অভিবাদন করিতেছে তাহাদের নাবালক পুত্রকন্যাগণের অন্নবস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। বাঙ্গালীও পশ্চাৎপদ নহে।

৫। ধর্ম্মপ্রচারক হরনাথ

গৃহস্থের পাঠকগণ হরনাথের ধর্ম্মপ্রচার ও গ্রন্থাবলীর সহিত পরিচিত আছেন। সম্প্রতি কলিকাতায় হরনাথ-তত্ত্ব-প্রচারিণী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় প্রতি বৎসর দুই হাজার করিয়া হরনাথ-গ্রন্থাবলীর প্রত্যেক পুস্তকের সংস্করণ ছাপা হয় এবং এক বৎসরেই বিক্রয় হইয়া যায়। গ্রন্থাবলী উড়িয়া, মারাঠী, হিন্দি, গুজরাটী, তামিল, ইংরাজী ও জার্ম্মান্ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

তাঁহার ভক্তমণ্ডলী ভারতব্যাপী। ইনি সকলকেই "নাম" লইতে বলেন। নাম অর্থে হরিনাম, রাধাকৃষ্ণনাম। বেশভূষার কোন বিশেষত্ব নাই, যে যা দেয় তাহাই পরেন। আহারে জাতিভেদ নাই। হরনাথ বালকের মত সরল ও প্রেমময়, এমন ভালবাসা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই মোহিত হইয়াছে, জীবনে আর তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই। ইঁহার অমানুষিক শক্তিও যথেষ্ট আছে। কাজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া এবং বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে তিনি চাহেন না। শ্রীচৈতন্যের বিশ্বপ্রেম এবং নামধর্ম্ম প্রচার করিতেই তিনি ভালবাসেন এবং তাঁহাকে তাঁহার ভক্তেরা স্বয়ং নিত্যানন্দ বলিয়া স্বীকার করেন। ইনি বাঙ্গালা, ইংরাজী, হিন্দী এবং উর্দ্দুতে সুবক্তা—ইঁহাকে অনর্গল ৪।৫ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিতে দেখা গিয়াছে। বি-এ পরীক্ষা দিয়া ইনি কাশ্মীর মহারাজার ধর্ম্মার্থ অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে ২০।২২ বৎসর ছিলেন।

সিমলা পাহাড়ের ভারত-গবর্ণমেণ্ট অফিসের কর্ম্মচারীগণ বৃন্দাবনে একটি হরনাথ-অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পুরীতে সমুদ্রতটে একটি এবং স্বগ্রাম সোনামুখীতে (বাঁকুড়া) একটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। শেষোক্ত দুইটি বড় দিনের ছুটীর সময় সম্পূর্ণ হইবে আশা করা যায়।

প্রত্যেকটি আশ্রমেই গরীব তীর্থ-যাত্রী-দিগকে আশ্রয় দেওয়া হইবে, রোগ

হইলে সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করা হইবে। আশ্রমের অধীনে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ধর্ম্ম-পুস্তকালয় থাকিবে।

দেশের স্থানে স্থানে এইরূপ আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বড় বেশী। আমরা আশা করি, এই সাধু দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই অনুসৃত হইবে।

* *
*

৬। বড়োদা-রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা

আজকাল প্রাথমিকশিক্ষা-বিস্তারের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র প্রবল চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে বড়োদারাজ্যে ইহার কার্য্য যেরূপ দ্রুত গতিতে চলিতেছে, সেরূপ আর কোথায়ও নহে। বড়োদার গাইকোয়াড় বাহাদুর ইহার জন্য কেবল যে স্বয়ং বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তাহা নহে, তিনি তাঁহার মন্ত্রী ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীদিগকেও এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং স্বরাজ্যে প্রাথমিকশিক্ষা-বিস্তারের জন্য অতি সুন্দর নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। যে স্থানে পনরটি শিক্ষার্থী বালক পাওয়া যাইতেছে, সেই স্থানেই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। গাইকোয়াড় বাহাদুর স্থির করিয়াছেন, শীঘ্রই হউক অথবা কিছু বিলম্বেই হউক, রাজ্যের প্রতি গ্রামে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত করিবেন। প্রজাবৃন্দের শিক্ষার জন্য তিনি যে মহান্ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন এবং অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, ভারতীয় রাজন্যবর্গের তাহা অনুকরণীয়। বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের কুত্রাপি অদ্যাবধি এই প্রকার উদারনীতি অবলম্বিত হয় নাই। ভগবানের কৃপায় তাঁহার সঙ্কল্প পূর্ণ হইলে কেবল এই জন্যই তিনি ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের জন্যও তিনি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। বড়োদা-রাজ্যে বালিকাদিগের জন্য অদ্যাবধি সর্ব্বশুদ্ধ ৩১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাতে ১০,০০০ হাজারেরও অধিক বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে।

* *
*

৭। পুরোহিতের দুর্দ্দশা ও তাহার প্রতীকার

দেশে এখন সকল দিক হইতেই উন্নতির জন্য আন্দোলন চলিতেছে। এখন সকলেই নিজের নিজের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিতেছেন। ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সম্প্রদায়ের কোথাও কেহ নীরব হইয়া বসিয়া নাই। সকলের মধ্যে একটা মঙ্গলময় ভাবের সাড়া লক্ষিত হইতেছে। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চরিত্র, আচার, সমাজ, সংসার প্রভৃতি কোন দিকেই যাহাতে অনিষ্ট থাকিতে না হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। এই আন্দোলনে সহায়তা করিবার জন্য অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি এস্ সি মহাশয় পুরোহিত-সম্বন্ধে আলোচনা তুলিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

"আজকালকার দিনের পুরোহিতের দুর্দ্দশা দেখিলে শৃগাল কুকুরেও অশ্রু বিসর্জ্জন করে। গামছায় চাল কলা বাঁধিয়া পুরুতঠাকুর এখন যজমানদের ঘরে ঘরে গিয়া দেবসেবা করিয়া ফেরেন। বাবুদের বাড়ীতে যেমন বামুনঠাকুর রান্না করেন, তেমনি পুরুতঠাকুর দেবসেবা করেন। সরস্বতীর সঙ্গে উভয়েরই সমান ঘনিষ্ঠতা। পুরোহিতের অবস্থা কি করিয়া উন্নত করা যায়, এ বিষয়ে কেহই চিন্তিত

নহেন। যাঁহারা পুরোহিত, তাঁহারা ছেলেদের ইংরাজি শিখাইয়া কেরাণীগিরি বা অন্য কোনও কাজে দিতেছেন, সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে তাহারা পৌরাহিত্য না করে। এই সকল ছেলে যখন ইংরাজিতে কৃতবিদ্য হয়, তখন তাহারা তাহাদের আত্মীয়-স্বজন পৌরোহিত্য করেন, এ কথা স্বীকার করিতেও লজ্জিত হয়। আর যজমানগণও পুরোহিতের কথা লইয়া মাথা ঘামান না—কেননা দু'পাত ইংরাজি পড়িলে আর কিছু না হইলেও নিজের ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি খুব একটা তাচ্ছীল্য আনিয়া দেয়। তবে আশার কথা সম্প্রতি একটু হাওয়া ফিরিয়াছে—ইংরাজি শিক্ষার মোহ যেন একটু একটু করিয়া কাটিয়া যাইতেছে। নিজের ঘর সামলাইবার জন্য অনেকে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কাজেই এহেন সময়ে পুরোহিতের দুর্দ্দশা বর্ণনা করা আমার নিতান্ত অরণ্যে রোদন হইবে না।

হে শিক্ষিত হিন্দু যুবক, তুমি যে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দাও, সাহেবদের কাছে যে হিন্দুয়ানির বড়াই করিয়া বক্তৃতা দিতে যাও, তুমি হিন্দুধর্ম্মের কি অনুষ্ঠান কর, কোন্ আচার পালন কর? তোমাতে আর নাস্তিকে প্রভেদ কি বড় বেশী? অশিক্ষিত কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র প্রভৃতি যে সকল লোককে তুমি "ছোট লোক" বলিয়া ঘৃণা কর, তাহারাই ত দেখি 'চব্বিশ প্রহর' দেয়, ছয় মাস ধরিয়া কথকতা শুনে, গাজনের সময় প্রকৃত তপস্যা পালন করিয়া থাকে। তোমাদের বাড়ীর মহিলাগণ না কি তোমাদের মত সুশিক্ষিত হইয়া উঠে নাই, তাই এখনও তোমাদের বাড়ী পূজা-পার্ব্বণ হয়, নহিলে সে পাট বন্ধ হইয়া যাইত।

তোমরা কি প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু হইতে চাও? প্রাচীন ঋষিগণের প্রতি কি বাস্তবিকই তোমাদের একটু ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে? তা যদি হয়, তা হইলে এ উদাসীন ভাব ত্যাগ কর—সমাজের আবর্জ্জনাসমূহ দূর করিতে যত্নবান হও। শুধু নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি করিলেই চলিবে না—যাহাতে নিজ নিজ পুরোহিতসম্প্রদায়েরও উন্নতি হয়, সেজন্য সকলকেই চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ পুরোহিত জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইলে তবে সমাজে ধর্ম্মভাবের প্রচার হইবে।

এই স্থলে সমাজকে লক্ষ্য করিয়া আমি কয়টা কথা বলিতে চাই। আজকাল কায়স্থ, কর্ম্মকার, তিলি, সুবর্ণবণিক, মাহিষ্য প্রভৃতি সম্প্রদায় যে ভাবে সমবেত হইয়া আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সেরূপ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তবে অন্যান্য জাতি তাঁহাদিগকে যেটুকু ঠেলিয়া দিতেছেন, তাঁহারা সেইটুকু অগ্রসর হইতেছেন। যেমন এই যে কায়স্থগণ প্রশ্ন করিতেছেন কি গুণে ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়া থাকিবার দাবী করেন, ইহাতে ব্রাহ্মণগণের প্রকৃত উপকার হইতেছে, তাঁহারা বাধ্য হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চা ও জ্ঞানচর্চ্চায় মন দিতেছেন। কিন্তু আরও একটু কার্য্য-তৎপরতা না দেখাইলে ভয় হয় বুঝি ব্রাহ্মণ তাঁহার শ্লাঘ্য স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। আমি বলি কি, কায়স্থাদি জাতি তাঁহাদের পুরোহিতবর্গকে একটু ঠেলা দিন এবং পুরোহিতগণ নিজেরাও একটু অগ্রসর হইয়া যান।

সকলে ভাবিলে নিশ্চয়ই পুরোহিতের উন্নতি হয়। এ বিষয়ে আমি যেরূপ বুঝি, বলিতেছি; আশা করি, যোগ্যতর ব্যক্তি এ বিষয়ের মীমাংসা করিবেন।

যজমান ও পুরোহিত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই যে, পুরোহিতের কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক। পুরোহিত ধার্ম্মিক ও সদাচারী হইবেন—মদ্যপ ও কুচরিত্র পুরোহিতকে কোন্ ভদ্রলোক বাড়ীর ভিতরে যাইতে দিবেন? সেকালে ত ওরূপ ব্রাহ্মণকে জাতিচ্যুত হইতে হইত।* পুরোহিত শাস্ত্রজ্ঞ হইবেন এবং দিবসের কিয়দংশ শাস্ত্রালোচনায় যাপন করিবেন। সময়ে সময়ে তিনি যজমানের হিতার্থ শাস্ত্রীয় উপদেশ দান করিবেন। কেবলমাত্র সংস্কৃত না পড়িয়া তাঁহার কিছু ইংরাজি পড়াও দরকার, কেননা ইংরাজি ভাবের সহায়তা লইয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলে তবে আজকালকার ইংরাজিশিক্ষিত যজমান তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবে। শাস্ত্রে যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের এই ষটকর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। ২৪।২৫ অন্ততঃ ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। একাধিক দার পরিগ্রহ, বৃদ্ধবয়সে বালিকার পাণিগ্রহণ প্রভৃতি বিসদৃশ কার্য্য ত্যাগ করিতে হইবে।

* * *

সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে এই যে, পুরোহিতের ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক ও সম্মানজনক করিতে হইবে, তবে ভাল লোক ঐ ব্যবসায় যাইবে। আর যতক্ষণ যোগ্য লোক—যাঁহারা ইচ্ছা করিলে চাকুরী বা আইন-ব্যবসায় অর্থ করিতে পারেন, এইরূপ লোক—এই ব্যবসায় আসিবেন ততক্ষণ ইহার উন্নতি হওয়াও সম্ভবপর নহে। পৌরোহিত্য এমন গৌরবের কার্য্য করিতে হইবে যে, লোকে পেন্সন নিয়া বা উকীলি হইতে অবসর লইয়া ইহাতে নিযুক্ত হইবে। সেইজন্য প্রথম দরকার এই—বাড়ী বাড়ী গিয়া নিত্য সেবার ব্যবস্থা চালাইয়া দেওয়া। গৃহস্থের উচিত এরূপ বিগ্রহ রাখা যাহা তিনি নিজেই পূজা করিতে [illegible]বেন—যেমন শিব লক্ষ্মী বা রাধা-কৃষ্ণের পট। শালগ্রাম-শিলার যখন ব্রাহ্মণ নহিলে পূজা হয় না, তখন বাড়ীতে শালগ্রাম-শিলা না রাখিয়া পাড়ায় একটি দেবালয় স্থাপনা করিয়া তাহাতেই কয়টি বাড়ীর পৈতৃক শালগ্রামের সেবার বন্দোবস্ত করা উচিত। দেবালয়টি পুরোহিতের বাড়ীর সংলগ্ন হইলে সোণায় সোহাগা হয়। পুরোহিত সেই দেবালয়ে অধিকাংশ সময় কাটাইবেন—যজমানগণও সময় মত পূজা দেখিতে ও পুরোহিতের নিকট শাস্ত্রকথা শুনিতে আসিবেন। পুরোহিত কথকের মত নানা রসের অবতারণা করিয়া পৌরাণিক আখ্যানের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম ও সংসারপালনবিষয়ক বিবিধ জ্ঞান তাহার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যজমানমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে ধন্য করিবেন, নিজেও ধন্য হইবেন। সেই দেবালয়ের সম্পর্কেই একটি চতুষ্পাঠী থাকিবে—তাহাতে কয়েকটি বিদ্যার্থী সংস্কৃত ও ইংরাজি শিখিয়া এই জ্ঞানী পুরোহিতের নিকট পুরোহিতোচিত শিক্ষা লাভ করিবে। বিবাহ বা শ্রাদ্ধ এইরূপ কোনও নৈমিত্তিক ব্যাপারে পুরোহিত যজমানের বাড়ী গিয়া সাত্ত্বিকভাবে কর্ম্মটি সুসম্পন্ন করিবেন। তবে যজমানগণ ইহাও দেখিবেন যেন পুরোহিত জ্ঞানচর্চ্চা ও সামাজিক ব্যবহারের জন্য

* মনুসংহিতা

যথোচিত অর্থ পান—সে বিষয়ে কার্পণ্য করিলে চলিবে না। ভাল জিনিস চাহিলে ভাল দাম দিতে হয়। একজন ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন পুরুষের সহিত আলাপ করিলে তাঁহাদের চরিত্রের ও জ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইবে—তজ্জন্য কিছু অর্থব্যয় অনর্থক বলিয়া মনে হইবে না। সাহেবেরা তাহাদের পাদরিদের যথেষ্ট মান্য করেন এবং উপযুক্ত অর্থও দিয়া থাকেন, আর সেই জন্য বিদ্বান্ লোক পাদরি হন এবং সমাজের অনেক উপকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভিক্টর হুগোর 'লে মিজেরাবল' নামক উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে বিশপ মাইরেলের মত পুরোহিত যাহাতে পাশ্চাত্য দেশে তৈয়ারী হয়, তাহার জন্যই তাঁহারা চেষ্টা করিয়া থাকেন।

বাঙ্গালা দেশে ধনীর প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের অভাব নাই এবং এখনও কেহ কেহ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে কতকগুলা ভূত ভোজন হইতেছে। আর ধনী ও কৃতবিদ্য অনেক হিন্দুসন্তান ইচ্ছায় হ'ক আর অনিচ্ছায় হ'ক, এখনও পুরোহিতের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে একজনেরও কি এমন ইচ্ছা হইবে না যে, আমি একটি সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ দেবালয় স্থাপন করি এবং প্রকৃত পুরোহিতপদবাচ্য এক মহাত্মাকে তাহার সেবাইৎ নিযুক্ত করি, আর এমন নিয়ম করিয়া যাই যেন ভবিষ্যতে কোনও অযোগ্য ব্যক্তি সেবাইতের পদ লাভ না করিতে পারে?"

* *
*

৮। বঙ্গের দীনবন্ধু

প্রায় চুয়ান্ন বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৬৭ সালে, 'কস্যচিৎ পথিকস্য' নামে বাবু 'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজানিকরে'র দুঃখে ব্যথিত হইয়া "নীলদর্পণং নাটকং" রচনাপূর্ব্বক, উহা 'নীলকরকর'কেরে' অর্পণ করেন। তাহার ফলে বঙ্গদেশে মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়,—মহামঙ্গল সাধিত হয়। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় উদ্দীপনা" শীর্ষক তৎকাল-লিখিত প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"দূরেই বা যাই কেন, আমাদের স্মৃতিকালের মধ্যে এই বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে মহা উদ্দীপনার অবতারণা আমরা দেখিয়াছি।

যখন মানুষের মন এইরূপ উত্তেজিত, তখন দীনবন্ধু মিত্রের সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটক প্রকাশিত হইল। নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না।"

এই এক গ্রন্থ রচনা করিয়া দীনবন্ধু বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালী জাতির কাছে অমর হইয়া গিয়াছেন।

সাময়িক দুর্দ্দৈব নিবারণের জন্য যে সমস্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হয়, ঐতিহাসিক হিসাবে, তাহাদের মূল্য বড় কম নহে। নীলদর্পণ সেই জন্য আমাদের কাছে চিরকাল আদৃত হইবে। বাস্তবিকই পুস্তকখানায় বঙ্গদেশের তাৎকালিক অবস্থার একটা সুন্দর চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার "সধবার একাদশী" "নবীন তপস্বিনী" প্রভৃতি গ্রন্থেও বঙ্গদেশের তৎসময়ের সামাজিক অবস্থার ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুপ্ত কবির শিষ্যদিগের মধ্যে হাস্যরস-অবতারণায় তাঁহার মত সিদ্ধহস্ত আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

রাস-পূর্ণিমার দিন তিনি পরলোকগমন করেন। তাই প্রতি রাস-পূর্ণিমায় তাঁহার গৃহে—কলিকাতার "দীনধামে"—তাঁহার পবিত্র স্মৃত্যর্থে সাহিত্যিকদিগের পূর্ণিমা-সম্মিলন সংঘটিত হয়। বর্ত্তমান বর্ষে গত ১লা অগ্রহায়ণ উহা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

* *
*

৯। বৈষ্ণব আন্দোলন

স্বধর্ম্মপরায়ণ পরমবৈষ্ণব শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের চেষ্টা, যত্ন ও সাহায্যে গত চারি বৎসর ধরিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর বার্ষিক অনুষ্ঠান হইতেছে। প্রথম তিন বৎসর তাঁহার রাজবাটী কাশীম-বাজারে, এবং চতুর্থ বর্ষে শ্রীল নরহরি ঠাকুরের শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে ইহার অধিবেশন হয়। বর্ত্তমান ৫ম বর্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপে সম্মিলনী হইবে। শ্রীধাম নবদ্বীপ বৈষ্ণব-সমাজের মহাতীর্থ—শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি। এই নবদ্বীপেই ১৪৩০ শকে তিনি প্রথমে—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।
(যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ)
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

কীর্ত্তন গান করিয়া হরিনাম-সংকীর্ত্তন-প্লাবনে সমগ্র বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যাকে পরিপ্লাবিত করিয়াছিলেন। সম্মিলনের উদ্যোক্তারা এ হেন ভুবনপাবন স্থানে সম্মিলনের স্থান নির্ব্বাচন করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের বিশেষ আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

সম্মিলনীর দিন ও কার্য্যাবলী স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী ১৯শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে অধিবাস। ২০শে ও ২১শে অগ্রহায়ণ 'পোড়ামাতলা'য় সভাধিবেশন এবং ২২শে অগ্রহায়ণ নগর সঙ্কীর্ত্তন হইবে।

* *
*

১০। সেবামাহাত্ম্য

আমরা গতবারে দেখাইয়াছি,—যে সমুদয় নূতন শক্তি ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের 'দ্বিতীয় যুগে'র সূত্রপাত করিয়াছে, তাহার মধ্যে সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠালাভ অন্যতম। এই সেবাই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম। এই সেবা-দ্বারাই চরিত্র সংগঠিত হয়—সেবাদ্বারাই গৃহস্থ আপনার মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারে—বিশ্ব-সংসারকে আপনার করিয়া লইতে পারে। আমরা নিম্নে ব্রহ্মচারী দেবব্রত মহাশয়ের এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা উদ্ধৃত করিলাম—

"ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ, ঋষি বা ভগবানের অবতার-গণ জীবের কল্যাণসাধনের নিমিত্ত যে সকল আদর্শ অনুসরণের অনুজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সেবাধর্ম্ম বা জীবে দয়া সর্ব্বোচ্চ। বেদ, বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ এই মহান্ আদর্শের ঘোষণা করিতেছে। সকল ধর্ম্মের মূলে যে সনাতন সত্য নিহিত আছে, তাহার উপলব্ধি হইলে, সেবাধর্ম্ম বা জীবে দয়া যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়। যাঁহারা জগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতিপাদন করেন—জীব-ব্রহ্মের স্বরূপতঃ একত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কেবল উপাধিগত ভেদই দেখিতে পান; তাঁহাদের পক্ষে সমদর্শন ও ব্রহ্মদর্শন একই কথা।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

"আত্মতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতমণ্ডলী বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও ব্যাধ সমস্ত জীবে সমদর্শী হন অর্থাৎ "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ" দর্শন করিয়া থাকেন। অতএব ভেদ উপাধিগত, উপাধি পরিবর্ত্তনশীল এবং তদ্দ্বারা জীব বা বস্তুর

জীবত্ব বা বস্তুত্বের সম্পাদন হয় না। আমার আমিত্ব ও কুকুরের কুকুরত্ব আত্মা ব্যতীত সম্ভবপর নহে। উপাধি দ্বারা অনতিদীর্ঘ স্থায়ী বিচিত্রতা প্রকটিত হয় মাত্র।

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ॥"

অর্থাৎ অদ্বিতীয় অব্যক্তভাবে সমস্ত প্রাণীতে বিদ্যমান, সর্ব্বব্যাপী, সকল ভূতের স্বরূপ, অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা, সমস্ত জীবে বর্ত্তমান, পরমেশ্বর সকলের স্রষ্টা, তাহার উপাধি বা সত্বাদিগুণ কিছুই নাই।

এখন দেখা যাইতেছে যে, ভেদগত যে উপাধি—সে উপাধি কিছুই নহে—আবরণ মাত্র।

যে কোন কেন্দ্রেই হউক প্রত্যেক স্থানেই তিনি পূর্ণ বিরাজমান—তিনি সর্ব্বব্যাপী।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জাতানিতি শান্ত
উপাসীত।"

অর্থাৎ সেই ঈশ্বর হইতে জাত, তাহাতে লীন ও তাঁহা দ্বারা প্রতিপালিত সুতরাং সমস্তই ব্রহ্ম।

কিন্তু যাঁহারা জগদতিরিক্ত ঈশ্বর কল্পনা করেন, তাঁহাদের মতে ঈশ্বর পিতা, জীব পুত্র, অতএব জীবে ভ্রাতৃভাব তাঁহাদিগের ধর্ম্মের মূল সত্য। এই সুমহান্ আদর্শ হইতেই জীবের প্রতি মৈত্রী, করুণা ও প্রেম উৎপন্ন হয়। যিনি যে পরিমাণে এই আদর্শের ধারণাক্ষম, জীবের প্রতি তাঁহার সেই পরিমাণ মমতা—সেই পরিমাণ ভালবাসা। এই জীবে দয়া বা সেবাধর্ম্ম ঈশ্বর-প্রেম বা ঈশ্বরভক্তি ব্যতীত সম্ভবপর নহে। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সম সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং॥

"যিনি ব্রহ্মানুভব করিতে পারিয়াছেন, সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তির শোক বা কামবাসনা থাকে না, তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং জীবাত্মা পরমাত্মায় অভেদ জ্ঞানস্বরূপ পরাভক্তি লাভ করেন। এই জীবাত্মার সহিত অভিন্ন দর্শনরূপ ভক্তিদ্বারাই আমি কত প্রকারে অবস্থিতি করিতেছি, এবং কিরূপ পদার্থে তাহার তত্ত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ আমার অপরিসংখ্য উপাধি এবং নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব চৈতন্যাবস্থায় জ্ঞান হয়। তখন আমি ও জীব যে একই পদার্থ তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। ইহার নাম ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মুক্তি।"

"যে আত্মা নরেতে
সেই আত্মাই এক হইয়া বিশ্ব সংসারে।"
"বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চ বিশ্বানরঃ
বিশ্বে বা নরা অস্যেতি বিশ্বানরঃ পরমেশ্বরঃ।"

অতএব পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমদর্শনাপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আর নাই। এই আদর্শ ধরিয়াই সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যবস্থা প্রকটিত হয়। প্রাকৃতিক জীবের অজ্ঞানাচ্ছন্ন হৃদয়ে যাহাতে শনৈঃ শনৈঃ এই মহান্ ভাবের স্ফুরণ হয়, তদুদ্দেশ্যেই নিখিল ধর্ম্ম-কর্ম্মের ব্যবস্থা। সুতরাং যে ধর্ম্ম বা যে কর্ম্ম তাহার বিরোধ-ভাবাপন্ন তাহা কখনও জীবের হিতকর নহে।

সর্ব্বভূতে সমদর্শন প্রাকৃতিক জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া যে ভেদ-গর্ত্তে নিপতিত হইয়া উৎসন্ন যাইবে, ইহা কোন ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য নহে। তাই সর্ব্ব-ধর্ম্মের সদুপদেশ হইতেছে "কাহাকেও হিংসা

না করা, অনিষ্ট না করা, সকলকে বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করা, সকলকে দয়া করা, পরহিতের জন্য স্বার্থত্যাগ করা।" ধর্ম্মের এই গূঢ় সনাতন সত্য উপদেশ জাতিগত বা সম্প্রদায়গত না হইলে ইহাকে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব বা আত্মদর্শন বলে।

কেহ কেহ বলিবেন, মানবের স্বভাব—দ্বেষহিংসা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মূল শিকড়। ইহা কস্মিন কালেও উৎপাটিত হইবার নয়। আবার তাহার উপর জাতিগত, ধর্ম্মগত, আচার-ব্যবহার-ও-সম্প্রদায়গত দ্বেষ-ঘৃণা ত রহিয়াছেই। এই সকল প্রবৃত্তি বলবতী থাকিতে সেবাধর্ম্ম ও ভ্রাতৃভাব সম্ভবে কি? ইহা স্থূলদর্শীর দৃষ্টিতে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই ইহা দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া ধারণা হইতে পারে না। জীব-স্বভাবে দেব-ভাব ও অসুর-ভাব উভয়ই বিদ্যমান আছে—সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগেই আছে। অনেকে দেবভাবাপন্ন এবং অনেকে অসুরভাবাপন্ন। যাহারা অসুরভাবাপন্ন, তাহাদিগকে দেবভাবে আনয়ন করিবার জন্য তাহাদিগের ইচ্ছা-শক্তিকে সৎপথগামী করিতে হইবে এবং যাহারা সৎপথগামী তাহাদিগের উত্তরোত্তর পুষ্টি-সাধনের নিমিত্ত ধর্ম্ম-কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, স্বীয় ধর্ম্মের প্রকৃত গূঢ়-রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে শিখিলে—ধর্ম্মোপদেশ-স্রোতে জীবন-স্রোতকে ভাসাইয়া দিলে তাঁহার অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, এ জগৎটা আকাশ-কুসুমবৎ নহে। এটি "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।" অবিভক্ত হইয়াই সর্ব্বভূতে বিভক্তের ন্যায় স্থিত অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক জীবের মধ্যে এক, অভিন্ন; তাঁহার বহুত্ব নাই, তথাপি তিনি প্রতি দেহে মন ও ইন্দ্রিয়াদি উপাধির পার্থক্য থাকায় ভিন্ন ভিন্ন জীব-রূপে প্রতীয়মান।

তাই সেবক "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর" বলিয়া জলদগম্ভীর নিনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া সর্ব্বভূতে সেই প্রেমস্বরূপ পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার জন্য "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" জগতের সেবায় সদা নিয়ত থাকেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলিতে থাকেন—

"হে প্রেমিক, স্বার্থমলিনতা
অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ?
কৃপা-পাত্র হয়ে কি বা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী,
প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান;
দাও দাও যে বা ফিরে চায়,
তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।
ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু,
সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ
কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর!
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

ইহা নিষ্কাম সেবাধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব। নিষ্কাম সেবক ব্যতীত এরূপ ধারণা জগতে নিত্য আগমন করে না। নিষ্কাম সেবকের সেবা কোন জাতি, ধর্ম্ম ও ব্যক্তি-বিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, কারণ তাঁহার কোন কামনা নাই, লাভালাভের দিকে

দৃষ্টি নাই। সকলের মধ্যে যে অধীশ্বর আছেন, যে পূর্ণস্বরূপ প্রেমস্বরূপ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে সকল স্থানে সকল অবস্থায় উপলব্ধি করিবার জন্যই নিষ্কাম সেবকের সমস্ত আয়োজন।

"মনসৈতানি ভূতানি
প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া
প্রবিষ্টো ভগবানিতি।"

* *
*

১১। সুশ্রুতসংহিতা

আমাদের দেশের ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই এ পর্য্যন্ত ধারণা ছিল, ভারতের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অনুন্নত। ইহার গাছগাছড়া—ঔষধসম্ভার সমস্তই অসভ্যতার চরম দৃষ্টান্ত। কিন্তু সুখের বিষয় এখন আর সে ধারণা নাই। এখন সকল দিক হইতেই আমরা ঘরমুখো হইতেছি। সকল বিষয়েই আত্মগৌরব অনুভব করিবার ক্ষমতা আমরা ফিরিয়া পাইতেছি। তাই আয়ুর্ব্বেদের উপরও আমাদের সাদর দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাই বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় পারদর্শী হইয়া কবিরাজী করিতে গৌরব বোধ করিতেছেন। তাই তাঁহারা বহুপ্রকারে চিকিৎসা-জগতের সম্মুখে আয়ুর্ব্বেদের মহিমা কীর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইতেছেন। সেই প্রয়াসের অন্যতম ফল—কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ভিষগ্‌রত্ন এম্, আর, এ, এস্ মহাশয়ের সুশ্রুতসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ।

সুশ্রুতসংহিতা আয়ুর্ব্বেদের একটি প্রধান স্তম্ভ। ইহাতে শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, নিদান, আরোগ্যবিজ্ঞান এবং আরও বহুবিধ বিষয় অতি সুন্দর এবং সুসঙ্গতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে শবব্যবচ্ছেদ, মৃতগর্ভ-বহিষ্করণের এমন সমস্ত সুন্দর প্রণালীর উল্লেখ আছে, যাহা ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের কাছে একেবারেই নূতন। কেমন করিয়া চক্ষুর ছানি কাটিতে হয়, তাহা সুশ্রুতই প্রথম জগতে প্রচার করেন। তিনিই প্রথম অস্ত্র-চিকিৎসা-প্রণালীকে অষ্টভাগে বিভক্ত করেন—যথা, আহার্য্য (ভিতর হইতে ক্লেদাদি নিষ্কাশন) ভেদ্য (বিঁধিয়া দেওয়া), ছেদ্য (কর্ত্তন), এষ্য (শলাকা-প্রবেশ), লেখ্য (ঈষৎ বিদারণ), সেব্য (সেলাই করা), বেধ্য (ছিদ্রকরণ) এবং বিস্রাবণীয় (টিপিয়া ক্লেদাদি নিষ্কাশন)।

তাঁহার সংহিতায় প্রায় একশত অস্ত্রের নাম ও আকৃতি বিবৃত হইয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক যুগেও সেই সব অস্ত্রগুলি নিতান্তই বর্ব্বর বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই। ভিষগ্‌রত্ন মহাশয় তাঁহার অনূদিত পুস্তকে কতগুলি অস্ত্রের চিত্র দিয়াছেন। আমরা আশা করি, এই চিত্র দেখিয়া পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী অনেকেরই হিন্দুজাতির ব্যবহারিক জ্ঞান ও বৈষয়িক সভ্যতা সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা অপগত হইবে।
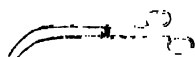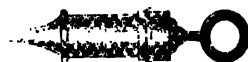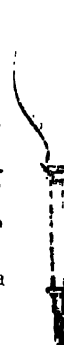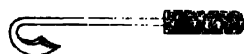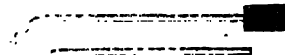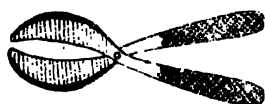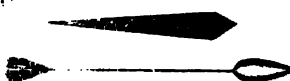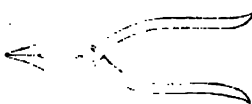
সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ভদ্র-মণ্ডলী !

অদ্য আমরা মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সম্মিলিত; ভাষা-জননীর মন্দির-দ্বারে আজ আমরা পূজার অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। এই আনন্দের দিনে আপনারা আমার ন্যায় নগণ্য সাহিত্য-সেবীকে সেই আনন্দের, সেই পরামৃতের অংশভাগী করিয়া আপনাদের উদার হৃদয়ের ও মহানুভবতার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমার নাই। আর আজ আপনারা নিজগুণে যে পদে আমাকে বরণ করিয়াছেন, আমি জানি যে আমি সে পদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; তবে আমার গ্রহণ করিবার পক্ষে এইটুক্ কৈফিয়ৎ দিলে বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মালদহবাসীদের —বৈষ্ণবকুলতিলক শ্রীল রূপসনাতন-অধ্যুষিত বৈষ্ণবতীর্থ মালদহ-জেলার সম্ভ্রান্ত সাহিত্য-সেবীদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারি এরূপ শক্তি মাদৃশ বৈষ্ণবদাসানুদাসের নাই।

আজ আমরা ছোটবড়-নির্ব্বিশেষে সকল সন্তান মাতৃমন্দিরে মায়ের অলক্তকরাগরঞ্জিত চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে এই মালদহ জেলায় সমবেত হইয়াছি। আসুন সকলে মিলিয়া সমস্বরে বলি :—

"আজি গো তোমার চরণে জননি,
আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত
দীনের গান।

চাহি না'ক কিছু তুমি মা আমার,
এই জানি কিছু নাহি জানি আর
তুমি গো জননি হৃদয় আমার,
তুমি গো জননি আমার প্রাণ।"

প্রাণময়ী সর্ব্বার্থসাধিকা আশাতোষিণী ভাষা-জননীর চরণে প্রণত হইয়া এক্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। এই যে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি—মাতার পূজার দ্বারে অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছি, ইহার পরিকল্পনা আধুনিক যুগে ফরাসী-রাজধানী পারী নগরীতে প্রথম প্রচলিত হয়। ফলে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে International Oriental Congress নাম দিয়া এক বিরাট সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। ফ্রান্সের এই মহদৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হইয়া লণ্ডন, সেণ্ট পিটার্সবর্গ, ফ্লোরেন্স, বারলিন, লীডেন প্রভৃতি প্রদেশ অদ্যাবধি এই সাহিত্য-সম্মিলন-ব্যাপারটার রীতিমত সাময়িক অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। আট বৎসর পূর্ব্বে (১৩১৪ বঙ্গাব্দে) আমাদের বাঙ্গালা-দেশে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কএকজন বাণীর কৃতী সন্তানের চেষ্টায় এইরূপ একটা সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল। আমাদের কপালের দোষে সে বৎসর সম্মিলনের সমস্ত

* মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম (কলিগ্রাম) অধিবেশনে পঠিত।

আয়োজন পণ্ড হইয়া যায়। তারপর ১৩১৪ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে কাশিমবাজার রাজ-বাটীতে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। সেই বৎসরই উত্তরবঙ্গে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সূচনা হয়। ফলে কাশিমবাজার, রাজসাহী, ভাগলপুর, ময়মনসিংহ, চুঁচুড়া, চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের এবং রঙ্গপুর, বগুড়া, গৌরীপুর, মালদহ, কামরূপ ও দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়। গতবর্ষে শ্রীহট্টেও একটি প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মালদহবাসিগণ, আজ মাল-দহ-সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়া, সাহিত্যিক জ্ঞানবিস্তার ও বঙ্গভাষার অনুশীলন করিবার যে শুভসূচনা করিয়া দিয়াছেন, মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীষে তাহা ফলপ্রসূ হউক এবং এই সম্মিলন যেন দেশের ও দশের উপকার করিয়া ধন্য হইতে পারে, দেশে সৎসাহিত্যের প্রচারকল্পে সহায় হইতে পারে, আর জ্ঞান ও নীতি শিক্ষাদ্বারা চরিত্রবলে বলীয়ান করিয়া ভবিষ্যতের আশাস্থল সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ যুবকসম্প্রদায়কে সমাজের কল্যাণকল্পে স্বদেশ-হিতব্রতে দীক্ষিত করিতে পারে। এক্ষণে এইরূপ সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না দেখা যাউক। জ্ঞান জাতি বা ব্যক্তির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিলে বদ্ধজলের ন্যায় কালে দুষ্ট হইয়া পড়ে। জ্ঞান বেগবান নদের ন্যায় সমাজের স্তরে স্তরে প্রবাহিত না হইলে মানবের উপকারে আসিতে পারে না। জ্ঞানের বিস্তার করিতে হইবে; এই প্রচারকার্য্য একের দ্বারা বা এক সমাজের দ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে না—সম্মিলিত চেষ্টায় এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। তাই বঙ্গের বরেণ্য কবিবর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা সমবেত চেষ্টাই অধিক সাফল্য লাভ করে। সকলের সামর্থ্য সমান নয়, সকলেই যে-কাযে শক্তি নিয়োজিত করে, তাহা হইতে খুব বড় একটা ফললাভ করা যায়। এই নির্ম্মাণ-কার্য্যই সাহিত্য-সম্মিলনের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র;" এবং এই উদ্দেশ্যেই "বঙ্গের সমুদয় সাহিত্যসেবীকে একস্থানে সম্মিলিত করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করাই এইরূপ সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।" "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই" প্রবাদ বাঙ্গালা দেশে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, কএক বৎসর পূর্ব্বে সমব্যবসায়ী সাহিত্যসেবিদিগের ভিতর মনোবিবাদ ও মতান্তরের পরিণতি এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত বিদ্বেষবহ্নি উদ্গীরিত হইত। অনেকস্থলেই ইহার কারণ ছিল—সহানুভূতির অভাব, সাহিত্য-সেবীদের ভিতর প্রাণের স্পন্দনের অভাব—প্রীতির অভাব। এক্ষণে এই আটবৎসরের মেলামেশার দরুণ স্বকপোল-কল্পিত অনৈক্য অনেকটা দূর হইয়াছে, ভাবের আদানপ্রদানের একটা সমতা হইয়াছে। এইরূপ অশেষ কল্যাণকর সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোধ হয় বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

এ কথাও আবার স্বীকার করিতে হইবে যে, মনীষা সহযোগিতার ধার ধারে না। সে বলদৃপ্ত নদের ন্যায় পর্ব্বত ভেদ করিয়া, উপলখণ্ড বিচূর্ণ করিয়া আপনার গন্তব্যপথ নির্দ্ধারণ করিয়া লয়; কিন্তু সেও সাগরসঙ্গম-অভিলাষে ছুটিয়া থাকে। মহামনীষীদের অন্তরাত্মাও সেইরূপ জনসঙ্ঘের ভাবের

মিলনপ্রয়াসী। মনীষীরা গগন-চুম্বী কুতুব-মিনারের ন্যায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেও তাঁহারা সম্মিলিত জনসঙ্ঘ-শক্তির ফল। দেশে ইট কাঠ পাথর সমস্তই ছিল, স্থপতিগণ চেষ্টা করিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিয়া কুতুব-মিনার গড়িয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে অজ্ঞাতনামা হিন্দু নরপতিই হউন, আর কুতুবুদ্দীন আইবকই হউন একজনকে খাড়া হইতে হইয়াছে। এতটা সমবায়ে তবে কুতুব-মিনার খাড়া হইয়াছে, সে আপনি দাঁড়াইতে পারে নাই।

এক্ষণে কোন্ পথে কার্য্য করিলে সম্মিলনের এই সকল মহদুদ্দেশ্য—সৎসাহিত্যের প্রচার, জ্ঞানের প্রচার, ভ্রাতৃভাবের বৃদ্ধি ও প্রীতি-সংস্থাপন, সমাজ ও জাতীয়তা-রক্ষণ—বজায় রাখিয়া চলিতে পারা যায় দেখা যাউক।

১। সমস্ত প্রাদেশিক সম্মিলনী দেশীয় সম্মিলনীর সহিত সহযোগিতায় এক উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করিলে আমরা অধিক কৃতকার্য্য হইব।

২। সমস্ত প্রদেশেই যাহাতে লিখিত ভাষার ঐক্য থাকে, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিভিন্ন প্রদেশে লিখিত ভাষার কোন প্রকার প্রভেদ বাঞ্ছনীয় নয়।

৩। বাঙ্গালাভাষার পূর্ব্বেতিহাস-সঙ্কলন-বিষয়ে প্রত্যেক প্রাদেশিক সম্মিলনী উপকরণ-সংগ্রহ-কল্পে সম্পূর্ণ সাহায্য করিবেন; যথা, স্থানীয় প্রবাদ-বাক্য, ব্রতকথাদি, কবি, পাঁচালী, গীত প্রভৃতি, কবি বা সাহিত্যিকদিগের জীবন-বৃত্তান্ত রচনাদি, পুরাতন দেবালয়ের ইতিহাস, প্রস্তর বা ধাতুফলকাদির বিবরণ, প্রসিদ্ধ লোকদিগের জীবন-বৃত্তান্ত, নানা প্রকার কিংবদন্তী প্রভৃতি।

৪। বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ-প্রচার। ইংরেজি ভাষা হইতে অনুবাদ নূতন কথা নয়; এক্ষণে ভারতবর্ষের ভিন্নদেশীয় ভাষায় বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, সেই সকল গ্রন্থ হইতে রত্নরাজি [illegible] করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা ভাষার অনেক পুস্তক আজকাল হিন্দীভাষায় অনূদিত হইতেছে, কিন্তু আমরা হিন্দী ভাষায় লিখিত অনেক উল্লেখযোগ্য আবশ্যক পুস্তকের সন্ধান পর্য্যন্ত রাখি না। তামিল ভাষার বহু শত উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি জৈন সম্প্রদায়ের বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে তদ্ভিন্ন [illegible] গুজরাটী, মারাঠী ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট পুস্তকসকলের অনুবাদ আবশ্যক।

৫। বাঙ্গালাভাষায় কেহ কোন নূতন পুস্তক প্রণয়ন করিলে, যদি তাহা দ্বারা সাহিত্যের প্রকৃত পরিপুষ্টি হয়, যদি তাহা দেশীয় সাহিত্যের মঙ্গলদায়ক হয়, তাহা হইলে ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া সম্মিলনের তাহা প্রচার করার বন্দোবস্ত করা উচিত।

৬। দেশে যাহাতে সমদর্শী অভিজ্ঞ সমালোচকের লেখা প্রচারিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সমালোচনার একদেশদর্শিতা বা অনুরোধ-পরতন্ত্রতা আমার দেশ হইতে বিদূরিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৭। বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনেক বিভাগে পারিভাষিক শব্দের বিশেষ অভাব আছে। দেশীয় সম্মিলনী বা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত একযোগে পরামর্শ করিয়া যাহাতে সেই সকল পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন ও প্রচারের সহায়তার ব্যবস্থা হয় তাহার চেষ্টা প্রার্থনীয়।

৮। স্থানীয় দুঃস্থ সাহিত্য-সেবিগণকে উৎসাহ-প্রদান ও তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকাবলীর প্রচারের চেষ্টা।

৯। বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র এইরূপ সম্মিলনের সঙ্ঘটন ব্যতীত সাহিত্যিকগণকে লইয়া প্রতিমাসে সাহিত্যানুশীলনের ব্যবস্থা করিলে সম্মিলনের মহদুদ্দেশ্য-সাধনের দিকে কার্য্যতঃ অগ্রসর হওয়া সহজ হইয়া পড়িবে।

অতঃপর, সাহিত্যের সহিত সমাজের কি সম্বন্ধ তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। মসিয়ে ফাগুয়ে (M. Faguet) বলেন :—

"ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ফরাসী সাহিত্য বিলাসের সাহিত্য ছিল। সে সাহিত্য সমাজ-মত-দ্যোতক ছিল না; সে সাহিত্যের প্রভাব ফরাসী-সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। তাহার পর বিপ্লবের সূচক যে সাহিত্য-সৃষ্টি ফরাসীদেশে হইয়াছিল, তাহা খ্রীষ্টান সাহিত্য নহে। ভলটেয়ার, রুসো, ডিড়েরো প্রভৃতি মনীষী লেখকগণকে কোনক্রমে খ্রীষ্টান বলা যায় না। বরং তাহাদের লেখার প্রভাবে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের খণ্ডন হইয়াছিল; খ্রীষ্টান সমাজের উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছিল। তথাপি কিন্তু বলিতে হয়, যে ফরাসী-সাহিত্য প্রায় পাঁচ শত বৎসরের খ্রীষ্টান সভ্যতার ফলে, সহস্র বৎসর কালের খ্রীষ্টান ধর্ম্মমত সাধনের পরিণতির স্বরূপ, সে ফরাসী ভাষার মজ্জাগত খ্রীষ্টান ভাব ভলটেয়ার, রুসোর লেখাতেও একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। **একদিনে ভাষার সৃষ্টি হয় না; যুগ-যুগান্তরের চেষ্টায় একটা ভাষা পূর্ণাঙ্গ হইয়া ফুটিয়া বাহির হয়; যুগ-যুগান্তরের মতবাদ, ভাব, ধ্যান, ধারণা ভাষার স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে**; সে সকল স্তর-বিন্যস্ত ভাবরাশিকে একটা বিপ্লবের ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ফরাসী-বিপ্লব ধ্বংসের বিপ্লব হইলেও, ভলটেয়ার-রুসোর মতন অমানুষ প্রতিভাশালী ধ্বংসাবতার অবতীর্ণ হইলেও ফরাসী সাহিত্যকে উহার ধর্ম্মের বেদী হইতে তাঁহারা কেহ নামাইতে পারেন নাই।" ফরাসী সাহিত্য সমালোচনা করিয়া মুসিয়ে ফাগুয়ে নিম্নলিখিত তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

(১) "যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির মেদমজ্জার সহিত জড়িত;—তাহা জাতির সকল স্তরে সঞ্চারিত,—উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্যন্ত সকল লোকেই পরিব্যাপ্ত।

(২) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির অতীত-পারম্পর্য্যের সহিত সম্বন্ধ—মালা-গ্রথিত পুষ্পশ্রেণীতুল্য।

(৩) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির সমাজধর্ম্ম-বর্জ্জিত হইতে পারে না; তাহা জাতির ভাষানিহিত ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না।" *

এই অবিসংবাদিত সত্যগুলি সকল সাহিত্য সম্বন্ধে প্রযুজ্য। সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ লাভ করিতে না পারিলে সাহিত্য কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্য স্থায়ী হইবার কারণ বাঙ্গালী মাত্রেই তাহার ভাবগ্রহণে ও রসবোধে সমর্থ। ভাবের অস্পষ্টতা কোথাও দেখা যায় না। প্রাণের ভাষায় লিখিত ভাবগুলি সমাজ-মুকুরের প্রতিচ্ছবি। তাই এখনও নিরক্ষর কৃষক দাশরথি, নিধুবাবু, রামপ্রসাদ, কাঙ্গাল

হরিনাথের গান গায়িয়া আনন্দ অনুভব করে—আপনাদের জ্বালা ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম শিক্ষিত-দিগের জন্য সাহিত্যের সৃষ্টি হইলে সে সাহিত্য কখনও স্থায়ী হইবে না। ভাব ও ভাষার অপূর্ব্ব মিলনে নব-প্রয়াগের সৃষ্টি করিয়া যাহাতে সকলে অবগাহন করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে, সেইরূপ করা প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই কর্ত্তব্য।

গভীর পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, আজকাল কএকজন শক্তিশালী লেখক য়ুরোপের আদর্শে গঠিত নূতন ভাব পরম্পরার পসরা আনিয়া আমাদিগের সাহিত্যে উপ ঢৌকন দিতেছেন; কিন্তু সেগুলি ঠিক আমাদিগের জাতীয়তার সহিত সমঞ্জসীভূত হয় না—আমাদিগের অতীতের ভাবপরম্পরার সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না; দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, যদি কোন শক্তিশালী লেখক প্রভুপত্নীর প্রতি চাকরের বা সহিসের প্রেমের বিষয় চিত্রকরের তুলিকার ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত করেন, তাহা হইলে মনোবিজ্ঞানের দোহাই দিয়া চাকর বা সহিসের প্রভুপত্নীর প্রতি প্রেম যে সম্ভবপর হইতে পারে না তাহা বলিবার ক্ষমতা কাহারও নাই; কিন্তু— ভারতবর্ষে চাকর বা সহিস প্রভুপত্নীকে মাতৃভাবে ভিন্ন অন্যভাবে দেখিতে জানে না। সে আপনাকে পুত্র বলিয়া জানে। সে দাসত্ব করিতে আসিয়া নম্রতাকে এতটা নিজের স্বভাবগত করিয়া লইয়া উপস্থিত হয় যে, প্রভুপরিবারের মহিলাগণের প্রতি তাহার মাতৃভাব ও ভগিনীভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব উপস্থিত হইলে সে আপনাকে পাপী বলিয়া গণ্য করে। য়ুরোপীয় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ভারতবাসীর স্বপ্নের অতীত। ভারতের চাকর বা সহিস আপনার দীনতায় হীনতায় আপনি ম্রিয়মাণ, তাহার হৃদয়ে এ ভাবের সৃষ্টি নূতন. য়ুরোপে এরূপ সম্ভবপর হইতে পারে কারণ, সেখানে সাম্যভাবই (equality) প্রধান। এরূপ গন্ধহীন বিলাতি কণ্টকপুষ্প আমদানি করিলে সৎসাহিত্যের পুষ্টি হইতে পারে না। তাই মনীষী কাপুয়ের সহিত একবাক্যে বলি—

যাহা জাতির সাহিত্য-তাহা জাতির অতীত পারম্পর্য্যের সহিত সম্বদ্ধ হইবে এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—"ভাষা কেবল সাহিত্যের উপাদান নহে, উহার সর্ব্বাঙ্গ জাতির ছাপে অঙ্কিত। ভাষা সমাজের অভিব্যক্তি, এই অভিব্যক্তি বিহঙ্গকলরবের ন্যায় বাতাসে মিশাইয়া যায় না, সাহিত্যের মর্ম্মস্থানে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত থাকে। ভাষা সাহিত্যের সৃষ্টি করে, আবার সাহিত্যের আশ্রয়ে ভাষা আত্মরক্ষা করে। মানুষের ভাষা আছে, সে ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সে সাহিত্য সনাতন হইয়া থাকে। তাই মানুষ মানুষ, নির্ভাষ পশু নহে। পশুর স্মৃতি নাই, স্মৃতির অক্ষয় মঞ্জুষা নাই; তাই পশুর উন্নতি নাই, স্থিতি নাই, বিকাশ নাই: মানুষের স্মৃতি আছে, স্মৃতির অক্ষয় মঞ্জুষা সাহিত্য আছে; তাই মানুষ নরদেবতা হইয়াছে, সে আবার হইতেও পারিবে। সাহিত্যের সৃষ্টি ধর্ম্মের উপাদানে হইয়া থাকে। সে ধর্ম্ম প্রথম স্তরে, বিভীষিকার উপাসনা, সৌন্দর্য্যের আরাধনা মাত্র। ইহার পর স্তরে স্তরে মানুষ যেমন উন্নীত হয়, তদনুসারে মানুষের সাহিত্যও আকারান্তরিত হয়। এই অসংখ্য স্তর-বিন্যস্ত সাহিত্য বিশ্বমানবতার

ইতিহাস—দেবত্বের উন্মেষ-কাহিনী।"* বহু-দিন পূর্ব্বে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ সাহিত্য-ধুরন্ধর শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—

"হিন্দু এবং য়িহুদী বহুনির্যাতনেও কেবল ধর্ম্মবলে এখনও জীবিত আছে। * * * য়িহুদী কোন্‌কালে বাস্তুদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার উপর, কত উৎপীড়ন উপদ্রব মাথায় রহিয়াছে, এখনও বহিয়াছে, তবু মরে নাই; কেবল মরে নাই নহে, জগতের মধ্যে সুন্দর, সুশ্রী, উন্নতদেহ, দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ, প্রফুল্ল, ধনশালী, কলানিপুণ জাতি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেন, তাহারা স্বধর্ম্ম-পরায়ণ এবং সদাচারনিষ্ঠ বলিয়া।" এ কথা যে খুব সত্য তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ধর্ম্ম যেরূপ ব্যক্তিকে, জাতিকে ধারণ করিয়া থাকে, ভাষাকেও সেইরূপ ধারণ করিয়া থাকে। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের প্রসার ও পুষ্টি ধর্ম্মের ভিতর দিয়া হইয়াছে, অর্ব্বাচীন সাহিত্যের কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম যে হয় নাই তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে সে সকল সাহিত্য আমাদের মর্ম্মস্পর্শী হয় নাই—ঐগুলি হৃদয়ে ক্ষণস্থায়ী ভাবের হিল্লোল তুলিতে পারিলেও, স্থায়ী আনন্দ দিতে পারে না। সুকুমারমতি যুবকযুবতীদিগের নিকট মানবীয় প্রেমের কবিতা ভাল লাগিতে পারে, উত্তর-কালে তাহারাই আবার প্রেমময় রাধাকৃষ্ণের প্রেম ব্যতীত অন্যরূপ প্রেমের কবিতা পাঠ করিতে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাই বলি সনাতন-ধর্ম্মরূপ মহীরুহকে বেষ্টন করিয়া যে সুকুমার কলালতা বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহাই কল্পান্তস্থায়ী হইয়া থাকে। আর যে কবির বীণার ঝঙ্কারে হৃদিরঞ্জনের মধুময় চিত্র নয়ন-সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তিনি আমাদের হৃদয়-আসন চিরকালের জন্য অধিকার করিয়া থাকেন।

আজকাল একটা ধূয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্মের সহিত সাহিত্যের কোন সংস্রব নাই। বাঙ্গালা-সাহিত্যে ছোট-গল্প-লেখকদিগের মধ্যে কএক জনের লেখা হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় এবং তাঁহারা আকার-ইঙ্গিতে কথাটা বুঝাইয়া দিতে চান—গল্পগুলিকে কলা-হিসাবে দেখিতে হইবে। Art is for art—কলা কলার জন্য। তাহাতে আবার ধর্ম্মের সংস্রব কি? গল্পগুলির উদ্দেশ্য জানিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ থাকিলেই হইল। এই সকল লেখকের নিকট স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনার বিষয়ীভূত নয়। ইঁহারা লোকলোচনের সম্মুখে কিম্ভূত-কিমাকার চিত্র দেখাইতে পারিলেই আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন, কিন্তু ইঁহা-দিগকে কি করিয়া বুঝাইব যে, সকল চিত্রই সকল লোকের গোচরীভূত করা যায় না।

এখন এই Art বা ইহার প্রতিশব্দ কলা সম্বন্ধে ঋষিপ্রতিম টলষ্টয় তাঁহার "What is Art" পুস্তকে আলোচনা করিয়া যাহা বলিয়া-ছেন তাহা এই—Art বা কলা মানবের কার্য্যকরী শক্তির (human activity) ফলস্বরূপ। উদ্দেশ্য ব্যতীত ইহার অন্য সার্থকতা নাই। মানবের উন্নতি বা অবনতির যতটুকু ইহা সহায়ক হইবে, ততটুকু ইহাকে ভাল বা মন্দ বলিব। কলাবিৎ আপনার ভাবপ্রেরণা অন্যে যদি সঞ্চারিত করিতে পারেন, তবেই

তিনি কৃতার্থম্মন্য হন। অঙ্গ-সঞ্চালন, রেখা, বর্ণ, শব্দ ও বাক্যসমন্বয়ে কলাবিৎ অন্যের হৃদয়ে ভাবের লহর তুলিতে পারেন। এইরূপে কলাবিৎ সমভাবের প্রেরণায় বিশ্বসংসারকে আপনার করিয়া থাকেন। "Art is a means of union among men, joining them in the same feelings." তা হইলে কেবলমাত্র 'সঞ্চরণ' বা 'সংক্রমণ'-শক্তিই কি কলার লক্ষণ? অস্বাভাবিক উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াও পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে ইহা এরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, পল্লীবাসীর নিকট, প্রতিবাসীর নিকট, এমন কি আত্মীয়ের নিকট হইতে সহানুভূতি বলিয়া জিনিসটা আর পাই না। অবশ্য আমি সহরের কথাই বলিতেছি। এরূপ স্থলে টলষ্টয় বলিয়াছেন,—"The business of art lies just in this—to make that understood and felt which, in the form of an argument, might be comprehensible and inaccessible." p. 102 —এটি খাঁটি সত্য। তর্ক করিয়া যখন মানবকে বুঝাইতে পারা যায় না, তখন তুলিকার একটি রেখায়, একটি অঙ্কনে, একটি বর্ণসম্পাতে, কবিতার একটি ছত্রে, তক্ষণশিল্পীর একটু খোদাইকার্য্যে, ভাবের লহর ছুটাইতে পারা যায়; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে কলাবিৎই তিনি—যিনি মানবহৃদয়ে সমভাবের লহর তুলিতে পারেন—যিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিশ্বমানবপ্রাণে সমানভাবে কার্য্য করিতে পারেন। যদিও কলা-সমালোচকগণ (Art-critics) প্রায় একবাক্যেই বলিয়া থাকেন—কলাবিদ্যার সার্ব্বজনীনতা (universality) একরূপ অসম্ভব, তথাপি আমরা টলষ্টয়ের সহিত একবাক্যে বলিব, কলার সার্ব্বজনীনতা অসম্ভব হয় হউক—[illegible] দেখিব কলা সার্ব্বজনীন আদর্শের [illegible] নিকটবর্ত্তী হইতেছে ততই তাহা [illegible] বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। [illegible] হইলে দেখা যাইতেছে—কলা [illegible] মানবকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার প্রয়াস" (Art unites men)। আর বিশ্বমা[illegible] ভাবের লহর দ্বারা গথিত করিতে হইলে [illegible] সকল ভাবরাশি মানবকে পশু হইতে [illegible] করিয়াছে, মানবকে দেবত্বে উন্নীত [illegible], মানবের কল্যাণকল্পে সহায় করিয়া [illegible] ছে, সেই সকল ভাবের দ্বারাই এ কার্য্য [illegible] না হইতে পারে। এই ভাব [illegible] নৈতিক সংস্কার (Religious [illegible]) আখ্যা দিয়াছেন।

[illegible] দর্শনে, শ্রবণে, ধ্যান-ধারণায় হৃদয়ে [illegible] ভাবের উন্মেষ করিয়া দেয়, যাহা [illegible] ক্ষুদ্রত্ব ভুলাইয়া দিয়া মহত্ত্বের দিকে [illegible], যাহা চরিত্রকে উন্নত করিয়া দেয়, [illegible] দেবভাবের স্ফুরণ করিয়া দেয় তাহাই [illegible] কলা, তাহাই শ্রেষ্ঠকলা; যাহা [illegible] বন্ধনে জগৎকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে চায়—যাহা বুঝাইতে চায় দেশকালের [illegible] গণ্ডী ছাড়াইলে, সংস্কারের গণ্ডী ছাড়াইলে মানব এক বিশ্বপিতা প্রেমময়ের সন্তান। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় পবিত্র ধর্ম্মভাব [illegible] বুঝিব। বিবেকের বাণী শুনিলেই এ প্রশ্নের সহজ সমাধান হইবে। টলষ্টয় বলিয়াছেন নৈতিক সংস্কার (Religious perception) ইহা ঠিক করিয়া দিবে। তাহার মতে

"The religious perception is the consciousness that our well-being,

both material and spiritual, individual and collective, temporal and eternal, lies in the growth of brotherhood among men—in their loving harmony with one another." (p. 159).

তাঁহার নৈতিক সংস্কার (Religious perception) বিশ্বমানবের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের উন্মেষে, মানবের ভিতর প্রীতির অচ্ছেদ্য বন্ধনে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পরিশেষে তিনি প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কলা (Art) বুদ্ধি হইতে ভাবের দ্বার দিয়া বিশ্বমানবকে একতার সূত্রে গ্রথিত করে, প্রচলিত পদ্ধতি ও অত্যাচার-সমূহকে বিনাশ করিয়া জগতে ভগবানের রাজত্ব—প্রেমের রাজত্ব স্থাপন করে। "The destiny of art in our times is to transmit from the realm of reason to the realm of feeling the truth that well-being for men consists in being united together and to set up in place of the existing reign of force, that kingdom of God, *i. e.*, of love, which we all recognise to be the highest aim of human life."—তাহা হইলে Art বা কলায় যে কোন উদ্দেশ্য নাই, এ কথা বলিলে চলিবে কেন। Art is for art এ কথার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না—টলষ্টয়ের সাহায্যে বুঝিতে পারি নাই। বরং যাহা বুঝিয়াছি তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

আবার তাহা বলি—**উদ্দেশ্য ব্যতীত ইহার অন্য সার্থকতা কিছু নাই** (*Art does not exist for its own sake*)। **মানবের উন্নতি বা অবনতির যতটুকু উহা সহায়ক হইবে ততটুকু ইহাকে ভাল বা মন্দ বলিব।**

অধুনা বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলির কোন কোনটিতে Artএর দোহাই দিয়া যে কদাচারের সৃষ্টি হইতেছে, যে সব উৎকট ভাবের লহর ছুটিতেছে, বিলাতী প্রেমের পূতিগন্ধময় উদ্ভট চিত্র প্রকাশিত হইতেছে, ন্যাক্কারজনক অনুবাদ বাহির হইতেছে তাহা আমাদিগের জননী, ভগিনী, গৃহিণী ও কন্যাদিগের হস্তে কোনমতেই দিতে পারা যায় না। কর্ত্তব্যানুরোধে গল্পলেখক-দিগের মধ্যে অধুনা যিনি শিরোমণি, ব্যারিষ্টার-প্রবর শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবুর নিকট আমি একটু অনুযোগ করিব। তিনিই আজকাল গল্প-লেখকদিগের আদর্শস্থল। তাঁহার লেখনী হইতে সমাজের বিকৃত বা উৎকট চিত্র কখন দেখি নাই। তাই পূজার সংখ্যা মানসী পত্রিকায় যখন তাঁহার 'লেডি ডাক্তার' গল্প পড়িলাম, তখন স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। প্রভাতবাবুর নাম দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। ফাঁদ পাতিয়া যুবক ডেপুটী সত্যেন্দ্র-মৃগ ধরিবার চিত্র—তাঁহার নিকট হইতে আমরা চাহি না—চাহি না তাঁহার নিকট হইতে লেডী ডাক্তার ও তাহার পরিচারিকা কামিনীর কথোপকথন। আপনারা একটু শুনুন,—

"শেষে সুবালা বলিল—"দেখ্ কামিনী—পোর্টের সে বোতলটায় কিছু আছে ?"

"আছে। এখনও আধবোতল আছে।"

"খানা সাজিয়ে, সে বোতলটা টেবিলের উপর রেখে দিস্। ওকে বলেছি, তোমার লিভার খারাপ হয়েছে। যা তা একটা কিছু

ওষুধ বলে মিশিয়ে, খানিকটা পোর্ট খাইয়ে দেব। আজ যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করে নিতে হবে।"

কামিনী বলিল,—"তা রেখে দেব। কিন্তু খুব সাবধান, বুঝলে? শেষকালে একেবারে হাতছাড়া না হয়ে যায়—সেই অখিল শীলের বেলায় যেমন হয়েছিল।"

"যা যা তোর আর উপদেশ দিতে হবে না"—বলিয়া সুবালা বাহিরে আসিল।"

এ চিত্র কি হিন্দু রমণীর হস্তে দিতে পারা যায়?

প্রভাতবাবুর অক্ষয় লেখনী-মুখে কখন এরূপ কদর্য্যচিত্র ফুটিয়া উঠে নাই, তাই এইটি দেখিয়া কএকটা অপ্রিয় সত্য বলিতে হইল। শাস্ত্রের শাসন "মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" মান্য করিয়া এ ক্ষেত্রে চলিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত।

এইবার আমরা ভাষা সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিব। পরমারাধ্যা চিরাদৃতা আমাদের শ্বেতশতদলবাসিনী বঙ্গভারতীর অঙ্গে নব্য-সাহিত্যিক-চিকিৎসকদিগের ছুরিকাঘাত দেখিয়া প্রত্যহই আমাদের চক্ষু দিয়া জলধারা বহির্গত হইতেছে। জানি না কবে কোথায় এ শবব্যবচ্ছেদের ছেদ পড়িবে। মা আমার শবের মত পড়িয়া আছেন—এই সকল চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারে মা আমার ক্ষত-বিক্ষতা। অক্ষয়—বিদ্যাসাগর—ভূদেব—বঙ্কিম—কালীপ্রসন্নপ্রমুখ সাহিত্যমহারথদিগের সাধনার ধন—বড় আদরের ধন—তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী জননীর এ দুর্দ্দশা দেখিয়া বোধ হয় তাঁহারা স্বর্গ হইতেও অশ্রুপাত করিতেছেন। হায়! হায়! জানি না কবে কোন্ রাসায়নিকপ্রবরের সিদ্ধমলমে মার আমার ক্ষত অঙ্গ জোড়া লাগিয়া আবার পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া আসিবে! এখনও ভারত-গগনের চিরউজ্জ্বলরবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-গগন আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন—এখনও আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজ্যোতিষ্ক অক্ষয়-চন্দ্রের দিকে চাহিয়া আছি—সাহিত্য-ধুরন্ধর পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদের দিকে চাহিয়া আছি—তাঁহারা কি ইহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবেন না? আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা মনে করিলে এই অত্যাচারের শেষ যবনিকা পড়িবার বিলম্ব হইবে না। যাহা হউক সুখের বিষয় সম্পাদক সুপণ্ডিত ব্যারিষ্টরপ্রবর প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বীরবিক্রমে প্রবল যুক্তিদ্বারা বঙ্গ জননীকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া বীরবল নামে এই সকল নব্য-সাহিত্যিককে আহবে আহ্বান করিয়াছেন। জানি না তিনি, শ্রদ্ধেয় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার ন্যায় অন্যান্য সাহিত্যরথীগণ এই কার্য্যে কতদূর সফলকাম হইবেন। নব্য লেখকেরা বলিয়া থাকেন বাঙ্গালা ভাষার যখন ব্যাকরণ নাই, আইনকানুন নাই তখন কাহার কথা শুনিয়া আমরা চলিব—এ শেষ কথা।

বঙ্গভাষার উৎপত্তি আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় সংস্কৃত ভাষাই ইহার জননী। জননীর নিকট হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহা জননীর স্নীদনের আইনানুসারে চলিয়া থাকে—এ ক্ষেত্রে তাহা না হইবার কারণ কি? যখন আমরা সংস্কৃতের অনুসরণ করিব, তখন তাহার নিয়ম না মানিয়া চলিব কেন? সংস্কৃতশব্দের সহিত দেশজশব্দ মিলাইয়া 'গুরুচণ্ডালী' দোষের সৃষ্টি করিব কেন? নব্যলেখকদিগের লেখনী পাঠ করিয়া মনে হয় তাঁহারা যেন ইচ্ছা করিয়া নূতনত্বে আমাদিগকে সংস্কৃত করিয়া দিবার

প্রলোভনে একটা নূতনের সৃষ্টি করিতে চান। অবশ্য প্রতিভা বা মনীষা ভাষার শব্দ-সম্পৎবৃদ্ধি-মানসে নূতনের সৃষ্টি করিবেই করিবে—ভাষাকে বলশালী করিবেই করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া শোথের ন্যায় মাংসবৃদ্ধি বলের পরিচায়ক নহে। দুই চারিটা উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্যটা একটু বিশদ করিতে চাই :—

"বসন্ত কুসুমফুলের গাঢ় রঙে তরুণীদের শাড়ী ওড়না রঙাইয়া দিত, সন্ধ্যামণির হৃদয় পিষিয়া চরণ রঙাইত, মেনার পাতার রস গালিয়া হাত রঙাইত। আর মধুর হাসি, প্রিয়বচন, চটুল চাহনিদিয়া হৃদয় রঙাইতে চেষ্টা করিত—রূপসীদের হৃদয় তাহাতে রঙিত কি না কে জানে। কিন্তু তরুণীদের আফিম ফুলের মতো রাঙা মাদক ঠোঁট দুখানি, ডালিমফুলের মতো গাল দুটি, শিউলি রঙা বসন আর মেহেদি রাঙা চরণ নিজেদের সকল লালিমা জড়ো করিয়া বসন্তর তরুণ-কোমল হৃদয়খানি শোণিত রঙে রঙাইয়া তুলিতেছিল।"

এই স্থলে ছয়বার 'রঞ্জ্'ধাতুর বিকৃতি ত দেখিলেন। ইহা ইচ্ছাকৃত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আর 'লালিমা' শব্দের ন্যায় 'হরিতিমা,' 'ম্লানিমা,' 'শ্যামিমা' প্রভৃতি অজ্ঞাত-পূর্ব্ব উদ্ভট শব্দ অবাধে সাহিত্যে চলিতে সুরু করিতেছে। আর এই কয়ছত্রে দুইবার 'মতো' ও একবার 'জড়ো' শব্দ ওকার-সংযোগে লিখিত হইয়াছে। অবশ্য উচ্চারণগত বানান্ (Phonetic spelling) যখন উদার যুক্তরাজ্যেও চলিতেছে না, তখন যে এই সংরক্ষণশীল বাঙ্গালাদেশে চলিবে সে ধারণা আমাদের নাই। আর যখন জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে উচ্চারণবৈষম্য দৃষ্ট হয়, তখন একস্থলের উচ্চারণ লিখিত ভাষায় চালাইলে চলিবে কেন? সাহিত্যে এ ভেদনীতি সমর্থন করা যায় না। যদি বলেন অভিমতার্থক 'মত' ও তুল্যার্থক 'মত'-শব্দের প্রভেদ করিবার জন্য শেষের শব্দে 'ও'কার সংযোগ করা হয়, তাহা হইলে, কাল, ভাল, বল, মন ইত্যাদি কথায় 'ও' সংযোগ করিয়া লেখা হয় না কেন?

অবশ্য এই সকল ইচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি তাহা আপনাদের ন্যায় সাহিত্য-স্বার্থের বিবেচ্য। আবার দেখুন :—

"একদিন যখন সন্ধ্যাবেলায় গাছে গাছে ফুলের দেয়ালি সাজিতেছিল, যখন দক্ষিণা বাতাস বিরহ মূর্চ্ছিতের নিশ্বাসের মতো থাকিয়া থাকিয়া ফুলের বনে শিহরণ হানিতেছিল, যখন ফুলের গন্ধে মাতাল হইয়া কোকিল, পাপিয়া প্রলাপ বকিতেছিল, যখন হাজার দীপের শিখার মাঝে ফোয়ারার জল তরল হীরার মালার মতো গড়িয়া পড়িতেছিল ইত্যাদি—"

এখানে আপনারা "বনে শিহরণ হানিতেছিল" এ কথার রসগ্রহণ করিতে পারিলেন কি? 'তরল হীরার মালা' যে কিরূপ পদার্থ তাহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না।

আবার শুনুন :—

"ঘৃণাভরে ফুলগুলি সব পদাঘাতে ছড়াইয়া দিয়া উদ্যত অশনির মতো বলিল কী!—"

ইংরেজিতে যাহাকে transferred epithet বলে 'উদ্যত অশনি' তাহারই দৃষ্টান্ত। আপনারা যদি এরূপ প্রয়োগ শিষ্ট বলিয়া মনে করেন, তবে চালাইতে পারেন; কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনারা "সকল লোকের বিস্মিত অবিশ্বাস অগ্রাহ্য করিয়া"

চালাইতে কিছুতেই রাজি হইবেন না। উচ্চারণভেদে যদি 'কি' দীর্ঘত্বলাভ করে, তবে অন্যশব্দে এরূপ প্রয়োগ হয় না কেন?

আপনারা কি "অবিনয় ক্ষমা" কখন শুনিয়াছেন? যদি না শুনিয়া থাকেন তবে শুনুন,—

"* * কুরূপ দেখিয়া অবহেলা করিয়াছি, ইহার লজ্জা আজ তাহার দয়ায় দারুণ হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে এইরূপ লোলুপের **অবিনয়ক্ষমা** করিতে **বলিয়ো**।"

প্রাণের যে কতটা যাতনায় নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এই মক্ষিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে তাহা অন্তর্যামীই জানেন; আর মাতৃভাষা-সেবীদের ভাষার দিকে অবহিত হইবার জন্য যে এই পন্থা অবলম্বন করি নাই তাহাও বলিতে পারি না।

ভাষা জননীর শরীর। এবার জননীর প্রাণের কথা—ভাবের কথা একটু বলিব। যাহা সমাজের, যাহা দশের, যাহা দেশের নীতি ও স্বাস্থ্যের সহায়ক ও পরিপোষক এইরূপ ভাবের চিত্র সকলের সমক্ষে আদর্শরূপে ধারণ করাই আমাদের কর্তব্য। বিশ্বমানবের ভাণ্ডার হইতে—প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সদ্ভাবসমূহ সমাহরণ করিয়া দেশের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে—ভাবের লহর ছুটাইতে হইবে—সমপ্রাণতার বন্যা বহাইতে হইবে—ভগীরথের ন্যায় ভ্রাতৃত্বের মন্দাকিনী ছুটাইতে হইবে। দেখিতে হইবে এমন ভাবের চিত্র, কাব্য বা কলায় ফুটাইয়া তুলিব না—যাহা মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কন্যা ও দয়িতার নিকট প্রকাশ করিতে পারা যায় না। আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, বিদেশের ভাবের চারাগুলিকে আমাদের স্থানকালপাত্র-উপযোগী করিয়া, সমাজ ও ধর্ম্মের আলোক ও বাতাসের সাহায্যে বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

এইবার কাব্য সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। আধুনিক কবিদের কতকগুলি কবিতা আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। বঙ্গের রবীন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে Mystic কবিতার চারা আনিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙ্গালা দেশে যেদিন প্রথম রোপণ করিলেন—যেদিন তিনি "সোণার তরী" প্রথম ভাসাইলেন, জানি না সেদিন বাঙ্গালার সুদিন কি দুর্দ্দিন। তারপর যখন,

"দিনের শেষে ঘুমের দেশে
　　　　ঘোম্‌টা পরা ঐ ছায়া
ভুলালো রে ভুলাল মোর প্রাণ।
ও পারেতে সোণার কূলে আঁধারমূলে
　　　　কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ ভাঙানো গান।"

গাহিলেন - 'খেয়া'য় পাড়ি দিলেন—সেই-দিন হইতে তাঁহারই চরণে শরণ লইয়া বঙ্গের আধুনিক কবিকুল ছুটিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতা চেষ্টা করিয়া কল্পনার বিমানে চড়িয়া কতকটা বুঝিতে পারিলেও, ইঁহাদের কবিতা কল্পনার 'এরিওপ্লেনে' চড়িয়াও বুঝিবার সামর্থ্যে কুলায় না। উর্ব্বর বাঙ্গালা-দেশের মাটির ও আবহাওয়ার গুণে অল্পদিনের মধ্যে সহস্র সহস্র অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ্য কবিতার সৃষ্টি হইল। এই শ্রেণীর কবিতায় ভাষার শিঞ্জিনী আছে, নূপুরের গুঞ্জন আছে, কিন্তু প্রাণ মাতিতে চায় না—কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে চায় না। ভাবের অভাবে, প্রাণের অভাবে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় শব্দ করিতে পারে, সত্য। এই সকল Mystic কবিতা দেহী আত্মার সহিত—

চিরসুন্দর পরমাত্মার সংযোগমূলক বলিয়া কোন কোন সমালোচকের মুখে শুনিয়া থাকি; কিন্তু আমরা এ গুলিতে যোগের কিছুই দেখিতে পাই না, দেখি বিয়োগ—ভাবের অভাব।

ইতঃপূর্ব্বে বহুবার সাহিত্য-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি, এখন সাহিত্য-শব্দে কি বুঝা যায় তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব।

সাহিত্য-শব্দটি সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য-শব্দটি যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইতে বেশী কিছু বুঝিবার উপায় নাই। সংস্কৃতে প্রধানতঃ তিনটি অর্থে সাহিত্য-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) যাহা কোন কিছুর সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তাহাই সাহিত্য। (২) মেলন। (৩) মনুষ্য-কৃত শ্লোকময় গ্রন্থবিশেষ। এই শেষোক্ত হিসাবে ভট্টি, মাঘ, ভারবি প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃতে সাহিত্য-নামে পরিচিত—কিন্তু বেদ, স্মৃতি, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সাহিত্য-নামের অন্তর্গত নয়। ইংরেজিতে "literature" বলিলে যেমন অনেক জিনিষ বুঝায়, বাঙ্গালায় সাহিত্য-শব্দেও আমরা জাতিবিশেষ-প্রসূত সমষ্টি-উদ্দিষ্ট লিপিবদ্ধ চিন্তারাশি বুঝিয়া থাকি। সমস্ত লিখিত গ্রন্থাদিকে আমরা সাহিত্য বলিয়া থাকি। গ্রন্থবিশেষে গ্রন্থকারের চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও আশার বিকাশ হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশের গ্রন্থ-সমষ্টিতে দেশের চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও আশার উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই গ্রন্থসমষ্টিই সাহিত্য; কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য ধরিয়া দেশীয় অথবা জাতীয় গ্রন্থসমষ্টি আলোচনা করিলে অনেক গ্রন্থই এই পর্য্যায় হইতে খসিয়া পড়িবে। সাহিত্যের একটা সীমা বা গণ্ডি আছে। সেই সীমা বা গণ্ডির অন্তর্ভূত প্রদেশই সাহিত্যের রাজ্য। এই সাহিত্য-সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই দেখিতে হইবে, জাতীয় চিন্তা ও কল্পনা, আশা ও উদ্যমের স্থান কতটুকু গ্রন্থ-রাজ্যের যতটুকুতে জাতীয় চিন্তা ও কল্পনা, আশা ও উদ্যম বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে, ঠিক ততটুকুই সাহিত্য-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে, সকল গ্রন্থই ত সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। গদ্যও সাহিত্য, পদ্যও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানও সাহিত্য—তবে কথা এই যে এই সকলের মধ্যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য বর্ত্তমান থাকা চাই; নহিলে গদ্যই বলুন, পদ্যই বলুন, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানই বলুন, কিছুই সাহিত্য নামে অভিহিত হইতে পারে না।

আর্ত্তের দীর্ঘশ্বাসে, প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসে, বীরের উদ্দীপনায়, ভক্তের ভক্তিসাধনায় কখন্ কোন্ মুহূর্ত্তে ভাষার উদ্ভব হইয়াছে কে বলিবে? কে বলিবে কেমন করিয়া দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষার উৎপত্তি? এইমাত্র জানি একের মনের ভাব অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্যই ভাষা। আমাদের এই উদ্দেশ্য যত সহজে যত অল্লায়াসে সংসাধন করিতে পারা যায় ততই আমাদের ভাষা সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যে জাতির কবি, গায়ক, লেখক, ভাবুকের কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তাস্রোত যত বহিয়াছে, সে জাতির ভাষার কলেবরও তত পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ভাষার প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিরাম যদি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে ভাষার উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি বুঝিতে হইবে। আমরা

বাঙ্গালী, বাঙ্গালা আমাদের ভাষা। যে ভাষায় আমরা প্রথম 'মা' বলিতে শিখিয়াছি, যে ভাষায় আমরা আমাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছি, যে ভাষায় আমাদের প্রাণের ভাবসমূহের দ্যোতনার প্রকৃষ্ট অভিব্যঞ্জনা, যে ভাষার পদলালিত্য অন্যান্য ভাষার আদর্শস্থানীয় হইতে পারে, সেই বাঙ্গালাভাষার প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিরাম বুঝিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাদৌ বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও কলেবরপুষ্টি বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তি-সম্বন্ধে আজ আমি এ ক্ষেত্রে কোন মতের উত্থাপন করিব না। বঙ্গভাষার উৎপত্তি লইয়া অনেকে অনেক উৎকট ও উদ্ভট মতের অবতারণা করিয়াছেন ও করিতেছেন। বঙ্গভাষার ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ আলোচনার সময় এখনও আসে নাই। যতদিন না আমরা বাঙ্গালাভাষায় প্রচলিত শব্দাবলী সংগ্রহ করিয়া তাহাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব, ততদিন বঙ্গভাষার উৎপত্তি নিরূপণ করিবার চেষ্টা করা বৃথা। বাঙ্গালাভাষার প্রণালী-বিশুদ্ধ যে শব্দ-সংগ্রহ বা অভিধান সঙ্কলন করিতে হইবে তাহাতে অধুনা প্রচলিত বা ইতঃপূর্ব্বে প্রচলিত সকল শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি এবং ইতিহাসের বিশিষ্ট বিবরণ থাকা চাই। তাহা হইলে আমরা ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিব। কিন্তু এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যের সম্যক্ আলোচনা করিতে হইবে। প্রাচীন সাহিত্যের কোন্ বীজ কত দিনে ক্রম-বিকশিত হইয়া নবীন সাহিত্যের শাখাকাণ্ডে পরিণত হইল, ঐতিহাসিকের চক্ষে ইতিহাসের আলোকে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। সমালোচক ঐতিহাসিকের চক্ষে প্রাচীন কাব্যাদি না পড়িয়া স্তাবক বা উপাসকের চক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ পড়িলে চলিবে না। প্রাচীন সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ছন্দোবন্ধ শব্দবিন্যাস, রচনা-পদ্ধতির সম্যক্ আলোচনা করা চাই। ব্যাকরণ ভাষার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ করে, মজ্জা, মেদ, মাংস, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতির পরীক্ষা। এই পরীক্ষা সুসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত যে কোন ভাষার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন, দেখিবেন, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। প্রাচীন কাব্য গীত রচনা চিন্তার পরিজ্ঞান না থাকিলে সে ভাষার ব্যাকরণ সঙ্কলন অসম্ভব। যাহাকে ভাষাবিজ্ঞান বলে, সেই বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত; সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যালোচনা যে অবশ্যকর্ত্তব্য তাহা আমাদিগকে বেশী করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

ক্ষণকাল মধ্যে সংক্ষেপে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব।

বৌদ্ধযুগে পালবংশীয় রাজাদিগের সময় হইতেই বোধ হয় বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রথম প্রচার আরম্ভ হয়। ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারই ঐ সকল সাহিত্যের লক্ষ্যস্থল। গানের পালা সাজাইয়া সেই গান গাহিয়া সাধারণের মধ্যে সেই ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করা হইত। যোগীপাল, মহীপাল, গোপীপাল, মাণিকচাঁদ, রমাইপণ্ডিত, ঘনরাম, ময়ূরভট্ট, রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম, প্রভুরাম, সীতারাম, রামদাস আদক প্রভৃতি

অনেকেই ধর্ম্মের গানের পালাকর্ত্তা ছিলেন। তদ্ব্যতীত ডাকের কথা, খনার বচন সাহিত্য-আকারে লোকশিক্ষার বেশ দুইটি সোপান ছিল। ডাকের কথা ও খনার বচন ধর্ম্ম-ঠাকুরের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক গানের পালা নহে। উহা প্রচলিত ও সাধারণের সহজ বোধগম্য ভাষায় পদ্যে রচিত ছোট ছোট ছড়া; তাহাতে রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, স্বাস্থ্য-নীতি, ধর্ম্মনীতি, কৃষিনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্য ও শিক্ষিতব্য বিষয় ছোট ছোট কথায় শিক্ষা দেওয়া হইত।

অনেক সময় অমঙ্গল-নিদান হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ধর্ম্মবিশ্বাসের মতভেদ হইতে ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতাজনক সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি এবং সেই সাম্প্রদায়িক মত প্রচার-করণোদ্দেশে সাহিত্যের আদিভূত পদাবলী, পৌরাণিক উপাখ্যান, পাঁচালী ও কথকতা ইত্যাদির উদ্ভব হইয়া থাকে। প্রবল বৌদ্ধমতের খরস্রোতকে মন্দীভূত করিবার নিমিত্ত সেন-বংশীয় রাজাদের শাসনকালে প্রচারিত ধর্ম্মঠাকুরের আবরণে আবৃত করিয়া নূতন শৈবমত প্রচারের চেষ্টা হইল এবং সেই উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্দ্র শিবায়ন রচনা করিলেন। পরে তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রাম রায় ও শ্যাম রায় 'মৃগব্যাধসংবাদ,' রতিদেব 'মৃগলুব্ধক,' রঘুরাম রায় 'শিবচতুর্দ্দশী,' ভগীরথ 'শিবগুণ-মাহাত্ম্য,' হরিহর-সুত 'বৈদ্যনাথ মঙ্গল' রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থও ক্রমশঃ ধর্ম্মের গানের মত গীত ও শ্রুত হইয়া শৈবমতটা এক প্রকার বেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

ধর্ম্মবিবাদ সকল দেশে সকল সময়েই আছে। য়ুরোপে এই ধর্ম্মবিবাদ উপলক্ষে কত রক্তপাত হইয়াছে। সুখের বিষয় ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে যুদ্ধক্ষেত্রে শোণিতপ্রবাহ না বহিয়া সাহিত্যের প্রবাহ ছুটিয়াছে।

শৈবমত প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শাক্তসম্প্রদায় মাথা নাড়া দিয়া এক নূতন স্রোত প্রবাহিত করিলেন। বসন্তরোগ ও তাহার চিকিৎসা উপলক্ষ করিয়া শীতলা-দেবীকে বসন্তের অধিষ্ঠাত্রীরূপে খাড়া করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য-বর্ণনা ও পূজা-অর্চ্চনার জন্য শীতলা-মঙ্গল বা শীতলা-গানের সৃষ্টি হইল। ক্রমে শাক্ত-সম্প্রদায় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার পালার আকারে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আবিষ্কার ও প্রচার করিতে লাগিলেন। কবিবল্লভ দৈবকীনন্দন প্রভৃতি 'শীতলা-মঙ্গল' বা 'শীতলা-মাহাত্ম্য' প্রচার করিলেন। কিছু-দিন পরেই হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি ৬০ জন পালাকর্ত্তা মনসাদেবীকে সর্পভয়নিবারিণীরূপে খাড়া করিয়া মনসা-মাহাত্ম্য বর্ণনাচ্ছলে 'বিষহরির গান' বা 'পদ্মাপুরাণ' নামে মনসা-মঙ্গল রচনা করেন। মনসামঙ্গলের মধ্যে নারায়ণদেব-রচিত চাঁদ সদাগর ও বেহুলা-নখিন্দরের কাহিনী বিশেষরূপে বিদিত। মনসা-মঙ্গলের পরই মঙ্গলচণ্ডীর গান বা চণ্ডীমঙ্গল নামে খ্যাত শুভচণ্ডীর গান বা শুভসূচনীর (সুবচনীর) কথা প্রচলিত হইল। দ্বিজ জনার্দ্দন, কবিকঙ্কণ, বলরাম, কবিরঞ্জন মুকুন্দরাম প্রভৃতি অনেকেই চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা; চণ্ডীমঙ্গলের পরই কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর-কথা। নায়ক-নায়িকার উপাখ্যান-ছলে আদ্যাশক্তি মহাকালীর মাহাত্ম্য-বর্ণনাই কালিকামঙ্গলের প্রধান বিষয়। গোবিন্দ দাস, কৃষ্ণরাম দাস, রাম-প্রসাদ সেন, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ, নিধিরাম কবিরত্ন প্রভৃতি

অনেকেই কালিকামঙ্গলের রচয়িতা। বহু-শক্তিরূপিণী আদ্যাশক্তি মহামায়ার ধাত্রীরূপকে ষষ্ঠীদেবীরূপে কল্পনাপূর্ব্বক কৃষ্ণরাম, কবিচন্দ্র ও গুণরাজ ষষ্ঠীমঙ্গল রচনা করিয়া ষষ্ঠীমাহাত্ম্য প্রচার ও ঘরে ঘরে ষষ্ঠীপূজার প্রচলন করেন। তাহার অব্যবহিত পরেই গুণরাজ খান্, শিবানন্দ কর, রণজিৎ দাস প্রভৃতি অনেকেই কমলামঙ্গল বা লক্ষ্মীচরিত্র রচনা করিয়া কমলা-মাহাত্ম্য প্রচার করেন। সঙ্গে সঙ্গে অমনই দয়ারাম দাস ও গণেশমোহন সারদা-মঙ্গল বা লক্ষ্মীমাহাত্ম্য-প্রচারে অগ্রসর হইলেন। কমলা-মঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে জগমোহন মিত্র ও সারদামঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে দয়ারাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

স্ব স্ব বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশের সুযোগ কোন সম্প্রদায়ই ছাড়িয়া দেন নাই। চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল যখন প্রচারিত হইল, তখন গঙ্গামঙ্গলই বা বাকী থাকে কেন। মাধবা-চার্য্য, দ্বিজ গৌরাঙ্গ, দ্বিজ কমলাকান্ত, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মঙ্গলকর্ত্তৃগণ গঙ্গামঙ্গল রচনা করিয়া গঙ্গামাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। গঙ্গামঙ্গলের মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-রচিত গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী সমধিক প্রসিদ্ধ। সাহিত্য-জগতে, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ন্যায় সৌর সম্প্রদায়ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন পক্ষে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন। দ্বিজ কালিদাস ও দ্বিজ রামজীবন বিদ্যাভূষণ সূর্য্যের পাঁচালী লিখিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মবিবাদের ন্যায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও সাহিত্যোৎকর্ষ সাধন পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছে। মুসলমান রাজত্ব-কালে মুসল-মানের মধ্যে সংঘর্ষ না ঘটিয়া যাহাতে একটা প্রীতির ভাব সংস্থাপিত হয় সে জন্য মুসলমান রাজপুরুষেরা হিন্দুসমাজের আচার-ব্যবহার ও হিন্দু শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম অবগত হইবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন। হিন্দুগণ তাঁহাদের সকল কার্য্যেই রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবতের দৃষ্টান্ত দিয়া চলিতেন; সুতরাং সর্ব্বাগ্রেই তাঁহাদের ঐ দিকেই লক্ষ্য পড়িল এবং উপযুক্ত লোক দিয়া ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করাইতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুবাদ-শাখার আরম্ভ হইল। কৃত্তিবাস, অদ্ভুতাচার্য্য, অনন্তদেব, দ্বিজ রামপ্রসাদ, রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতি রামায়ণ অনুবাদ করেন। বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কাশীরাম দাস, নন্দরাম দাস, ষষ্ঠীবর প্রভৃতি অনেক মহাত্মাই মহাভারতের অনুবাদ বা ভারত-বর্ণিত বিষয় অবলম্বনে বহুকাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতখানি মহাভারত মধ্যে সর্ব্ব-প্রাচীনত্বের গৌরব করিতে পারে। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময় বিজয় পণ্ডিতের 'বিজয়-পাণ্ডব-কথা' বা "ভারত পাঁচালি" প্রণীত হয়।

রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়া ভাগবতের অনুবর্ত্তী হইয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থরচনাদ্বারা অনেকে বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে গুণরাজ খান মালাধর বসু একজন। তাঁহার অনুবাদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' বা শ্রীগোবিন্দ-বিজয়। গুণরাজ খাঁর পর রঘুনাথ ভাগবতা-চার্য্য সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন। তাঁহার অনুবাদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'। কবিচন্দ্রের 'কৃষ্ণমঙ্গল' ভাগবত অনুবাদের সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত ভবানন্দ 'হরিবংশ'

এবং সঞ্জয় বিদ্যাবাগীশ 'ভগবদ্গীতা' অনুবাদ করেন।

কেবল গীত-রচনাদ্বারা সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন রামপ্রসাদ সেন, কমলকান্ত ভট্টাচার্য্য, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তদ্বংশীয় শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, কুমার শরচ্চন্দ্র ও মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ, দাশরথি রায়, রামদুলাল সরকার, কালী মীরজা, সৈয়দ জাফর খাঁ প্রভৃতি সাহিত্যজগতে অনেক খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব, সকলেই সাহিত্য সেবা করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকেরা সাহিত্যের লালন-কার্য্য করিয়াছেন। বৈষ্ণব মহাপ্রভুরা সেই সাহিত্যের হাতে খড়ি দিলেন। বৈষ্ণব যুগে বাঙ্গালা-সাহিত্য লালনের অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাড়নার অবস্থায় পদার্পণ করে। বাস্তবিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থা বৈষ্ণবদিগেরই অনুগ্রহে। বৈষ্ণব কবিদিগের রসমাধুর্য্যময়ী লেখনী হইতে যে অমৃতময়ী মধুর কোমলকান্ত কবিতাধারা নিঃসৃত হইয়াছে, আজিও তাহা সহৃদয় ব্যক্তি-গণের তৃপ্তিসাধন করিতেছে। জয়দেব যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া, সাহিত্যকানন চিরবাসন্ত আমোদে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছেন।

এই যে সাহিত্যের কথা বলিয়া আসিলাম, ইহার সঙ্গে আমাদের অদ্যকার সঙ্কল্পিত মালদহ-সম্মিলনের কি সম্পর্ক তাহা একটু দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা কি শিখিতে চাই তাহা দেখা আবশ্যক। আমরা যে দেশের মানুষ সেই দেশটা কেমন ও কি ছিল তাহা জানা চাই; তাহার পর সেই দেশের মানুষগুলি কেমন, পূর্ব্বে কিরূপ ছিল এবং পরেই বা কেমন হইতে পারে তাহা জানা আবশ্যক। বোধ হয় এই দুইটা বিষয় ভাল করিয়া জানিতে পারিলে আর বড় বেশী কিছু জানিবার বাকী থাকে না। এই দুই বিষয় জানিতে গেলে আমাদিগকে সাহিত্যের আশ্রয় লইতেই হইবে, আর অন্য পন্থা কিছু নাই। দেশ বা দেশের লোক কেমন ছিল তাহা যদি জানিতে হয় তবে খুঁজিতে হইবে—তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে কোথায় কে কি লিখিয়া পড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই আমাদের প্রাচীন সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের গবেষণার কথা আসিয়া পড়ে। ত্রিকাল-দর্শন নামে একটা বিদ্যা এক সময়ে ভারতবাসীর অধিকৃত ছিল বলিয়া শোনা যায়—কিন্তু এখনকার যুগে ত্রিকালদর্শী কেহ আছেন কি না আমার জানা নাই, থাকিলে তাঁহাকে স্তবে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট ভূতভবিষ্যৎ সমস্ত জানিয়া লইতাম; তাহা যখন হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আমাদের **খুঁজিতেই** হইবে। আমরা মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনে সম্মিলিত হইয়া সেই খুঁজিবার পথ নির্ণয় করিয়া লইব। মালদহ জাতীয়-শিক্ষাসমিতির উদ্যোগে এই সম্মিলন আহূত হইয়াছে। আদৌ পথ পাওয়া যাইবে কি না তাহার আশ্বাস দিবার জন্য সেই শিক্ষা-সমিতি পূর্ব্ব হইতেই সেই পথ-নির্ণয়কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা অনুসন্ধানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মালদহের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতি-হাস সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়া-ছেন, তাহার কতকটা বিবরণ আপনারা অভ্য-র্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ অভিভাষণে শুনিয়াছেন এবং বিস্তৃত

বিবরণ এখন অন্যান্য কৃতী পুরুষের মুখে শুনিতে পাইবেন ; সুতরাং সে সকল বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এখন বেশী কিছু নাই, তবে আমি যে কথা বলিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি, তাহা এই,—

মালদহ একটি পুরাতন স্থান। মুসলমান-রাজত্বের প্রাক্কালে যে বহুবিস্তৃত বরেন্দ্র-রাজ্য ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার প্রভাবে বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থান মগধকে ধ্বংসমুখে পতিত হইতে হইয়াছিল, সেই বরেন্দ্ররাজ্যের অতি প্রবলতম অংশ এই মালদহ-প্রদেশ। তৎপরে মুসলমান-সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে পাঠানদিগের বাঙ্গালা-দেশের মধ্যে এবং মোগলাধিকারের বাঙ্গালা-দেশের মধ্যেও মালদহ-প্রদেশের প্রয়োজনীয়তা বড় কম ছিল না। আর যদি বৌদ্ধযুগ পূর্ব্ব-কালের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাদির খোঁজ করিতে হয়, তাহা হইলেও মালদহকে একেবারে ভুলিলে চলিবে না।

গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রের অতীত কাহিনীর কথা—যাহা আমি স্বদেশী ও বিদেশীর নিকট শুনিয়া আসিতেছি—সেই সকল তোতাপাখীর কণ্ঠস্থ বুলি আর আপনাদের নিকট বলিয়া আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিব না। আপনাদের নিকট সে সকল গৌরবময়ী স্মৃতির কথা আমরা শুনিতে আসিয়াছি। বিস্মৃতির অতল তল হইতে যে সকল রত্ন আপনারা আহরণ করিয়া রাখিয়া-ছেন, তাহাই দেখিতে আসিয়াছি। দেখিতে আসিয়াছি—গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ, গৌড়ের বারদুয়ারী মস্‌জিদ—যাহার গম্বুজ-গুলি শত বৎসর পূর্ব্বে ক্রেটন সাহেব সুবর্ণ-পত্র দ্বারা মণ্ডিত দেখিয়াছিলেন, গৌড়ের সিংহদ্বার "দখল দরওয়াজা" ও গড়বন্দীপ্রাসাদ, নবাব হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহের সমাধি-স্থান, ফিরোজা-মিনার, গৌড়স্তম্ভ, কদম রসুল মস্‌জিদ, তাঁতিপাড়া মস্‌জিদ, লুটন মস্‌জিদ, প্রাসাদের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদ্বার,—"লুকাচুরী" ও "কোতয়ালি দরওয়াজা"; এক কথায় দেখিতে আসিয়াছি—প্রাচীন পাঠান-কীর্ত্তি মুসলমান-গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী ও তাহার উত্তরাংশে অবস্থিত হিন্দুগৌড় বা প্রাচীন রাজধানী "রমাবতী"র ভগ্নাবশেষ। আর দেখিতে আসিয়াছি—বৈষ্ণবদিগের মহাতীর্থ রামকেলি, প্রেমের অবতার বাঙ্গালার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পদধূলিতে যে স্থান পবিত্রীকৃত হইয়াছে, সেইস্থান দেখিতে আসিয়াছি, যে স্থানে আমাদের 'প্রাণগোরা' বিশ্রাম করিয়া-ছিলেন, সেই কেলিকদম্বমূল দেখিতে আসি-য়াছি। দেখিতে আসিয়াছি—শ্রীরূপসনাতন-সেবিত সেই মদনমোহন ঠাকুর, 'রাধাকুণ্ড', 'শ্যামকুণ্ড', শ্রীরূপ গোস্বামি-খনিত "রূপ-সাগর"-দীর্ঘিকা; আর দেখিতে আসিয়াছি শ্রীপাট গয়েশপুর—যে স্থানে আম্রকাননে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীমদ্বীরভদ্র গোস্বামিপ্রভু কেশবছত্রীর পুত্র দুর্ল্লভ ছত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই কেশব ছত্রীর নিকট ইতঃপূর্ব্বে গৌড়ে মহাপ্রভু আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আর পাণ্ডুয়ায় দেখিতে আসিয়াছি—আসাবসাহী দরগা, সেলামী দরগা ও বাইশ হাজারী দরগা, নূর কুতুব আলামের দরগা, সোনা মস্‌জিদ, একলখী মস্‌জিদ, জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ আদিনা মস্‌জিদ।

ইতিহাস-চর্চ্চার জন্য মালদহ জেলা প্রসিদ্ধ। মালদহ রিয়াজ-উস্-সলাতিন-প্রণেতা ঐতি-হাসিক গোলাম হোসেনের জন্মস্থান ও কর্ম্মস্থান। শতবৎসর পূর্ব্বে এই স্থান হইতেই তিনি

বাঙ্গালীকে স্বাধীনভাবে ইতিহাস-প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। গোলাম হোসেন শিষ্য-পরম্পরায় ইতিহাস-আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য আবদুল করিম ও তৎশিষ্য মৌলবী ইলাহি বক্স ইতিহাসের চর্চ্চা, ইতিহাস-আলোচনার একটা ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। আমি মানস-নেত্রে দেখিতে পাইতেছি, মালদহ সহরে যেখানে দাতব্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে, সেই স্থান গোলাম হোসেনের জন্মস্থান বলিয়া, আর সহরের উত্তরাংশে "মীর চক" নামক স্থান—যেখানে তিনি চিরনিদ্রায় সমাহিত আছেন—সেই স্থান বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদিগের তীর্থক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হইবে। তাহার পর পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় বাঙ্গালার পুরাতন রাজধানী গৌড়-পাণ্ডুয়ার অতীত কাহিনী—বাঙ্গালার সুখ-দুঃখের কথা—বাঙ্গালীর অতীত গৌরব-বিবরণ সর্ব্বপ্রথম আমাদের নিকট বিবৃত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার আজীবন পরিশ্রমলব্ধ ঐতিহাসিক তথ্যগুলি মাসিক পত্রিকার অঙ্ক হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে দেখিলে আন্তরিক সুখী হইব। আমার বোধ হয় তিনিই প্রথিতযশাঃ ঐতিহাসিক-বরেণ্য শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইতিহাস-আলোচনায় প্রথম প্ররোচিত করেন। তাঁহার পর মৈত্রেয় মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুসন্ধিৎসার বর্ত্তিকা লইয়া অন্ধকারময় ঐতিহাসিক গুহার অন্তর্নিহিত রত্নরাজি উদ্ধার করিয়া, নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়া—আপনিও ধন্য হইয়াছেন, আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীরের সাধনায় পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ—পরিশেষে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি "বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি"র গঠন। তাঁহারই চেষ্টায় কুমার বাহাদুর শরৎকুমারের বদান্যতায় ও সভ্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাঙ্গালার ইতিহাসের কএক পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়াছে, নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া সত্যের মাহাত্ম্য প্রচারে সহায় হইয়াছে, "গৌড়-রাজ-মালা" ও "লেখমালা"র আবির্ভাব হইয়াছে। "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" জগতের নিকট সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, বিজ্ঞানানুমোদিত উপায়ে ইতিহাসের আলোচনা করিতে বাঙ্গালী জানে, উপকথা ও প্রবাদের ভিতর দিয়া ইতিহাসের সারমর্ম্মটুকু গ্রহণ করিতে পারে।

মালদহের কথা ভাবিতে গেলেই মনে পড়িয়া যায়, জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম। তিনি "গৌড়ের ইতিহাস" দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহার পর আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু কর্ম্মযোগী ইতিহাসের একনিষ্ঠ সাধক হরিদাস পালিত মহাশয় 'আদ্যের গম্ভীরা' লিখিয়া বাঙ্গালায় ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের একাংশ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। ভবিষ্যতে যাঁহারা সমাজ ও ধর্ম্মের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিবেন, তাঁহারা পালিত মহাশয়ের প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করিয়া সুফল লাভ করিবেন, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

মালদহ জেলার মধ্যে সাহিত্যালোচনা করিয়া যাঁহারা যশের মন্দিরে প্রবেশলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িয়া যায়। ইঁহারা আমাদের সাহিত্যের সেবা করিয়া আমাদের ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন।

বঙ্গ সাহিত্যে গৌড়-পাণ্ডুয়া-পথ প্রদর্শক

৺ ঐতিহাসিক রাধেশচন্দ্র শেঠ

India Press, Calcutta.
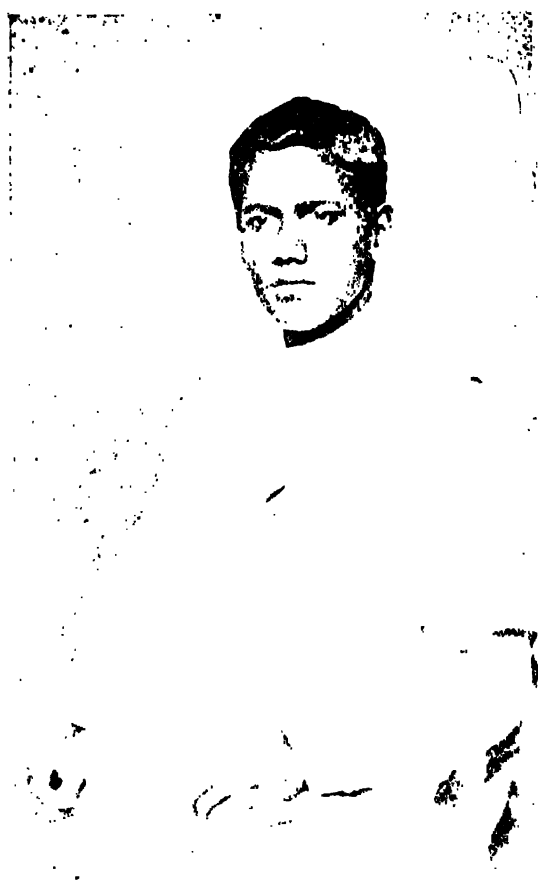
পরিশেষে একজন নীরব সাধক—একজন কর্ম্মযোগীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনায় সিদ্ধিলাভের কথা বলিব। মূর্ত্তিমান্ বিনয়—বিনয়কুমারের কথা আপনারা সকলেই জানেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসে সুপণ্ডিত। তিনি মাতৃভাষার সাধনা করিয়া আজ বাঙ্গালীর নিকট বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহার পুস্তকাবলী সাহিত্য-সমাজে আদৃত হইয়াছে; কিন্তু সে সকল কথা আজ আমি এখানে তুলিব না, তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি—"মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ"। ১৩১২ সালে যখন প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর অসম্পূর্ণতা অনেকেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া কলিকাতায় "Bengal National Council of Education" সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন জেলায় জেলায় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই অকালে অস্তিত্ব-লোপ হইয়াছে, কিন্তু সুখের বিষয় বিনয়কুমার সরকার, বিপিনবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র সরকার-প্রমুখ কর্ম্মিগণের চেষ্টায় ও সাধনায় মালদহ-শিক্ষা-পরিষৎ আজিও সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—কত দুঃস্থ বালককে শিক্ষাদান করিয়া সমাজে প্রকৃত মানবের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই; ব্যাবহারিক জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য এই জেলার কএকজন ছাত্রকে য়ুরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইয়া শিক্ষিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। এই পরিষৎ মালদহবাসীর চিন্তাস্রোতকে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করাইয়া যে কল্যাণের সূচনা করিয়াছে তাহা আশা-প্রদ। আশা করি, কালে "মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ" মহীরুহে পরিণত হইয়া ফল-পুষ্পভারে নত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-কানন আমোদিত করিয়া রাখিবে।

আর, আজ যে স্থানে এই সভা আহূত হইয়াছে, সেই কলিগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ সাহিত্যানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সরকার মহাশয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি একাধারে কমলা ও বীণাপাণির বরপুত্র; এই কলিগ্রামের উন্নতিকল্পে তাঁহার মহতী চেষ্টায় তাঁহার প্রাণপণ পরিশ্রম যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই বিদ্যালয়রূপে আমাদের নয়নসম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এইরূপে সর্ব্বকালে সকলদিক্ হইতেই যখন মালদহ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রকারে বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থান হইয়া রহিয়াছে, তখন ইহার উত্থান-পতনের ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের উন্নতির উপায় চিন্তা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

মালদহবাসী মালদহের জন্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবেন, ইহার জন্য উপরোধ, অনুরোধ বা সঙ্কল্প আবশ্যক করে না। ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ কথা; কিন্তু মালদহের কি ছিল জানিলে যখন বাঙ্গালীর একাংশের ইতিহাস জানা যায়, তখন মালদহের গবেষণায় সমস্ত বাঙ্গালীর আগ্রহ হওয়া আবশ্যক। মালদহবাসী কাজ করিয়া সাফল্যের মুখ দেখিতে পাইয়াছেন, তাহার ফলাফল আজ আমাদের সম্মুখে ধরিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগের সহিত সমান আগ্রহ দেখাইয়া যদি তাঁহাদের গবেষণার ফলগুলিকে আদর করিয়া লই, তবেই না মালদহের এই সাহিত্য-সম্মিলন সর্ব্বতো-ভাবে সফল হয়। মালদহ যাহা করিয়াছেন, যাহা আমাদের দিতেছেন, তাহা আমাদের আদর্শ হউক, আমরা মালদহের আদর্শে অপরত্র এইরূপ সম্মেলন-অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করি। জাতীয় শিক্ষা-সমিতি কাহারও

সাহায্য না লইয়া স্বক্ষেত্রে স্বাধীন চেষ্টায় স্বকার্য্য করিয়া যাইতেছেন। এই স্বাবলম্বন অতিমাত্র প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন ব্যক্তি-সমষ্টি লইয়া সমাজের গঠন হয়, তেমনই এই মালদহের ন্যায় কর্ম্মিদল সকল জেলায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গড়িয়া উঠুক এবং ক্রমশঃ সে সকলের সমবায়ে বিপুল বঙ্গ-সমাজের গঠন সম্পূর্ণ হউক। কোথায় কি সূত্রে কেমন করিয়া তাহা হইবে, তাহার জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না। সমস্ত বঙ্গের সাহিত্য-চেষ্টা যাহাতে একাঙ্গীভূত হয়, আজ বিশ বৎসর হইল তাহার স্থান ভগবৎকৃপায় গঠিত হইয়াছে। যেমন মালদহের জাতীয় শিক্ষাসমিতি আশা করেন—মালদহের প্রত্যেক ব্যক্তি মালদহের সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া মালদহের কাজ সুসম্পন্ন করুক; তেমনই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আশা করেন, কেবল মালদহ কেন, বঙ্গের সমস্ত জেলায় মালদহ সাহিত্যালোচনা-সমিতির ন্যায় সমিতি হইয়া সমগ্র বঙ্গের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য দেশের সমস্ত বিচ্ছিন্ন স্বাধীন শক্তিকে একত্র করিয়া এক বঙ্গের নামে সংহত শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করুক। মালদহ-শিক্ষা-সমিতির কার্য্য মালদহে নিবদ্ধ থাকুক, কিন্তু সে কেবল স্বাধীনতার দোহাই দিয়া কেবল স্বাতন্ত্র্যের মহিমা দেখাইবার জন্য সমস্ত বঙ্গের সংহত চেষ্টায় যোগ দিবে না অথবা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে, ইহা যেন হইতেই পারে না। এরূপ বিসদৃশ কল্পনাও বোধ হয় মালদহ শিক্ষা-সমিতির লক্ষীভূত নয়। মালদহ যেমন সমস্ত মালদহ জেলাকে একত্র করিয়া এক ক্রিয়া ও এক উদ্দেশ্যে বদ্ধ করিতে প্রয়াসী—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎও তেমনই সমস্ত জেলাকে পরিষদের নামে একত্র করিয়া এক ক্রিয়া ও এক উদ্দেশ্যে বদ্ধ করিতে প্রয়াসী। অনেকে বলিবেন এ সকল অবান্তর কথার অবতারণা কেন? একটু প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই এই সকল কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হয়—সমস্ত বঙ্গকে লইয়া। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন হয়—সমস্ত উত্তরবঙ্গকে লইয়া। আবার সেই উত্তরবঙ্গের মধ্যে এক প্রান্তে মালদহ সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠান। ইহা যেমন কর্ম্মপ্রবণতার লক্ষণ, তেমনই স্বাধীনতার নামে বিচ্ছিন্নতা-বর্দ্ধনের লক্ষণ। অনেকেই প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করেন। সুরসিক অমৃতলাল বসু একদিন বলিয়াছিলেন,—"এক কলিকাতার মধ্যেই অতঃপর "ঠনঠনিয়া-সম্মিলন", "বড়-বাজার-সম্মিলন," "চৌরঙ্গী-সম্মিলন" ঘটিবে।" —মনুষ্য-চরিত্রের অভিনয়-কলাকুশল সুরসিক নটরাজ দূরভবিষ্যতে দৃষ্টি রাখিয়া যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, এই সম্মিলনের সভাপতির পদে বৃত হইয়া সে দিক্ হইতে আমি দৃষ্টি একেবারে সঙ্কুচিত করিতে পারিলাম না বলিয়া এ সকল কথার অবতারণা করিয়াছি। এই ক্ষুদ্র-বৃহৎ-স্থানব্যাপী সম্মিলনগুলির সহিত যে কোথাও দ্বন্দ্ব নাই, তাহা বলিয়া দেওয়া বোধ হয় আমাদের পক্ষে অসঙ্গত হইল না।

মালদহবাসীদের আজ বড় আনন্দের দিন—জননী বঙ্গভাষার মন্দির-প্রতিষ্ঠার পুণ্যাহ, সাধকের প্রেমাঞ্জলি দিবার দিন। আজ শত ভক্ত অর্ঘ্য লইয়া মাতৃমন্দিরদ্বারে দণ্ডায়মান। আসুন আমরা সকলে মাতার বন্দনা করিয়া নববলে বলীয়ান হইয়া মাতৃভাষার সেবাকল্পে জীবন উৎসর্গ করি। আজ আমরা আমাদের স্বার্থপরতা ভুলিতে আসিয়াছি।

ভুলিতে আসিয়াছি—আমাদের ক্ষুদ্রতা, আমাদের নীচতা। আসুন আমরা অচ্ছেদ্য অটুট দিব্য প্রেমের বন্ধনে ভ্রাতৃভাবে সকলের সহিত আবদ্ধ হইয়া মাতৃভাষার সেবা করি; কারণ, কথাই ত আছে "দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।"

আর কবির সহিত বলি,—

"মায়ের চরণে ফুলমালা দেরে জড়ায়ে,
মায়ের ভাষায় আপনারে দেরে ছড়ায়ে
দিশে দিশে, দেশে বিদেশে,
আজি স্পন্দিত নিমেষে।"

আজ মালদহবাসী কর্ম্মীদের সাধনায় আমার বোধ হয় এই সুন্দর মাতৃমন্দির-দ্বারে প্রতিবৎসর বাঙ্গালাদেশের সাহিত্যিকগণ সমবেত হইয়া আপনাদের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিবেন—আপনাদের হৃদয়ে নববলের সঞ্চার করিয়া দিবেন। আসুন এক্ষণে আমরা কর্ম্ম-ফলের দিকে না চাহিয়া—কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া—কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই।

শ্রী অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

দেশের পরিচয়

If we would impart a love of country, we must give a country to love.—Sister Nivedita.

আমাদের স্বদেশ ও মাতৃভূমি সম্বন্ধে আমাদের যতদূর জানা উচিত, আমরা তাহার কিছুই জানি না; শুধু তাহাই নহে, আমাদের ইংরাজী-শিক্ষিত লোকেরা যেন দেশ হইতে দূরে যাইয়া পড়িতেছেন। মেকলে সাহেবের উদ্যোগে যে দিন স্থির হয় যে, ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়া দেশে উচ্চশিক্ষা প্রচারিত হইবে, সেদিন যে আমাদের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শুভ-ফলপ্রসূ বৃক্ষের বীজ বপন করা হইয়াছিল তাহা মনে করা ভুল। হইতে পারে যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বহুশাখায় পাশ্চাত্যদেশে যে উন্নতি হইয়াছিল তাহা জানা আমাদের একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল; হইতে পারে যে নূতন জীবন-সংগ্রামে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের কিছু জ্ঞান অপরিহার্য্য হইয়াছিল; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজী শিক্ষার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছে, এবং সে জোর অনাবশ্যক বেশী দিন রক্ষা করা হইয়াছে। কিয়ৎপরিমাণে বিদেশের সাহিত্য-চর্চ্চা শিক্ষাপ্রদ এবং আনন্দদায়ক বটে, কিন্তু অবস্থা যদি এইরূপ হয় যে কেবল বিদেশের সাহিত্যেরই চর্চ্চা হইবে, সংস্কৃত ও বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি অনাদর প্রদর্শিত হইবে, তাহা হইলে মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত বালকের শরীরের ন্যায় আমাদের চিন্তা দুর্ব্বল ও অস্বাভাবিক হইতে বাধ্য। নিজের সাহিত্যের মধ্য দিয়াই দেশের প্রাণ ফুটিয়া উঠে, সে সাহিত্যের সহিত যাহার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়, দেশের সহিত তাহার কোনও যোগ থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলরত্নরাজি-বিভূষিত হইয়া যে কৃতী ছাত্র বাহির হইয়া আসেন, তিনি এতদিন পড়িয়াছেন কি?—ইংরাজী সাহিত্য, পাশ্চাত্য দর্শন, পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞান ও বাহ্যবিজ্ঞান। ভবিষ্যতে কিরূপ তিনি জীবনের

আদর্শ করিয়াছেন ?—সেই সব পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তার আলোচনা। সেক্সপিয়রের প্রত্যেক গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করিব, প্রত্যেক বাক্য কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কি করিয়া সে অর্থ হইল, কোথায় তাৎকালিক কোন ঘটনা বা কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাৎকালিক সমাজের চিত্রবৈচিত্র্য, এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিব, সেই সম্বন্ধে গবেষণা করিব, এইভাবে কৃতী ছাত্রের মনোগত ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে বিশেষ অতিরঞ্জন করা হয় না। সেইরূপ যিনি দর্শনের ছাত্র, তাঁহার প্রধান আলোচ্য বৈদেশিক দর্শন,—কোম্‌তে, হেগেল, ক্যাণ্ট্‌ মিল ও হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতির মীমাংসা ও যুক্তিপ্রণালী। অর্থনীতি ও সমাজনীতির ছাত্রেরা যে সকল তর্ক আলোচনা করেন, তাহা শুদ্ধ পাশ্চাত্য সমাজেই উঠিতে পারে; তাঁহারা যে প্রণালীতে যুক্তি করেন তাহা শুদ্ধ পাশ্চাত্য সমাজেই প্রযোজ্য। এই ভাবে সকল বিষয়েই তথাকথিত উচ্চশিক্ষার সহিত দেশের যোগ শিথিল হইয়া যাইতেছে। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন আশুকর্ত্তব্য এবং সে পরিবর্ত্তন আমূল করিতে হইবে।

এখন আলোচনা করা যাউক—কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন এবং কি উপায়ে তাহা সকলের মনে বিস্তার করা যায়।

প্রথমতঃ, আমাদের পরিচিত হওয়া আবশ্যক—দেশের বাহ্য অভিব্যক্তির সহিত, অর্থাৎ দেশের রূপের সহিত। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বড় অল্প। বস্তুতঃ বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে যে ভূগোল পাঠ করা হয়, তাহার পর এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সহিত কিছু জানিতে চেষ্টা করি না। বালক-বালিকাদের কোমল হৃদয়ে আমাদের দেশের রূপ মুদ্রিত করিতে হইবে। তাহার জন্য গৃহে গৃহে ভারতবর্ষের সুরঞ্জিত মানচিত্র বিলম্বিত করিতে হইবে; হৃদয়ে বাস্তব দৃশ্যগুলির চিত্র ফুটাইতে হইবে;—আমাদের মাতৃভূমির শিয়রে গগণস্পর্দ্ধী হিমালয়, তাহাতে কত গুহা উপত্যকা, কত শৈল স্রোতস্বতী, কত অরণ্য উপবন, কত তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গ, তথায় মেঘক্রীড়া ও সৌরকিরণ-সম্পাত,—সে দৃশ্যগুলি কি বিরাট, কি গম্ভীর, কি মহান্‌! তাহার পর দেশের পার্শ্বে ও পদতলে অনন্তবিস্তার সমুদ্র, কখনও প্রভাত-সূর্য্যকিরণে হাসিয়া উঠিতেছে, কখনও মেঘাড়ম্বরময় আকাশের তলে রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে; নিম্নে মায়ের চরণ-স্থাপনার্থ প্রস্ফুটিত কমলবৎ সিংহলদ্বীপ। আর এই শৈল-সমুদ্রবেষ্টনের মধ্যে কত গ্রাম-নগর, কত নদী-পর্ব্বত, কত অরণ্য-মরুভূমি, কত শ্যামলপ্রান্তর। ছবির বই ছাপা হউক, তাহাতে এই সকল দৃশ্যের প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট হউক। গৃহে গৃহে সে বই প্রচারিত হউক, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে দেখুক কি বিশাল, বৈচিত্র্যময়, সুন্দর আমাদের দেশ। যিনি যতদূর পারেন ভ্রমণ করুন, যাঁহাদের ক্ষমতা আছে তাঁহারা সুন্দর, সরল ভাষায় সে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখুন, এবং সেই সকল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সকলের দ্বারা পঠিত হউক—অনাবশ্যক কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য শিথিল আগ্রহের সহিত নয়—আজন্ম-প্রবাসী নিজের গৃহের নিজের গ্রামের কথা যেরূপ আগ্রহে পাঠ করে সেইরূপ আগ্রহে। দেশের একজন প্রধান মনস্বী লিখিয়াছিলেন "আমাদের দেশের নদীপর্ব্বত ও প্রান্তরগুলি

আমি ত শুধু সলিল ও মৃত্তিকার ভিন্ন প্রকারের সংযোগ বলিয়া ভাবি না,—আমার চক্ষে ইহা এক অখণ্ড মাতৃশরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।" স্বদেশসেবকের এই উৎকৃষ্ট ভাব আমাদের সকলের অনুশীলন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হইবে আমাদের দেশের এই সব দৃশ্যগুলি আমাদের নিজস্ব, আমাদের অসীম সুখের ও আনন্দের আকর।

দেশের রূপের আর এক অঙ্গ—ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের চিত্র। এরূপ চিত্র-সম্বলিত পুস্তকেরও বিশেষ প্রয়োজন। লিখিয়া বুঝান অপেক্ষা একখানি চিত্র দেখাইয়া সহজে বুঝান যায়—লোকে কিরূপ বেশভূষা করে, কি ভাবে কেশ সজ্জিত করে। কৃষক, ভিখারী, ছাত্র, ধনী, ভদ্র-লোক, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক সকলের বেশ প্রত্যেক প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইবে—তাহা সংগ্রহ করিয়া ছাপান প্রয়োজন। যেন একজনকে দেখিলেই চিনিতে পারা যায় সে কোন্ প্রদেশের অধিবাসী।

এতক্ষণ দেশের রূপের কথাই বলা হইতে-ছিল। রূপ অনাদরের বিষয় নহে। আমরা যাহার প্রতি অনুরক্ত, বার বার তাহার রূপ দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়; যাহার সহিত আমরা পরিচিত হই, তাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ জন্মে। সুতরাং দেশের বহির্দৃশ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্বদেশপ্রীতির একটি বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু ইহার আর একটি অঙ্গ আছে, এক্ষণে তাহার কথাই বলিব। তাহা হইতেছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতি—দেশের প্রাণ। অতীত কালের ও বর্ত্তমানের দেশের সাধনা, ভাব ও চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, সুখ-দুঃখ, আশা ও আশঙ্কা। আমরা মুষ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ ভাবি বা সম্প্রতি ভাবিতে শিখিয়াছি তাহা দেশের যথার্থ ভাবনা নয়। আমরা যে সকল আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করি, তাহা দেশের সহস্র-সহস্রবৎসরাজ্জিত প্রকৃত আদর্শ নহে। আমাদের দেশের নিজস্ব চিন্তাপ্রণালী ও আদর্শ কি, তাহা স্থির করিতে হইবে, তাহার সহিত হৃদয় মিশাইয়া ভাবিতে হইবে। এই উপায়ে আমরা স্থির করিতে পারিব আমাদের অভাব ও অবস্থার উপযোগী কার্য্যপ্রণালী কি?

ভারতবর্ষের অন্তঃপ্রকৃতির ধারণা করিতে হইলে, প্রথমতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা কি ভাবে জীবন যাপন করে,—তাহাদের সামাজিক নিয়ম, আচার-ব্যবহার, উৎসব ও বিপদের চিত্রের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমরা এত উদাসীন যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ত দূরের কথা, বঙ্গদেশের কৃষকদের দৈনিক জীবন ও সুখ দুঃখের সম্বন্ধেই আমরা একান্ত অনভিজ্ঞ। পল্লীগ্রামে যে কত প্রকার উৎসব আছে, কি ভাবে পল্লীজীবনে বৈচিত্র্য ও সরসতার সঞ্চার হয়, তাহা আমরা জানিতে চেষ্টা করি না। দেশের দরিদ্র কৃষকদের সহিত মিশিবার সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে ও তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। যে মেলাতে দেশের বহু লোকের সমাগম হয় আমরা সে মেলাতে যাইতে আগ্রহহীন কেন? মেলায় আমাদের আর কোনও প্রয়োজন না থাকে, না থাকুক, কিন্তু সেখানে দেশের অসংখ্য লোক একত্র হইবে, তাহাদের উৎসাহ-উদ্দীপ্ত মুখ দেখিতে পাইব, তাহাদের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইব, তাহাই কি আমাদিগকে তথায়

লইয়া যাইবার প্ররোচক হইবে না? ফুটবল ম্যাচ দেখিতে আমাদের ছাত্রদের যেরূপ আগ্রহ, ঘোষপাড়ার মেলা, মাহেশে রথযাত্রার মেলা প্রভৃতি দেখিতে সেরূপ আগ্রহ নাই। তাহাদের হৃদয়ে সে আগ্রহ জাগাইতে হইবে।

তাহার পর দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের স্বদেশী হইতে হইবে। বিদ্যায় দেশভেদ নাই বলিয়া যাহা বলা হয় সে সম্বন্ধে অতি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত। Physics, Chemistry, Physiology প্রভৃতি সম্বন্ধে এ কথা খাটিতে পারে, কিন্তু দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, শিল্প সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। বিশ্বের দুরূহ তত্ত্বগুলি আমাদের পণ্ডিতেরা কি ভাবে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তা-প্রণালী, তাঁহাদের মীমাংসা, আমাদের প্রাচীন দর্শন-শাস্ত্রগুলি পাঠ করিলে জানা যাইবে। তাহা না পড়িয়া আমরা যদি বিদেশী দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাতেই ব্যাপৃত থাকি, তাহা হইলে দেশের এত কালের সাধনায় আমরা কোনও উপকার লাভ করিতে পারিলাম না; যে বিষয়গুলি বিদেশীয় পণ্ডিতদের চক্ষে বড় বোধ হইয়াছে আমরা তাহা লইয়াই ব্যাপৃত থাকি; যে প্রণালীতে তাঁহারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমরা সে প্রণালীরই অনুসরণ করি। কে বলিতে পারে আমাদের প্রাচীন প্রণালীই হয় ত ভাল ছিল; আমাদের পণ্ডিতেরা যে বিষয়গুলির আলোচনা করিয়াছেন তাহাই হয় ত যথার্থভাবে বড়। সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এ কথা আরও বেশী খাটে। আমাদের প্রকৃতি ও য়ুরোপীয়দের প্রকৃতি ভিন্ন প্রকারের; আমাদের ও তাহাদের আদর্শ বিভিন্ন; আমাদের আদর্শ ঈশ্বরে আস্থা, শান্তি-প্রিয়তা, অল্পে সন্তুষ্টি, ভোগৈশ্বর্য্যে অনাদর,—তাহাদের আদর্শ প্রভুত্ব-বিস্তার, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্তি, উচ্চ আশা। যদি আমাদের আদর্শই প্রকৃত ভাবে উচ্চ হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনায় আমরা ভ্রান্তপথে চালিত হইতেছি। সুতরাং জ্ঞানালোচনাতেও আমাদিগকে স্বদেশী হইতে হইবে। যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোচনার আদর থাকিবে, ততদিন ছাত্রেরা তাহার আলোচনা করিতে বাধ্য; কিন্তু ছাত্রদের মনে রাখা উচিত যে, তাঁহারা শুধু পরীক্ষার জন্যই, অর্থোপার্জ্জনের সহায়তার জন্যই এত করিয়া বিদেশী শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন; তাঁহারা জীবনের উদ্দেশ্য করুন —মাতৃভাষায় আমাদের নিজস্ব শাস্ত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, মাতৃভাষায় শিক্ষিতদের মধ্যে তাহার আলোচনা। তাহা হইলে হয় ত পরে আমাদের শাস্ত্রের আদর বিশ্ববিদালয়ে বাড়িতে পারে। কিন্তু তাহা যদি নাও হয় তথাপি আমরা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব না।

অতঃপর সাহিত্যের কথা। আমাদের মনে রাখা উচিত যে বিদেশী কাব্য হইতে রস গ্রহণ করিতে হইলে আমাদের মনোবৃত্তিকে কিছু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। আমাদের জন্মগত যে সকল সংস্কার, যে সকল ভাব ও চিন্তাপ্রণালী আমাদের অভ্যস্ত, বিদেশী সাহিত্যে তাহাদের সহিত কোনও সম্পর্ক নাই; প্রত্যুত তাহারা আমাদের অনভ্যস্ত ভাব এবং বেষ্টনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং উত্তমশ্রেণীর বিদেশী সাহিত্য হইতে আমরা যে শিক্ষা ও আনন্দ পাইব, মধ্যম-শ্রেণীর জাতীয় সাহিত্য হইতে তাহার কম শিক্ষা ও আনন্দ পাইব না। অতএব যাঁহারা উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কাব্য থাকিতেও উত্তম, মধ্যম, অধম সর্ব্বশ্রেণীর শুধু ইংরাজী পদ্য ও উপন্যাসই পাঠ করেন, তাঁহারা

নিজেদের কতদূর ক্ষতি করিতেছেন, তাহা বলা বাহুল্য। প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালার সাহিত্যে নিমগ্ন না হইলে আমরা দেশের প্রকৃত জীবন উপলব্ধি করিতে পারিব না। Tennyson, Wordsworth, Byron, Goldsmith প্রভৃতির নাম বাঙ্গালী ছাত্রের মুখে মুখে যেরূপ শুনা যায়, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, রামপ্রসাদের নাম সেরূপ শুনা যায় না কেন? ছাত্রেরা ত চিত্তবিনোদনের জন্যই অধিকাংশ ইংরাজী কাব্য পাঠ করেন; আমাদের মানসিক অবস্থা যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালা কাব্য পাঠ করিলে অধিক চিত্তবিনোদন হইত।

ইংরাজী শিক্ষার পর হইতে বঙ্গসাহিত্যের একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার বিষয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে সকল গান লেখা হইত, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মধ্যে তাহা সুচারুরূপে প্রচারিত হইত। আর আজকাল যে সকল গান লেখা হয়, তাহা মুষ্টিমেয় ইংরাজী-শিক্ষিত লোক ছাড়াইয়া অতি অল্পদূরে প্রচারিত হয়। অথচ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের গানগুলি যে, ভাব-সম্পদে বা ভাষার সৌন্দর্য্যে বর্ত্তমান অপেক্ষা নিম্নে স্থান পাইবার যোগ্য তাহা নহে। মায়াবাদের জটিল তত্ত্ব, সংসারের অনিত্যতা, পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অসারতা, ভগবানের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য—এই সব মহান্ ভাবগুলি প্রাচীন গীতিলেখকদের দ্বারা দেশময় এমন সুপ্রচারিত ও সর্ব্বজনবোধ্য করা হইয়াছে যে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। রামপ্রসাদ, দাশুরায় ও অসংখ্য বৈষ্ণবকবিদের গান বাঙ্গালার পথে ঘাটে, গৃহে প্রান্তরে, আজিও ধ্বনিত। চাষা লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে তাহা গাহিতেছে, ভিখারী গৃহস্থের দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহা শুনাইতেছে, মাঝি নৌকা চালাইতে চালাইতে তাহা গাহিতেছে, আর পণ্ডিত-মণ্ডলীও সভায় বসিয়া তাহা সাদরে সাশ্রুনয়নে শুনিতেছেন। এমনটি হইতে পারিয়াছিল তাহার কারণ প্রাচীন কবিদের দেশের প্রাণের সহিত যোগ ছিল,—বাঙ্গালীর হৃদয়বীণার তারগুলি কি ভাবে বাঁধা আছে, কি ভাবে তাহা স্পর্শ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা শিখিয়াছিলেন। আজকালকার অধিকাংশ গানগুলি ইংরাজী ভাবে অনুপ্রাণিত; ইংরাজী-শিক্ষিতদের মধ্যে তাহাদের বহুলপ্রচার হইলেও দেশের প্রাণ তাহা কাড়িতে পারে নাই। কেবল স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনের ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কতকগুলি গান দেশের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। এখন যাঁহারা লেখক আছেন ও হইবেন, তাঁহাদের চেষ্টা করিতে হইবে তাঁহাদের রচনা যাহাতে দেশময় এই ভাবে প্রচারিত হয়। তাহার জন্য প্রয়োজন দেশের সাধনা বুঝা, এবং দেশের নিজস্ব ভাষা আয়ত্ত করা। আর প্রয়োজন যে, যে উপায়ে সাহিত্যরস সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়, সে উপায়গুলি সযত্নে সম্বর্দ্ধিত করা। যে সব ভিখারী গান গাহিয়া বেড়ায়, যে কবি ও কথক সাহিত্যের মধুররসে শ্রোতার হৃদয় আর্দ্র করে, যে যাত্রার অধিকারী সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে এবং তাহাদের সংস্কার ও সংগঠন করিয়া সমাজোপযোগী করিতে হইবে।

গল্প ও উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য মানব-হৃদয়ের সার্ব্বজনীন ভাবগুলি বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও বেষ্টনীর মধ্যে ফুটাইয়া তোলা। বাঙ্গালার গল্প ও উপন্যাস লিখিতে হইলে দেশের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক।

লেখকেরা শিক্ষিত ও নগরবাসী লোকদিগকে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের সহিত পরিচিত করাইতে চেষ্টা করিবেন। দেশের দরিদ্র কৃষকদের সুখ-দুঃখ, আশা-আশঙ্কা, উৎসব-বিপদ লইয়া যে দৈনিক জীবন তাহারই চিত্রগুলি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করুন,—যাহাকে নিবেদিতা বলিয়াছেন, "that fine ancient poem,—the common life of the common Indian people." যে লেখকেরা পাশ্চাত্য সমাজ ও জীবন অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন, তাঁহারা স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন ও পাঠকদের রুচি বিপথগামী করিতেছেন।

মুসলমানদের তুর্কী, পারস্য, আফগানিস্থান আছে; খৃষ্টানদের য়ুরোপ, আমেরিকা আছে; কিন্তু আমাদের হিন্দুদের এই ভারতবর্ষ ছাড়া আর দেশ নাই। সুখে দুঃখে, উৎসবে বিপদে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই দেশে সহস্র সহস্র বৎসর কাটাইয়াছেন, এই দেশের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র, প্রতি বারিবিন্দু অমৃত, প্রতি পবন-হিল্লোল হৃদয়স্নিগ্ধকারী। দেশের মহৈশ্বর্য্যময় রূপ দেখিতে হইবে, দেশের লোকেরা কি ভাবে জীবন যাপন করে, তাহাদের সুখ-দুঃখ, অভাব-আকাঙ্ক্ষা জানিতে হইবে, তাহার সহিত সহানুভূতি করিতে হইবে। তাহা যদি না করি, তবে আমাদের বৃথাই জ্ঞানলাভ, বৃথাই আর্থিক উন্নতি। ছাত্রাবস্থা হইতে ইহার অনুশীলন কর্ত্তব্য। দীর্ঘ অবকাশের সময় ছাত্রেরা দল বাঁধিয়া বাহির হইয়া পড়ুক, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান দেখিয়া বেড়াক। ইহাতে যে কত বিবিধ প্রকারের উপকার হইবে তাহা বলা যায় না। শুধু খরচের কথা,—সে খরচ খুব বেশী হইবে না, অধিকাংশ অভিভাবক তাহা দিতে পারিবেন; তাঁহারা যেন মনে রাখেন ছেলেদের জন্য মূল্যবান জুতা জামা প্রভৃতিতে ব্যয় না করিয়া তাহাদিগের বেড়াইবার সুযোগ দিলে তাহারা উপকার ও আনন্দ উভয়ই বেশী পাইবে। এ ত দীর্ঘ অবকাশের কথা। দুই এক দিনের অবকাশের সময়ও ছাত্রেরা সহরের চারিপাশে ছোট ছোট Excursion করিতে পারিবে, তাহাতে শরীরের উপকার হইবে, মানসিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে এবং পল্লীজীবনের সহিত চাক্ষুষ পরিচয় হইবে, তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিবে। পল্লীগ্রামে যাইবার যে কোনও সুযোগ উপস্থিত হইবে, তাহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। পল্লীজীবন সম্বন্ধে যদি আমরা অনভিজ্ঞ থাকি তাহা হইলে আমরা জানিব না কি উপায়ে দেশের সকলের মধ্যে নূতন ভাব প্রচারিত করা যায়, কি ভাবে আন্দোলন করিলে তাহা সফল হইবে, দেশের প্রকৃত অভাব কি, কি উপায়ে তাহার মোচন সম্ভব। ইংরাজী ভাষা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, সে সমস্তই বিদেশী; স্বদেশী ওই সব জিনিষ আছে, তাহাই আমাদের মুখ্যভাবে আলোচ্য, বিদেশী বিদ্যা আলোচনা করিতে হইলে, আমাদের ভাষায় স্বদেশী ভাবে তাহার আলোচনা গৌণ ভাবে করিতে হইবে। Novel, magazine এবং cheap 6-penny novel কি আগ্রহের সহিত অনেকে পাঠ করেন; প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলির সংবাদও রাখেন না;—ইহা কতদূর গভীর ক্ষোভের বিষয়। ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের ধনী ব্যক্তিরা প্রথমে য়ুরোপ ও আমেরিকার কথাই ভাবেন, অথচ তাঁহারা ভারতবর্ষের বিচিত্র দ্রষ্টব্য স্থানের অতি অল্পই

দেখিয়াছেন। হে ভারতবাসিগণ, আর কত দিন এ মোহ আবদ্ধ থাকিবে! জাগিয়া উঠ, চক্ষু মেলিয়া চাহ,—দেখ তোমাদের দেশ,—সে কি সুন্দর; দেখ তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের স্বদেশবাসিগণকে, তোমাদের পল্লীবাসী কৃষকগণকে,—তাহারা তোমাদের কত নিকট আত্মীয়, কত বিবিধ সূত্রে তোমাদের সহিত সম্বন্ধ; আগ্রহের সহিত তোমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য পাঠ কর, দেখ তাহারা তোমাদের জীবনের সহিত কি ভাবে জড়িত, তাহারা তোমাদিগকে কত আনন্দ দিতে পারে, দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারে, আর ধর্ম্মজগতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা দেখ। এত বিপুল ধর্ম্ম-সাহিত্য আর কোন্ জাতির আছে? জীবনের প্রত্যেক বিষয়ে, প্রত্যেক ভাবনায়, প্রত্যেক সাধনায় এমন ধর্ম্মের প্রভাব আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? অনন্ত বৈচিত্র্যময়, অসীম সুখ-দুঃখের আকর, সমস্ত দেশ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে,—তোমরা একবার হৃদয়ের সহিত তাহাকে গ্রহণ কর, তাহার প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ মিশাইয়া দাও, কিসে সে দেশ প্রকৃত সুখী হইবে তাহার চেষ্টা কর, কিসে তাহার প্রকৃত অভাব মোচন হইবে সেইরূপ উদ্যোগ কর। মাতৃভূমির প্রকৃত সন্তান হইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও—পরমমঙ্গলময় জগদীশ্বর তোমাদের সহায় হউন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্,এ।

তসর-শিল্প

আমাদের দেশের ধনীসন্তানেরা তসর ও বাফ্‌তার কোট এবং চাদর এবং মহিলারা তসরের কাপড় ও শাড়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন; বিবাহ, উপনয়ন ও পূজাপার্ব্বণাদিতে গরদের রেশমের মত তসরেরও বেশ আদর দেখা যায়; গরদের কাপড় তসরের কাপড় অপেক্ষা কিছু বেশী মূল্যবান। তসরও গরদের ন্যায় এক প্রকার কীটজ তন্তু; তসরকীট গৃহে পালন করা যায় না বলিয়া ইহাকে বন্য-রেশম আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে; তসরকীট বন্যভাবাপন্ন এবং বাহিরে বৃক্ষশাখায় থাকিয়া পাতা খায় ও রেশম গুটি প্রস্তুত করে; তৎপরে লোকে গুটিগুলি বৃক্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে। গরদ-রেশমকীট তুঁত-পাতা খাইয়া গুটি প্রস্তুত করে; ইহাদিগকে গৃহাভ্যন্তরে পালন করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন প্রকার তসরপোকা দৃষ্টিগোচর হয়; ভারতে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার তসর-পোকা ব্যবসা ও শিল্পে স্থান পাইয়া থাকে—তসর বা মিলিট্টা অথবা পেফিয়া তসর (জাতা, ডাবা, মুগা, লাড়িয়া প্রভৃতি), মুগা-তসর, এণ্ডি-তসর, ত্রিকুলা-তসর এবং এট্‌লাস ও এনথেরিয়া রয়েলি তসর। জাপানের ইয়ামামায়ী তসর পোকা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তসরসূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু ইহা এত কম পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে ইহা জাপানের বাহিরে রপ্তানি হইতে পায় না। চীনদেশের পেরণী তসর যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ইউরোপ ও আমেরিকাতে রপ্তানি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভারত-

বর্ষের তসর-শিল্পের অবস্থা বেশ উন্নত ছিল; ভাগলপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, চাঁইবাসা, চান্দা, বিলাসপুর, ময়ূরভঞ্জ, গয়া, সিংহভূম, মানভূম, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি জেলাতে যথেষ্ট পরিমাণে তসর-রেশম উৎপন্ন হইত এবং তন্তুবায়গণ তসর-সূত্রের বস্ত্র প্রস্তুত করতঃ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও ইউরোপে চালান দিত; কিন্তু আজকাল ক্রমেই এই শিল্পের অবনতি দেখা যাইতেছে। বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদিগের অনাস্থাই এই অবনতির মূল কারণ বলিয়া মনে হয়; কারণ এই শিল্প নিরক্ষর লোক দ্বারা সাধারণতঃ পরিচালিত হইয়া থাকে; নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উপায়গুলি ইহাদের জানা নাই বলিয়া ইহারা কোনও নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই শিল্পের উন্নতি করিতে পারে না। কোথায়, কি ভাবে এবং কত দামে তসর-রেশম বিক্রয় হয় তাহা ইহাদের জানা থাকে না; সুতরাং অনেক সময়ে ইহারা কম দামে বস্ত্র ও সূত্র ইত্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুখের বিষয় এই যে আজকাল শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধে একটু মনোযোগ দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় মিলিট্টা তসর সম্বন্ধে কিছু বলিব। বিহার, মধ্যভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার কোনও কোনও জেলায় তসর এখনও কুটীর-শিল্প ভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

আসান, কুসুম, শাল, অর্জ্জুন, হরিতকী, বয়ড়া, [illegible], [illegible], বিশ্বোল, ঢাক, কুম্ভী, জাম, অশ্বত্থ, সেগুন, বাদাম, শিমুল, কেন্দ বা দেশী আবলুস প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া তসর-পোকা রেশম দিয়া থাকে; তন্মধ্যে আসন ও শাল গাছে তসর-পোকা পালন করিতে সুবিধা। বীজ তসর-গুটি হইতে প্রজাপতি বাহির হইলে স্ত্রী ও পুং প্রজাপতির সঙ্গমের পর স্ত্রী-প্রজাপতিগুলি ডিম প্রসব করে। ঐ ডিম ঘরে ১০।১২ দিন থাকিয়া ফুটিয়া ছোট ছোট তসর-কীট বাহির হয়। কীটগুলিকে উপরিকথিত যে কোনও গাছের শাখায় রাখিয়া দিলে ইহারা গাছের পাতা খাইয়া ৪০ হইতে ৬০ দিনে ৪ বার খোলস বদ্‌লাইয়া প্রায় ৩½—৫ ইঞ্চি পরিমাণ বড় হয় ও তৎপরে ২।৩টী পাতার মধ্যে গুটি প্রস্তুত করতঃ উহার মধ্যেই মূলকীটে পরিণত হয়। মূলকীট সহ গুটিগুলি বৃক্ষ হইতে আহরণ করিয়া আনা হয় ও কিছু বীজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্টগুলি বিক্রয় কিম্বা কাটাই করা হয়। এই বীজ-গুটি বা কোষ হইতে মূলকীটগুলি প্রজাপতি হইয়া বাহির হয় এবং স্ত্রী ও পুং প্রজাপতির সঙ্গমের পর পূর্ব্বের ন্যায় ডিম প্রসব করিয়া মরিয়া যায়; প্রজাপতি অবস্থায় ইহারা কিছুই খায় না; গুটি হইতে বাহির হইবার ৬।৭ দিনের মধ্যেই ইহারা স্বভাবতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কতকগুলি গুটি গাছেই থাকিয়া যায়; এই গুটি হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া গাছের উপরে ডিম দেয় ও তৎপরে তসর-কীট ফুটিয়া বাহির হয় ও পাতা খাইয়া গুটি প্রস্তুত করে; এই গুটিগুলিকে বন্য তসর-রেশমগুটি বলা যাইতে পারে। তসর-গুটি হইতে একটি প্রায় ৪০০।৫০০ হাত দীর্ঘ অপরিচ্ছিন্ন সূত্র বাহির হয়; ৪।৫টী গুটির সূত্র একত্র করিয়া ইহাদিগকে কাটাই করা হয়। মুখ খোলা গুটি হইতে (অর্থাৎ যে গুটি হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া গিয়াছে) একটি অপরিচ্ছিন্ন সূত্র পাওয়া কষ্টকর; সাধারণতঃ এই গুটিগুলি তুলার মত ধুনিয়া ও পিঁজিয়া সূত্র প্রস্তুত করা হয়। কাটাই

পোকিয়া তসর রেশম কীট

সূত্র হয়, সূক্ষ্ম স্থিতিস্থাপক, মসৃণ, চকচকে ও বেশী মূল্যবান; এই জন্যই বীজগুটি রাখিয়া অবশিষ্ট গুটিগুলি রৌদ্রে কিম্বা বাষ্পে তাপাইয়া গুটির মধ্যস্থিত ইবে বা মূলকীট-গুলি মারিয়া ফেলা হয়। আজকাল মুখ-খোলা গুটি হইতে কাণপুর ও বোম্বেতে কলের সাহায্যে বেশ মিহি সূত্র প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু ইহাতে অনেক দামী ও জটিল কল-কব্জার আবশ্যক।

প্রতি বৎসর প্রায় ১০০,০০০ সের তসর ভারতবর্ষ হইতে ইতালি, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে রপ্তানি হইয়া থাকে। মধ্যভারতবর্ষ, বেহার ও উড়িষ্যা, বাঙ্গালা এবং মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে সাধারণতঃ তসর-গুটি রপ্তানি হয়; বিহার ও বাঙ্গালা হইতে কিছু কাপড় ভারতের অন্যান্য স্থানে ও ইউরোপে চালান হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনী-পুর, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলাতে কিছু কিছু সূত্র কাটাই এবং বস্ত্রবয়ন হইয়া থাকে। এই সকল স্থানের ব্যবসায়ীরা গিরিধি, রাণীগঞ্জ, সাঁওতাল পরগণা, সিংহভূম, মানভূম, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে গুটি ক্রয় করিয়া লইয়া আইসে ও তৎপরে কাটাই করিয়া বয়ন করে। কোনও কোনও স্থানে তসর রঞ্জনও হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে অনেক প্রকার মিলিট্টা-তসর কীট দেখা যায়, যথা:—মুগা, জাতা, ডাবা, লাড়িয়া, বগুই ইত্যাদি। কোনও জাতি বর্ষ-একজাত আবার কোনও জাতি বর্ষ-দ্বিজাত অর্থাৎ প্রথমোক্ত তসরের ডিম প্রতি বৎসর একবার মাত্র ফুটে, আর শেষোক্ত তসর-কীটের ডিম প্রতি বৎসর দুই বার ফুটে। শেষোক্ত তসর-প্রজাপতি জুন ও জুলাই মাসে বাহির হইয়া প্রায় ৩০।৪০ ঘণ্টা পরে ডিম দেয়; ঐ ডিম ৮।১০ দিনের মধ্যেই ফুটিয়া থাকে; এই কীটগুলি প্রায় ৪০ দিন পরে গুটি প্রস্তুত করে এবং উহার ১৫।২০ দিন পরে প্রজাপতি হইয়া ডিম দেয়; এই ডিম ৯।১০ দিন পরে ফুটে ও কীটগুলি অক্টোবর মাসে গুটি প্রস্তুত করে; এই গুটিগুলি হইতেই পরবর্ত্তী জুন বা জুলাই মাসে প্রজাপতি বাহির হয়। প্রথমোক্ত তসর-প্রজাপতি অক্টোবর মাসে বাহির হয় ও ৩০।৪০ ঘণ্টা পরে ডিম প্রসব করিয়া ১০।১১ দিন পরে ফুটিয়া থাকে; এই কীটগুলি ফেব্রুয়ারী মাসে গুটি প্রস্তুত করিয়া পরবর্ত্তী অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত গুটির মধ্যে মূল-কীট অবস্থায় থাকে এবং পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে প্রজাপতি হইয়া ডিম প্রসব করে। কোনও জাতি জুলাই মাসে ডিম প্রসব করে; এই ডিমগুলি ৮।১০ দিনের মধ্যে ফুটে এবং কীটগুলি প্রায় দুই মাস পাত খাইয়া গুটি প্রস্তুত করতঃ তন্মধ্যে মূলকীট অবস্থায় পরবর্ত্তী জুলাই মাস পর্য্যন্ত থাকে।

তসর-গুটি ডিম্বাকৃতি ও ধূসরবর্ণ; গুটি গুলি জাতিভেদে বড়-ছোট হইয়া থাকে এব এক প্রান্তদেশে একটি লম্বা বোঁটা বিদ্যমা থাকিয়া বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন থাকে। বীজ গুটিগুলি ঘরের মধ্যে খোলা জায়গায় ঝুলাই রাখা হয়। মে বা জুন মাসে বৈকালবে চারটা হইতে সকাল ছয়টা পর্য্যন্ত প্রজাপতি গুলি কাটিয়া বাহির হইতে থাকে; পু প্রজাপতিগুলিকে উড়িয়া যাইতে দেওয়া হ আর স্ত্রী-প্রজাপতিগুলির পাখা পাতা দি বাঁধিয়া দিয়া রাত্রিতে বাহিরে কোনও বৃক্ষে শাখার উপরে বা খোলা জায়গায় রাখা হ অথবা সূতা দিয়া ইহাদের পা বাঁধিয়া গাছে ডালের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হয়; রাত্রি বহু পুং-প্রজাপতি আসিয়া ইহাদের সহি

সংযোজিত হয়। পুং-প্রজাপতিগুলি শুঁয়া দ্বারা স্ত্রী-প্রজাপতির অবস্থান অনেক দূর হইতে বুঝিতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যে সকল পুং-প্রজাপতি ঘর হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় সাধারণতঃ সেগুলি ফিরিয়া আসে না। বন্য পুং-প্রজাপতি-গুলি ঘরের প্রজাপতি অপেক্ষা বলবান; কিন্তু এ গুলি নিকৃষ্ট জাতীয় হইলে ডিম, কীট ও গুটিগুলিও কিছু ছোট হইয়া থাকে। সংযুক্ত হইবার প্রায় ২০।২৫ ঘণ্টা পর পুং-প্রজাপতিগুলিকে বিযুক্ত করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, আর স্ত্রী-প্রজাপতিগুলিকে বাঁশের টুকরীতে রাখিয়া দিলে ২।৩ রাত্রে ১৫০ হইতে ১৭০ সরিষার মত ছোট সাদা ডিম প্রসব করে। সংযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই স্ত্রী-প্রজাপতির ডিম্বকোষে ডিমগুলি বর্ত্তমান থাকে; সংযুক্ত হইলে ডিমগুলি হয়; সংযুক্ত না হইলে স্ত্রী-প্রজাপতিগুলি ডিম প্রসব করে বটে, কিন্তু ডিমগুলি বাওয়া হয় অর্থাৎ ফুটে না। অনেকগুলি স্ত্রী-প্রজাপতি সংযুক্ত হইবার পর এক টুকরীতে রাখা যাইতে পারে এবং প্রত্যেক দিনের ডিম পৃথক রাখিয়া দেওয়া ভাল; প্রথম রাত্রের ডিম হইতে নীরোগ ও বলবান কীট হইয়া থাকে। যদি বেশী ডিমের প্রয়োজন না থাকে, তবে কেবল প্রথম দিনের ডিম পালন করিবার জন্য রাখিলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে। পাতার দোনা করিয়া প্রায় ৭০।৮০টী ডিম উহাতে রাখা হয়। প্রায় ৭৮ দিন পরে ডিমের রঙ্ কৃষ্ণাভ হয় ও তৎপর দিন প্রাতঃকালে ডিম হইতে কীটগুলি ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে। নবজাত কীটগুলি অনেকটা ধূসরবর্ণের হয় ও উহাদের দেহ লোমে পরিপূর্ণ থাকে। দোনা সহিত কীট-গুলি গাছের নরম শাখায় রাখিয়া দিলে উহারা নরম পাতা খাইবার জন্য শাখায় উঠিয়া যায়; পাতা বেশী না থাকিলে প্রতি শাখায় ১৫।২০টার বেশী কীট রাখা সঙ্গত নহে, কারণ বড় হইলে ইহারা সমুদয় পাতা খাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলে এবং তখন উহাদিগকে শাখা-গুলি কাটিয়া অন্য পত্রযুক্ত শাখায় বাঁধিয়া দিতে বেগ পাইতে হয়। কীটগুলি আপনা হইতেই পাতা খাইয়া বড় হইতে থাকে; ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত পাতা খাইয়া ইহারা প্রথম কলপে যায় অর্থাৎ ইহারা প্রায় ২৫।৩০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাতা খাওয়া বন্ধ করে ও পশ্চাতের পা দিয়া বৃক্ষশাখার পত্র শক্ত করিয়া ধরিয়া নিশ্চল ভাবে থাকে, তৎপরে উপরকার চামড়া বা খোলস ফেলিয়া দেয়। খোলস ছাড়ার পর ইহারা আবার প্রায় দ্বিগুণ হয়, অনেকটা সবুজাভা প্রাপ্ত হয় ও দেহের লোমের সংখ্যাও অনেকটা কমিয়া আসে; তৎপরে পুনরায় পাতা খাইতে থাকে এবং নবম কিম্বা দশম দিনে দ্বিতীয় কলপে যায়; প্রায় দুই দিন পাতা খাওয়া বন্ধ করিয়া নিশ্চল অবস্থায় থাকে ও তৎপর খোলস ছাড়ে ও পাতা খাওয়া আরম্ভ করে। ফুটিবার ২০।২১ দিন পরে ইহারা তৃতীয় কলপে যায় এবং প্রায় তিন দিন পাতা খাওয়া বন্ধ করিয়া নিশ্চল অবস্থায় থাকে এবং তৃতীয়বার খোলস ছাড়িয়া পুনরায় পাতা খাইতে থাকে। এখন হইতে ইহাদের দেহের রং গাঢ় সবুজবর্ণের হয় ও স্থানে স্থানে সোণালি রঙ্গের চিহ্ন দেখা যায়। ফুটিবার প্রায় ৪০।৪২ দিন পরে ইহারা চতুর্থ কলপে যায় ও পাতা খাওয়া বন্ধ করে; প্রায় চারিদিন নিশ্চল অবস্থায় থাকিয়া ইহারা চতুর্থবার খোলস পরিবর্ত্তন করে এবং তৎপরে প্রায় ৭।১০ দিন পর্য্যন্ত পাতা খায় ও
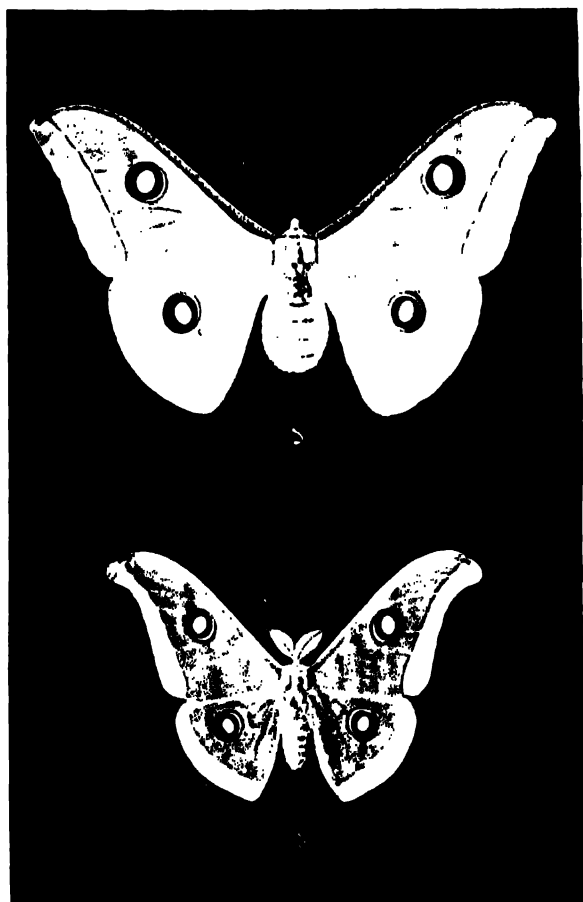
প্রায় ৩½ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হইয়া পাতা খাওয়া একেবারে বন্ধ করে ও মুখ দিয়া সূত্র নির্গত করিতে থাকে ও গাছের ডালে একটি বোঁটা প্রস্তুত করতঃ ২।৩টি পাতার মধ্যে সূতা জড়াইতে থাকে এবং তৎপরে নিজের দেহের চারি ধারে সূতা জড়াইতে থাকে এবং দুই দিনের মধ্যেই একটি ডিম্বাকৃতি ছেয়ে রঙ্গের গুটি প্রস্তুত করিয়া ফেলে এবং ৬।৭ দিন পর গুটির মধ্যে ইযে বা মূলকীটে পরিণত হয়। রেশম কীটগুলি ইযে, প্রজাপতি এবং ডিম্বাবস্থায় কিছুই খায় না। বোঁটা সহিত গুটিগুলি বৃক্ষ হইতে আস্তে আস্তে আহরণ করিয়া ঘরে টুকরীর মধ্যে রাখিয়া দিতে হয়। গুটিগুলিতে আঘাত লাগিলে উহাদের মধ্যস্থিত ইযেগুলির অনিষ্ট হইতে পারে। বড় ও ভাল গুটিগুলি বীজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্টগুলি ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত রৌদ্রে রাখিয়া মারিয়া ফেলিতে হয়; নতুবা ১০।১১ দিন পরে প্রজাপতিগুলি গুটি হইতে নির্গত হইয়া সূত্রের অনবচ্ছিন্নতা নষ্ট করিয়া দেয়। নাগপুর অঞ্চলে এই সময়ের গুটিগুলিকে আমপাতিয়া বন্দের গুটি বলে। এই গুটিগুলি কিছু ছোট হয়। আমপাতিয়া বন্দের বীজকোষ বা গুটিগুলি রাখিয়া দিলে প্রায় ২০।২৫ দিন পর প্রজাপতি বহির্গত হয়; ইহারা পূর্ব্বের ন্যায় সংযুক্ত হইয়া ডিম প্রসব করে ও ডিমগুলি ৯।১০ দিন পরে ফুটে; এই কীটগুলি ৪ বার কলপ ছাড়িয়া প্রায় ৭০।৭৫ দিনে বৃক্ষের শাখাতে গুটি প্রস্তুত করে; পূর্ণাবস্থায় ইহারা প্রায় ৪½ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হইয়া থাকে এবং গুটিও বেশ বড় বড় প্রস্তুত করে। এই বন্দকে নাগপুর অঞ্চলে বর্ষাতি-বন্দ বলা হয়। এই গুটি হইতে পর বৎসর জুন মাসে প্রজাপতি নির্গত হয়।

লাড়িয়া জাতীয় বীজকোষ বা গুটি হইতে বৎসরে একবার মাত্র প্রজাপতি বাহির হয়। আগষ্ট মাসে প্রজাপতি বাহির হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সংযুক্ত হইয়া ডিম পাড়ে। এই ডিম ৮।১০ দিনের মধ্যে ফুটিয়া কীট বাহির হয় ও কীটগুলি অক্টোবর মাসে গুটি প্রস্তুত করে; এই গুটি হইতে পর বৎসর আগষ্ট মাসে প্রজাপতি বাহির হইয়া থাকে।

বগুই জাতীয় বীজকোষ বা গুটি হইতে অক্টোবর মাসে প্রজাপতি বাহির হয় ও তৎপরে পূর্ব্বের ন্যায় সংযুক্ত হইয়া ডিম পাড়ে; এই ডিম ১০।১২ দিনের মধেই ফুটিয়া যায়; এই কীট পাতা খাইয়া ফেব্রুয়ারি মাসে গুটি প্রস্তুত করে; এই গুটি হইতে পর বৎসর অক্টোবর মাসে প্রজাপতি নির্গত হয় ও ডিম পাড়ে। শীতের সময় পোকাগুলির পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতে বর্ষা ও অন্যান্য সময় অপেক্ষা বেশী দিন লাগে।

তসর-গুটিগুলি পাতার সঙ্গে থাকে বলিয়া প্রায় দেখা যায় না; গুটি সংগ্রহ করিবার সময় গাছের নীচে দেখিতে হয়; যদি গোল-মরিচের মত কাল কাল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ গাছে তসর-কীট বা গুটি আছে। তসর-কীট বড় হইলে ইহাদের বিষ্ঠা প্রায় গোলমরিচের মত দেখায়; জলে ভিজিলে এই গুলি আরও ফুলিয়া যায় ও বড় দেখায়।

তসর কীটের শত্রু

তসর কীটগুলি গাছের ডালে ছাড়িয়া দিবার পর আর তেমন যত্ন লইতে হয় না; তবে ইহাদের অনেক স্বাভাবিক শত্রু আছে। ইন্দুর, বাদুর, টিকটিকি, বোল্‌তা, ভ্রমর, কাক, পিপীলিকা, মাছি প্রভৃতি ইহাদের স্বাভাবিক শত্রু। কীটগুলিকে এই সকল শত্রু

হইতে রক্ষা করা কষ্টকর; তবে ইহারা খাইয়া যাহা থাকে তাহাতেও বেশ দু'পয়সা পাওয়া যায়। সাঁওতাল, কোল, হো প্রভৃতি জাতিরা সাধারণতঃ জঙ্গলে এই পোকা পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে; ইহারা তীর ধনুক হস্তে ঘুরিয়া বেড়ায় ও পাখীগুলি তাড়াইয়া থাকে; একজন লোক এইরূপে অনেক গাছের পোকা রক্ষা করিতে পারে। পিপীলিকা মারিবার একটি সহজ উপায় আছে—নবজাত কীটগুলি গাছে ছাড়িবার পূর্ব্বে গাছের গোড়ায় কিছু খাবার জিনিস রাখিলে বৃক্ষ হইতে যখন পিপীলিকাগুলি নামিয়া আইসে, তখন উহাদিগকে অনায়াসে মারিয়া ফেলা যাইতে পারে। এক রকম মাছি তসর-কীটের উপর ডিম পাড়ে; এই ডিম ফুটিয়া ইহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতঃ উহার মাংসপেশী ও তৈলাক্ত পদার্থ খাইয়া বর্দ্ধিত হয় ও প্রায় ১২।১৩ দিনের মধ্যেই তসর-কীটকে মারিয়া বাহির হয়; ইহার প্রায় ১১।১২ দিন পরে পূর্ণাবয়ব মাছি হইয়া থাকে।

বীজ-তসর-গুটি

ক্রমান্বয়ে ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত এক স্থানের বীজ-গুটি হইতে তসর-পোকা পালন করিলে ইহারা নিস্তেজ হয় ও ইহাদের রোগপ্রবণতা বৃদ্ধি হয়; সুতরাং কোনও দূর দেশ হইতে মধ্যে মধ্যে বীজ-কোষ আনা উচিত; অথবা জঙ্গলে বন্যাবস্থায় তসর-কীট যে গুটি প্রস্তুত করে, এই গুটিগুলি সংগ্রহ করিয়া বীজের জন্য রাখিয়া দেওয়া সঙ্গত; বন্য তসর প্রজাপতি-গুলি বড় ও ভাল জাতীয় হইলে ফল বেশ ভাল হইয়া থাকে। বীজ-তসর-গুটি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া আসার নাম যোয়ার বদল। যোয়ার বদল করিলে কোনও স্থানের নিস্তেজ তসর-কীটও স্থানান্তরে যাইয়া সবল হইয়া থাকে ও বড় বড় তসরগুটি প্রস্তুত করে; নূতন আবহাওয়া পাইলে ইহারা বেশ বৃদ্ধি পায় ও ইহাদের রোগ-প্রবণতাও কম হয়। অনেকে বীজ-কোষ-গুলি স্থানান্তর হইতে আনা কষ্টকর ও ব্যয়-সাধ্য বলিয়া ক্রমান্বয়ে এক স্থানের বীজগুটি হইতেই ডিম লইয়া থাকে; সুতরাং কীট অবস্থায় ইহাদের পোকাগুলি নানা রোগে মারা যায় এবং গুটিও ভাল প্রস্তুত করে না। তসর-শিল্পের অবনতির ইহাও অন্যতম কারণ বলা যাইতে পারে।

তসর পোকার ব্যাধি

অনাবৃষ্টি হইলে তসর-পোকা ভাল বৃদ্ধি পায় না এবং নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়; আবার অনাবৃষ্টির পর হঠাৎ অতিবৃষ্টি হইলেও ইহাদের মহামারী উপস্থিত হয়। বর্ষাকালে তসর-পোকা পালন করাই প্রশস্ত। তসর-পোকা সাধারণতঃ তিন প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়:—(১) রসা, (২) কালশিরা, (৩) কটা।

(১) রসা রোগ:—কয়েকদিন পর্য্যন্ত অতিবৃষ্টি হইলে তসর-কীটগুলি ভিজা পাতা খাইতে বাধ্য হয় এবং ইহাদের শরীর ফুলিয়া গিয়া ১০।১২ দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ রোগের জীবাণু অনুবীক্ষণ-যন্ত্রে ৫০০-৬০০ গুণ বর্দ্ধিত করিলে ৫ হইতে ৭ কোণবিশিষ্ট দেখায়; এই অণুগুলি বহু কোণবিশিষ্ট দানা বিশেষ। প্রজাপতি অবস্থায় এই রোগ দেখা যায় না; এই রোগ পুরুষানুক্রমিক ব্যাধি নহে।

(২) কাল-শিরা রোগ:—তসরকীটগুলি নরম পাতা অভাবে খুব কড়া পাতা এবং ময়লা ও ধূলি-পরিপূর্ণ পাতা খাইলে এই

রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়; অনাবৃষ্টি ও গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃও এই রোগ হইয়া থাকে; নিস্তেজ প্রজাপতির ডিম পালন করিলেও কীটাবস্থায় এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহা এক প্রকার উদরাময় রোগ; এই রোগ হইলে পোকাগুলি ক্ষীণদেহ হয়; কখনও মুখ দিয়া বমি করে এবং কখনও বা ইহাদের বিষ্ঠা পাতলা হয়। এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহারা ৮।১০ দিনের মধ্যেই মারা যায়; এই রোগের জীবাণুগুলি অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে ৫০০-৬০০ গুণ বর্দ্ধিত হইলে খুব ছোট ছোট বিন্দুর মত দেখায়; কখনও বা অনেকগুলি বিন্দু শৃঙ্খলাকারে দেখা যায়; এই রোগ খুব সংক্রামক।

(৩) কটা রোগ :—কটা রোগ এক প্রকার পুরুষানুক্রমিক ব্যাধি; নিস্তেজ কীট পালন করিলে অথবা কোনও কারণবশতঃ কীটগুলি নিস্তেজ হইলে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই রোগ কীট-অবস্থায় হইলে ইহে বা মূলকীটে এবং তৎপরে প্রজাপতিতেও দেখা যায় এবং ডিম প্রসব করিলে ডিমের ভিতর ও তৎপরে ডিম ফুটিলে নবজাত কীটেও পরিলক্ষিত হয়। এই রোগে আক্রান্ত হইলে পোকাগুলি শীঘ্র মরে না বটে, কিন্তু ক্রমেই ইহারা নিস্তেজ হইয়া যায় এবং ৩।৪ পুরুষ পর ইহাদের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হইয়া প্রায় সব পোকাই মারা যায়। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে ৫০০-৬০০ গুণ বর্দ্ধিত করিলে এই রোগের জীবাণুগুলি অনেকটা তিলের মত দেখায়। এই অণুগুলি খুব চাকচিক্যশালী। ডিম প্রসব করিবার সময় প্রত্যেক স্ত্রী-প্রজাপতিগুলি স্বতন্ত্র রাখিয়া ডিম প্রসব করিবার পর প্রত্যেকটী স্ত্রী-প্রজাপতি হইতে একটু রস লইয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষা করতঃ রোগের বীজাণু দৃষ্ট হইলে সব ডিমগুলি নষ্ট করিয়া দিতে হয়। তারপর সুস্থ ও সবল প্রজাপতির ডিম (যে প্রজাপতির রসে রোগের জীবাণু দৃষ্টিগোচর হয় না) রাখিয়া পালন করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

তসর-কীট সম্বন্ধে অথবা এণ্ডি ও গরদ রেশম সম্বন্ধে যদি কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে আমার নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি লিখিলে তাহার সদুত্তর আগ্রহের সহিত দিয়া থাকি। এই প্রবন্ধে আমি অতি সহজ ভাষায় তসর-কীট পালন সম্বন্ধে বলিয়াছি। ভবিষ্যতে তসর-সূত্র-কাটাই ও রঞ্জন-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিবার বাসনা রহিল। তসর-কীটের উপযোগী খাদ্য বৃক্ষ থাকিলে অনায়াসে যে কেহ এই প্রবন্ধ পড়িয়া তসর কীট পালন করিতে পারেন। বলা বাহুল্য যে, তসর-কীট গরদ ও এণ্ডি কীটের ন্যায় গৃহাভ্যন্তরে পালন করা যায় না। আমি গত বৎসর বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রায় ২০০টি তসর-কীট ঘরের মধ্যে পালন করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে ২০টি মাত্র গুটি প্রস্তুত করিয়াছিল। অবশিষ্টগুলি কীটাবস্থায় মারা গিয়াছিল। তসর-কীট খুব বন্যভাবাপন্ন, উঁচু গাছ না হইলে ইহারা তেমন বৃদ্ধি পায় না এবং ঘরের মধ্যে পাতাও ভাল করিয়া খায় না। ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধে এবং চীন-জাপানদেশীয় তসর-কীট-পালন সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমন্মথনাথ দে,
এগ্রিকালচারল কলেজ, পুসা।

বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিদের স্থান *

সাহিত্য মানবহৃদয়ের ভাবসমূহের অভিব্যক্তি। সাহিত্যিকের হৃদয়-কন্দর হইতে যে সুচিন্তা ও উচ্চভাবের প্রস্রবণ নির্গত হয়, তাহারই পুণ্যধারা শুষ্ক সমাজক্ষেত্রের আবর্জ্জনা ও মলিনতা দূর করিয়া তাহাকে উর্ব্বর করিয়া তুলে। তখন সেই উচ্চভাবসমূহের শ্যামলক্ষেত্র শত শত লোককে আনন্দে বিভোর করে, আর ঐ পূতধারাও নিজে অমরত্ব-সাগরে ধাবিত হয়। গ্রন্থকারের নিভৃতকক্ষের নীরব ভাষা তখন স্পষ্ট হইয়া উঠে, আর সেই ভাষা সমাজে ধ্বনিত হইয়া উন্নতভাবগুলিকে কার্য্যে পরিণত করে। তখন সমাজ নূতন শক্তিতে ও নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে নিজের গৌরবময় কার্য্য অঙ্কিত করিয়া উত্তরকালীন জাতিসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সমাজ কাল-সমুদ্রের তীরে যে পদাঙ্ক রাখিয়া যায়, তাহারই অনুসরণ করিয়া কোন মুমূর্ষু সমাজ নবীন প্রাণ পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। তখন সাহিত্য আবার সমাজের সেই ছবি আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেয়। তখন সাহিত্যে সমাজ প্রতিবিম্বিত হয়। তাই আমরা সাহিত্য ও সমাজে ঘাতপ্রতিঘাতের সাড়া পাই। সত্য বটে, সাহিত্যিক উন্নত এবং মঙ্গলময় বিষয়ের দিকে সমাজের চিন্তাধারা প্রবাহিত করিয়া নিজের কর্ত্তব্যসাধন করেন, কিন্তু অপরপক্ষে তিনিও তৎকালীন সমাজের পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া তখনকার সমাজের কার্য্যাবলী দ্বারা অনেকটা অনুপ্রাণিত হন। সেই কারণেই বোধ হয় এলিজাবেথের গৌরবময় কার্য্যসমূহের ফল মিলটন ও সেক্ষপিয়র। তাই আমরা সাহিত্যের মধ্য দিয়া গ্রন্থকারের সমসাময়িক সমাজের চিত্র দেখিতে পাই এবং তিনি সমাজে ভাবের যে উদ্দীপনা আনিয়া দেন, তাহাও দেখিতে পাই। বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিলেও উক্ত সত্য প্রতীয়মান হইবে।

রস সাহিত্যের প্রাণ। রসের অবতারণা না করিলে সাহিত্য জমিয়া উঠে না। আর রসের প্রধান উপকরণ সৌন্দর্য্যবোধ। সৌন্দর্য্যের যতই নাড়াচাড়া হইবে, ততই রস যেন উথলিয়া উঠিবে। রসসৃষ্টি করা সংসারে বহু ভাগ্যবানের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু রস উপভোগ অনুশীলনসাপেক্ষ। ইংরাজীতে একটী কথা আছে—A poet is born and not made. এই কথাটির মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। সৃষ্টিচাতুর্য্য যেন স্বভাবের প্রেরণাতেই হয়, কিন্তু রসোপভোগ সাধনা-সাপেক্ষ। যে সৌন্দর্য্য রসের প্রধান উপকরণ, তাহার সম্যক অনুভূতি না হইলে রসেরও স্ফূর্ত্তি হয় না। সুকোমল দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শায়িত হইয়া রাজা যে সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারেন না, সামান্য কৃষক হয়ত অসম ভূমিতে শয়ন করিয়া তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে। সৌন্দর্য্যবোধে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। সৌন্দর্য্যবোধ যতটা ফুটিয়া উঠে, রসজ্ঞানও তত বাড়িতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও অনেকটা স্ফূর্ত্তি

* মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনের কলিগ্রাম-অধিবেশনে পঠিত।

হয়। সৌন্দর্য্য ত চতুর্দ্দিকেই ছড়ান রহিয়াছে, কিন্তু তাহার উপলব্ধি করিতে হইলে অনুশীলন আবশ্যক। ললিত সাহিত্য সেই অনুশীলনে অনেকটা সহায়তা করে। মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে রসসৃষ্টি ত দূরের কথা, রসানুভবের ক্ষমতাও অতি অল্প। তথাপি সামান্য অনুশীলন করিয়া বৈষ্ণবসাহিত্যের যাহা একটু রসাস্বাদন করিয়াছি, তাহাই আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিব।

যখন বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্র ঘনান্ধকারে আবৃত ছিল, তখন বৈষ্ণব কবিগণই আলোকস্তম্ভরূপে বিরাজ করিয়া এই সংসার-সাগরের কতশত পথভ্রান্ত নাবিককে সুপথ দেখাইয়া গন্তব্যস্থানে লইয়া গিয়াছেন। যখন বঙ্গভাষা মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত, যখন কেবলমাত্র তাহার মুখ ফুটিতেছে, সেই সময়ই বৈষ্ণব কবিগণ মনুষ্যহৃদয়ের বৃত্তিসমূহের যেরূপ সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা আজকালকার এই বয়ঃপ্রাপ্ত বঙ্গভাষায়ও বিরল। তাঁহাদের সাহিত্য, সমালোচনার কষ্টিপাথরে বিশুদ্ধ বলিয়া ত প্রতিপন্ন হইবেই, পরন্তু উহা ভক্তের অমৃত ও জীবনবন্ধু এবং এই কর্ম্মকঠোর সংসারে শান্তির উৎস। তাঁহারা প্রেম ও ভক্তির পুণ্যসলিলসিঞ্চনে পাষাণ প্রাণেও ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত করিয়াছেন, মরুক্ষেত্রেও ওয়েসিসের সৃষ্টি করিয়াছেন, নিদাঘের ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে স্ফটিকের শীতলহার গাঁথিয়া পরাইয়াছেন। তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নিম্নস্তরের সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই নিম্নস্তরের ভাষা না হইলে প্রাণের আবেগ প্রকাশিত হয় না, হৃদয়ের ভাবসমূহের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হয় না। তাই সেই ভাষা মন্থন করিয়া তাঁহারা যে যে পূর্ণরসচন্দ্রের আবির্ভাব করাইয়াছেন, তাহার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে কত পাপী তাপীর হৃদয়ের অন্ধকার দূর হইয়া গিয়াছে—কত হৃদয়সাগর আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্য এবং ধর্ম্মের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহারা মানুষের মধ্য দিয়া ভগবানের স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে চায়। ভগবানকে একটা অচিন্ত্য বিরাট ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর বলিয়া দূরে রাখিতে চাহে না। নিজেদের মধ্যে আনিয়া নিখিল রসমূর্ত্তির আধার সেই পরম প্রেমিককে আপনার জন করিতে চায়। যেখানে যত ভয়, সেইখানে প্রেমের সম্পর্ক ততটা দূর হইয়া যায়। প্রকৃত প্রেমে ভয়ের মাত্রা প্রায় থাকেই না। তাই বৈষ্ণব-কবিরা পিতা, মাতা, সখা, স্বামী, স্ত্রী প্রভৃতির মধ্য দিয়া লীলাময়ের লীলাবিকাশ দেখিতে চান। ইহাতে আমরা প্রেমের আধারকে আপন করিয়া অতি উত্তমরূপে আস্বাদ করিতে পারি। এই জন্যই যখন অর্জ্জুন ভগবানের বিরাটরূপ দর্শন করিলেন, তখনই ভীতচিত্তে বলিলেন—

"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥"

তখন যে বিরাটপুরুষকে হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে বলিয়া তাচ্ছিল্যভাব দেখাইয়াছেন, যাহাকে শয়নে, উপবেশনে, পরিহাসার্থ অবজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট অতি সন্তর্পণে ক্ষমা চাহিতেছেন। কিন্তু ভক্তের নিকট এই মূর্ত্তি ভাল লাগে না, ভক্ত

এই বিরাটরূপে প্রেমের সেই আস্বাদ পান না। তাই বলিতেছেন—

"কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।"

তখন ভগবান্

"ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বম্
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য।"

বলিয়া অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিলেন।

বৈষ্ণব কবিরা এই তত্ত্বই 'মানে' মধুরভাবে দেখাইয়াছেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে একটা constructive element বা গড়িয়া তুলিবার উপাদান আছে। এই ধর্ম্ম, প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া নহে, কিন্তু প্রবৃত্তির অভিব্যক্তিকে ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকতার দিকে লইয়া যাইতে চাহে। স্বভাবকে উপেক্ষা করিয়া একটা অতি-মানবিক আদর্শের অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকিলে তাহার প্রতিক্রিয়া বিপরীত ফলই প্রসব করে। বিষয় ছাড়িয়া বিষয়ীকে ধরিতে যাওয়া, মানুষ ছাড়িয়া মনুষ্যত্বের পশ্চাৎ ধাবনা করা এবং ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া রস গ্রহণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। এই জন্যই বৈষ্ণবেরা ভগবানের অবতারবাদের এত সমাদর করিয়া থাকেন। সত্য বটে, খৃষ্টধর্ম্মও মানুষকে খুব উচ্চস্থান দিয়াছে, Man is made after the image of God—ঈশ্বরের ছাঁচে মানুষ তৈয়ারী। খৃষ্টধর্ম্ম-মতেও ঈশ্বর মানুষের দেহ ধারণ করিয়া মানুষের সম্মান ও আদর বাড়াইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কেবল শান্ত ও দাস্য রসই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব কবিরা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ভাব ত ফুটাইয়াছেনই, কিন্তু তদপেক্ষা যাহা সকল রসের সেরা, যাহাতে সমস্ত রস পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, যাহাতে রস ক্ষীরে পরিণত হইয়াছে, সেই মাধুর্য্যরস এমনভাবে ফুটাইয়াছেন, এমন সূক্ষ্মভাবে তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই মাধুর্য্যে সমস্ত রসের সমাবেশ ত আছেই, তা ছাড়া ইহার নিজের যে একটা বিশেষত্ব আছে, তাহা সকল রসকেই ছাড়াইয়া যায়। তাই চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে—

"গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥"

রায় রামানন্দও বলিয়াছেন—"কান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনই সাধ্যতত্ত্বের অবধি"। প্রেমের একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। আমরা জড়জগতে দেখিতে পাই attraction বা আকর্ষণের প্রভাবেই বস্তুর পরমাণু একত্রিত হইয়া solidএর সৃষ্টি করে, আর repulsion বা বিপ্রকর্ষণের প্রভাবেই বস্তু পরমাণুর পার্থক্য ঘটাইয়া gasএর সৃষ্টি করে। প্রেমেও সেইরূপ দেখিতে পাই। প্রেমের আকর্ষণী শক্তিতে এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের সহিত মিলিত হইতে চায়, এক হইতে চায়। অপর পক্ষে প্রেম হইতে যে যতদূরে চলিয়া যায়, এক হৃদয় হইতে অন্য হৃদয়ের ততই বিপ্রকর্ষণ হয়। এই সত্যের আভাস Shelly তাঁহার Love's philosophyতে অতি মধুর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—

"The fountains mingle with the river,
And the rivers with the ocean.
The winds of heaven mix for ever,
With a sweet emotion.
Nothing in the world is single
All things by a law divine
In one another's being mingle."

মাধুর্য্যের এমন একটা আবেশ আছে যে, তাহার নিকট অন্য সুখ কিছুই লাগে না, তাই ভবভূতি রাম-মুখে কহাইয়াছেন—
"বিনিশ্চেতুং শক্যো সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা প্রবোধ নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মুদঃ ॥ ইত্যাদি।

এই যে প্রেমভাবটা, তাহার বিশ্লেষণ বড়ই জটিল, বিশেষতঃমাধুর্য্য-দিকটা বড়ই রহস্যপূর্ণ। বাস্তবিক প্রেমের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা বড়ই কষ্টকর। ইহা অনেকটা স্বহৃদয়-সংবেদ্য। তাই Thomas A Kempis তাঁহার The Imitation of Christএ বলিয়াছেন—If any man love, he knoweth what is the cry of this voice. আর আমাদের প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস সেই কথাই অমৃতে মাখিয়া বলিয়াছেন—

ভ্রমরা জানয়ে, কমল মাধুরী
তেঁহ সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী
আনে কেহ অপযশ ॥
ধরম করম, লোক চরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর, যাহার মরমে
সেই সে বলিতে পারে ॥
চণ্ডীদাস কহে শুনহ সুন্দরী
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের, রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ তার ॥

এই প্রেমের উৎকর্ষ বলিতে যাইয়া কবি আবার বলিয়াছেন—

বিহি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল 'পি'
রসের সাগর, মন্থন করিতে
তাহে উপজিল 'রী'
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল 'তি'
সকল সুখের, এ তিন আখর
তুলনা দিব যে কি ?

যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই তাহার মনুষ্যত্বও নাই। পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম বিজয়-ডঙ্কা বাজাইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রেম-ধর্ম্মের বিজয়-ডঙ্কা-নিনাদই সর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর ও প্রাণস্পর্শী। চণ্ডীদাস অথবা জ্ঞানদাসের সহিত আমরাও বলিতে পারি —

পিরীতি মূরতি, পিরীতি রতন
যার চিতে উপজিলা।
সে ধনী কতেক, জনমে জনমে
যজ্ঞ করিয়া ছিলা ॥ (চণ্ডীদাস)

সই কি না সে বঁধুর প্রেম।
আঁখি পালটাতে নহে পরতীত
যেন দরিদ্রের হেম ॥ (জ্ঞানদাস)

ইহার একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে একটানা সুখের প্রবাহ নাই। ইহা বড় মধুর, কিন্তু "নিমে সুধা দিয়া, একত্র করিয়া" ইহা প্রস্তুত। সচরাচর ইহা দৃষ্ট হয় যে, প্রেমের আবেগও যত বাড়িয়া যায়, বাধাও তত আসিয়া জুটে। যে পুণ্যধারা সাগরের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রবাহিত হয়, কত শত পর্ব্বত আসিয়া তাহার গতি রোধ করিয়া দাঁড়ায়। তাই কবি বলিয়াছেন—

কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘসিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয় ॥

দুঃখ আসিয়া বৈচিত্র্য আনিয়া না দিলে প্রকৃত প্রেমের রহস্য বুঝা যায় না, for without sorrow none liveth in love. কিন্তু যে বেগময়ী ধারা গিরিশৃঙ্গ হইতে বাহির

হয় তাহার গতি কে রোধ করে? মান, অপমান, জাতি, কুল, শীল সমস্তই উহার নিকট তৃণের স্থায় ভাসিয়া যায়। প্রেমের যে গৈরিকস্রাব নির্গত হয়, উহার মুখে শত শত বাধা-বিঘ্ন পুড়িয়া ছারখার হইয়া উড়িয়া যায়। সত্য বটে, প্রেমের পাত্রের নিকট উহা নিজকে ছোট করিয়া দেয়, for in whatever instance a person seeketh himself there he falleth from love. কিন্তু বাধা আসিয়া যখন উহার পথ রুদ্ধ করে, তখন "Though weary love is not tired, though pressed it is not straitened, though alarmed it is not confounded, but as a lively flame and burning torch, it forces its way upwards and securely passes through all." প্রেমের অগ্নিশিখার চিত্র আমরা বৈষ্ণব কবিদের 'পূর্ব্বরাগ' ও 'বিরহে' দেখিতে পাই

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, রস ভাবমূলক। ভাব-পথেই রসকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবিরা এবং ভক্তগণ নিখিল রসামৃতের রসাস্বাদন করিবার জন্য ব্রহ্ম হইবার আকাঙ্ক্ষাকেও হেয় জ্ঞান করেন, কারণ তাঁহারা হয়ত ঐ সময়ে রসের আস্বাদ পাইবেন। যাহাতে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া তাঁহাকে রসিকভাবে আস্বাদ করা যায়, তাহাই তাঁহাদের স্পৃহনীয়। তাই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

তুলয়ামো লবেণাপি ন স্বর্গং ন পুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

এই রসানুভূতি করিবার জন্যই তাঁহারা দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে বাদ দেন নাই। ইহা মনোবিজ্ঞানসম্মত কথা যে, feeling বা অনুভূতির সহিত দেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যখনই হৃদয়ে একটা ভাবের প্রেরণা আসে, তখনই উহার বিকাশ শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি ভাবকে হৃদয়ে কল্পনা করিয়া লইলেও শরীরে যে তাহার অভিব্যক্তি হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা যাত্রা এবং থিয়েটারে অহরহঃ দেখিতে পাই। শরীরকে বাদ দিয়া কেবল ভাব স্থায়ী হইতে পারে না। যখন আমাদের হৃদয় স্নেহ বা প্রীতির আধারের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন আমরা দূরে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। তখন ইচ্ছা হয় তাহাকে কোলে লই অথবা তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দেই। ইহা ভাবের স্বাভাবিকী গতি। সুতরাং রসস্ফূর্ত্তি হইলে যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণব কবিরা স্বভাবকে উপেক্ষা করিয়া একটা অতি প্রাকৃতিক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তাই তাঁহাদের সাহিত্যে আসঙ্গ-লিপ্সার কথা দেখিতে পাই। কিন্তু এই দেহ কিম্বা ইন্দ্রিয় সমস্তই যে সেই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাহা তাঁহাদের সাহিত্যে পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবৃত্তির ধ্বংসে নহে, পরন্তু প্রবৃত্তিকে শ্রীভগবানের চরণে একান্ত-ভাবে সমর্পণ করাই তাঁহাদের মতে সেবা। প্রেমধর্ম্মী বৈষ্ণবগণ কেবল মন দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা ইচ্ছা করেন না, কিন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবাকেই পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন। কেবল মন দ্বারা যে কৃষ্ণকে ধরিয়া রাখা যায় না, তাহা আমরা বৈষ্ণব কবিদের 'মানে'র চিত্রে বেশ দেখিতে পাই, কারণ কৃষ্ণ চলিয়া গেলে তাঁহাকে পাইবার জন্য রাধিকা আকুল হইলেন আবার কৃষ্ণকে পাইয়াও

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

(চণ্ডীদাস)

তাঁহারা মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় সমস্তই কৃষ্ণপদে ঢালিয়া দিতে চান। তাঁহাদের এই ভাব দেখিয়া গীতার সেই উপদেশ মনে পড়ে—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী
মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং
মৎপরায়ণঃ॥

বৈষ্ণব সাধনার একটী মূলমন্ত্র এই—"পর-ব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।" সংসারে সকল কার্য্যের মাঝে থাকিয়া ভগবানের উপর মন প্রাণ ঢালিয়া দিতে হইবে। ইহাকে তাঁহারা উৎকৃষ্ট পন্থা মনে করেন। সংসারে কার্য্য করিলেও অন্তরে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁহারা একমাত্র আরাধ্য দেবতা বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহার জন্য শত শত বাধাকে বরণ করিতে প্রস্তুত হন, তাই বৈষ্ণব কবি রাধামুখে কহিয়াছেন—

তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যাম বঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয়॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে, এ তনু সেবিনু
চন্দন তুলসী দিয়া॥

এখানে একটী প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া রাখা ভাল। বৈষ্ণব কবিদের সাহিত্য বুঝিতে হইলে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের নিকট "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" তাঁহাদের মত ভক্তির চক্ষে সাহিত্য আলোচনা করিলে অনেক বিষয়, যাহাকে আমরা হয়ত অশ্লীল বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণিত মনে করি, হয়তঃ যাহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট না হইয়া সভ্যতার ধূয়া ধরিয়া যাহাকে দূরে ফেলিয়া দেই, তাহাই আবার নূতন সাজে আমাদের নয়নগোচর হইবে। যাহাকে হয়ত সভ্যতার নিম্নস্তরে স্থান দিয়াছি তাহাই আবার উচ্চ অঙ্গের ভক্তির পরিপোষক বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

ভক্ত না হইয়া তাঁহাদের সাহিত্য বুঝিতে গেলে অনেক সময়ই প্রকৃত রসের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁহারা ভক্তিকেই আধ্যাত্মিকতার উচ্চশিখরে উঠিবার প্রথম সোপান মনে করেন, ভক্তিকেই আশ্রয় করিয়া ক্রমে উচ্চে উঠিতে থাকেন, কারণ ভগবদ্‌-ভক্তির উদয় হইলেই স্বতঃই জ্ঞান ও বৈরাগ্য আসিয়া পড়ে। তাই ভাগবত বলিয়াছেন—

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥

"হে রাজন্ অনুগত হইয়া সাধন ভক্তি দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম আরাধনা করিলে ভক্তের সাধ্যভক্তি, বৈরাগ্য এবং তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হয়। তৎপর তিনি সাক্ষাৎ পরম শান্তি পান। ভগবান্ বলিয়াছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যাশ্চাস্মি
তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

সত্য বটে, গীতাতে অনেকস্থলে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে, কিন্তু এই জ্ঞান সহজ-সাধ্য নহে। ইহা শ্রদ্ধা বা ভক্তিসাপেক্ষ। তাই গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

আর কৃষ্ণাবতার না মানিয়া লইলেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমাভিনয় অস্বাভাবিক বা

অপ্রাকৃতিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। উহা সার্ব্বজনীন ভাব। রাধাকৃষ্ণ-লীলাতে সমস্ত রস যেমন উথলিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যেমন সমস্ত রসের বিশেষতঃ মাধুর্য্যরসের আস্বাদ পাওয়া যায়, এমন আর কোন্ লীলায় পাওয়া যায়? সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিলে অবতারবাদ না মানিয়াও নায়ক-নায়িকার প্রেমাভিনয়রূপে ঐ লীলায় রস অনুভব করিতে পারি। একটু চিন্তা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে যে, সাহিত্যের যা শৃঙ্গার বা আদি ভক্তিতত্ত্বের তাহাই মাধুর্য্য। ভক্তির রস ও সাহিত্যের রস বিভিন্ন জাতীয় নহে। ভক্তি ভগবানকে রসামৃত মূর্ত্তিতেই ভজনা করিতে চাহে, পৃথিবীতে সমস্ত রসই সেই রসসিন্ধুর দিকে ধাবিত। ঐ সমস্ত রসই আবার সাহিত্যের উপাদান, আর রসতত্ত্ব মাধুর্য্যকে যেমন শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে, সাহিত্যও তেমনি আদি রসকে উচ্চতম আসন দিয়াছে। যিনি যাহাই বলুন আদিরসকে বাদ দিলে সাহিত্য নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, বাসন্তী পূর্ণিমা রজনী চন্দ্র ব্যতীত উপভোগ করাও যা আর আদিরস বাদ দিয়া সাহিত্যের রস ভোগ করাও তা। তাই অনেক সময় মাধুর্য্য শৃঙ্গারের মত দেখায়। কিন্তু আদিতে কামের গন্ধ থাকে বলিয়া মাধুর্য্যকেও সঙ্গে সঙ্গে বাদ দিলে চলিবে না। অনুরাগ উভয়ের জনক, কিন্তু প্রেম ও কাম উভয়েই স্বতন্ত্র। সাগর মন্থন করিয়া গরল ও অমৃত দুই-ই উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু অমৃতই স্পৃহনীয় আর গরল ত্যাজ্য। হীরক ও কয়লা মূলতঃ এক হইলেও উহাদের প্রকৃতির আকাশ পাতাল পার্থক্য। যে অরণিকে আশ্রয় করিয়া অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আবার ধ্বংস না করিলে অগ্নির ঔজ্জ্বল্য প্রকটিত হয় না। ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া প্রেমোদ্ভব হইলেও ইন্দ্রিয়লালসাকে না পুড়াইলে প্রেমাগ্নি-শিখাও স্পষ্ট অনুভূত হয় না। বৈষ্ণবেরাও কাম ও প্রেমের পার্থক্য করিয়া বলিয়াছেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
—চরিতামৃত।

জ্ঞানাদি দ্বারাও সত্যে উপনীত হওয়া যায় বটে, কিন্তু উহা বহু আয়াসসাধ্য। হৃদয় পূর্ব্বে পবিত্র না হইলে জ্ঞানের অধিকারী হয় না। কিন্তু জ্ঞানী-মূর্খ, পুরুষ-স্ত্রী সকলেই ভক্তির অধিকারী। এ বিষয়ে গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপ-
যোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং
গতিম্॥

এই কথাই আবার ভক্তিপ্রাণ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বং ঋষিত্বং বাঽসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন ব্রতং ন বহুজ্ঞতা॥

মুকুন্দের ভক্তিতে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব দেবত্বং, ঋষিত্ব, ব্রত, ও বহুদর্শিতা সকলই অনাবশ্যক; কারণ আবার ভগবানই আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।

যেহেতু প্রবৃত্তিপথে এই ভক্তিরস আস্বাদন করিতে পারা যায় এবং সকলেই এ বিষয়ে

অধিকারী হইতে পারে। বৈষ্ণব কবিরা ভক্তি বা মাধুর্য্যরস দ্বারা সেই নিখিলরসামৃতের মূর্ত্তি ভজনা করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি সৌন্দর্য্যের নাড়াচাড়া করিলে রসের আবির্ভাব হয়, সেই জন্য বৈষ্ণবেরা ভগবানকে পরমসুন্দররূপেই অঙ্কিত করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যানুভব অনুরাগের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। সৌন্দর্য্যানুভব আবার রূপগত ও গুণগত। পরিব্রাজকাচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ও 'ভক্তিরসায়নে' প্রেমের পূর্ব্বাপর দশপ্রকার অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া "হরিগুণশ্রুতি"বা ভগবানের গুণশ্রবণ দ্বারা যে তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতি তাহার পর 'রত্যঙ্কুরোৎপত্তি" বা চিত্তের দ্রবীভাবজনিত প্রেমের উৎপত্তির স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনেক সময় রূপের সৌন্দর্য্য থাকিলেও গুণসৌন্দর্য্যের অভাবে প্রেম আসে না। কিন্তু যে পুণ্যবান রূপ ও গুণের কেন্দ্রস্বরূপ, যাঁহার মুখে জ্ঞানের সৌম্যমূর্ত্তি এবং রূপের প্রভা পরস্পর প্রতিযোগিতা করিতে থাকে, তিনি লোকমাত্রেরই হৃদয়ের যে অধিকারী হইবেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে ভগবানের রূপগত এবং গুণগত সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই বলিয়াই আমাদের হৃদয় এত দ্রবীভূত হয় এবং সেই গুণাধারের দিকে আকৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণব কবিদের সাহিত্য বুঝিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ বিশ্লেষণ আবশ্যক বলিয়া ঐ সমস্ত কথা বলিলাম। এক্ষণে তাঁহারা মাধুর্য্যরসের স্বরূপ কি ভাবে ব্যক্ত করিয়া তাহার আস্বাদন করিয়াছেন এবং আমাদিগকে করাইতেছেন তাহাই দেখাইবার প্রয়াস করিব।

বৈষ্ণব কবিরা মাধুর্য্যরসের বিকাশ মোটামুটি হিসাবে চারিটি দিক দিয়া দেখাইয়াছেন। প্রথম 'পূর্ব্বরাগ', দ্বিতীয় 'মান', তৃতীয় 'বিরহ' ও চতুর্থ 'মিলন'। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাসের নামই উল্লেখযোগ্য। এই কয়জন কবিকে আশ্রয় করিয়া অনেক বৈষ্ণব কবিই অমৃত বর্ষণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই কয়জনের কাব্য আলোচনা করিলে মোটামুটি সকলেরই আলোচনা করা হইবে; কারণ মূলে প্রতিপাদ্য বিষয় সকলেরই এক। আমি এই বিষয় সামান্যভাবে আলোচনা করিব। সুধীবৃন্দ মূলগ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে ইহার রস সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, জয়দেব সংস্কৃতভাষায় "গীতগোবিন্দ" লিখিলেও তিনি বৈষ্ণব কবিদের আদিগুরু এবং তাঁহার সংস্কৃত অনেকটা বাঙ্গালার ছাঁচে ঢালা বলিয়া তাঁহার সাহিত্যেরও আলোচনা করিব।

বহুদিন পূর্ব্বে যখন গৌড় যবনকবলিত হয় নাই, যখন হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী গৌড়ে উড্ডীন হইতেছিল সেই সময় জয়দেব কেন্দবিল্বগ্রামে বসিয়া মধুর পদাবলীর সুতানে 'অজয়ে' উজান বহাইয়াছিলেন, তাই বুঝি ভক্তাধীন ভগবান তাঁহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া "দেহি পদপল্লবমুদারম্" লিখিয়া গিয়াছিলেন। ভাষামাধুর্য্যে ও ছন্দের পারিপাট্যে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে যে গীতিকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের অন্য কাব্যে দুর্লভ। তিনি যে প্রেমামৃত-প্রস্রবণের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিলেন সেই পূতধারার পথ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ বিস্তৃত করিয়া অনেক মরুহৃদয় শান্তিবারিতে অভিষিক্ত করিয়া প্রেমের হিল্লোল সৃষ্টি করিয়াছেন। 'গীতগোবিন্দ'-রচনার পর

তাঁহার কাব্যপ্রভা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং গুজরাট হইতে বঙ্গের শেষ পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রদেশ তাঁহার পদাবলীতে মুখরিত হইল, আর সেই পরমপ্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের মুখে তাঁহার "কোমলকান্ত পদাবলী" বঙ্গদেশে অমৃতের বন্যা সৃজন করিয়াছিল। জয়দেব সত্যই বলিয়াছেন—

"যদি হরিপদস্মরণে সফলং মনঃ।
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্॥"

জয়দেব বসন্ত বর্ণন আরম্ভ করিলেন, যখন প্রকৃতি ফল-ফুলে সুশোভিত হইয়া, কোকিলের কুহুতানে ও জ্যোৎস্নার মাধুর্য্যে হ্লাদিনী শক্তির আভাস দিতেছিল, তখন সাক্ষাৎ হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা রাধারাণী পরম-সৌন্দর্য্যাধার শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিকাশের সহায়তা করিবার জন্য তাঁহার অনুরাগিণী হইলেন, এই "জয়দেবভণিতমুদয়তি হরিচরণ-স্মৃতিসারম্" এই সৌন্দর্য্যই ভগবানের দিকে লইয়া যায়। জয়দেব বসন্তবর্ণনা দ্বারা "পূর্ব্ব-রাগ" জন্মাইলেন, আর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কৃষ্ণ-দর্শন অথবা কৃষ্ণনাম-শ্রবণে ঐ অনুরাগের সূচনা করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সৌন্দর্য্য-বোধই অনুরাগ বা প্রেমের কারণ। তবে চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের এই অনুরাগ-সৃষ্টির পার্থক্য বোধ হয়, বিদ্যাপতি প্রভৃতি রূপগত সৌন্দর্য্য হইতে অনুরাগের সৃষ্টি করিলেন, তাই আমরা দেখিতে পাই—

কি কহব রে সখি কানুক রূপ
কো পতিয়াব স্বপন স্বরূপ। (চণ্ডীদাস)
রাই কেন বা এমন হৈলা।
কি রূপ দেখিয়া আইলা। (জ্ঞানদাস)

তখন হইতেই প্রেমাগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতে আরম্ভ করিল। তখন হইতে রাধিকার সেই চঞ্চলতা নাই, মনের সে শান্তি নাই।

তখন সাঙন ঘন সম ঝুরু দুনয়ান।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
তখন সোণার বরণ তনু।
কাজর ভৈ গেল জনু॥
অরুণ অধর বান্ধুলী ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতূর তুল॥

রাধিকা তখন "বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল," শরীর ক্ষীণ হইল "অঙ্গুল অঙ্গুরী বলয়া" হইল। কৃষ্ণকামা কৃষ্ণভাবে পাগলিনী সাজিলেন।

কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধিকা প্রথম হইতেই পাগলিনী, তাই তিনি পাগল হইয়া বলিতেছেন—

কে বা শুনাইল সখি সেই নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সখি তারে॥

এখানে প্রথমে দর্শন নাই, কিন্তু রাধিকা নামেই এমন মাধুর্য্য অনুভব করিলেন যে, নাম শুনিয়াই শ্যামকে পাইবার জন্য আকুল হইলেন। এইখানে কবি বোধ হয় ভগবদ-নুরাগ হইতে মানবানুরাগের পার্থক্য বুঝাইতে চাহিয়াছেন। মানবে অনুরাগ সাধারণতঃ রূপ অথবা গুণের সৌন্দর্য্য-বোধ হইতেই হয়। কেবলমাত্র নাম শুনিয়া অনুরাগ শুধু ভগবানেই সম্ভবে।

এই পাগলিনী তখন

সদাই ধ্যানে, চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নতারা।

বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে
যেমন যোগিনী পারা ॥
* * *
নিজ করোপর, রাখিয়া কপোল
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটি নয়নে, বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা ॥

রাধিকার এই ঐকান্তিক টানে ভগবান বাঁধা পড়িলেন, তাই সখীগণ বলিতেছেন—

ধনি ধনি রমণি, জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর ॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বনকারী
মঝু মনে লাগল ধন্দা ॥

এইখানে এইটুকু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বিদ্যাপতিতে রাধিকার অনুরাগের (অপর পক্ষে ভক্তের ভগবানের প্রতি অনুরাগের) একটা ক্রমবিকাশ দেখিতে পাই। সরলা নবনায়িকা নবনায়কের সহিত মিলিত হইতে হইলে প্রণয়কে কি ভাবে ব্যক্ত করে, কবি তাহাই দেখাইয়াছেন; তাই আমরা রাধার মুখে শুনিতে পাই—

না জানি প্রেমের নাহি রতি রঙ্গ।
কেমনে মিলিব ধনি সুপুরুখ অঙ্গ ॥
বচন চাতুরী হাম কিছু নাই জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জনিয়ে মান ॥

সেই জন্য সখীগণ তাঁহাকে শিখাইয়া দিতেছেন—

যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পানি।
মৌন ধরবি কিছু না কহব বাণী ॥
যব পিয়ে ধরি বলে নেয় নিজ পাশ।
নহি নহি বোলবি গদ গদ ভাষ ॥

পূর্ব্বরাগের এই চিত্র দেখাইলাম। এক্ষণে বৈষ্ণব কবিগণ 'মানে'র ভিতর দিয়া কি ভাবে প্রেমের অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন, এবং ভগবানের দীনতা ভক্তের নিকট কতটা প্রস্ফুত হইতে পারে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

মানের ভিতর দিয়া নায়ক-নায়িকার প্রণয় ফুটিয়া উঠে। ইহাকে অবলম্বন করিয়া নায়ক আপনার অভিমান ত্যাগ করিতে পারেন, আর নায়িকার মানভঙ্গ করিয়া মানের গৌরব বাড়াইতে পারেন। এই জন্য নায়কনায়িকার নিকট এই ভাব বড়ই মধুর।

কৃষ্ণের চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাওয়া অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব কবিরা এই মানের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রেমের এটা স্বাভাবিক রীতি যে, প্রেমিক অন্যকে প্রেমের অংশী করিতে চাহে না। অন্যকে অংশ দিতে দেখিলেই প্রণয়ী বা প্রণয়িনী মান করিয়া বসে। এই ভাবটি ভতৃহরি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

প্রভাতবাতাহতকম্পিতাকৃতিঃ
কুমুদ্বতীরেণুপিশঙ্গবিগ্রহম্।
নিরাশভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী
ন মানিনীশং সহতেঽন্যসঙ্গমম্ ॥

যদিও রাধিকা কৃষ্ণকে পাইবার জন্য একান্ত লালায়িত, তথাপি কৃষ্ণকে অন্যাসক্ত জানিয়া অভিমান করিয়া বসিলেন। বিদ্যাপতি এই উপলক্ষে স্ত্রীচরিত্র বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া একস্থানে অতি অল্পকথায় অনেকখানি ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—

তোহারি কেশ, কুসুম, তৃণ, তাম্বুল
ধরলহি রাইকো আগে।
কোপে কমলমুখী, পালটিয়া না হেরই
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে ॥

রাধিকার সম্মুখে এই কেশ, কুসুম, তৃণ ও তাম্বুল ধরার মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত আছে। কৃষ্ণ যেন অনুনয় করিয়া বলিতেছেন—"অপরাধ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য কেশমুণ্ডনে প্রস্তুত আছি, ক্ষমা করিয়া অনুরাগপ্রেরিত কুসুম গ্রহণ কর, দন্তে তৃণ করিয়া বলিতেছি আর এইরূপ করিব না। আমার প্রণয়ের ও তোমার ক্ষমার নিদর্শনস্বরূপ এই তাম্বুল গ্রহণ কর।"

রাধিকা কিন্তু গুরু মান করিয়াছেন তাই বলিতেছেন—

আর না দেখিব, ও কাল মুখ
ওখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যথা, মনের মানুষ
যেখানে মন যে টানে॥
হরি, হরি, যাহি যাহি মাধব
যাহি কেশব বদ কৈতব বাদম্॥

এই রসের উপযুক্ত আস্বাদিকা সখীরা আসিয়া একটু ভয়ও দেখাইয়া রাধিকাকে বুঝাইতেছেন—

সুন্দরি, ইথে কি মনোরথ পূর।
যাচিত রতন, তেজি পুনঃ মঙ্গল
সো মিলব অতি দূর॥
কোকিল নাদ, শ্রবণে যব শুনবি
তব কাঁহা রাখবি মান।
কোটী কুসুম শর, হিয়া পর বরিখব
তব কৈছে ধরবি পরাণ॥

* * *

মানিনি, হাম কহিয়ে তুয়া লাগি।
নহে নিকটে পাই, যে জন বঞ্চয়ে
তাকর বড়ই অভাগি॥
দিনকর বঁধু, কমল সব জানয়ে
জল তেহি জীবন হোয়।
পঙ্কবিহীন তনু, ভানু শুখায়ত
জলহি পচায়ত সোয়॥
নহে সমীপে, সুখদ যত বৈভব
অনুকূল হোয়ত যোই।
তাকর বিরহে, সকল সুখ সম্পদ
ক্ষণে দগধই সোই॥

(জ্ঞানদাস)

মানিনীর মান যখন তাহাতেও ভাঙ্গিল না তখন কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। প্রেমের বিচিত্র রীতি এই যে যাচিত মান ফিরাইয়া দিলেও প্রেমিকা আবার তাহারই জন্য কাঁদিতে বসেন, তাই রাধিকা বলিতেছেন—

আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর, নটবর শেখর
কাঁহা সখি করল পয়ান॥
তপবরত কত, করু দিন যামিনী
যো কানু নাহি পায়।
হেন অমূল ধন, মঝু পদে গড়ায়ল
কোপে মুঞি ঠেলিনু পায়॥

(চণ্ডীদাস)

রাধিকা এই সময়ে বড়ই ফাঁপরে পড়িয়াছেন। যাঁহাকে কটুকথা বলিয়া বিদায় দিয়াছেন, তাঁহার নিকট আবার কি করিয়াই বা যান। কেবল দীর্ঘনিশ্বাসে সখীগণকে মনোভাব জানাইতেছেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন রাধিকার মন একটু নরম হইয়াছে, তখন সাহস করিয়া বলিলেন "ত্বমসি মম ভূষণম্, ত্বমসি মম জীবনম্।" কিন্তু তখনও কৃষ্ণ কেবল চরণস্পর্শেরই সাধ করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন,—

অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে।
সোণা শতগুণ হৈয়া কাহে নাহি তোষে॥
সে চরণ ধূলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরসাদ॥

তখন 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বলিয়া চরণ স্পর্শ করিতে গেলেন।

কথিত আছে যে, সাক্ষাৎ ভগবান আসিয়া ঐ পদটি পূরণ করেন।

ঘটনা সত্য কি মিথ্যা মীমাংসা করিবার জন্য আমাদের প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় দরকার নাই, তবে এ কথা অন্তত মানিতে পারি যে, ভক্তাধীন হরি ভক্তের নিকট নিজেকে কতদূর নিম্নগামী করাইতে পারেন তাহা জয়দেবের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহার লেখনী হইতে বাহির করিয়াছেন। ভগবদ্‌ভক্তের লক্ষণে কথিত হইয়াছে।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

'আপনি আচরি প্রভু ভক্তকে' শিখাইলেন যে, প্রকৃত প্রেমিক হইতে হইলে এমনই দীন হইতে হয়—ভালবাসার পাত্রের নিকট এমন করিয়াই মান অপমান ত্যাগ করিয়া স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। এই দীনভাব একদিন নিত্যানন্দ প্রভুও দেখাইয়াছিলেন। জগাই মাধাইএর মার খাইয়াও তাহাদেরই উপকারার্থ যাচিয়া নাম বিলাইয়াছিলেন। আর পাশ্চাত্যদেশে যীশুও এই দীনতার কথা বলিতে যাইয়া কহিয়াছেন—"যদি তোমার একগালে চড় দেয় তবে তাহাকে অন্য গাল পাতিয়া দিও।" প্রেমের এইরূপ আদর্শ না হইলে কি সংসারে প্রকৃত জয় হয়। সত্য বটে, এই জয়ে অস্ত্রের ঝনঝনা, কামানের গর্জ্জন, আর্ত্তের মর্ম্মভেদী ক্রন্দন, সবলের অত্যাচার কিছুই নাই—আছে কেবল দীনতা, শান্তি, প্রেমাশ্রু আর স্বার্থত্যাগ। কিন্তু এই জয়ই প্রকৃত জয়। যীশুকে লক্ষ্য করিয়া যিনি একদিন জগৎ জয় করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই বীরাগ্রণ্য নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তাঁহার জীবন-সূর্য্যের অস্তোন্মুখ সময়ে নাকি বলিয়াছিলেন আমাদের জয়ের মূল্য কি? আমি যাহা জয় করিলাম তাহার চিহ্ন আমার জীবনেই লোপ পাইল। তিনিই (যীশু খৃষ্ট) প্রকৃত জয়ী, যাঁহার জয়-ডঙ্কা মৃত্যুর পরেও বাজিতেছে, আর যাঁহার রাজ্য দিন দিনই বিস্তৃত হইতেছে।" এই প্রেমেরই টানে পড়িয়া যখন যীশুখৃষ্ট ক্রুশে নিহত হইতেছিলেন তখনও বলিতেছিলেন,—"Father, forgive them for they know not what they are doing." পিতঃ তাহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ তাহারা জানেনা তাহারা কি করিতেছে। বৈষ্ণব কবিরা সাহস করিয়া পরম আরাধ্যদেবতার ভক্তের জন্য যে এতখানি দীনতা দেখাইয়াছেন তাহা দেখিলে বড়ই চমৎকৃত হইতে হয়। বোধ হয় আর কোন সাহিত্যেই এমন করিয়া ভগবানের দীনতা দেখান হয় নাই।

এক্ষণে বৈষ্ণব কবিরা "বিরহে" মাধুর্য্যরস কেমন করিয়া আস্বাদ করিয়াছেন, তাহাই দেখাইব।

এই সংসার বৈচিত্র্যময়। বিচিত্রতায় জ্ঞানের বিকাশ। ইহা পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানসম্মত কথা যে continual consciousness is no consciousness at all. এই জন্য যে সমস্ত জীব কেবল অন্ধকারেই থাকে, তাহারা অন্ধকার কি জিনিস তাহা বুঝিতে পারে না; অথবা যাহারা কেবল আলোকেই থাকে, তাহারা আলোক কি জিনিস তাহা বুঝিতে পারে না। বিপরীত জ্ঞান দ্বারা বস্তুর প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব। এই সত্যই আবার বিখ্যাত জর্ম্মাণ দার্শনিক পণ্ডিত হিগেল তাঁহার Thesis, Antethesis and

Synthesis দিয়া বুঝাইতে প্রয়াস করিয়াছেন, এবং তাহা দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই জগতে সুখের পর দুঃখ, আনন্দের পর বিষাদ অনিবার্য্য। এখানে একটানা কিছুই নাই। প্রবল ঝটিকাময়ী অমাবস্যা রজনীর পর সূর্য্যালোকদীপ্ত প্রভাত, প্রকৃতি সৌন্দর্য্য-ধ্বংসকারী শীতঋতুর পর কোকিলমলয়-জ্যোৎস্নাযুক্ত বসন্তের মাধুরী অহরহ দেখিতেছি। এই জগতে No rose without a thorn—no sunshine without a shade. কিন্তু এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়াই আমরা পরস্পরকে আস্বাদ করিতে পারি। বৈষ্ণব কবিরা এই সত্যই "বিরহে" এমন মোহন ঝঙ্কার দিয়া বাজাইয়াছেন যে, জগতের অন্য সাহিত্যে বোধ হয় এমন সুতান আর শুনিতে পাইব না। এই বিরহানল প্রেম-হেমকে পুড়াইয়া জগৎসমক্ষে আরও উজ্জল করিয়াছে। তাঁহারা যে করুণ ভাষায় এই বিরহগীতি গাহিয়াছেন তাহাতে পাষাণহৃদয়ও ফাটিয়া প্রেমাশ্রুপতন করে। বৈষ্ণব কাব্যের পাঠক মূলগ্রন্থ হইতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাইবেন। কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি বলিব ঠিক করিতে পারিতেছি না। প্রত্যেকটিই যেন এক একটি অমৃতের টুকরা। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন অবলম্বন করিয়া এই বিরহগীতি আরম্ভ। রাধিকার এই সময়ের চিত্র বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে গৌরবর্ণা রাধিকা কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার

অঙ্গুলক আঙুটী, সো ভেল বাহটী
হার ভেল অতি ভার।

'ভরা বাদর মাহ ভাদরে'

তাঁহার মন্দির শূন্য হইয়াছে, ডাহুক ডাহুকীর রবে, ময়ূরের নৃত্যে তাঁহার প্রাণ আকুল হইতেছে। আবার বসন্তের কুহুরবে মেঘের গর্জ্জন ভাবিয়া তিনি জৈমিনী স্মরণ করিতেছেন, নীলনলিনের মালাকে সর্প ভাবিয়া গরুড় স্মরণ করিতেছেন। তাঁহার "দিনে দিনে ক্ষীণ তনু, হিমে কমলিনী জনু" "চাঁদচন্দন তনু, অধিক উতাপই"। কে জানিত যে তাঁহার এই দশা হইবে, তাই বিদ্যাপতি বলিতেছেন—

হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি, কণ্ঠ শুকায়ব
কে দূর করিব পিয়াসা।
চন্দন তরু যব, সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব, নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন, কিছু না বরিখব
সুরতরু ঝাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধরসেবি, ঠাম নাহি পায়ব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে॥

এই ভাবটি যে কি মধুর তাহা কাব্যামোদী মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

দিন গুণিতে গুণিতে অনেক দিনই কাটিয়া গেল, কিন্তু কৃষ্ণ ফিরিলেন না। রাধার আর শরীর ধারণে ইচ্ছা নাই, সেই জন্য বলিতেছেন—

"মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।"

কিন্তু আবার মরিতেও ইচ্ছা হইতেছে না। কেন? নিজের জন্য নহে, কিন্তু প্রিয়তমের জন্য। তিনি যদি মরিয়া যান তবে কানুর যত্ন কে করিবে। তাই পর মুহূর্ত্তেই বলিতেছেন—

কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব?

পরে বলিতেছেন আর যদি মৃত্যুই হয় তবু

"না পুড়াইও রাধা অঙ্গ, না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরি ডালে॥
সোইত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরল তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহু সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে॥"

অনেক দিন ধরিয়াই তিনি বঁধুর জন্য দিন কাটাইলেন। তাঁহার

"পহু নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল।"
দিবস লখিতে লখ গেল।
দিবস দিবস করি, মাস বরিখ গেল
বরিখে বরিখ কত ভেল॥

শেষ তাঁহার অন্তিম দশা আরম্ভ হইল, তাই চণ্ডীদাস বলিতেছেন—

কালিন্দী পুলিনে, কমলের শেজে
রাখিয়া রাইএর দেহ।
কোন সখী অঙ্গে, লিখে শ্যাম নাম
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ॥
কেহ কহে চোর, বঁধুয়া আসিল
সে কথা শুনিয়া কানে।
মেলিয়া নয়ন, চৌদিশ নেহারে
দেখিয়া না সহে প্রাণে।
যখন হইনু, যমুনার পার
দেখিনু সখিরা মেলি।
যমুনার জলে, রাখে অন্তর্জলে
রাই দেহ হরি বলি॥

এই বিষয়ে অধিক উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের আর ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। এক্ষণে বৈষ্ণব কবিরা 'মিলনে' প্রেমের যে বিকাশ দেখাইয়াছেন তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আমরা 'বিরহে' দেখিতে পাইলাম রাধিকার প্রাণের আবেগের প্রাবল্য কতদূর। এই প্রেমের টানে পরমপ্রেমিক প্রাণবল্লভ কি স্থির থাকিতে পারেন? তাই এখন রাধিকার 'কুদিন সুদিন' হইল। তাঁহার বাম আঁখি স্পন্দিত হইতেছে, প্রভাতে কাক 'কোলাকুলি' করিয়া 'আহার' বাটিয়া খাইতেছে, 'পিয়া আসিবার নাম সুধাইতে' উড়িয়া বসিতেছে—

মুখের তাম্বুল, খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল
চণ্ডীদাস কহে, সব সুলক্ষণ
বিহি ভেল অনুকূল।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, ঐ বর্ণনা হইতে আমরা বঙ্গীয় সমাজের রীতিনীতির নক্সা দেখিতে পাই।

আজ শ্রীমতীর শীতের ওড়নী পিয়া গিরীষির বা (গ্রীষ্মের বাতাস), বরিষার ছত্র, পিয়া দরিয়ার না (নৌকা) আসিয়াছে, 'কমলিনী মধুপ' এবং চকোর চাঁদ পাইয়াছে। তাঁহার আর আনন্দ ধরে না, তাই স্ত্রীস্বভাবোচিত চরিত্রে সাধ করিতেছেন—

বঁধুয়া আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া
মিলব আমার পাশে।
তুরিতে দেখিয়া, চকিত উঠিয়া
বদন ঝাঁপিব বাসে॥
তা দেখি নাগর, রসের সাগর
আঁচরে ধরিবে মোর।
করে কর ধরি, গদগদ করি,
কহিবে বচন থোর।
তখন সময় জানিয়া, থির মানিয়া
পুরাব মনের আশ॥

আজ আর রাধিকা পূর্ব্বকষ্টের কথা মনে আনিতে চাহেন না। নিজে যে এতকাল বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন তাহা ভুলিয়া প্রাণনাথকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল,
মথুরা নগরে ছিলেত ভাল ॥
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥

আজ তিনি "জীবন যৌবন সফল" করিয়া মানিলেন। যাহারা বিরহে কষ্ট দিতেছিল তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন—

সোহ কোকিলা অবলাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব, লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥
(বিদ্যাপতি)

চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগণে উদয় হউক চন্দ ॥

আজ তাঁহার অভিমান ভাসিয়া গিয়াছে। প্রাণনাথের প্রেমের নিকট মান অপমান সব । কত বলিবার থাকিলেও যেন আবেগে কিছুই বলিতে পারিতেছেন না, তাই বলিতেছেন—

বঁধু আর কি বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে
প্রাণ-নাথ হৈও তুমি ॥
বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোমাকে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতে রসেতে, ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি
মন নাহি আন তায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোক
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥
সতী বা অসতী তোমার বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি ॥
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণ খানি ॥

* * *

শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটী, হয় শত কোটী
সকলি করিবা ক্ষমা ॥
না ঠেলিও বলে, অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, তোহা বঁধু বিনে
আর কেহ নাহি মোর ॥

এমন অনাত্মোন্মুখী প্রেম, এমন একান্ত নির্ভরতা, এমন স্বার্থত্যাগ, এমন বিনীত নিবেদনের চিত্র যে জগতের অন্য কোন কবি এমন সুন্দররূপে আঁকিতে পারিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। তাই ভগবান, যিনি উপদেশ দিয়াছেন —

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্য মোচয়িষ্যামি মা শুচ ॥

নিজের কথায় নিজে বাঁধা পড়িয়া হ্লাদিনী শক্তির সহিত মিলিত হইলেন। তাই আজ প্রেমময়ের লীলাসহায়ক হ্লাদিনী শক্তির মান বাড়াইয়া পরম প্রেমিক ভগবান বলিতেছেন—

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়নতারা।

কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন
কিশোরী গলার হারা ॥
রাধে, তিন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া, ও রাঙ্গা চরণে
শরণ লইনু আমি ॥
শয়নে স্বপনে, ঘুমে জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত, করিয়ে মিনতি
সকলি করিবা ক্ষমা ॥

আমাদের এই শুষ্কহৃদয়ে প্রেম নাই, হৃদয় বড়ই কর্কশ। রাধিকার মত প্রেম না হইলে ত ভগবানকে পাওয়া যায় না। তাই প্রার্থনা করি ভগবান্ তোমার করুণা যাহা "মূকং করোতি বাচালম্। পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।" এই দীনজনে কৃপা কর, যেন হৃদয় তোমার প্রেমে পুলকিত হইয়া তোমার প্রেমময় লীলা-বৈচিত্র্য আস্বাদ করিয়া তোমার দিকে আকৃষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণশশী গোস্বামী এম্ এ, বি এল্ ।

আয়ুর্ব্বেদে মৌলিক তত্ত্ব

মদীয় কোন প্রবন্ধে ত্রিদোষ বা বায়ু-পিত্ত-কফের বিষয় উল্লেখকালে বলিয়াছিলাম,—"সৃষ্টপদার্থের মৃত্তিকাদি প্রধান পাঁচটি মূল উপাদান মধ্যে মরুৎ, অগ্নি ও অপ্ দেহে অবস্থান্তরিত হইয়া "ত্রিদোষ" বা বায়ু-পিত্ত-কফ নামে অভিহিত হয়।" *

এই মৃত্তিকাদি পঞ্চ পদার্থের মধ্যে মরুৎ, অগ্নি ও অপ্ অবস্থান্তরিত হইয়া দেহে অবস্থান করিলেও উক্ত পঞ্চ পদার্থের সহিত দেহের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। সে কারণ পঞ্চ মহাভূত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল।

প্রাচীন আর্য্যগণের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও আকাশ এই পাঁচটি মূলপদার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্ ও জনসাধারণ অনেকেই এই পদার্থপঞ্চকে মূলপদার্থ স্বীকার না করিয়া যৌগিক বলিয়া প্রচার করেন। বাস্তবিক এগুলি মৌলিক কি যৌগিক তাহা সুধী আচার্য্যগণ স্থির করিবেন। তবে ইহাদের মৌলিকত্ব-প্রচারে যে সকল শাস্ত্রীয় যুক্তি পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা বর্ত্তমান কালের স্বীকৃত এই যৌগিকগুলি মৌলিকত্বের কিছু দাবী করিতে পারে কি না তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

মহাভূত বা মূল পদার্থ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

মহাভূতানি খং বায়ুরগ্নিরাপঃ ক্ষিতিস্তথা।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ ॥
চঃ, শা, ১ম অঃ।

অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই পাঁচটি মহাপদার্থ; ইহাদের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রে এমন কথা কোথাও নাই যে, এই পাঁচটি পদার্থ প্রত্যেকে একটি মাত্র দ্রব্য, ইহাতে অন্য কোনও পদার্থের সম্মিলন নাই। বরং শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

* উপাসনা, ১৩১৮ সাল, আশ্বিন সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

তেষামেকগুণঃ পূর্ব্বো গুণবৃদ্ধিঃ পরে পরে।
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো গুণশ্চৈব ক্রমশো গুণিষু স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে আকাশের একটি গুণ (শব্দ), কিন্তু পর পর ভূতে ক্রমশঃ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। মাত্র গুণ নহে, সেই অনুপাতে পূর্ব্ব ভূতসমূহও পরবর্ত্তী ভূতে ক্রমশঃ মিশ্রিত হইয়া বায়ুতে দুইটি দ্রব্য এবং শব্দ ও স্পর্শ দুই গুণ; তেজে আকাশ ও বায়ু সংমিশ্রণে তিন দ্রব্য এবং শব্দাদি তিনটি গুণ; অপে আকাশ, বায়ু ও তেজ মিশ্রিত হইয়া চারি দ্রব্য এবং শব্দাদি চারিটি গুণ এবং ক্ষিতিতে আকাশাদি চারি দ্রব্যের সংমিশ্রণে পঞ্চ দ্রব্য ও শব্দাদি পঞ্চ গুণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এখানে একটি প্রশ্ন করা যাইতে পারে—যখন আকাশ ব্যতীত বায়ু প্রভৃতি চারি পদার্থেই দুই বা ততোধিক পদার্থ মিশ্রিত রহিয়াছে, তখন শাস্ত্রকারগণ ইহাদিগকে মিশ্র-পদার্থ না বলিয়া মূলপদার্থ বলিবেন কেন?

এ প্রশ্নের সমাধান করিবার পূর্ব্বে মূল-পদার্থ কাহাকে বলে নির্ণয় করা আবশ্যক।

মূল শব্দের একটি অর্থ আদি; তাহা হইলে মূল-পদার্থ বলিলে আদি-পদার্থ বুঝা যাইতেছে। বাস্তবিক চিন্তা করিলে প্রতীতি হইবে জগতের প্রথম সৃষ্ট এই আকাশাদি পঞ্চ পদার্থ। সে কারণ শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

অক্ষরাৎ খং ততো বায়ুস্তস্মাৎ তেজঃ
ততো জলম্।
উদকাৎ পৃথিবী জাতা ভূতানামেষ সম্ভবঃ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আকাশ তদনন্তর ক্রমশঃ বায়ু, তেজ, জল ও মৃত্তিকার উৎপত্তি হইয়াছে। এই মৃত্তিকা-সৃষ্টির পর উদ্ভিদ, প্রাণী, ধাতু, যাহা কিছু বল, সৃষ্ট হইয়াছে।

যদি সৃষ্টির প্রথমোৎপন্ন বলিয়াই এই পাঁচটি আদি বা মূল-পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে পাঁচটি স্বীকার না করিয়া একমাত্র আকাশকে মূল-পদার্থ বলাই কর্ত্তব্য।

তাহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় আর্য্যগণ বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই আকাশাদি পঞ্চ পদার্থের সমবায়ে জগতের ইতর পদার্থ সমুদয়ের অবয়ব গঠিত হয়; ইহাদের সমবায় ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থের অবয়ব গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এই পাঁচটি অন্যান্য পদার্থ হইতে এ বিষয়ে কিছু স্বতন্ত্র; যেমন জলে মৃত্তিকার কোন অংশ নাই, তেজে জলের কোন অংশ নাই ইত্যাদি। সে কারণ তাঁহারা সাধারণ পদার্থসমূহ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন, সৃষ্টির প্রথমোৎপন্ন এবং সৃষ্ট পদার্থের অবয়ব-গঠনের মূলস্বরূপ এই পদার্থ-পঞ্চকে আদি বা মূল-পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এক্ষণে বলা আবশ্যক, ভারতীয় মনীষিগণ ক্ষিত্যাদি পঞ্চ পদার্থকে সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহ সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত সম্বন্ধে প্রয়োজ্য। এই স্থূল বায়ু, তাপ, জল ও মৃত্তিকায় আকাশ, বায়ু, তাপাদি ব্যতীত আরও বহুবিধ দ্রব্যের সমাবেশ রহিয়াছে, তাহা জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিগণের বুদ্ধির অতীত বিষয় ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

তাঁহারা সূক্ষ্ম অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র মহাভূতের শব্দাদি পাঁচটি মাত্র গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যখন উক্ত সূক্ষ্ম পদার্থ-পঞ্চ পরস্পর হীনাধিক্য ভাবে মিশ্রীভূত এবং পরস্পর সংমিশ্রণে আরও বহুবিধ উপাদান সংগ্রহ পূর্ব্বক এই স্থূল—আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে, তখন

তাহাদের স্থূলতা-প্রাপ্তির সহিত উক্ত শব্দাদি পঞ্চ গুণ ব্যতীত গুরু, লঘু, উষ্ণ, শীত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, স্থির, সর, মৃদু, কঠিন প্রভৃতি আরও অতিরিক্ত বিংশতি গুণের সমাবেশ হইয়াছে।

সুতরাং বুঝিতে পারা গেল প্রাচীন মতে যে কয়টি আদিম পদার্থের উপকরণে জগতের পদার্থসমূহ গঠিত হইতেছে অর্থাৎ যাহাদের সমবায় ব্যতীত চেতন-অচেতন কোন পদার্থেরই অবয়ব গঠিত হইতে পারে না, তাহারাই (পদার্থসমূহের অবয়ব-গঠনের মূল বলিয়া) মূল পদার্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। *

উক্ত পঞ্চ পদার্থ সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত হইলেও স্থূল পঞ্চ পদার্থই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনার বিষয়ীভূত। যেহেতু এই স্থূল ক্ষিত্যাদি পঞ্চ পদার্থ হইতেই জড়জগতের স্থূল পদার্থনিচয়ের উপাদানসমূহ সংগৃহীত হইয়া থাকে এবং এই কারণে এই পাঁচটিও মহাভূত অর্থাৎ মূল পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

এই পঞ্চ পদার্থের সমবায়, জগতের চেতনাচেতন সমুদয় পদার্থের মূল উপাদান বলিলে, কি জীবদেহ, কি ধাতুসমূহ, কি উদ্ভিদাদি সকলেরই মূল উপাদান ইহাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। যদি তাহাই হয়, তবে পদার্থে এই উপাদানসমূহ কিরূপ ভাবে সংগৃহীত হইয়া থাকে?

এক্ষণে যে উপায়ে উপাদান সংগৃহীত হয় বলা যাইতেছে।

বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি দেখা যায়; কিন্তু বীজ মৃত্তিকায় উপ্ত না হইলে কখন বৃক্ষ জন্মে না। তাহার পর জল, তাপ এবং বায়ুর প্রয়োজন; আকাশ অর্থাৎ অবকাশ না থাকিলেও বৃক্ষের উৎপত্তি অথবা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে ইহাদের কোন একটির অভাব ঘটিলে বীজের কার্য্যশক্তি দেখা যাইবে না। এইরূপে বীজ ভূগর্ভ হইতে মৃত্তিকাদি পঞ্চ পদার্থের বিকার রস-আকারে গ্রহণ করিয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। বৃক্ষ পুনরায় মূল দ্বারা পাঞ্চভৌতিক রস আকর্ষণ করিয়া স্বীয় বৃদ্ধি, পুষ্টি ও স্থিতি লাভ করে। তাহার পর উৎপন্ন বৃক্ষে মৃত্তিকাদির কোনও অংশ পাওয়া যায় কি না স্থির করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ মৃত্তিকাদির গুরু, লঘু প্রভৃতি গুণসমূহ নির্ণয় করিয়াছেন, এবং উৎপন্ন উদ্ভিদে উক্ত গুণরাশি উপলব্ধি করিয়া মৃত্তিকাদির অংশসমূহ নির্ণয় করিয়াছেন।

সৃষ্টির প্রথমোৎপন্ন মৃত্তিকাদি পদার্থ-পঞ্চের স্ব স্ব গুণরাশি যখন পরবর্ত্তী উদ্ভিদাদি পদার্থে লক্ষিত হইতেছে, তখন তাহাতে গুণাশ্রয়ী পূর্ব্ববর্ত্তী মৃত্তিকাদি দ্রব্যেরও অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতেছে। কারণ দ্রব্য ব্যতীত গুণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর নহে।

গুরু, খর, কঠিন, স্থূল, গন্ধ প্রভৃতি গুণ-সমূহ মৃত্তিকায় বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সকল গুণ হইতে পদার্থের উপচয়, গুরুত্ব, স্থৈর্য্য, কাঠিন্য প্রভৃতি সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং উদ্ভিদের উপচয়, কাঠিন্য, গুরুত্ব প্রভৃতি মৃত্তিকার বিকার হইতে সংগৃহীত বুঝিতে হইবে।

দ্রব, স্নিগ্ধ, শীত, মৃদু প্রভৃতি গুণ জলে

* প্রাচীন মতে বলার উদ্দেশ্য বর্ত্তমানকালে আচার্য্যগণ মৌলিকের ভিন্ন প্রকার লক্ষণ স্থির করিয়াছেন এবং প্রচারিত লক্ষণ সাহায্যে প্রাচীন মহাভূত সমূহকে মৌলিক স্বীকার না করিয়া যৌগিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষণ প্রয়োজন-সাপেক্ষ; প্রয়োজন বোধে প্রাচীন মহর্ষিগণ উপরোক্ত নিয়মে মিশ্রীভূত মৃত্তিকা-জলাদিকেও মূল বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

বিশেষ ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এই সমুদয় গুণ হইতে পদার্থের ক্লিন্নতা, শৈত্য, স্নিগ্ধতা, মৃদুতা প্রভৃতি সম্পাদিত হয়। সুতরাং জলের অংশ হইতে উৎপন্ন উদ্ভিদের উক্ত অংশসমূহ পূরণ হইয়া থাকে। এইরূপে তেজের গুণ উষ্ণ, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, রূপ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন উদ্ভিদাদি পদার্থের তাপ, তৈক্ষ্ণ্য, প্রভা, বর্ণ প্রভৃতি এবং বায়বীয় ও আকাশাত্মক লঘু, সূক্ষ্ম, চল, মৃদু প্রভৃতি গুণসমূহ হইতে উদ্ভিদাদি পদার্থসমূহের লঘুতা, রৌক্ষ্য, মৃদুতা, পরমাণু প্রভৃতি সম্পাদিত হয়।

মৃত্তিকাদি পঞ্চপদার্থের সমবায়ে পদার্থ সকল গঠিত হইলেও সকল পদার্থে ইহাদের পরিমাণ সমান ভাবে থাকে না। এই কারণেই পদার্থ সকল পরস্পর বিভিন্ন-গুণাকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

উদ্ভিদের মধ্যে শাল, সেগুন, পনস প্রভৃতি বৃক্ষসমূহকে অতিশয় সংহতাবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রকার কদলী বিবিধ প্রকার লতা ও শাক জাতীয় উদ্ভিদ্ সকল অতিশয় সরস; চিত্রক, শূরণ, মান জাতীয় উদ্ভিদ্ সকল অতিশয় তীক্ষ্ণ ও দাহকর; শোভাঞ্জন, পেঁপে প্রভৃতি বৃক্ষগুলি অতিশয় লঘু, মৃদু ও ছিদ্র-বহুল দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চভূতের হীনাধিক্য সমাবেশই এই পার্থক্যের কারণ।

তাহার পর ধাতুতে মৃত্তিকাদির কোন অংশ পাওয়া যায় কি না দেখা যাউক।

অস্মদ্দেশীয় আর্য্যগণ, প্রস্তর কিম্বা কঠিনতম মৃত্তিকা ও তাপ-রসাদির বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণে বিবিধ বর্ণ ও গুণাকৃতিসম্পন্ন ধাতু-সমূহের উদ্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং ধাতুসমূহে উক্ত মৃত্তিকাদির শব্দাদি পাঁচটি এবং গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষাদি গুণ-সমূহের উপলব্ধি করিয়া এ বিষয়ে গতসন্দেহ হইয়াছিলেন। ধাতুসমূহে বায়বীয় ও আকাশাত্মক অংশ অতীব অল্প মাত্রায় বিদ্যমান হেতু সকল ধাতুই অতিশয় সংহতা-বয়ব এবং গুরুত্বাদি গুণবিশিষ্ট। যে ধাতুতে যত অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা ও তেজের অংশ বিদ্যমান আছে, তাহা সেই অনুপাতে অন্য ধাতু অপেক্ষা উজ্জ্বল ও গুরুত্বাদি গুণসম্পন্ন দেখা যায়। ধাতুসমূহ মধ্যে স্বর্ণে এই দুইটি পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যমান হেতু ইহা অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা অধিক পরিমাণে গুরু, উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণাদি গুণসম্পন্ন; এবং সেই কারণেই স্বর্ণ অন্য ধাতু অপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেহের পুষ্টি, বল, কান্তি, দীপ্তি সম্পাদনে সমর্থ; ইহা ব্যবহারের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে।

আরও একটি বিচার্য্য বিষয় এই যে, ধাতু-সমূহ যখন মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ-সংমিশ্র ভূগর্ভেই সৃষ্ট হয়, তখন তাহাতে ইহাদের কোনও অংশ নাই, ইহা কি সম্ভবপর?

যদিও বর্ত্তমানপ্রচারিত কোন যন্ত্রবিশেষে স্বর্ণাদি ধাতু হইতে এ কাল পর্য্যন্ত মৃত্তিকাদির কোনও অংশ আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু ভবিষ্যতে কখন হইতে পারে না এরূপ কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ যন্ত্রের চরম আবিষ্কার হইয়াছে এ কথা কেহ বলেন না।

অতঃপর পঞ্চভূত সমবায়ে জীবদেহ কিরূপে গঠিত হইতেছে, বলা যাইতেছে। জীবগণ দেহরক্ষার্থ খাদ্য গ্রহণ করে; এই খাদ্য উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহ উভয় পদার্থ হইতেই সংগৃহীত হয়।

উদ্ভিদেরা যে উপায়ে ভূগর্ভ হইতে মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জীবগণ খাদ্যরূপে উদ্ভিদ্ হইতে উক্ত পাঞ্চভৌতিক রস লাভ করিয়া

থাকে। সিংহ-ব্যাঘ্রাদি মাংসভোজী প্রাণীরা উদ্ভিদ্‌ভোজী প্রাণী হইতে মৃত্তিকাদির অংশ-সমূহ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

মানবগণ এইরূপে কতক উদ্ভিদ্ হইতে কতক প্রাণীদেহ হইতে কতক বা ব্যবহৃত ধাতুসমূহ হইতে এই সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও স্থিতি লাভ করে।

জীবগণের উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহ হইতে সংগৃহীত খাদ্য পরিপাক হইয়া প্রথমতঃ রস ধাতুরূপে পরিণত হয়। শরীরের স্নিগ্ধতা, শৈত্য ও পোষণাদি কার্য্যান্তে খাদ্যের প্রথম পরিণতি রস-ধাতুর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সারাংশ হইতে রক্তের উৎপত্তি হয়। এইরূপে প্রতি ধাতুর কার্য্যান্তে অবশিষ্টের সারাংশ হইতে ক্রমশঃ মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা; তদনন্তর পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধাতু শুক্র এবং নারীর রজ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আহার্য্য পদার্থের সারাংশ হইতে উৎপন্ন এই সপ্ত পদার্থ জীবগণের দেহ ধারণের প্রধান উপযোগী হেতু, আয়ুর্ব্বেদ ইহাদের ধাতু আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

এইরূপে আকর্ষিত মৃত্তিকাদি পঞ্চ আদি-পদার্থের অংশসমূহই উদ্ভিদ্ হইতে ক্রমে জীবদেহে সঞ্চারিত হইয়া দেহ-গঠনের বীজ "শুক্র ও রজ" রূপে পরিণত হইতেছে।

যে পঞ্চ মহাভূতের সমবেত বিকার উদ্ভিদ্, ধাতু ও জীবসমূহের অবয়ব, পুষ্টি, বৃদ্ধি ও স্থিতির মূলস্বরূপ হইতেছে; তাহাদিগকে মৌলিক বলা যুক্তিসঙ্গত নহে কি?

শ্রীজীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন।

দণ্ডবিধি আইন ও প্রায়শ্চিত্ত *

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বৌধায়ন, কাত্যায়ন, হারিত, প্রভৃতি ব্যবস্থাপকগণ হিন্দুদিগের জ্ঞানাজ্ঞান-কৃত পাপমোচনার্থ কতকগুলি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এগুলি একই সময়ে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সামাজিক অবস্থা-ভেদে, তৎতৎকৃত দণ্ডবিধিরও তারতম্য হইয়াছে। ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণভাবে সেই ব্যবস্থাগুলি দ্বারা পরিচালিত না হইলেও, কোন হিন্দু তাঁহাদের উপদিষ্ট ব্যবস্থাগুলির কখনই অমর্য্যাদা করেন নাই। এই সকল ব্যবস্থাপকগণের মতানুপোষকের সমষ্টি লইয়া হিন্দুসমাজে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এই সম্প্রদায়গুলির আচার-ব্যবহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় সর্ব্বতো-ভাবে একরূপ হইতে পারে নাই। একরূপ না হইলেও, তাঁহাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে মূলতঃ ঐক্য থাকায় তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বৈরী-ভাব নাই, বরং সখ্যই আছে, সহানুভূতিও আছে—নাই কেবল, কন্যাআদানপ্রদান এবং অন্নভোজন। ধর্ম্মগত পার্থক্য তাঁহাদের মধ্যে কিছুই নাই, ধর্ম্মচর্য্যার ক্রমের কিছু কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু এই পার্থক্য তাঁহাদের জাতীয় সম্মিলনের পক্ষে কখনই প্রতিষেধক হইতে পারে নাই। বিধি-ব্যবস্থা-গুলি একই মহৎ উদ্দেশ্যে উপদিষ্ট,—অর্থাৎ পাপের দমন ও ক্ষালন। বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত দণ্ডবিধি আইনের সহিত এই ব্যবস্থাগুলির তুলনা করিলে, স্পষ্টই

* 'ব্রাহ্মণ সমাজ' হইতে উদ্ধৃত।

প্রতীয়মান হয় যে, ইংরাজ ব্যবস্থাপকগণ মনুষ্য সমাজের হিতার্থ ও তাহার উন্নতি-বিধানার্থ, কেবলমাত্র তাহাদের পার্থিব দুঃখ-মোচনেই বদ্ধপরিকর; কিন্তু তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরিণামে সদ্গতির চিন্তা তাঁহারা একেবারেই করেন নাই। সুতরাং সমাজবিশেষের ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। অপর পক্ষে, হিন্দুব্যবস্থাপকগণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ মনুষ্য কেবলমাত্র সমাজের প্রতি বা সমাজস্থ ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি সাধু ব্যবহার করিলেই যে তাহার দায়িত্ব কাটিয়া গেল তাহা নহে। যাঁহারা মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া বিধাতার মঙ্গল-ময়ী সৃষ্টি সার্থক করিতে চাহেন, অগ্নিস্বরূপ পরমাত্মার অংশীভূত স্ফুলিঙ্গ বলিয়া, জীবাত্মার চরম পরিণতি—পরমাত্মলাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাঁহারা আত্মার ক্রমোন্নতি করিতে বাধ্য; না করিলে প্রত্যবায়ী, সুতরাং দণ্ডার্হ হইবেন। হিন্দুর প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে, প্রতি পদে পদেই তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিলে এখন আর হিন্দু ব্যবস্থাপক-গণের বিধানমত দণ্ড গ্রহণ করিতে হয় না। কাল-মাহাত্ম্যে মনুষ্যের মতি-গতির এবং বৈষয়িক অবস্থার এমনই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, তত্তৎপাপের ক্ষালন জন্য প্রাচীনকালের বিধানগুলি বর্ত্তমান কালের পক্ষে ঠিক উপযোগী না হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তদ্বারা সেগুলি এস্থলে দেখাইয়া দেওয়া সমীচিন বোধ না হওয়ায়, উল্লেখ করা গেল না। ফলতঃ সেই প্রাচীন ব্যবস্থা মতে এক্ষণে দণ্ড বিধান করিতে হইলে, বর্ত্তমান সমাজ উচ্ছৃঙ্খলভাব ধারণ করিত। কার্য্য-নিবারণার্থ রাজদণ্ডের বিধান থাকিলেও, আমি যদি কোন প্রকার কুৎসিত আচরণদ্বারা নিজের অনিষ্ট চেষ্টা করি, বর্ত্তমান আইনানুসারে আমি দণ্ডনীয় হই না। এক-মাত্র আত্মহত্যার চেষ্টায় ও ভ্রূণহত্যায় আমাদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। আত্মহত্যার চেষ্টায় দণ্ড আছে, আত্মহত্যা-কার্য্য সম্পন্ন হইলে, কোন দণ্ডই নাই। হিন্দু ব্যবস্থাপকগণ কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টায় এবং আত্মহত্যায় পৃথক্ পৃথক্ পাপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; এবং প্রথম অপরাধটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টির দণ্ডবিধান আরও কঠোরতর করিয়া গিয়াছেন। আত্মঘাতীর মৃতদেহ অস্পৃশ্য এবং অদাহ্য এবং তাহার আত্মার সদ্গতিলাভ সুদূরপরাহত। এইরূপে সংসারে কতপ্রকার কুৎসিৎ আচরণদ্বারা আমরা স্ব স্ব অনিষ্টোৎপাদন করিয়াছি, তাহার সীমা নাই। সেই সমস্ত কার্য্যের জন্য আমাদের রাজদণ্ডের ভয় নাই; সুতরাং দণ্ডাভাবে, এরূপ অপরাধ নিত্যই হইতেছে এবং অপরাধের সংখ্যাও নিত্যই বাড়িতেছে। পূর্ব্বে এই সমস্ত অপরাধ করিতে লোকে শঙ্কা বোধ করিত এবং করিবার প্রলোভন বড়ই প্রবল হইলে সংগোপনে করিত। ক্রমে অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, তাহাদিগকে এই সমস্ত অকার্য্যকরণকালে আর সঙ্কুচিত হইতে হয় না, গোপন করিবারও আবশ্যক হয় না। এই সকল অপরাধের জন্য রাজপুরুষদিগের নিকট তাহারা কিছুমাত্র দায়ী নহে। রাজপুরুষগণ ব্যতীত আর একটি যে শাসক-সম্প্রদায় আছে, তাহা তাহারা বিস্মৃত হয়। বিস্মৃত হইবারই কথা। যাহার শক্তি নাই, তাহার অস্তিত্বে অনেকেই সন্দিহান হয়।

আমাদের সমাজ এখন কতকটা শক্তিহীন। সুতরাং "সমাজ" বলিয়া যে কোন শাসক-সম্প্রদায় আছে, তাহা অনেকের মনে উদয় হয় না। যাঁহার ধর্ম্ম-ভয় আছে, তাঁহারই সমাজ-ভয় আছে; যাহার ধর্ম্ম-ভয় নাই, তাহার সমাজ-ভয় থাকিতে পারে না। যাহাদিগের সমাজ-ভয় নাই, তাহাদিগের প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। যাঁহারা এখনও সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান, তাঁহাদিগের জন্যই এই প্রবন্ধ। তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, যে সমস্ত অপরাধের জন্য আমরা রাজ-পুরুষদিগের নিকটে দায়ী নহি, সে সমস্তের জন্যে ঈশ্বরের নিকট, অন্ততঃ স্ব স্ব সমাজের নিকট আমরা দায়ী। তাঁহাদিগকে আরও স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, সমাজই মনুষ্যকে সংযত রাখে, সমাজই মনুষ্যকে সুপথে চালিত করে, এবং সমাজের উৎসাহ-বাক্যেই মনুষ্য উন্নতির পথে ধাবিত হয়। সমাজ পাপকারীর দণ্ডবিধানে সক্ষম। এককালে ইহার ক্ষমতা অপরিসীম ছিল। অনেক সমাজ সম্পূর্ণ শক্তিহীন হইয়াছে বটে; কিন্তু হিন্দুসমাজ দুর্ব্বল, হীনতেজ ও ক্ষীয়মান হইলেও, ইহার ক্ষমতা অদ্যাপি একেবারে লোপ পায় নাই। কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিকে হিন্দুসমাজ একেবারে ত্যাগ করিতে চাহে না; তাহাকে সংশোধন করিয়া পুনরায় সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে চায়। চৌর্য্যাপরাধে, দণ্ডবিধি আইনে কারাদণ্ড, বা অর্থদণ্ড বা উভয় প্রকার দণ্ডই ব্যবস্থা। অপরাধী ব্যক্তির অপরাধের মাত্রানুসারে এই দণ্ডের হ্রাসবৃদ্ধি হয়; এবং এইরূপ দণ্ড অপরাধীর চরিত্র-সংশোধন এবং তত্তৎসমাজস্থ অন্যান্য লোকেরও শিক্ষার কারণ হয়। রাজদণ্ড ব্যতীত সমাজ রক্ষা হয় না। অতি প্রাচীনকালেও রাজদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইয়াছে।—

"অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা
দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥"

প্রাচীন ব্যবস্থামতে রাজদণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে আর পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত না; কিন্তু সে দণ্ড অতি কঠোর ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি—অশীতিরতি সুবর্ণচুরির দণ্ড "রাজ-কর্ত্তৃক মুষলাঘাতে মরণ"। বর্ত্তমান দণ্ডবিধি আইনে ইহার জন্য কয়েক মাস কারাবাসমাত্র ব্যবস্থা। সুতরাং বর্ত্তমান আইনমত দণ্ড গ্রহণ করিলেও, অপরাধী ব্যক্তি সমাজে ব্যবহার্য্য হয় না। রাজদণ্ডের পর, তাহাকে আবার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

যাহাতে অপরাধীর মন ও আত্মা কলুষিত না থাকে, সেইজন্যই এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। অনুরোধ, উপরোধ-কৃত প্রায়শ্চিত্ত,—প্রায়শ্চিত্তই নহে। স্বপ্রণোদিত হইয়া এবং উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট স্বকীয় অপরাধ পূর্ণ-ভাবে ব্যক্ত করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইতে হয়; এবং সাধারণকে জানাইবার জন্য পূর্ব্ব-দিবসে মস্তক মুণ্ডন করিয়া এবং অনুতাপের চিহ্নস্বরূপ পূর্ণ সংযমী থাকিয়া, তৎপর দিবসে শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। রাজ-দণ্ডের দ্বারা তাহার ঐহিক মঙ্গলের কারণ হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্তদ্বারা তাহার পারত্রিক মঙ্গলেরও বিধান হইল। এইরূপ করিলে সমাজ অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ একেবারে বিস্মৃত হয়, এবং তাহাকে সমাদরে ক্রোড়ে স্থান দেয়। কিন্তু আজকাল দেখিতে পাই, রাজদণ্ডের পর আর প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠে না। তাহার ফল এই যে, চোরের "চোর" নাম আজন্ম ঘুচে না, সমাজেও তাহার কস্মিন্ কালে প্রতিপত্তি লাভ হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজের দণ্ডবিধি আইনের "গণ্ডীপার" হইয়া, তুমি যাহা কিছু কর না কেন, তোমাকে দণ্ড দিবার এক্ষণে আর কেহই নাই। তুমি সত্য ভুলিয়া যাও, পিতামাতাকে দাস্যবৃত্তিতে নিযুক্ত রাখ, শৌণ্ডিকালয়ে বাস কর, অখাদ্য পান ভোজন কর, বা পরস্ত্রীর হস্তধারণ করিয়া স্ফূর্ত্তি করিতে করিতে তীর্থদর্শনে বহির্গত হও, তুমি এ সমস্ত কার্য্যের জন্য রাজদ্বারে দণ্ডার্হ নহ। তোমাকে এই উন্মত্তাবস্থা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে কাহার সাধ্য? যদি কেহ পারে তাহা সমাজ। ইহা উচ্ছৃঙ্খল সমাজের কার্য্য নহে; ধর্ম্মহীন সমাজের কার্য্য নহে বা সদ্যপ্রসূত অস্থিমজ্জাহীন সমাজেরও কার্য্য নহে। যে সমাজের প্রাচীন ইতিহাস আছে, যে সমাজে অলোকসামান্য প্রতিভাবিশিষ্ট মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়াছেন, এবং যে সমাজের ভিত্তি মহাপ্রলয়ের মহাবেগেও অটল, সেই সমাজই তোমাকে এই উন্মত্তাবস্থা হইতে রক্ষা করিতে পারে। গুরু অপরাধের গুরু প্রায়শ্চিত্ত এখন একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে এবং তাহার কতকগুলির সম্পাদন বর্ত্তমান আইনে নিষিদ্ধ। সমাজের কারাদণ্ড দিবার অধিকার নাই, তবে অভোজ্যভোজন, বেশ্যাগমন, অসত্যভাষণ, জলে অশুচি দ্রব্য নিক্ষেপণ, ব্রাহ্মণপীড়ন, শূদ্রযাজন প্রভৃতি লঘুতর অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড করিবার অধিকার আছে। ইহাকে আমরা প্রচলিত ভাষায় প্রায়শ্চিত্ত বলি। প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অঙ্গ অনুতাপ, অপরাধ ও ন্যূনতা-স্বীকার, এবং ব্রাহ্মণগণকে কিছু অর্থদান। ব্রাহ্মণকে অর্থদান শুনিয়া চমকিও না। ব্রাহ্মণ অর্থশোষক নহেন, হিন্দুসমাজের মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ডের বলেই হিন্দুসমাজ গঠিত, বর্দ্ধিত ও সমুন্নত। মহাভারত পাঠ কর, পুরাণ পাঠ কর; ব্রাহ্মণের স্বার্থত্যাগ, ব্রাহ্মণের ক্লেশসহিষ্ণুতা, ব্রাহ্মণের পরোপকারিতা, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপ্রবণতা ও ব্রাহ্মণের আত্মবিসর্জ্জনের শতসহস্র জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ দেখিতে পাইবে। তাই ব্যবস্থাপকগণ প্রায়শ্চিত্তজনিত দণ্ডিত অর্থ অন্যকে না দিয়া সমাজরক্ষক ব্রাহ্মণকে বিভাগ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধিকদিনের কথা নহে, পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন এই সমস্ত অপরাধীর সমাজভুক্ত হইয়া থাকা কঠিন হইত। সমাজবহির্ভূত কথাটা অতি গুরুতর। তাহার বাটিতে কেহ অন্নাহার করিবে না, তাহার সহিত কেহ একপংক্তিতে ভোজন করিবে না, কন্যা-পুত্রের বিবাহ দিতে হইলে সে তুল্যবংশ হইতে পাত্রপাত্রী পাইবে না। ইহা অপেক্ষা কঠোর দণ্ড আর কি হইতে পারে? কয়জন ব্যক্তি এই দণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া তৎ-তৎকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু হায়, সমাজ-রক্ষার প্রধান উপায় এই প্রায়শ্চিত্তে এক্ষণে অনাদর। গুরু অপরাধে রাজদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা মনে করে, আইন মত তাহাদের অপরাধের দণ্ড হইয়াছে, আবার সামাজিক দণ্ড কেন গ্রহণ করিব? সামাজিক অপরাধে অপরাধীরা মনে করে সমাজ কে? তাহার ক্ষমতাই বা কি? কতকগুলি ব্যক্তিসমষ্টি লইয়াই সমাজ। এই সমষ্টি হইতে ২।৪ জনকে ফুস্‌লাইয়া লইলেই কার্য্যোদ্ধার। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আপন উন্নত মস্তক অবনত করা অপেক্ষা, সমাজ ভাঙ্গাই তাহারা অধিকতর সুবিধাজনক মনে করে; এবং অর্থদ্বারাই হউক, অনুরোধদ্বারাই হউক, আর প্রলোভনদ্বারাই হউক, সমাজ ভাঙ্গিতে অগ্রসর হয়। সমাজেও কিছু সকল লোক

তুল্যরূপ দৃঢ়চেতা নহেন। সুতরাং ছলে, বলে, কৌশলে তাহারা স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লয়। "স্বকার্য্যমুদ্ধরেদ্ প্রাজ্ঞঃ"। তাই বলিয়া এই সমস্ত সমাজভঙ্গকারী বা তাহাদের সাহায্যকারিগণকে "প্রাজ্ঞ" বলিতে পারি না। তাহাদিগকে সমাজদ্রোহী, মিত্রদ্রোহীও বলিতে পার। তাহাদিগের পরিণামে—

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

তাঁহারা ধর্ম্মের দাস নহেন, অবস্থার দাস। আজ আমার ছেলেটি ম্লেচ্ছান্ন ভোজন করিল অমনি সুর উঠিল, বিপাকে পড়িয়া ম্লেচ্ছান্ন-ভোজনে পাপ নাই। আজ আমার ছেলেটি সুরাপান করিল, অমনি সুর উঠিল, গোপনভাবে সুরাপানে পাপ নাই। এই সকল লোকই প্রায়শ্চিত্তের বিরোধী। ইহাদিগের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিও আছেন; সুতরাং তাঁহাদের অনুচর ও পার্শ্বচরের অভাব হয় না। ইহাদিগের মতে প্রায়শ্চিত্তের অর্থদণ্ড ব্রাহ্মণ-শাসনের স্বার্থপরতার ফল; ইহারা রোড্‌শেস, পবলিক্‌ওয়ার্কশেসের মত ইহাকে একটি "ব্রাহ্মণ-শেস্" বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সমাজে যাঁহারা কিছু মাত্র প্রতিষ্ঠাবান্, সমাজ-রক্ষায় যাঁহারা যত্নশীল, ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণের উন্নতির প্রতি যাঁহাদের আন্তরিক লক্ষ্য, শাস্ত্রানুমোদিত প্রায়শ্চিত্তের প্রতি কোন প্রকারেই তাঁহাদের হতাদর করা উচিত নহে। দ্রব্যবিশেষ আহারে, ব্যক্তিবিশেষের সহবাসে, স্থানবিশেষ গমনে, বিষয়বিশেষের চিন্তায়, আমাদের মনোবৃত্তি কলুষিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিলে, আমাদের শাস্ত্রনিষিদ্ধ পান-ভোজন, ব্যক্তিবিশেষের সহিত সহবাস, স্থানবিশেষে গমন এবং বিষয়বিশেষের চিন্তা অবশ্যই পরিহার্য্য। এবং দণ্ডবিধি আইনের প্রচলন না থাকিলে যেমন মনুষ্যের কুকার্য্যান্বিত হওয়া স্বতঃই সম্ভব, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্তের অপ্রচলনে উপরি-উক্ত নিষিদ্ধ কার্য্যগুলির পরিহার কিরূপে সম্ভবে? অতএব দণ্ডবিধি আইনে যে সমস্ত অপরাধের উল্লেখ আছে, তদতিরিক্ত অপরাধগুলি জনসাধারণের অনিষ্টজনক না হইলেও, সেগুলি অপরাধ,—এবং তাহার নিবারণ জন্য সামাজিক দণ্ডের প্রয়োজন।—

দণ্ডঃ সংরক্ষতে ধর্ম্মং তথৈবার্থং বিধানতঃ।
কামং সংরক্ষতে যস্মাৎ ত্রিবর্গো দণ্ড উচ্যতে॥
রাজদণ্ডভয়াল্লোকাঃ পাপাঃ পাপং ন কুর্ব্বতে।
যমদণ্ডভয়াদেকে পরলোকভয়াৎ তথা॥

(যুক্তি কল্পতরুঃ)

*　　*　　*　　*

মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্বোধন *

[বঙ্গদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে শ্রীহট্ট জেলায় কয়েক-বৎসর হইতে জেলার বিভিন্ন গ্রামের সাহিত্য-সেবিগণ মিলিত হইয়া সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। তাহার পূর্ব্ব হইতেই রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে রঙ্গপুর জেলায় সাহিত্য-সম্মিলন চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি ঢাকা নগরীতে একটি সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ জেলার সাহিত্যসেবিগণকে কথঞ্চিৎ

* অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

মিলনসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। এবার বঙ্গের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে মালদহ জেলার প্রথম সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইল। আশা হইতেছে এই উপায়ে জেলায় জেলায় পল্লীসমূহের সাহিত্য-সেবিগণ সম্মিলিত হইয়া বঙ্গজননীর বাণীমূর্ত্তির সম্যক্ আরাধনার উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

মালদহ জেলার প্রথম সাহিত্য-সম্মিলন সহরে অনুষ্ঠিত হয় নাই—একটি পল্লীগ্রামে হইয়াছে। মফঃস্বলের জীবনবত্তার ইহা প্রকৃষ্ট পরিচয়। নানা স্থান হইতে পল্লীজীবনের নানা অভিব্যক্তি দেখিতে পাইলে দেশবাসিগণ আশান্বিত হইবেন।

গত সাত-আট বৎসরের মধ্যে মালদহ জেলায় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। মালদহের জাতীয় বিদ্যালয়গুলি জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। এই বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রগণকে সহরে আসিয়া পরীক্ষা দিতে হয়। সরকারী শিক্ষাবিভাগের নিয়মে প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের ছাত্রদিগেকে আর সহরে আসিতে হয় না। সুতরাং মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির আয়োজনে জেলার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম প্রান্তের শিক্ষার্থিগণ বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে। তদুপলক্ষে সহরের জাতীয় শিক্ষা-কেন্দ্রে নানা সদুপদেশ প্রচারিত হয়। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-শিষ্যগণ বিদ্যালয়ের অবকাশকালে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, উচ্চতর শিক্ষালাভ এবং বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতা-প্রাপ্তির জন্য সহরে অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে সম্মিলিত হইয়া পঠন-পাঠন করিয়া থাকেন। মালদহে এবার যে সাহিত্য-সম্মিলন হইল তাহা এই ৭।৮ বৎসরের কার্য্যাবলীর একটি সুফল বিশেষ।

এই সম্মিলনে মালদহের সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় কলিগ্রামের মুখপাত্র হইয়া জেলার এবং কলিকাতার নিমন্ত্রিত বন্ধুবর্গকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ আমরা প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে তিনি অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অভি-ভাষণের দুইটি বিষয়ের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। (১) তিনি বলিয়াছেন—দেশের তথাকথিত ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজ অপেক্ষা আমাদের নিম্নশ্রেণী ও অশিক্ষিত জনসাধারণ চরিত্র হিসাবে সত্যসত্যই হীন নহে। আমরা এ কথা বহুবার প্রচার করিয়াছি। পণ্ডিত মহা-শয়ের মুখে এ কথা শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ চোখ খুলিয়া বিচার করিলে দেখিবেন যে, জনসাধারণের চরিত্রশক্তিকে আমরা এতদিন অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি; এই জন্য আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত ও বিব্রত করিতেছে। (২) লোক-সমাজে শিক্ষাপ্রচার সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয় ভারতের প্রকৃত জাতীয় আদর্শ দেখাইয়া দিয়াছেন। এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে অল্প ব্যয়ে, অল্প সরঞ্জামে এবং অল্প সময়ে মানুষ-গড়া প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করা অসম্ভব।

অধ্যাপক শাস্ত্রী মহাশয় চরিত্রবান্ নিষ্ঠাবান্ শিক্ষাপ্রচারক। তিনি সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের নিয়ম পালন করিয়া জীবনযাপন করিয়া থাকেন। অথচ টোল-চতুষ্পাঠীর তথা-কথিত সঙ্কীর্ণতা তাঁহার নাই। তিনি বৌদ্ধ-দর্শনে এবং পালি-সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তিনি নানা স্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং নানা ভাষা-ভাষী ভারতীয় পণ্ডিত-গণের সংশ্রবে আসিয়া তুলনা-মূলক আলোচনা-প্রণালীর ব্যবহারে পটুত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত প্রবন্ধ-গ্রন্থাদির দ্বারা বঙ্গসাহিত্য কথঞ্চিৎ সমৃদ্ধ হইয়াছে। ফলতঃ বঙ্গীয় সুধীজগতে তিনি উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত, আধুনিক জগতের চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তি-পুঞ্জের সহিত পরিচিত থাকিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট।

সুতরাং অধ্যাপক শাস্ত্রী মহাশয় বর্ত্তমান ভারতোপযোগী জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা আমাদের জননায়কগণের

সবিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। আমরা এ সম্বন্ধে সুধীগণের আলোচনা প্রার্থনা করিতেছি।]

আজ পুণ্যাহ। আজ আমরা আমাদের নিখিল মঙ্গলের বিধানকারিণী বিদ্যাদেবীর বিশেষ আরাধনার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি। অতএব আজিকার দিন পবিত্র। আজিকার এই দিন যেন আমাদিগকে অন্তরে বাহিরে, এবং চিত্তে, কর্ম্মে ও বাক্যে পবিত্র করিয়া তুলে। তাই বলিতেছিলাম আমরা সকলেই সমকণ্ঠে উচ্চারণ করি 'পুণ্যাহং, পুণ্যাহং, পুণ্যাহং,।' আমাদের এই কর্ম্মে যেন তাঁহারই অনুগ্রহে মঙ্গল হয়, স্বস্তি হয়। আপনারা সকলেই আশীর্ব্বাদ করুন—'স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি।' আপনারা প্রার্থনা করুন আমাদের এই কার্য্য যেন নির্ব্বিঘ্নে সুচারুভাবে সম্পন্ন হইয়া সমৃদ্ধির জন্য, বৃদ্ধির জন্য, অভ্যুদয়ের জন্য হইতে পারে। আপনারা সকলেই হৃদয়ের সহিত বলুন—"ঋধ্যতাম্, ঋধ্যতাম্, ঋধ্যতাম্।' বিশ্বের অন্তর্য্যামী ভগবান্ এখানে সন্নিহিত আছেন; ভ্রাতৃগণ, আপনারাও উপস্থিত হইয়াছেন; আমাদের যে সকল হিতৈষী বন্ধু নানাকারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারাও হৃদয়ে-হৃদয়ে যেন এখানে উপস্থিত হন। আমরা প্রার্থনা করিতেছি ভগবতী সরস্বতীরই অনুশাসনে যিনি যেরূপে পারেন, তিনি সেইরূপেই কল্যাণ-বৃদ্ধিতে "কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্,"—সকলেই এখানে সন্নিহিত হউন। আমাদের সকলেরই হৃদয় এই অনুষ্ঠানে "শিবসঙ্কল্পমস্তু,"—যাহা শিব—মঙ্গল, আমাদের মন যেন তাহাই সঙ্কল্প করে। "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু"—আমাদের এই আরম্ভ শুভের জন্য হউক।

ভ্রাতৃগণ, কলিগ্রামবাসী আজ এই শুভ-মুহূর্ত্তে বিনয়বচনে ও স্বাগতসম্ভাষণে আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। আপনারা করুণা করিয়া এই উপহৃত অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করিলে তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে। আপনারা যে, তাঁহাদের আহ্বানে কর্ণপাত করিয়া এখানে শুভাগমন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা আন্তরিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এখানে আপনাদের যত্ন ও সেবা-সম্বন্ধে নানা বিষয়ে অসুবিধা ও ত্রুটি হইবে, ইহা আমাদের অবিদিত নাই; তথাপি বন্ধুগণ, আপনারা আমাদের ঘরের লোক, এই মনে করিয়া, এবং সাহিত্যালোচনার জন্য আপনারা কষ্ট স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহেন, নানা স্থানে ইহার পরীক্ষা পাইয়া, আমরা আপনাদিগকে আহ্বান করিতে সাহসী হইয়াছি। আশা করি, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অশক্তি-জাত স্খলনসমূহ ক্ষমা করিবেন।

আপনারা আজ যেখানে পদার্পণ করিয়াছেন, সেখানে এতাদৃশ অনুষ্ঠান এই প্রথম। স্থানীয় লোকের অধিকাংশই ইহাতে অনভ্যস্ত। বিশেষতঃ, অতি সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে আমাদিগকে ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইয়াছে। এ জন্যও নানাদিকে নানারূপ আমাদের ত্রুটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ইহার জন্য আমরা আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। বলা বাহুল্য, এ কার্য্যটি কেবল আমাদের নহে, ইহা সমগ্র মালদহ-বাসীরই। ইহা আপনাদের নিজের কাজ। অতএব নিজের কার্য্যের ত্রুটি আপনারা অবশ্যই সহ্য করিবেন।

বিশেষ আনন্দের আবির্ভাবে সময়ে সময়ে দুঃখ-স্মৃতি উপস্থিত হয়, চিরবিরহিত স্বজন-অন্তরঙ্গের কথা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। বন্ধুগণ, আজ এই আনন্দ-সম্মিলনের দিনে

আমাদের রাধেশচন্দ্রের কথা মুহুর্মুহুঃ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে। আজ জীবিত থাকিলে এই সম্মিলনের আনন্দ তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভব করিতেন। এবং নিশ্চয়ই আমাদের এই বর্ত্তমান সম্মিলন সুন্দরতর হইত। মালদহের সর্ব্বতোমুখ উন্নতি ও গৌরব দেখিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টিত ও উৎসুক হইয়া থাকিতেন। গৌড়ের বিজয়কাহিনী গাহিয়া শিক্ষিত সমাজকে তিনিই আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গৌড়ের নামে তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠিত। তিনি আমাদিগকে বলিতেন যাহাই কেন আমরা অধ্যয়ন বা আলোচনা করি, আমরা গৌড়ের লোক, সব সময়েই গৌড়ের কথা যেন আমাদের মনে থাকে। এ কথা তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেন। গৌড় লইয়াই তিনি জীবন কাটাইয়াছেন। গৌড়-ভূমিতে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনকে তিনিই আহ্বান করেন। তখন তিনি পীড়িত, কিন্তু সে দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া গৌড়বাসীর মান-গৌরব-রক্ষার জন্য ভগ্ন স্বাস্থ্যে রুগ্ন দেহে তিনি কি বিপুল পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা আপনারা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি আর সারিয়া উঠিতে পারিলেন না। সেই অনিয়ম-অত্যাচার তাঁহার মৃত্যুর প্রধান কারণ হইয়া উঠে। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন তাহা যায় নাই, যাইবেও না; গেলে ইহারই মধ্যে চলিয়া যাইত। রাধেশচন্দ্র মালদহের যাহা করিয়াছেন, তাহার ফল আমারা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাই আজ এই আনন্দের দিনে তাঁহার মূর্ত্তি স্মরণপথে উদিত হইতেছে।

বন্ধুগণ, সহসা মালদহে এরূপ একটা সাহিত্য-সম্মিলন কোথা হইতে ফুটিয়া উঠিল এবং তাহার প্রয়োজনই বা কি, এইরূপ প্রশ্ন কাহারো কাহারো হৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছে। মালী যদি তাহার মালঞ্চের অতিক্ষুদ্র তরুটিকে যথাযথরূপে জলসেচনাদি করিয়া সেবা করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই তরুটিই দিনে দিনে বৃদ্ধিলাভ করে, তাহার চারিদিকে শত-শত নব-নব শাখা-প্রশাখা-পল্লব উদ্গত হইতে থাকে, এবং শেষে তাহা পত্রপুষ্পফলে সমৃদ্ধ হইয়া বনস্পতি নাম ধারণ করিয়া নিজের সার্থকতা সম্পাদন করে। মূলদেশেও একটি মাত্র প্রধান মূল হইতে তাহার চারিদিকে কত-শত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মূল বহির্গত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়া কতদূর হইতে রস গ্রহণ করে এবং এইরূপে সেই তরুরাজকে দৃঢ়তর করিয়া তোলে। ইহা স্বাভাবিক। এস্থলে প্রশ্নই হইতে পারে না, সেই অতিক্ষুদ্র তরুটির কেন ঐরূপ নব-নব শাখা-পল্লব-মূলাদি উদ্গত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করে বা তাহাদের কি প্রয়োজন আছে। বটবীজ যদি অনুকূল ভূমিতে রোপিত হইয়া অনুকূল অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাহার এরূপ পরিণতি অবশ্যই হইবে। সে অন্যের অগোচরে মৃত্তিকার মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ মূল বিস্তার করিয়া, চারিদিক হইতেই রস গ্রহণ করিয়া আত্মাভিমুখ করে, এবং বাহিরেও ক্রমশঃ সেই বীজপতন স্থানে আবদ্ধ না থাকিয়া নিজের জটাকলাপে চতুর্দ্দিকের স্থান অধিকার করিয়া ফেলে। ইহা তাহার স্বভাব। কেহ প্রতিকূল হইয়া না দাঁড়াইলে ইহা হইতেই হইবে।

সমুদ্রের মধ্যে কোন স্থানে, যে কোন রূপেই হউক, জল ক্ষুব্ধ-চঞ্চল হইলে সেই আন্দোলনে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তটদেশ পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। এখানে প্রশ্ন

হইতে পারে না, কি প্রয়োজনে ঐরূপ তরঙ্গের পর তরঙ্গ হয়, এবং কেনই বা সেই তরঙ্গ বেলাভূমি পর্য্যন্ত আগমন করে। ইহা নৈসর্গিক নিয়ম।

আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথা। বঙ্গে, ভারতে, অথবা এই সমগ্র ভুবন-ক্ষেত্রে শুভ মুহূর্ত্তে বিশ্বজনীন সাহিত্য-বনস্পতির বীজ রোপিত হইয়াছে, অনুকূল অবস্থায় অঙ্কুরাদিক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ত এখন চতুর্দ্দিকে নব-নব শাখা-প্রশাখা ও জটাকলাপে বিশ্বকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবেই। বিশ্বসাহিত্যার্ণবে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, কল্লোল-বিক্ষেপ ত সুদূর বেলা-ভূমিকে স্পর্শ করিবেই।

বর্ষার নবজলধারাপাতে ভূতল অভিনব বিবিধ উদ্ভিদে শ্যাম তনু ধারণ করিয়া দর্শকের চিত্তে শ্যামসুন্দরের মোহিনী মূর্ত্তি জাগাইয়া দেয়। কোথা হইতে এই উদ্ভিদগুলি আগমন করে? তাহারা কি সহসা উৎপন্ন হয়? তাহাদের বীজগুলি নানা সময়ে বায়ুবিহঙ্গাদি কর্ত্তৃক সমাহৃত হয়, এবং সাধারণ লোক-লোচনের অন্তর্হিত হইয়া অবস্থান করে; কিন্তু তাহাদের অঙ্কুরাদি কার্য্য নৈসর্গিক নিয়মে শনৈঃ শনৈঃ চলিতে থাকে। পরে যখন সেই অঙ্কুরাদি সাধারণ চক্ষুর দর্শনযোগ্য আকার ধারণ করে, অতর্কিতভাবে মানব তখন এক দিন পুরোভাগে তাহা দেখিতে পায়।

বন্ধুগণ, আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনও এইরূপ। সাহিত্যালোচনা নিজের নৈসর্গিক নিয়মেই আজ এখানে এইরূপে আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। ইহা সহসা যদৃচ্ছাক্রমে হয় নাই। সাহিত্যালোচনার যাহা পরিণতি তাহারই ইহা একটি প্রকাশমাত্র। শাখা-পল্লব পত্র-কুসুম যতই প্রভূত হইবে, মনে করিতে হইবে, বৃক্ষ ততই সুদৃঢ় হইতেছে;—তাহার মধ্যে যে অনন্ত শক্তি অন্তর্হিত হইয়া রহিয়াছে শনৈঃ শনৈঃ তাহাই প্রকাশিত হইতেছে। ইহা কল্যাণের লক্ষণ। বসন্তের মলয়-মারুত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিলে শিশির-শীর্ণ দ্রুমরাজিতে যেমন নবোদ্ভিন্ন কিশলয়গুচ্ছ আবির্ভূত হয়, সেইরূপ শিক্ষা-সম্বন্ধে পশ্চাৎপতিত থাকিলেও শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় প্রতিদিনই উপচীয়মান সাহিত্যালোচনার প্রভাব সংস্পর্শপ্রাপ্ত হওয়ায়, এই মালদহেও বর্ত্তমান সম্মিলনের আবির্ভাব হইয়াছে। এরূপ সম্মিলন যতই অধিক হইবে, ততই মঙ্গল বাড়িবে। সাহিত্যালোচনার প্রভাব বা রসাস্বাদ ইহারই দ্বারা প্রতি নগর-গ্রাম-পল্লীতে প্রসার লাভ করিতে পারিবে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন শতসহস্র নদ-নদী ভিন্ন ভিন্ন প্রস্রবণের জল বহন করিতে করিতে সমস্ত রাজ্য-জনপদকে শস্য-সম্পদাদি দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া অবশেষে মহাসমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হয় ও তাহার গৌরব-মাহাত্ম্য প্রকটিত করে; সেইরূপ এতাদৃশ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র সম্মিলন-সমূহই দূর-সুদূরের উপকরণ-রাজি সংগ্রহ করিয়া বিশ্বসাহিত্যের মহত্ত্ব সম্পাদন করিবে। আমরা ইহাতে বিচ্ছিন্ন হইব না, আরও দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হইব। ইহাতে আমাদের শক্তির হ্রাস হইবে না, বৃদ্ধি হইবে। কার্য্য-কুশলতা নষ্ট হইবে না, ফুটিয়া উঠিবে। কর্ম্মিদলের অভাব হইবে না, নূতন নূতন কর্ম্মীর আবির্ভাব হইবে। এবং সাহিত্যা-লোচনার ব্যাঘাত হইবে না, পরম সুযোগ হইবে। অতএব বন্ধুগণ, এই সম্মিলন আমাদের ভবিষ্যৎ মহাকল্যাণের সূচনা করিতেছে। এখন যাহাতে ইহা সার্থক হয়,

যাহাতে ইহা কল্যাণ উৎপাদন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে আপনারা চিন্তা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

ভ্রাতৃগণ, ইহা আপনাদের অবিদিত নাই যে, যিনি যত অধিক শিক্ষিত হইবেন, তাঁহার দায়িত্ব তত অধিক। তিনি এক দিকে যেমন জনগণের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অপর দিকে তেমনই বিষম অনিষ্টও উৎপাদন করিতে পারেন। তাঁহাদের প্রতিচরণক্ষেপে, প্রতিবচনবিন্যাসে, বা প্রতিনয়নভঙ্গীতে লোকের কুশলাকুশল নির্ভর করে। শ্রেষ্ঠেরা যাহা আচরণ করেন, অন্যেরা তাহাই অনুবর্ত্তন করে; তাঁহাদিগকেই ইহারা অনুসরণ করে। অতএব শিক্ষিতেরা যদি এদিকে লক্ষ্য না করিয়া চলেন, তবে হায়! সাধারণের আর গতি নাই।

শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই যদি সম পরিপুষ্ট হয়, তবেই তাহা সুস্থ, এবং তাহাতেই শরীরী আনন্দ অনুভব করিতে পারে। কিন্তু যদি তাহার একটি মাত্র অঙ্গ অতি পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তবে তাহা তাহার সুখের জন্য না হইয়া বস্তুত অসুখই উৎপাদন করে। এবং সেই অঙ্গকেও পরিপুষ্ট না বলিয়া বরং ব্যাধিগ্রস্ত বলা হইয়া থাকে। আমাকে যদি সুস্থ হইয়া জীবন যাপন করিতে হয়, তাহা হইলে, দেখিতে যতই কেন ক্ষুদ্র হউক না, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টির দিকে আমাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমি তাহাদের একটিকেও বর্জ্জন করিতে পারি না, কেননা তাহাদের সকলকে লইয়াই আমি পূর্ণ। কেবল একটি মাত্র অঙ্গে আমি পূর্ণ নহি।

ভূমি, রস, তাপ, আলোক, বায়ু ও আকাশ এই সমস্তকেই লইয়া, অঙ্কুর বৃক্ষরূপে পরিণত হয়; ঐ সমস্ত ভূতের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া তাহা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে; উহাদের একটিকেও বর্জ্জন করিলে চলে না, তাহাতে তাহা বিকল হইয়া পড়িবে, অসম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। কেবল বীজ থাকিলে হয় না, উহাদের প্রত্যেকটির প্রয়োজন, অন্যথা তাহার সত্তাই থাকিতে পারে না।

প্রত্যেক মানবও সেইরূপ একাকী নিজে সম্পূর্ণ নহে, তাহার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদিগকে লইয়াই সে সম্পূর্ণ হয়। অন্যকে বর্জ্জন করিলে সে থাকিতেই পারে না। সে অনুভব করুক বা না করুক, প্রত্যেকের সহিত তাহার যোগ রহিয়াছে। বিরাট সমাজ-দেহের আমি যেমন একটি অঙ্গ, আমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহারাও অন্যান্য অঙ্গ। অতএব যতদিন এই সমস্ত অঙ্গই সুপরিপুষ্ট হইয়া না উঠে ততদিন সমাজের স্বাস্থ্যসুখ কোথায়?

ব্যক্তিগত শিক্ষা বা সফলতা বস্তুত থাকা না থাকা তুল্য। গাড়ীর একখানি মাত্র চক্রে কোন কার্য্য হয় না। পল্লীর পর্ণকুটীর-পরিবেষ্টিত ইষ্টকগৃহও নিরাপদ নহে। বর্ব্বর-দস্যু-তস্কর-পরিবৃত সজ্জন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সপ্তশত মূর্খকে লইয়া বলি স্বর্গগমন বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই।

যতদিন আমাদের চতুর্দ্দিকের প্রত্যেকটি লোক শিক্ষিত হইয়া না উঠিতেছে, যতদিন আমরা তাহার জন্য যথাশক্তি প্রয়াস করিতে প্রবৃত্ত না হইতেছি, এবং যতদিন আমাদের এই কার্য্য যথোচিত ভাবে পরিচলিত না হইতেছে, বন্ধুগণ, আমি বলিব, ততদিন আমাদের যথার্থ সফলতা লাভ হয় নাই, ততদিন আমরা অন্ধ হইয়া রহিয়াছি—আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হয় নাই।

ভারতবর্ষ সহসা আকাশ হইতে নিপতিত

হয় নাই, বা মহাসমুদ্র হইতেও উদ্‌গত হয় নাই। অরণ্যবাস শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে করিলেও ইহা বর্ব্বরজীবন বহন করে নাই। সভ্য দেশ বলিতে যাহা বুঝায়, স্বয়ং স্বতন্ত্র-ভাবে স্বাধীন বুদ্ধিতে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সে তাহা চিন্তা করিয়া কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল। আজ তাহার বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ভারত আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে। নিজের অতিমহান্, অতি-উচ্চ পবিত্র আদর্শ হইতে স্খলিত হইতে হইতে সে অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও সেই আদর্শের নিদর্শন বিনষ্ট হইয়া যায় নাই, এবং যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য আছে, ততদিন হইবেও না; কোন্ অকৃতজ্ঞ তাহা সযত্নে রক্ষা না করিবে?

বন্ধুগণ, আমি শিক্ষার প্রসারের কথা বলিতেছিলাম। এ সম্বন্ধে ভারত ইতি-বৃত্তের কয়েকটি পংক্তি এখানে আপনাদের স্মরণপথে আনয়ন করিব। একজন রাজা (কৈকেয় অশ্বপতি) বলিতেছেন (ছান্দোগ্য, ৫-১১-৫)—

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো, ন মদ্যপো, নানাহিতাগ্নিঃ ন অবিদ্বান্, ন স্বৈরী ন স্বৈরিণী।"

আমার রাজ্যে চোর নাই, কৃপণ নাই, মদ্যপ নাই, অনাহিতাগ্নি নাই, অবিদ্বান্ নাই, স্বেচ্ছাচারী নাই, স্বেচ্ছাচারিণী—ব্যভিচারিণী নাই। দেশের অধিপতি বলিতেছেন তাঁহার রাজ্যে একটিও অবিদ্বান্ নাই, এবং বিদ্যা-লাভের যাহা ফল, তাহা তাঁহার রাজ্যে বিরাজমান।

আরও কয়েকটি পংক্তির দিকে লক্ষ্য করুন (অযোধ্যা, বাল, ৬) ঐ একই কথা উক্ত হইয়াছে—

কামী বা ন কদর্য্যো বা নৃশংস পুরুষঃ কচিৎ।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্ ন চ নাস্তিকঃ॥ ৮
সর্ব্বে নরাশ্চ নার্য্যশ্চ ধর্ম্মশীলাঃ সুসংযতাঃ।
মুদিতাঃ শীলবৃত্তাভ্যাং মহর্ষয় ইবামলাঃ॥ ৯
নানাহিতাগ্নির্ণাযজ্বা ন ক্ষুদ্রো বা ন তস্করঃ।
কশ্চিদাসীদযোধ্যায়াং ন চাবৃত্তো ন সঙ্করঃ॥ ১২
নাস্তিকো নানৃতী বাপি ন কশ্চিদবহুশ্রুতঃ।
নাসূয়কো ন চাশক্তো নাবিদ্বান্ বিদ্যতে কচিৎ॥" ১৪

যদি কেহ মনে করেন অশ্বপতি নামে বা দশরথ নামে বস্তুত কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না, অতএব সে কথা কেবল গল্পমাত্র; তাহা হইলে আমরা বলিব, ক্ষতি নাই, ধরিয়া লইলাম অশ্বপতি ছিলেন না, দশরথ ছিলেন না, তাঁহাদের রাজ্যও ছিল না। কিন্তু ঐ কথাগুলি যাহা হইতে উদ্ধৃত সেই উপনিষৎ ও রামায়ণ নামে যে পুস্তক আছে, তাহা ত সত্য. সেই উপনিষদের ঋষি ও রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকিই হউন অথবা অপর কেহ হউন—ছিলেন, ইহাও ত সত্য। ভারত-বর্ষেই যে ঐ পুস্তকদ্বয় রচিত হইয়াছে তাহাও সত্য। ধরিয়া লইলাম অশ্বপতি ও দশরথের রাজ্য সেরূপ ছিল না। কিন্তু উপনিষৎকার ও রামায়ণকার দেশের ঐ যে আদর্শ সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা ত কখনই অসত্য নহে। তাঁহারা ভারতের লোককে ঐ আদর্শেই যে পরিচালিত করিয়াছেন, তাহা ত কখনই অসত্য বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। যাঁহারা দেশের বস্তুত মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদের ত শিক্ষা সম্বন্ধে উহা ভিন্ন আদর্শই হইতে পারে না, এই আদর্শকে পরিত্যাগ বা অবজ্ঞা করিলে কোন দেশই অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না, পারে নাই

এবং পারিবেও না। ভারতের এই যে 'ন অবিদ্বান্'—কেহই অবিদ্বান্ নহে,—এই পুরাতনী বাণী বর্ত্তমান সভ্যদেশসমূহে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা তদনুসারে কার্য্য করিতেছে। নিয়ত (compulsory) শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জাপানের মৃত সম্রাট্ মিকাডো বলিয়াছিলেন—এখন হইতে এরূপভাবে শিক্ষা বিস্তৃত করিতে হইবে যাহাতে কোন গ্রামে অশিক্ষিত পরিবার না থাকে, বা কোন পরিবারের মধ্যে কেহ অশিক্ষিত না হয়।

'ন অবিদ্বান্'—কেহই অবিদ্বান্ নহে, ইহাই যদি শিক্ষাপ্রচারের সনাতন মঙ্গল আদর্শ হয়,—তাহা হইলে ইহাই লক্ষ্য রাখিয়া যে আমাদিগকে চলিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

এখন একবার এই শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মালদহবাসীদের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক ; দেখা যাউক 'ন অবিদ্বান্' এই বীরবাণীর কতটুকু সফলতা আমাদের মালদহে হইয়াছে।

বিগত ১৩১৮ সালে (১৯১১ খ্রীঃ) ভারতের লোকসংখ্যা হয়। তাহার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মালদহ সম্বন্ধে এই সকল কথা জানা যায় :—মোট লোক-সংখ্যা—১০,০৪,১৫৯ ; ইহার মধ্যে লেখা-পড়া জানে মোট ৪৫, ৯০৪ জন, অবশিষ্ট ৯,৫৮, ২৫৫ জন নিরক্ষর! তাহা হইলে বলিতে হয় শতকরা ৪ জন (৪.৫) লেখা পড়া জানে, আর অবশিষ্ট ৯৬ জন একেবারে নিরক্ষর। ইহার মধ্যে আরও দেখিবার আছে। মালদহে স্থানান্তরের শিক্ষিত লোকগণের সংখ্যা ইহা হইতে বাদ দিলে খাঁটি মালদহের শিক্ষিত লোকের সংখ্যা আরও কম হইবে। যে জেলার লোক শতকরা ৯৬ জন নিরক্ষর, তাহা কতদূর অধঃপতিত, তাহার দশা কত শোচনীয়, তাহা কত করুণার পাত্র, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমি বলিয়াছি লেখা-পড়া-জানা লোক আমাদের জেলায় মোট ৪৫, ৯০৪ ; ইহার মধ্যে পুরুষ ৪৪,২৪৩ ; স্ত্রী ১,৬৬১ অতএব বলা যায় এক হাজারে ৩ জন (৩.২) স্ত্রীলোক শিক্ষিত!

আমাদের জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। হিন্দু ৪,৬৫,৫২১ জন, আর মুসলমান ৫,০৫,৩৯৬ জন। অর্থাৎ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ৩৯,৮৭৫ জন বেশী। কিন্তু সংখ্যায় বেশী হইলেও মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা শিক্ষায় কম। শিক্ষিতের সংখ্যা হিন্দুদের ২৭,৭০৫ আর মুসলমানদের ১৮,০৫৪ জন।

বন্ধুগণ, আমরা সাহিত্যের আলোচনার জন্য, শিক্ষার জন্য আমাদের জেলার হিন্দু-মুসলমান উভয়েই এখানে সমবেত হইয়াছি এবং দেখিতে পাইতেছি আমাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়। কি ভীষণ কথা, আমরা শতকরা ৯৬ জন নিরক্ষর! এই অশিক্ষা-পিশাচীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে, আমাদিগের সকলকেই বদ্ধপরিকর হইয়া প্রযত্ন করিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

আলোচ্য ১৩১৮ সালের লোক-সংখ্যার দশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩০৮ সালে (১৯০১ খ্রীঃ) যে লোক-সংখ্যা হয়, তাহা আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, তাহার পর ১০ বৎসরের মধ্যে শতকরা এক জনও অধিক লোক লেখা পড়া শিখিতে পারে নাই।*

* ১৩১৮ সালের লেখা-পড়া-জানা লোক শতকরা ৪.৫, আর ১৩০৮ সালে ৩.৭ ।

আমরা যদি দশ বৎসরের এইরূপ ফল স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও নিশ্চিন্ত হইয়া কালযাপন করি, তাহা হইলে আশা কোথায়?

সন্দেহ নাই, বন্ধুগণ, আপনাদের নিকট আমি যে প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছি, তাহা অতি জটিল, অতি গুরুতর। মনে হইতে পারে, আমাদের এই ক্ষুদ্র সাহিত্য-গোষ্ঠীতে এতাদৃশ প্রশ্নের আলোচনা মহত্তরগণের উপহাসের বিষয় হইবে। মহামহারথীরা যেখানে পরাঙ্মুখ, দুর্ব্বল কীটানুকীটের উপস্থিতি সেখানে শোভা পায় না।

কিন্তু আমাদের যাহা যথার্থ কল্যাণ, তাহার আলোচনায়, তাহার সিদ্ধির প্রয়াসে আমাদিগকে প্রবৃত্ত দেখিয়া বৃদ্ধেরা যদি উপহাস করেন, করিতে পারেন। কিন্তু কি প্রকারে আমরা তাহা ভুলিয়া থাকিব? যাহা না হইলে আমাদের চলিবে না, যতই কেন আমরা ক্ষীণ হই, দুর্ব্বল হই, চেষ্টা ত করিতেই হইবে। আমরা চাঁদ ধরিতে চাহিতেছি না; লোকে যাহা ধরিতে পারে,—সর্ব্বত্র ধরিতেছে, আমরাও তাহাই ধরিতে চাহিতেছি। যদি আমরা ধরিতে চাই, সত্যসত্যই যদি তাহা ধরিবার জন্য আমাদের দৃঢ় ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আজ হউক, কাল হউক, দশ দিন বা দশ বৎসর পরে হউক আমরা তাহা নিশ্চয়ই ধরিব। কিন্তু আমরা যে অল্প লোকেই ধরিতে চাহিতেছি। "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে"—সহস্র-সহস্র মানবের মধ্যে কোন একজন সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, আমরা যদি সনাতন আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া এরূপ শিক্ষা প্রচার চাহি, তাহা হইলে সিদ্ধি আমাদের অদূরবর্ত্তিনী না হইলেও, দূরবর্ত্তিনী থাকিয়াও, একদিন শুভমুহূর্ত্তে আমাদের নিকটে উপস্থিত হইবে। আমাদের মনে রাখা উচিত "ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ"—রত্ন অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় না, তাহাকেই অন্বেষণ করিতে হয়।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা কেবল অন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, মঙ্গল তাহার দুর্লভ। শৈশবে আহার-বিহার-শয়ন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই জননীকে অবলম্বন করিতে হয়, তাঁহা ভিন্ন গতি থাকে না; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বালক যদি পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যেক কার্য্যে মাতার সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে তাহার দুর্গতির সীমা থাকে না। সংসারে একমাত্র সন্তান-পালনই জননীর কার্য্য নহে, তাঁহার আরও বহু কর্ত্তব্য থাকে, তাঁহাকে সমস্ত দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হয়। মাতার স্নেহ ও যত্নে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে পুত্র ক্রমশঃ নিজেই নিজের ভার গ্রহণ করিতে পারে এবং এইরূপে সমস্ত সংসারেই মঙ্গল দেখা দেয়।

শিক্ষাসম্বন্ধেও এইরূপ। আমাদের জননীস্থানীয়া রাজশক্তির উপর কেবল নির্ভর করিলে আমাদের চলিবে না। কেবল শিক্ষাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় নহে, তাঁহার চিন্তা-ক্ষেত্রের সীমা নাই। তিনি যতদূর পারেন এদিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন, যত্ন করিতেছেন এবং করিবেন। তিনি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি নিয়তই রাখিবেন। ইহা না করিয়া তিনি পারিবেন না। তাঁহার এই স্নেহ-করুণা-যত্নে সুরক্ষিত থাকিয়াও কেন আমরা যতদূর পারি নিজের ভার নিজে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব না? যতক্ষণে মা ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া দিবেন ততক্ষণে খাওয়া হইবে মনে করিয়া কোন বয়স্ক পুত্রই অলসভাবে বসিয়া

থাকে না, থাকিলেও মাতা তাহা ভাল বাসেন না, আর পুত্রেরও তাহা মঙ্গলজনক নহে।

দেশের সমস্ত শিক্ষার ভার রাজার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা ভারতবর্ষের আদর্শ নহে, এবং কোন স্থানেও তাহা হয় না, হইতে পারেও না। রাজা যতদূর পারেন করেন এবং দেশের লোককে দিগ্‌দর্শন প্রদান করেন, তাহার পর দেশবাসীরাও তাহার যত্ন-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়।

লোকশিক্ষার ভার প্রধানত লোককেই লইতে হইবে। ভারতবর্ষে তাহাই হইয়াছে, এবং সেই জন্যই 'ন অবিদ্বান্‌' এই মহাবাণী এখানে অসম্ভব হয় নাই। ভারতের বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত "আচার্য্যকুল" * বা "গুরুকুল"গুলি † দেশের রাজার স্থাপিত নহে, বা রাজকোষের অর্থেও তৎসমুদয় পরিচালিত হইত না। জনগণ বা সমাজের ব্যবস্থাতেই সেই সমুদয় স্থাপিত হইত, এবং ব্রহ্মচারীর গৃহস্থ-পরিবার হইতে ভিক্ষাহৃত তণ্ডুলমুষ্টিতেই তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু তাহা হইলেও, বিদ্যা তখন দান করা হইত, বিক্রয় করা হইত না; এবং শিক্ষাও তখন নিয়ত (compulsory) ছিল। জনগণ নিজহস্তে লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই আর্য্যসভ্যতা ততদূর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল। কাল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন একেবারে ঠিক সেই প্রাচীন আচার্য্যকুল বা গুরুকুল হইবার সম্ভাবনা নাই সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও বর্ত্তমান সমস্ত অবস্থা চিন্তা করিয়া আজকালকার উপযোগী যতদূর পারা যায়, ততদূরই শিক্ষাপ্রচার আমরা নিজের হস্তে গ্রহণ করিতে কি আদৌ সমর্থ হই না?

ভ্রাতৃগণ, আমরা সকলেই যে শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করি, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার বিধি ব্যবস্থা করিতে গিয়া আমরা অনেক সময় মুগ্ধ হইয়া যাই। কুণ্ডল পায়ে, নূপুর কাণে ধারণ করিলে শোভা হয় না, শীতের পরিচ্ছদ গ্রীষ্মে ও গ্রীষ্মের পরিচ্ছদ শীতে পরিধান করিলে প্রয়োজন ত সিদ্ধ হয়ই না, বরং তাহা অনর্থের জন্য হয়। ভূমির প্রকৃতি-অনুসারে কৃষিপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে হয়। অনেক সময় আমরা এই মূল তত্ত্বটি ভুলিয়া যাই। আমার নিজের ঘরে কতটা কি আছে, তাহা দ্বারা কতদূর কি ফল হইতে পারে, এই সমস্ত বিচার করিয়া না দেখিয়া আমরা পরের ঘর হইতে এমন কতকগুলি জিনিস আনিয়া হাজির করি, যাহাদের রাখিবার স্থানই আমাদের ঘরে কুলায় না; এবং এইরূপে নূতন আমদানী জিনিস ত নষ্ট হয়ই, আমাদের পুরাতন সম্বলও সেই সঙ্গে চলিয়া যায়।

বাহিরে যাহা দেখিব নির্ব্বিচারে তাহাই ঘরে তোলা ভাল নহে, এবং সর্ব্বত্র তাহার প্রয়োজনও থাকে না, আর তাহাতে কর্ম্মপথও জটিল দুর্গম হইয়া পড়ে।

শিক্ষার প্রসঙ্গ উঠিলেই স্কুল-কলেজের কথাই আমাদের মনে জাগিয়া উঠে; আর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ঘর-দালান, টেবিল-চেয়ার, বেঞ্চ-ডেস্ক ইত্যাদি উপকরণ-রাজি আসিয়া জুটে। এগুলি না হইলে স্কুলই হইবে না, আর স্কুল না হইলে পড়া শুনাও

* গোপথব্রাহ্মণ, পূর্ব্ব ২-৪; ছান্দোগ্য ৪-৯-১; আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, ১-১০-১৯।

† মুণ্ডক, ১-২-১২; বৌধায়নধর্ম্মসূত্র, ২-১-২২, ১-২-৩০, বিষ্ণু, ২৮-১৬৯; যাজ্ঞ, ১-২-৩৪-৩৫।

হইতে পারে না। যাঁহারা সব সময় কোট-প্যাণ্টালুন পরেন, সেই সাহেব-সুবাদের জন্য চেয়ার-বেঞ্চের আবশ্যকতা থাকিতে পারে; তাহা বলিয়া আমাদের শিশুগণের জন্য তাহার কি প্রয়োজন আছে জানি না, বরং অপকারই হয়। অথচ এই আসবাব পত্র না হইলে মনে করি বিদ্যালয় আমাদের হইল না। আমি যদি বিধিমত বিদ্যালয় করিতে চাই, তবে যত টাকাই খরচ হউক, সর্ব্বপ্রথমে আমাকে ইহা সংগ্রহ করিতেই হইবে। অথচ সামান্য মাদুরেই এই কাজ চলিতে পারে। এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যত ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত-পরীক্ষায় তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যকই বালক দৃষ্ট হইয়াছিল। এই সমস্ত সংস্কৃত-বিদ্যার্থী বেঞ্চ-ডেস্কের সাহায্যে অধ্যয়ন করে নাই, বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহেও শিক্ষা পায় নাই। অথচ ইহারা পড়িয়াছে, জ্ঞানও উপার্জ্জন করিয়াছে, উপাধিলাভও ইহাদের ঘটিয়াছে। স্বাস্থ্যও যে ইহাদের তাহাদের অপেক্ষা খারাপ তাহার প্রমাণ নাই। যে দেশ বিদ্যাকে যত সুলভ করিতে পারিবে, সে দেশ ততই অভ্যুদয় লাভ করিবে। ভারতবর্ষ ইহা যেমন করিয়াছিল, আমি জানি না, অন্য কোথাও আর এরূপ হইয়াছে কি না। আচার্য্যকুল বা গুরুকুলগুলিতে বালকেরা শীতাতপ-বর্ষা-অনুসারে কখনো বা সাধারণ অনাড়ম্বর গৃহের মধ্যে, কখনো বা স্নিগ্ধচ্ছায় তরুমূলে কখনো কখনো বা রমণীয় বেদিতলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসন পাতিয়া মনের আনন্দে অধ্যয়ন করিত। উন্মুক্ত প্রকৃতির সংসর্গে চিত্তের ন্যায় শরীরেও তাহারা সমুন্নত হইয়া উঠিত। তাহারা সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ সেই দীন অথচ শাস্ত্রোজ্জ্বল আশ্রমে অধ্যয়ন করিত, তাহারা গণিতবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি তাৎকালিক সমস্তই সেই স্থানেই শিক্ষা করিত। বিদ্যা সেই সময়ে যতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, ততদূর তাহারা আয়ত্ত করিত, ততদূর শিক্ষা তাহাদের সম্পূর্ণ হইত। বিদ্যার উৎকর্ষ সে সময়ে নিতান্ত অল্প ছিল না। Residential বিদ্যালয়বিষয়ক বর্ত্তমান উচ্চ-চীৎকারের সমাধানও এই স্থানেই হইয়াছিল। সেই কুটীরের শিক্ষা, তরুতলের শিক্ষা, বন-আশ্রমের শিক্ষা পাইয়া দেশে আদর্শ রাজা, আদর্শ প্রজা হইত; আদর্শ মন্ত্রী, আদর্শ শিল্পী, আদর্শ শিক্ষক দেখা দিত। শিক্ষার দ্বারা দেশের যাহা যাহা হইতে পারে, সেই ব্যবস্থাতেই তৎসমুদয় সুসিদ্ধ হইত। সেই ব্যবস্থাতেই, আপনারা শুনিয়াছেন, অশ্বপতি বলিতে পারিয়াছিলেন—আমার জনপদে চোর নাই, কৃপণ নাই, মাতাল নাই, অনাহিতাগ্নি নাই, অবিদ্বান্ নাই, স্বেচ্ছাচারী নাই, ব্যভিচারিণী নাই। এই ব্যবস্থাতেই বাল্মীকি অযোধ্যার কথা বলিয়া গিয়াছেন—

"নাস্তিকো নানৃতী বাপি ন কশ্চিদবহুশ্রুতঃ।
নাসূয়কো ন চাশক্তো নাবিদ্বান্ বর্ত্ততে কচিৎ॥

*　*　*　*

দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাপি রাজন্যভক্তিমান্॥"

অযোধ্যায় নাস্তিক নাই, মিথ্যাবাদী নাই; কেহই সেখানে অবহুশ্রুত নাই, কেহই সেখানে অবিদ্বান্ নাই; সেখানে কেহ অশক্ত বা অসূয়াকারী নাই, রাজার প্রতি ভক্তিহীন লোক অযোধ্যায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে তরুরাজ মস্তকের উপর বহুদিন হইতে কালের প্রচণ্ড শীতাতপ ও প্রবল ঝঞ্ঝাবৃষ্টি

সহ্য করিয়া, টিঁকিয়া থাকিয়া, দূর-সুদূরে নিজের শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করিয়া শ্যামস্নিগ্ধ ছায়াপ্রদানে ও পত্রপল্লবপুষ্পফল-সৌরভে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, কেন আমরা তাহাকে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতেছি? যদি আমাদের "ফলচ্ছায়া-সমন্বিত" মহাবৃক্ষের প্রয়োজন থাকে, তবে ইহাকে আমরা সমূলে উচ্ছিন্ন করিতেছি কেন? যদি ইহাকে আগাছায় আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, বা লতাজালে ইহার শাখা-পল্লবকে সমাবৃত করিয়া থাকে, সেই আগাছাকে কাটিয়া দাও, সেই লতাজালকে ছিঁড়িয়া ফেল, মূলদেশে জলসেচন কর, আবার তাহা সুপুষ্ট হইয়া উঠিবে, আমাদের মনোরথ সুসিদ্ধ হইয়া যাইবে। আর যদি নিতান্তই সেই জীর্ণ তরুবরকে কোনরূপেই রক্ষা করিতে না পারা যায়, ক্ষতি নাই, তাহাকে কাটিয়া ফেল, শিকড়গুলি তুলিয়া লও, চাষ দিয়া জমি উপযুক্ত করিয়া তোল, এবং ঐ স্থানে আবার সেই তরুরাজেরই একটি সুপরিপুষ্ট বীজ রোপণ কর, কয়েক দিন বিবিধ উপদ্রব হইতে যত্নের সহিত তাহাকে রক্ষা কর, দেখিতে দেখিতে আবার পূর্ব্বেরই মত মহাবৃক্ষ জাত হইয়া আমাদিগকে সেইরূপই অমৃতফল প্রদান করিবে। সাবধান, বন্ধুগণ, আমরা যেন মোহবশত ঐ স্থানে বিষবৃক্ষ বা কণ্টকবৃক্ষ রোপণ করিয়া না ফেলি, আমরা যেন বিষফলাস্বাদে বা কণ্টকাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া না যাই।

আমরা যে শিক্ষাপ্রচার বা গণশিক্ষা চাহিতেছি, তাহার জন্য আমাদিগকে ঐ আচার্য্যকুল বা গুরুকুলের দিকে নয়ন-নিক্ষেপ করিতে হইবে। প্রাচীন পবিত্র গুরুকুলের ক্ষীণ নিদর্শন চতুষ্পাঠী বা টোলসমূহ এখনো টিকিয়া রহিয়াছে। কিন্তু অসঙ্গত অপ্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য ভাব এগুলিকেও গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভগবান্ করুন, ইহারা যেন কবলিত হইয়া নিজের সত্তাকে, নিজের বিশেষত্বকে একেবারে হারাইয়া না ফেলে। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ সংস্কার-প্রার্থী হইয়াছেন, সাবধান, সংস্কারের জন্য ইঁহারা একেবারে পূর্ব্বের দিকে—নিজের দিকে অন্ধ হইয়া যেন কেবল পশ্চিমের দিকে বদ্ধলক্ষ্য না হন।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের এই প্রাচীন গুরুকুলসমূহে তাৎকালিক সমস্ত বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইত। তবে গুরুর যোগ্যতা ও অন্যান্য কারণে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার ন্যূনাধিকত্ব অবশ্যই ছিল। অথবা হয়ত কোন স্থানে কোন বিশেষ বিষয়ের আদৌ শিক্ষা দেওয়া হইত না। বিদ্যার্থীকে তাহার জন্য অপর গুরুকুল আশ্রয় করিতে হইত। বর্ত্তমান চতুষ্পাঠীসমূহেও এইরূপ হইয়া থাকে। কোন কোন টোলে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, জ্যোতিষ, গণিত ইত্যাদি বহুবিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, আবার কোন কোন টোলে হয়ত একটি বা দুইটি বা ততোধিকও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এক সংস্কৃত ভিন্ন বিবিধ প্রাকৃত ভাষাও টোলে পড়ান হয়।

এই প্রণালীতেই নব-নব চতুষ্পাঠীতে আমাদের বালকেরা ইংরাজী, বাঙ্গালা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ও শিক্ষা করিবে। এক-একটি চতুষ্পাঠীতে যেমন একাধিক অধ্যাপক থাকিয়া বিভিন্ন-বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেন, এ সম্বন্ধেও সেইরূপ হইবে। যে অধ্যাপক যে বিষয় যতটা

শিক্ষা দিতে পারেন, বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট ততটাই সেই বিষয় শিখিয়া আবার অপর টোলে গিয়া অধিকতর শিক্ষা গ্রহণ করিবে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়গণ যেমন এক-একটি চতুষ্পাঠী খুলিয়া যিনি যাহা জানেন তিনি সেই বিদ্যাই প্রচার করিতেছেন, ইংরাজী-শিক্ষিতগণও সেইরূপ করিবেন।

দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য থাকিলেও এক-একটি ইন্দ্রিয় যেমন এক-একটি কার্য্যের জন্য নিযুক্ত থাকিয়া দেহীর উপকার করে, সেইরূপ সমাজেরও বিভিন্ন-বিভিন্ন কার্য্যের জন্য কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তিকে নিযুক্ত থাকিতে হয়। অধ্যয়ন-অধ্যাপন ব্রাহ্মণদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে। তাঁহাদিগকে পড়িতেও হইবে পড়াইতেও হইবে। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এখনও তাহা করেন। সংস্কৃত শিখিলেই তাঁহারা স্বভাবতই অধ্যাপনে নিযুক্ত হন, তাঁহারা ইহা না করিয়া থাকিতেই পারেন না। এরূপ নিঃস্বার্থ সমাজ-সেবক আর কোন্ দেশে আছে? ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের এই আদর্শেই আমাদের মধ্যে বিদ্যাব্রতী লোক-সেবকগণের প্রয়োজন। ইঁহারা তাঁহাদেরই মত পড়িবেন ও পড়াইবেন। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-প্রচারের আর একটি ব্যবস্থার কথা আপনাদের নিকটে উল্লেখ করিব, আপনারা ইহা প্রণিধান করিয়া দেখিবেন। আমি এ কথা অন্যত্র বলিয়াছি, আবার একবার বলিতেছি, এবং যতদিন কার্য্যসিদ্ধি না হয় ততদিন পুনঃ পুনঃ বলিতে হইবে।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি অভিজ্ঞ হয়, প্রত্যেক ব্যক্তিরই যদি গভীর তত্ত্বসমূহ আলোচনা করিবার যোগ্যতা থাকে, সকলেই যদি যথার্থ পাণ্ডিত্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সুখের সীমা থাকে না, সে সমাজে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্য্যত তাহা হয় না। সমাজে অভিজ্ঞের ন্যায় অজ্ঞ লোকও থাকে, পণ্ডিতের ন্যায় মূর্খ লোকেরও তাহাতে স্থান হয়, যোগ্য-অযোগ্য পণ্ডিত-মূর্খ উভয়কে লইয়াই সমাজ হয়। অতএব যাঁহারা সমাজের পরিচালক, যাঁহারা লোকহিতের নিয়ন্তা, তাঁহাদিগকে উভয় শ্রেণীরই লোকের কুশল চিন্তা করিতে হয়; বরং অভিজ্ঞশ্রেণী স্বয়ং স্বকীয় মঙ্গলসাধনে সমর্থ বলিয়া তাঁহাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া তাঁহারা অজ্ঞ-অযোগ্যগণেরই মঙ্গলের জন্য সবিশেষ প্রয়াস করিয়া থাকেন। গাড়ীর একটি বলদ দুর্ব্বল হইলে, আর তাহা লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইতে পারে না। শকটচালককে ঐ দুর্ব্বল বলীবর্দ্দ সবল করিয়া লইতে হইবে, এবং তজ্জন্য তাহাকে শুষ্ক-কঠিন তৃণপুঞ্জের পরিবর্ত্তে সরস-কোমল শষ্পকবল প্রদান করিতে হইবে, এবং এইরূপে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে ঐ দুর্ব্বল বলীবর্দ্দ সবল হইয়া উঠিবে, শুষ্ক-কঠিন তৃণপুঞ্জ হইতেও সে তখন রস গ্রহণ করিয়া শরীর পোষণ করিবে, এবং শকটকে যথাস্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

ভারতের মুনি-ঋষিগণ ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন মন্ত্র-ব্রাহ্মণ আরণ্যক-উপনিষদ্ প্রভৃতিতে যে সকল গভীর তত্ত্ব রহিয়াছে, তৎসমুদয় সাধারণ-জনের বোধগম্য নহে, ঐ সকল দুরূহ গ্রন্থে প্রবেশ করিয়া সাধারণ-লোকেরা উপকার লাভ করিতে পারে না, অথচ তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকা কোনরূপে কর্ত্তব্য হইতে পারে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি সহজভাষায় নানা কথা-

আখ্যায়িকায়, নানা দৃষ্টান্ত-উপমায় ব্যাখ্যা করিয়া এবং উপযুক্ত নানাবিধ নব-নব বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়া তৎসমুদয়কে পুরাণ-নামে প্রচার করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, লোকতত্ত্ব প্রভৃতি যে সকল বিষয় পূর্ব্বে সাধারণলোকের নিকট অতি দুর্জ্ঞেয় ছিল, পুরাণের প্রচারে তাহাদিগের নিকট সেই সমুদয় সহজ হইয়া উঠিল। লোক ধর্ম্মভাবে, দেবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখ হইয়া উঠিল।

আজিও ভারতের জনপদ-নগর-গ্রাম-পল্লীতে যে ধর্ম্মভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা বেদ-বেদান্ত-আরণ্যক-উপনিষদের জন্য নহে, তাহার একমাত্র কারণ পুরাণ। রামায়ণ-মহাভারতেরই অমৃত কথা ভারতের অতি নিকৃষ্ট সমাজেরও লোককে বন্য-বর্ব্বর-অসভ্য হইতে দেয় নাই, পুরাণসমূহের মধুর কথালহরীই তাহাদের হৃদয়কে এখনো পুণ্যানুভাবে সরস করিয়া রাখিয়াছে। সু-কু, ভাল-মন্দ, দোষ-গুণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতিকে পুরাণেরই সাহায্যে ভারতের সাধারণজনগণ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। পুরাণেরই কল্যাণে গ্রামে বাপী, কূপ ও তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হইত, পথে পথে ফলচ্ছায়াপ্রদ পাদপ-শ্রেণী রোপিত হইত, পান্থশালা স্থাপিত হইত, ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইত। ক্ষেত্র ও অন্যান্য স্থানে জলের আগম-নির্গমের জন্য উপযুক্ত সেতুসমূহ বদ্ধ হইত, আরোগ্যশালা স্থাপিত হইত, আতুর ব্যক্তি ঔষধ পাইত, বিদ্যার্থী বিদ্যা পাইত, পবিত্র দেবায়তন-সমূহের উন্নত শৃঙ্গাবলী মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিত, প্রভাত-প্রদোষে মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের মঙ্গলধ্বনি দিগন্ত কম্পিত করিয়া উত্থিত হইত; অধিক কি কোন উন্নত সমাজের লোকেরা যাহাতে কিছু কল্যাণ উপভোগ করিতে পারে, ভারতের জনগণ তাহা হইতে বঞ্চিত হয় নাই, প্রত্যুত দেবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রচুরভাবে তৎসমূহ অধিকার করিয়াছিল। কেবল আধ্যাত্মিক ভাবের কথা নহে, কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য নহে, লৌকিক বিষয়সমূহকেও সাধারণ জন-সমাজে পুরাণ-পাঠের সাহায্যে প্রচার করা হইত। ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতিষ, বাস্তুবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রাজনীতি, কৃষিবিদ্যা, অর্থনীতি ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞাতব্য তাৎকালিক সমস্ত তত্ত্বই কোন স্থানে সংক্ষেপে কোন স্থানে বা বিস্তৃতভাবে পুরাণে সঙ্কলিত হইয়াছে। যাহারা স্বয়ং বা গুরুর নিকটে অধ্যয়নের অবসর পাইত না, তাহারা পুরাণকথা শুনিয়া শুনিয়াই সেই সকল বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হইয়া উঠিত। বাহ্য ও অধ্যাত্ম উভয়দিকেই পুরাণশ্রবণে ভারতের জনগণ এইরূপে শিক্ষা-লাভের অতি রমণীয় সুযোগ পাইত।

কিন্তু বর্ত্তমানের অবস্থা শোচনীয়, পুরাণ-পাঠ দেখিতে দেখিতে এতদূর কমিয়া গিয়াছে যে, আর অতি অল্প দিনেরই মধ্যে হয় ত তাহার অস্তিত্বলোপ হইবে। সাধারণ লোকের কথা দূরে থা'ক, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও পুরাণ-পাঠকে আজকাল অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। বিচক্ষণ সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রায়ই পুরাণকথক হইতে দেখা যায় না। মনে হয় বর্ত্তমান সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত মহোদয়গণ পুরাণ-কথকতায় স্বকীয় মর্য্যাদা-হানি আশঙ্কা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে করা উচিত যে, একদিন ব্যাস-বশিষ্ঠের ন্যায় মহর্ষিরাই পুরাণকথকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ন্যায় ব্যক্তিগণ ঐ

ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই পুরাণপাঠ-শ্রবণের যাহা ফল, ভারত তাহা লাভ করিয়াছিল। আত্মতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব ও লোকতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা পণ্ডিতেরাই যথার্থভাবে করিতে পারেন, মূর্খের তাহা কার্য্য নহে। আজকাল যে সকল পুরাণকথক দৃষ্টিগোচর হন, তাঁহাদের অধিকাংশই শাস্ত্রজ্ঞানহীন। ইঁহাদের হাতে পড়িয়া পুরাণকথা দুর্গতির চরমসীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই শ্রেণীর কথক মহাশয়েরা মূলপুরাণে যাহা নাই তাহা কল্পিত করেন, যাহা আছে তাহা বলেন না, অথবা বিকৃত করিয়া বলেন। ইঁহাদের দৃষ্টি মূলপুরাণের দিকে অতি অল্পই থাকে। মূর্খ-মোহনের জন্য ইঁহারা সময়ে সময়ে মিথ্যা-কথার ত সৃষ্টি করেনই, তাহা ছাড়া অনেক স্থলে অতিবিরুদ্ধ অতি-অশ্লীল কথার অবতারণা করিতেও নিবৃত্ত হন না। ইহার সংস্কার করিবে কে? এই দুর্গতি হইতে পুরাণপাঠকে উদ্ধার করিয়া পুনর্ব্বার সঞ্জীবিত করিবে কে?

পুরাণের কথকতা ছাড়িয়া দিলে আমাদের কিছুতেই চলিবে না, আমাদিগকে ইহার বিপুল প্রচার করিতেই হইবে। সময়োপযোগী করিয়া আমাদিগকে ইহার সংস্কারও করিতে হইবে। পুরাণের রচনার সময় পর্য্যন্ত ভারতে যে-যে বিষয় যেরূপ আলোচিত বা পরিজ্ঞাত ছিল, পুরাণকারেরা তাহা তাহা সঙ্কলন করিয়াছেন। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আরও কত নব-নব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এক-একটি বিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। আমাদিগকে এগুলি সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। আমরা যখন "লবণেক্ষুসুরাসর্পিঃ"—প্রভৃতি সমুদ্র-সমূহের কথা বলিব, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আটলাণ্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর প্রভৃতিরও নামোল্লেখ করিব, যখন বিন্ধ্য-হিমালয়ের কথা আসিবে, সেই সময়ে আল্‌প্‌স-ককেসসেরও নাম করিব, যখন গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু সরস্বতীর নাম করিতে হইবে, সেই সময়ে ভল্‌গা-নাইলেরও উল্লেখ করিতে হইবে। যখন নবগ্রহের কথা উঠিবে, তখন, নব্যতন্ত্রের মতে রাহু-কেতুর লোপ করিয়া ইউরেনস্‌ ও নেপচুনের উল্লেখও করিতে হইবে। যখন দর্শনপ্রসঙ্গ হইবে, তখন সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসার ন্যায় প্লেটো-ক্যাণ্ট-হিগেলের কথাও কহিতে হইবে। যেমন একই বিষয়কে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং সেইরূপ ভাবেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া থাকি, নব্য আবিষ্কার ও মতবাদগুলিকেও সেইরূপ ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। যদি এমন কোন বিষয় থাকে যাহার সহিত পৌরাণিক বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই, তাহা না হয় ধর্ম্মপুরাণের কথকতার সময় নাই বলিলাম, কিন্তু তাহারই আদর্শে নবীন পুরাণে তাহা শুনাইতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা পুরাণ-কথা শ্রবণ করিয়া বাহ্য-অধ্যাত্ম উভয়-দিকেই কতক জ্ঞানলাভ করিতে পারিব, এবং ইহাই আমাদিগকে করিতে হইবে। অতএব বিদ্যাব্রতিগণ পুরাণকথকের আসনে অধিষ্ঠিত হউন! গ্রামে গ্রামে পল্লীতে-পল্লীতে মধুময় পুরাণ-কথার লহরীমালা উত্থিত হইয়া গ্রামবাসীর পল্লীবাসীর হৃদয়কে অভিষিক্ত করুক, এবং পুনর্ব্বার পবিত্র সৌন্দর্য্যে ভারতবর্ষ পরিপূরিত হইয়া উঠুক!

গ্রামের মন্দির ও মসজিদ-গুলি জীর্ণ হইয়া স্খলিত-পতিত হইতেছে। এগুলিকে সংস্কৃত

করিয়া লইতে হইবে। পল্লীর বটতরুর মূল শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। মুক্তশ্যামল দুর্ব্বাক্ষেত্ররূপ আসন পাতিয়া প্রকৃতি দেবী আহ্বান করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিয়া পুরাণ-কোরাণ, সাহিত্য-বিজ্ঞান, যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহারই কথকতা আরম্ভ করুন। শ্রোতার অভাব হইবে না। পুরনারীগণ কথক ঠাকুরকে পরিবৃত করিয়া রাখিবে। যথাশক্তি ভোজ্য-দক্ষিণা দিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইবে না, স্বতই তাহাদের সে প্রবৃত্তি আছে।

আত্মনির্ভরতা না থাকিলে বড়ই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পল্লীবাসীরা ক্রমশই ইহা হারাইয়া দুর্গতিপ্রাপ্ত হইতেছে। চক্ষু থাকিতেও তাহারা দেখিতে পাইতেছে না, হস্ত থাকিতেও তাহারা কার্য্য করিতে পারিতেছে না। তাহাদের শক্তি আছে, অথচ তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস নাই। ইচ্ছা করিলেই তাহারা এক-একটি বৃহৎ কার্য্য করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু সে ভাব তাহাদের উদ্বুদ্ধ নাই। পানায় পানায় পুকুরের জল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই জলপান করিয়া তাহারা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে ভুগিতেছে, কত অসুবিধাতেই তাহাদিগকে পতিত হইতে হইতেছে; কিন্তু প্রতিদিন হয় ত পাঁচ শত লোক সেই পুকুরে স্নানাদি করে, তথাপি তাহার পানা উঠে না। প্রত্যেকে প্রতিদিন স্নানের সময় পাঁচ মিনিট করিয়া পরিশ্রম করিলে কয়দিনই বা এক-একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী পরিষ্কার করিতে লাগে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমাদের গ্রামে একটি ব্রাহ্মণ-বিধবা একাকিনী দুইটি পুষ্করিণীর পানা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি প্রতিদিন স্নানের সময় নীরবে কিছুক্ষণ এই কার্য্য করিতেন। বর্ষায় পল্লীগ্রামে জল-কাদায় মানুষের ত দূরের কথা, গ্রাম্য পশুগুলিও কত কষ্ট পায়; অথচ স্থানে স্থানে দুই চারি কোদাল মাটী কাটিয়া দিলেই এই কষ্ট নিবারিত হইতে পারে, দুই-একটা নালা কাটিয়া দিলে গ্রামের জল বাহির হইয়া যায় এবং তাহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কিন্তু তাহা হয় না, শত কষ্টও সহ্য করিবে, প্রতি বৎসরই জ্বরে জ্বরে জীর্ণ হইয়া পড়িবে, অথচ নিজেদের এই সামান্য কাজটি তাহাদের দ্বারা হয় না। তাহারা ইহার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, হয় জমিদারের নিকট, না হয় জেলার বোর্ডের নিকট দরখাস্তের উপর দরখাস্ত ছাড়িবে, আর তর্ক করিবে। অথচ তাহাদের নিজেদেরই যে এই কার্য্য করিবার শক্তি আছে, তাহা তাহাদের জানা নাই। ইহাদের এই শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে; যতদূর সম্ভব তাহারা নিজের প্রয়োজন নিজেই যাহাতে সম্পন্ন করিতে পারে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। প্রতি বৎসরই হয় বাণের জলের আধিক্যে, অথবা একেবারে তাহার অভাবে কত স্থানের কৃষকদের ধান নষ্ট হইয়া যায়, দুই চারি দশ গ্রামের কৃষকেরা বৎসরের মধ্যে ২।৩ দিন কোদাল ও ঝুড়ি লইয়া কাজ করিলে হয় ত একটা প্রকাণ্ড বাঁধ তাহারা দিতে পারে, কিন্তু তাহাদের যে এ শক্তি আছে, তাহা তাহারা ভাবিতেই পারে না। এতই তাহাদের নিজের প্রতি অবিশ্বাস। "নাত্মানমবমানয়েৎ দীর্ঘমায়ুর্জিজীবিষুঃ।" দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা থাকিলে নিজকে অবমানিত করিতে হয় না। আমাদের পল্লীসমাজে এই যে নিজের প্রতি অবজ্ঞার ভাবটা ফুটিয়া উঠিয়া সকলকে জড়-জীর্ণ করিয়া দিতেছে ইহার অপনয়ন করিতে হইবে, এবং ইহা খুব শক্ত নহে।

যিনি কখন এই শ্রমজীবী ও কৃষকদলকে লইয়া কোন নির্ম্মল রজনীতে উন্মুক্ত আকাশের নিম্নে কথাবার্ত্তা বা আলাপ-পরিচয় করিয়াছেন, শিক্ষার কথা, শিল্পের কথা বাণিজ্যের কথা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাদের সহিত মিশিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবার সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তিনি জানিতে পারিয়াছেন ভদ্রনামধারী ব্যক্তিগণের অপেক্ষা তাহাদের হৃদয় কোনরূপেই শিক্ষাগ্রহণের এবং তাহার পরিচালনের অযোগ্য নহে; তাহাদেরও যথেষ্ট বোধশক্তি আছে, এবং কার্য্য করিতেও তাহারা পটু। গ্রামের তথাকথিত ভদ্রলোকগণের সহিত ইহাদের কেমন একটা বিচ্ছেদ আছে। উভয়েই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দিকে ধাবিত, কেহই কাহারও দিকে দেখে না, একের সুখ-দুঃখ অন্যের নিকটে পৌঁছায় না। এই দূর-ব্যবধানের উচ্ছেদ করিতে হইবে, এবং এক শিক্ষাপ্রচারেই ইহা সম্ভব। দেশের যাহারা মেরুদণ্ডস্বরূপ সেই শ্রমজীবী ও কৃষকগণকে টানিয়া না তুলিলে আমাদের বস্তুত উন্নতির সম্ভাবনা নাই। নানা উপায়ে, যিনি যেরূপে পারেন, তিনি সেইরূপেই ইহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুন। ইহাদের জন্য নৈশ পাঠশালার প্রতিষ্ঠা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় এবং ইহা দুষ্করও নহে। ইচ্ছা হইলেই অনেকেই ইহা নিজ নিজ গ্রামে করিতে পারেন। গ্রামের যিনি যাহা জানেন, অবসর মত এক-এক দিন তিনি তাহারই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এই সকল পাঠশালায় আলোচনা করিবেন। মুখে মুখে তাহারা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্যাদির কত কথা শিখিয়া ফেলিতে পারিবে। দেশ-বিদেশের কত কত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফেলিবে, ভূগোল-ইতিহাসের কথা শুনিয়া বিশ্বের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিবে।

উপনিষদের এক স্থানে আছে—"প্রজাপতি-রাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্"—প্রজাপতি নিজেকে দুইভাগে বিভক্ত করেন এবং তাহাতে পতি ও পত্নী হয়। আরো আছে—"অর্দ্ধো হ বা এষ আত্মনো যজ্জায়েতি"—স্ত্রী নিজের অর্দ্ধেক অংশ। ইহাই যদি পতি-পত্নীর সম্বন্ধ হয়, গৃহপতি যদি নিজের অপরার্দ্ধ গৃহপত্নীকেই লইয়া সম্পূর্ণ হন, তবে বলা বাহুল্য গৃহপত্নী অশিক্ষিত থাকিলে গৃহপতিরও শিক্ষা বস্তুত সম্পূর্ণ বলিতে পারা যায় না। শিক্ষার যদি আদৌ প্রয়োজন থাকে তবে তাহা যেমন পুরুষজাতির, সেইরূপ স্ত্রীজাতিরও। জল যদি তৃষ্ণাকে নিবারণ করিতে পারে, তবে তাহা পুরুষেরও করিবে, স্ত্রীরও করিবে; দীপ যদি অন্ধকার নাশ করিয়া গৃহকে উদ্ভাসিত করে, তবে তাহা, হে বন্ধু, তোমারও করিবে, আর ঐ যে সীমন্তিনী গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাঁহারও করিবে। এই একটা মোটা কথা লইয়া যখন এখনও কোন স্থানে বাদানুবাদ দেখিতে পাই, তখন অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। বালকদের শিক্ষার জন্য আমরা যেরূপ প্রয়াস করি, বালিকাদের ও অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার জন্য আমরা তাহার একাংশও করি না। আমাদের যে, এ কোন্ মোহ জমাট হইয়া গিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। একতর পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। হে পুরুষ, হয় তুমি তোমার সহধর্ম্মিণীকে তোমার মত শিক্ষিত করিয়া তোল, না হয় তুমিও যাহা কিছু শিখিয়াছ সমস্ত গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করিয়া, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, তোমার সহ-

ধর্ম্মিণীরই মত অশিক্ষিত সাজিয়া বস। আমার বিশ্বাস, বন্ধু, তুমি কিছুতেই দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিতে সম্মত হইবে না। যদি তাহাই হয়, যদি নিজে তুমি অশিক্ষিত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা না কর, তবে কি নিমিত্ত, কোন্ অধিকারে তুমি তোমার স্ত্রীকে অশিক্ষিত রাখিবে? কেন আমরা আমাদের গৃহিণী, ভগিনী, জননীকে শিক্ষিত দেখিব না?

মালদহে স্ত্রীলোকের সংখ্যা মোট ৫,০৫,৬১২। ইহার মধ্যে কয়টি স্ত্রীলোক কেবল লিখিতে ও পড়িতে জানে শুনিবেন? মোট ১,৬৬১! ইহার মধ্যে হিন্দু ১,১২১, আর মুসলমান ৫১৯। এখন ইহা আলোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য মনে হয়, আপনারা বিধান করুন।

বন্ধুগণ, আপনাদিগকে সম্মুখে লাভ করিয়া অনেক কথাই আমাদের মনে জাগিতেছে, কিন্তু সে সমুদয় বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত অবসর নাই। আমি আপনাদের অনেকটা সময় লইয়াছি, আপনাদের ধৈর্য্য-চ্যুতির সম্ভাবনা দেখিয়া শঙ্কিত হইতেছি, কিন্তু এখনো দুই একটি কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিবার রহিয়াছে, আশা করি তজ্জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

মাতৃভাষার সাহায্যে কোন বিষয়ের শিক্ষা সুলভ ও সুগম। ভাষান্তর শিক্ষা করিয়া তাহার দ্বারা কিছু শিখিতে গেলে তাহাতে অনেক অসুবিধা আছে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগকে মাতৃভাষারই সাহায্যে শিক্ষালাভের জন্য যত্ন করিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষা বঙ্গভাষা, অতএব বঙ্গভাষাতেই যদি আমরা সমস্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারি, তবেই আমাদের সুবিধা। বঙ্গভাষাকে এজন্য পরিপুষ্ট করিতে হইবে, এবং এই পরিপুষ্টি দুই উপায়ে হইতে পা[রে]। প্রথম, বঙ্গভাষায় নব-নব মৌলিক পুস্তকের প্রণয়ন; দ্বিতীয়, ভাষান্তরের অত্যাবশ্যক পুস্তকসমূহের বঙ্গভাষায় অনুবাদ। অনুবাদ-কার্য্য কিছু-কিছু আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তাহা কিঞ্চিৎ আশাপ্রদ হইলেও অনুরূপ বা আবশ্যকমত এখনো হয় নাই। এদিকে দ্রুতগতি না হইলে চলিবে না। পাশ্চাত্যভাষায় অভিজ্ঞ বাঙ্গালীর অভাব নাই, য়ুরোপীয় দর্শনাদিতে সুপণ্ডিত বাঙ্গালীও অনেক আছেন, কিন্তু কয়খানি পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানাদির পুস্তক অনূদিত হইয়াছে; কয়জন বাঙ্গালী এজন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন? প্রতি বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে কত এম্ এ বাহির হইতেছেন, তাঁহারা অধ্যাপকও হইতেছেন, তাঁহাদের ছাত্রেরাও আবার উত্তীর্ণ হইতেছেন, অথচ এ পর্য্যন্ত একখানিও য়ুরোপীয়-দর্শন-বিষয়ক পুস্তক বাঙ্গালায় বাহির হইল না। মাসিক পত্রিকাগুলিতেও ক্বচিৎ-কদাচিৎ এক-আধটা দার্শনিক প্রবন্ধ দেখা যায়, তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। ভারতবর্ষ দার্শনিকের দেশ। ঐ য়ুরোপীয় দর্শন যদি আমাদের সংস্কৃতদার্শনিকগণের নিকট উপস্থিত হয়, তবে কত উপকার হয়। কিন্তু ভাষার প্রতিবন্ধকতাই সমস্ত বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক আজ গল্প লিখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। গল্প লিখিবার অনেক লোক আছে, তাঁহারা না হইলে যে, এ দিক্টা শূন্য। অতএব তাঁহারা এই দিকেই দৃষ্টিপাত করুন। এক-এক জন এক-একটি বিষয় লইয়া সংগ্রহ করিতে থাকিলে অল্প দিনেই ভাণ্ডার পূর্ণ

হইয়া উঠিবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম্ এ মহাশয় গ্রীক্‌ভাষা হইতে দুইখানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া আমাদিগকে দিয়াছেন! শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আজীবন অনুবাদ-কার্য্যে ব্রতী হইয়া রহিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি ফরাসীভাষা হইতে অনুবাদে নিযুক্ত আছেন। এইরূপই কতকগুলি ধৈর্য্যশীল পরিশ্রমী অনুবাদকের প্রয়োজন।

আমরা কোন কাজ আরম্ভ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ফল দেখিবার জন্য উৎসুক হই, নাম জাহির করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ি। কার্য্যের দিকে যাঁহার লক্ষ্য নাই,—তিনি প্রধানত নামের দিকে লক্ষ্য করেন, তাঁহার কার্য্য ত ভাল হয়ই না, নামও হয় না। কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া যত্নের সহিত যদি কোন কাজ করা যায়, তবে কাজটাও ভাল হয়, আর নামও হয়। মালদহেরও মধ্যে কি কেহ কেহ এদিকে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইবেন না ?

সংস্কৃতভাষা—সংস্কৃতসাহিত্য জগতের সর্ব্বত্র নিজের মহিমা প্রচার করিয়াছে। সংস্কৃতের সহিত ভারতীয় ভাষার—বঙ্গভাষার কত নিকট সম্বন্ধ, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। সংস্কৃতের নিকট হইতে বাঙ্গালা অনেক লইয়াছে, আরও তাহাকে অনেক লইতে হইবে। তাহাকে ছাড়িয়া দিলে ইহার পরিপুষ্টি অসম্ভব। বঙ্গভাষার অভ্যুদয়ের জন্য সংস্কৃতেরও প্রচার অত্যাবশ্যক। শুনিয়াছি পূর্ব্বে মালদহের গোবিন্দপুর, ভর্ত্তিপুর, গয়েশপুর, পোখরিয়া ইত্যাদি গ্রামে একশত দেড়শত সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল, কিন্তু এখন আজ আপনারা যেখানে সমবেত হইয়াছেন, সেই গ্রামে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরত্ন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উল্লেখযোগ্য একটীমাত্র চতুষ্পাঠী রহিয়াছে। আর আড়াইডাঙ্গায় নূতন একটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং মালদহ-সহরেও একটির প্রতিষ্ঠা-সংবাদ শুনা যাইতেছে। জেলায় সংস্কৃতভাষার যাহাতে বহুল প্রচার হয়, তাহা আমাদের সকলেরই বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর দুইটি ভাষার প্রচার করিতে পারি, এবং করা উচিত। পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য কোন মতেই আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের সম্পূর্ণতাবিধানে পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যই সমর্থ। ভারতের মধ্যযুগের ধর্ম্মে ও সমাজে ত্রিধারার আবির্ভাব হইয়াছিল, এক দিকে বৌদ্ধ, আর এক দিকে জৈন, এবং মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধারা। পালিসাহিত্যের এক-আধটু আলোচনা দেখা গেলেও প্রাকৃত সাহিত্য, বিশেষত প্রাকৃতনিবদ্ধ জৈন সাহিত্য এখনও আমাদের আলোচনার পথে উপস্থিত হয় নাই। সংস্কৃতের সহিত পালি ও প্রাকৃতের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, অনায়াসে তাহার সহিত ইহাদের আলোচনা চলিতে পারে। প্রাকৃত ত হইয়াই থাকে, যদিও অধ্যাপক মহাশয়গণ প্রায়ই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া ইহার প্রতি যত্ন বা আদর প্রদর্শন করেন না।

কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে গান্ধর্ব্ব বা সঙ্গীত-বিদ্যা অতি-উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। যে-যে স্থানে ইহা আলোচিত হয়, প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা একটি বিলাসের উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, ইহা যে একটি বিদ্যা, তাহা বিচার করিয়া দেখা হয় না। আমাদের পৌরাণিক আচার্য্যগণ সঙ্গীতকে অষ্টাদশবিধ বিদ্যার মধ্যে স্থান দিয়াছেন। তাঁহারা ইহাকে বেদের ন্যায়

সম্মান করিতেন, এবং সেই জন্যই গান্ধর্ববেদ বলিয়া ইহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সঙ্গীতের কোন স্থান নাই, যে সমস্ত নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনা-জল্পনা, আন্দোলন-আলোচনা শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; তাহাদেরও মধ্যে সঙ্গীতের কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশান্তরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতের স্থান আছে, এবং তাহা অতি-সঙ্গত। ভারতের সঙ্গীতবিষয়ে নিজের বিশেষত্ব প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, শিক্ষিতগণ এদিকে প্রায় উদাসীন, ভারতের নিজের চিন্তিত, নিজের আবিষ্কৃত যন্ত্রসমূহের দর্শন পাওয়া দূরের কথা, নামও শুনিতে পাওয়া যায় না। গত বৎসর বড়দিনের সময় বোম্বাই সহরের গান্ধর্ব্ব-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ কলিকাতায় আসিয়া কয়েকদিন নাগরিকগণকে ভারতীয় সঙ্গীতকলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য যন্ত্রাদি আসিয়া ভারতীয় সঙ্গীতকলাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। লোকে একটু চেষ্টা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া আসল রস অনুভব করিবার ইচ্ছা করে না, কেবল উপরের ভাসা-ভাসা যৎকিঞ্চিৎ পাইয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। অভিনয়গুলি ত পাশ্চাত্য-ভাবে পূর্ণ, যাত্রার দলও ক্রমশ সেইরূপ হইয়া পড়িতেছে। দেশীয় বাদ্যযন্ত্র প্রায়ই বহিষ্কৃত হইয়াছে। আতোদ্য বা ঐকতানিক বাদ্যে বৈদেশিক যন্ত্রই অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়, অথচ পূর্ব্বোক্ত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ দেশী যন্ত্রসমূহে যে বাদ্য শুনাইয়াছিলেন, তাহা অল্প চিত্তাকর্ষক নহে। সঙ্গীত যখন ব্যসন-রূপে পরিণত হয়, তখনই তাহা অনর্থ প্রসব করে, সংযতভাবে তাহার অনুশীলন কখনই অকল্যাণের কারণ নহে।

সঙ্গীতের দ্বারা সাহিত্যের রসপুষ্টি হয়। কাব্যার্থ গীত হইলে শ্রোতার মর্ম্ম অধিকতর ভাবে তাহা স্পর্শ করে। সাহিত্য সমাজে যাহা করিতে চাহে, সঙ্গীত সংযোগ হইলে তাহা আরও সুচারুভাবে করিতে পারে। ভারতের আদি মহাকাব্য এখনও নানারূপে গীত হইয়া শ্রবণবিবরে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। সঙ্গীত সাহিত্যেরই অঙ্গ। ইহাকে বর্জ্জন করিলে সাহিত্য বিকল বলিয়া গণনীয়। অতএব সাহিত্যিকগণের এ বিষয়ে নেত্র নিমীলন করিয়া অবস্থান করা কোনরূপেই উচিত নহে। যে-কোনরূপেই হউক এক-আধটু সঙ্গতীচর্চ্চা প্রায় সর্ব্বত্রই আছে। কেবলমাত্র বিলাসের উপকরণ মনে না করিয়া, বিদ্যাহিসাবে যাহাতে ইহা সকলে অনুশীলন করেন, এবং ভারতীয় সঙ্গীতকলা রক্ষিত হইতে পারে, সঙ্গীতপ্রিয়গণ এজন্য চেষ্টিত হউন।

বিধাতার সৃষ্টিতে সব সমান হয় না, হইতে পারেও না, এবং হইলেও তাহাতে সৃষ্টি থাকে না; কেননা বৈচিত্র্যই সৃষ্টির লক্ষণ, সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়ী। অতএব সৃষ্টিরই নিয়মে লোক নানাপ্রকার হয়, সকলেই ভিন্ন-ভিন্ন শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ে বিশেষত্ব থাকে এবং তাহারই প্রয়োজন। যিনি যেরূপে পারেন তিনি আমাদের সাহিত্য-পরিপুষ্টির জন্য সেইরূপেই তাহা করিবেন। যিনি ধনবান্ তিনি ধন দিয়া সাহায্য করুন, যিনি বুদ্ধিমান্ তিনি বুদ্ধি প্রদান করুন, বিদ্বান্ বিদ্যা প্রদান করিবেন, শাস্ত্রদর্শী শাস্ত্রের কথা উপদেশ করিবেন, ধার্ম্মিক ধর্ম্মপ্রচার করিবেন; এই-

রূপে যাঁহার যাহা শক্তিতে কুলায়, তাঁহাকে তাহাই করিতে হইবে, তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিতে হইবে। অগ্নির নিকট আমরা জলের শীতলতা প্রার্থনা করিব না, বা জলের নিকট অগ্নির উষ্ণতা চাহিব না। যাঁহার যাহা আছে তিনি তাহাই দিয়া আত্মাকে প্রকাশিত করুন। দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই কেবল বিশ্বের নিকট নিজকে সমর্পণ করিতেছে। তাহাতেই তাহার সার্থকতা। গোলাপ ফুলটি নিজের অন্তরের ভিতরে যে সৌরভসম্ভার সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই ত কেবল প্রকাশ করিয়া বিশ্বের মধ্যে উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে, গোলাপের গোলাপত্ব তাহাতেই প্রকাশ পাইতেছে। সে নিজের জন্য এক কণাও রাখিয়া দিতেছে না। যখনই তাহা সেই সৌরভ-সঞ্চয়ে পরাঙ্মুখ থাকে, তখন তাহার বস্তুত আত্মপ্রকাশ হয় না, তাহার সার্থকতা লাভ হয় না। সূর্য্য নিয়তই এইরূপ বিশ্বের নিকটে নিজকে উন্মুক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়া উৎসর্গ করিতেছে। বর্ষার মেঘ এইরূপেই জলরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়া বিশ্বের নিকটে সমর্পণ করিতেছে। জগতের সমস্ত ভূতই এইরূপে নিজকে প্রকাশ ও উৎসর্গ করিতেছে। প্রকাশ ও উৎসর্গ ইহাই জগতের নিয়ম। অতএব বন্ধুগণ, প্রকৃতির নিয়মে এই ভাবেই পরিচালিত হওয়া আমাদের স্বভাব, আমরা যেন এই স্বভাব হইতে স্খলিত না হই। আমরা যে যাহা পারি তাহাই করিব, এমন কি একটি কথাও উচ্চারণ করিয়া, যেন সাহিত্যসেবা করিতে পারি, এবং এই সাহিত্য-সেবা দ্বারা বিশ্ব-সাহিত্যের সেবা করিয়া এই সমগ্র বিশ্বের সেবায় সমর্থ হইতে পারি। কলিগ্রাম-বাসীরা আজ এই বিশ্বসেবা-যজ্ঞে আপনাদিগকে আহ্বান করিয়া মনে মনে নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেছেন, আজ তাঁহারা নিজের শত শত ত্রুটির দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া আপনাদের সন্দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। আপনাদের শুভাগমনে তাঁহাদের এই যজ্ঞ যেন সুচারু সম্পন্ন হয়। আপনারা প্রসন্ন হউন, এবং এই যজ্ঞদেবতাও প্রসন্ন হইয়া আমাদের সকলের উপর মঙ্গলাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

মফঃস্বলের বাণী

বিপন্ন মধ্যবিত্ত

দেশের অবস্থা যতই চিন্তা করা যায়, ততই প্রাণে হতাশ-ভাবের সঞ্চার হয়—প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন সর্ব্বত্র হয় ভারতেও তেমন মানবের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু হইতেছে। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ভারতবাসীর একটা বিষম চেষ্টা করিতে হয় এবং সেই জীবনধারণের চেষ্টা যখন আশানুরূপ ফল প্রসব করে না, তখন মানব-মনে একটা ভীষণ উদ্বেগের উৎপত্তি হয়।

আজ ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র বিষম অন্নকষ্ট উপস্থিত—সর্ব্বত্র নীরব এবং সরব হাহাকার উত্থিত হইতেছে—এবং বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথমে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিবর্গ এই বিষম আহবে প্রাণ ত্যাগ করিবে এই আশঙ্কা বদ্ধমূল হইতেছে।

বঙ্গদেশের জনসমূহকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—জমিদার, মধ্যবিত্ত ও চাষী। এই শ্রেণী-বিভাগ বঙ্গদেশে ইংরেজরাজ-প্রবর্ত্তিত প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক

বিধানের ফল। জমিদার পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত মূলধনের উপসত্ব অনায়াসে হজম করে। চাষা প্রজা ক্ষুদ্রায়তন জমি ও উচ্চাকাজ্ক্ষাহীন সঙ্কীর্ণ জীবন লইয়া কাল কাটায়। প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের অনুবলে সে জমির কার্য্যতঃ মালিক, তদুপরি শস্যের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় সে একান্ত অক্ষম না হইলে অনশন-ক্লেশ বড় বেশী ভোগ করে না। সমস্যা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিকে লইয়া—মধ্যবিত্ত ব্যক্তি সমাজের মেরুদণ্ড। জীবনযুদ্ধে তাহারা সর্ব্বত্রই অগ্রসর এবং তাহারাই চিরকাল বিজয়-মুকুট অধিকার করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশ আজ যাহা, তাহা সম্পূর্ণই মধ্যবিত্তদের দ্বারা হইয়াছে। দেশের যাবতীয় উন্নতি তাহারা করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু সেই মধ্যবিত্তের মুখে আজ অবসাদের করাল ছায়া আপতিত হইয়াছে। ইহারা জানে সমৃদ্ধির কোলে ইহাদের জন্ম হয় নাই। অতএব আত্মচেষ্টায় আত্মরক্ষা করিতে হইবে। তাই তাহাদের সমস্ত বৃত্তিগুলি পরিচালিত ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া দাড়ায়। ইহারাই ত্যাগী, সাহসী ও কর্ম্মী। ইহাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও তেজোবীর্য্যে জগৎ স্তম্ভিত। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, মহেন্দ্র সরকার, জে সি বসু, পি সি রায়, সুরেন্দ্রনাথ, অশ্বিনীকুমার, শিশিরকুমার, মতিলাল, হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণদাস, বিপিন পাল, অরবিন্দ প্রভৃতি ইহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু আজ যেন অবস্থা শোচনীয় মনে হয়! আজ মধ্যবিত্তের গ্রাসাচ্ছাদনের পথ প্রায় সংরুদ্ধ। স্বল্পবিত্তে কাহারও সংসার আর চলে না—শিক্ষার জন্য অর্থ ও শক্তি ব্যয় করিয়া যে অর্থাগম-পন্থা আবিষ্কার হইতেছে, তাহার সংখ্যা সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিতেছে। চাকুরীতে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়—তথাপি চাকুরী করিয়াও কত পরিবার উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিতেছিল—কিন্তু চাকুরী ত আর জুটে না! ইহারাও কৃষকের উৎপন্ন অর্থ ভাগবণ্টন করিয়া লয়—উকীলভাবে, ডাক্তারভাবে—মোক্তারভাবে—বা দোকানদারভাবে কৃষকের ধনে অংশ বসায়! দেশের শস্য-ক্ষেত্র তাহাদের হস্তে নহে—বুঝি তাহা হস্তে রাখিবার শক্তি তাহাদের নাই। অনাহারে বা অল্পাহারে তাহাদের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে—একপুরুষ পূর্ব্বে যাহারা শারীরিক বীর্য্যে গৌরবান্বিত ছিল তাহারা আজ ক্ষীণপ্রাণ ক্ষীণজীবী! ৩০৲ টাকা বেতনের কর্ম্মচারীকে আজ ৭৲ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়—সে তাহার সন্তানসন্ততির জন্য অর্থ সংস্থান করিয়া সুশিক্ষা, সুষ্ঠু আহার ও স্বাস্থ্যকর আবাসস্থল ব্যবস্থা করিতে পারে না—ফল তাই বিভীষিকাময়ী হইয়া দাঁড়াইতেছে!

জীবন-যাত্রা সুনির্ব্বাহের জন্য কৃষি সর্ব্বপ্রথম ব্যবসা—তৎপর শিল্প-বাণিজ্য। এদেশে কৃষি যাহাদের হস্তে ন্যস্ত আছে তাহারাই তাহার উপযুক্ত রক্ষক—আজ যাহারা মধ্যবিত্তদিগকে কৃষি-কার্য্যে মনোযোগ দিতে বলেন তাহারা একদেশদর্শীর ন্যায় উপদেশ দেন। এদেশে এখন আর এত অনাবাদী জমি পড়িয়া নাই যাহা ভদ্রসন্তানগণ চাষআবাদ করিতে পারেন, অথচ অন্যের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে হয় না! আমি নূতন চাষী হইয়া আমার একজন বা শতজন চাষী ভ্রাতাকে নিরন্ন করিব—এ ব্যবস্থা কাগজে পত্রে বেশ শুনায়, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে দেশের আর্থিক উন্নতি হয় না। কিন্তু সামাজিক অবস্থায় একটা উলট পালট হইতে

পারে মাত্র। অনতিকাল বিলম্বে এই সমস্যা উপস্থিত হইবে তাহারও সন্দেহ নাই। আজই চাষী মুসলমান শিক্ষিত হইতেছে, তাহারা অবশ্য অধুনাতন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মত চাষ ছাড়িয়া চাকুরী ধরিবে, তখন তাহাদের পরিত্যক্ত জমিতে ভদ্রমহোদয়গণ হাল চষিবেন। শুধু চাষী কেন, নিম্নশ্রেণীর শূদ্রগণ বাসায় ভাণ্ডারী থাকিতে এখন আর প্রস্তুত নহে—তাহারা প্রত্যেকে আজ ক্ষত্রিয় হইবার জন্য বদ্ধপরিকর। সহরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত দোকানের দিকে চাহিলে দেখা যাইবে এই শ্রেণীর লোকেরা কেহ পান-সিগারেট, কেহ সোডালিমনেড বা মিঠাই বিক্রয় বা ফেরি করিতেছে। ফলে দাঁড়াইতেছে প্রকৃত অর্থ উৎপন্নের ভার একমাত্র নমঃশূদ্র এবং মুসলমানের হস্তে কৃষিক্ষেত্রেই রহিল। অন্য কুত্রাপি নহে। যেমন উকীল, ডাক্তার, মোক্তার, দোকানদার কৃষকের উৎপন্ন অর্থে ভাগ বসান, ইহারাও তেমন সেই অংশে ভাগ বসাইতেছে মাত্র। অতএব সমাজে অর্থ অপেক্ষা অনর্থের সৃষ্টি বেশী হইতেছে।

এই সমস্ত চাপে পড়িয়া মধ্যবিত্ত আজ মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছে—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্ট মধ্যবিত্ত অচিরে ধ্বংসপুরে গমন করিতে বসিয়াছে। শিল্প ও ব্যবসায় ভিন্ন তাহাদের গতি নাই—অথচ সাধারণজনগণের দৃষ্টি এখনও তেমন এদিকে গমন করিতেছে না তাই বাঙ্গালার মেরুদণ্ড আজ ভগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে—এ সমস্যা পূরণ না হইলে দেশে শান্তি আসিবে না।

বরিশাল-হিতৈষী

যৌথকারবারের কূটতত্ত্ব

একটী প্রবাদ আছে, "অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়।" আমরা এ কথাটা মুখে বলি বটে, কিন্তু কাজে তাহা করি কি? গরীবের ছেলে লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, এটাও একটী প্রবাদ-বচন। আমরা এই প্রবাদেরই দাস হইয়া আছি। তাই আমরা আদার-ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর লইতে ব্যস্ত, বড় বড় যৌথকারবার চালাইতে উন্মত্ত, রাতারাতিই বড়লোক হইবার জন্য অধীর। যে কার্য্যে আমাদের কিছুমাত্র পারদর্শিতা নাই, সংবাদপত্রে বা লোকমুখে লাভের কথা শুনিয়া সেইরূপ একটী কার্য্য চালাইবার খেয়াল মাথায় আনিয়া থাকি। সংবাদপত্রে যেই পড়িলাম ভারতের রেলকোম্পানী এবার ৮কোটী টাকা লাভ করিয়াছে, অমনি আমাদের রেলগাড়ী চালাইতে খেয়াল চাপে। ম্যানচেষ্টারের বস্ত্রব্যবসায়ীদের বস্ত্রের লাভের কথা শুনিয়া কাপড়ের কল স্থাপন করিতে প্রাণ আন্‌চান্ হইয়া উঠে। সাময়িক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এই সমস্ত কার্য্য করিতেছি বটে, ফলে টিকিতেছে কয়টী? লাভ হইতেছে কয়টী হইতে? এ পর্য্যন্ত বড় বড় যতগুলি যৌথকারবারের চেষ্টা হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই ফেল পড়িয়াছে। আর যেগুলি আছে তাহাও ভাল চলিতেছে না। এ সব হইতেছে কেন?

কোনও একটী ব্যবসায় চালাইতে সে কার্য্যে অভিজ্ঞতা চাই। তাহা ভিন্ন দক্ষতারও বিশেষ প্রয়োজন। আবার দূরদর্শিতা না থাকিলে কোন কার্য্যেই উন্নতি হইতে পারে না। এই সমস্ত গুণের অধিকারী হইতে হইলে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অতি কমই হইয়া থাকে। ব্যবসায়-বিজ্ঞানে জ্ঞানের অল্পতাই আমাদের কৃতকার্য্যতার এক প্রধান অন্তরায়।

ইহা ভিন্ন পাশ্চাত্যদেশবাসী যেরূপ মূলধন লইয়া কল-কারখানা স্থাপন করে, আমরা তাহা করি না। আমরা গরীবের সন্তান লক্ষ টাকার ভাবনাতেই অস্থির হইয়া উঠি, তাই আমাদের মস্তক কোটীর দিকে ধাবিত হয় না। ম্যানচেষ্টারের একটী কাপড়ের কলের সহিত আমাদের দেশের একটী কাপড়ের কলের মূলধনের তুলনা কর, দেখিবে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আমরা অতি সামান্য মূলধনেই তাহাদের প্রতিদ্বন্দী হইতে ইচ্ছা করি, এই ইচ্ছা ফলবতী হইবে কেন? আমরা মিতব্যয়ী হইতে যাইয়া তাহাদের পরিত্যক্ত পুরাতন কল ও বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া বসি। তাই আমাদের যন্ত্রের কার্য্যসম্পাদিকা শক্তি তাহাদের যন্ত্রের সমতুল্য হয় না। কিছুদিনপর কলটী বিকল হইয়া যায়। "পর্ব্বতের ইন্দুর-প্রসবের মত" আমাদের লক্ষ টাকার স্বপ্ন এই স্থানেই শেষ হইয়া থাকে। পাকা সোয়ার না হইলে যেমন ঘোটক হইতে প্রতি পদেই পড়িবার আশঙ্কা থাকে, উপযুক্ত রূপ মূলধনের অভাবেও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রতি পদেই পতনের আশঙ্কা রহিয়া যায়।

আমাদের দেশের যৌথকারবারের আরও একটী দোষ ঘটিয়া উঠিয়াছে। একটী কল-কারখানা স্থাপিত হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অংশীদারগণ লভ্যাংশের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। ভাবিয়া দেখিলে এটীও আমাদের যৌথকারবারের একটী প্রধান অন্তরায়। এই ত সেদিনের কথা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। ভাগ্যিস্ উপযুক্ত কর্ণধার ছিল, তাই কলটী প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে। যৌথকার-বারের অতি শৈশব অবস্থায় লাভের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কিরূপভাবে কলটী ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই উচিত। প্রত্যেক অংশীদারের চক্ষু এই দিকে পড়িলে কলের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। ভবিষ্যতে ক্ষতির সংস্থা যে ব্যবসায়ের এক প্রধান মূলসূত্র, তাহা প্রত্যেক অংশীদারের জানিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

কলকারখানার উপযুক্ত পরিচালকও আমাদের দেশে নাই। এই কার্য্যসম্পাদনের জন্য ভিন্নদেশ হইতে লোক আনিতে হয়। ইহাতেও অনেক অর্থ বিদেশীদের হাতে দিতে হয়। দেশীয় পরিচালকের অভাবও আমাদের যৌথকারবার-পরিচালনের এক প্রধান অন্তরায়। সম্প্রতি আমাদের দেশের কতকগুলি উৎসাহশীল যুবক আমেরিকা, জাপান, ইউরোপ প্রভৃতি স্থান হইতে নানা-রূপ ব্যবসায়ে শিক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। এটী অতীব সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। এই সঙ্গে যাহাতে তাহারা উৎসাহ পায়, আমাদের সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন সততাই যে ব্যবসায়ের মূল, এ কথাটী আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

আমাদের দেশের বড় বড় যৌথকারবার-গুলির দুর্দ্দশা দেখিয়া আরও মনে হয়—আমাদের দেশে প্রকৃত যৌথকারবারের সময় উপস্থিত হয় নাই। আর যদিও আসিয়া থাকে, সেটী নিতান্তই শৈশব অবস্থা। প্রকৃত যৌথকারবার চালাইতে যে শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষা আমাদের আজ পর্য্যন্তও হয় নাই। ঢাল নাই তরবারী নাই, নিধিরাম সর্দ্দার সাজিলে যুদ্ধে জয়লাভ হইবে কেন?

লোকে কথায় বলে 'সরিষা কুড়াইতে কুড়াইতেই বেল হয়।" দেশের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই প্রবাদই আমাদের মূল-মন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই প্রবাদের এ স্থানে ব্যাখ্যা এই যে সামান্য মূলধনে সামান্যরূপ ব্যবসায় হইতেই বড় বড় ব্যবসায় হইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথকারবার চালাইবার বিদ্যা মাথায় আসিবে। যাহার যে বিষয়ে ভাল জ্ঞান আছে, যাহার যে বিষয়ে কার্য্যক্ষমতা জন্মিয়াছে, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তাহার সেই বিষয়েই ধাবিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের যৌথকারবার নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, অগ্রে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র যৌথকারবার করিয়া সে ভ্রম দেশ হইতে দূর করিতে হইবে। কোনও কারণে যৌথকারবারের প্রারম্ভে ক্ষতি হইলে, তাহা দেশব্যাপী একটা নৈরাশ্যের ভাব সঞ্চার করিয়া দেয়। ভবিষ্যতে শ্রীবৃদ্ধির মুখে কণ্টক পতিত হয়। আমাদের যৌথকারবার-গুলির মুখে যে কলঙ্ক-কালিমা পড়িয়াছে, সেই কলঙ্ক মোচন করিতে সম্প্রতি বৃহদাকার কারখানার পরিবর্ত্তে সামান্য মূলধনের সহিত আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কার্য্যকুশলতার যোগ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথকারবারে উন্নতি দেখাইতে হইবে। তবে ত যৌথকারবারের কলঙ্ক দূর হইবে। আমরা যদি এইরূপ শনৈঃপন্থা অবলম্বন করি, তাহা হইলে আশা হয় একদিন পর্ব্বত লঙ্ঘনও করিতে পারিব।

স্বরাজ

বাল্যসমিতি

বিক্রমপুরের মধ্যে আউট-সাহী একখানা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে "বাল্য-সমিতি" নামে বালক ও যুবকদের একটি সমিতি আছে; ইহার সংশ্লিষ্ট একটী সাধারণ পাঠাগার, বিপন্নবান্ধব-সম্প্রদায় বা সেবা-সমিতি, দরিদ্র-ভাণ্ডার এবং ছোট রকমের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। গ্রামের ছেলে ও যুবকগণই ইহার প্রাণ। বৃদ্ধগণও যথাসাধ্য উপদেশ ও অর্থাদি সাহায্য করিয়া থাকেন।

গত ২৫শে আশ্বিন শনিবার বাল্য-সমিতির ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এম, এ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিল্পদ্রব্য ও প্রবন্ধের প্রতিযোগিতা-স্থায়ী রমণী ও বালকদের মধ্যে পুরস্কার বিতরিত হইলে সভার কার্য্য শেষ হয়। এই দিনই ঢাকা মিটফোর্ড হাঁসপাতালের অবসর-প্রাপ্ত ডাক্তার রায় সাহেব গুরুনাথ সেন মহাশয় বাল্য-সমিতির নব গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরের একটী পল্লীগ্রামের যুবকগণ যাহা করিতেছে, তাহা অনেক সহরেই হয় না, অথচ আমরা সহরের বড় বড়াই করিয়া থাকি। দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই সহরে বাস করেন। তাঁহারা কি স্থানে স্থানে এমনতর সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া ছেলেদের মনে ধর্ম্ম ও সেবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিতে পারেন না? এখনকার স্কুল-কলেজের শিক্ষা, হাওয়ার শিক্ষা। কেরাণীগিরী ছাড়া কার্য্যক্ষেত্রে এই প্রকার শিক্ষার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া তো মনে হয় না। বিশেষতঃ এখনকার স্কুল-কলেজসমূহে ধর্ম্ম-শিক্ষার নিতান্তই অভাব। সুতরাং স্কুল-কলেজে যাহা হওয়ার সম্ভাবনা নাই এমন ধর্ম্ম-শিক্ষা, লোক-সেবা, চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন যাহাতে সম্পাদিত হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত বাহিরের পুস্তকাদি পড়িয়া যাহাতে ছাত্রগণ নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ সাধন করিতে সক্ষম হয় তাহার ব্যবস্থা আমাদিগকেই করিতে হইবে। বরিশালে দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনী বাবুর উদ্যোগে এমনএকটী সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এখনও উহা আছে এবং সকলেই উহার কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া থাকে।

এখন বন্ধ-উপলক্ষে, পুরস্কার-বিতরণ-উপলক্ষে স্কুল-কলেজগুলি একটা নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়। মাষ্টার প্রফেসরগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া থাকেন। ইহাতে সংযম-ভ্রষ্ট হইয়া ছাত্রগণ বল্গাবিহীন অশ্বের ন্যায় কুপথে যে পরিচালিত না হয় তাহা নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল ব্যাপারে শিক্ষকদের যে প্রকার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, ছাত্রদের নৈতিকজীবন-গঠনে, তাহাদিগকে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার তেমন আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয় না। স্কুলে ধর্ম্ম-শিক্ষা নাই, নীতি-শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই—এ সব কথা নিয়া আমরা গভর্ণমেণ্টকে দোষ দিয়া সকল বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব একবারে ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহি। যাহারা তাহা না করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্যজ্ঞানে ছেলেদের এ সকল শিক্ষাদানে অগ্রসর তাহারাই ধন্য।

বিক্রমপুর আউটসাহীর এই দৃষ্টান্ত সকল স্থানেই অনুসৃত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

ত্রিপুরা-হিতৈষী

গোপাষ্টমী

সোদপুরের নিকট মাড়োয়ারীগণ কর্ত্তৃক পিঞ্জরাপোল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত নয় বৎসর যাবৎ এই পিঞ্জরাপোলে প্রতি কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে গোপাষ্টমী-উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কলিকাতা ও অন্যান্য নানা স্থান হইতে বহু লোক প্রতি বৎসর তথায় সমবেত হইয়া থাকেন। এই দিবস গরু সকলকে উত্তমরূপে ভোজন করান হয় এবং নানাবিধ স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারে সজ্জিত করা হয়। এই উৎসবের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য নানা স্থান হইতে বহুলোক আসিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন ও অন্যান্য দ্রব্যের দোকান খুলিয়া থাকেন। নানাবিধ বাদ্য-গীতাদি ও বায়স্কোপ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারীগণ ও অন্যান্য হিন্দুগণ এই উৎসবের দিনে গো সকলকে মিষ্টান্নাদি ভোজন করান ও তাহাদের সেবা করিয়া থাকেন। গো-মাতার সেবা-কার্য্যে মাড়োয়ারীসম্প্রদায় যেরূপ অর্থব্যয় ও যত্ন করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারা সমগ্র হিন্দুসমাজের ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত গোরক্ষিণী সভা হিন্দুর গৌরবের বস্তু।

পূর্ব্বে গৃহস্থগণ বৃদ্ধ বা অকর্ম্মণ্য গো-সকলকে অযত্ন করিত, যতদিন গাভী সকল দুগ্ধ প্রদান করে, ততদিন তাহাদের সেবা করিত; কিন্তু পরে তাহাদের অকর্ম্মণ্যতাবশতঃ তাহাদের প্রতি অযত্ন করিত। অনেকে ক্ষমতা না থাকায় তাহাদিগকে পূর্ণমাত্রায় খাইতেও দিত না। নীচজাতীয় অনেকে এরূপ অকর্ম্মণ্য গো সকলকে কসাইদের নিকট বিক্রয় করিত। যাহার স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করা হয়, অকৃতজ্ঞ মানব তাহাদিগকে বার্দ্ধক্যাবস্থায় কসাইদের নিকট বিক্রয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে লজ্জাবোধ করে না। অধিকন্তু অকারণ তাহাদের ভোজন করানর দায় হইতেও নিষ্কৃতিলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু সহৃদয় গোমাতার সেবক প্রকৃত হিন্দু মাড়োয়ারীগণ এইরূপ গোশালা স্থাপন করিয়া সমগ্র হিন্দুর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এই গোশালার কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ ব্যয়ের জন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ী মাড়োয়ারীগণ নিজেদের লভ্যাংশের অতি অল্পমাত্র সঞ্চয় করিয়া থাকেন, কিন্তু এই বিন্দু বিন্দু বারি সঞ্চয় করিয়া তাঁহারা এক প্রকাণ্ড তড়াগ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে যেরূপ উদ্যোগী ও সচেষ্ট, তাহাতে ইহা শীঘ্রই এক বিশাল সমুদ্রে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই। হিন্দু মাত্রেরই এই সৎকার্য্যে যোগদান করা কর্ত্তব্য। অধুনা ক্রমশঃ যেরূপ গো-কুল ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই গো-কুল নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং গো-মাতার রক্ষার জন্য সকলেরই বিশেষভাবে যত্ন করা উচিত। যাহার দুগ্ধই অক্ষম বাল্যাবস্থায় জীবন-ধারণের একমাত্র সম্বল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করাই সঙ্গত। কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানব তাহার প্রতি অযথা অত্যাচার করিয়া থাকে, অবলা পশু-জাতি বিনা বাধায় সজল নয়নে অকৃতজ্ঞ মানবের সেই অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকে। গাভীর দুগ্ধের তুল্য উৎকৃষ্ট খাদ্য নাই। গাভীই মাতৃস্থানীয়া হইয়া অসহায় অবস্থায় আমাদের জীবন রক্ষা করেন, সুতরাং হিন্দুগণ গোমাতাকে দেবতাস্থানীয়া বলিয়া মনে করেন, তাহার পূজা, সেবা প্রভৃতি পুণ্যজনক বলিয়া মনে করেন। এই গোপাষ্টমীর উৎসবে হিন্দুমাত্রেরই যোগদান করা কর্ত্তব্য এবং ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য সকলের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

দর্শক।

পরিশিষ্ট

গুরুণা স্ত্রৈণঃ। ৫৫।

নবমে কারকাংশে চ গুরুযুক্তেক্ষিতে দ্বিজ।
স্ত্রীলোলুপো ভবেদ্বালো বিষয়ী নৈব জায়তে॥

কারকাংশান্নবমে রাশৌ গুরুণা দৃষ্টে যুক্তে বা সতি জাতকঃ স্ত্রৈণঃ স্ত্রীলোলঃ স্যাদতএব বিষয়েষু উদাসীনো ভবেদিতি পরাশরঃ। ভৃগ্বঙ্গারক বর্গেতি পদমত্র নিবৃত্তং॥ ৫৫॥

কারকাংশ রাশির নবমে বৃহস্পতির যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে, মনুষ্য স্ত্রীলোলুপ এবং তজ্জন্য বিষয়স্পৃহা বিরহিত হয়। এই স্থান হইতে কুজ শুক্র বর্গের আর অনুবৃত্তি নাই॥ ৫৫॥

রাহুণার্থনিবৃত্তিঃ। ৫৬॥

কারকাংশে চ নবমে ক্ষতযুক্তেক্ষিতে দ্বিজ।
পরস্ত্রীসঙ্গমাদ্ বালো বন্ধকো ভবতি ধ্রুবম্॥

কারকাংশান্নবমস্থানস্থিতেন নবমদ্রষ্ট্রা বা রাহুণা পুরুষস্য পরস্ত্রী-সঙ্গ নিমিত্তং অর্থ নিবৃত্তি র্ধননাশঃ স্যাৎ॥ স বালো বন্ধকশ্চ ভবতীতি পারাশরীয়ে॥ ৫৬॥

কারকাশ্রিত নবাংশ রাশির নবমে রাহুগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে পরদারা-সক্তি নিবন্ধন মনুষ্যের ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। পরাশর মতে সে ব্যক্তি যেন পর-স্ত্রীতে আত্মবিক্রয় করে॥ ৫৬॥

অথ কারকাংশাৎ সপ্তমরাশিফলমাহ।

লাভে চন্দ্রগুরুভ্যাং সুন্দরী। ৫৭॥

কারকাংশাৎ সপ্তমে চ গুরুচন্দ্রযুতে দ্বিজ।
সুন্দরী গেহিনী তস্য পতিভক্তিপরায়ণা॥

লাভে (৪৩=৭) কারকাংশাৎ সপ্তমে রাশৌ চন্দ্রগুরুভ্যাং চন্দ্রে গুরৌ বা স্থিতে সতি পরিণীতা প্রথম-পত্নী-সম্বন্ধ-বিশিষ্টা বা স্ত্রী সুন্দরী ভবতি, এবমগ্রেঽপি। নবমরাশিফলসমাপ্তত্বাদ্ গ্রহাণাং দৃগ্বলমত্র নিবৃত্তং॥ ৫৭॥

এক্ষণে সপ্তম ভাবফল লিখিত হইতেছে। কারক নবাংশ রাশির সপ্তমে চন্দ্র বা বৃহস্পতির যোগ থাকিলে স্ত্রী সুন্দরী হয়। একাধিক স্ত্রী সত্বে সকলেই সুন্দরী

জৈমিনী—

হইতে পারে না সুতরাং এ স্থলে স্ত্রী শব্দে প্রথম-পত্নী-সম্বন্ধ-বিশিষ্টা রমণীকেই বুঝিতে হইবে। অগ্রবর্ত্তী সূত্র কয়টিতেও উক্তরূপ অর্থ জ্ঞাতব্য। নবম ভাব ফলের সমাপ্তি নিবন্ধন এই সূত্র হইতে আর গ্রহগণের দৃষ্টিফলের অনুবৃত্তি না থাকিলেও তাহা একেবারে উপেক্ষণীয় নহে ॥ ৫৭ ॥

রাহুণা বিধবা ॥ ৫৮ ॥

রাহুণা বিহ্বলা বালা জায়তে চাঙ্গনা দ্বিজ।

কারকাংশাৎ সপ্তমে রাশৌ রাহুণা যুক্তে সতি রমণী বিধবা স্যাৎ। নরো বিধবাপতি র্ভবতীতি শেষঃ ॥ ৫৮ ॥

কারকাংশ রাশির সপ্তমে রাহু থাকিলে মনুষ্য কোন বিধবা রমণীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করে। পরাশর মতে পত্নী রতিবিহ্বলা হয় ॥ ৫৮ ॥

শনিনা বয়োঽধিকা রোগিণী তপস্বিনী বা। ৫৯।

শনিনা চ বয়োধিক্যা রোগিণী বা তপস্বিনী ॥

কারকাংশাৎ সপ্তমে শনিনা যুক্তে সতি পুরুষস্য ভার্য্যা বয়োধিকা রোগিণী তপস্বিনী বা ভবতি ॥ ৫৯ ॥

শনিগ্রহ কারকাংশ-রাশির সপ্তম ভাবগত হইলে মনুষ্যের ভার্য্যা তদপেক্ষা বয়োধিকা রোগিণী কিম্বা তপস্বিনী হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

কুজেন বিকলাঙ্গী ॥ ৬০ ॥

ভৌমেন বিকলাঙ্গী চ তথা কান্তা কুলক্ষণা ॥

কারকাংশাৎ সপ্তমে রাশৌ কুজেন যুক্তে জায়া বিকলাঙ্গী অঙ্গদোষ-সমন্বিতা কুলক্ষণাঙ্গী বা ভবতি ॥ ৬০ ॥

মঙ্গল কারকাংশ রাশির সপ্তমভাবগত থাকিলে, পত্নী শারীরিক কোন প্রকার দোষবিশিষ্টা হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

রবিণা স্বকুলে গুপ্তা চ ॥ ৬১ ।

রবিণা স্বকুলে গুপ্তা চাসক্তা পরবেশ্মনি ॥

কারকাংশাৎ সপ্তমে রাশৌ রবিণা যুক্তে সতি ভার্য্যা স্বকুলে স্বামী কুলে গুপ্তা গুপ্তপ্রেমা চামরণং তিষ্ঠতি। চকারাৎ বিকলাঙ্গী চ ভবেৎ ॥ ৬১ ॥

কারকাশ্রিত নবাংশ রাশির সপ্তমে রবি থাকিলে কামিনী বিকলাঙ্গী হয় এবং ভর্ত্তৃকুলেই গুপ্তপ্রেমে আবদ্ধ হইয়া চিরকাল অবস্থান করে॥ ৬১॥

বুধসিতাভ্যাং কলাবতী। ৬২॥

বুধে কলাবতী জ্ঞেয়া কলাভিজ্ঞা প্রজায়তে।
তদ্বজ্‌জ্ঞেয়া চ শুক্রেণ নির্ব্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তম॥

কারকাংশাৎ সপ্তমে রাশৌ বুধসিতাভ্যাং বুধেন সিতেন বা যুক্তে সতি ভার্য্যা কলাবতী গীতবাদ্যাদি বিবিধাসু কলাসু কুশলা ভবতি॥ ৬২।

বুধ বা ভার্গব কারকাশ্রিত নবাংশ রাশির সপ্তমস্থ হইলে মনুষ্যের পত্নী গীত বাদ্যাদি বিবিধ কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া থাকে॥ ৬২॥

চাপে চন্দ্রেণানাবৃতদেশে॥ ৬৩॥

পূর্ব্বোক্তেষু যোগেষু চাপে (১৬=৪) কারকাশ্রিত নবাংশরাশে শ্চতুর্থস্থানে চন্দ্রেণ যুক্তে সতি অনাবৃতদেশে অনাচ্ছাদিত প্রদেশে তৎতৎ সূত্রোক্ত কামিন্যা সহ প্রথম সহবাসঃ স্যাৎ॥ ৬৩॥

পূর্ব্বোক্ত যোগাদি সত্বে কারকাংশ রাশির চতুর্থে চন্দ্র থাকিলে, অনাবৃত প্রদেশে, তৎতৎ সূত্রোক্ত রমণীর সহ মনুষ্যের প্রথম স্ত্রী সহবাস ঘটে। ৬৩॥

অথ কারকাংশাৎ তৃতীয়রাশিফলমাহ।

কর্ম্মণি পাপে শূরঃ॥ ৬৪॥

কারকাংশাৎ তৃতীয়ে চ পাপখেটযুতেক্ষিতে।
স শূরো জায়তে বালো বীর্য্যবান্ বহু বিক্রমী॥

কর্ম্মণি (৫১=৩) কারকাশ্রিত নবাংশরাশে স্তৃতীয় স্থানে পাপে পাপ গ্রহে সতি পুরুষঃ শূরো বিক্রমী স্যাৎ। পরাশরমতেনাত্র পাপস্য দৃষ্টিরপি ফলপ্রদা॥ ৬৪॥

এক্ষণে তৃতীয় ভাবফল আরম্ভ হইল। কারক নবাংশ রাশির তৃতীয় স্থানে পাপগ্রহের যোগ (বা দৃষ্টি) থাকিলে পুরুষ বিক্রমশালী হয়। পরাশর মতে উক্ত স্থানে পাপগ্রহের যোগ এবং দৃষ্টি সমফলদায়ক॥ ৬৪॥

শুভে কাতরঃ। ৬৫।

কারকাংশাৎ তৃতীয়েঽপি শুভখেটযুতেক্ষিতে।
জায়তে তত্বহৃদয়ঃ কাতরোঽপি বিশেষতঃ॥

কারকাংশাৎ তৃতীয়ে রাশৌ শুভে শুভগ্রহ যুক্তে (দৃষ্টে বা) সতি জাতকঃ কাতরো ভীরুস্বভাবঃ স্যাৎ ॥ ৬৫ ॥

কারকাংশ রাশির তৃতীয় স্থানে শুভগ্রহের যোগ (বা দৃষ্টি) থাকিলে মনুষ্য ভীরু স্বভাব (কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধিৎসু) হয় ॥ ৬৫ ॥

মৃত্যুচিন্তয়োঃ পাপে কর্ষকঃ ॥ ৬৬ ॥

কারকাংশাৎ তৃতীয়ে চ ষষ্ঠে পাপযুতেক্ষিতে।
কৃষিকর্ম্মরতো নিত্যং জায়তে চ ন সংশয়ঃ ॥

কারকাংশাৎ মৃত্যু (১৫ = ৩) চিন্তয়োঃ (৬৬ = ৬) তৃতীয়ে ষষ্ঠে চ পাপে দ্বয়োরপি সপাপত্বে মনুষ্যোঽসৌ কর্ষকঃ কৃষিকর্ত্তা স্যাৎ ॥ ৬৬ ॥

কারকাংশ রাশির তৃতীয় এবং ষষ্ঠ উভয় স্থানে পাপগ্রহের যোগ (বা দৃষ্টি) থাকিলে মনুষ্য কৃষিকার্য্যনিরত হয় ॥ ৬৬ ॥

সমে গুরৌ বিশেষেণ ॥ ৬৭ ॥

পূর্ব্বসূত্রোক্ত যোগপ্রাপ্তে সমে (৫৭ = ৯) কারকাংশান্নবমে রাশৌ গুরৌ সত্যসৌ বিশেষেণ কর্ষকঃ স্যাৎ ॥ ৬৭ ॥

উক্ত যোগে অর্থাৎ নবাংশ রাশির তৃতীয় এবং ষষ্ঠ স্থানে পাপগ্রহ থাকিয়া নবম স্থানে পুনরায় বৃহস্পতি থাকিলে মনুষ্য বিশেষরূপে কৃষিকার্য্যে রত হয় ॥ ৬৭ ॥

অথ কারকাংশাৎ দ্বাদশরাশি ফলমাহ।

উচ্চে শুভে শুভলোকঃ ॥ ৬৮ ॥

কারকাংশাদ্ ব্যয়স্থানে উচ্চস্থেঽপি শুভগ্রহে।
সদ্‌গতি র্জায়তে তস্য শুভলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥

কারকাংশাদ্ উচ্চে (৬০ = ১২) দ্বাদশ রাশৌ শুভে শুভগ্রহে সতি শুভলোক প্রাপ্তিঃ স্যাৎ ॥ সর্ব্বত্রৈব বলানুসারেণ ফলং জ্ঞাতব্যমিতি ॥ উচ্চ ইতি পদং ক্ষুদ্রদেবতাশ্বিত্যন্তসূত্রেষন্বেতি ॥ ৬৮ ॥

কারকাংশ রাশির ব্যয় স্থানে কোন শুভগ্রহ থাকিলে মনুষ্যের শুভলোক প্রাপ্তি হয়। পরাশরোক্ত শ্লোকে উচ্চস্থ শব্দ থাকায় গ্রহগণের তুঙ্গাদি বল তারতম্যে ফল তারতম্য জ্ঞাতব্য। এই সূত্র হইতে ক্ষুদ্র-দেবতাস্ত্ব অশীতি সংখ্যক সূত্র পর্য্যন্ত ব্যয় শব্দের অনুবৃত্তি আছে ॥ ৬৮ ॥

কেতৌ কৈবল্যং॥ ৬৯ ॥

কারকাংশাদ্ ব্যয়ে কেতৌ শুভগ্রহযুতেক্ষিতে।
তদাপি জায়তে মুক্তিঃ সাযুজ্যপদমাপ্নুয়াৎ॥

কারকাংশাৎ দ্বাদশে কেতৌ সতি কৈবল্যং ভবেৎ॥ ৬৯ ॥

কারকাংশরাশির দ্বাদশে কেতু থাকিলে মনুষ্য কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়। পরাশরোক্ত শ্লোকানুসারে উক্ত দ্বাদশ ভাব গত কেতুর প্রতি শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকা আবশ্যক॥ ৬৯ ॥

ক্রিয়চাপয়োর্বিশেষেণ॥ ৭০ ॥

মীনেঽথ, কর্কটে বাপি কারকাংশাদ্ ব্যয়ে শিখী।
শুভগ্রহেণ সংদৃষ্টে কৈবল্যপদ মাপ্নুয়াৎ॥

কারকাংশাৎ দ্বাদশে ক্রিয় (১২=১২ মীন) চাপয়োঃ (১৬=৪ কর্কট) মীন রাশৌ কর্কটে বা কেতৌ স্থিতে সতি বিশেষেণ পুরুষঃ কৈবল্যং প্রাপ্নোতি॥ শুভ গ্রহাণাং দৃষ্টি যোগশ্চেৎ ফলাধিক্যং জ্ঞাতব্যং॥ ৭০ ॥

মীন বা কর্কট রাশি গত কেতু কারকাংশ রাশির দ্বাদশস্থ হইলে মনুষ্য নিশ্চয়ই কৈবল্য পদপ্রাপ্ত হয়। শুভলোক প্রাপ্তি শুভগ্রহের নিত্য সিদ্ধ ফল, সুতরাং উক্ত দ্বাদশ স্থানে পুনরায় শুভগ্রহের যোগ দৃষ্টি থাকিলে ফলের নিশ্চয়তাই জ্ঞাতব্য।

এই স্থানে টীকাকার শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সহ বিশেষ অর্থাপত্তি সমুপস্থিত। তিনি লিখিয়াছেন "কারকাংশে মেষে ধনুষি বা তত্র শুভে সতি বিশেষেণ মুক্তিঃ স্যাৎ" এক্ষণে জানা আবশ্যক যে বর্ত্তমান কারকাংশের দ্বাদশ রাশিগত ফল লিখিত হইতেছে, কারকাংশ রাশির নহে, এবং টীকাকার নিজেই "কারকাংশাৎ দ্বাদশে ফলমাহ" বলিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। কারকাংশ রাশিগত ফল পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে এস্থলে পুনর্ব্বার তাহার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। সুবোধিনীকার "ন চ সূত্রকারেণ কেতোঃ শুভত্বমুক্তং" বলিয়া কেতুকে পাপ গ্রহ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন এবং তদ্দোষে "কেতোঃ সাযুজ্য মুক্তি দাতৃত্বাযোগ্যত্বাৎ" বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ৬৯ সংখ্যক সূত্রার্থে, কটপয়াদি সংজ্ঞানুসারে কেতু (৬১=১) শব্দে এক অর্থাৎ কারকাংশ রাশি কল্পনা করতঃ তৎপূর্ব্ব শুভ শব্দ সহ সম্বন্ধ রাখিয়া কারকাংশে শুভগ্রহ থাকিলে মুক্তি হয় এইরূপ অর্থ করিয়া পুনর্ব্বার "কারকাংশাৎ দ্বাদশে কেতৌ সতিমুক্তি রিতিবার্থঃ" বলিয়া পূর্ব্বার্থের অনিশ্চয়তাও সপ্রমাণ করিয়াছেন। বৃদ্ধকারিকায় লিখিত আছে "গুরু-ধ্বজ-কবিজ্ঞাঃ স্যুঃ যথাপূর্ব্বং শুভগ্রহাঃ"। এতদনুসারে কেতু বৃহস্পতির নিম্নস্থ শুভগ্রহ সুতরাং

তাহার মুক্তিদাতৃত্ব শক্তির অভাব নাই। পারাশরী হোরাতেও এ স্থলে কোন ব্যয়স্থায় লগ্ন রাশির উল্লেখ দেখা যায় না। বর্ত্তমান সূত্রেও ব্যয় স্থান শব্দ পরিত্যাগ করতঃ "কারকাংশ" বলিয়া লগ্ন রাশির উল্লেখ পূর্ব্বক ৬৮ সংখ্যক সূত্রোক্ত শুভশব্দ সহ সম্বন্ধ রাখিয়াছেন। কেতু শব্দে কারকাংশ রাশি উল্লেখকরতঃ শুভ শব্দ সহ সম্বন্ধ রাখা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বরং ৬৮ সংখ্যক সূত্রের অনুবৃত্তি ক্রমে "উচ্চে শুভে কেতু যুক্তে কৈবল্যং" ইত্যাদি রূপ সূত্র ধরিয়া উক্ত শুভগ্রহ যুক্ত দ্বাদশস্থানে কেতুর যোগ থাকিলে কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটে এ প্রকার অর্থ করাই যুক্তি সঙ্গত এবং পারাশরী হোরা সহ সামঞ্জস্য থাকে, সুতরাং তদর্থই সমীচীন এবং গ্রাহ্য। পুনশ্চ বর্ত্তমান সূত্রে সর্ব্বত্র সবর্ণা ভাবা রাশয়শ্চ সূত্র সত্ত্বেও সাধারণ জাতকশাস্ত্রানুগত ক্রিয় শব্দে মেষ এবং চাপ শব্দে ধনুরাশি উল্লেখ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা সাধারণের বিবেচ্য ॥ ৭০ ॥

পাপৈরন্যথা ॥ ৭১ ॥

কেবলেঽপি ব্যয়ে কেতৌ পাপগ্রহযুতেক্ষিতে।
ন মুক্তি র্জায়তে তস্য শুভলোকং ন পশ্যতি ॥

কারকাংশাৎ দ্বাদশে পাপৈঃ পাপগ্রহৈঃ অন্যথা ন মুক্তি র্ন শুভলোক প্রাপ্তিশ্চেতি ॥ ৭১ ॥

পূর্ব্বোক্ত ৬৮ সংখ্যক সূত্রে শুভগ্রহের ফল বর্ণনান্তে এক্ষণে পাপগ্রহের ফল লিখিত হইতেছে। কারকাংশ রাশির দ্বাদশে পাপগ্রহের যোগদৃষ্টি থাকিলে ৬৮ সংখ্যক সূত্রের বিপরীত ফল অর্থাৎ মুক্তি বা শুভলোক প্রাপ্তি কিছুই হয় না, বরং নরকে পতনাদিই জ্ঞাতব্য। পরাশরোক্ত শ্লোকে দেখা যায় যে, কেবল অর্থাৎ শুভগ্রহের দৃষ্টিযোগ বিহীন কেতু পাপযুক্ত দৃষ্ট হইয়া তথায় অবস্থান করিলেই উক্ত অশুভ ফলের প্রদাতা। তদনুসারে সুতরাং দ্বাদশস্থ কেতুর প্রতি শুভগ্রহের যোগ দৃষ্টিই শুভ ফলের পরিচায়ক ॥ ৭১ ॥

রবিকেতুভ্যাং শিবে ভক্তিঃ ॥ ৭২ ॥

রবিণা সংযুতে কেতৌ কারকাংশাদ্ ব্যয়স্থিতে।
গৌর্য্যাং ভক্তি র্ভবেৎ তস্য শাক্তিকো জায়তে নরঃ ॥

কারকাংশতো দ্বাদশ রাশি স্থিতাভ্যাং রবিকেতুভ্যাং শিবে ভক্তি-র্ভবতি ॥ ৭২ ॥

এক্ষণে পরবর্ত্তী এগারটি সূত্রে কারকাংশের দ্বাদশ স্থান স্থিত রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ সূচিত দেবতা ভক্তি লিখিত হইতেছে। উক্ত স্থানে রবি এবং কেতু উভয়ে একত্রে থাকিলে

মনুষ্য শিবভক্তিপরায়ণ হয়। অগ্রবর্ত্তী ৭৯ সংখ্যক সূত্রে কেতু গ্রহের নিজস্ব ভিন্ন ফল লিখিত থাকায় এস্থলে রবি এবং কেতুর যোগ ফল ভিন্ন তাহাদের ব্যক্তিগত ফল চিন্তা করা অযৌক্তিক। কিন্তু বাস্তবিক শিবভক্তি রবি গ্রহেরই ফল, রবিকেতুর যোগ ফল নহে। পরাশর মতে পর পর প্রতি সূত্রেই কেতু শব্দের অনুবৃত্তি থাকায় বুঝা যায় যে কেতু গ্রহ তৎসংযুক্ত গ্রহোক্ত ফলের নিশ্চয়তা জ্ঞাপক। যেমন দ্বাদশস্থ রবি হইতে শিব ভক্তি, কিন্তু উক্ত রবি সহ কেতুর যোগ থাকিলে তদ্দেবতা বিষয়ে ভক্তির প্রাবল্য ঘটে। টীকাকারগণের মধ্যে কেহ প্রত্যেক গ্রহ সহ প্রতি সূত্রেই কেতুর সংযোগ রাখিয়াছেন, কেহ বা কেতুকে পরিহার পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ হইতেই ফলাদেশ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, এই মতদ্বৈধের উহাই এক মাত্র কারণ। গ্রহান্তরাদিতে রবি হইতে রবি ভক্তিরই উল্লেখ দেখা যায়, সুতরাং তদ্গ্রহ হইতে রবি ভক্তি এবং শিবভক্তি উভয়ই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। পারাশরী মতে গৌরী ভক্তির ও উল্লেখ দেখা যায়। বর্ত্তমানে প্রায় সকলেই কুলক্রমাগত গণেশাদি পঞ্চ-দেবতার মধ্যে অন্যতম কোন দেবতার উপাসক, সুতরাং এই দেবভক্তি বিষয়ক যোগ গুলি প্রায় অনেক স্থলে মিলিতে দেখা যায় না। ইহার পরবর্ত্তী সূত্র গুলি উক্ত রূপ অর্থ প্রকাশক এবং সরল বলিয়া তাহাদের টীকানুবাদ প্রায় প্রদত্ত হইল না।

চন্দ্রেণ গৌর্য্যাং ॥ ৭৩ ॥

চন্দ্রেণ সংযুতে কেতৌ কারকাংশাদ্ ব্যয়স্থিতে।
রবিভক্তি র্ভবেৎতস্য নির্ব্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তম ॥

এস্থলে মত দ্বৈধ দৃষ্ট হইতেছে। পারাশরী হোরা ভিন্ন সর্ব্বত্রই গৌরীশব্দের উল্লেখ থাকায় অনুমান হয় যে, লিপিকর প্রমাদে উক্তগ্রন্থে রবি ও চন্দ্রে দেবতা-দ্বয়ের বৈপরীত্য ঘটিয়াছে কারণ উক্ত গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোথাও সূর্য্যে গৌরীভক্তির উল্লেখ নাই, বিশেষতঃ পুংগ্রহে পুংদেবতা ভক্তি এবং স্ত্রীগ্রহে স্ত্রীদেবতা ভক্তিই সাধারণ নিয়ম ॥ ৭৩ ॥

কুজেন স্কন্দে ॥ ৭৪ ॥

গ্রহগণ মধ্যে মঙ্গলই সামরিক গ্রহ সুতরাং তদ্গ্রহ হইতে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকের আরাধনাই যুক্তিযুক্ত এবং সর্ব্বসম্মত ॥ ৭৪ ॥

বুধ শনিভ্যাং বিষ্ণৌ ॥ ৭৫ ॥

উক্ত দ্বাদশ স্থানস্থ বুধ এবং শনি হইতে বিষ্ণুভক্তি চিন্তনীয়। এস্থলে বুধ এবং শনির যোগ ফল নহে, উভয়েই তদ্ভক্তির উদ্দীপক ॥ ৭৫ ॥

গুরুণা সাম্ব-শিবে ॥ ৭৬ ॥

বৃহস্পতি হইতে সর্ব্বত্রই শিব ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাম্বশিব শব্দে দুর্গাশিবের যুগলমূর্ত্তি বুঝিতে হইবে ॥ ৭৬ ॥

শুক্রেণ লক্ষ্ম্যাং । ৭৭ ॥

গ্রন্থান্তরে শুক্র হইতে লক্ষ্মী ভিন্ন গৌরীভক্তিরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৭৭ ॥

রাহুণা তামস্যাং দুর্গায়াঞ্চ ॥ ৭৮ ॥

রাহুণা তামসীং দুর্গাং ভূতপ্রেতাদিসেবকঃ ॥

রাহু হইতে ভদ্রকালী ছিন্নমস্তা প্রভৃতি ভগবতীর তামসী মূর্ত্তি এবং সত্বগুণপ্রধানা দুর্গা মূর্ত্তিরও চিন্তা করা যায়। টীকাকারগণ "তামস্যাং ভূতাদি দেবতায়াং" বলিয়া তামসী শব্দের ভূত প্রেতাদি অর্থ করিয়াছেন। ভূত প্রেতাদি তমোগুণান্বিত হইলেও সূত্রে তামস শব্দের উল্লেখ নাই। তবে কর্ণ পিশাচ্যাদির উল্লেখ করিলে কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইত। মধুকৈটভ ভীত বিধাতার স্তবান্তে দেবীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

এবং স্তুতা তদাদেবী তামসী তত্র বেধসা।
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ ॥
নেত্রাস্য নাসিকা বাহু হৃদয়েভ্য স্তথোরসঃ।
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥

সুতরাং তামসী শব্দে ত্রিগুণাত্মিকা ভগবতীর তমোগুণ প্রধানা মহাকালী মূর্ত্তি এবং তদুদ্ভবা অন্যান্য মূর্ত্তিই এ স্থলে জ্ঞাতব্য ॥ ৭৮ ॥

কেতুনা গণেশে স্কন্দে চ ॥ ৭৯ ॥

হেরম্ব ভক্তঃ শিখিনা স্কন্দভক্তোঽথবা ভবেৎ।

কেতু কৈবল্য দাতা গ্রহ সুতরাং যে গ্রহের সহিত যুক্ত থাকে তদ্‌গ্রহ সূচিত দেবতার প্রতিই ভক্তির প্রাবল্য ঘটায়। অপর কোন গ্রহসহ যুক্ত না থাকিলে কেতু হইতে গণেশ এবং স্কন্দ ভক্তিই চিন্তনীয় ॥ ৭৯ ॥

পাপর্ক্ষে মন্দে ক্ষুদ্রদেবতাসু ॥ ৮০ ॥

কারকাংশাদ্ ব্যয়স্থানে মন্দে শনৌ পাপর্ক্ষে পাপরাশৌ স্থিতে সতি ক্ষুদ্র দেবতাসু যক্ষরক্ষপিশাচাদিষু ভক্তির্ভবতি ॥ উচ্চ ইতি পদমত্র নিবৃত্তং ॥ ৮০ ॥

কোন পাপক্ষেত্র গত শনি কারকাংশ রাশির ব্যয়স্থ হইলে মনুষ্য উপবিদ্যাদিতে ভক্তিমান্ হয়। মুক্তি দাতৃত্ব শক্তি বিহীন দেবতাই ক্ষুদ্র দেবতা সুতরাং যক্ষ রক্ষ পিশাচাদি দেবযোনি এবং অপরাপর উপবিদ্যাই ক্ষুদ্র দেবতা নামে অভিহিত। এই স্থানে কারক নবাংশ রাশির ব্যয় রাশি গত ফল সমাপ্ত হইল ॥ ৮০ ॥

দম্ভার্থে যজতে যশ্চ তপ্যতে চ তপস্তথা।
ন পরার্থমিহেত্যুক্তঃ স মার্জারঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥ ৬৪॥
বিভবে সতি নৈবাত্তি ন দদাতি জুহোতি চ।
তমাহুরাখুস্তস্যান্নং ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধ্যতি॥ ৬৫॥
সমাগতানাং মর্ত্ত্যানাং পক্ষপাতং সমাশ্রয়েৎ।
তমাহুঃ কুক্কুটং দেবাস্তস্যাপ্যন্নং বিগর্হিতম্॥ ৬৬॥
স্বধর্ম্মং যঃ সমুচ্ছিদ্য পরধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ।
অনাপদি স বিদ্বদ্ভিঃ পতিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৬৭॥
দেবত্যাগী গুরুত্যাগী গুরুপত্ন্যুঙ্ঘকস্তথা।
গোব্রাহ্মণস্ত্রীবধকৃদপবিদ্ধ প্রচক্ষ্যতে॥ ৬৮॥
যেষাং কুলে ন বেদোঽস্তি ন শাস্ত্রং নৈব চ ব্রতম্।
তে নগ্নাঃ কীর্ত্তিতাঃ সদ্ভিঃ তেষামন্নং বিগর্হিতম্॥ ৬৯
আশাকর্ত্তুস্ত্বদাতা চ দাতুশ্চ প্রতিষেধকঃ।
শরণাগতং যস্ত্যজতি স চাণ্ডালো নরাধমঃ॥ ৭০॥

দম্ভ-তৃপ্তি তরে যজ্ঞ করে যেই জন,
কিম্বা সে করয়ে তপ, শুন বাছাধন,
পরার্থ কিছুই নহে যেই জন বলে,
মার্জার বলেন তা'রে পণ্ডিত সকলে। ৬৪।
ধন আছে—নিজে নাহি করয়ে ভোজন,
নাহি করে দান কিম্বা যজ্ঞের যজন,
আখু বলি' প্রাজ্ঞে তা'রে করেন ব্যাখ্যান,
তার অন্ন ভোজ্য নয় শাস্ত্রের প্রমাণ।
তাহে যেবা পাপ হয়, শুন বাছাধন,
কৃচ্ছ্র তা'র প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রের বচন। ৬৫।
সমাগত জনে যেবা পক্ষপাত করে
কুক্কুট তাহারে কহে যত প্রাজ্ঞ নরে,
তা'রো অন্ন বিগর্হিত করিতে গ্রহণ,
পাপস্পর্শ হয় তাহে, শুন বাছাধন। ৬৬।

স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া যেবা পর-ধর্ম্ম লয়
অনাপদে, জ্ঞানী তা'রে পতিত যে কয়। ৬৭
দেবত্যাগী, গুরুত্যাগী, আর যেই জন
গুরুপত্নী তাগ করে, শুন বাছাধন,
গো ব্রাহ্মণ আর নারী বধে যেই জন
অপবিদ্ধ বলি তা'রে বলে প্রাজ্ঞ জন। ৬৮
যেই কুলে বেদ নাই—নাই শাস্ত্রজ্ঞান,
ব্রত নাই, নগ্নকুল তাহার আখ্যান।
তাহাদের অন্ন নাহি লয় সাধু জনে;
বহু পাপময় তাহা শাস্ত্রের বচনে। ৬৯।
আশা দিয়ে দান নাহি করে যেই জন,
অপরের দানে যেবা করয়ে বারণ,
পরিত্যাগ করে যে শরণাগত জনে,
চণ্ডাল সে নরাধম জেনো ইহা মনে। ৭০।

যো বান্ধবৈঃ পরিত্যক্তঃ সাধুভির্ব্রাহ্মণৈরপি।
কুণ্ডাশী যশ্চ তস্যান্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৭১ ॥
যো নিত্যকর্ম্মণো হানিং কুর্য্যান্নৈমিত্তিকস্য চ।
ভুক্তান্নং তস্য শুদ্ধ্যে চ ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥ ৭২ ॥
যস্য চানুদিনং হানিগৃহে নিত্যস্য কর্ম্মণঃ।
যশ্চ ব্রাহ্মণসন্ত্যক্তঃ কিল্বিষী স নরাধমঃ ॥ ৭৩ ॥
নিত্যস্য কর্ম্মণো হানিং ন কুর্ব্বীত কদাচন।
তস্য ত্বকরণে বন্ধঃ কেবলং মৃতজন্মসু ॥ ৭৪ ॥
দশাহং ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠেদ্দানহোমাদিবর্জ্জিতঃ।
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহঞ্চ বৈশ্যো মাসার্দ্ধমেব চ।
শূদ্রস্তু মাসমাসীত নিত্যকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭৫ ॥
রোগ গ্রহাদিবিধিনা নিত্যকর্ম্মবিধিচ্যুতঃ।
পাদকৃচ্ছ্রং ততঃ কৃত্বা গাং দত্ত্বা শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৬ ॥
ততঃ পরং নিজং কর্ম্ম কুর্য্যুঃ সর্ব্বে যথেপ্সিতম্ ॥ ৭৭ ॥

যে জন বান্ধবত্যক্ত, সাধুত্যক্ত আর
ব্রাহ্মণেরা যাহারে করেন পরিহার,
কুণ্ডাশী সে, তা'র অন্ন করিলে ভোজন,
শুদ্ধ হ'বে সে পাপে করিয়া চান্দ্রায়ণ। ৭১
যেই জন নিত্যকর্ম্ম নৈমিত্তিক আর
ত্যাগ করে তা'র অন্ন না কর আহার;
তাহে যেবা পাপ হয়, শুন বাছাধন,
তিন দিন উপবাসে হইবে মোচন। ৭২।
যে নরের ঘরে নিত্য-কর্ম্ম-হানি হয়,
ব্রাহ্মণের পরিত্যক্ত, কিল্বিষী নিশ্চয়। ৭৩।
অতএব নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ না করিবে,
পরম যতনে তাহা সতত সাধিবে।
নিত্যকর্ম্ম না করিলে হয় প্রত্যবায়,
বন্ধ ঘটে সম্বন্ধ কিছু নাহিক তাহায়।
বাধা ঘটে শুধু ইথে জনমে, মরণে,
তাহে প্রত্যবায় নাই কহে সুধীজনে। ৭৪।
দান হোম আদি কার্য্য করিয়া বর্জ্জন,
দশ দিন থাকিবেন, ইথে, বিপ্রগণ;
ক্ষত্রিয়ে দ্বাদশ দিন, বৈশ্য পঞ্চদশ,
শূদ্র এক মাস র'বে অশৌচের বশ। ৭৫।
রোগবশে কিম্বা কোন দুর্গ্রহের তরে,
নিত্যকর্ম্ম-চ্যুতি সংঘটন হ'লে পরে,
পাদকৃচ্ছ্র করি' পরে করিয়া গোদান,
শুদ্ধিলাভ হইবে শুনহ মতিমান। ৭৬।
তা'র পরে শুদ্ধ হ'য়ে নিত্য-কর্ম্ম-পর
রহিবেন, নিরন্তর হইয়া তৎপর। ৭৭।

প্রেতায় সলিলং দেয়ং বহ্নিদগ্ধা তু গোত্রিকৈঃ।
প্রথমেঽহ্নি চতুর্থে চ সপ্তমে নবমে তথা ॥ ৭৮ ॥
ভস্মাস্থিচয়নং কার্য্যং চতুর্থে গোত্রিকৈর্দিনে।
ঊর্দ্ধং সঞ্চয়নাৎ তেষামঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে ॥ ৭৯ ॥
সোদকৈস্তু ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কার্য্যাঃ সঞ্চয়নাৎ পরম্।
স্পর্শ এব সপিণ্ডানাং মৃতাহনি তথোভয়োঃ ॥ ৮০ ॥
বৃক্ষাহি-গো-দংষ্ট্রি-শস্ত্র-তোয়োদ্বন্ধনবহ্নয়।
বিষপ্রপাতাদিমৃতে প্রায়োঽনাশকয়োরপি ॥ ৮১ ॥
বালে দেশান্তরস্থে চ তথা প্রব্রজিতে মৃতে।
সদ্যঃশৌচমথান্যৈশ্চ ত্র্যহমুক্তমশৌচকম্ ॥ ৮২ ॥
নৈবোর্দ্ধদৈহিকং কার্য্যং ন চ কার্য্যোদকক্রিয়া।
গর্ভস্রাবে তদেবোক্তং পূর্ণকালেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৮৩ ॥
ব্রাহ্মণানামহোরাত্রং ক্ষত্রিয়াণাং দিনত্রয়ং।
ষড়াত্রমপি বৈশ্যানাং শূদ্রাণাং দ্বাদশাহকম্ ॥ ৮৪

শ্মশানেতে বহ্নিযোগে দেহ দগ্ধ করি',
গোত্রজাতজন সবে শোক চিহ্ন ধরি'
প্রথম, চতুর্থ, আর সপ্তম, নবম
দিবসে সলিল দিবে ধরিয়া নিয়ম। ৭৮।
চতুর্থ-দিবসে তা'র সগোত্রীয় জন
যথাবিধি করিবেন ভস্মাস্থিচয়ন,
প্রথমে চয়ন কার্য্য করি' সম্পাদন
অঙ্গস্পর্শ-কার্য্য তবে করিবে সাধন। ৭৯।
সঞ্চয়ন-অন্তে কার্য্যবিহিত যে সব
সহোদকগণ করিবেন সেই সব।
মৃতাহে সপিণ্ড আর সহোদকগণ
স্পর্শ কার্য্য উভয়ে করিবে সম্পাদন। ৮০
শস্ত্রে, জলে, উদ্বন্ধনে অথবা অনলে,
বিষে, কিম্বা মৃত্যু হয় প্রপাতের বলে,
সগোত্র সোদক সবে, এ হেন মরণে,
একাহ অশৌচ লবে শাস্ত্রের বচনে। ৮১।
বালক অথবা দেশান্তরবাসী জন
অথবা যে করিয়াছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
তা'দের মরণে জানি সদ্যাশৌচ হয়,
শাস্ত্রান্তরে ত্র্যহ অশৌচ ইথে কয়। ৮২।
ইহাতে ঊর্দ্ধদৈহিক কার্য্য কিছু নাই।
করিবে উদক-ক্রিয়া বর্জ্জন সদাই।
গর্ভস্রাবে সেই বিধি জানিও নিশ্চয়,
পূর্ণকালে শুদ্ধ হ'বে শাস্ত্রে এই কয়। ৮৩।
ব্রাহ্মণের অহোরাত্র, ক্ষত্রিয়ে ত্রিদিন,
বৈশ্য পক্ষে বিধি ইথে হয় ছয় দিন।
শূদ্রের দ্বাদশ দিনে ইথে শুদ্ধি হয়,
শাস্ত্রের বচন ইথে নাহিক সংশয়। ৮৪।

সপিণ্ডানাং সপিণ্ডস্তু মৃতেঽন্যস্মিন্ মৃতো যদি।
পূর্ব্বাশৌচসমাখ্যাতৈঃ কার্য্যাস্তত্র দিনৈঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৮৫ ॥
এষ এব বিধির্দৃষ্টো জন্মন্যপি হি সূতকে।
সপিণ্ডানাং সপিণ্ডেষু যথাবৎ সোদকেষু চ ॥ ৮৬ ॥
জাতে পুত্রে পিতুঃ স্নানং সচেলন্তু বিধীয়তে।
মৃতে হি সর্ব্ববন্ধূনামিত্যাহ ভগবান্ ভৃগুঃ ॥ ৮৭ ॥
তত্রাপি যদি চান্যস্মিন্ জাতে জায়েত চাপরঃ।
তত্রাপি শুদ্ধিরুদ্দিষ্টা পূর্ব্বজন্মবতো দিনৈঃ ॥ ৮৮ ॥
দশ-দ্বাদশ-মাসার্দ্ধ-মাসসংখ্যৈর্দিনৈর্গতৈঃ।
স্বাঃ স্বাঃ কর্ম্মক্রিয়াঃ কুর্য্যুঃ সর্ব্বে বর্ণা যথাবিধি ॥ ৮৯ ॥
প্রেতমুদ্দিশ্য কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টং ততঃ পরম্।
সপিণ্ডীকরণং চৈব কার্য্যমাবৎসরান্নরৈ ॥ ৯০ ॥
ততঃ পিতৃত্বমাপন্নে দর্শ পূর্ণাদিভি স্ত্রিভিঃ।
প্রীণনং স্তস্য কর্ত্তব্যং যথা শ্রুতিনিদর্শনং ॥ ৯১ ॥
দানানি চৈব দেয়ানি ব্রাহ্মণেভ্যো মনীষিভিঃ ॥ ৯২ ॥
যদ্‌যদিষ্টতমম্ লোকে যচ্চাপি দয়িতং গৃহে।
তত্তদ্‌গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ৯৩ ॥

একের অশৌচ মধ্যে অন্যের মরণে
পূর্ব্বাশৌচে শুদ্ধি হেরি' শাস্ত্রের বচনে। ৮৫।
মৃতক-সূতক, দু'য়ে এই ত নিয়ম
সপিণ্ড, সোদক পক্ষে নহে ব্যতিক্রম। ৮৬।
পুত্রের জনমে পিতা তৎপর হইয়া
সচেল করিবে স্নান শুদ্ধির লাগিয়া।
মরণে বান্ধব সবে করিবেক স্নান,
ভগবান ভৃগু এই করিলা বিধান ॥ ৮৭ ॥
এক শিশু জন্মিলে, সে গোত্রে যদি আর
জন্মে শিশু, পূর্ব্বাশৌচে শুদ্ধি হ'বে তা'র। ৮৮।
দশ কি দ্বাদশ, পক্ষ কিম্বা মাস পরে,
বিপ্রাদির শুদ্ধি হয় বর্ণ অনুসারে,
তা'র পরে বর্ণোচিত কার্য্যে অধিকার
হইবে সবার ইহা শাস্ত্র বাক্য সার। ৮৯।
প্রেতের উদ্দেশে পরে করিবে সাধন,
একোদ্দিষ্ট শাস্ত্রবিধি তাহাতে যেমন;
সম্বৎসর পরে হয় সপিণ্ডীকরণ,
তাতে যেবা বিধি তাহা করিবে সাধন। ৯০।
তৎপরে পিতৃত্ব ঘটে, সেই ত সময়
দর্শ পৌর্ণমাস আদি করিবে নিশ্চয়,
শ্রুতিতে যেমন বিধি আছে নিরূপণ,
সেই মত সর্ব্বকার্য্য করিবে সাধন। ৯১।
মৃতের মঙ্গল তরে আনি বিপ্রগণে,
যথাশক্তি দিবে দান সদা শুদ্ধ মনে। ৯২।
লভিতে অক্ষয় ফল, করিয়া যতন
ইষ্ট বস্তু প্রিয় দ্রব্য করিবে অর্পণ,
গুণবান ব্রাহ্মণে অর্পিবে এই দান,
সতত সবারে করি' সাদর সম্মান। ৯৩।

প্রেতং প্রেতং সমুদ্দিশ্য ভূমিং ধেন্বাদিকং স্বকম্।
দদ্যাদ্ যেনাস্য সংপ্রীতাঃ পিতরঃ সন্তি পুত্রকঃ ॥ ৯৪ ॥
পূর্ণৈস্তু দিবসৈঃ স্পৃষ্ট্বা সলিলং বাহনায়ুধম্।
প্রতোদদণ্ডৌ চ তথা সম্যগ্বর্ণাঃ কৃতক্রিয়াঃ ॥ ৯৫ ॥
স্ববর্ণধর্ম্মনির্দ্দিষ্টমুপাদানং তথা ক্রিয়াঃ।
কুর্য্যুঃ সমস্তাঃ শুচিনঃ পরত্রেহ চ ভূতিদাঃ ॥ ৯৬ ॥
অধ্যেতব্যা ত্রয়ী নিত্যং ভবিতব্যং বিপশ্চিতা।
ধর্ম্মতো ধনমাহার্য্যং যষ্টব্যঞ্চাপি যত্নতঃ ॥ ৯৭ ॥
যচ্চাপি কুর্ব্বতো নাত্মা জুগুপ্সামেতি পুত্রক।
তৎ কর্ত্তব্যমশঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজনে ॥ ৯৮ ॥
এবমাচরতো বৎস পুরুষস্য গৃহে সতঃ।
ধর্ম্মার্থ-কামসম্প্রাপ্ত্যা পরত্রেহ চ শোভনম্ ॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঋতধ্বজচরিতে মদালসোপাখ্যানে
অলর্কানুশাসনে ধর্ম্মাধর্ম্মনিরূপণং নাম
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মৃতের উদ্দেশে ভূমি, ধেনু আদি আর
দানে তৃপ্ত পিতৃগণ হয় ত তাহার। ৯৪।
বর্ণ অনুসারে পূর্ণ হ'বে দিন যবে
সলিলবাহনায়ুধ-স্পর্শ করি' তবে
স্পর্শ করি' প্রতোদ দণ্ডাদি যেবা আর
যথাবিধি কর্ত্তব্য সাধিবে আপনার। ৯৫।
নিজ নিজ বর্ণ-ধর্ম্মে যে হয় বিহিত
সেই মত কার্য্য করা সবারি উচিত।
এই বিধি যে মানব করয়ে পালন
ইহপরকালে শ্রেয়ঃ লভে সেই জন। ৯৬।
ত্রয়ী অধ্যয়ন নিত্য করিবে নিশ্চয়
শ্রেয়ের বিচার নিত্য যুক্তিযুক্ত হয়,
ধর্ম্মপথে থাকি' ধন করিবে অর্জ্জন,
ধর্ম্ম কার্য্যে সে ধন করিবে নিয়োজন। ৯৭।
আত্মার জুগুপ্সা নাহি হয় যে কার্য্যেতে,
মহাজনে লুকাইতে ইচ্ছা নাই যা'তে,
হেন কার্য্য কর সদা নিঃশঙ্ক অন্তরে,
ঘটিবে সুফল সুনিশ্চয় তাহে পরে। ৯৮।
শুন, বৎস, গৃহী হেন করি' আচরণ
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম পায়—রহে ফুল্লমন,
ইহপরকালে শুভ লভে সুনিশ্চয়
শাস্ত্রের বচন, ইথে নাহিক সংশয়। ৯৯।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে ঋতধ্বজচরিতান্তর্গত মদালসা-উপাখ্যানে
অলর্কানুশাসনে ধর্ম্মাধর্ম্মনিরূপণ নামক
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিজপুত্র উবাচ।

স এবমনুশিষ্টঃ সন্ মাত্রা সম্প্রাপ্য যৌবনম্।
ঋতধ্বজসুতশ্চক্রে সম্যগ্দারপরিগ্রহম্॥ ১॥
পুত্রাংশ্চোৎপাদয়ামাস যজ্ঞৈশ্চাপ্যযজদ্বিভুঃ।
পিতুশ্চ সর্ব্বকালেষু চকারাজ্ঞানুপালনম্॥ ২॥
ততঃ কালেন মহতা সম্প্রাপ্য চরমং বয়ঃ।
চক্রেঽভিষেকং পুত্রস্য তস্য রাজ্যে ঋতধ্বজঃ॥ ৩॥
ভার্য্যয়া সহ ধর্ম্মাত্মা যিযাসুস্তপসে বনম্।
অবতীর্ণো মহারক্ষো মহাভাগো মহীপতিঃ॥ ৪॥
মদালসা চ তনয়ং প্রাহেদং পশ্চিমং বচঃ।
কামোপভোগসংসর্গ-প্রহাণায় সুতস্য বৈ॥ ৫॥

মদালসোবাচ।

যদা দুঃখমসহ্যং তে প্রিয়বন্ধুবিয়োগজম্।
শত্রুবাধোদ্ভবং বাপি বিত্তনাশাত্মসম্ভবম্॥ ৬॥

দ্বিজ পুত্র বলে পিতা করহ শ্রবণ—
"মাতৃপাশে উপদেশ করিয়া গ্রহণ
ঋতধ্বজনন্দন লভিলা বহু-জ্ঞান,
দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলা মতিমান।
ক্রমেতে যৌবন যবে আসিল তাঁহার
যথাবিধি হইলেন তিনি কৃতদার। ১।
ক্রমেতে জন্মিল পুত্র হৃদয়নন্দন;
যথাশাস্ত্র বহু যজ্ঞ করিলা সাধন;
পিতৃ-আজ্ঞা অনুবর্ত্তী হইয়া সতত
নানা শুভকার্য্যেতে রহিলা সদা রত। ২।
এইরূপে অতীত হইল বহুকাল,
হইলেন বৃদ্ধ ঋতধ্বজ মহীপাল।

তবে রাজা প্রিয়তম সেই ত নন্দনে
রাজ্যে অভিষিক্ত কৈলা আনন্দিত মনে। ৩।
তপস্যার তরে, করি' বাসনা অন্তরে
ভার্য্যা সহ বনে যেতে, রাজ্য ত্যাগ করে। ৪।
গমন সময়ে, মদালসা পুত্রবরে
কামনা নাশের তরে উপদেশ করে। ৫।
মদালসা কয় হ'বে যে সময়
দুঃখ তব অতিশয়,
প্রিয় নাশ ফলে, কিম্বা শত্রুবলে
পরাজিত যে সময়,
কিম্বা বিত্ত নাশ হ'য়ে হত-আশ
হবে তুমি যে সময়

ভবেৎ তৎ কুর্ব্বতো রাজ্যং গৃহধর্ম্মাবলম্বিনঃ।
দুঃখায়তনভূতো হি মমত্বালম্বনো গৃহী ॥ ৭ ॥
তদাস্মাৎ পুত্র নিষ্কৃষ্য মদ্দত্তাদঙ্গুরীয়কাৎ।
বাচ্যং তে শাসনং পট্টে সূক্ষ্মাক্ষরনিবেশিতম্ ॥ ৮ ॥

দ্বিজপুত্র উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তস্মৈ সৌবর্ণং সাঙ্গুরীয়কম্।
আশিষশ্চাপি যা যোগ্যাঃ পুরুষস্য গৃহে সতঃ ॥ ৯ ॥
ততঃ কুবলয়াশ্বোঽসৌ সা চ দেবী মদালসা।
পুত্রায় দত্ত্বা তদ্রাজ্যং তপসে কাননং গতঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঋতধ্বজচরিতে মদালসোপাখ্যানে
অলর্কাভিষেচনং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সে দুঃখ অপারে শান্তি পাইবারে
উপায় আছে নিশ্চয়।
গৃহ ধর্ম্মে রত ভবে আছে যত
মমত্ব তা'দের বল,
সেই বলে তা'রা সুখে আত্মহারা
দুঃখেতে অতি দুর্ব্বল,
রাজ্যাসক্ত হ'য়ে প্রিয়জন লয়ে
যখন কাতর হ'বে;
মম দত্ত এই অঙ্গুরী হইতে
পট্ট নিষ্কাশিয়া ল'বে।

সূক্ষ্ম অক্ষরেতে সেই ত পট্টেতে
[illegible] উপদেশ লেখা,
করি[illegible] করিলে দর্শন
[illegible] লেখা দেখা। ৬-৮।
দ্বিজপুত্র ব[illegible] তা করহ শ্রবণ
এত বলি স্ব[illegible] করিয়া অর্পণ।
আশীষ করি[illegible] যে হয় বিহিত,
মদালসা [illegible] হরষিত।
নরেশ কুবলয়াশ্ব মদালসা সনে
পু[illegible] রাজা কি[illegible] পশিলেন বনে।" ৯-১০

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে ঋতধ্বজচরিতান্তর্গত মদা[illegible]পাখ্যানে
অলর্কের রাজ্যাভিষেক নামক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিজপুত্র উবাচ।

সোঽপ্যলর্কো যথান্যায়ং পুত্রবন্মুদিতাঃ প্রজাঃ।
পালয়ামাস ধর্ম্মাত্মা স্বে স্বে কর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ ॥ ১ ॥
দুষ্টেষু দণ্ডং শিষ্টেষু সম্যক্ চ পরিপালনম্।
কুর্ব্বন্ পরাং মুদং লেভে ইয়াজ চ মহামখৈঃ ॥ ২ ॥
অজায়ন্ত সুতাশ্চাস্য মহাবলপরাক্রমাঃ।
ধর্ম্মাত্মানো মহাত্মানো বিমার্গপরিপন্থিনঃ ॥ ৩ ॥
চকার সোঽর্থং ধর্ম্মেণ ধর্ম্মমর্থেন চান্নবান্।
তয়োশ্চৈবাবিরোধেন বুভুজে বিষয়ানপি ॥ ৪ ॥
এবং বহূনি বর্ষাণি তস্য পালয়তো মহীম্।
ধর্ম্মার্থ-কামসক্তস্য জগ্মুরেকমহর্যথা ॥ ৫ ॥
বৈরাগ্যং নাস্য সঞ্জজ্ঞে ভুঞ্জতো বিষয়ান্ প্রিয়ান্।
ন চাপ্যলমভূৎ তস্য ধর্ম্মার্থোপার্জ্জনং প্রতি ॥ ৬ ॥

দ্বিজপুত্র বলে, পিতা করহ শ্রবণ
রাজ্যলাভ করি' তবে অলর্ক রাজন,
যথা ন্যায়, পুত্র সম পালেন প্রজায়,
স্বধর্ম্মে স্বকর্ম্মে সদা স্থাপিয়া সবায়। ১।
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন
যথোচিত কার্য্য যাহা,—করেন রাজন।
বহু মহাযজ্ঞ করি' দেব তৃপ্তি তরে
করেন পালন ধর্ম্ম, আনন্দ অন্তরে। ২।
জন্মিল তাঁহার মহাবল পুত্রগণ
সবে ধর্ম্মরত ধীর পিতার মতন।
অধর্ম্মের শত্রু সবে ধার্ম্মিকের সখা
এমন নন্দন সদা নাহি যায় দেখা। ৩।

ধর্ম্মপথে থাকি রাজা ধনার্জ্জন করে
সেই ধন করে ব্যয় ধর্ম্মলাভ তরে।
ধর্ম্মার্থের অবিরোধে সেই নররায়
ভুঞ্জিয়া বিষয় সুখে জীবন কাটায়। ৪।
এইরূপে ক্রমে বহু বর্ষ হ'লো গত
রাজ্য করে—ধর্ম্ম-অর্থ-কামে হ'য়ে রত।
বহু বর্ষ কেটে যায় দিনেকের প্রায়
মনেতে নবেশ কোনো কষ্ট নাহি পায়। ৫।
প্রিয় বিষয়ের ভোগে আসক্ত সতত,
হৃদয়ে বৈরাগ্য নাহি হইল আগত।
ধর্ম্মের চরম অর্থ মোক্ষ নাম যা'র,
সে সদর্থ তবে বাঞ্ছা নাহি হয়ো তার। ৬।

নবাবিষ্কৃত, কুশীনগর

(বুদ্ধদেবের সমাধি-ক্ষেত্র)
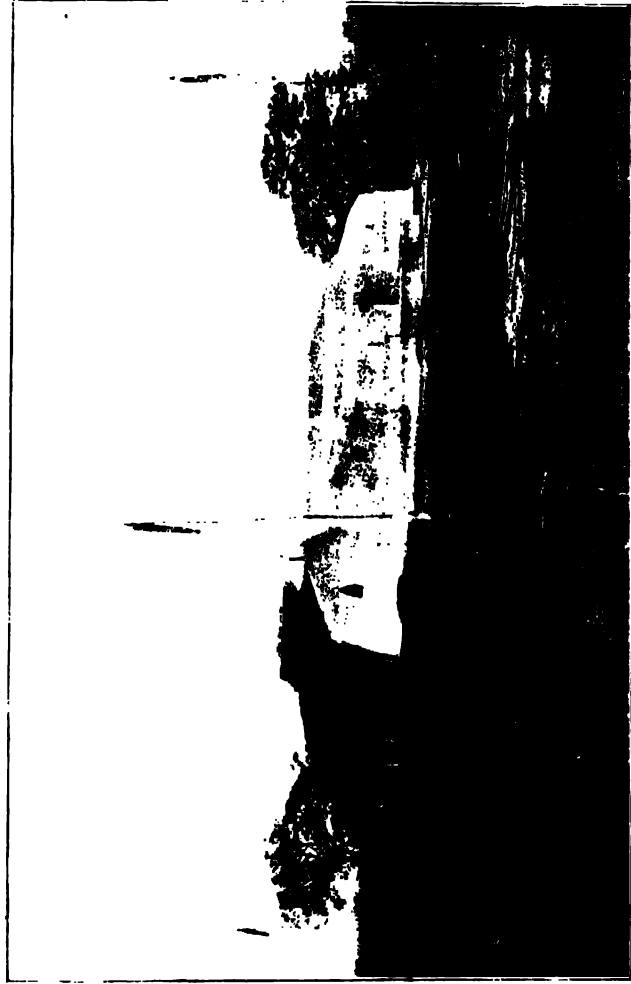
"আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর ।"

"ভারতবাসী 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরজাতি-পীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটি মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

ভূদেব

৫ম খণ্ড
৫ম বর্ষ

পৌষ, ১৩২

৩য় সংখ্যা

আলোচনা

১। হিন্দুজাতির নিকট পাশ্চাত্যের ঋণ

আজকাল আমরা বলিতে শিখিয়াছি,—"তার পর, দুর্ভিক্ষ-অনাহারের প্রকোপ যখন কমে আস্‌বে, পরে এক দিন এই ভারতের ধর্মনেতারা দেশ হ'তে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'বেন, এবং একে একে ইউরোপের সকল দেশকে বৈরাগ্যের কথা শুনিয়ে মন প্রাণ কেড়ে ল'বেন। দেখ্‌ব, ভারতের ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ইউরোপের কর্ম্মবিজ্ঞানকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়ে ওঁদের জীবন-সংগ্রাম ও সাংসারিকতার হ্রাস করে দেবে। ইউরোপীয় সমাজ এখন বৈষয়িক ভারে জর্জ্জরিত,—এই আধ্যাত্মিক নবজীবনের জন্য বসে' আছে। ভারতের প্রকৃত উন্নতিতে ইউরোপেরও মুক্তি।"

মানবসভ্যতার উপর হিন্দুজাতির প্রভাব-বিস্তারের আশায় এখন আমরা সাহসপূর্ব্বক

নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া থাকি; "গ্রীকসাহিত্য বিস্তারের দ্বারা ইউরোপের ষোড়শ শতাব্দীতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতে মানবজাতির নব অভ্যুদয় হিন্দু-সাহিত্য প্রচারের দ্বারা সংঘটিত হইবে। ভারতের বিদ্যাপ্রচারক, শিক্ষাপ্রচারক ও সাহিত্যপ্রচারকগণ, বিশ্বের বিজ্ঞান-ভাণ্ডার,—মানবজাতির সারস্বতক্ষেত্র, আপনাদের অপূর্ব্ব সাহসিকতা, বিপুলবিস্তৃত অধ্যবসায় ও জগদ্ব্যাপিনী সাধনার ফল প্রতীক্ষা করিতেছে।"

আমাদের এই আশা কি অমূলক? আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা কি বাতুলতা মাত্র? আমাদের এই ভবিষ্যতের নয়নরঞ্জক, চিত্তবিমোহনকারী দৃশ্য কি উন্মাদময়ীকল্পনাসৃষ্ট মরুদেশের মরীচিকার ন্যায় উপেক্ষণীয়? যাঁহারা অতীত-গৌরববাহিনী ইতিহাস-কথাকে কাব্যের ছড়া মাত্র মনে করেন, তাঁহারা আমাদের ভবিষ্য জাতীয় জীবনের চিত্রকে দুরাশার স্বপ্ন মাত্র বিবেচনা করিবেন, সন্দেহ নাই। আর, যাঁহারা ভারতবর্ষের পূর্ব্বাপর অবস্থা সম্যক্ জানিবার ইচ্ছাকে "নব্য সভ্যতা"র প্রতিবন্ধক বিবেচনা করেন, এবং হিন্দুজাতির ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের স্তর-বিন্যাসগুলির সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারা হিন্দু-সভ্যতার আগামী যুগ-ধর্ম্মের উদ্বোধনকে বৃথা বাক্যাড়ম্বর জ্ঞানে তুচ্ছ করিবেন। কিন্তু অতীত কখনও বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎকে ত্যাগ করে না—বর্ত্তমান অকৃতজ্ঞ হইলেও তাহারই ভিতর দিয়া অতীত ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত করিয়া লয়।

ভারতবর্ষের অতীত মিথ্যা নয়, অলীক নয়—হিন্দুজাতির পূর্ব্ব কার্য্য-কলাপ কবি-কল্পনার সামগ্রী নয়, কেবল মাত্র ধ্যান-ধারণার বিষয়ীভূত নয়, যোগী-ঋষিরই উপলব্ধি-গম্য নয়। আধুনিক জাতীয়-গৌরবদৃপ্ত মিথ্যা অভিমানের আশ্রয়েই স্বদেশ, স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ আমাদের নিকট দৈবক্রমে পূজা লাভের যোগ্য হইয়া উঠে নাই! ভারতবর্ষ চিরকাল মানবজাতির গুরুস্থানীয়; ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যুগে যুগে মানবসন্তানকে শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ধর্ম্ম বিতরণ করিয়াছেন। কেবল আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্বই নয়, কেবল মুক্তি, নির্ব্বাণ, ত্যাগ, বৈরাগ্যের কথাই নয়,—ভারতবাসী সর্ব্বদা এশিয়া ও ইউরোপকে বৈষয়িক জ্ঞান, ব্যবহারিক বিদ্যা, গৃহস্থালী-তত্ত্ব এবং সাংসারিক জীবনে উন্নতির উপায় শিক্ষা দিয়াছে। জগতে ভারতবর্ষের গুরুগিরি ঐতিহাসিক সত্য। ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে—তোমাদের তাম্রশাসন, প্রাচীন পুঁথি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য, বিদেশীয় সাহিত্যের প্রমাণ, চীন, জাপান, আরব, পারস্য এবং গ্রীসের প্রাচীন অর্ব্বাচীন লেখক-গায়ক-শিল্পিকুল সকলই সাক্ষ্য দিতেছে—ভারতবর্ষের নিকট এসিয়া ও ইউরোপ প্রায় সকল বিষয়েই ঋণী। আমরা ক্রমে ক্রমে প্রমাণসহ দেখাইব যে, মানবজাতির বড় বড় ধর্ম্মগুলি, বড় বড় দর্শনবাদগুলি, বড় বড় বিজ্ঞানগুলি হিন্দুজাতির উদ্ভাবিত, হিন্দু-জাতির মনীষার ফল। হিন্দুজাতি সর্ব্বদা সকল জাতিকে ঋণে আবদ্ধ রাখিয়াছে—ভবিষ্যতেও যে রাখিবে তাহা সন্দেহ করিয়া দুর্ব্বলতার এবং অদূরদর্শিতার ও নৈরাশ্যের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।

* *
*

২। পাটীগণিতে ভারতবর্ষের দান

এবার আমরা হিন্দুজাতির গণিতবিজ্ঞানে উৎকর্ষলাভের কথা বলিব। সংখ্যালিখনের

দশমিক প্রণালী যে ভারতবর্ষে প্রথম অবলম্বিত হয়, তাহা আজকাল সর্ব্ববাদি-সম্মত। আর্য্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্ত যে সংখ্যা-লিখনের দশমিক প্রণালী অবগত ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য্যভট্ট খ্রীষ্টীয় ৪৭৬ সালে, ব্রহ্মগুপ্ত ৫৯৮ সালে, জন্মগ্রহণ করেন। ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতীতে এই প্রণালী বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ এই প্রণালী সম্যক্রূপে গ্রহণ করেন। আর্য্যভট্টের আর্য্যভট্টীয় (জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত) ও ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত কালিফ আল্ মনসুরের (৭৫৪-৭৭৫) সময় আরবী ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। কালিফ আল্ মামুনের রাজত্বকালে (৮১৩-৩৩) খোরাসান-নিবাসী মহম্মদ ইবন্ মুসা ভারতবর্ষে আগমন করেন। ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি একখানি বীজগণিত লেখেন। ঐ বীজগণিত আর্য্যভট্টীয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্ত্তী আরব-বীজগণিত-লেখকগণ মুসার বীজগণিতের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। যতদূর পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে আরবদেশে সংখ্যালিখনের দশমিক প্রণালীর ব্যবহার ৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম হয়। কালিফ ওয়ালিদের (৭০৫-৭১৫ খ্রী: অ:) রাজত্ব-কালে আরবদেশে দশমিক প্রণালীর ব্যবহারের কোনও চিহ্নই পাওয়া যায় না।

দশমিক প্রণালী খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রচলিত হয়। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে Leonardo, "Algebra et al muchabala" নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি দশমিক প্রণালী বর্ণন করেন এবং সেই সময় হইতে ইউরোপে উহার প্রচার আরম্ভ হয়। লিওনার্ডো ঐ গ্রন্থে রোমক প্রণালী অপেক্ষা আরবীয় প্রণালীর উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন। তাঁহার গ্রন্থপাঠে ইহাও জানা যায় তৎসময়ে দশমিক প্রণালী ইউরোপে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

সংখ্যালিখনের চিহ্নগুলিও যে ভারতবর্ষ হইতেই অধুনিক সভ্যজগতে প্রচলিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুস্থানে প্রচলিত দেবনাগরী সংখ্যাচিহ্নগুলিই রূপান্তরিত হইয়া আরবগণের দ্বারা ব্যবহৃত হইত। আরব-গণের নিকট হইতে ইউরোপীয়গণ উহা গ্রহণ করেন।

যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ ও ঘনমূল-নিষ্কাশন প্রভৃতি কার্য্যের যে যে প্রণালী আজকাল সভ্যজগতে সর্ব্বত্র প্রচলিত, তাহা ভাস্করাচার্য্যের (১১১৪ খ্রী: অ:) লীলাবতীতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীধরাচার্য্যের (৯১৩ খ্রী: অ:) ত্রিশতিকায়ও বর্গ এবং ঘনমূল নিষ্কাশনের নিয়ম বর্ণিত আছে।

৩। হিন্দুজাতি বীজগণিতের জন্মদাতা

জার্ম্মান্ পণ্ডিত হকেল (Haeckel) সাহেবের মতে হিন্দুগণ বীজগণিতের আবিষ্কর্ত্তা। বস্তুতঃ যদিও ডাওফ্যান্টাস্ (Diophantus) বীজ-গণিতের কতকগুলি তথ্যের আলোচনা করিয়া-ছিলেন, সাঙ্কেতিক বীজগণিত ভারতবর্ষেই প্রথম আলোচিত হয়। সময়হিসাবে আর্য্যভট্ট যদিও ডাওফ্যান্টাসের পরবর্ত্তী, কিন্তু আর্য্য-ভট্টের বীজগণিত যে ডাওফ্যান্টাসের বীজ-গণিত অপেক্ষা অনেক উচ্চে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর্য্যভট্টের বীজগণিতে বর্গ-সমীকরণের সম্পূর্ণ সমাধান, ১,২,৩,... প্রভৃতি রাশিগুলির, উহাদের বর্গের, ও ঘনফলের সমষ্টি এবং একঘাত (Indeter-

minate) সমীকরণের সমাধান পাওয়া যায়। বর্গ-সমীকরণের যে দুইটী মূল আছে, তাহা হিন্দুগণ জানিতেন; গ্রীকগণের উহা অবিদিত ছিল। ব্রহ্মগুপ্ত দ্বিঘাত (Indetertminate) সমীকরণের আলোচনা করিয়াছিলেন। ডাওফ্যাণ্টাস্ ঐ প্রকার সমীকরণের একটী বিশেষ সমাধান লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুগণ সাধারণ সমাধান লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত যে যে সমাধান সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দীতে মাত্র সাধিত হইয়াছে। ব্রহ্মগুপ্ত-প্রদত্ত একটী দ্বিঘাত (Indeterminate) সমীকরণের সাধারণ সমাধান জগদ্বিখ্যাত ইউলারও (Euler) সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ইউরোপে উহার সমাধান ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে Dela Grange কর্ত্তৃক সাধিত হয় এবং তাঁহার সমাধান ব্রহ্মগুপ্তের সমাধানের অবিকল অনুরূপ। আর্য্যভটের কুট্টক-প্রণালী ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত অবিদিত ছিল। ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে Bachet ঐ প্রণালী প্রথম ইউরোপে প্রচলন করেন। আর্য্যভট্ট একাধিক অব্যক্তরাশি-ঘটিত সমীকরণেরও আলোচনা করিয়াছেন।

আর্য্যভট্ট কিন্তু হিন্দু বীজগণিতজ্ঞগণের প্রথম নহেন। তাঁহার পূর্ব্বেও যে বীজগণিতের চর্চ্চা হিন্দুস্থানে প্রচলিত ছিল এবং বিশেষ উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা তাঁহার গ্রন্থপাঠে উপলব্ধি হয়। ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতীতে শূন্য সম্বন্ধে একটী অধ্যায় আছে। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে অ + ০ = অ, ০² = ০, √০ = ০, অ ÷ ০ = ∞। মূল লিখিবার চিহ্ন √ ভাস্কর প্রথম ব্যবহার করেন। ইউরোপে ঐ চিহ্ন Chuquet (১৬শ শতাব্দী) সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করেন, পরে Rudolff ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে উহা প্রচলিত করেন। ঋণাত্মক রাশির ব্যবহার হিন্দুগণ প্রথম আবিষ্কার করেন। রাশির উপর একটী বিন্দু লিখিলে তাহা ঋণাত্মক বিবেচিত হইত। ভগ্নাংশ লিখিবার প্রণালী—লবের নীচে হর লেখা—হিন্দুগণ প্রচার করেন; প্রথমতঃ লব ও হরের মধ্যে কষি লিখিত হইত না, পরে কিন্তু ঐ চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। ভগ্নাংশ লিখিবার এই প্রণালী আরবগণ হিন্দুগণের নিকট শিক্ষা করেন এবং পরে ইউরোপে প্রচার করেন। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার বীজগণিতের শেষ অধ্যায়ে সংযোগ (Combination) সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন।

* *
*

৪। হিন্দুস্থানে জ্যামিতির উৎকর্ষ

পণ্ডিতগণের মতে জ্যামিতির আবিষ্কার ইজিপ্ট দেশে সংঘটিত হয়। গ্রীসে ইহার আলোচনা ও সম্যক উন্নতি সাধিত হয়। হিন্দুগণের জ্যামিতিজ্ঞান ও তাহার আলোচনা কিন্তু তাৎকালিক অন্য প্রদেশের তুলনায় কোনও মতেই হীন নয়। পরন্তু কোনও কোনও অংশে তাহা গ্রীক জ্যামিতি অপেক্ষা অনেক উচ্চে। গ্রীক জ্যামিতি ও শুল্ভ-সূত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া গণিতের ইতিহাস-লেখক Cantor সাহেব এই সিদ্ধান্ত প্রকটিত করেন যে, শুল্ভ-সূত্রের লেখক গ্রীক জ্যামিতি-বেত্তা হিয়েরো (Hiero of Alexandria) এবং তাহার শিষ্যগণের নিকট অনেকাংশে ঋণী। কিন্তু শুল্ভ-সূত্র খ্রীষ্টপূর্ব্ব অন্ততঃ অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, প্রোফেসর Ball (W. W. R.) এর মতে হিয়েরোর সময় সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১২০ সালের পূর্ব্বে নয়। বস্তুতঃ কোনও ইতিহাস-লেখকই তাঁহাকে

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২১৫ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন নাই। ডাক্তার থিবো দেখাইয়াছেন যে, ইউক্লিডের ১ম অধ্যায়ের ৪৭শতম প্রতিজ্ঞা,—যাহা পিথাগোরস (৫৬৯—৫০০ খ্রীঃ পূঃ) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বলিয়া প্রবাদ—হিন্দুগণ পিথাগোরসের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছিলেন। জার্ম্মান্ পণ্ডিত Schrder-এর মতে পিথাগোরস হিন্দুজ্যামিতি-শাস্ত্র হইতে অনেক জিনিষ লইয়াছিলেন। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত—π—এর মান হিন্দুগণ যত সূক্ষ্ম পরিমাণে জানিতেন গ্রীকগণ তাহা জানিতেন কি না সন্দেহ। আর্কিমিডিস πএর মান ৩$\frac{১}{৭}$ অপেক্ষা বৃহত্তর ও ৩$\frac{১০}{৭১}$ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বলিয়া স্থির করেন। অর্থাৎ তাঁহার গণনানুসারে π ৩·১৪২৮৫৭ ও ৩·১৪০৮৪৫এর মধ্যবর্ত্তী। হিয়েরো πএর মান ৩ ও $\frac{২২}{৭}$ দুই প্রকারই গ্রহণ করেন।

রোমীয়গণ স্থূল-গণনা-কালে πএর মান কখনও ৩, কখনও ৪ গ্রহণ করিতেন, সূক্ষ্ম-গণনার জন্য তাঁহারা ৩$\frac{১}{৮}$ = ৩·১২৫ লইতেন।

বৌধায়ন শুল্‌ভ-সূত্রে πএর মান ৩·০৮২৫ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর্য্যভট্ট πএর মান নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রকট করিয়াছেন—

চতুরধিকং শতমষ্টগুণং দ্বাষষ্টিস্তথা সহস্রাণাম্।
অযুতদ্বয়বিষ্কম্ভস্যাসন্নো বৃত্ত-পরিণাহঃ॥

অর্থাৎ তাহার মতে πএর আসন্নমান $\frac{৬২৮৩২}{২০০০০}$ = ৩·১৪১৬।

ভাস্করাচার্য্য πএর মান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

ব্যাসে ভনন্দাগ্নি হতে বিভক্তে খবাণ-সূর্য্যৈঃ পরিধিঃ স সূক্ষ্মঃ। দ্বাবিংশতিঘ্নে বিহৃতেঽথ শৈলৈঃ স্থূলোঽথবা স্যাদ্ব্যবহার-যোগ্যঃ॥

অর্থাৎ স্থূলব্যবহারযোগ্য π = $\frac{২২}{৭}$ কিন্তু সূক্ষ্মগণনাকালে π = $\frac{৩৯২৭}{১২৫০}$ বা ৩·১৪১৬। ইউরোপে পূর্ব্বোক্ত Leonardo πএর মান ১৪৪০/৪৫৮$\frac{১}{৯}$ লইয়াছেন (খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী)। ১৫শ শতাব্দীতে Purbach (১৪২৩—৬১) আর্য্যভট্টোল্লিখিত $\frac{৬২৮৩২}{২০০০০}$ মান গ্রহণ করিয়াছেন। ১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে Regiomontanus πএর মান ৩·১৪২৪৩ দিয়াছেন।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে πএ এর যে মান দেওয়া আছে, তাহা হিন্দুস্থানের বাহিরে আধুনিক কাল ভিন্ন কোথাও বিদিত ছিল না।

ব্রহ্মগুপ্ত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলনিষ্কাশনের যে সূত্র দিয়াছেন তাহা ইউরোপে Claviousএর (১৬শ শতাব্দী) পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। ব্রহ্মগুপ্ত ইউক্লিডের ১ম অধ্যায়ের ৪৭শ প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বৃত্তান্তর্গত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল, চতুর্ভুজের বাহুপরিমাণ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, বৃত্তের ক্ষেত্রফল যে ব্যাসার্দ্ধ ও অর্দ্ধপরিধির গুন ফল, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। সূচী ও পিরামিডের ক্ষেত্র ও ঘন ফল নিষ্কাশন করিয়াছেন।

* *
*

৫। হিন্দু ত্রিকোণ-মিতি

ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রে হিন্দুগণ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইউরোপে প্রচলিত sine শব্দ আরবগণের নিকট হইতে লব্ধ। আরবগণের ব্যবহৃত শব্দ সংস্কৃত শিঞ্জিনী শব্দের অপভ্রংশ।

গণনাকালে গ্রীকগণ কোণের সম্মুখীন চাপের জ্যা ব্যবহার করিতেন, Hipparchus and Ptolemy জ্যা সম্বন্ধে তালিকা প্রস্তুত করেন, উহা নির্ভুল নয়। হিন্দুগণ নির্দ্দিষ্ট কোণের দ্বিগুণ কোণের চাপের অর্দ্ধজ্যা ব্যবহার করিতেন। অধুনা-প্রচলিত sineও এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া

থাকে। আর্য্যভট্ট ও ৩¾ অংশ ও উহার গুণিতক পরিমাণ কোণের শিঞ্জিনীর তালিকা প্রস্তুত করেন। π=৩·১৪১৬ লইলে এই তালিকা নির্ভুল। ভাস্কর একটী সূত্র দিয়াছেন যাহা আজকালকার Differential Calculus-এর অনুসারে লিখিলে L (sine θ) = (cos θ) L θ এই সূত্র হইতে অভিন্ন।

গণিতে উৎকর্ষলাভ সাংসারিক জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়। যাঁহারা মনে করেন হিন্দু-জাতি কেবল মালা জপিত, এই পার্থিব জগতের কথা ভাবিত না, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক তত্ত্বে এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মে উন্নতি-লাভই কোন মানুষের চরম লক্ষ্য নয়। ধর্ম্ম-প্রচারই কোন জাতির একমাত্র লক্ষ্য থাকিতে পারে না। যাঁহারা হিন্দুজাতিকে ধর্ম্মপ্রচারকের লোভনীয় পদ দান করিয়া আমাদিগের অতীত ইতিহাস বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা ভুল বুঝাইয়াছেন। এই ধর্ম্ম-গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া মিথ্যা অহঙ্কারে অন্ধের ন্যায় আমরা নিষ্কর্ম্মা হইয়া যাইবার পথে চলিতে-ছিলাম। ইতিহাস নূতন করিয়া আলোচনার ফলে ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে যে হিন্দু জাতির সাংসারিক জ্ঞান বড় কম ছিল না, ব্যবহারিক বিদ্যা প্রচুর পরিমাণেই ছিল। তাহারা শিল্প-ব্যবসায়, বাণিজ্য, সুখভোগ, বিলাস-সামগ্রীর চরম করিয়া ছাড়িয়াছিল এবং এই বৈষয়িক ভিত্তিরউপরেই বৈরাগ্যের ধ্বজা উড়াইয়াছিল।

* *
*

৬। শ্রীহট্টের সাহিত্য-সম্পদ

শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব বি-এ, মহাশয় শ্রীহট্টের প্রাচীন-সম্পদ লইয়া সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীহট্টের নদ-নদী, গ্রাম নগর, লোক-জন, পূজাপার্ব্বণ, গীত-পাঁচালী, সাহিত্য-পুরাণ প্রভৃতির প্রতি তদ্দেশবাসী সাহিত্যিকদিগের অনুরাগ যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টা এই আলোচনায় লক্ষিত হইবে। তাঁহার আলোচনার কিয়দংশ নিম্নে আমরা উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি, বঙ্গের অন্যান্য সাহিত্যিকগণ নিজের নিজের জেলাকে সম্পূর্ণরূপে জানিবার জন্য রজনীবাবুর ন্যায় আলোচনা ও উদ্যোগ করিবেন—

"গোবিন্দ ভোগের গান, গাজীর গান, গুপ্মার গান, ডরাই গান, কাঁপের গান, সারি গান, সূর্য্যব্রতের গান, মেয়েলী গান, মালসী গান— এই সকল কি আমরা সংগ্রহ করিয়াছি? হিন্দু ও মুসলমান, পুরুষ ও নারী কত সঙ্গীতকার এই শ্রীহট্টে জন্মিয়াছিলেন, কত মুসলমান গোবিন্দের স্তুতি বন্দনা করিয়াছিলেন, তাহা কি আমরা জানি? ঐ সকল গানের অনেকগুলির ভিতরে, হয়ত অশ্লীলতা থাকিতে পারে, কিন্তু ভাষাতত্ত্বের হিসাবে ঐ গানগুলির মূল্য বহু উর্দ্ধে। তারপর, আমার দেশের জনমানব যে গানে বিভোর হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে, আমাদের জননী, গৃহিণী ও ভগিনীগণ যে গানে যুগযুগান্তর হইতে আনন্দের অমৃতধারা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন, আমার মত তুচ্ছ সাহিত্যিকের রক্তের ভিতরে তাহার কি কোনও প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই? সেই প্রভাব কতদূর বিস্তৃত, তাহার সন্ধান না পাইলে, আমি ক্ষুদ্র মানব কোথা হইতে আসিয়া কোথায় ভাসিয়া যাইতেছি তাহা উপলব্ধি করিব কিসে? হোক্ সে চিত্র অতি-তুচ্ছ, অতি ঘৃণ্য, পাশ্চাত্য আলোকোদ্ভাসিত নেত্রে অতি জঘন্য,—কিন্তু সে আমার দেশের

চিত্র, আমার সমাজের চিত্র, আমার পিতৃপুরুষের চিত্র, আমার মাতৃজাতির চিত্র,—সেই চিত্র দেবচিত্র। আমরা পুনরায় তাহার উদ্ধার করিব এবং তাহাকে সুসংস্কৃত করিয়া বর্ত্তমানের ভাব ও ধারণার অনুকূলে পুনর্ম্মার্জ্জিত করিয়া তাহারই অমৃতসিঞ্চনে আমার জীবন-রক্তের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিব।

এই সকল গানের ভিতরে কত যে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাময়িক তথ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহার কি ইয়ত্তা করিতে পারি? দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটীর কথা বলিতেছি। মনসাপুরাণের কথাই ধরা যাক্। মনসার ভাসান গান বাকুঁড়া হইতে আরম্ভ করিয়া কাছাড় পর্য্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া জনমানবকে আনন্দের অমৃতনিষেকে সিক্ত করিয়া আসিতেছে। সুকবি নারায়ণদেব, নারীকবি চন্দ্রাবতী, ধলাইনদীর জলপানকারী দ্বিজ গোপীকান্ত, কবি ষষ্ঠীবর, বিপ্র জানকীনাথ, বৰ্দ্ধমান দত্ত, হরিহর দত্ত, কবি জগন্নাথ, মুরারি মিত্র, মা’ল ধর্ম্মদাস, শুক্লবৈদ্য ভানুদাস, ইটা পরগণার হৃদয়ানন্দ দত্ত, দক্ষিণ তরপের দ্বিজ শ্যামানন্দ, দ্বিজ কাশীনাথ, দীন ভবানন্দ, “শিবশক্তির কিঙ্কর” কালারায় প্রভৃতি ২১ জন পদ্মপুরাণের নূতন রচয়িতার সন্ধান পাইয়াছি—ইহারা সকলেই এই জেলার লোক। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য তাঁহাদিগের পবিত্র রক্তে উদ্ভূত হইয়াছেন,—কিন্তু, কই, আপনারা কি সে পরিচয়ের সদর্প অধিকার স্থাপন করিতে পারেন?

ইঁহাদের বর্ণনায় শ্রীহট্টের বহুতর নদনদী খালবিলের উল্লেখ আছে। পাঠ করিয়াছি, নিজ সহর শ্রীহট্টের বক্ষ ভেদ করিয়া ‘মালিনী,’ ‘যোগিনী,’ ‘ভোগিনী,’ ‘গোয়ালিনী’ প্রভৃতি আটটী পার্ব্বত্যনদী খরবেগে বহিয়া যাইতেছে—কিন্তু, কই? সে কোন্ যুগের কথা? তিনটীর বেশী তো পরিচয় পাই নাই।

*　　*　　*

পদ্মপুরাণে জানিতে পাই ‘রত্না’-নদীর উপর দিয়া পণ্য-পরিপূর্ণ জাহাজ ভাসিয়া যাইত। সে রত্না আজি ভরাট হইয়া গিয়াছে, তাহার বক্ষের ভিতর হইতে কৃষক আজি লাঙ্গলের সাহায্যে রত্ন সংগ্রহ করিতেছে, আর খনিত্রযোগে বাহির করিতেছে বিশাল জাহাজের ভগ্ন বৃহৎ মাস্তুল!! শ্রীহট্টের সেই তরঙ্গব্যাকুলা রত্নার প্রবাহের কাহিনী, কাহিনী ও কথা আমরা কি সংগ্রহ করিয়াছি? কোন্ নদীর ‘ক্ষীর সম স্বাদু পানি’, কোন্ নদী খরবেগা, করঙ্গী, কল্‌কলিয়া দামালিয়া, বৌলাই প্রভৃতি নদী কত দূর বিস্তীর্ণা ছিল, এবং কোন্ পণ্য, কোন্ বস্ত্র শ্রীহট্ট হইতে রপ্তানি হইত—এই সকল বহুতর তথ্য ঐ মনসা-পুরাণের গলিত পত্রে নিবদ্ধ রহিয়াছে। নৌ-শিল্পের জন্য শ্রীহট্ট একসময়ে ভারতবিখ্যাত ছিল। ঐ মনসা-পুরাণের ভিতরে নৌকার গঠন, আকৃতি ও পরিসরের বিবৃতি রহিয়াছে। সে নৌকাগুলি ক্ষুদ্র নৌকা ছিল না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীনৌকায় বিলাস-সম্ভোগের ব্যবস্থা থাকিত।

আদাজামির ভাদাইয়া কাটাজামির আনাইয়া
নৌকাতে রুইল সারি সারি।
সুপুরির গোলাপ রস দিয়া মারে কেউন্দ কস
নৌকা কস দেয় অধিকারী॥”

—কবি চন্দ্রাবতী।

এইরূপ বর্ণনা কি নিরর্থক লেখনী-সঞ্চালন মাত্র? শ্রীহট্টের সমাজকে চিনিতে হইলে, আচার, ব্যবহার, রীতি ও নীতি অবগত হইবার বাসনা থাকিলে ঐ পদ্মপুরাণের

অন্তস্তলে ডুবিয়া যান্—দুই হস্তে মুক্তামুষ্টি লইয়া ভাসিবেন।

পঞ্চখণ্ডের বৈষ্ণব কবি রামানন্দ মিশ্র, ঢাকাদক্ষিণের প্রদ্যুম্ন মিশ্র ও জগজ্জীবন মিশ্র, ইটার সার্ব্বভৌম, সপ্তগ্রামের গোপীনাথ দত্ত, সাটিয়াজুরীর সীতারাম কর, গাভীগাঁও-নিবাসী দ্বিজ শ্যামানন্দ, বাগ্‌বাড়ীর অনন্তরাম রায় ও কিশোর রায়, বারপৈতের ভোলানাথ মুন্সী, লাখাইর ভবানীপ্রসাদ দত্ত, রায়নগরের লালা আনন্দরাম ও বিশ্বাসমহাশয়, পদকর্ত্তা শ্যামকিশোর অধিকারী, ভক্ত শিবানন্দ দত্ত—ইহারা কি ক্ষীণ হস্তে লেখনী চালনা করিয়াছেন? রামানন্দের রসতত্ত্ব-বিলাস, প্রদ্যুম্ন মিশ্রের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোদয়াবলী, জগজ্জীবন মিশ্রের মনঃসন্তোষিণী, সার্ব্বভৌমের কাব্য ও নাটক, গোপীনাথের নারীপর্ব্ব, দ্রোণপর্ব্ব প্রভৃতি মহাভারতের কয়েকটি পর্ব্বের পদ্যানুবাদ ও চক্রপাণি দত্তের বংশাবলী, সীতারামের তামাকু-পুরাণ, শ্যামানন্দের সঙ্গীত, অনন্তরামের সত্যনারায়ণের পাঁচালী, 'একলা মুন্সী' কিশোর রায়ের পাঁচালী ও গোবিন্দভোগের গান, আনন্দরামের ঝুলনসঙ্গীত, বিশ্বাসমহাশয়ের মাল্‌সী গান, ভবানীপ্রসাদের দত্তবংশাবলী, শিবানন্দের গোবিন্দবিজয়,—বর্ত্তমানযুগে ইহাদের অধ্যবসায়ের, প্রতিভার, রসিকতার, সরল বাক্যবিন্যাসের ও ঐতিহাসিক তত্ত্বপ্রচারের তুলনা কোথায়? প্যারীচরণ ও রামকুমার সে দিনের লোক—ইঁহাদের কথা, না হয়, না-ই বলিলাম। এতদ্ব্যতীত 'নিয়ত মঙ্গলচণ্ডী'র গ্রন্থকার "অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ" মান্দারকান্দি নামক দেশের কামদেব বাচস্পতির তনয় কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য, নানাবিধ পাঁচালীর রচয়িতা রাধাকৃষ্ণ দাস, দ্বিজ রামকৃষ্ণ, দ্বিজ রামচন্দ্র, বিশ্বনাথ, জয়কৃষ্ণ দাস, সুবল দাস, 'হরিবংশে'র অনুবাদক ভবানন্দ, 'কলঙ্কভঞ্জনে'র লেখক মদনানন্দ, 'মহাভারত' ও 'ক্রিয়াযোগসারে'র অনুবাদক রামেশ্বর নন্দী, 'লক্ষ্মণ বিজয়,' 'রাম-রাজ্যাভিষেক,' 'ব্রহ্মাপুরাণ' প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থের সুলেখক 'জয়চন্দ্র নরপতির সভাসদ্ ব্রাহ্মণ' ভবানীদাস, 'ক্রিয়াযোগসারে'র অন্য অনুবাদক অনন্তরাম, 'বৈদ্যনাথ মঙ্গলে'র লেখক দ্বিজ হরিহর সুত সুন্দররায়, ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত 'কৃষ্ণচরিত' পুস্তকের প্রাচীনতর রচয়িতা কবি রামদাস, 'ত্রিপুরার রাজমালা'-রচয়িতা বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর—প্রভৃতি সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্য বাঙ্গালা সাহিত্যে কি প্রচারিত হইয়াছে? আর এই সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের সহিত শ্রীহট্টের কি কোনও সম্বন্ধ নাই? সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করুন, দেখিবেন, ইঁহাদের অনেকেরই বংশধর, জ্ঞাতি, কুটুম্ব হয়ত আজ এই সভায় উপস্থিত আছেন।

অতীতের দূরতর চিত্রে নেত্রপাত করুন্, দেখিবেন এক সময়ে,

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত,
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত,
ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার,

জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দশাখাভুক্ত প্রেমরসময় যদুনাথ কবিচন্দ্র, 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-প্রণেতা ঈশান নাগর, অদ্বৈতের মাতামহ স্থানীয় আচার্য্য বিজয়পুরী প্রভৃতি একদিন এই শ্রীহট্টে জন্মিয়া অনন্তপথগামিনী ভাষাতরণীর মাঝি-মাল্লার কাজ করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টবাসী বলভদ্র আচার্য্য—পূর্ব্ববঙ্গের রাজা শ্যামলবর্ম্মার সভাপণ্ডিত

ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় "শ্যামলবর্ম্ম-চরিতম্" নামক ঐতিহাসিকগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল কথা স্মরণ করিলেও পুলকিত হইতে হয়। "মহাজ্ঞানী পরমভক্ত বৈষ্ণবাচার্য্য কমলাক্ষ ভট্টাচার্য্য, তোমার শিক্ষায় তোমার ছাত্র বিশ্বম্ভর কেশবভারতীর সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিশ্বপ্লাবী প্রেমের বন্যায় বাঙ্গালাদেশ ভাসাইয়া দিয়া তোমাকে 'অদ্বৈতাচার্য্য' নামে অমর করিয়াছে, এবং বিশ্বের নূতন চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দিয়া 'চৈতন্য মহাপ্রভু' নামে ভুবন-বিখ্যাত হইয়াছে। তোমার জন্মভূমি, তোমার ছাত্রের পিতৃভূমি—এই শ্রীহট্ট" *—ইহা স্মরণেও পুণ্য হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা শ্রীহট্টবাসী শ্রীচৈতন্যের শ্রীহট্ট আগমন সম্বন্ধে তদীয় বিগ্রহপূজক জগজ্জীবন মিশ্রের মনঃসন্তোষিণী টীকার বর্ণনার ও রামচন্দ্র কবিরাজের 'বঙ্গ-বিজয়' নামক গ্রন্থের অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও ভক্তকবি লোচনদাস প্রভৃতির পূর্ব্ববঙ্গভ্রমণ-কাহিনীতে আস্থা ছাড়াইয়া উঠিতে পারিতেছি না। সংসারবিরাগী রাজা দিব্যসিংহ 'লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস' সাজিয়া মাতৃভাষার সেবকরূপে ভক্তিতত্ত্বপ্রচারসূত্রে 'অদ্বৈতের বাল্যলীলা সূত্র' নামক যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, "যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র"—সে গ্রন্থের তুলনা কোথায়? মিথিলার প্রাচীন-ভাণ্ডার লুণ্ঠনপূর্ব্বক নবদ্বীপে ফিরিয়া যিনি নব্যন্যায়ে বাঙ্গালাদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া-ছিলেন, সেই পণ্ডিতকুলশিরোমণি একচক্ষু রঘুনাথের জন্মভূমি এই শ্রীহট্ট। 'সময় প্রদীপে'র রচয়িতা হরিহরাচার্য্য 'অষ্টাবিংশতি প্রদীপে'র লেখক মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার এই শ্রীহট্টের লোক। এইরূপ আর কত নাম গ্রহণ করিয়া হৃদয়বেদনা বাড়াইব।

* * *

সাধক-কুল-ধ্রুবতারা কুতব্-উল্-আউলিয়া, সমরখন্দী [illegible], মধুসৈয়দ, গদাহাসন, শাহপরাণ, [illegible], ফতেগাজী প্রভৃতি কত সাধু মুসলমানের পবিত্র অস্থি এই '৩৬০ আউলিয়ার মুলুক' শ্রীহট্টের মৃত্তিকায় নিহিত রহিয়াছে। আমরা তাঁহাদের পবিত্র জীবন-কাহিনী [illegible] অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইব, তাঁহাদের [illegible]কের নামের সহিত শ্রীহট্টের অতীত ইতিহাসের এক একটী অধ্যায় জড়িত রহিয়াছে। সেই ইতিহাস কাহারা প্রণয়ন করিবে?

সিংহাবলীর 'সিংহরাজবংশের, ভট্টপাটকের নবগীকৃষ্ণ[illegible]দের বংশের, লাউড়ের রাজবংশের ইতিহাস কি সঙ্কলিত হইয়াছে? রাজা গৌড়গোবিন্দ, রাজা আচকনারাইন, রাজা সুবিদনারায়ণ, রাজা বিজয় সিংহ, রাজা প্রতাপ, রাজা গোবর্দ্ধন, রাজা উবর্দ্ধন, পোড় রাজা [illegible] বাঞ্ছশীক্রুধর দত্ত খাঁ শ্রীবংসের ইতিহাস কি সঙ্কলিত হইয়াছে? ইটারাজ্য-ধ্বংসকারী [illegible] ওস্মান, প্রতাপগড়বিজয়ী মজুমদার[illegible]প সেনাপতি লোধি খাঁ—ইহাদের [illegible] কি আলোচনায় নহে?

কাছাড়ের [illegible]বনপাহাড়, ত্রিপুর-সীমান্তে ঊনকোটী[illegible], জয়ন্তিয়ার পর্ব্বতমালা অনু-সন্ধান করুন, এতদঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আর্য্যসভ্যতার সন্ধান পাইবেন। খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্বে সুদূর ইরাবতী-উপত্যকা পর্য্যন্ত আর্য্য-উপনিবেশ বিস্তৃত ছিল। শ্রীহট্টের সেই আর্য্যসভ্যতার যুগের ইতিহাস কোথায়?

* "দেশবার্ত্তা", ৩য় সংখ্যা

ভানুনারায়ণের গড়, উদয় নারায়ণের গড়, বদরপুরের গড় ইহাদের সম্বন্ধে শেষতথ্য জ্ঞাত হইয়াছি কি? চিলারায়ের আক্রমণ, 'আয়তন' নগর অবরোধ—এই সকলের কোনও বিস্তৃত সন্ধান পাইয়াছি কি? নারীপ্রাধান্যমূলক খশ জাতির প্রাচীন সভ্যতার, 'নারীরাজ্য' জয়ন্তিয়ার বিস্তৃত বিবরণ কোথায়? ভুজবলের খোজার মসজিদে, আদিনামহলায় প্রাপ্ত শৃগালচিহ্নিত প্রস্তরখণ্ডে কোন্ তত্ত্ব লিপিবদ্ধ রহিয়াছে? শৈলেশ্বরবিলের তীরদেশে অবস্থিত কানু-গোলের গভীর অরণ্যনিহিত ভগ্নমন্দিরস্তূপে দেবতা হরগৌরীর সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু আরও কত জ্ঞাতব্য তথ্য নিহিত রহিয়াছে। মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রোক্ত পীঠদেবতা হাটকেশ্বর এইস্থানে কিছুদিন অবস্থান করিতেন কি না কিছুই বলিতে পারি না। "শ্রীহট্টে হট্ট-বাসিন্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজিত দেবী-পুরাণোক্ত হট্টবাসিনী কি শ্রীহট্টসহরের ভগ্ন-শিলাঙ্কিত অরণ্যবাসিনী বনদুর্গা? ইটার উমামহেশ্বর, কানুগোলের হরগৌরী, কাছাড়ের হাচেঙ্গসা রাজবংশের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মুদ্রায় উল্লিখিত হরগৌরী কি প্রমাণ করিয়াছিল? এই সকল প্রশ্ন মাত্র—সাহিত্যিকের অনুসন্ধিৎসু লেখনী ইহার উত্তর দানে নিযুক্ত হউক।"

***

৭। পল্লীসেবার সদুপায়

আমরা সময়ে সময়ে বাঙ্গালীর পল্লীসেবায় মনোনিবেশের পরিচয় দিয়াছি। খুলনাজেলার "পল্লীপরিষৎ," শ্রীরামপুরের "চাতরা-ভক্তা-শ্রম," বিক্রমপুরের "আউটসাহী বাল্যসমিতি" কি সুন্দর কার্য্য করিতেছেন তাহা আপনারা শুনিয়াছেন। কোথায়ও রাস্তাঘাট-পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধান, কোথায়ও অনাথ-দরিদ্রের দুঃখ-নিবারণ, কোথায়ও সর্ব্ববিধ লোকহিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান—এই প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্দেশ্য। বিগত জল-প্লাবনের দুর্দ্দৈবে আমাদের দেশবাসীরা কিরূপ স্বার্থত্যাগ, কষ্টস্বীকার এবং শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন তাহা এখন আর কাহারও অবিদিত নাই। ভারতবাসীর এই কর্ম্মতৎপরতায় লাটসাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া দেশ-বিদেশের নেতৃবর্গ এবং ইউরোপীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা লোক-প্রশংসার ধার ধারি না—এবং আমাদের ভরসা আছে, আমাদের কর্ম্মিবৃন্দ এই প্রশংসার সংবাদ রাখিতেও সচেষ্ট ন'ন।

সম্প্রতি হাবড়া জেলার "মাজু-গ্রন্থাগারে"র একখানি মুদ্রিত বিবরণী পাঠ করিয়া প্রীতি-লাভ করিয়াছি। মাজুগ্রামবাসিগণের স্বচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরী হইতে তিন বৎসরে ১৫,৩৩০এর অধিকপুস্তক পাঠক-পাঠিকা-মহলে চলাফেরা করিয়াছে। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় আশান্বিত হইলাম। তাঁহাদিগকে বিলাতের Nineteenth Century, Fortnightly Review এবং Review of Reviews অন্ততঃ এই তিনখানা কাগজ আনাইতে অনুরোধ করি।

পল্লীসেবা সম্বন্ধীয় আর একখানি অনুষ্ঠান-পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে একটি "ছাত্রসভা" আছে। তাহার উদ্যোগে সেখানে পুরাণ-পাঠ এবং লোকশিক্ষা-বিস্তারের অন্যান্য উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাঁহাদের "গ্রাম-

পর্য্যবেক্ষণ"শীর্ষক কর্ম্মপ্রণালীর বিবরণী এ স্থলে নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। পল্লীর অবস্থা সম্যক্ জানিবার উপায় ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১। জাতি

(১) নাম; (২) সংখ্যা; (৩) পূর্ব্বপরিচয়—কোথা হইতে কি জন্য আসিয়াছে, কতদিন গ্রামে আছে; (৪) হ্রাস-বৃদ্ধি, তাহার কারণ; (৫) শ্রেণীভেদ—উচ্চ-নীচ, কৌলীন্য, পরস্পর সম্বন্ধ; (৬) বর্ত্তমান অবস্থা; (৭) শিক্ষা; (৮) প্রকৃতি—শান্ত কি অশান্ত, ধর্ম্মভাব কিরূপ, সুনীতি-দুর্নীতি; (৯) জীবিকা; (১০) কোন্ বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়; হিন্দু বা মুসলমান-সমাজে কিরূপ স্থান।

২। শিল্প

(১) নাম; (২) আমদানি-রপ্তানি; (৩) কত লোক সেই শিল্প করে—স্থানীয় কত ও বৈদেশিক কত; (৪) গ্রামের পরিমাণমত প্রয়োজন তাহাতে সম্পন্ন হয় কি না; (৫) ভাল-মন্দ; (৬) সুবিধা-অসুবিধা।

৩। বাণিজ্য

(১) নাম; (২) ভাল-মন্দ; (৩) সুবিধা-অসুবিধা; (৪) পরিমাণ; কত লোক সেই বাণিজ্য করে—স্থানীয় কত, বৈদেশিক কত।

৪। কৃষি

(১) শস্যের নাম; একই শস্যের অবান্তর বিভিন্ন-বিভিন্ন নাম, যেমন একই ধান ভিন্ন-ভিন্ন নামের হয়; (৩) পরিমাণ; (৪) কৃষির সাধন, যথা—হাল, বলদ ইত্যাদি বিভিন্ন-বিভিন্ন যন্ত্রের নাম উহা গ্রামে উৎপন্ন হয় কি না; (৫) সার ব্যবহার করে কি না, সার-সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদিগের ধারণা এবং কিরূপ সার ব্যবহৃত হয়; (৬) জল দেওয়ার ব্যবস্থা; (৭) ফসল কাটিবার ব্যবস্থা; (৮) কোন্ শস্য উৎপন্ন হয়; (৯) কোন নূতন শস্য প্রচলিত হইয়াছে কি না; (১০) কোন্ শস্য কিরূপভাবে ব্যবহার করে; (১১) উৎপন্ন শস্যের রপ্তানী, বিক্রয় ইত্যাদি কিরূপ হয়।

৫। ধর্ম্ম-মত

(১) নাম, (২) অবান্তর নাম, যথা হিন্দুর মধ্যে শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি; (৩) কি উপাসনা করে, কোন সময়ে করে, উপাসনা বা পূজার উপকরণ, (৪) যে দেবতার উপাসনা করে তাঁহার প্রকৃতিসম্বন্ধে উপাসকেরা কি ভাব পোষণ করে; (৫) কি উদ্দেশ্যে পূজা করে; (৬) নিজে পূজা করে কি কাহারও দ্বারা পূজা করায়; (৭) কি প্রণালীতে পূজা করে অর্থাৎ প্রথম কি কি করিয়া আরম্ভ করে, ইত্যাদি; (৮) কি মন্ত্রে পূজা করে; (৯) উপাস্য দেবতার সম্বন্ধে কোন গল্প থাকিলে তাহার উল্লেখ, (১০) কোন মন্ত্রাদি জপ করে কি না, করিলে তাহা কি; (১১) মন্ত্রদাতা গুরু আছেন কি না; (১২) পরলোকসম্বন্ধে কিরূপ বিশ্বাস, (১৩) ভূত-প্রেত-পিশাচ ইত্যাদিতে বিশ্বাস আছে কি না, থাকিলে কিরূপ, ভূতে ধরিলে কি উপায়ে তাহার প্রতীকার করে; (১৪) দৈনিক কোন ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান আছে কি না, (১৫) কোন তীর্থে যায় কি না, তীর্থের ধারণা কিরূপ; (১৬) গ্রামের দেবালয় প্রভৃতি।

৬। শিক্ষা

(১) কোন কোন্ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিরূপ ব্যবস্থা আছে, (২) উপস্থিত ব্যবস্থা গ্রামের প্রয়োজনের উপযুক্ত কি না; (৩) শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য গ্রামের লোক কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে; (৪) গ্রামে কত জন পুরুষ ও স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারে।

৭। সমাজ

(১) জন্ম হইতে মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাতির কার্য্যকলাপ, যথা—অন্ন-

প্রাশন, বিবাহ ইত্যাদি ; (২) সমাজশাসন, সমাজবন্ধন ; (৩) বিবাদ-বিসংবাদের কিরূপে নিষ্পত্তি হয়।

৮। উৎসব

(১) প্রাচীন ও বর্ত্তমান ; (২) জাতি বা সম্প্রদায়-গত উৎসব ; (৩) উদ্দেশ্য ; (৪) উৎসবের অঙ্গ—নৃত্য, গীত, বাদ্য, বাজি ইত্যাদি।

৯। ব্রত

(১) নাম ; (২) উদ্দেশ্য ; (৩) সময়, কত দিন ধরিয়া হয় ; (৪) পূজা, উপকরণ ; (৫) কথা, ছড়া, কবিতা, মন্ত্র ; (৬) কিরূপ ভাবে করা হয় ; (৭) কোন্ ব্রত কোন্ জাতির মধ্যে প্রচলিত।

১০। উদ্ভিদ

(১) বিভাগ—(ক) বৃক্ষ, (খ) গুল্ম, (গ) লতা, (ঘ) ওষধি-শস্য, (খ) বৃহৎ, মধ্যম বা ক্ষুদ্র ; (২) কোন্ কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ্ আছে, তাহাদের নাম, পরিমাণ ও আকৃতি ; (৩) অল্পসংখ্যক অথচ বিশেষ উপযোগী বৃক্ষাদির নাম ও সংখ্যা ; (৪) পত্র, পুষ্প, ফল-প্রভৃতি কি কি জন্য ব্যবহৃত হয় ; (৫) কোন উদ্ভিদের পত্র হইয়াছে, হইতেছে, বা হইবার সম্ভাবনা, এবং কোন্ কোন্ জাতি বৃক্ষ বাড়িতেছে, তাহাদের কারণ ; (৬) কোন্ কোন্ উদ্ভিদ্ নূতন আসিয়াছে, কিরূপে আসিয়াছে ; (৭) বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন্ কোন্ ফুল, ফল প্রভৃতি উৎপন্ন হয় বা পাওয়া যায়।

১১। পশু

(১) বিভাগ—বন্য বা গ্রাম্য ; (২) নাম ও সম্ভব হইলে সংখ্যা ; (৩) প্রকৃতি—মানসিক ও শারীরিক ; জন্ম-মৃত্যু, সন্তান-সন্ততি, বাস-স্থান-সংগ্রহ, আহার-অন্বেষণ, গুণ-দোষ ; (৪) ব্যবহার—কোন কার্য্যে লাগে।

১২। পক্ষী

পশুবৎ।

১৩। কীট-পতঙ্গ

পশুবৎ।

১৪। যান-বাহন

(১) নাম ; (২) প্রাচীন ও আধুনিক ; (৩) সংখ্যা ; (৪) আকার-বর্ণনা ; (৫) সাজ-সজ্জা ; (৬) কয়জন এক সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারে ; (৭) ব্যয়, লাভ ক্ষতি ; (৮) সংগ্রহের উপায়, সুলভ-দুর্লভ ; (৯) কত দিন স্থায়ী।

১৫। বেশভূষা

(১) নাম ও সংখ্যা ; (২) প্রাচীন ও আধুনিক ; (৩) উপাদান অর্থাৎ কিসে প্রস্তুত ; (৪) সুলভ-দুর্লভ ; (৫) প্রচার ; (৬) কিরূপ কোথায় ব্যবহৃত হয় ; (৭) কোথায় নির্ম্মিত হয় ; (৮) কোন্ জাতীয় ব্যক্তি কোন্ বেশ-ভূষা বিশেষরূপে আদর করে ; কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ বেশ ভূষা করা হয় কি না ; (১০) বয়স, ব্যবসায়, জাতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ বিশেষ বেশ-ভূষা আছে কি না।

১৬। রাস্তা-ঘাট

(১) সাধারণ বা অসাধারণ পথ ; (২) সংখ্যা ; (৩) কখন ও কে করিয়াছেন ; (৫) অবস্থা ; (৬) সংস্কারের উপায়-নির্দ্দেশ।

১৭। জল

(১) পানীয় ; (২) অন্যান্য কার্য্যের উপযুক্ত ; (৩) কিরূপে সম্প্রতি চলে ; (৪) বন্যা ; (৫) বৃষ্টি ; (৬) পুষ্করিণীর সংখ্যা ও অবস্থা ; (৭) অধিকারীর নাম ; (৮) অভাব থাকিলে প্রতিকারের চেষ্টা।

১৮। খাদ্যসামগ্রী

(১) সাধারণ ; (২) বিভিন্ন বিভিন্ন জাতির ; (৩) বিভিন্ন-বিভিন্ন ঋতুর ; (৪) সারবান্ ও সুস্বাদু ; (৫) স্থানীয় ও অস্থানীয়, সুলভ-দুর্লভ।

১৯। স্বাস্থ্য

(১) সাধারণ; (২) বিশেষ বিশেষ ঋতুতে; (৩) কোন ব্যায়াম বেশী ও কি জন্য; (৪) মৃত্যুসংখ্যা; (৫) রোগ-প্রতিকারের উপায়; (৬) চিকিৎসক—সংখ্যা ও যোগ্যতা।

২০। সাধারণ কার্য্য

(১) শিক্ষা; (২) চিকিৎসা; (৩) ডাক; (৪) খাল-নালা; (৫) সেতু; (৬) পথ-ঘাট; (৭) আমোদ-প্রমোদ।

* *
*

৮। কাব্য রচনা ও স্বদেশ-সেবা

রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়ে বাঙ্গালী জাতি বোলপুরে যাইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। এই সম্বর্দ্ধনায় রবিবাবু যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা সোজা সোজি বুঝা কঠিন। তাঁহার অভিভাষণ নানা লোকে নানা অর্থে গ্রহণ করিবে। বিশেষতঃ কবিবরের ভাষা স্বভাবতই অলঙ্কারপূর্ণ, তলাইয়া বুঝিয়া মর্ম্মগ্রহণ করিবার অধিকার অনেক লোকেরই নাই। আমরা তাঁহার উক্তির দুই একটি স্থলের যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিতেছি।

প্রথমতঃ, কবি ও স্বদেশ-সেবক, সাহিত্যসেবী ও কর্ম্মবীর, লেখক ও কর্ম্মী, চিন্তাপ্রচারক ও কর্ম্ম-কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠাতা, ভাবুক ও কর্ম্মযোগী, পণ্ডিত ও পরোপকারী, বিদ্বান্ ও সাধক,—তিনি এই দুই প্রকার লোকের পার্থক্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা চরম কথা—দেশবাসীর প্রণিধানের যোগ্য—আমাদের উদীয়মান ছাত্র ও যুবক-সমাজের সর্ব্বদা স্মরণীয় উপদেশ—সাহিত্য-সমালোচকগণের পক্ষে একটি প্রাথমিক সূত্র স্বরূপ। তাঁহার মর্ম্মকথা এই যে, যিনি কবি, সাহিত্যসেবী, লেখক, চিন্তাপ্রচারক, ভাবুক, পণ্ডিত বা বিদ্বান্ তাঁহাকে স্বদেশসেবক, কর্ম্মবীর, কর্ম্মী, কর্ম্ম-কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠাতা, কর্ম্মযোগী, পরোপকারী বা সাধকের মাপকাঠিতে বিচার বা সমালোচনা করা উচিৎ নয়। এই দুই শ্রেণীর লোক দুই ভিন্ন ভিন্ন জগতে বাস করেন—তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে হইলে এই দুই স্বতন্ত্র জগতের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

খুলিয়া বলিলে আরও বিশদ হইবে। কথাটা বড়ই প্রয়োজনীয়। আমরা জাতীয় জীবনের যে অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছি সে অবস্থায় আমাদের সকলেরই এই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ একটি অতি সময়োপযোগী কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন—সেজন্য একটুকু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতেছি।

কবি স্বদেশ-সেবক কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করিও না; সাহিত্য-সেবী কর্ম্মবীর কি না এ প্রশ্ন তুলিও না; লেখক স্বয়ং কর্ম্মী কি না তাহা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইও না। চিন্তা-প্রচারক নিজে কোন কর্ম্মকেন্দ্রের পরিচালক বা প্রবর্ত্তক কি না, তাঁহার চিন্তা বুঝিবার জন্য এ সংবাদ সংগ্রহ করিও না। যিনি ভাবুক, তিনিই আবার কর্ম্মযোগী কিনা, যিনি পণ্ডিত, তিনিই আবার পরোপকারী কি না, যিনি বিদ্বান্ তিনিই জীবনের প্রতিকর্ম্মে তাঁহার জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতেছেন কি না—এ সকল প্রশ্ন অবান্তর মাত্র। এক ব্যক্তি দুই প্রকার গুণেরই অধিকারী হইতে পারেন না, তাহা নহে। যিনি কবি তিনি স্বদেশ-সেবক হইতেও পারেন, না-ও হইতে পারেন। যদি স্বদেশসেবক হ'ন, ভালই, না হ'ন ক্ষতি নাই কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার কাব্য উপেক্ষিত হইবে না। কবির জীবন-বৃত্তান্ত

হইতে তাঁহার পরোপকারের বা স্বদেশসেবার প্রমাণ বা অপ্রমাণগুলি টানিয়া বাহির করিলে তাঁহার কাব্য বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। এই সকল তথ্য জানিলে বা না জানিলে যেটুকু সুবিধা বা অসুবিধা হইবে তাহার দ্বারা কাব্য বা কবির মূল্য বাড়িবে বা কমিবে না। নূতন কতকগুলি কথা জানিতে পাইয়া পাঠক কবিকে নূতন একদিক হইতে চিনিতে পারিবেন মাত্র—তাঁহার নূতন এক ব্যক্তিত্ব বুঝিতে পারিবেন মাত্র—তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কয়েকটি নূতন পরিচয় পাইবেন মাত্র—এই নূতন জগৎ কবির কাব্যের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা জানিতে পারিব মাত্র। কিন্তু তাহার সাহায্যে কাব্য-হিসাবে, সাহিত্য-হিসাবে, পাণ্ডিত্য-হিসাবে, চিন্তা-হিসাবে, রচনা-হিসাবে এবং ভাব-হিসাবে আমরা লেখকের লেখা হইতে, বক্তার বক্তৃতা হইতে আমাদের জীবন-গঠনোপযোগী নূতন কোন তত্ত্ব পাইব না। কবিকে স্বদেশসেবক অথবা স্বদেশ-দ্রোহী, পরোপকারী অথবা স্বার্থপর, ধার্ম্মিক অথবা পাপাত্মা, বৈরাগী অথবা ভোগী, অকপট অথবা কপট ইত্যাদি-রূপে আবিষ্কার করিব মাত্র। তাহাতে সমাজের স্বদেশ-সেবক, পরোপকারী, সাধক অথবা স্বার্থপর, স্বদেশদ্রোহী, অধার্ম্মিক, এবং মর্কট-বৈরাগ্য-অবলম্বনকারীর সংখ্যা বাড়িবে বা কমিবে মাত্র। কবি, লেখক, সাহিত্যসেবী-পণ্ডিত, বিদ্বান্ অথবা অ-কবি, অ-লেখক, মূর্খ, অশিক্ষিত, ইত্যাদির সংখ্যা কিছুমাত্র বাড়িবে বা কমিবে না। তাহাতে আমাদের উত্তম, মধ্যম বা অধম কাব্যের, সাহিত্যের রচনার, পাণ্ডিত্যের ও বিদ্যাবত্তার পরিমাণ 'যথাপূর্ব্বং তথা পরই' থাকিবে।

সোজা কথা এই, জীবনের প্রাত্যহিক দিন-কার কর্ম্মের সঙ্গে মিলাইয়া লেখকের, চিন্তা-বীরের, সহিত্যসেবীর রচনা, চিন্তা ও কাব্য বুঝিতে বসিও না। কবি যখন কবিত্ব ত্যাগ করিয়া নূতন আকারে তোমাদের সম্মুখে দেখা দিবেন, সাহিত্যসেবী যখন কর্ম্মজগতের আসরে নামিয়া দশে পাঁচে মিলিয়া কর্ম্ম-কেন্দ্র গঠন করিতে অগ্রসর হইবেন, পণ্ডিত যখন পরোপকারের ধ্বজা লইয়া সকলকে পরোপ-কারের কর্ম্মে ব্রতী করিবেন, বিদ্বান যখন বৈরাগ্য-ব্রত উদযাপন করিবার জন্য নূতন ব্যক্তিত্ব লইয়া নূতন আকারে মূর্ত্তিমান্ ত্যাগ-ধর্ম্মরূপে তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন—তখন তাঁহার জীবন-সংবাদ লইও, তখন তাঁহার কপটতা-অকপটতার হিসাব গ্রহণ করিও, চরিত্রবত্তা-অচরিত্রবত্তার প্রমাণগুলি বাহির করিও, তাঁহার নিকট হইতে স্বদেশ-সেবার "সার্টিফিকেট" আদায় করিও, লোকসমাজ তাঁহাকে কবে কোথায় কি ভাবে দেখিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিও। কিন্তু সাবধান তখন আবার তাঁহার সাহিত্য-সেবার পরিচয় লইও না, তাঁহার কবিতায় কোন্ কোন্ রস ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইও না; তাঁহার পাণ্ডিত্যের দৌড় কতদূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার খুঁজিয়া তাহা জানিবার জন্য লালায়িত হইও না, তাঁহার নামের আগে ও পরে কতখানি ডিগ্রী,উপাধি, টিকি বা ল্যাজ সংযুক্ত আছে তাহার সংখ্যা বা ওজন করিও না।

পাণ্ডিত্য না থাকিলেও পরোপকারী হওয়া যায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অধিকারী না হইলেও স্বদেশসেবা করা যায়—সাহিত্য-জগতে নামজাদা লোক না হইয়াও জগৎকে স্তম্ভিত করা যায়—নিতান্ত অ-কবি, অ-বিদ্বান্ এবং

অশিক্ষিত হইলেও কর্ম্মবীর, কর্ম্মী, সাধক, কর্ম্মযোগী, পরোপকারী, লোকহিতৈষী, মানবসেবক, ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মপ্রচারক হইবার কোন বাধা হয় না। সুতরাং স্বদেশ-সেবককে, কর্ম্মবীরকে তাঁহার "পাশে"র, "উপাধি"র, কাব্যরচনার, পুস্তক মুখস্থ করার, বৈজ্ঞানিক-অনুসন্ধানের, ঐতিহাসিক গবেষণার, বই লিখিবার সার্টিফিকেট আদায় করিতে যত্নবান্ হইও না। যদি স্বদেশ-সেবকের এই সকল গুণ থাকে, ভালই; কিন্তু এই সব নূতন জগতের নব নব গুণ না থাকিলেও "বয়ে গেল," বড় বেশী আসে যায় না। এই কারণেই স্বদেশ-সেবা-হিসাবে, পরোপকার-হিসাবে, বৈরাগ্য-হিসাবে, ধর্ম্মপ্রণেতা-হিসাবে, তাঁহার কার্য্যাবলীর মূল্য বাড়িবে বা কমিবে না। মূর্খের বৈরাগ্য যে বৈরাগ্য, বিদ্বানের বৈরাগ্যও ঠিক সেই বৈরাগ্য। পণ্ডিতের পরোপকারের যে মূল্য, অপণ্ডিতের পরোপকারেরও ঠিক সেই মূল্য; অশিক্ষিতের স্বদেশ-সেবার যে মাহাত্ম্য, শিক্ষিত সাহিত্যবীরের স্বদেশসেবা তদপেক্ষা এক চুলও বেশী মূল্যবান্ নহে।

কাব্য যিনিই রচনা করুন তাহা কাব্যই বটে। স্বদেশ-সেবা যিনিই করুন তাহা স্বদেশ-সেবাই বটে। বক্তৃতা যিনিই করুন তাহা বক্তৃতা, সাহিত্য যিনিই সৃষ্টি করুন তাহা সাহিত্য। আবার পরোপকার যাঁহার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হউক, তাহা পরোপকার। বৈরাগ্য যিনিই অবলম্বন করুন তাহা বৈরাগ্য। কোন সাহিত্যসেবীর কাব্য সমালোচনা করিবার সময় অবান্তর কথা আনিও না, কোন ব্যক্তির স্বদেশ-সেবার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া বাজে কথা তুলিও না।

তবে কি কবি বা চিন্তাপ্রচারক বা ভাবুক স্বদেশসেবক, পরোপকারী, কর্ম্ম-কর্ত্তা ইত্যাদি হইতে পারেন না? এই দুই প্রকার গুণের অধিকারী কি একই ব্যক্তি হইতে পারেন না? আর, স্বদেশ-সেবক বা পরোপকারী বা সন্ন্যাসী কি পণ্ডিত, লেখক, কবি বা বিদ্বান্ হইতে পারেন না? এই দুই প্রকার গুণের মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে কি?

দ্বিবিধগুণের যেখানে সমাবেশ সেখানে মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে বলিব- সেখানে এক নূতন প্রকারের ব্যক্তিত্ব গঠিত হইয়াছে জানিব। সোনাতে সোহাগা দিয়া নূতন এক জীবেরই সৃষ্টি হইয়াছে বুঝিব। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এই মণিকাঞ্চন সংযোগে, এই নূতন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির ফলে আমরা সমাজের নূতন কতকগুলি বীরপদবাচ্য লোক পাইব মাত্র, নূতন এক রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইব। তাহার দ্বারা সাহিত্যসেবা কিম্বা স্বদেশসেবার সমালোচনার পক্ষে বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে, এরূপ গুণসমাবেশ—সম্প্রতি এরূপ মণিকাঞ্চন যোগ আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা যে কথার মীমাংসা করিতে বসিয়াছি তাহার জন্য এই প্রশ্ন উত্থাপনের কোন আবশ্যকতা নাই। এরূপ "সোনায় সোহাগা" জগতে দেখা যায় কি না—এই সংযোগ বিরল বা অবিরল, তাহাও আমাদের এখানে একেবারেই বিবেচ্য নয়।

গ্রীকসাহিত্যে ইস্কাইলস্, সফক্লীস্ ও ইউরিপিডিস্ যে স্থান অধিকার করিতেছেন তাহার জন্য আমরা কোন্ কোন্ সংবাদ লইয়া থাকি? গ্রীক-সাহিত্যের ইতিহাস ব্যতীত আর কোন কথা মনে রাখা আবশ্যক কি? গ্রীকজাতি সম্বন্ধে সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রীয়জীবনের কথা, আচার-ব্যবহারের কথা, নৈতিক অবস্থার

কথা ইত্যাদি আরও অনেক কথা জানিতে হয় বটে—কিন্তু কি জন্য? তাহার দ্বারা এই নাট্যকারগণের নাটকগুলি বুঝিবার জন্য। এই নাটকের লেখকগণকে মনুষ্যত্ব হিসাবে, স্বদেশসেবক হিসাবে, চরিত্রবত্তার হিসাবে বড়, মহনীয় বা পূজ্য করিবার জন্য নয়। যখন আমরা ইতিহাস ঘাঁটিয়া জানিতে পারি যে; স্বদেশ-উদ্ধারের জন্য ইহাঁরা যুদ্ধ করিয়াছিলেন অথবা এ সম্বন্ধে পরাঙ্মুখ ছিলেন-রাষ্ট্রের উন্নতি বিধানের জন্য প্রতিদিন যথা-সম্ভব চেষ্টা করিতেন অথবা উদাসীন থাকিতেন, সমাজের, শিল্পের এবং গ্রীক-সভ্যতার অন্যান্য বিভাগের পুষ্টির জন্য কথঞ্চিৎ শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন বা করেন নাই,—তখন তাঁহাদের বহুমুখীন জীবনের একটা চিত্র সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র কয়েকটা জানিতে পারি এবং তাঁহাদিগকে নূতন কারণে স্মরণীয় বা অস্মরণীয় মনে করি। কিন্তু তাহার দ্বারা তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলি আমাদের কাব্য-সমালোচনার কষ্টিপাথরে বেশী উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল হইয়া পড়ে কি? ইতিহাসপাঠে এই টুকুমাত্র লাভ হয় যে, কতকগুলি সাময়িক ঘটনা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের ভাষানিবদ্ধ বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ কথঞ্চিৎ পরিস্ফুট হয়। তাহা ছাড়া আর কিছু নয়। প্লেটো, য়্যারিষ্টটল, কালিদাস, দান্তে, গেটে, সেক্সপীয়র ইঁহাদের কাব্য সম্বন্ধেও সেই কথা। আমরা জিজ্ঞাসা করি না—প্লেটো কেতাবে যে আদর্শ লিখিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া ফেল মারিয়াছিলেন কি না, য়্যারিষ্টটলের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের সৌহার্দ্দ্য কত দিন ছিল, দান্তে ইতালীর খণ্ডরাজ্যগুলি যুক্ত-রাজ্যে পরিণত করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন কি না, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের নিকট কত পেন্‌শান পাইতেন, গেটে নেপোলিয়নের পরাক্রম হইতে জার্ম্মাণির উদ্ধারসাধন নিজ জীবনের কর্ত্তব্য মনে করিতেন কি না, সেক্সপীয়রের সঙ্গে রাণী এলিজাবেথের সম্বন্ধ কিরূপ ছিল। যদি এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করি, তবে তাহার দ্বারা তাঁহাদের রচনাগুলি সেই সময়কার অবস্থানুসারে বুঝিবার জন্য, তলাইয়া মজাইয়া দেখিবার জন্য আমাদের একমাত্র চেষ্টা থাকে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ নিষ্কর্ম্মা ছিলেন, কেহ বা স্বদেশদ্রোহী ছিলেন, কেহ প্রকৃত দেশভক্ত ছিলেন, কেহ বা স্বার্থসিদ্ধির কথাই ভাবিতেন—এ সকল কথা আমরা জানি; কিন্তু তাহার জন্য য়্যান্টীগোনি, রিপব্লিক, ডিভাইন কমেডি, রঘুবংশ, ফৌষ্ট বা কিং-লিয়ারকে স্বর্গে তুলি না অথবা রসাতলে পাঠাই না। পৃথিবীর মহাপুরুষ চরিত্রবান্ ধর্ম্মবীর স্বদেশসেবকের তালিকায় ইঁহাদের কাহাকেও স্থান দিয়া থাকি, কাহাকে বা দি না এই পর্য্যন্ত। কিন্তু জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর ও সাহিত্য-রথীদিগের তালিকায় ইঁহারা অমর রূপে পূজ্য।

এই সুবিস্তৃত আলোচনায় আমরা বুঝিলাম :-

(১) ধার্ম্মিক, বৈরাগী, কর্ম্মবীর, সাধক, স্বদেশসেবক, পরোপকারী ইত্যাদি না হইয়া কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, কর্ম্মযোগ, সাধনা, স্বদেশসেবা, পরোপকার ইত্যাদি বিষয়ে (ক) অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করিতে পারেন;—আবার (খ) অতি নিকৃষ্ট সাহিত্যও রচনা করিতে পারেন।

(২) ধার্ম্মিক, বৈরাগী ইত্যাদি হইয়া কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ইত্যাদি বিষয়ে (ক) অতি

নিকৃষ্ট কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করিতে পারেন, আবার (খ) অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্যও রচনা করিতে পারেন।

এখন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদি কাহাকে বলে সে প্রশ্নের মীমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই। সাহিত্যের আদর্শ কি, কোন্ কোন্ উপাদানে উন্নত কাব্যের গঠন হয়—এই সকল কথা এ স্থলে আলোচ্য নয়।

অধিকন্তু,—

(১) উৎকৃষ্ট বিদ্বান্, পণ্ডিত, চিন্তাবীর, কবি, সাহিত্যসেবী ইত্যাদি না হইয়া কোন ব্যক্তি (ক) ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, কর্ম্মযোগ, স্বদেশসেবা, পরোপকার, ইত্যাদি জীবনের কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন; আবার (খ) ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ইত্যাদি কার্য্যে পরিণত নাও করিতে পারেন।

(২) উৎকৃষ্ট বিদ্বান, পণ্ডিত, কবি ইত্যাদি হইয়া কোন ব্যক্তি (ক) ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ইত্যাদি জীবনের কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন; (খ) আবার নাও পারেন।

স্বদেশসেবা কাহাকে বলে, বৈরাগ্যের লক্ষণ কি কি,—ইত্যাদি বিষয় এখানে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই সকল কার্য্য যাহাই হউক, পাণ্ডিত্য, কাব্যালোচনা, সাহিত্যসেবা ইত্যাদির সঙ্গে কোন প্রকৃতিগত সম্বন্ধ নাই।

সুতরাং কোন লোককে বিচার করিতে হইলে—বিশেষতঃ তাঁহার সাহিত্যসেবার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে—আমরা সাহিত্য-জগতের নিয়মের যেন বাহিরে না যাই। যদি সাহিত্য বুঝিবার জন্য জীবনবৃত্তান্ত-ঘটিত কোন কথা বলা আবশ্যক হয়, তবে সর্ব্বদা যেন মনে থাকে যে তাহা অবান্তর মাত্র। কোন্ মুহূর্ত্তে কবির কাব্য-সমালোচনা ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছি তাহা ভুলিয়া গেলে গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। কোন ব্যক্তি চরিত্র হিসাবে বড় বা ছোট তাহা জানি বলিয়া সাহিত্যসেবী হিসাবে সেই ব্যক্তিকে বড় বা ছোট যেন না করিয়া ফেলি। সাহিত্যসমালোচনার ইহাই বৈজ্ঞানিক রীতি।

৯। কবিবরের উক্তি

এখন আমরা কবিবরের অভিভাষণ হইতে আমাদের আলোচ্য অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যাঁরা জনসাধারণের নেতা, যাঁরা কর্ম্মবীর, সর্ব্বসাধারণের সম্মান তাঁদেরই প্রাপ্য এবং জনসাধারণের কাজে সেই সম্মানে তাঁদের প্রয়োজনও আছে। যাঁরা লক্ষ্মীকে উদ্ধার করবার জন্য বিধাতার মন্থনদণ্ডস্বরূপ হয়ে মন্দর গিরির মত জনসমুদ্র মন্থন করেন, জনতা তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে, তাঁদের ললাটকে সম্মানধারায় অভিষিক্ত করবে, এইটেই সত্য, এইটেই স্বাভাবিক।

কিন্তু কবির সে ভাগ্য নয়। মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রেই কবির কাজ এবং সেই হৃদয়ের প্রীতিতেই তার কবিত্বের সার্থকতা। কিন্তু এই হৃদয়ের নানা বিচিত্র—সেখানে কোথাও মেঘ, কোথাও রৌদ্র। অতএব প্রীতির ফসলেই যখন কবির দাবী, তখন এ কথা তার বলা চলবে না যে, নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণেরই প্রীতি তিনি লাভ করবেন। যাঁরা যজ্ঞের হোমাগ্নি জ্বালাবেন, তাঁরা সমস্ত গাছটাকেই ইন্ধনরূপে গ্রহণ করতে পারেন, আর মালা

গাঁথার ভার যাঁদের উপরে, তাঁদের অধিকার কেবলমাত্র শাখার প্রান্ত ও পল্লবের অন্তরাল থেকে দুটি-চারটি করে ফুল চয়ন করা।

কবি বিশেষের কাব্যে কেউ বা আনন্দ পান, কেউ বা উদাসীন থাকেন, কারো বা তাতে আঘাত লাগে এবং তাঁরা আঘাত দেন। আমার কাব্যসম্বন্ধেও এই স্বাভাবিক নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয়নি, এ কথা আমার এবং আপনাদের জানা আছে।"

কবিবর সাহিত্যসেবা এবং স্বদেশসেবার পার্থক্য কেবল সম্মান-লাভের দিক হইতে দেখাইয়াছেন। আমরা এই পার্থক্য ব্যাপক ভাবে দেখাইলাম। আমরা একটুকু গোড়ার কথা, দুইশ্রেণীর ব্যক্তির ভিতরকার অনুপ্রাণনার কথা বিশ্লেষণ করিয়াছি।

* *
*

১০। ভারতবাসীর নোবেল-প্রাইজ লাভ

রবিবাবু তাঁহার সম্বর্দ্ধনার উত্তরে দেশবাসীকে জানাইয়াছেন :—

"দেশের লোকের হাত থেকে যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগে পৌঁছেছে, তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এতকাল আমি তা নিঃশব্দে বহন করে এসেছি। এমন সময় কি জন্য যে বিদেশ হতে আমি সম্মান লাভ করলুম, তা এখনো পর্য্যন্ত আমি নিজেই ভাল করে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি সমুদ্রের পূর্ব্বতীরে বসে যাঁকে পূজার অঞ্জলি দিয়েছিলেম, তিনিই সমুদ্রের পশ্চিম তীরে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্য যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন, সে কথা আমি জানতুম না। তাঁর সেই প্রসাদ আমি লাভ করেছি এই আমার সত্য লাভ।

যাই হোক্ যে কারণেই হোক্, আজ য়ুরোপ আমাকে সম্মানের বরমাল্য দান করেছেন। তার যদি কোনো মূল্য থাকে তবে সে কেবল সেখানকার গুণিজনের রসবোধের মধ্যেই আছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তার কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ নেই। নোবেল-প্রাইজের দ্বারা কোনো রচনার গুণ বা রসবৃদ্ধি করতে পারে না।"

এই উত্তর সম্বর্দ্ধনা-উৎসবের উপযোগী হইয়াছিল কি না—আমরা জানি না। উদ্ধৃতাংশের অর্থ সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলিবে। আমরা তাঁহার ব্যক্তিগত "সম্মানলাভে"র, তাঁহার "বরমাল্য"-প্রাপ্তি সম্বন্ধে, অথবা তাঁহার "সত্যলাভ" বিষয়ে কোন সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহার নীরব ভক্তভাবে আমরাও তাঁহার সার্থকতা লাভে আনন্দিতই হইয়াছি। কিন্তু দশের একজন ভাবে এই উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে দু' একটি মাত্র কথা বলিয়া রাখিতে চাহি —

প্রথমতঃ, ভারতের হিন্দু-মুসলমান, আমরা অবনত ঘৃণিত জাতি। পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছি বলিয়া কোন লোক স্বীকার করে না। এই কারণে আমাদের নৈতিক অধোগতির চূড়ান্ত হইয়াছে। দেশের লোকের গৌরবে গৌরব বোধ না করিয়া আমরা হিংসাই করিয়া থাকি। পরের উন্নতিতে আমাদের বুক চড় চড় করে—চোখ টাটায়। স্বদেশ ও স্বসমাজকে সম্মান করা ত দূরের কথা—নিজের উপরই বিশ্বাস বিন্দুমাত্র নাই। নিজেকেই নিজে চিনি না। আত্মশক্তিতে নির্ভর করি না—আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান কাহাকে বলে জানি না। তবে অন্ধকার কাটিতেছে—বিশ্বাস জন্মিতেছে—আত্মসম্মানবোধ জাগিতেছে। এই জন্য রামমোহন,

:দেব, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, নবীন, হেমচন্দ্র, বিবেকানন্দ—সকলকে বিস্মৃতির গর্ভ হইতে আনিয়া আনিতে সচেষ্ট হইয়াছি। দশ বৎসর পূর্ব্বে লোকে স্বামী বিবেকানন্দকে "নরা দত্ত" 'বিবেকানন্দ দত্ত" বলিত, এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসকেও লোকে "রামকৃষ্ণ বাবু" বলিত। তখন তাঁহারা জীবিত। আজ রবীন্দ্রনাথকে সজ্ঞানে দুইবার সম্বর্দ্ধনা করিবার মতি হইয়াছে, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য।

এখন যে স্বদেশীয় একজন সুধীকে সম্মান করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছি ও নিজ জীবনকে ধন্য মনে করিতেছি—তাহা কত-দিনের কথা? এ শিক্ষা কতদিনের? গভীরভাবে দেখিলে বুঝিতে পারিব—বিগত ৭।৮ বৎসরের মধ্যেই উন্নত জাতিসুলভ বীর-পূজার প্রবৃত্তি আমাদের চরিত্রে বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনের দুই যুগ দেখিলেন। তিনি আমাদের ইতিহাসের সন্ধিকালে উপস্থিত। এই জন্যই পূর্ব্বযুগের অবজ্ঞা—এবং নবযুগের বিকাশোন্মুখ কথঞ্চিৎ আন্তরিক কথঞ্চিৎ কপট, খানিকটা লোক-দেখান খানিকটা যথার্থ লোক-প্রীতি—এই দুই প্রকার ঘটনা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল। ইহা দুঃখের কথা নয়, পরিতাপের বিষয় নয়—আনন্দ-উৎসবের সময়ে তির্য্যগ্‌ভাব-প্রদর্শনের উপলক্ষ্য নয়।

বীর-পূজার এখন প্রারম্ভিক অবস্থামাত্র, সময় আসিতেছে যখন আমরা আধ কপটতা আধ আন্তরিকতা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ হৃদয়ে বীরের সম্বর্দ্ধনায় তন্ময় হইয়া পড়িব। তখন টাউন-হলের সভায় লোক হইবে কি না এই সন্দেহে পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করিবার জন্য ব্যস্ত হইব না। তখন ছেলে জমা করিয়া সভার আসর পূর্ণ করিতে হইবে না। সেই সময়ে রাস্তায় ঘাটে, মাঠে বাটে, দোকানে বাজারে, কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে নৈসর্গিক আনন্দের ধ্বনি পড়িয়া যাইবে—কুলী-মজুর, ফেরীওয়ালা, দর্জ্জি, তাঁতী, কর্ম্মকার, মাষ্টার, কেরাণী একত্র হইয়া সেই বীরপুরুষের বীণা-ঝঙ্কারে নাচিতে থাকিবে, গাহিতে থাকিবে। সমগ্র দেশব্যাপিনী ভাবুকতার বন্যা জনসমাজকে প্লাবিত করিবে। এইরূপ আনন্দে পাগল আমরা হইতে জানি না তাহা নহে। যে দিন ভারতবর্ষের রঙ্গ-মঞ্চে কবীর, তুকারাম, শ্রীচৈতন্যের ন্যায় পাগল আবির্ভূত হইয়া অজস্র কীর্ত্তন গাহিতেছিলেন, সে দিন ভারতমাতার সন্তান-সন্ততি বিনা বিজ্ঞাপনে বিনা বক্তৃতায় পাগল হইতে শিখিয়াছিল—বীরপূজা করিতে পারিত—দেশের লোককে সম্মান করিতে জানিত। আর কি আমরা পাগল হইব না?

* *

১১। বিদেশে পূজালাভ

দ্বিতীয় কথা—লোকে বলে, "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" আমরা এই সঙ্গে যদি বলি "বিদেশে বিদ্বান্ পূজ্যতে আগে, স্বদেশে পরে পূজ্যতে" তাহা হইলেও বোধ হয় মিথ্যা বলা হইবে না। ফরাসী পণ্ডিতের সম্মান ইংরাজ আগে করিয়া থাকে। ইংরাজ পণ্ডিতের সম্বর্দ্ধনা জর্ম্মাণী আগে করিয়া থাকে। আমেরিকার গুণীর আদর ফরাসী জাতি আগে করে। বিদ্যা-জগতের, সাহিত্য-জগতের, শিক্ষা-জগতের দস্তুরই প্রায় এইরূপ। দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে হইবে কি? প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক লাইবনিজ (১৬৪৬—১৭১৬ খৃঃ অঃ)

জার্ম্মাণিতে কিছুমাত্র উৎসাহ পান নাই। জার্ম্মাণির প্রসিদ্ধ নৌতত্ত্ববিৎ ও গণিতজ্ঞ পণ্ডিত মেয়ার (Tobias Mayer, ১৭৬৩-৬২) ইংরাজ-জাতির অর্থ-সাহায্যে তাঁহার মৌলিক অনুসন্ধান ও গবেষণাসমূহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ বৈজ্ঞানিক হাম্বল্ড (১৭৬৯-১৮৫৯) নিজ অর্থবলে এবং ফরাসী-সাহিত্য-পরিষদের অনুগ্রহে রচনাবলী প্রকাশ করিতেন—জার্ম্মাণির সাহিত্য-জগতে সম্বর্দ্ধনা তিনি মৃত্যুর অত্যল্পকাল পূর্ব্বেই লাভ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ফরাসী-সাহিত্য-পরিষদের অর্থ-সাহায্য এবং সম্বর্দ্ধনা লাভ করিবার পর জার্ম্মাণির জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ জার্ম্মাণিতে এবং অন্যত্র প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, ইংরাজ-সন্তান নিউটনও বিলাতেই প্রথমে "কল্কে পান" নাই। লাইবনিজ যেমন স্বদেশে এবং স্বসমাজে বহুকাল অনাদৃত ছিলেন—নিউটনের আবিষ্কারও সেইরূপ বিলাতী সাহিত্যে এবং ইংরাজী চিন্তায় বহুকাল পর্য্যন্ত কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই। ফরাসী ভল্টেয়ারের পৃষ্ঠপোষকতায় নিউটনতত্ত্ব জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। নিউটন এবং লাইবনিজকে বাদ দিয়াই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ ও জার্ম্মাণ-লেখকগণ স্বদেশের বিদ্বান্‌গণের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতেন। অথচ এই দুইজনকে বাদ দিলে আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়া কাটিয়া ফেলা হয়!

বিলাতের রয়েল সোসাইটি এবং অন্যান্য বিজ্ঞান বা সাহিত্য-সমিতির গত দুই শত বৎসরের কাগজপত্র দেখিলে বুঝা যায়—ইংরাজ-সমাজে স্বার্থপরতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সঙ্কীর্ণ চিত্ততা, দ্বেষ, দলাদলি হিংসা ইত্যাদি কত বেশী ছিল এবং এখনও কত আছে। ফরাসী-পরিষৎও স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের কত গবেষণা চাপিয়া রাখিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণেরও অনেক সময়ে উৎসাহাভাবে প্রতিভা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ইংরাজ-সমাজে এ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দোষই দেখা গিয়াছে। বিলাতী রসায়নের প্রধান স্তম্ভ পণ্ডিত ড্যাল্টনের (১৭৬৬-১৮৪৪) দুর্গতি কাহার না মনে আছে? ফ্যারাডেও অর্থাভাবে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরাজ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক যে সকল কথা দেশের লোককে শুনাইয়াছেন তদনুসারে তাঁহারা স্বদেশে কার্য্যতঃ অথবা মুখতঃ কোন সমাদর লাভ করেন নাই। জার্ম্মাণির বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং ফরাসী-সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি বিদেশীয় "রসবোধজ্ঞ গুণিজন" না থাকিলে বিদ্যার জগতে বিলাতের নাম থাকিতই কি না সন্দেহ। অতএব দেখা গেল—কেবল বাঙ্গালী বা ভারতবাসীই দেশীয় পণ্ডিতকে অবজ্ঞা করে তাহা নহে। জার্ম্মাণি, ফরাসী, ইংরাজ সকলেই এ সম্বন্ধে পাপী।

১২। পাশ্চাত্য সভ্যতার মারপ্যাঁচ

তৃতীয়তঃ, সত্যসত্যই কি পাশ্চাত্য জগতের "গুণিজনে"রা অতি উচ্চ অঙ্গের রসজ্ঞ—বড় পাকা সমজদার? তাঁহারা কি নিক্তির ওজনে মাপিয়া ফরাসী, জার্ম্মান্, রুশীয়, প্রাচ্য, আমেরিকান—সকল প্রকার লোকের বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সাহিত্যসেবা, পরোপকার, লোকহিত, কাব্যালোচনা ইত্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন? তাঁহারা কি দেশ-কালপাত্র বিবেচনা না করিয়া সকল স্থলেই

পক্ষপাতশূন্য যথার্থ সমালোচনা করিয়া থাকেন? তাঁহারা কি হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মভেদ ও সাদা, কাল, লাল, পীত, রংএর চামড়াভেদ, এবং ফরাসী, জার্ম্মান্, গ্রীক, ইংরাজ, রুশীয়, ভারতীয়, চীনা, জাপানী ইত্যাদি 'জাতিভেদ' না করিয়াই বিদ্যা-বুদ্ধির সম্মান করেন? আমরা পাশ্চাত্য চিন্তা-জগতের কিছু কিছু সংবাদ রাখিয়া থাকি। আমরা পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-মণ্ডলের রেষারেষি, দালাদলির ইতিবৃত্ত এবং বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ নহি। ফরাসী জাতির কোন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে রুশজাতির কোন এক সম্প্রদায়ের কিরূপ সম্বন্ধ, জার্ম্মাণির কোন পণ্ডিত-সমাজের সঙ্গে আমেরিকা বা ইংলণ্ডের কোন বিদ্বৎপরিষদের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বুঝিবার উপায় আছে।

যদি পাশ্চাত্য জগৎসম্বন্ধে কোন কথা জোরের সহিত বলা যাইতে পারে, তবে তাহা এই—

পাশ্চাত্য জগতে কোন বিষয়ে নিরপেক্ষ সমালোচনা বিন্দুমাত্র নাই। তাঁহারা মতলব অনুসারে কাজ করেন, কথা বলেন, বক্তৃতা দেন, পরামর্শ দেন, সন্ধি করেন, পুস্তক প্রকাশ করেন। প্রতিপদবিক্ষেপে, প্রতিদিনকার ওঠা-বসায়, ঘরোয়া-বৈঠকে, চা-পানের নিমন্ত্রণে, এবং মন-রাখা আনাগোনায় তাঁহাদের ফিকিরী, চালাকী, ওস্তাদী, সোজা কথায় ডিপ্লমেসী পরিস্ফুট। তাঁহাদের সমাজ, তাঁহাদের ধর্ম্ম, তাঁহাদের রাষ্ট্র, তাঁহাদের সাহিত্য, তাঁহাদের বিবাহ, তাঁহাদের লোকসেবা—প্রত্যেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ কার্য্যকলাপেই এই "পাঁচ চালে মাত" করিবার পন্থা, ভবিষ্যতে "কাজ হাঁসিল" করিবার কৌশল দেখিতে পাইবে। কাজেই তাঁহাদের জগতে যতগুলি বিদ্যার কেন্দ্র, যতগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান, যতগুলি বিজ্ঞান-পরিষৎ, যতগুলি মানব-সেবক-সমিতি, যতগুলি রাষ্ট্রীয় "দল," যতগুলি পার্ল্যামেণ্ট-ক্যাবিনেট, যত গুলি সংবাদপত্র বা মাসিকপত্র, যতগুলি ধর্ম্মসভা রহিয়াছে, সেই সমুদয়ের নিত্যনৈমিত্তিক "চাল" পরিবর্ত্তন অনেক "ভিতরকার কথা"র উপর নির্ভর করে। সেই ভিতরকার কথাগুলি আর কিছুই নয়—দলাদলি, অনৈক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্যকে "বাগে ফেলিবার" চেষ্টা, দশ জনকে 'কাবু' করিবার অভিসন্ধি, হিংসা-দ্বেষ কলহ ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহাদের সাহিত্যবিষয়ে "রসবোধ" এইরূপ অসংখ্য দলাদলির, মতলববাজীর, এবং আড়াআড়ির কোন কোন ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যজগৎ সামান্য-সামান্য কার্য্যকলাপেও সরল, সহজ, পক্ষপাতশূন্য, সমদর্শী, আন্তরিকতাময়, অর্থাৎ হৃদয়ের সহিত বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আমাদের অনেকে তোতাপাখীর মত শিখিয়াছেন, এবং বুলি আওড়াইয়া থাকেন যে, পাশ্চাত্যজগৎ বড়ই ঐক্যবিশিষ্ট, ঐক্যই তাঁহাদের শক্তির প্রধান কারণ, তাঁহাদের একতার গুণেই তাঁহারা আজ জগতে প্রসিদ্ধ। ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান, তুমি বহুকাল হইতে অনেক মিথ্যা কথা শিখিয়াছ। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, পাশ্চাত্য জগতের একতা সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা। তোমরা ইতিহাস পড়িয়াছ—তোমরা পণ্ডিত। কিন্তু বলিতে পার প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় জীবনের কোন্ অধ্যায়ে ঐক্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়? এই তথাকথিত একতা ইতালীর ইতিহাসে কোন যুগে ছিল কি? ইউরোপের মধ্যযুগের বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই তোমাদের জানা

আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই কি উপায়ে ঘুস দিয়া অন্যান্য দেশের রাজা-গুলিকে হাত করিতেন এবং এই উপায়ে প্রত্যেক সমাজকে নানা স্ব-স্বপ্রধান দলে বিভক্ত করিয়া লইতেন, তাহা ত বিদ্যালয়ের ছোটখাট ইতিহাস-পুস্তকেই বালকেরাও জানে। তারপর আধুনিক যুগের কথা কি আর চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে? ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাহার বহুপূর্ব্বে আমাদের অনেকের জন্ম হইয়াছে, সেই সময় পর্য্যন্ত "ইতালী" নামে কোন রাষ্ট্র ছিল না, জার্ম্মাণি নামেও একটা দেশ পৃথিবীর লোকের চিন্তার মধ্যে স্থান পাইত না। শত-শত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গ্রাম-জনপদ-জেলায় এই সকল দেশ খণ্ডীকৃত ছিল। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ-গঠন ত কালকার কথা। পাশ্চাত্যজগতে ঐক্য কোথায় বলিতে পার কি? তারপর, জার্ম্মাণিতে এবং আমেরিকাতে যুক্তরাজ্যত গঠিত হইয়াছে। এই "যুক্ত" রাজ্যগুলির মধ্যে কত অসংখ্য অনৈক্য, স্বার্থ-তৎপরতা, গ্রামে গ্রামে 'হাম বড়া' ভাব, পরস্পর প্রতিযোগিতা, বিচারালয়ে, মন্ত্রণা-সভায়, ধর্ম্ম-কর্ম্মে বিভিন্নতা রহিয়াছে, তাহার তালিকা করিতে গেলে হাজার পৃষ্ঠার একখানা সুবৃহৎ গ্রন্থ লেখা হইয়া যাইবে। কেবল ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানই কি অনৈক্যের জন্য, দলাদলির জন্য, মতভেদের জন্য পাপী?

তবে কি পাশ্চাত্যজগতে ধর্ম্মবিষয়ে ঐক্য আছে? সত্য কথা, আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলি, পাশ্চাত্য জগতে সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব একেবারেই নাই। তোমরা বোধ হয় মনে কর সমগ্র খৃষ্টান-জাতি মুসলমান-জাতি বা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এবং বৌদ্ধজাতি বা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একমত! মিথ্যা কথা। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-জাতি তুরস্ক অধিকার করিয়া ইউরোপে বসতি আরম্ভ করেন। তখন হইতে ভিন্ন-ভিন্ন খৃষ্টানজাতি ভিন্ন-ভিন্ন মতলবে তুরস্কের সুলতানের সঙ্গে ভিন্ন-ভিন্ন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। খৃষ্টান ইউ-রোপের ভিতর কিছুমাত্র ঐক্য ছিল না বলিয়াই তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষা পাইয়াছে। পাশ্চাত্যজগতের অনৈক্যই মুসলমান জাতির শক্তি। সেইরূপ জাপানের অভ্যুদয়-ব্যাপারটা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে এখানেও সেই খৃষ্টানের অনৈক্য। তারপর এই যে চোখের সম্মুখে গ্রীস, বল্কান, মরক্কো, চীন-দেশসমূহে কাণ্ড চলিতেছে সেখানে পাশ্চাত্য সমাজের ঐক্য দেখিলে না অনৈক্য দেখিলে? শক্তি দেখিতেছ না দুর্ব্বলতা দেখিতেছ? দলবাঁধা দেখিতেছ, না দলাদলি দেখিতেছ?

যাহা হউক, "ধান্ ভানতে শিবের গীত" আমরা অনেকখানি গাহিয়া ফেলিলাম। প্রকৃত কথা এই—পাশ্চাত্যজাতি ভবিষ্যৎ জাতীয়-স্বার্থ, রাষ্ট্রীয় ডিপ্লমেসি, পরস্পর-প্রতিযোগিতা, এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্য-ভেদ বিবেচনা না করিয়া কোন দিন কোন বিষয়ে কার্য্য করেন নাই। আমাদের বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বোধ হয় এ সম্বন্ধে খুব ভাল সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। এই সঙ্গে অবান্তর ভাবে একটা কথা বলিয়া রাখি—জগদীশচন্দ্র ভারতে বসিয়া যে সকল স্বাধীন গবেষণা করিতেছেন আমরা দেখিয়াছি সেই সকল গবেষণার ইতিহাসে জগদীশচন্দ্রের উল্লেখ অল্পই হইয়া থাকে। অথচ পাশ্চাত্যজগতের পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে পরীক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যাবলী বিশেষরূপেই বিবৃত হয়। জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-জগতে নূতন-নূতন উপাধি

পাইবার উপযুক্ত কি না, তাঁহার আবিষ্কার অথবা গবেষণাগুলির মূল্য আছে কি না তাহার বিচারক আমরা নহি। কিন্তু যাঁহারা "রস-বোধিজ্ঞ গুণিজন" তাঁহারা রামচন্দ্রের সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালী: প্রয়াসও যথাযথ বিবৃত করিবেন—ইহাই আমরা আশা করিতে পারি। জগদীশচন্দ্র একেবারেই উপেক্ষিত হইতেছেন বা হইয়াছেন তাহাও আমরা বলিতে চাহি না। তাঁহার নামোল্লেখ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-জগতের মহলে মহলে প্রশংসার সহিতই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার ভিতরে যে কত রহস্য আছে, তাহা স্বয়ং জগদীশচন্দ্র জানেন, এবং যাঁহারা পাশ্চাত্যপণ্ডিত-জগতের কারচুপী বুঝেন, তাঁহারা কিছু কিছু অনুমান করিতে পারিবেন। ও দেশে একজনের রচনা বা আবিষ্কার বা অনুসন্ধান আর একজনের নামে প্রচারিত হয় কি না তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কে বলিতে পারে?

* *
*

১৩। স্বদেশের স্বর্ণ-সিংহাসন

চতুর্থতঃ, ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান, তোমরা রবীন্দ্রনাথকে এতদিন কি কেবল নিন্দাই করিয়া আসিয়াছ? রবীন্দ্রনাথের "দেশের লোকের হাত থেকে" "অপমান ও অপযশ" মাত্রই কি তাঁর "ভাগ্যে পৌঁছেছে?" তিনি "সমুদ্রের পূর্ব্বতীরে বসে যাঁকে পূজার অঞ্জলি দিয়েছিলেন" সেই বাল্মীকি-কালিদাস-জয়দেব-রামপ্রসাদ-বঙ্কিম-দ্বিজেন্দ্রলালের আরাধ্যদেবতা, "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা—জয়দা বরদা," "বন্দে মাতরং"-ধ্যানের বিগ্রহ-মূর্ত্তি ভারতমাতা সমুদ্র সন্তরণ পূর্ব্বক পর-পারে যাইয়া "দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন"—ইহা কি সত্য? বাঙ্গালী তাহা স্বীকার করিবে না—ভারতবাসী তাহা স্বীকার করিবে না। পাশ্চাত্য জগৎ রবীন্দ্রনাথকে যে ভাবে সমাদর করিতেছেন, তাহাতেও বুঝা যায় তাঁহারাও এ কথা আদৌ স্বীকার করেন না। ভারতবর্ষের বাণী এবং হিন্দুর হিন্দুত্বটুকু বাদ দিলে পাশ্চাত্যজগৎ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নূতন কিছুই পাইবেন না—এ কথা তাঁহারা বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য-জগতে ভারতীয় জীবন-গঙ্গার অন্যতম ভগীরথরূপেই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের পূজা পাইতেছেন। ভগীরথের মাহাত্ম্য আছে স্বীকার করি—রামা-শ্যামা ভগীরথ সাজিলে পতিত পাবনী গঙ্গার মর্ত্ত্যে আগমন হয় না, তাহা নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরাও বলিবেন। কিন্তু গঙ্গা-মাহাত্ম্য যদি ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে গোড়ার কথাই বাদ পড়িল। ভগীরথকে লইয়া নাচানাচি করিবার কোন উপলক্ষ্যই থাকিবে না।

পাশ্চাত্যজগৎ বুঝিয়াছে—রবীন্দ্রনাথ ভারতাত্মাকে ইউরোপে পৌঁছাইয়াছেন। ইউরোপের যে জিনিষের অভাব ছিল—বহুদিন হইতে যে অভাব নানা কারণে ইউরোপ বুঝিয়াও বুঝে নাই—সম্প্রতি যে অভাব নানা কারণে (সাহিত্য কাব্য ছাড়াও অসংখ্য কারণে) তাহাদিগকে পদে পদে বেদনা দিতেছে—সেই অভাব-মোচনের উপায়-স্বরূপ ভারতীয় ভাবুকতা লইয়া রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ভাব-গগনে উদিত হইয়াছিলেন। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই পথ দেখাইয়াছিলেন। আজ "বীর-সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগতময়—বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।" কবিবরকে সম্বর্দ্ধনা করিতে যাইয়াও খৃষ্টানেরা হিন্দুর নিকট সেই শিষ্যত্বেরই একটা নূতন পরিচয় দিয়াছেন।

বোলপুরের সম্বর্দ্ধনায় দুইজন খৃষ্টান হিন্দুর নিকট পাশ্চাত্যের শিষ্যত্ব-গ্রহণের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। "সঞ্জীবনী" হইতে আমরা তাঁহাদের সম্ভাষণ উদ্ধৃত করিতেছি। মিঃ মিলবারণ বলিয়াছিলেন—

আপনার কবিতা পাঠ করিয়া আমরা এই বিশাল বিশ্ব ব্যাপার এক নূতন ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি, যাহা আমরা আর পূর্ব্বে কখনও করিতে পারি নাই। আমি একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। আমি আনন্দের সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, আপনার 'গীতাঞ্জলির' অনেকগুলি স্তোত্র সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক নিত্য প্রভাতে গীত হইয়া থাকে। আপনার 'গীতাঞ্জলি' আমাদের শাস্ত্রোক্ত উপাসনা মন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত হইয়া গিয়াছে।

মিঃ হল্যাণ্ড বলেন—

"মহাশয়, আমাদের দেশের একজন কবি বলিয়াছিলেন "যিনি দয়া প্রদর্শন করেন, এবং যাঁহার প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়, তাঁহারা উভয়েই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,"—সম্মান সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ কথা বলা যায়, বাস্তবিক জগতের কবিসভায় আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে পুরস্কৃত করিয়া, ইউরোপ সমগ্র সভ্য-সমাজে গৌরবান্বিত হইয়াছে। আজ আপনার সম্মানে যদি কাহারও অধিক আনন্দের কারণ থাকে, তবে সে ইউরোপের; আমি আজ আপনার সম্মুখে সেই আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছি। বহুকাল পর্য্যন্ত প্রতীচ্যপ্রদেশ ভারতবর্ষকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, আজ আপনার এই পুরস্কার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই বলিতেন যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে মিলন অসম্ভব, কিন্তু আপনাকে এই বৎসর যে পুরস্কার প্রদত্ত হইল, তাহার ফলে পণ্ডিতগণের এই উক্তি খণ্ডিত হইয়া গেল, পূর্ব্ব পশ্চিমে মিলন হইল—আর এ মিলন কোন সম্প্রদায় বিশেষের দেব মন্দিরে নহে—যেখানে নিত্য জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার প্রকাশ—এ মিলন সেই অধ্যাত্মরাজ্যে!"

কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। রবীন্দ্র নাথ হিন্দুর বাণী প্রচার করিয়া পাশ্চাত্যকে ত মুগ্ধ করিলেন। কিন্তু এতদিন পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ হয় নাই কেন? প্রাচ্যের কাল চামড়ার ভিতর যে এত মূল্যবান্ হৃদয় লুক্কায়িত থাকিতে পারে তাহা জার্ম্মাণ পণ্ডিত সোপেনহোয়র এবং ম্যাক্স-মূলার বহুদিন পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের ধর্ম্মতত্ত্ব যে কত দূর গভীর ও উদার তাহাও ম্যাক্সমূলার প্রচার করিয়াছিলেন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাইন্‌স মহোদয় প্রাচ্যজগতের জীবন স্পন্দন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে যাইয়া চীন জাপান ও ভারতবর্ষের চিন্তাবীরগণের মধ্যে বিবেকানন্দকে অত্যুচ্চ আসনই প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে একটা নোবেল প্রাইজ-লাভ ভারতবাসীর কপালে কেন ঘটিল? আইরিশ কবি ইয়েট্‌সের বিদ্যা বুদ্ধি ভাবুকতা রসজ্ঞতা কি সোপেনহোয়ারাদি পণ্ডিতগণ অপেক্ষা বড় বেশী? ইহার স্থান পাশ্চত্য জগতে এই সকল গুণিজন অপেক্ষা নিম্নে হইতে পারে—এখনও সমান নহে—কোন দিন সমান হইবে কি না অতটা ভবিষ্যদ্বাণী করিবার যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য কবি ইয়েট্‌সের কাব্য আলোচনা করি নাই।

ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান ইহারমধ্যে কি কোন রহস্যই নাই? আমরা গত

সংখ্যায় বলিয়াছিলাম; "কতকগুলি ঘটনা-চক্রের প্রভাবে, হিন্দু চিন্তাবীরকে একটি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার আজীবন সেবককে—প্রাচ্যজগতের তথাকথিত অর্দ্ধ-সভ্যজাতি-প্রসূত মানব সন্তানকে পাশ্চাত্য জগৎ বৈঠকে বসিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সম্মান ও পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কি কি কারণে ইউরোপীয় সুধীবর্গ প্রাচ্যজগতের একজন চিন্তাবীরকে এরূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়া সম্মান ও গৌরব বোধ করিলেন, তাহার আলোচনা করিবার জন্য অনতিদূর ভবিষ্যতেই দার্শনিক ও ঐতিহাসিক-গণ আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হইবেন। অধিকন্তু ইতিহাস বিজ্ঞানের কোন্ নিয়মানু-সারে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সম্পদই মানব-জাতিকে ভারতীয় সাহিত্য ও জীবনধারার অন্যান্য বিভাগ বুঝাইবার উপায় ও কেন্দ্র স্বরূপ হইল, তাহার বিশ্লেষণও অল্পকালের ভিতরই দেশবিদেশের পণ্ডিত-সমাজে আরব্ধ হইবে।"

দেখিতেছি—এই কারণগুলির অনুসন্ধান পাশ্চাত্য জগতে এখনই আরব্ধ হইয়াছে। "ঘটনাচক্র"গুলির বিশ্লেষণ কোন কোন ইংরাজ-সমালোচক ইতিমধ্যেই সুরু করিয়াছেন। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান না বুঝিয়া, স্বদেশের জাতীয় এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থাস্বার্থ বিচার না করিয়া পাশ্চাত্য জগতে কোন কাজ ও চিন্তা হয় না—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়-ব্যাপারটাও যে এইরূপ একটা ঘটনা-চক্রের ফল, সাময়িক কারণপুঞ্জের এক অভিব্যক্তি, দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনার অন্যতম লক্ষণ, পাশ্চাত্য সমাজের জাতীয় ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান-বিচারের এক দৃষ্টান্ত—তাহার পরিচয় পাশ্চাত্য সমালোচক-গণ দিতেছেন। এক ব্যক্তি, ভারতমাহাত্ম্যে জাতিমাহাত্ম্যে, এবং কালমাহাত্ম্যে ("novelty of his nationality" এবং "time") রবীন্দ্রনাথের সমাদর হইল সেই কথা বিশেষ ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

A few years ago his name was hardly known even to that small band of watchers for new lights upon the literary horizon. Then came the talk about the Delhi Durbar and the Durbar itself; and all that vague interest in Eastern art, Eastern thought and Eastern literature, which had been steadily, if quietly, growing since the opening up of Japan, concentrated upon India. Hence the success of Kismet of pseudo-Oriental dances, of the Russian ballet and 'Sumurun.' The plain man had pictures of India flashed upon him nightly from the bioscope the businessman was forced to think about the startling change of capitals and speculate upon its consequences in commerce; while people who had been content to take their ideas about this country from Kipling and other English writers began to ask for "inside information," and to seek in native literature itself for the secret of India's mysterious power to stir the imagination of Englishmen.

Tagore was fortunate in the time of his introduction to London. He found a public prepared to listen in

a mood of curiosity and goodwill, a public, too, somewhat impatient just now of the older forms of endeavour in art, and sufficiently keen to recognise ability. A larger proportion of our people than ever before has found its way to material satisfaction, and now has leisure for less substantial pleasure, which in a previous generation were crowded out of its life. London, the ancient city of the Philistines, as the artists of that generation regarded it, has now in fact become what Paris was to them, a place where any one with any pretensions whatever to "a new note" in literature and art may get a hearing and secure a coterie.

আর একজন সমালোচক বলিয়াছেন :—

"And it is significant that the envoy should have come when he did; when the long misunderstanding of the East by the West that threatened to bring about further disaster should seem to be giving way. If ever an intermediary, gifted with a tongue of delicate eloquence, and with a dual insight into the natures and temperamental ways of two peoples, was designed by fate for the office, it was surely Rabindranath Tagore. To be able to talk with him during his last visit was to gain a new intelligence of the spirit of India.

উদ্ধৃতাংশের বঙ্গানুবাদ দিবার আর প্রয়োজন নাই। ভারতের হিন্দু-মুসলমান, এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা ভবিষ্যতে আমরা বলিব। কেননা ইহা বিংশশতাব্দীর নবযুগের কথা—কেবল তোমার আমার, হিন্দু মুসলমানের, ভারত-চীন-জাপান-পারস্যের নবযুগ নয়;—আজকাল জগতে যে সকল আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে প্রাচ্যপাশ্চাত্য—এসিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকা-আমেরিকা—সমগ্র ভূখণ্ডেরই যুগান্তর-সাধনের পন্থা পরিষ্কৃত হইতেছে। সুতরাং আমাদের কালমাহাত্ম্য, যুগমাহাত্ম্য, জাতিমাহাত্ম্য, সমাজমাহাত্ম্য আমাদিগকে সবিশেষ আলোচনা ত করিতে হইবেই—বিদেশীয় পণ্ডিতেরাও আর দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন না। এখন কেবল এইটুকু জানিয়া রাখ যে, তোমরা জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র অবজ্ঞাই করিয়াছ এ কথা স্বীকার করা যায় না। তাঁহার এবং অন্যান্য বহু ভারতবীরের সম্বর্দ্ধনা করিতে তোমরা কিছুকাল হইল শিখিয়াছ। কেবল তাহাই নহে—দেশবিদেশে যাহাতে ভারতবাসী মাত্রেই মাথা তুলিয়া সম্মানলাভ করিতে পারে, ভারতবর্ষের গুণিগণ আদৃত হইতে পারেন, ভারতের কাঠবিড়ালী পর্য্যন্ত তাহার যথোচিত মর্য্যাদা পাইতে পারে, স্বদেশে তাহার পূর্ব্ব-ব্যবস্থা করিতে তোমরা অভ্যস্ত হইতেছ। আমাদের এই আত্ম-সম্মান-বোধ জাগরণের ফলে, এই জাতীয়-গৌরব-অনুভূতির উদ্বোধনে, এই নব-বিকশিত বীরপূজা-ও গুণিসমাদর-র প্রবৃত্তির প্রভাবে যে উচ্চ স্বর্ণ-সিংহাসন নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে উপবিষ্ট হইয়াই কেবল রবীন্দ্রনাথ কেন,—ক্ষুদ্র-বৃহৎ নগণ্য-সুগণ্য সকল ভারতবাসীই নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে দেশ-বিদেশে আদর, সম্মান, সহানুভূতি, পূজা আকৃষ্ট করিতেছেন। দেশের লোকের মহত্ত্বেই, দেশের গৌরব-বৃদ্ধিতেই, দেশ-বিদেশের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ও

চিন্তারাজ্যে ভারতবর্ষের কীর্ত্তি প্রচারেই, দেশমাতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াই, এবং ভারতীয় বীণাপাণির সস্নেহ অর্ঘ্যস্বীকার ও অঞ্জলি-গ্রহণের ফলেই, রবীন্দ্রনাথ বিদেশে "সম্মানের বরমাল্য" লাভ করিয়াছেন—এ কথা তিনি ভুলিয়া থাকিতে চাহেন থাকুন, আমরা তাঁহার ভক্তভাবে কিছুকাল ভুলিয়া থাকিতে চাহি থাকি, কিন্তু "দেশের লোক" তাহা ভুলিবে না।

আমরা এত কথা বলিয়া ফেলিলাম—ব্যাপারটা তলাইয়া মজাইয়া আমাদের বোঝা আবশ্যক এই জন্য। রবীন্দ্রনাথকে আমরা এতকাল যে ভাবে আদর করিয়া আসিয়াছি—নোবেল-প্রাইজ লাভের দ্বারা তাহার বিন্দুমাত্র বাড়ে নাই; আমাদের রবীন্দ্র-সমাদর কোন দিনই কম ছিল না—কমিবেও না।

১৪। অর্দ্ধজগতের তীর্থক্ষেত্র

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছিলেন :—

"উঠিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে
　　　　মোক্ষ দ্বার
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তিপ্রণত
　　　　চরণে যাঁর
অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছায়িল গান্ধার হ'তে
　　　　জলধিশেষ।"

সেই দেশ ২৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত মানবজাতির অর্দ্ধসংখ্যক নরনারীর মহাতীর্থ রহিয়াছে। সেইদেশ ভবিষ্যতেও চীন, তিব্বত, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ এবং জাপানের পুণ্যভূমি থাকিবে।

বুদ্ধদেবকে আমরা বঙ্গসন্তান বলিয়া থাকি। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালী বিহারী হিন্দুস্থানী বলিয়া কোন প্রভেদ ছিল না। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে—উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র—এক কায়দা, এক আদর্শ, এক চিন্তাপ্রবাহ প্রভাববিস্তার করিত। বিবাহ, সমাজবন্ধন, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য—সকল বিষয়েই আদান-প্রদান বেশ চলিত। হিন্দু সাহিত্যের ভৌগোলিক বিভাগানুসারে উত্তরভারত, মধ্যভারত, প্রাচ্যভারত, দাক্ষিণাত্য ইত্যাদি মোটামোটা বিভাগই হিন্দুস্থানবাসীর বিচারণীয় হইত। ভারতবর্ষের এই বিভাগগুলি গ্রীক্ পর্য্যটকেরা বর্ণনা করিয়াছেন—রোমীয় লেখকেরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ইহার পরিচয় আছে। চীনপর্য্যটকগণও এই বিভাগেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

ফলতঃ প্রাচীন চিন্তার ধারায় প্রাচ্যভারত এক অখণ্ড সমাজরূপে পরিগণিত হইত। সেই প্রাচ্য-ভারতের এক অংশে বুদ্ধদেবের জন্মমৃত্যু-লীলার অবতারণা হয়। ভারতের যে অংশকে বুদ্ধদেব ধন্য করিয়াছিলেন—সেই প্রাচ্যভারত এখনও বৌদ্ধদিগের মহাতীর্থ। এই জন্যই তিব্বত-পর্য্যটক রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই মহোদয় শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রণীত "আদোর গম্ভীরা"-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :

"হরিদাস বাবু তিব্বতী এবং সিংহলী সমাজ ও সাহিত্যে বাঙ্গালাদেশের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, বাস্তবিক শ্যাম ব্রহ্মদেশ, চীন তাতার মঙ্গোলিয়া সুদূর জাপান ও যবদ্বীপ যে বাঙ্গালী কর্ম্ম ও চিন্তাবীরগণের কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করিতেছে, সমগ্র এসিয়া-খণ্ডই ভারতীয় হিন্দুর লীলাক্ষেত্র ছিল এবং হিন্দুর এই প্রভাববিস্তার বিষয়ে বাঙ্গালী অধ্যাপকও প্রচারক, শিল্পী, বণিক ও নরপতিই যে অগ্রণী ছিলেন, এবং সাহিত্য, কলা, শিল্প, ধর্ম্ম প্রভৃতি ব্যাপারে অনেকের পথপ্রদর্শক ছিলেন, এই তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আধুনিক বঙ্গের অবসন্ন হৃদয়ে উচ্চ আশার বিমল

জ্যোতি বিকীর্ণ করিবে। বাঙ্গালার ইতি-বৃত্ত আলোচনা এই কারণে অতীব আবশ্যক। বাঙ্গালী অর্দ্ধ এসিয়ার শিক্ষাগুরু। বঙ্গ-দেশকে অর্দ্ধ এসিয়াবাসী স্বর্গ বিবেচনায় এখনও পূজা করিয়া থাকেন।"

বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলাবস্তু (লুম্বিনী) আজ স্বাধীন নেপালের অন্তর্গত। প্রাচীন কালে উহাকে প্রাচ্যভারতের এক জনপদ-রূপে বিবেচনা করা হইত। এখনও ইহাকে ব্রিটিশভারতের গোরখপুর জেলার অন্তর্বর্ত্তী বলিলেও ভৌগোলিক হিসাবে কোন ভুল হয় না। এই গোরখপুর জেলাতেই আবার বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হয়। আমরা ইতিহাসে পড়িতাম—কুশীনগর ভগবান্ বুদ্ধের ভৌতিক দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সে কুশীনগর কোথায় তাহা আমরা জানিতাম না।

সম্প্রতি, আজ দুই বৎসর হইল, লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রধান কর্ম্ম-চারী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হীরানন্দ শাস্ত্রী এম্, এ এম্, ও, এল্ এই কুশীনগর আবিষ্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন—গোরখপুর জেলার কাশিয়া গ্রাম প্রাচীন কুশীনগরের অপভ্রংশ। এই কাশিয়াগ্রামে একটি প্রকাণ্ড স্তূপের ৩৪ ফিট নীচে বুদ্ধ-দেবের সমাধিচিহ্ন রহিয়াছে—তাম্রফলকে লিখিত বর্ণনা অনুসারে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যের প্রমাণ বলে এই স্থানকে পণ্ডিতজগৎ বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের স্থানরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

সুতরাং একই জেলায় বুদ্ধদেবের জন্ম ও মৃত্যু। মুসলমানের মক্কা ও মদিনা যেমন আরবদেশে—সমগ্র বৌদ্ধজগতের মক্কা ও মদিনা সেইরূপ প্রাচ্যভারতের এই এক ক্ষুদ্র জনপদে অবস্থিত।

এই নূতন আবিষ্কারের ফলে বঙ্গদেশ ও প্রাচ্যভারতের সঙ্গে চীন জাপান শ্যাম ব্রহ্মদেশের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ভবিষ্যতে আরও গভীর হইবে।

বেদান্ত-দর্শন কাহার রচনা ? *

হিন্দুগণের চিরাগত বিশ্বাস যে মহাভারত ভগবান ব্যাসদেবের রচনা এবং শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতগণের পরম্পরা-পুষ্ট ধারণা যে বেদান্ত-দর্শনও তাঁহারই রচনা। এই বদ্ধমূল বিশ্বাস শিথিল বা অপনীত হইবে কি না তাহা জানি না; তবে শ্রদ্ধাস্পদ সুধীসমাজ এই ক্ষুদ্র লেখকের শাস্ত্রপ্রমাণগুলি ধীর ভাবে প্রণিধান করিয়া মীমাংসা করিবেন, এ আশা দুরাশা নহে।

ভগবান ব্যাসদেবের অনেকগুলি নাম লোকসমাজে প্রচলিত আছে; যথা—কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, পারাশর্য্য, ব্যাস, সত্যবতী সুত ও বাদরায়ণ। প্রথম কয়টী নাম মহাভারতের স্থানে স্থানে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। শেষ নামটী কেবল বেদান্ত-দর্শনে প্রাপ্ত হওয়া যায়—মহাভারতে তাহা নাই। বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে মহাভারত তথা ভগবদ্গীতার বিষয় আলোচনা অবশ্যম্ভাবী হয়, সুতরাং আমরা সেই দুইটীর বিষয়ও কিছু কিছু বর্ণন করিব।

মহাভারত অগাধ সমুদ্র। ইহার গর্ভে নানাপ্রকার রত্নরাজি বিরাজিত। চেষ্টা করিলে অভীপ্সিত রত্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, আবার একই বিষয়ের অনেক প্রকার কথিত হইয়াছে। অপিচ ভবিষ্যৎ কথার প্রসঙ্গে অনেক পরবর্ত্তী ঘটনারও উল্লেখ আছে। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনে একটা সংশয় উপস্থিত হয় যে এই সমগ্র গ্রন্থখানি একব্যক্তি বা সময়ের রচনা কি না। বিষয়ের বৈচিত্র্য ও অসামঞ্জস্য দেখিয়া বোধ হয় ইহার সমগ্র অংশ একব্যক্তির বা এক সময়ের রচনা নহে। যে মহাভারত মুদ্রিত আকারে বঙ্গদেশ, উত্তরভারত ও বোম্বাই প্রদেশে দৃষ্ট হয় তাহা যে অন্ততঃ চারি বার প্রতিসংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, ইহার নিদর্শন মহাভারতের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, যে আদি মহাভারত ভগবান ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত হয় তাহা আখ্যানবর্জ্জিত ছিল। † তাহা চতুর্ব্বিংশসহস্র শ্লোক যুক্ত ছিল। তাহা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রবণ করাইয়া ছিলেন। ইহাতে ব্যাসদেব অধ্যাত্মতত্ত্বই অধিক বিবৃত করিয়াছিলেন। এই কারণেই ঋষিসমাজে মহাভারতের এত অধিক প্রচার ও সমাদর হয়। তারপর দ্বিতীয় সংস্করণ ব্যাস-শিষ্য লোমহর্ষণের সময় হয়। ¶ তিনি পুরাণ-ভাগ সংযোজিত করিয়া ব্যাসদেবের ভারতের কলেবর বৃদ্ধি করেন। তারপর তৃতীয় সংস্করণ মহারাজা জনমেজয়ের সময় বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক সংসাধিত হয়। তিনি ভগবান ব্যাসদেব ও লোমহর্ষণের রচনায় অনেক আখ্যায়িকা সংযোজিত করেন এবং ব্যাসদেবের সংক্ষেপ বর্ণনাগুলি বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করেন। তারপর চতুর্থ সংস্করণ লোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা সৌতিকর্ত্তৃক কুলপতি

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৮শ বর্ষের ৭ম অধিবেশনে পঠিত।

† উপাখ্যানৈর্ব্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতেবুধৈঃ।...১০৩ আদি অনুক্রম।

¶ ততৈব রোমহর্ষেণ পুরাণমবধারিতং। ২১ মহা—শান্তি ৩১৮ অধ্যায়-জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ।

শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক সত্রে উপস্থিত ঋষি-মণ্ডলীর সভায় সম্পাদিত হয়।

আমার এইরূপ উক্তি মহাভারতের অনুক্রমণিকা-পর্ব্বটীও সমর্থন করিতেছে। উহাতে উত্তরার গর্ভপাত পর্য্যন্ত বিষয়ের বর্ণনা বা সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ভগবান ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তিনি স্বীয় পুত্র শুকদেবের শিক্ষার্থে ইহা সংক্ষেপে সার্দ্ধশত-শ্লোকময়ীরূপে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। * সুতরাং ভগবান ব্যাসদেবের আদি মহাভারতে যে ঐ ঘটনা পর্য্যন্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ ছিল, তাহা বেশ বোধহইতেছে। জনমেজয়ের সময়ে বৈশম্পায়নের কথনে যে সংস্করণ হয় তাহাতে পরীক্ষিত-উপাখ্যান, আস্তীকপর্ব্ব ও অন্য আখ্যায়িকাগুলি সংযোজিত হইয়াছিল। শৌনকের সময়ে যে সংস্করণ হয় তাহাতে তাঁহার ভৃগুবংশ-বৃত্তান্ত সংযোজিত হয়। তিনি যে জনমেজয় ও আস্তীকের পরবর্ত্তী তাহা ডুণ্ডুভ সর্প কর্ত্তৃক তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রুরুকে কথিত বৃত্তান্ত দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। † আবার পৌষ্যপর্ব্ব ও আয়োধ ধৌম্য ও উতঙ্ক উপাখ্যান যে কোন্ সময়ে ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা ঠিক নিরূপণ করিবার উপায় নাই, সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধযুগের সমকালে ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে, কারণ উহাতে ক্ষপণক নামক বৌদ্ধসন্ন্যাসীর কথা আছে। সে তক্ষক নাগ; ক্ষপণক রূপ ধারণ করিয়া উতঙ্কের স্বর্ণকুণ্ডল অপহরণ করিয়া পলাইয়াছিল ইহাও বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে উতঙ্ক জাতক্রোধ হইয়া মহারাজ জনমেজয়কে নাগবংশ ধ্বংস করিতে উত্তেজিত করিয়াছেন ইহাও লিখিত হইয়াছে। তৎকালে যে কোন সামাজিক সংঘর্ষের একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল এবং ইহা যে তাহার প্রতি ইঙ্গিত তাহা বেশ বোধ হইতেছে।

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই সংঘর্ষ ব্রহ্মবাদিগণের সহিত জৈন বা বৌদ্ধগণের ধর্ম্মবিরোধ হইতে উৎপন্ন হয়। মহাভারত-পাঠে অনেক বিষয়ের অবগতি হয়। ইহাতে কোথাও স্পষ্টভাবে চরিত বর্ণিত হইয়াছে, আবার কোথাও রূপকের অভ্যন্তরে তাহাই লুক্কায়িত রহিয়াছে। যেমন নাগ শব্দ ইহার অর্থ সর্প। তক্ষক তাহাদের রাজা। সে পরীক্ষিত রাজাকে দংশন করিয়াছিল। আবার সে-ই যে তক্ষশিলায় রাজত্ব করিত তাহাও বর্ণিত আছে। তাহার ভগিনী জরৎকারুর পুত্র ব্রাহ্মণ আস্তীক তাহাকে জনমেজয়ের অগ্নিকুণ্ডে পতন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এই সকল অতি প্রাকৃত বিরুদ্ধ ভাব দেখিলে বেশ বোধ হয় নাগগণ সর্প নহে, তাহারা মনুষ্যযোনিবিশেষ। উতঙ্কের কুণ্ডল-অপহরণ ব্যাপারে এই নাগকে ক্ষপণক বা নগ্নবৌদ্ধ সন্ন্যাসী করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা দ্বারা লেখক যে জৈনদিগম্বর সন্ন্যাসীদিগের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। নাগগণ সম্ভবতঃ ভারতে নূতন ঔপনিবেশিক ছিল। তাহারা হয় তো সর্পপূজা করিত বা সর্পকেই তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিত। তাহারা হয় তো বড় কুটিলমতি ছিল তাই ব্রহ্মবাদিগণ তাহাদের সহিত সদালাপ করিতেন না এবং

* ততোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবান্ মুনিঃ। ১০৩ অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাং। ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্ব্বং পুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকং। ১০৪। মহা—আদি, ১অঃ।

† জনমেজয়স্য যজ্ঞেঽস্মিন্ সর্পাণাং হিংসনং পুরা। পরিত্রাণং চ ভীতানাং সর্পাণাং ব্রাহ্মণাদপি। ১৮ মহা—আদি, ১১ অধ্যায়।

স্বীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। এই কারণে হয় তো তাহারা জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

হিন্দুধর্ম পূর্ব্বে বড় উদারনীতিক ছিল। যে যে বিদেশীয় জাতি ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছে, হিন্দুজাতি তাহাকেই আপনার সার্ব্বজনীন অঙ্গে মিশাইয়া লইয়াছে এবং তাহাকে হিন্দুধর্মের অন্তরে ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। তাই আস্তীক ব্রাহ্মণ সন্তান; তাই বভ্রুবাহন ক্ষত্রিয়সন্তান। পরবর্ত্তী কালেও হিন্দুজাতির এই উদার ভাব দৃষ্ট হয়। তাহারা কুটিলপ্রকৃতি চাণক্য, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ও ছন্দশাস্ত্রকার পিঙ্গলকে, নাগবংশীয় হইলেও, ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান করিয়াছে। আমার বোধ হয় এই নাগগণ অধুনাতন কালে নাগাসন্ন্যাসীরূপে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে মহাভারত হইতে অনেক ঐতিহাসিক ও জাতীয় তথ্য প্রকাশিত ও রহস্য বিশদীকৃত হইতে পারে।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্রনামক গ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-বিশ্লেষণ উপলক্ষে মহাভারতের মৌলিকতা ও প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে যে সুবিচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ভূতপূর্ব্ব বিচারক বঙ্কিমেরই অনুরূপ হইয়াছে। তাঁহার মতে মহাভারতে তিন স্তরের রচনা বিদ্যমান। প্রথম স্তরের রচনা ভগবান ব্যাসদেবের—ইহাতে প্রকৃত ঘটনার যথাযথ বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় স্তরের রচনায় আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। ইহা কোন ধার্ম্মিক সুকবির দ্বারা ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মহাভারতে প্রবেশিত করা হইয়াছে। তৃতীয় রচনায় কু-কবির হস্তকৌশল দৃষ্ট হয়—তাহা মহাভারতের ঘটনাবলীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে, ইহা না থাকিলে মহাভারতের কোন অঙ্গহানি হইত না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ভগবদ্গীতাও দ্বিতীয় স্তরের রচনা—ইহা কোন ধার্ম্মিক সুকবি কর্তৃক রচিত হইয়া মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।*

বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার-পদ্ধতি দোষরহিত ও যুক্তির সমাবেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাহাতে প্রক্ষিপ্তাংশের পাশ কাটাইবার যো নাই। তাহা যুক্তি ও বিচারের নিকট আপনা আপনি ধরা দেয়। তবে তিনি ভগবদ্গীতাকে দ্বিতীয় স্তরের রচনা বলায় এবং তাহাকে ভগবান ব্যাসদেবের কৃতিত্ব হইতে বঞ্চিত করায় আমার মতে তাঁহার বিচারে একটু দোষ স্পর্শ করিয়াছে। আমি তাঁহারই প্রতিজ্ঞাবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এবং তাঁহারই অনুসৃত যুক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া প্রদর্শন করিব যে ভগবদ্গীতাতে তিনস্তরের রচনা বর্ত্তমান। প্রথম ভগবান ব্যাসদেবের, দ্বিতীয় অন্য কবির এবং শেষটী তৃতীয় কবির। ইহা দ্বারা বেদান্ত-দর্শনেরও রচনা সম্বন্ধে অনেক সহায়তা পাওয়া যাইবে।

প্রাচীন কবিগণের রচনা-প্রণালী এই যে তাঁহারা গৌরচন্দ্রিকা ফাঁদেন না—একেবারে বিষয়ের বর্ণনা আরম্ভ করেন। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে তাহাই করিয়া গিয়াছেন, তবে আদিকাণ্ডের পূর্ব্ব চারি অধ্যায়ে যে তিনি জিজ্ঞাসু হইয়া নারদকে বর্ত্তমান সময়ে লোকপূজ্য, সত্যশীল, ধার্ম্মিক নৃপতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন এবং শ্লোকের উৎপত্তির বর্ণন করিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ তাঁহার রচনা

* কৃষ্ণচরিত্র ১ম খণ্ড ১।১০।১১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

নহে; উহা তাঁহার পরবর্ত্তী কালের বা তাঁহার শিষ্য ভরদ্বাজের রচনা হওয়াই খুব সম্ভব। বাল্মীকির রচনা পঞ্চম অধ্যায় হইতে ধরা যাইতে পারে। এইরূপে ব্যাসদেবের মহাভারতের আরম্ভ ও নিরূপণ করিতে পারা যায়। তাঁহার সংক্ষিপ্ত মহাভারত অনুক্রমণিকা যে উক্ত অধ্যায়ের ১১০ শ্লোক হইতে আরব্ধ হয় তাহা বেশ বোধ হইতেছে। তাহাতে দুর্য্যোধনকে ক্রোধময় বৃক্ষ, কর্ণকে স্কন্ধ, শকুনিকে শাখা, দুঃশাসনকে পুষ্প-ফল ও অমনীষী ধৃতরাষ্ট্রকে তাহার মূল বলা হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে ইহার বিপরীত ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। তথায় যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় দ্রুমরূপে বর্ণিত হইয়াছেন এবং তাহার মূল কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার স্কন্ধ অর্জ্জুন, ভীম শাখা ও মাদ্রীসুতগণ তাহার পুষ্প ও ফলরূপে কথিত হইয়াছেন। * এইরূপে ব্যাসদেবের মহাভারত যে আদিপর্ব্বের অংশাবতার পর্ব্বের ৬১ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোক হইতে আরম্ভ হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। এই অধ্যায়ের আরম্ভে বৈশম্পায়ন তাঁহার পূজ্যপাদ গুরুকে প্রণাম ও স্তুতিবাদ করিয়া জনমেজয়ের নিকট কথা আরম্ভ করিয়াছেন। †

কিরূপে মহাভারতের উৎপত্তি হইল, মহাভারতে এ সম্বন্ধে দুইটী মত উল্লিখিত হইয়াছে। একটীতে অতিপ্রাকৃত বর্ণনা আছে। অন্যটীতে সাধারণ কথাই বর্ণিত হইয়াছে। একটী যে ভগবান ব্যাসদেবের বহুকাল পরে লিপিবদ্ধ ও তাহার ভাব রামায়ণের প্রথম চারি অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এবং দ্বিতীয়টী যে ভগবান ব্যাসদেবের তিরোধানের অ কাল পরে তাঁহার শিষ্য দ্বারা লিখিত হয় তাহাতেও সন্দেহ থাকে না। প্রথমটীতে রামায়ণের ন্যায় ব্রহ্মাকে আসরে আনা হইয়াছে। ব্যাসদেব মহাভারত কল্পনা করিয়া চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে পদ্মযোনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাস ব্রহ্মার সম্মান করিয়া তাঁহাকে বসিতে আসন দিলে তিনি তাঁহাকে মহাভারত লিখিতে বলেন। তাহাতে ব্যাসদেব বলেন তিনি সেই ইতিহাস কাব্য খানি মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন কেবল দ্রুত লেখকের অভাবে তাহা লিখন কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইতেছে। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে গণেশ দেবতার সহায়তা গ্রহণ করিতে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু ব্যাসদেব গণেশ ঠাকুরকে একটী অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়া লিখিতে বলিলেন। তাহা এই যে তিনি কিছু না বুঝিয়া লিখিবেন না। গণেশ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া ওঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ব্যাসদেব জটিল অর্থযুক্ত শ্লোক বলিলে গণেশদেবকেও চিন্তামগ্ন হইতে হইত। সেই অবসরে ব্যাসদেব আরও রচনা করিয়া লইতেন। এই জটিল স্থলগুলি ব্যাসকূট বলিয়া কথিত। মহাভারতে তাহার ৮৮০০ সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ ব্যাসদেব ও তৎপুত্র শুকদেব মাত্র বোঝেন। সঞ্জয় বোঝেন কি না তাহার

* দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ ফলপুষ্পে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥ ১১০ যুধিষ্ঠিরঃ ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখাঃ। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥

† যুক্তে পিতরি তে বীর্য্যং বনাদেত্য যবন্দিরং।
মতিমাংশ্চ বিষ্যাসো বেদে ধনুষি চাতবন্। আদি ৬১ অধ্যায়।

নিশ্চয়তা নাই মহাভারতের প্রথম উৎপত্তি এইরূপ লিখিত হইয়াছে। * এই সময় যে ব্যাসদেব ঈশ্বরের পদবীতে আরূঢ় হইয়াছিলেন তাহা বেশ বোধ হইতেছে; কারণ তাঁহার কাব্য ইতিহাস লিখনে গণেশ দেবকে উপস্থিত করা হইয়াছে। "ওমিত্যুক্ত্বা গণেশোঽপি বভূব কিল লেখকঃ" চরণের "কিল" শব্দও তাহাই প্রকাশ করিতেছে, কারণ 'কিল' শব্দ ঐতিহ্যে অর্থাৎ পূর্ব্বাপর-প্রবাদ অর্থেই অধিক প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়।

মহাভারত উৎপত্তির দ্বিতীয় মত এই যে ভগবান ব্যাসদেব শুচি শান্ত হইয়া, নিত্য উদ্যত হইয়া নিরলস ভাবে এই গ্রন্থের রচনা তিন বৎসরে পূর্ণ করেন। এবং ইহাই যে অধিক সম্ভব তাহার ভুল নাই কারণ মহাভারতে যে গভীর অধ্যাত্মকতত্ত্ব, নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বর্ণন করা হইয়াছে তাহা যদৃচ্ছাভাবে তড়বড় করিয়া বলিয়া যাইবার বিষয় নহে—তাহা ধীর শান্তভাবে বিবেচনার সহিত লিখিবার বিষয়; সুতরাং গণেশের লেখকতারূপ যে প্রবাদ তাহা অলীক; কারণ এই উক্তি দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইতেছে। আদি পর্ব্ব ৬২ অধ্যায়ে উহা লিখিত আছে—

ত্রিভির্বর্ষৈ র্লব্ধকামঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ। ৪১
নিত্যোত্থিতঃ শুচিঃ শক্তো মহাভারতমাদিতঃ।
তপোনিয়মমাস্থায় কৃতমেতন্মহর্ষিণা॥ ৪২
ত্রিভির্বর্ষৈ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমুত্তমং॥ ৫২

মহাভারতের বিষয়-সূচী দুই স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম অনুক্রমণিকায় দ্বিতীয় পর্ব্ব সংগ্রহ অধ্যায়ে। প্রথমটী ভগবান ব্যাসদেবের রচনা তাহা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। দ্বিতীয়টী অন্য কোন পরবর্ত্তী কবির রচনা। ইহাতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত মহাভারতের সকল বিষয়ের ধারাবাহিক সূচী লিখিত হইয়াছে। অপিচ ইহাতে মহাভারতের বিষয়ের বহির্ভূত হরিবংশের কথারও উল্লেখ দৃষ্ট হয় সুতরাং পর্ব্ব সংগ্রহ অধ্যায়টী যে বহুকাল পরবর্ত্তী সময়ের রচনা তাহার সন্দেহ নাই।

অনুক্রমণিকা অধ্যায়ের "যদাশ্রৌষং" ভণিতাযুক্ত শ্লোকগুলির যেরূপ লিপিচাতুর্য্য অর্থগৌরব ও প্রাঞ্জলতা দৃষ্ট হয় তাহাতে ঐগুলি যে ভগবান ব্যাসদেবের রচনা তাহার তিলার্দ্ধ সন্দেহ থাকে না। অপিচ ইহাতে ব্যাকরণের নিয়মের লঙ্ঘন ভাবও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় ইহাতেও প্রকাশ হইতেছে যে ইহা ঋষি প্রণীত। কারণ তাঁহারা স্বাধীন চেতা—তাঁহাদেরই কথার ভাব লইয়া ব্যাকরণের নিয়ম বদ্ধ হইয়াছে। এই ধুয়াযুক্ত অংশে ভগবদ্গীতার অভ্যন্তরস্থ বর্ণিত বিষয়ের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। যথা—

যদা শ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥ ১৮১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনকে নিজ শরীরে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করেন তাহা গীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং গীতোক্ত কথা অনুক্রমণিকা সমর্থিত করিতেছে। অতএব গীতা যে ব্যাসদেবের রচনা তাহার সন্দেহ নাই।

* কাব্যস্য লেখনার্থায় গণেশঃ স্মর্য্যতাং মুনে। এবমাভাষ্য তং ব্রহ্মা জগাম স্বং নিবেশনং॥ ৭৪। লেখকো-ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়কঃ। ময়ৈব প্রোচ্যমানস্য মনসা কল্পিতস্য চ॥ ৭৭ ব্যাসোঽপ্যুবাচ তং দেবম-বুদ্ধ্বা মা লিখ কচিৎ। ওমিত্যুক্ত্বা গণেশোঽপি বভূব কিল লেখকঃ। ৭৯ গ্রন্থগ্রন্থিং তদা চক্রে মুনির্গূঢ়ং কুতূহলাৎ। যস্মিন্ প্রতিজ্ঞয়া প্রাহ মুনির্দ্বৈপায়নস্ত্বিদং॥ ৮০। অষ্টৌশ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌশ্লোক শতানি চ। অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি সঞ্জয়ো বেত্তি বা ন বা॥ ৮১

মহাভারতের অনেক স্থলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অবতার বলা হইয়াছে। তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও পরাক্রমের জন্য তিনি 'পুরুষোত্তম' বলিয়া কথিত হইতেন। তিনি জগৎপূজ্য ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় অর্ঘ্যাহরণ সময়ে বৃদ্ধ ভীষ্মদেব তাঁহাকেই প্রথম সম্মান প্রদান করিতে পাণ্ডবদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ সময়ে তিনি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ভীষ্মদেবকে বধোদ্যত হইলে ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পরও যুধিষ্ঠিরের অভিষেকান্তে শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকেই নিয়ত অনুধ্যান করিতেন ইহাতে তাঁহার তৎপ্রতি স্নেহ প্রকাশ হইতেছে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে উপদেশ দেন কারণ ভীষ্মদেব স্বর্গারোহণ করিলে তাহা অব্যাখ্যাতই রহিয়া যাইবে। এই ধর্ম্মতত্ত্বই ভগবান ব্যাসদেব শান্তিপর্ব্বে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কুল বৃষ্ণিবংশেও সকল অপেক্ষা সম্মানার্হ ছিলেন। তাঁহার অগ্রজ বলদেবও তাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন কার্য্য করিতেন না এবং অন্য বৃষ্ণিবংশীয় কাহাকেও করিতে দিতেন না। এই সকল বিষয় যখন দেশ প্রচলিত ছিল তখন ব্যাসদেব তাহার কিরূপে অন্যথা করিতে পারেন? সুতরাং তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিবেন ইহা অবশ্যম্ভাবী। এই ভাবেরও সমর্থন অনুক্রমণিকায় রহিয়াছে। যথা—

যদা শ্রৌষং মাধবং বাসুদেবং
সর্ব্বাত্মনা পাণ্ডবার্থে নিবিষ্টং।
যস্যেমাং গাং বিক্রমমেকমাহু
স্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥ ১৫৩
যদা শ্রৌষং নরনারায়ণৌ তৌ
কৃষ্ণার্জ্জুনৌ বদতো নারদস্য।
অহং দ্রষ্টা ব্রহ্মলোকে চ যাতং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥ ১৫৪

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের হিতার্থে উদ্যত। এই পৃথিবী বামন অবতারে তাঁহার একটী পাদবিক্ষেপরূপে কথিত হয়, সুতরাং সঞ্জয় আমি জয়াশা করি না। কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ, নারদ ব্রহ্মলোকে তাহা দেখিয়া আসিয়াছেন সুতরাং ইহা শুনিয়া আমি জয়াশা করি না। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বেশ বোধ হইতেছে যে ভগবদ্গীতা ভগবান ব্যাসদেবের রচনা—ইহা অন্য কবির রচনা নহে এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্তও হয় নাই।

মহাভারত পর্ব্বসংগ্রহে তিনটী গীতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম উদ্যোগ পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের প্রমাদ-বিদূরণার্থ সনৎসুজাত-কথিত অধ্যাত্মশাস্ত্র; দ্বিতীয় ভগবদ্গীতা; তৃতীয় অশ্বমেধ পর্ব্বে বর্ণিত অনুগীতা। পর্ব্ব সংগ্রহে সংক্ষেপ বিস্তারভাবে দুই সূচী দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষেপে অনুগীতার উল্লেখ আছে, বিস্তারে তাহা পরিত্যক্ত দৃষ্ট হয়। ইহা সম্ভবতঃ লিপিকরের প্রমাদ। সংক্ষেপ বিস্তার উভয় স্থলেই ভগবদ্গীতার কথা লিখিত হইয়াছে,* সুতরাং বেশ বোধ হইতেছে যে অন্ততঃ পর্ব্বসংগ্রহ রচনাকালে ভগবদ্গীতা মহাভারতে ছিল।

যদি ভগদ্গীতা ব্যাসদেব রচিতই স্থির হইল তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে আর একটি

---

* পর্ব্বোক্তং ভগবদ্গীতা পর্ব্ব ভীষ্মবধস্তথা। ৬৮
কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ। ২৪৩
মোহজং নাশয়ামাস হেতুভির্মোক্ষদর্শিভিঃ।
সমীক্ষ্যাধোক্ষজঃ ক্ষিপ্রং যুধিষ্ঠিরহিতে রতঃ॥ ২৪[illegible] পর্ব্বসংগ্রহ

আক্ষেপ প্রযুক্ত হইতে পারে। যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুনের মোহনাশার্থে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যে এই অষ্টাদশাধ্যায়ী গ্রন্থ বর্ণিত হইতে পারে তাহা একরূপ অসম্ভব, সুতরাং এই সমগ্র গ্রন্থ যুদ্ধস্থলে বর্ণিত হয় নাই। অর্জ্জুন ধর্ম্মভীরু মনুষ্য ছিলেন, সুতরাং তাঁহার স্বজন নিধনে যে কষ্ট ও মোহ উপস্থিত হইবে তাহা স্বাভাবিক বরং না হওয়াই বিচিত্র। তত্ত্বজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই মোহ, অবিস্তৃত তত্ত্ব কথায় নিরাকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। পর্ব্বসংগ্রহে বিস্তৃত অংশে সেই ভাব লিখিত রহিয়াছে। এই তত্ত্বজ্ঞানটুকু ভগবান ব্যাসদেব অবসর অনুসারে পরিপাটির সহিত বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যুদ্ধস্থলে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেওয়ায় কোন অস্বাভাবিকতা বা বিসদৃশতা লক্ষিত হইতেছে না। এই ভগবদ্গীতা মহাভারতের মধ্যে স্থানলাভ করিয়া উহাকে পবিত্র করিয়াছে এবং উহার পাঠকগণকে পবিত্র করিয়া মোক্ষের ঋজুপথ প্রদর্শন করিয়া দিয়াছে। এমন উদার ধর্ম্মতত্ত্ব জগতের অন্য কোন গ্রন্থে আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। ইহা মহাভারত সমুদ্রের অমৃত ও মহাভারত দুগ্ধের নবনীত। অনুক্রমণিকায় ইহাকে মহাভারত বেদের উপনিষৎ বলা হইয়াছে। *

মহাভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মতত্ত্ব বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত রহিয়াছে তাহারই সারাংশ ভগবদ্গীতায় একস্থলে একত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাসদেব গীতায় জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের বর্ণন করিয়াছেন। কোথাও তিনি জ্ঞানযোগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কোথাও কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠতা প্রখ্যাপিত করিয়াছেন। আবার কোথাও ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন। স্থূলদৃষ্টিতে ইহা বিরোধাভাস বলিয়া বোধ হয় কিন্তু তাহা নহে—পূতাত্মা ব্যাসদেব কোথাও প্রলাপ উক্তি করেন নাই। ইহা যে একই তত্ত্বের বিভিন্নরূপে বুঝিবার তিনটী বিভিন্ন প্রণালী তাহার সন্দেহ নাই; কারণ ব্যাসদেব জ্ঞানযোগ ও ভক্তিকে একই বস্তু বলিয়াছেন। যথা—তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন। ৬।৪৬।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ
মম প্রিয়ঃ ॥ ৭।১৭

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে
তেষু চাপ্যহং ॥ ৯।২৯

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং
বিশিষ্যতে। ১২।১২

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌ বালাঃ প্রবদন্তি ন
পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলং ॥ ৫।৪

যোগী, তপস্বী জ্ঞানী ও কর্ম্মী সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অতএব অর্জ্জুন যোগযুক্ত হও। জ্ঞানীর একনিষ্ঠা প্রযুক্ত তিনি ঈশ্বরের প্রিয়তম। ঈশ্বরের কাহার প্রতি দ্বেষ বা প্রিয়ভাব নাই তবে যিনি তাঁহাতে ভক্তিমান তিনিও তাঁহাতে বর্ত্তমান। যোগ হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ আবার জ্ঞান হইতে ধ্যান বা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। সাংখ্য ও যোগ একই বস্তু একটী অবলম্বন করিলে উভয়ের ফল প্রাপ্তি হয়।

* অত্রোপনিষদং পুণ্যাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।...২৫৪

গীতায় জ্ঞান অর্থে সাংখ্য শাস্ত্রপ্রোক্ত তত্ত্ব বুঝাইয়াছে। ইহা ভগবান কপিল প্রথমে বর্ণন করেন। কর্ম্ম অর্থে যজ্ঞ-কর্ম্ম ও প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া উভয়ই বুঝাইয়াছে। যোগক্রিয়া প্রথমে হিরণ্যগর্ভ নামক ঋষি প্রবর্ত্তিত করেন। * তাহা বহুকালাগত হইয়া নষ্টকল্প হইলে ভগবান ব্যাসদেব তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়া যান—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে তাহাই অর্জ্জুনকে বর্ণন করিতেছেন। পরিভাষার এই স্পষ্টতার কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায় না বরং ইহার সমর্থন মহাভারতের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। যে যে স্থলে সম্যক্ জ্ঞানের বিষয় আলোচিত হইয়াছে তৎতৎস্থলে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে † অধিকন্তু কপিল-দেবকে নারায়ণ রূপেই বর্ণন করা হইয়াছে। যথা—

কৃৎস্নং চ সাংখ্যং নৃপতে মহাত্মা
নারায়ণো ধারয়তেহপ্রমেয়ং ॥

১১৪ শান্তি ৩০১ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের ১০৮ শ্লোকে ইহাও বলা হইয়াছে যে সাংখ্য মত বেদে যোগে ও পুরাণে সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। § এই সকল বিষয়ের বিরোধ উক্তি গীতার শেষ অধ্যায় ত্রয়ে ও বেদান্ত দর্শনে দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই অধ্যায় ত্রয় যে ভগবান ব্যাসদেবের রচনা নহে, তাহা একপ্রকার অনুমান করা যাইতে পারে এবং এই অধ্যায়ত্রয়ের রচয়িতাই যে বেদান্ত-দর্শনের রচয়িতা তাহাও প্রমাণ করিতে পারা যায়; সুতরাং সেই কার্য্যে আমরা অগ্রসর হইতেছি।

সুকবি সদ্গুরু ও সদুপদেশকগণের একটী বিশেষ গুণ এই যে তাঁহারা বিষয়ের সমগ্র ও অংশ তন্নতন্নভাবে বুঝিয়া পাঠক, শিষ্য ও শ্রোতার নিকট এমন বিশদভাবে প্রকাশ করেন যে তাহা তাহাদের হৃদয়ে দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রতিফলিত হয়। যদি দর্পণের আবিলতা বা জ্ঞানের অস্বচ্ছতাপ্রযুক্ত কোথাও তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত না হয় তাহাও আবৃত্তিগুণে পরিষ্কৃত হইয়া যাইতে পারে। ইহা অনেকস্থলে প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে; তাহার উদাহরণ আছে—কঠিন হইতে কঠিনতর অঙ্ক গভীর চিন্তাপ্রভাবে সমীকৃত হইয়াছে ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। গীতায় ভগবান ব্যাসদেবকে একাধারে সুকবি, সদ্গুরু ও সদুপদেশকরূপে মূর্ত্তিমান দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি গীতাশাস্ত্র ভক্তিভাবে তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছেন তাঁহার নিকট গীতার জটিলভাবও স্পষ্টভাব ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে গীতায় তিন-স্তরের রচনা দৃষ্ট হয়। আমার মতে গীতার প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ের রচনা ভগবান ব্যাস-দেবের। ১৩শ হইতে ১৫শ এই অধ্যায়ত্রয় দ্বিতীয় কবির রচনা এবং শেষ অধ্যায়ত্রয় তৃতীয় কবির রচনা। ব্যাসদেব সাংখ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। তৃতীয় কবি সাক্ষাৎ-ভাবে সাংখ্যের নিন্দা না করুন পরোক্ষভাবে

* সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষি স উচ্যতে। হিরণ্যগর্ভোযোগস্য বেত্তা নান্যঃ পুরাতনঃ ॥ ৬৫-শান্তি ৩৪১ অধ্যায়।

† নাস্তি সাংখ্যসমংজ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলং। তাবুভাবেক চর্য্যৌতাবুভাবনিধনৌ স্মৃতৌ ॥ ২ শান্তি ৩১৬ অ। জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতং ১০১। অমূর্ত্তেস্তস্য কৌন্তেয় সাংখ্যং মূর্ত্তিরিতি শ্রুতিঃ। ১০৬ শান্তি ৩০১ অঃ

§ জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎস্ রাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে।
যচ্চাপিদৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র ॥ ১০৮ শান্তি ৩০১ অধ্যায়।

তাহা করিয়াছেন। ব্যাসদেব ৯ম অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে লিখিয়াছেন যে জীবাত্মা পরমাত্মাকে একই ভাব বা পৃথক্ পৃথক্‌ভাব অথবা প্রতি শরীরে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন স্বীকার করিয়া তাহার বহুত্বই চিন্তাকর। এ সকলগুলিই জ্ঞানযজ্ঞের অন্তর্গত সুতরাং এ সকলই আমার (ঈশ্বরের) উপাসনা। * জীবাত্মা যে পৃথক্ ও বহু ইহা সাংখ্য শাস্ত্রের মত। এই মতই বেদান্ত দর্শন ব্যতিরেকে অন্য দর্শনকারগণ অনুমোদন করেন। অন্যান্য উপনিষদেরও এই মত

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ। ৯
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি ॥...
১২ কঠোপনি ২য় বল্লী

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গা
সহস্রশঃ প্রভ-বন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযান্তি ॥ ১
মুণ্ডকোপনি ২য় মুণ্ডক ১ম অঃ

স (ব্রহ্ম) এষোহন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
৬ ঐ ঐ ২ খণ্ড

একই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মাই বহিঃপ্রতিকৃতি স্বরূপ হইয়া বহুভাবে বিরাজ করিতেছে। যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে তাহার প্রতিরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ প্রতিজীবাত্মা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই লয় প্রপ্ত হয়। তৃতীয় কবি এইরূপ পৃথক্ জ্ঞানকে রাজসিক জ্ঞান বলিয়াছেন। ব্রহ্মময় জগৎ ও অব্যয় পরমাত্মা অবিভক্তভাবে প্রতি শরীরে বিরাজমান এইরূপ জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। আর কৃৎস্নব্রহ্মের ক্ষুদ্র বস্তুতে তত্ত্ব-বহির্ভূত ও হেতুশূন্য আরোপরূপ যে জ্ঞান তাহাকে তামস জ্ঞান বলিয়াছেন। † ভগবান ব্যাসদেব ঋষির ন্যায় উদার মতই অনুসরণ করিয়াছেন। যে ব্রহ্ম দুর্জ্ঞেয়; তাঁহার সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি বিশেষের কথিত মতই যে যথার্থ ও ভ্রমশূন্য এরূপ স্পর্দ্ধা কেহ করিতে পারে না। যে সেরূপ অহমিকা করে তাহার যে সম্যক্ জ্ঞানলাভ হয় নাই তাহা পূজ্যপাদ উপনিষৎকার ঋষিগণ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কঠোপনিষদের ব্রহ্মানন্দ নামক দ্বিতীয় বল্লীর ৬।৭ অনুবাকে এই ভাব রহিয়াছে। যথা—

অসন্নেব স ভবতি; অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তিব্রহ্মেতি চেদ্‌বেদ; সন্তমেনং ততো বিদুরিতি।

অসদ্ বা ইদমগ্রমাবসীৎ। ততো বৈ সদ-জায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত; তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি।

যদি ব্রহ্মকে অসৎ ও সৎ উভয়ই জান, তাহা হইলেই তাঁহাকে সম্যক্ জানিয়াছ বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বে অসৎ ছিল, তার পর অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইল। সৎ বা ব্রহ্ম স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন। এই উভয় রূপ চিন্তাই সুচিন্তা। ব্রহ্মসম্বন্ধেই যখন ঋষিগণের এইরূপ স্বাধীন চিন্তা

* জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতো মুখং ॥

† সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং। ২০ পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথক্‌বিধান্। বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং। ২১ যত্তুকৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং। অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতং ॥ ২২ গীতা ১৮শ অধ্যায়।

তখন তাঁহার সহিত প্রতি জীবাত্মা বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কিরূপ সম্বন্ধ আছে তাহাও নিশ্চিত-রূপে নির্দ্ধারণ করিবার যো নাই—কেবল এইরূপ বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়া তৃপ্ত হইতে হইবে যে তিনি এই প্রাকৃতিক জগতের অন্তরাত্মা, তাঁহাকে তন্ময়ভাবে ধ্যান করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ইহাও উপনিষৎকার ঋষিগণেরই উক্তি। * সুতরাং ঋষির ও ব্যাসদেবের এই বলবৎ প্রমাণ বলে আমরা বলিতে বাধ্য যে তৃতীয় কবির রচনা সঙ্কীর্ণতা-মল-দূষিত, উহা ঋষির মত হইতে পারে না, উহা দ্বেষাদ্বেষীর প্রবল-সংঘর্ষ-কালের রচনা, ভগবদ্গীতায় প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে।

ব্যাসদেব গীতার ২য় অধ্যায়ের ৪২ হইতে ৪৪ শ্লোকের মধ্যে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করিয়াছেন—যে হেতু উহা অনন্ত ও বহু-শাখাপ্রযুক্ত সুতরাং মোক্ষপ্রাপক নহে। উহা পাণ্ডিত্যাভিমানীগণ এমনি পুষ্পিত (রঙ্গিলে চটক্‌দার) অর্থবাদে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং ভোগাসক্ত যজমানদিগকে স্বর্গসুখের প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বিভোর করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তি সুদূর-পরাহত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে নারায়ণ অর্জ্জুনকে ত্রিগুণময় বেদ ত্যাগ করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য বা ব্রহ্মতৎপর হইতে উপদেশ দিয়াছেন। † যে যজ্ঞকর্ম্মে হিংসা আছে ইহা তাহারই নিন্দা। নতুবা ব্যাসদেব ৩য় অধ্যায়ের ৯ম, ১৪শ ও ১৫শ শ্লোকে অন্ন-যজ্ঞের প্রশংসা করিয়াছেন, বরং তা না করাই প্রত্যবায় ইহাও বলিয়াছেন (৩।১৩)। ইহাও কাপিল মত। তিনি প্রথমে যজ্ঞে গোবধ-নিষেধার্থে চেষ্টা করিয়া যান। শান্তিপর্ব্ব ২৬৭ অধ্যায়ের গো-কপিলীয় সংবাদে এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার চেষ্টা বোধ করি সফল হইয়াছিল, কারণ তদবধি ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ উপনিষৎ রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং যজ্ঞে গোবধ রহিত করেন। বোধ করি তদবধিই গো যজ্ঞের মাতা বলিয়া সম্মানিত হইতে আরম্ভ হন এবং তদবধিই নারায়ণ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ইঁহারা গো-ব্রাহ্মণের রক্ষা করিতেন এবং গো-নামে স্বীয় নামকরণ করিতেন। গৌতম, গোভিল, বার্ষগণ্য নামগুলি তাহার উদাহরণ। কপিল দেব যে গোটীকে প্রথম রক্ষা করেন, বোধ করি তদ্বর্ণবিশিষ্টা গাভী তদবধি কপিলা নাম গ্রহণ করিয়াছে। কপিল দেবের পঞ্চবিংশ তত্ত্বের ভাব সম্পূর্ণ ও খণ্ডশঃ উপনিষদে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে তাঁহার আদি গ্রন্থ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। অপিচ তত্ত্ব-সমাস নামে ত্রয়োবিংশ বিষয়যুক্ত ও ২২টী ক্ষুদ্র বাক্যে গ্রথিত একটি ক্ষুদ্রগ্রন্থ দেখা যায়, তাহাই ভগবান কপিল দেবের রচনা বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে যে বিষয়গুলি আছে, তিনি তদুপরি উপদেশ দান করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তৃত টীকা জনৈক নির্নামা যতি কর্ত্তৃক রচিত হয়। তাহাতে সাংখ্যকারিকা হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ঈশ্বর কৃষ্ণের

* প্রণবো ধনুঃশরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। ৪ মুণ্ড ২য় মু ২য় খণ্ড।

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং। ১২ কঠোপনি ২য় বল্লী।

† ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাং। ৪১ যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ। ৪২ কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্ম-কর্ম্মফলপ্রদাং। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি। ৪৩ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাংতয়াপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে। ৪৪ ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদানিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্। ৪৫

রচিত। এই গ্রন্থই কপিল দেবের সাংখ্য বলিয়া টীকাকার, মেধাতিথি ও শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই সাংখ্য সপ্ততির ২য় আর্য্যায় বেদের মোক্ষপ্রাপক গুণ নিরাকৃত হইয়াছে এবং ব্যক্ত বা ত্রয়োবিংশ-তত্ত্ব প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞানই মোক্ষসাধক তাহা প্রখ্যাপিত করা হইয়াছে। তবে বেদ যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের তুল্য তাহা স্বীকার করা হইয়াছে। যথা—

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্ত।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ॥২

বেদ যে মোক্ষসাধক নহে তাহা উপনিষদেরও মত। বেদকে তথায় অপরা বিদ্যা বলা হইয়াছে।*

সুতরাং ভগবান ব্যাসদেব যে বেদকে মোক্ষপ্রতিবন্ধক বলিয়াছেন তাহা উপনিষৎ সমর্থিত করিতেছে। তৃতীয় লেখক কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডবহুল বেদই সমর্থন করিয়াছেন। জ্যোতিষ্টোমাদি যাগে পশুহনন সমর্থন করায় কপিলদেব যে বেদকে অবিশুদ্ধ বলিয়াছেন, সুতরাং বেদনির্দ্দিষ্ট কার্য্য অনুবর্ত্তন করা উচিত নহে, এই লেখক জৈমিনির মতে তাহাই সমর্থিত করিয়াছেন। যথা—

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্য মিতিচাপরে ॥১৮।৩

এই জৈমিনির কথার আভাষ থাকায় ইনি যে তাঁহার পরবর্ত্তী তাহার সন্দেহ থাকিতেছে না। ধর্ম্ম-মীমাংসা-গ্রন্থকার একজন জৈমিনি আছেন। ব্যাসদেবের শিষ্য আর একজন জৈমিনি, আবার জৈমিনি-ভারত-রচয়িতা অন্য জৈমিনি। এই তিন জনই যে এক ব্যক্তি তাহা বলিতে পারি না। যদি এক ব্যক্তি হয়েন তাহা হইলে ব্যাসদেব যে তৎশিষ্য জৈমিনির কথা ও বচন উদ্ধৃত ও সমর্থিত করিবেন তাহা সম্ভবপর নহে। ইহাতে কাল-বিপর্য্যয় (anachronism)-দোষও আসিয়া পড়িতেছে। সুতরাং ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে এই রচনাটী ব্যাসদেবের নহে।

ব্যাসদেব সন্ন্যাসী ও যোগীকে এক পর্য্যায়ে স্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং কথিত হইয়াছে যে সন্ন্যাসও যা যোগও তাই। যাহার মনে সংকল্প আছে সে যোগী হইতে পারে না ইহাও বলিয়াছেন।—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ। ৬।১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ৬।২

ব্যাসদেব জ্ঞানী, যোগী, নিষ্কামকর্ম্মী সকলকেই যজ্ঞকারী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই যে সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ইহাও বলিয়াছেন—

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবো পজুহ্বতি ॥ ৪।২৫
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞাযোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতা ॥ ৪।২৮
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৪।৩০
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্মসনাতনং ॥ ৪।৩১

তৃতীয় লেখক সন্ন্যাস ও ত্যাগ এক পর্য্যায়-ভুক্ত করিয়াও সন্ন্যাসীকে ফল প্রদানে বঞ্চিত করিয়াছেন—ফলপ্রাপ্তি যজ্ঞের অত্যাগীর ভাগ্যেই ফেলিয়াছেন। ইহা ঋষির ন্যায় ঋজু ও সত্য ভাষণ নহে, ইহা বিতণ্ডাকারীর ছলোক্তির ন্যায় হইয়াছে। এখানে যে স্পষ্ট

* তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। ৫ মুণ্ডকোপনিষৎ ১ম মুণ্ড ১ খণ্ড

গোঁজামিল দেওয়া হইয়াছে তাহা বেশ বোধ হইতেছে। তাঁহার রচনা যথা—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ১৮।২
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেবতৎ। ১৮।৫
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে। ১৮।১১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং
কচিৎ॥ ১৮।১২

শেষ শ্লোকে ব্যাজ-স্তুতি ভাবও লুক্কায়িত রহিয়াছে।

ব্যাসদেব মায়া-অর্থে প্রকৃতি বুঝিয়াছেন। ইহা উপনিষদের অনুসৃত মত। যাহার আকার আছে তাহাই সত্ত্ব-রজ-তম ত্রিগুণ-বিশিষ্ট। যাহা গুণের অতীত তাহাই নির্গুণ; তাই ব্রহ্ম নির্গুণ ও তাঁহার সৃষ্টা প্রকৃতি গুণময়ী।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥ ৭।১৪
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া
সমাবৃতঃ। ৭ ২৫

এ স্থলে যোগমায়াঅর্থে কুহক নহে; উহার অর্থ প্রকৃতির প্রদত্ত বা জনিত অজ্ঞানতা।

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ ১০
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায়।

তৃতীয় লেখক মায়াঅর্থে চিত্তের ভ্রমোৎপাদক দৃশ্যই বুঝিয়াছেন।—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

উপরি-উক্ত মতগুলি পরস্পর তুলনা করিয়া অনুধাবন করিলে পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন যে গীতার শেষ অধ্যায়ত্রয় ব্যাসদেবের রচনা নহে, কাহারও প্রতি দ্বেষ-ভাব চরিতার্থ করিবার জন্য ও বহুল প্রচার মানসে ব্যাসদেবের পবিত্র গীতাশাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। ইহা যে পরবর্ত্তী রচনা তাহার আর একটী বলবৎ প্রমাণ এই :—

গীতার একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুন ভগবানকে বলিতেছেন যে তিনি তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিবৃত করিলেন তাহাতেই তাঁহার মোহ দূর হইয়াছে, সুতরাং এই উক্তির পরে অর্জ্জুনের অন্য নূতন বিষয় জানিবার আর স্থল বা অবকাশ থাকে না। যদি ইহার পরে কেহ নূতন কথা বলে তাহা যে এই রচয়িতার রচনা হইতে পৃথক্ রচনা তাহা স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করিয়া দেয়। অপিচ দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে গ্রন্থের সমাপ্তিরও নিদর্শন রহিয়াছে।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতং।
যৎত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং
বিগতো মম॥ ১১।১
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে
প্রিয়াঃ॥ ১২।২০

তৃতীয় লেখক অনেক সন্তর্পণে পাদবিক্ষেপ করিয়া আত্মগোপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার রচনা শেষে লিখিয়াছেন যে, আমাদের এই সংবাদ যে অধ্যয়ন করিবে সে আমার জ্ঞান-যজ্ঞে আহুতি করিবে। * উপদেশ

* অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ১৮। ৭০

গ্রন্থাকারে থাকিলেই তার অধ্যয়ন সম্ভব. সুতরাং ইহাও গ্রন্থাকারে পরিণত হইয়া গীতায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহা মুখে মুখে রণস্থলে উপদিষ্ট হয় নাই। এ স্থলে অসামঞ্জস্য দোষ স্পষ্টরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ব্যাসদেব অবতার-বাদ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার অবতার-শব্দ মুখ্য গৌণ দুই অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়। ইহার মুখ্য অর্থ জন্ম গ্রহণ করা। ইহার গৌণ অর্থ ভগবানের শরীর পরিগ্রহ করা, যাহা সাধারণতঃ দশটী কিন্তু ভাগবতের মতে তাহাই চব্বিশটী। যিনি ব্রহ্মময় জগৎ বিশ্বাস করিতেন, যিনি সর্ব্বভূতে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান অবলোকন করিতেন, যিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, হস্তী, গো, কুকুর ও চণ্ডালের মধ্যে কোন প্রভেদ দর্শন করিতেন না সেই ভগবান ব্যাসদেব যে অবতার-বাদ অনুমোদন করিবেন ইহা দ্বারা তাঁহার কথার পৌর্ব্বাপর্য্য সামঞ্জস্যই রক্ষিত হইয়াছে। গীতার ১০ম অধ্যায়ে বর্ণিত যে ঐশ্বরিক বিভূতি ইহাও অবতারবাদের একটী অঙ্গ। সুতরাং ইহা দ্বারাও প্রকাশ করা হইয়াছে যে উক্ত অধ্যায়ে প্রোক্ত যে যে মনুষ্যগণের মধ্যে ঐশ্বরিক বিভূতি অধিক মাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে তাঁহারাও ঈশ্বরের অবতাররূপে গণ্য হইতে পারেন। অধ্যায় শেষে নারায়ণ তাঁহার কথার নিষ্কর্ষসার এই বলিয়া দিয়াছেন যে যাহা বিভূতিযুক্ত শ্রীমান্ সম্পদযুক্ত ও সম্পূর্ণ তাহাই তাঁহার অংশ বলিয়া অবধারণ করিবে। অথবা অধিক কথায় আবশ্যক নাই, ঈশ্বর এই জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং জগত তাঁহারই একাংশ ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। ভগবানের বচন যথা—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪।৮

যেন (জ্ঞানেন) ভূতান্যশেষেণ
দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৪।৩৫

সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মাকুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। ৫।৭

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ
সমদর্শিনঃ ॥ ৫।১৮

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গোযেষাং সাম্যে
স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মনি
তে স্থিতঃ ॥ ৫।১৯

যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশ-
সম্ভবং ॥ ১০।৪১

অথবা বহুনৈতেন কি জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ
১০।৪২

তৃতীয় লেখক অবতার ও মূর্ত্তিপূজা উভয়েরই নিন্দা করিয়াছেন—তাঁহার মতে একবস্তু বা কোন কার্য্যে ব্যাপৃত ব্যক্তির প্রতি ব্রহ্মের অহৈতুক ও তত্ত্বহীন আরোপ তামস-জ্ঞান। (১৮।২২) এই শ্লোক ও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাত্ত্বিক ও রাজসিক জ্ঞানের অর্থযুক্ত দুইটী শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। (২১৫ পৃঃ পাদটীকা)। ইহার কথার পূর্ব্বাপর ঐক্য নাই। যদি সর্ব্বভূতেই অব্যয় ব্রহ্মের একত্বভাবই সাত্ত্বিক জ্ঞান হইল তাহা হইলে অবতার বা মূর্ত্তিতে কি ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই বলিতে হইবে? সুতরাং ইহার এ কথাতেও অব্যবস্থা-দোষ রহিয়াছে। ইনি ১৭শ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে দেবপূজাকে সাত্ত্বিক পূজা বলিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে এই দেবপূজা দ্বারা তিনি কি বুঝিয়াছেন?

ইহা দ্বারা সাকার ভাব ছাড়া অন্য কিছু মনে আসিতে পারে না, সুতরাং ইহা পরস্পরের বিরোধ-উক্তি হইল। অতএব ঋষির কথা দূরে থাকুক, এই রচনা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির নহে এবং ইহা যে জিগীশাপরবশ হইয়া লিখিত তাহা বেশ বোধ হইতেছে। তাহার যে বিশেষ কারণ ছিল তাহা সময় নির্দ্ধারণকালে প্রকাশ করিব।

দ্বিতীয় লেখকের সহিত ব্যাসদেবের অধিক মতবৈষম্য নাই। ইনি কেবল কতকগুলি অধিক নূতন পারিভাষিক কথার প্রয়োগ করিয়াছেন মাত্র। ব্যাসদেব শরীর ও আত্মা বুঝাইতে দেহ, দেহী, শরীর, শরীরী, (২,১৩,১৮,৩০) শব্দ ব্যবহৃত করিয়াছেন তৎতৎস্থলে ইনি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। (১৩।১-২) ব্যাসদেব পুরুষ অর্থে জীবাত্মা, পরম পুরুষ অর্থে পরমাত্মা বুঝিয়াছেন। (৮।১০,২২) দ্বিতীয় লেখকও তাহাই বুঝিয়াছেন তবে বেশীর ভাগ এই যে তিনি দেহস্থ আত্মাকেও পরমাত্মা বলিয়াছেন আর ব্রহ্মকে পুরুষোত্তম বলিয়াছেন (১৫।১৬-১৭)। ব্যাসদেব লিখিয়াছেন প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীনা হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছে অথবা ব্রহ্ম প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া ভূত চরাচরের অভিব্যক্তি করিতেছেন। দ্বিতীয় লেখক প্রকৃতির ব্রহ্মনিরপেক্ষতার কথাই স্বীকার করিয়াছেন এবং ব্রহ্মকে অকর্ত্তা ও উভয়কে অনাদি বলিয়াছেন। উভয়ের বচন, যথা—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ৯।৭
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরং ॥ ৯।১০
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মানানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানম কর্ত্তারং স পশ্যতি ॥১৩।২৯
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি ।১৩।১৯
কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।১৩।২০

ভগবান ব্যাসদেব ও দ্বিতীয় কবি ব্রহ্মকে সৎ অসৎ দুই বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা উপনিষদের প্রতি সম্মান করা হইয়াছে।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ৯।১৯

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎতৎপরং যৎ ॥ ১১।৩৭

অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সৎতন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩।১২

উপনিষদের বচন ২১৫ পৃঃ উদ্ধৃত করিয়া আসিয়াছি।

দুর্জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধেই এই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে, তাঁহার সৃষ্ট প্রকৃতি ও সগুণ বস্তুতে এ কথা খাটিবে না; তথায় প্রাকৃতিক নিয়মই বলবান হইবে অর্থাৎ সৎ হইতে সতের উৎপত্তি ও অসতের অনুৎপত্তি এবং অসৎ হইতে সতের বা অসতের উৎপত্তি হইবে না এই নিয়মমত কার্য্য হইবে। এই কারণে বিরোধ নিরসনের জন্য ব্যাসদেব ২য় অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে তাহাও লিখিয়া দিয়াছেন

নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্তনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

এক্ষণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবির রচনা তুলনা করিয়া বেদান্ত-দর্শনের রচয়িতাকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি। গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

ঋষিভির্বহুধাগীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥

অর্থাৎ ঋষিগণ নানাপ্রকার ছন্দ দ্বারা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন এবং (আমরা) তাহাই নানাপ্রকার হেতু প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মসূত্র দ্বারা নিশ্চিত করিয়াছি। ঋষিগণ উপনিষদে আত্মা সম্বন্ধে বর্ণন

করিয়াছেন ইহা যথার্থ কথা। তাঁহারা পঞ্চবিংশতত্ত্ব সম্বন্ধেও বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহারা সাংখ্যপ্রোক্ত তত্ত্বগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কিছু বলেন নাই, ব্রহ্মসূত্রে তাহা হইয়াছে। ইহাতে সাংখ্যদর্শন ও তৎসহকারী যোগদর্শনের খণ্ডন আছে। তত্ত্বগুলির প্রতি অনাস্থা আছে। প্রকৃতির ব্রহ্মনিরপেক্ষ সৃজনকর্তৃত্ব ভাবটী নিরাকৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সেই প্রকৃতি পুরুষ ও সাংখ্যপ্রোক্ত পঞ্চবিংশতত্ত্বের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ বিসম্বাদী মতের মধ্যস্থলে ব্রহ্মসূত্র বা তন্নামবিশিষ্ট শ্লোকের স্থাপন বড় সন্দেহযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। যদি ইহা দ্বিতীয় কবিরই রচনা বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে তাঁহাকে বিরোধভাষী উন্মত্ত বলিয়া নিশ্চিত করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার রচনায় সেরূপ ভাবের মনে স্থান দিবার কোন স্থল নাই সুতরাং এই শ্লোকটী কোন কূটকারী কর্তৃক এস্থলে স্থাপিত হইয়াছে ইহা না বলিলে আর গত্যন্তর নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে সর্ব্বকর্ম্মের সাধনে পাঁচটী কারণের আবশ্যক। ইহা সাংখ্য-বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাং॥

তার পরের শ্লোকে অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, করণ, চেষ্টা ও দৈব সেই পাঁচ কারণের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। সাংখ্য অর্থে সম্যক্ জ্ঞান। কৃতান্ত অর্থে শ্রেষ্ঠ বা সুনিশ্চিত মত বা সিদ্ধান্ত। এখানে কৃতান্ত শব্দ সাংখ্য-শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। সম্যক্ জ্ঞানের আর শ্রেষ্ঠতা হইতে পারে না তাহা স্বয়ংই চরম জ্ঞান; সুতরাং লোকপ্রসিদ্ধ সাংখ্য শাস্ত্রের প্রতি যে কৃতান্ত বিশেষণটী ব্যবহৃত হয় নাই তাহা একরূপ নিশ্চিত বলা যাইতে পারে, অতএব সাংখ্য কৃতান্ত যে এই লেখকেরই রচিত কোন গ্রন্থ তাহার সন্দেহ নাই। পাছে কৌশল শীঘ্র লোক-দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অভিসন্ধি মূলে উৎপাটিত হয় এই কারণে তাহার অর্থের সঙ্কেত ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অন্য কবির রচনায় স্থাপন করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। বিনা কারণে এইরূপ অনুমান কেহ গ্রহণ করিতে না পারেন তজ্জন্য তাঁহাদের অবগতির জন্য ও সংশয় দূর করিবার জন্য লিখিতেছি যে এই সাংখ্য কৃতান্ত প্রোক্ত কারণ প্রচলিত সাংখ্যকারিকা বা সপ্ততিতে নাই তবে তাহা বেদান্ত-দর্শনে দৃঢ়তার সহিত কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের ২য় অধ্যায় ২য় পাদের ৩৭ হইতে ৪৩ সূত্রের মধ্যে উহা আলোচিত হইয়াছে। *

যদি বেদান্ত-দর্শন গীতার তৃতীয় কবির রচনা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য দাঁড়াইতেছে যে তিনি তাহা নিজ নামে প্রচার করিলেন না কেন, এরূপ কূট ব্যবহার কেন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? সাংখ্য ও যোগের মত সর্ব্ববাদী-সম্মতভাবে গৃহীত হইয়াছিল—উপনিষৎকার ঋষিগণও তাহা বহুমান করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ব্রহ্মসূত্রকার উপনিষদের সু অর্থ করুন আর কু অর্থই করুন, আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিব যে কঠোপনিষদের ১ অধ্যায় তৃতীয় বল্লীস্থ ১০ ও ১১ শ্লোকে এবং ২য় অধ্যায় তৃতীয় বল্লীস্থ ৭।৮ শ্লোকে যে অব্যক্ত শব্দ ব্যবহৃত

* পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ। ৩৬ সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ। ৩৮ অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ৩৯ করণাচেন্ন ভোগাদিভ্যঃ। ৪০ অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা। ৪১ উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ৪২ ন চ কর্ত্তুঃ করণং ৪৩।

হইয়াছে তাহা সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বা প্রধানকেই বুঝাইতেছে। এই ভাবের একটী শ্লোক গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকে দৃষ্ট হয়, তথায় প্রকৃতির উল্লেখ নাই এই মাত্র প্রভেদ। এইরূপ অস্থির পঙ্ককে পড়িলে স্বার্থপর ও গূঢ়াভিসন্ধিমান মনুষ্য যে পথ অবলম্বন করিয়া থাকে ব্রহ্মসূত্রকারও তাহাই করিয়াছিলেন। মহাভারতে অনেক বিরোধ উক্তির আশ্রয় দান করা হইয়াছে এবং সে সকলগুলিই ভগবান ব্যাসদেবের রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং তৃতীয় কবি তাঁহার বিরুদ্ধ রচনার অন্তর্নিবেশ ও গ্রন্থের নাম উল্লেখের এমন সু-অবসর কেন পরিত্যাগ করিতে যাইবেন? তিনি যেরূপ কূটকারী ছিলেন ব্যাসদেবের গীতায় গ্রন্থের উল্লেখ থাকিলে তিনি স্বীয় রচনা তাঁহার রচনার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতেও বোধ করি ইতস্তত করিতেন না, কিন্তু ইহাতে তাঁহার দুইটী অন্তরায় ছিল। প্রথম ব্যাসদেব পূজ্য ঋষি, তাঁহার আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে নিজ রচনা প্রবেশ করাইতে ধর্ম্মভীরু মাত্রেরই বাধকতা উপস্থিত হইবার কথা। দ্বিতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র বলিয়া ভগবদ্গীতা অনেকেই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন, সুতরাং ব্যাসদেবের নির্ম্মল উক্তি অবিকৃত ভাবেই আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে। দ্বিতীয় লেখকের রচনায় গ্রন্থের আভাষের ইঙ্গিত আছে, এই কারণেই তৃতীয় লেখক তাঁহার রচনায় নিজ গ্রন্থের অস্তিত্বের আভাষ দিয়াছেন।

দ্বিতীয় কবি ১৫শ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত; তাঁহা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সকল বেদের তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, তিনি বেদান্তকার ও বেদবিৎ।

> সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
> মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
> বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
> বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহং॥

এই শ্লোকটী বিশ্লেষণ করিলে তিন প্রকার অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান সম্বন্ধে যাহা তাহা ত স্পষ্টই রহিয়াছে। ভগবান ব্যাসদেব সম্বন্ধেও ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে কারণ তিনি গীতাশাস্ত্ররূপ বেদান্ত বা উপনিষৎকার এবং বেদবিভাগ করায় তিনি বেদবিৎও হইলেন। এখন দেখিতে হইবে তৃতীয় ব্যক্তি কে যাহার প্রতি এই সকল গুণই প্রযুক্ত হইতে পারে। এই তৃতীয় ব্যক্তিই হইতেছেন গীতার দ্বিতীয় কবি স্বয়ং। আমরা উপনিষদের মধ্যে দেখিতে পাই যে বৃহদারণ্যকে নূতন নূতন ভাবের কথা বিবৃত করা হইয়াছে। এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে ও অশ্বত্থের কথায় সেইরূপ নূতন কথা বিবৃত হইয়াছে। কঠোপনিষদে এই অশ্বত্থকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে কিন্তু ইহাতে সে ভাব ছাড়া আরো অধিক ভাবও সংযোজিত হইয়াছে। ইহা যে দেহ সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক উক্তি, তাহাতে ভুল নাই। যাহা হউক এইরূপ নূতন নূতন ভাবের উৎস বৃহদারণ্যকেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের রচনা। তিনি সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া শুক্ল-যজুর্ব্বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ ও এই উপনিষৎ লাভ করেন, ইহা তিনি জনক রাজার নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন। তিনি মহাভারত-বক্তা বৈশম্পায়ন মুনির ভাগিনেয় ছিলেন। মাতুল-ভাগিনেয়ে কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটে। ভাগিনেয় বেদ-উপনিষৎ লাভ করিয়া জনক রাজার সভায় তাঁহার

বেদ উচ্চারণ করিয়া মাতুলের অপ্রিয়তা করিবার জন্য যজ্ঞের অর্দ্ধেক দক্ষিণা সবলে আহরণ করেন। দেবল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি, পৈল, সুমন্ত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। অপিচ, জনক রাজা এবং তাঁহার সভাসদগণও তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারিলেন না, প্রত্যুত তাঁহার সম্মাননাই করিলেন। এই আখ্যায়িকা শান্তি-পর্ব্ব ৩১৮ অধ্যায়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। * রোমহর্ষণ পুরাণেও ইহা বর্ণন করিয়া যান। পুরাণে যখন এই কলহের বিষয় স্থান প্রাপ্ত হইল, তখন ইহা খুব সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে, সেই যাজ্ঞবল্ক্যই গীতার দ্বিতীয় কবি; কারণ উপরি-উক্ত শ্লোকে লুক্কায়িত তৃতীয় ব্যক্তির আকার-প্রকার সৌসাদৃশ্য ইহার সহিতই সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যাইতেছে। স্মৃতি অর্থে ধর্ম্মশাস্ত্রও বুঝাইতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য যে তন্নামে প্রচারিত স্মৃতির রচয়িতা, ইহা দেশবিখ্যাত; ইহা মিথিলা ও উত্তর ভারতে প্রচলিত। যাজ্ঞবল্ক্যের খ্যাতি অল্প সময়েই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার শুক্ল যজুর্ব্বেদে গো-বৃষ পবিত্র বলিয়া তাহার বধ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, ইহা প্রাচীন স্মৃতিকার বশিষ্ঠদেবও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। † গীতার দ্বিতীয় স্তরের রচনার ভাব যাজ্ঞবল্ক্যের আরণ্যক ও স্মৃতিতেও প্রতিফলিত রহিয়াছে। (তৃতীয় অধ্যায় অধ্যাত্ম প্রকরণ দ্রষ্টব্য)

তৃতীয় কবির এরূপ কূট ব্যবহারে মনো-নিবেশ করিবার গুরুতর কারণ সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে সনাতন-ধর্ম্মে বিধর্ম্মীয় ভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে কলুষিত করিবার উপক্রম করিতেছিল। ইহাতে তিনি মনে মনে ঈর্ষান্বিত হইতেন, কিন্তু বিক্রমশালী বিধর্ম্মী রাজার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে, প্রকাশ্যভাবে কোন প্রতীকার করিতে অক্ষম হইয়া এই কূটজাল বিস্তার করেন। তিনি ইহাতে সনাতন-ধর্ম্মের রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু ঋষির পবিত্র নামে চিরকালের জন্য কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া দিলেন। এখন আপামর সাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে সমগ্র গীতা ও বেদান্ত-দর্শন ভগবান ব্যাস-দেবেরই রচনা। এ বিশ্বাস সহসা অপনোদিত হইবে কি না, তাহা জানি না; তত্রাপি কর্ত্তব্যজ্ঞানে সুধী-সমাজের নিকট শাস্ত্রযুক্তি-সম্বলিত আমার এই ক্ষুদ্র মতটী প্রকাশ করিলাম, তাঁহারা নিরপেক্ষ বিচার করিবেন, ইহা আশা করিতে পারি।

উপরি-উক্ত সেই গুরুতর কারণটী অনু-গীতার অংশবিশেষ ও সনৎসুজাতের রচনা-সাপেক্ষ, সুতরাং তাহা প্রকাশিত হইলে বেদান্ত-দর্শনের ও গীতার তৃতীয় স্তরের রচনা নখদর্পণের ন্যায় প্রতিভাত হইবে। অশ্বমেধ অনুগীতা-পর্ব্বাধ্যায়ে গুরুশিষ্য-সংবাদে ৪৯ অধ্যায়ে অনেকগুলি ধর্ম্মমত লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত ধর্ম্মমত-গুলি অনুগীতা রচনার পূর্ব্বেই প্রচলিত হইয়াছিল। সে ধর্ম্মমতগুলির ভাব এই—কেহ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কেহ করেন না, কেহ তাহার সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত, কেহ সকল বিষয়েই বিশ্বাসবান। কেহ জগতের অনিত্যতা,

* প্রতিষ্ঠাস্তুতি তে বেদঃসখিলঃ সোত্তরো দ্বিজ। ১০ কৃৎস্নংশতপথং চৈব প্রণেষ্যসি দ্বিজর্ষভ। বিপ্রিয়ার্থং সশিষ্যস্য মাতুলস্য মহাত্মনঃ। ১৭ মিষতো দেবলস্যাপি ততোঽর্দ্ধং কৃতবানহং। স্ববেদদক্ষিণায়ার্থে বিমর্দ্দে মাতুলেনহ। ১৯ সুমন্তুনাথ পৈলেন তথাজৈমিনিনা চ বৈ। পিত্রা তে মুনিভিশ্চৈব ততোঽহমনুমানিতঃ। ২০ দশপঞ্চ চ প্রাপ্তানি যজুংষ্যর্কান্ মহানঘ। তথৈব রোমহর্ষেণ পুরাণমবধারিতং॥ ১

† গৌরগবয় শলভাশ্চানুদ্দিষ্টাস্তথাধেন্বনড্‌াহৌ মেধ্যৌ বাজসনেয়কে। ১৪শ অধ্যায়।

কেহ নিত্যতা, কেহ মায়ারূপ, কেহ বিদ্যমানতা স্বীকার করেন। কেহ জীবাত্মা-পরমাত্মাকে অভিন্ন, কেহ ভিন্ন, কেহ দুই মিশ্রিত ভাবে চিন্তা করেন। কেহ সকল জীবাত্মাকে ব্রহ্মের সহিত এক, কেহ পৃথক্ চিন্তা করেন; আবার কেহ প্রতি শরীরে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া তাহার বহুত্ব স্বীকার করেন। কেহ আহার, কেহ উপবাস, কেহ কর্ম্ম, কেহ নিষ্কর্ম্ম বা প্রশান্তি, কেহ ভোগ, কেহ মোক্ষ, কেহ হিংসা, কেহ অহিংসা ইত্যাদি মতের উপাসনা করেন। * এই মতগুলি বিশ্লেষণ করিলে বোঝা যায় যে, তখন সনাতন মতের পার্শ্বে সাংখ্য-যোগ, ন্যায়-মীমাংসা, বৈশেষিক মতের সহিত লোকায়ত, চার্ব্বাক, বৌদ্ধ জৈন মতও বিরাজিত ছিল। এতগুলি বিসংবাদী মতের সমাবেশ দেখিয়া শিষ্যের চিত্ত ব্যথিত হইয়া শ্রেয়-নির্দ্ধারণে অপারগ হয়। তাই তিনি সে সম্বন্ধে গুরুকে প্রশ্ন করায় তিনি শিষ্যকে অহিংসাই সর্ব্বধর্ম্মের সার বলিয়া বর্ণন করিলেন। গুরুর মতে অহিংসাই অনুদ্বিগ্ন, কৃত্যতম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-লক্ষণ এবং ইহাই মোক্ষপ্রাপক জ্ঞান। যাহারা হিংসাপরায়ণ, যাহারা নাস্তিক, যাহারা লোভমোহসমাযুক্ত, তাহারা নরকগামী হয়। যথা—

অহিংসা সর্ব্বভূতানামেতৎ কৃত্যতমং মতং ॥২।
এতৎ পদমনুদ্বিগ্নং বরিষ্ঠং ধর্ম্মলক্ষণং।
জ্ঞানং নিঃশ্রেয় ইত্যাহুর্বৃদ্ধা নিশ্চিত-
দর্শিনঃ ॥৩।
হিংসাপরাশ্চ যে কেচিদ্ যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ
লোভমোহসমাযুক্তা স্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥৪।
অশ্ব, ৫০ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মবাদিগণই এই সকল মত হৃদয়ে পোষণ করিতেন।

মন্যন্তে ব্রাহ্মণা এব ব্রহ্মজ্ঞানতত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩।
৪৯ অধ্যায়

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অনুগীতার রচনা-সময়েও ব্রহ্মবাদিগণ স্বীয় স্বীয় স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াও দূষিত হইতেন না এবং তাঁহাদের সহকারিগণও তাহা দোষাবহ বলিয়া মনে করিতেন না। ইহাই যে শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণের প্রকৃত আচরণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অবস্থা চিরকাল স্থায়ী হয় নাই। তাঁহাদের এইরূপ উপেক্ষা দেখিয়া স্বার্থপরগণ আত্মগোপন করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মমত অনুপ্রবেশিত করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মমত দেশে প্রতিপত্তি লাভ করে, ধর্ম্মের সেই মধ্যাহ্ন সময়ে নাগার্জ্জুন-নামে জনৈক প্রভাবশালী মণ্ডলেশ্বর রাজা কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ব্রহ্মবাদিগণের ঋষি-প্রণীত চিকিৎসা-গ্রন্থে প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়া তাহা প্রতিসংস্কৃত করেন। ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছিল যে, ঋষিগণের রচনা তিরোহিত হইয়া তৎস্থলে প্রতিসংস্কর্ত্তার রচনা স্থানলাভ করে। সুতরাং ঋষির মধুর সরল ওজস্বিনী ভাষার আস্বাদে বঞ্চিত হইয়া ব্রহ্মবাদিগণের ন্যায় আমরাও ব্যথিত হইতেছি। ঋষিগণের প্রাচীন অগ্নিবেশ-তন্ত্র ও সুশ্রুতে যে গভীর পাণ্ডিত্য, অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা নিহিত ছিল, তাহার আংশিক আমরা প্রতিসংস্কৃত চরক ও সুশ্রুতে পাইয়াও বিস্ময়বিস্ফারিতলোচন ও

* ঊর্দ্ধদেহাদ্বদন্ত্যেকে নৈতদস্তীতি চাপরে। কেচিৎ সংশয়িতং সর্ব্বং নিঃসংশয়মথাপরে। ২ অনিত্যং-নিত্যমিত্যেকে নাস্ত্যস্তীতি চাপরে। একরূপং দ্বিধেত্যেকে ব্যামিশ্রমিতি চাপরে।৩ একমেকে পৃথক্ চান্যে বহুত্বমিতি চাপরে। আহার কেচিদিচ্ছন্তি কেচিচ্চানশনে রতাঃ। কর্ম্ম কেচিৎ প্রশংসন্তি প্রশান্তিং চাপরে জনা। ৭ কেচিন্মোক্ষং প্রশংসন্তি কেচিদ্ ভোগান্ পৃথগ্বিধান। অহিংসানিরতাশ্চান্যে কেচিদ্ধিংসাপরায়ণাঃ।...ইদং শ্রেয় ইদং শ্রেয় ইত্যেবং ব্যুথিতো জনঃ। অশ্ব ৪৯

মুগ্ধ হইতেছি, ঋষির আমূল গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে আমরা যে কি আনন্দলাভ করিতাম তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। নাগার্জ্জুন পদ্য অপেক্ষা গদ্যেরই পক্ষপাতী ছিলেন, তাই তিনি চিকিৎসা-গ্রন্থের পদ্য ছাঁটিয়া গদ্য বসাইয়া দিয়া গিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে 'ভবতি চাত্র শ্লোকঃ' লিখিয়া ঋষির বচন উদ্ধার করিয়াছেন। মহাভারতেও যে এইরূপ হইয়াছিল তাহা আদি পর্ব্বে লিখিত দুই বংশাবলী দৃষ্টে বুঝা যায়—একটী প্রাচীন রচনা; দ্বিতীয়টী গদ্যে রচিত আধুনিক রচনা। এই গদ্যে অনুবংশ শ্লোকের প্রতি সুশ্রুতের ন্যায় সঙ্কেত আছে। ৯৫ অধ্যায়ে গদ্যবংশাবলীতে শান্তনুর একটী গুণের উল্লেখ করিয়া অনুবংশের প্রতি সঙ্কেত আছে। ইহা কিন্তু মূল মহাভারতে নাই; ইহাতে বোধ হয় প্রতিসংস্কারের তাড়নায় তাহা স্থানভ্রষ্ট হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, এই ধর্ম্মবিপ্লব ও ধর্ম্মগ্রন্থের ধ্বংস-সময়ে মহাভারতে সনৎসুজাত-নামে আর একটী গীতা স্থানলাভ করে। ইহা ব্রহ্মবাদিগণের রচনা বলিয়া বোধ হয় না—ইহা কোন জৈন বা বৌদ্ধ যতি বা শ্রমণের রচনা—লিপি-কৌশল ও ভাবের অভিব্যঞ্জনাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সনৎসুজাত-গীতাটী ধৃতরাষ্ট্রের প্রমাদ-দূরীকরণার্থ কথিত হয়। প্রথমে ইহার আরম্ভ সম্বন্ধেই একটী বিসদৃশতা লক্ষিত হয়। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিবৃত করিতে বলিলে, তিনি শূদ্রযোনি বলিয়া সে বিষয়ে তাঁহার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। মহাভারতের অন্য স্থলের সহিত ইহার ঐক্য হয় না। মার্কণ্ডেয়-সমস্যা অধ্যায়ে শূদ্রযোনি মিথিলাবাসী ধর্ম্মব্যাধও ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছিল, ইহা লিখিত আছে। তারপর ভগবান ব্যাসদেব সঞ্জয়ের মুখেই ভগবদ্গীতার বিষয় ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন—তিনি সূতজাতি ছিলেন। সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব যে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য কেহ বিবৃত করিতে পারিবে না এ ধারণা ও বিশ্বাস ব্রহ্মবাদিগণের ছিল না, অন্ততঃ অনুগীতার রচনাকাল পর্য্যন্ত এই বিশ্বাসই দৃঢ় ছিল। তারপর হয় তো তাহা শিথিল হইতে আরম্ভ হয় এবং সনৎসুজাত-রচনার পূর্ব্বে হয় তো শূদ্রজাতি ধর্ম্মালোচনা হইতে বঞ্চিত হন; তাই রামায়ণে শূদ্র সন্ন্যাসী শম্বুকের নিধনে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিপালনের কথা শ্রুত হওয়া যায়। জৈনগণ যে শূদ্রজাতিকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতেন, তাহা জৈনমন্দিরে তাহাদের প্রবেশ নিষেধ হইতে প্রতিপন্ন হয়। তাহাদের মধ্যে এই প্রথা সনৎসুজাত রচনা-কালেও বলবতী ছিল তাই বিদুরের ধর্ম্মতত্ত্ব বিবরণে অক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মবাদিগণের তাৎকালিক রীতিনীতির অজ্ঞতাও প্রকাশিত হইতেছে।

সনৎসুজাত-গ্রন্থের দুইটী সংস্করণ দৃষ্ট হয়। একটী মহাভারতস্থ সংস্করণ, আর একটী পণ্ডিত ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় প্রকাশিত শঙ্করভাষ্যসম্বলিত দ্বিতীয় সংস্করণ। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হয়। মহা-ভারতের সংস্করণে পাঁচটী অধ্যায় ও এই সংস্করণে চারিটী অধ্যায় রহিয়াছে। তারপর অধ্যায়ের মধ্যস্থ অবান্তর অল্পবিস্তর প্রভেদও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুবিধা অনুসারে আমি উভয়গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিব।

কঠোপনিষদের (২য় বল্লীতে) যম-নাচিকেতার উপাখ্যানে মৃত্যু ও অমরত্বের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। যমরাজ তথায় বলিয়াছেন যে, যাহারা জন্মান্তরে বিশ্বাস

করে না, সুতরাং আত্মার অমরত্ব স্বীকার করে না তাহারা তাঁহার বশে আসিয়া নিগ্রহ প্রাপ্ত হয়। সনৎসুজাতে মৃত্যু একরূপ অস্বীকৃত হইয়াছে, তথায় প্রমাদকেই মৃত্যু বলা হইয়াছে।

প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি।

১ম অ ৪, মহা উদ ৪২। ৪

ব্রহ্মবাদিগণের মতে যমরাজ ধর্ম্মরাজ বলিয়া কথিত। এস্থলে তিনি ক্রোধ, প্রমাদ ও মোহের প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত। ইহা একরূপ নিন্দা।

আস্থাদেষ নিঃসর তে রন্যরাণাং
ক্রোধঃ প্রমাদো মোহরূপশ্চ মৃত্যুঃ॥ ৭ ১ম—অ

নিষ্কামযজ্ঞকর্ম্মদ্বারা যে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বেদে কথিত, ইহা যথার্থ কি না? ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে যে, অবিদ্বানগণই তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; অপিচ বেদ তাহার প্রয়োজনীয়তাও খ্যাপন করিতেছে। তাহা দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু বিদ্বানগণ তাহা প্রাপ্ত হয়। এ স্থলটী জটিল করিয়া রাখা হইয়াছে, কারণ অবিদ্বানের কথা বলিতে বলিতে বিদ্বানের ব্রহ্মলাভের কথা বলায় কৌশল আছে। আয়াতি সংস্কৃত "এতি" শব্দের জৈন প্রয়োগ হইতে পারে, ইহার অর্থ আগমন করা; ভাষ্যে ভোগৈশ্বর্য্য-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। জৈনগণ জন্মান্তর মানেন না, এ স্থলে সেই ভাবই লুক্কায়িত রহিয়াছে। যথা—

এবং হ্যবিদ্বানুপযাতি তত্র
তথার্থজাতঞ্চ বদন্তি বেদাঃ।
স নেহ আয়াতি পরং পরাত্মা
প্রয়াতি মার্গেণ নিহন্ত্য মার্গান্॥ ১৮

১ম অ; উদ্ ৪২। ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে ও মহাভারতের উদ্ ৪৩।৩৩ শ্লোকে "অর্হৎ" শব্দ যে ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা জৈন তীর্থঙ্কর ও পূজ্যব্যক্তি উভয়ই বুঝাইতে পারে। তবে ধনের সহিত পুত্রদানের বিষয় কথিত হওয়ায় সংশয় নিরসিত হইয়া জৈনতীর্থঙ্করই যথার্থ অর্থ বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে পুত্রদানের কথা শ্রুত হওয়া যায় না। জৈনদের মধ্যে তাহা এখন আছে কি না জানি না, খুব সম্ভব পূর্ব্বে ছিল। যথা—

অর্হতে যাচমানায় পুত্রান্ বিত্তং দদাতি যঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তং দ্বিতীয়ং স্যান্নিত্যং বৈরাগ্যযোগতঃ॥

মহাভারতে অনুরূপ পাঠ আছে এবং পূর্ব্ব শ্লোকে পুত্রদারার যাজ্ঞা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করিলেন—কেহ পঞ্চ বেদী, কেহ চতুর্বেদী, কেহ ত্রিবেদী, কেহ দ্বিবেদী, কেহ একবেদী, আবার কেহ অনৃক বা শূন্য-বেদী, ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহার উত্তরে কথিত হইয়াছে যে, এক সত্যবেদের অজ্ঞানতা-বশতঃ বহু বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। সত্য হইতে স্খলিত হওয়ায় নানা প্রকার কর্ম্মের উদয় হইয়াছে। তার পরেই অথর্ব্ববেদের প্রশংসা আছে। যথা—

একবেদস্য চাজ্ঞানাদ্ বেদাস্তে বহবোঽভবন্।
সত্যস্যৈকস্য রাজেন্দ্র সত্যে কশ্চিদবস্থিতঃ॥

৩৭—২য় অধ্য, উদ ৪৩।৪৩

ছন্দাংসি নাম ক্ষত্রিয় তানথর্ব্বা।
পুরা জগৌ মহর্ষিসংঘ এষঃ।
ছন্দোবিদস্তে য উত নাধীতবেদা।
ন বেদবেদ্যস্য বিদুর্হি তত্ত্বং॥

মহা উদ্ ৪৩।৫০।

ছন্দাংসিনাম দ্বিপদাং বরিষ্ঠ,
স্বচ্ছন্দযোগেন ভবন্তি তত্র।
ছন্দোবিদস্তে ন চ তানধীত্য

গতা হি বেদস্থ ন বেদ্যমার্য্যাঃ ॥
২য় অধ্যায় ৪০ ভাষ্যধৃতপাঠ।

মহাভারতে ইহার পরে ভাষ্যধৃত পাঠও প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে ভাষ্যধৃত পাঠে চাতুরী খেলা হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বে এক সত্যবেদের অজ্ঞানতাবশতঃ বহু বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা বলিয়া সেই বেদেরই বিষয় বর্ণন করিলে যুক্তিসিদ্ধ হইত। ইহা না করিয়াও আর্য্যগণকে অধ্যাত্মতত্ত্ববিমূঢ় বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারাও প্রকাশিত হইতেছে যে লেখক আর্য্যসমাজ-বহির্ভূত কোন ব্যক্তি ছিলেন।

কোন কারণে ব্রহ্মবাদিগণ অথর্ব্ববেদকে ত্রয়ীর মধ্যে স্বীকার করেন নাই। মনুতে ইহা অভিচারমূলক বেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাবিত্রীভ্রষ্ট হইলে দ্বিজগণ ব্রাত্য হইতেন। অথর্ব্ববেদে এই ব্রাত্যগণের প্রশংসা আছে। অথর্ব্ববেদে প্রাচীন ও আধুনিক অনেক উপনিষৎ স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। সনৎ-সুজাতের মহাভারতীয় পাঠে অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদের প্রশংসা থাকায় ইহার রচয়িতা যে কোন ব্রাত্যজাতিসম্ভূত ব্যক্তি তাহা এক প্রকার প্রমাণিত হইতেছে। তাই তিনি নিজের অনুসৃত মতেরই শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ব্রহ্মবাদিগণের মতে অরণ্যবাসজনিত চিত্তের একাগ্রতা ও সংযম ভাবে ব্রহ্মো-পাসনার কারণেই মুনির মুনিত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। এ লেখকের মুনি মৌনেই পর্য্যবসিত। তাঁহার মতে নীরব ভাবে উপাসনা করিবে; মনে কিছু চিন্তা করিবে না, তাহা হইলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ হইবে।

তুষ্ণীম্ভূত উপাসীত ন চেচ্ছেন্মনসা অপি।
অভ্যাবর্ত্তেত ব্রহ্মাস্মৈ বহ্বনন্তরমাপ্নুয়াৎ॥ ২য় ৪৬

মৌনাদ্ধি স মুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ।
অক্ষরং তৎ তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥ ৪৭

যদি ব্রহ্মকে মনন না করিবে তাহা হইলে যে কিরূপ উপাসনা হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এস্থলে "ভাষ্যে নচেচ্ছেৎ" বাক্য দ্বারা বিষয়েন্দ্রিয়ের ইচ্ছা বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা পূর্ব্ব বচনের বিরোধী হয়, কারণ তথায় কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের অন্বেষণে কাহার নিকট যাইবে না; বেদেও ইহার প্রাপ্তির আশা না করিলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে সক্ষম হইবে। যথা—

নাস্য পর্য্যেষণং গচ্ছেৎ প্রত্যর্থিষু কথঞ্চন।
অবিচন্বন্নিমং বেদে ততঃ পশ্যতি তং প্রভুং॥ ৪৫

সুতরাং এস্থলে যে শূন্যচিন্তা তাহার সন্দেহ নাই। ইহা জৈন বৌদ্ধ মতেরই অনুষ্ঠান।

মহাভারতের পাঠে উপরি-উক্ত ৪৭ শ্লোক "ন মৌনান্মুনিঃ" ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু এস্থলে উহা অশুদ্ধ, কারণ প্রথম অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে মান ও মৌন দুই তুলিত হইয়াছে—মানকে ইহলৌকিক ও মৌনকে পারলৌকিক বলা হইয়াছে—সুতরাং মৌন যে তুষ্ণীভাবে শূন্যধ্যান, তাহা পরবর্ত্তী বচনের সহিত মিলিয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মবাদিগণ একাদশেন্দ্রিয় স্বীকার করেন। এ লেখক বুদ্ধিকে ধরিয়া তাহা দ্বাদশ করিয়াছেন। ইহাও সনাতন মত নহে। (৪।৮ দেখ উদ ৪৬।৭) ইন্দ্রিয়কে এ লেখক গুণ বলিয়াছেন।

৪র্থ অধ্যায় ১৪ শ্লোকে সর্পগণ মনুষ্যদিগকে নিধন করিয়া গর্ত্তে লুক্কায়িত হয়, ইহা লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নাগজাতির প্রতি সঙ্কেত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাহারা উপাংশু হত্যা করিতে সিদ্ধহস্ত ছিল—তাহা পরীক্ষিতের তক্ষক-দংশন-আখ্যানেই প্রকাশ রহিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে ক্ষণিকবাদের ভাব যেন প্রকাশিত রহিয়াছে। তথায় লিখিত হইয়াছে যে, সূর্য্য ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবেই পরদিবস পুনঃ উৎপন্ন হন।

এতেনৈব সগন্ধর্ব্বা রূপমপ্সরসো জয়ন্।
এতেন ব্রহ্মচর্য্যেণ সূর্য্য অহ্নায় জায়তে॥

অর্থাৎ এই ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ রূপকে জয় করিয়াছেন অর্থাৎ চিরযৌবনে বিভূষিত হইয়াছেন। ভাষ্যে * অহ্নায় শব্দে 'জগতাং দ্যোতনায়' অর্থাৎ জগৎকে জ্যোতিদানও প্রকাশার্থ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু উহা কষ্ট কল্পনা; কারণ 'জায়তে' জন্মগ্রহণ অর্থেই অধিক প্রযুক্ত। তাহার ভবতি হওয়া অর্থ হইলেও এস্থলে তাহাই ধরিয়া অহ্নায় শব্দে কৌশল ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহা যে অন্যের জৈন রূপ তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক ক্ষণিকবাদিগণের মতে একটী বস্তু বা বিষয়ের পরক্ষণেই বিনাশ হইয়া পুনঃ অস্তিত্ব হয় এই ভাব এ স্থানেও কৌশলে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই ক্ষণিকবাদিগণ জৈন-বৌদ্ধগণেরই একটী শাখাবিশেষ। পরবর্ত্তী ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধগণ দুই সূর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, তাহা ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্ত-শিরোমণি নামক জ্যোতিষগ্রন্থেও খণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে হীনো মনীষীর কথা আছে। ব্রহ্মের রূপ কেহ দৃষ্টিগোচর করিতে পারেন না, "হীনো মনীষী" মন অভিনিবেশ দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়া মৃত্যুকে জয় করেন।—

অদর্শনে তিষ্ঠতিরূপমস্য পশ্যতি চৈনং
সুসমৃদ্ধসত্বাঃ।
হীনোমনীষী মনসাভিপশ্যেৎ এনং বিদুর-
মৃতাস্তে ভবন্তি॥

এ শ্লোকটী মহাভারতে নাই। হীনো মনীষী অর্থে ভাষ্যে * রাগদ্বেষ রহিত হইয়া যাহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে এই অর্থ করা হইয়াছে, ইহাও কষ্ট কল্পনা। ইহাতে যে হীনযান-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীর অর্থ লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা শব্দের সমাবেশ দ্বারা বেশ প্রকাশিত হইতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় নাগার্জ্জুন এই দলের নেতা ছিলেন, এই লেখকও সম্ভবতঃ সেই দলভুক্ত ছিলেন,

* এই ভাষ্য সম্বন্ধেও আমার মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ইহা ভগবান ভাষ্যকারের রচনা নহে। ইহা কোন জৈন পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত হইয়া তাঁহার নামে প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে শারীরক ভাষ্যের অনুকরণে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধারের প্রথা অনুসৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাতে শারীরক ভাষ্য বা গীতা ভাষ্যের ন্যায় গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রাঞ্জলতার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে, অপিচ উদ্ধার গুলি অসম্পূর্ণ ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ভগবান শঙ্কর এরূপ করেন নাই। তাঁহার ভাষ্য এত প্রাঞ্জল ও প্রসাদ গুণে পূর্ণ যে তাহা ফেলিয়া ভাষ্যের টীকা পড়িতে ইচ্ছা হয় না। তার পর ভাষ্যে সুরেশ্বরাচার্য্য ও লিঙ্গাদি পুরাণের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। সুরেশ্বরাচার্য্য শুনিতে পাই তাঁহার ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করেন, সুতরাং ইনি যে শঙ্করের পরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই, কাজেই তাঁহার ভাষ্যে তদ্বচন উদ্ধারের অবসর থাকে না। শঙ্করবিজয়কার কাল বিপর্য্যয়ের খিচুড়ী করিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ের লোককে এক সময়ে স্থাপন করিয়া তাঁহার গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য নগণ্য করিয়া দিয়াছেন। তারপর এক ব্রহ্মপুরাণ ব্যতিরেকে শঙ্করের পূর্ব্বে অন্য আধুনিক পুরাণের অস্তিত্ব ছিল না। তাহা পুরাণের অভ্যন্তরস্থ বিষয় ও মতগুলি দ্বারা স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নীলকণ্ঠ এই ভাষ্যের কথা বলিয়াছেন, সুতরাং ইহা তাঁহার পুর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদান্ত-দর্শনকারের সময় হইতে ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-জগতে এইরূপ লুকোচুরী আরম্ভ হইয়াছিল। ভোজদেবের সময় তাহা চরম সীমায় ওঠে, সেই সময় আধুনিক অনেকগুলি পুরাণ রচিত হয় এবং পরবর্ত্তী কালে আরও রচিত হইয়া অষ্টাদশ পূর্ণ হয়। পুরাণগুলিও পরিত্যাগ করিবার বস্তু নহে। ইহাতেও আধুনিক কালের ধর্ম্ম, সমাজ, আচার ব্যবহার, রীতি-নীতির ইতিহাস-ভাণ্ডার পূর্ণ রহিয়াছে। সুধী-সমাজ ইচ্ছা করিলে মেধাতিথির ভাষ্য ও কুল্লুকের টীকা তুলনা করিলে তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হইবেন।

সুতরাং স্বীয় সম্প্রদায়ের যে গুণ বর্ণন করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কিছু নাই।

চতুর্থ অধ্যায়ের ২৯।৩০ শ্লোকে বামদেবের ন্যায় আমি সূর্য্য আমি মনু ইত্যাদি ভাব ব্যক্ত করিয়া আমি স্থবির পিতামহ পিতা পুত্র সকলই বলা হইয়াছে—

অহমেবাস্মি বো মাতা পিতা
পুত্রোঽস্ম্যহং পুনঃ
আত্মাহমস্য সর্ব্বস্য যচ্চ নাস্তি
যদস্তি চ। ২৯
পিতামহোঽস্মি স্থবিরঃ পিতা পুত্রশ্চ
ভারত।
মমৈব যূয়মাত্মস্থা ন মে যূয়ং ন
চাপ্যহং॥ ৩০

এই স্থবির শব্দে দ্বি-অর্থ নিহিত করা হইয়াছে। ইহার মুখ্য অর্থ বৃদ্ধ, গৌণ অর্থ, বর্ষীয়ান জৈন সন্ন্যাসী। পিতামহ শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত, (১) পিতার পিতা, (২) পদ্মযোনি ব্রহ্মা। ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্মাকে বৃদ্ধ পিতামহ বলেন না, তাহা অন্যধর্ম্মাবলম্বিগণই ব্যবহার করিতে পারেন। যাহা হউক, এতগুলি আভ্যন্তরিক প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইল যে, এই রচনা কোন জৈন-সন্ন্যাসীর কৌশলপূর্ব্বক ধর্ম্মবিপ্লবকালে মহাভারতে স্থানলাভ করিয়াছে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মবাদিগণের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

এই লেখক যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন এবং শেষ অধ্যায়ে প্রতি শ্লোকের অন্তে একটী "ধূয়া" দিয়াছেন, তাহার অর্থ যোগিগণই সনাতন ভগবানকে দর্শন করিয়া থাকেন— "যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনং॥" ভগবদ্গীতার তৃতীয় কবি যে এই লেখকের প্রতি কটূক্তি করিয়া তাঁহার অধ্যায়ত্রয় ও বেদান্ত-দর্শন লিখিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। নতুবা ভগবান ব্যাসদেবের যজ্ঞ-নিন্দায় তাঁহার মন বিচলিত হইবার কোন কারণ ছিল না, যেহেতু ব্যাসদেব সনাতনধর্ম্মে বিশ্বাসী ঋষি, তিনি বেদের প্রতি অসম্মান করেন নাই, কিন্তু এ লেখক বেদে আস্থাবান নহেন, তিনি বিধর্ম্মী—তাঁহার ছদ্মবেশে ব্রহ্মবাদিগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে যাওয়ায় তৃতীয় কবি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার ও তদ্ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই তাঁহার রচনায় সন্ন্যাসীর ফল প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিতভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই দুই লেখকই যে সমকালবর্ত্তী ছিলেন তাহার বিশেষ কারণ আছে। সনৎসুজাত-লেখক যেমন ব্রহ্মবাদিগণকে প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, গীতার তৃতীয় লেখক তদ্রূপ বিধর্ম্মী রাজাকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য প্রপঞ্চ বিস্তার করিয়াছিলেন—তিনি নিজ রচনা ঋষি-প্রণীত প্রাচীন রচনা বলিয়া প্রখ্যাপিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং এই উভয় লেখকের প্রাদুর্ভাবকাল একরূপ অবধারিত করিতে পারা যায়। তাঁহারা উভয়ে যে নাগার্জ্জুনেরই সমসাময়িক, তাহাতে সন্দেহ নাই। তখন বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার মতগুলি বহুভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহার আস্বাদ না পাইলে ভগবদ্গীতার তৃতীয় কবির রচনায় বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম্ম ও চার্ব্বাক ক্ষণিকবাদ আদি মতের আভাস পাইতাম না এবং বেদান্ত-দর্শনেও এইগুলি নিরাকৃত দেখিতাম না।

সাংখ্য ও যোগ মত যে বেদান্ত-দর্শনে কেন তিরস্কৃত হইয়াছে তাহারও বিশেষ কারণ দেখিতে পাই। ইহার তুল্য উত্তম জ্ঞান নাই, ইহা ভগবান ব্যাসদেবের উক্তি,

উপনিষৎকারগণও তাহাতে সায় দিয়া গিয়াছেন। ইহা সহজ প্রযুক্ত অনেকেই গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে তাৎকালিক সমাজ ও বর্ণাশ্রমে বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, তাই ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন প্রচারিত হয়। ব্রাত্যগণ * সাংখ্য-মতে নিষ্ঠাবান হইলেও তাঁহাদের অঙ্গে কালিমা লেপিত হয়। এই দ্বিজাতিগণ পরে অথর্ব্ববেদ সঙ্কলিত করেন। তাহাতে ব্রাত্যগণের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং যাঁহারা সনাতন-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ভাব বা মত পোষণ করিতেন, তাঁহারা তাঁহাদের আশ্রয়স্বরূপ অথর্ব্ববেদের প্রতিই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। ভগবান কপিলব্যেদের প্রতি সম্মান রক্ষা করিয়া তাঁহার উদার মত প্রচার করেন। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব গো-কপিলীয় সংবাদে স্যুমরশ্মি কে তাঁহার উক্তি দ্বারাও তাহা সমর্থিত হইতেছে—তিনি বলিয়াছিলেন যে বেদ লৌকিক প্রমাণ, আমি বেদের অসম্মান করিতেছি না; দুই ব্রহ্মই জানা আবশ্যক, এক শব্দ-ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ, দ্বিতীয় পরংব্রহ্ম। যথা—

বেদাঃপ্রমাণং লোকানাং ন বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃতাঃ।
দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।
১। ২৬৯ অধ্যায়

কিন্তু তাঁহার পরে কেহ কেহ বেদের অর্থবাদের অযথার্থতায় সংশয়িত হইয়া উহার অসম্মান ও অপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা এইরূপ করিলেন তাঁহারা মহাভারতে পণ্ডিতাভিমানী বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং পরে তাঁহারা নাস্তিক বলিয়া কথিত হন। ইঁহারা পরে অথর্ব্ব বেদের কলেবর নিজ নিজ মত দ্বারা পুষ্ট করেন ও অন্য বেদত্রয়ের নিন্দাবাদ প্রচার করেন। এই সকল কারণে কালক্রমে অথর্ব্ববেদীয়গণের সহিত ব্রহ্মবাদিগণের প্রবল দ্বেষভাব সংঘটিত হয়। ভগবান বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা কপিল নামক জনৈক অন্য ঋষির স্মরণার্থ তাঁহার নামে শাক্যগণকর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ঋষি জনৈক শাক্যদুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। এই বংশে ভগবান শাক্যসিংহের জন্ম হয় গীতার তৃতীয় লেখকের পূর্ব্ব সময় হইতে এই ঋষির সহিত সাংখ্যপ্রবক্তা ভগবান কপিলের অভিন্নতা প্রচারিত হয়। সুতরাং বৌদ্ধযুগে সকলের বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে বুদ্ধদেবের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ কপিলই সাংখ্যমত প্রচার করেন, অতএব তিনিও বৌদ্ধমতাবলম্বী হইবেন এই সিদ্ধান্তটী অপরিহার্য্য হইয়া ওঠে। এই কারণেই গীতার তৃতীয় লেখক অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভাবেও বেদান্তদর্শনে স্পষ্টরূপে সাংখ্যমতের খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং যোগশাস্ত্রেও সাংখ্যের ন্যায় পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া তাহাকেও সাংখ্যের সহিত একগাড়েই ফেলিয়া দিয়াছেন। ইহাদ্বারা তিনি নিজের ভ্রান্ত বিশ্বাসেরই আভাস দিয়াছেন, নতুবা যে ভগবান ব্যাসদেব সাংখ্যযোগ ও ভক্তির প্রশংসা তাঁহার অমর গ্রন্থ গীতায় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অবজ্ঞাভাবে যে তৃতীয় কবি কিছু বলিতে সাহসী হইবেন তাহা বলা যায় না। † তিনি ইহাদ্বারা

---

* ব্রত শব্দ হইতেই যে ব্রাত্যশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে উহাদ্বারা নির্দ্দিষ্টকালে অসংস্কৃত দ্বিজাতিকেই বুঝাইয়াছে।

† শান্তিপর্ব্ব শেষ অধ্যায়ে ইহার আভাষ আছে। তথায় ব্রহ্ম স্থাবর-জঙ্গম জগতের এক ও অভিন্ন যোনিরূপ ব্রহ্মসূত্রে বিঘোষিত মত কথনের পর অধ্যায় শেষে সাংখ্যযোগের প্রশংসা আছে। ইহাও এই তৃতীয় লেখকের রচনা বলিয়া বোধ হয়।

প্রাগুক্ত স্বীয় অভিসন্ধি সিদ্ধ ও স্বীয় অভীপ্সিত মত প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন এই মাত্র বলা যাইতে পারে। প্রথম প্রথম তিনি স্বীয় নাম গোপন ভাবে রাখিয়াছিলেন। ইহাতে সাংখ্যকৃতান্ত ব্যাসদেবের রচনা বলিয়া প্রচারিত হইয়া যায়। তার পর নাগার্জ্জুনের পরে সাংখ্যকৃতান্ত বাদরায়ণের রচিত বলিয়া প্রচারিত হয় এবং ব্যাসদেব ও বাদরায়ণ অভিন্নব্যক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হয়েন। এইরূপে কালক্রমে বাদরায়ণ ভগবান ব্যাসদেবের একটী নাম বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। মহাভারত, গীতা ও বেদান্তদর্শন তন্ন তন্ন করিয়া মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। ভরসা করি, সুধীসমাজ পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া আমার সহিত একমত হইবেন।

ভগবান ব্যাসদেবের গীতায় নির্ব্বাণ শব্দ দেখিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ঐ এক শব্দের অস্তিত্বই গীতাকে বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী কালের রচনা করিয়া দিতেছে, কারণ গীতায় যে ভাবে নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বৌদ্ধ নির্ব্বাণেরই অনুরূপ, তাহা ভগবান পাণিনির নির্ব্বাত স্থান অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। সুতরাং গীতা পাণিনিরও পরবর্ত্তী রচনা।

গীতায় নির্ব্বাণ শব্দ একক ব্যবহৃত হয় নাই। উহা ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃচ্ছতি। ২।৭২

স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ৫।২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষঃ। ৫।২৫

তারপর ইহার অর্থস্বরূপ শান্তি, ব্রাহ্মীস্থিতি নির্ব্বাণপরমা, শান্তি, শান্তরজঃ, ব্রহ্মভূত, ব্রহ্মস্পর্শ অত্যন্তসুখ ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে।

স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী। ২।৭০

স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ২।৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি। ২।৭২

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।৪৩৯

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতঃ। ৫।১৯

সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি। ৫।২৯

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষং। ৬।২৭

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে। ৬।২৮

সুতরাং প্রদীপ-লোপের সহিত অগ্নির নির্ব্বাণ বা শূন্যে মিশনের ন্যায় ভগবান ব্যাসদেবের ব্রহ্মানন্দ ... ব্যবহৃত হয় নাই তাহা নিশ্চিত। বৌদ্ধনির্ব্বাণে শূন্যে মিশ্রণভাব আছে, নিজত্ব পরিত্যাগের কষ্ট যে না আছে তাহা নহে, নির্ব্বাণে যে কোনরূপ সুখানুভব আছে, তাহা বৌদ্ধগণ বর্ণন করেন নাই, সুতরাং তাহা জানিবার উপায় নাই। এই বিরুদ্ধভাবের অনুভূতি দ্বারা বেশ প্রকাশ হইতেছে যে, ব্যাসদেবের ব্রহ্মনির্ব্বাণ বৌদ্ধগণের নির্ব্বাণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। মহাভারতের অন্যত্র ব্রহ্মনির্ব্বাণ ও নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তথায় ব্রহ্মপদবী লাভ অর্থই দ্যোতিত হইয়াছে। ইহার মূল যে নির্ব্বেদ অর্থাৎ মনের ব্রহ্মে একাগ্রভাব বা বিষয়ে বৈরাগ্যভাব তাহাই প্রকাশিত রহিয়াছে।

নির্ব্বেদাদেব নির্ব্বাণং ন চ কিঞ্চিদ্বিচিন্তয়েৎ।
সুখং বৈ ব্রাহ্মণো ব্রহ্ম নির্ব্বেদেনাধিগচ্ছতি।
১৭ শান্তি ১৮৯

যথা স্বাত্মস্থিতং ধ্যানং তথা কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ।

মহর্ষয়ো জ্ঞানতৃপ্তা নির্ব্বাণগতমানসাঃ ॥

২ শান্তি ১৯৫

গচ্ছন্তি যোগিনোহ্যেবং নির্ব্বাণং তন্নিরাময়ং।

২২ শান্তি ১৯৫

অশ্বমেধ পর্ব্বে নির্ব্বাণ শব্দে নিরিন্ধন অগ্নির ধ্বংসাবস্থা প্রাপ্তির কথা লিখিত হইলেও তথায় পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া বিচার করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থই লব্ধ হয়—শূন্যে মিশিয়া যাওয়া অর্থ হয় না।

শনৈর্নির্ব্বাণমাপ্নোতি নিরিন্ধন ইবানলঃ। ১২
বিমুক্তঃ সর্ব্বসংস্কারৈস্ততো ব্রহ্মসনাতনং।
পরমাপ্নোতি সংশান্তমচলং নিত্যমক্ষরং ॥

১৪। ১৯ অধ্যায়

সুতরাং নির্ব্বাণ শব্দ দেখিয়াই গীতাকে বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতেছি না। এই শব্দটী ভগবান ব্যাসদেবের উদ্ভাবিত শব্দসম্পদের একটী। পরবর্ত্তীকালে তাহাই একক ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। তার পর বৌদ্ধগণ ইহা নিজের ধর্ম্মমতানুযায়ী অর্থে ব্যবহৃত করিয়া লইয়াছেন। এইরূপ হওয়াই অধিক সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে।

পাণিনি যেমন নির্ব্বাণ শব্দ নির্বাতে ব্যবহৃত করিয়াছেন, তেমনি ব্যাড়ি বুদ্ধ শব্দে জিন সুগত যোগী সর্ব্বজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি বুঝিয়াছেন।* এই ব্যাড়ির উল্লেখ পাণিনি করিয়াছেন। ইহার লক্ষশ্লোকাত্মক অভিধান ছিল, তাহা সকলই কালপ্রভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।† কেবল অভিধানের টীকাকারগণ তাঁহার বচনের উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে কতক জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে পাণিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৮০০।৯০০ বৎসরে প্রাদুর্ভূত হন, সুতরাং ব্যাড়ি তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। তাহার পূর্ব্বে জিন সুগত শব্দ জৈন ও বৌদ্ধ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইত। তখন মহাভারতে থাকিলেও হয় ত তাহারা নির্ব্বাণ শব্দ গ্রহণ করেন নাই। ইহা শাক্যসিংহের মৃত্যুর পর হইতে বৌদ্ধসমাজে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহারা দেব বা দেবভাবের অর্থজ্ঞাপক বিষয়ের মধ্যে যাইতে চাহিতেন না, এই কারণেই ব্রহ্ম শব্দটী উহার পূর্ব্ব হইতে বাদ দিয়া দিয়াছেন

ব্রহ্ম, শূন্য, কাল, নিরাকার বস্তু অথচ এই তিনটী অনুভবসিদ্ধ। আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন আমি সন্দিগ্ধ হইতে পারি না—তাহা যে ধ্রুব সত্য, ইহা আমি বেশ জানি। সেইরূপ ব্যষ্টি আমার অস্তিত্বের সহিত সমষ্টি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। আমি বলিলে যেমন শরীর অতিরিক্ত একটী অবিনশ্বর বস্তু বুঝায় যাহার পারিভাষিক নাম আত্মা। সেইরূপ এই সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের মহান্ আত্মার নাম পরমাত্মা। তিনিই ব্রহ্ম, সুতরাং আমার অস্তিত্বের সহিত ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে গত্যন্তর নাই।

উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে নীলবৎ প্রতীয়মান একটি বিশাল কটাহ দেখিতে পাই। কিন্তু ইহা যে কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। ইহাকে শূন্য, অনন্ত, আকাশ বলিয়া থাকে। সাংখ্য-শাস্ত্রের শব্দ-গুণ-ধর্ম্মী যে আকাশ তাহা এই অনন্ত আকাশের নিম্ন অংশ। এই অনন্ত শূন্যের রহস্য ভেদ করিতে পারি বা না পারি ইহা যে বর্ত্তমান তাহা বেশ অনুভব করিতেছি। গণিত-শাস্ত্র এই অনন্ত শূন্যের ব্যাপকতা কণামাত্র লোক-চক্ষুর

* অথ বুদ্ধোজিনো যোগী সর্ব্বজ্ঞ সুগতোবুধঃ।
† ব্যাড়ে সর্ব্বত্রাভিধানলোপঃ। শৌনকীয় প্রাতিশাখ্য

গোচর করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রকাশ করিবার স্পর্দ্ধা কেহ করিতে পারে না. সুতরাং ইহাকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত ধরিলেও কোন দোষ হয় না। কাল সম্বন্ধেও ইহাই প্রযুক্ত হইতে পারে। তাহার ক্ষুদ্র অংশ পল, দণ্ড, দিন। উহার বৃহৎ অংশ মাস, বৎসর, যুগ, কল্প ইত্যাদি। এগুলি যে দিন দিন গত হইয়া কালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান উৎপাদন করিয়া দিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যেই জীবের জন্ম-মৃত্যু হইতেছে, ইহার কুক্ষিতে কত বিগত জাতির উৎপত্তি ও ধ্বংস হইয়া কত নূতন জাতির জন্ম হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং কালও ব্রহ্মের একটী স্বরূপ, এই কারণে ভগবান নিজ শরীরে কালের নিরেট আকার আঁকিয়া দিয়া অর্জ্জুনের মোহ দূর করিয়াছিলেন। সাকার ভাবে কালকে ব্যক্ত করিতে হইলে, ব্যাসদেব তাহার যে আকার গীতায় অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাই যথার্থের প্রায় অনুরূপ। তাই ভগবানও স্বয়ং বলিয়াছেন যে তিনি "কাল"।

এখন বেদান্ত-দর্শনের যুক্তি-তর্কের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমার পূর্ব্ব মত দৃঢ় করিতেছি, যে ইহা ঋষিপ্রণীত নহে—ইহা ভ্রান্ত মানুষের রচনা ; সুতরাং ইহাতে যে একদেশ-দর্শিতা বর্ত্তমান থাকিবে তাহা অবশ্যম্ভাবী।

বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র * প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলিয়া বোধ হয় না, কারণ গ্রন্থের অভ্যন্তরে তাহা সমর্থিত হয় নাই। যদি জগতের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে স্বীকৃত হইল, তাহা হইলে তাহার বিবর্ত্ত ভাব কোথায় রহিল ?

তারপর পঞ্চম সূত্রে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি মনে মনে অভিধ্যান করিয়া জগৎ সৃজন করিয়াছে, এ মতটী বেদবহির্ভূত। † উহা ব্রহ্ম সম্বন্ধেই কথিত হইতে পারে। ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহা স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে স্বীকৃত হইয়াছে, কারণ তথায় মহর্ষি কপিলকে আদি জ্ঞানী বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য যে বহু পরবর্ত্তী রচনা তাহাও প্রমাণ সহিত পরে প্রদর্শন করিব। বেদান্তদর্শনকার কেবল ছান্দোগ্যের মতই অনুসরণ করিয়াছেন, অন্য উপনিষদের মতের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার গ্রন্থের একটি বিশিষ্টতা ; ইহাকে আমরা একদেশদর্শিতা বলিয়াই অভিহিত করিব।

ব্রহ্মসূত্রকার যদি জীবের অব্যাপকতা ও ব্রহ্মের ব্যাপকতা বর্ণনরূপ প্রথম অধ্যায় মাত্র লিখিতেন, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু তিনি সাংখ্য-যোগ প্রমুখ সকল মত খণ্ডন করিতে অগ্রসর হওয়ায় স্বীয় মতের দোষও অনেক প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রকার সাংখ্য দর্শনের মত খণ্ডনেই অধিক সূত্র রচিত করিয়াছেন। ভগবান ভাষ্যকারও সূত্রকারের এই ভাব সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন যে যেমন প্রধান মল্লের পরাজয় হইলে হীন মল্লগণ আপনা আপনি হীনপ্রভ হয়, সেইরূপ সাংখ্য-শাস্ত্রের খণ্ডনে অন্য শাস্ত্রীয় মতগুলিও স্বতঃ-নিরাকৃত হইবে। ব্রহ্মসূত্রের যুক্তিতর্ক সদসৎ হউক বা অকাট্য হউক বা না হউক ভগবান শঙ্কর তাহার যে বিশদ ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পক্ষ বিপক্ষ মত

* জন্মাদ্যস্য যতঃ। ২　　† ঈক্ষতের্নাশব্দং। ৫

উদ্ধৃত করিয়া অনেক স্থলে সুসিদ্ধান্তের মীমাংসা করিয়া সূত্রকারের মত স্থাপিত ও দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন। দুই এক স্থলে সূত্রকারকে বাঁচাইবার জন্য তিনি অন্য শাস্ত্রকারগণের প্রতি কিঞ্চিৎ অন্যায় করিয়াও গিয়াছেন। ভগবান কপিলই এই অন্যায়ের অধিক অংশভাগী হইয়াছেন। (ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

গম্ভীরায় সাহিত্য-সম্মিলন *

গম্ভীরার সংস্কার ও নামকরণ

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, গম্ভীরায় কেবল কুরুচির প্রশ্রয় ছিল, সামাজিক কুৎসার উৎস ছিল, বীভৎস ভাবভঙ্গীর বিলাসক্ষেত্র ছিল। এখন তৎস্থানে দেখিতেছি, ধর্ম্ম, সমাজ, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, কাব্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং জাতীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়াস ও আলোচনা। এই জাতীয় শিক্ষা-সম্মিলন দেশের পক্ষে বড়ই হিতকর, বড়ই আনন্দ-জনক, অজ্ঞ-সমাজের শিক্ষা-প্রস্রবণ এবং গানে ও প্রাণে সম্মিলন।

গানে ও প্রাণে সম্মিলন

প্রাণ গান একই কথা। গানে প্রাণে ভেদ ঘুচাইয়া সমস্ত স্বরভঙ্গ, সমস্ত তালচ্যুতি সাবধানে নিবারণ করিয়া এই বিশ্বব্যাপী মাধুর্য্য-চৈতন্যে ভাব ভাষায় পরিণত হয়। স্বরবিজ্ঞান ও ভাষা বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই একত্র স্থিত। ভাষা না হইলে ভাবনা হইতে পারে না। ভাবনা করিতে হইলে, ভাষার প্রয়োজন। জীবন থাকিলে ভাবিতেই হইবে।

ভাব ও ভাষা

ভাবনার বিনিময় না হইলে, জীবন নিরর্থক হইয়া পড়ে। আবার, ভাষা না হইলে ভাবনা অসম্ভব। সুতরাং ভাষা ও জীবন একই সত্তার দুইটী বিভিন্ন প্রান্তভাগ। ভাবে ভাষা গড়ে—সাধারণ ব্যক্তিগত প্রয়াসে তাহার পুষ্টি বা শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় না। ভাষার উন্নতি অর্থে, ভাবের উন্নতি। জাতীয় চৈতন্যে যেমন নূতন নূতন জটিলভাবের আবির্ভাব হয়, ভাষার গঠনগত জটিলতা বা সম্প্রসারণও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যে ভাষায় কোন একটি বিশিষ্ট ভাব সর্ব্বাপেক্ষা ভাল করিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে এবং সাধারণ-শিক্ষা (mass education) বিস্তার করিয়া জন্মভূমির সেবা করে, তাহা গ্রাম্য বা আত্ম-কৃত, যাবনিক বা বৈদেশিক এবং অসংস্কৃত শব্দ হইলেও, সে স্থলে তাহা অপেক্ষা সুষ্ঠু শব্দ কিছু হইতে পারে না। ভাষার উন্নতি-কল্পে বৈদেশিক জ্ঞানও কোন অপবিত্র উপাদান নহে। ভাষার উন্নতি প্রতিভার সহজ অধিকার। আপনাপন অস্তিত্বের পূর্ণোদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই, শব্দ বা ভাষার সৃষ্টি।

ভাষার উন্নতি না অবনতি ?

অনেকে বলিতে পারেন এবং না-যে বলিতেছেন এমনও নহে, যে, গম্ভীরার গানে যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাতে ভাষার উন্নতি না হইয়া বরং অবনতিই হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট

* বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে মালদহ গম্ভীরা-সমিতির প্রতিযোগিতা-পরীক্ষার পারিতোষিক বিতরণ সভায় পঠিত।

নিবেদন, তাঁহারা একটু তলাইয়া চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ। যেখানে স্বাভাবিকতার শান্তি থাকে না, সেইখানেই বিরোধ ঘটিয়া থাকে।

ভাষার উপাদান-সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং ভাষার পুষ্টি সাধন

মালদহের নিজস্ব গম্ভীরার মধ্য হইতেও মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যের কলেবর-পুষ্টির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। অতএব, পূর্ব্বে সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে শব্দ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। পরে, ভাবের পরিপুষ্টি সাধিত হইলেই, ভাষার উন্নতি হইবে। বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি, বাঙ্গালীর সভ্যতা ও বাঙ্গালীর আদর্শ প্রস্তুত করিবার একটি প্রধান উপায় মালদহের গম্ভীরা।

দুইটি মহৎ কার্য্য—মৃতকলার পুনরুদ্ধার ও পরিত্যক্ত ব্যক্তিগণকে উৎসাহ দান

বিজ্ঞ সমাজের এ সম্বন্ধে সহানুভূতি ও আগ্রহ প্রকাশের কার্য্যে, দুইটা মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। একটিতে বাঙ্গালার মৃত-কলা পুনর্জীবিত হইল, অন্যটীতে ত্যক্ত ও ব্যথিত লোকগুলি উৎসাহিত হইল।

বিজ্ঞে ও অজ্ঞে সম্বন্ধ স্থাপন

মানবের প্রকৃত মহত্ত্ব, সকলকে ছাড়িয়া নহে, সকলকে লইয়া। একটা সোপান-শ্রেণীর উপর দৃষ্টিপাত করিলেই এ কথা আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। সর্ব্বোচ্চ সোপান পরবর্ত্তী অপর সকল সোপান-শ্রেণীর ভিতর দিয়া সর্ব্ব নিম্ন সোপানের সহিত সংযুক্ত। নিম্নতর সোপানাবলী আছে বলিয়াই সর্ব্বোচ্চ সোপানের অস্তিত্ব। সুতরাং নিম্নতর সোপান পরম্পরই দৃঢ় হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বিজ্ঞের সহিত অজ্ঞের পার্থক্য এই যে, বিজ্ঞ সম্বন্ধ কোথায় শিখিয়াছেন, তিনি সর্ব্ব নিম্নতর জীবশ্রেণীর সহিত নিজ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। এই মহত্ত্ব তাঁহাকে কোথায় আকর্ষণ করিতেছে, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

জাতীয় চরিত্র গঠন ও জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি সাধন

আমাদের বর্ত্তমান সমাজ প্রাচ্য জাতীয় চরিত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ফলোদ্ভূত। প্লাবন সদৃশ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল নহে, পরন্তু, সমল ও মলিনতাপূর্ণ; এবং তাহার সেই সমলতা ও মলিনতাতেই ভবিষ্যতে ভূমির কাঠিন্য ও উর্ব্বরতার বীজ থাকে; তাই প্লাবনবেগ প্রশমিত হইলে, ভূমি কঠিন ও উর্ব্বরা হয়। আমাদের সমাজে এখন পরিবর্ত্তনের প্লাবন প্রবাহমান; এখন আমাদের সহস্র ত্রুটী ও ভ্রম কেবল অবশ্যম্ভাবী নহে পরন্তু আবশ্যক।—প্লাবনের সমল প্রবাহের বেগ ও বারিরাশি উভয়ই বহুকালস্থায়ী। যখন উচ্ছ্বসিত বারিরাশি ক্রমে বহিয়া যাইবে, তাহার বেগ প্রশমিত হইবে, তখনই আমাদের জাতীয় চরিত্রের গঠন হইবে—জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে, তখন তাহার কাঠিন্য ও উর্ব্বরতা আপনা হইতেই আসিবে। এ সম্বন্ধে জড়জগতে ও জাতীয়-জীবনে সাদৃশ্য বিস্ময়কর। দেশ যখন শিক্ষিত হইতে যায়, তখন এরূপ ভাবেই শিক্ষার ফলস্রোত নানা দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে।

গম্ভীরায় সাহিত্য কি—সাহিত্যের আবার সম্মিলন কি ?

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, গম্ভীরায় সাহিত্য-সম্মিলন কি ?—সে সাহিত্য বা কি ? —সাহিত্যের আবার সম্মিলন কি ? সাহিত্য আর কিছুই নহে। "সহিত"-শব্দ হইতে "সাহিত্য"-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ;—তাহার মূলার্থ "মিলন" ;—তাহা হইতেই ক্রমে প্রচলিত অর্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে কেবল কাব্যশাস্ত্রকেই সাহিত্য বলিত। বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যকে এক কথায় এরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, "মানব-সমাজের সর্ব্বপ্রকার আত্মোন্নতির শক্তি-সঞ্চারক জ্ঞান-ভাণ্ডার।" এই অর্থেই বর্ত্তমান যুগে "সাহিত্য"-শব্দ সর্ব্বত্র মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। "সাহিত্য"-শব্দেই সাহিত্যের শক্তিগ্রহ হইয়াছে। ইহাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান। তারপর ঐহিক ও পারলৌকিক তত্ত্বও ইহার অন্তর্গত। জীব-পরমাণু ও পরব্রহ্মে সম্বন্ধ-নির্ণয়ই সাহিত্যের মেরুদণ্ড। বাঙ্গলাভাষার প্রসিদ্ধ লেখক (শাসনকর্ত্তা বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না) মাননীয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সাহিত্যকে বেশ পরিস্ফুটরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"জ্ঞান অন্তরের বস্তু। ভাষা-গৃহীত তথ্যের প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞান,—ভাষার সাহায্যেই জ্ঞান জ্ঞাতার নিকটে পরিষ্কৃত ও স্পষ্টীভূত এবং অন্যের নিকট প্রতীত হয়। কিন্তু, ভাষা, স্থানে এবং কালে সীমাবদ্ধ। এই স্থান-কালের কঠোর নিগড় হইতে বিমুক্ত করিয়া ভাষাকে পৃথিবী পরিচ্ছিন্ন স্থানে এবং অপরিচ্ছিন্ন কালে পরিব্যাপ্ত করিবার যে "উপায়," তাহাই "সাহিত্য"। মোটকথা, "সাহিত্য" ভিন্ন কোন তত্ত্বই ব্যক্ত হইতে পারে না।

সাহিত্য-প্রচারের উদ্দেশ্য এবং গীত-রচয়িতৃগণের গম্ভীরায় সাহিত্য-প্রচার

সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই সাহিত্য-প্রচারের চেষ্টা দেখা যায়। কারণ, ভাবে ভাষা গড়ে। ভাবই আবার জ্ঞান-স্বরূপ। এই আর্য্যদেশে, আর্য্যশাস্ত্রই শ্লোক বিশেষের দ্বারা বলিয়াছেন যে. "এ সংসারে জ্ঞান লাভ করিয়া যে ব্যক্তি পরকে তাহা দান না করে, জ্ঞানস্বরূপ ভগবান তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না।" ইহাই সাহিত্য-প্রচারের সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য। এই প্রবর্ত্তনায় স্বভাব-কবি গম্ভীরার গীত-রচয়িতৃগণ সমাগত হইয়া গম্ভীরায় সাহিত্য প্রচার করিতেছেন।

জ্ঞান চর্চ্চাই জাতীয় জীবনের মূল

জাতীয় জ্ঞান জাতীয় সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। জ্ঞান-চর্চ্চাই জাতীয় জীবনের মূল। অতএব, সাহিত্য সেবার একান্ত প্রয়োজন।

গীতরচয়িতৃগণের মৌলিকতা ও পাণ্ডিত্য

স্বভাবকবি গম্ভীরার গীতরচয়িতৃগণকে প্রকৃত শিক্ষিত বা জ্ঞানী বলা যাইতে পারে। এ কথায় পণ্ডিত-সমাজ নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, সন্দেহ নাই—মানহানির মোকদ্দমাও আনিতে পারেন। কিন্তু, একটু ভাবিয়া দেখিবেন, তাঁহাদের সহিত এই অজ্ঞদের প্রভেদ কত—বিশেষত্ব কত।

বিজ্ঞ ও অজ্ঞের মধ্যে প্রভেদ ও বিশেষত্ব—শেখা-বিদ্যা ও অশেখা-বিদ্যা

জগতে সকলেই কবি, ভাব সকলেরই আছে। কিন্তু, যে সেই ভাব, ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে, তাহাকেই সুকবি বলে। প্রকৃত শিক্ষিত তাঁহাদিগকে বলা যায়, যাঁহারা জগতে কোন নূতন ভাব আনেন অর্থাৎ কিছু আবিষ্কার করেন। কিন্তু সেই আবিষ্কারকগণ জ্ঞানরাজ্যের "অশেখা-বিদ্যাকে" শেখা-বিদ্যার বাজারে আনিয়া যাচাই করেন মাত্র। যাচাই-কার্য্য আর কিছুই নহে, যাথার্থ্য-পরীক্ষা অর্থাৎ পাচাত্যবিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে বলে যাথার্থ্য-প্রতিপাদন (Verification)। অন্তরের কথা কি বাহির হইতে পাওয়া যাইতে পারে? তাহা যদি সম্ভবপর হইত, তবে, মনুষ্য আপনার অন্তর্নিহিত চৈতন্য পথে ঘাটে কুড়াইয়া পাইত। শেখা-বিদ্যার কার্য্য বাহিরে, আর, অশেখা-বিদ্যার কার্য্য অন্তরে। শেখা-বিদ্যার নিকটে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় স্ব স্ব ক্ষুদ্র অধিকারের গণ্ডীর মধ্যেই অবরুদ্ধ, পরন্তু সে সমস্তের মর্ম্মে মর্ম্মে পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ্য-বিনিময়ের যেরূপ নানামুখি পথ প্রমুক্ত রহিয়াছে, তাহার সন্ধান খুঁজিয়া পাওয়া অশেখা-বিদ্যারই কাজ—মূল জ্ঞানেরই কাজ।

পণ্ডিত ও জ্ঞানীতে প্রভেদ

পণ্ডিত বিদ্যা আত্মস্থ করেন, জ্ঞানী বিদ্যা প্রচার করেন। বিদ্যা এবং জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর; প্রভেদটির গুরুত্বও অধিক এবং দুই বিভিন্ন পথের ঠিকানা নির্দ্দেশ করাও কঠিন। যাঁহারা বিদ্যা-ধনে ধনী, তাঁহাদিগকে বলে সুপণ্ডিত, যাঁহারা জ্ঞান-রত্নের খনি, তাঁহাদিগকে বলে পরমজ্ঞানী।

জ্ঞান, বিদ্যার বিশ্লেষিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মহাযোগের কিরূপ অপূর্ব্ব বন্ধন আঁটিয়া দেয় তাহার সন্ধান

একটু ভাবিয়া দেখিলে, বোধ হয়, বিদ্যার পথ সকলেরই নিকট সুপরিচিত-জ্ঞানের পথ অনেকের নিকট হয়তো অপরিচিত। মূল কথা, জ্ঞান নিভৃতান্তরে কার্য্য করিয়া বিদ্যার বিশ্লেষিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মহাযোগের কিরূপ অপূর্ব্ব বন্ধন আঁটিয়া দেয়, তাহার সন্ধান করা পণ্ডিত মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তাই আজ পণ্ডিত-সমাজ, অশেখা-বিদ্যার সাধক স্বভাবকবিদিগকে কি ভাবে নিভৃতান্তরে কার্য্য করিয়া বিদ্যার বিশ্লেষিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মহাযোগের কিরূপ অপূর্ব্ব বন্ধন আঁটিয়া দিয়াছেন তাহার সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক, মনুষ্যের গভীর ভাবস্রোতের অভ্যন্তরে ভাবনা-শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এইরূপ, নিরক্ষর ব্যক্তিদের এরূপ কার্য্য কি বিস্ময়কর নহে?

বিনা ভাব প্রদানে ভাষা-সৃষ্টি

বিনয় না ভাব প্রদান করিলেও, সেই ভাব আয়ত্ত করিয়া তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কি কম শক্তি সামর্থ্যের কথা! এ ক্ষেত্রে তাহাও করা হয় নাই। ভাষা, ভাব ও প্রতিভার সহজ অধিকার। এইখানেই বিজ্ঞ-সমাজের সহিত এই অজ্ঞসমাজের পার্থক্য ও বিশেষত্ব। অতএব, ইহাদিগকে উৎসাহিত করা কি ন্যায় ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বিজ্ঞসমাজের কর্ত্তব্য নহে?

উদ্যোগকর্ত্তৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান

অতঃপর, গম্ভীরার এই নবরূপ-পরিগ্রহের প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা মহাশয়দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হইতেছি।

সমালোচকগণের সমালোচনা

বর্ত্তমান সময়ে, আমাদের দেশে উচ্চাভিলাষের স্থান বিদ্বেষ-বুদ্ধি অধিকার করিয়াছে—অসূয়ার প্রতিপত্তিই বেশী দেখা যাইতেছে। বাক্‌প্রগল্‌ভ সমালোচক ও কর্ম্মহীন প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুর সংখ্যা বড় বেশী—তাঁহারা কেবল নিশ্চলভাবে বসিয়া জাবর কাটিতেই বেশী ভালবাসেন।

উদ্যোগকর্ত্তার প্রতি নিবেদন

তাই, উদ্যোগকর্ত্তাদিগের প্রতি আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যেন জগতের অবজ্ঞা-টিট্‌কারীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিজ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত না হন। কারণ, কর্ম্মের উদ্দেশ্য কেবল উপস্থিত একটা কোন ফললাভ নহে। নিজের শক্তিকে খাটাইবার জন্যও কর্ম্মের প্রয়োজন। কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত সুযোগটী পাইলেই এই শক্তি নানা আশ্চর্য্য ও অভাবনীয়রূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। কর্ম্মী যদি যথার্থ বলিষ্ঠমনা ব্যক্তির ন্যায় কথায় ও ব্যবহারে, চিন্তায় ও প্রকাশে পরিমাণ রক্ষা করিয়া না চলিতে পারে, তবে, সে কর্ম্মের চেষ্টায় ফললাভ না হইয়া বারম্বার বিধ্বস্ত হইতে থাকে। এইরূপ কর্ম্মফল-আশাই দুরাশা বা নিরাশা-নামে অভিহিত হয়। আমরা আশা করি, উদ্যোগকর্ত্তাগণ বিশ্বপ্রেমিক কবির এই জীবন্ত আত্ম-প্রসার-বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ থাকিবেন।

"আপনারে ল'য়ে বিব্রত থাকিতে.
আসে নাই কেহ অবনী' পরে!
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে!"

সমালোচকগণের সান্ত্বনা

জগতে প্রায়ই কেহ অর্থ ব্যয় করিয়া প্রতিষ্ঠা ক্রয় করিতে চায় না, ইহাই বিচার করিয়া, সমালোচকগণ মনে সান্ত্বনা আনিতে পারেন।—আর যদি তাহাই হয়, তাহাতে যদি দেশের উপকার হয়, তাহাতেই বা দোষ কি? জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি "ক্রমোন্নতি" কর্ম্মের উদ্দেশ্য মনে করিয়া কর্ত্তব্যবোধে স্ব স্ব কার্য্য করিতে থাকেন, তবে, প্রত্যেকেরই আত্মোন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং কার্য্য-বিশেষে কর্ম্ম-ফলের জন্য ভীতি-বিহ্বলতা, বাধ্য-বাধকতা এমন কি প্রতিহিংসাও জন্মায় না। কর্ম্ম নিত্য, কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী—কার্য্যের প্রতিক্রিয়া সুনিশ্চয়। অতএব, যতই কার্য্য করা যায়, ততই আত্মোন্নতি সাধিত হয়—কিছুই বিফল হয় না।

শ্রীনলিনীকান্ত বসু।

চট্টল মহিমা *

আর্য্যগণ যখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতের পশ্চিম অঞ্চল নানা কারণে উত্তরোত্তর তাঁহাদের বাসের অনুপযোগী হইয়া উঠিতেছে, তথা হইতে তাঁহাদিগকে অবশ্যই সরিয়া পড়িতে হইবে, তখন খুঁজিয়া দেখিলেন ভারতের মত স্থান আর নাই, ভারতই তাঁহাদের সেই মহীয়সী ক্ষমতার সম্পূর্ণ পরিচালনা ও উৎকর্ষ-সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র;

* চট্টগ্রাম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত প্রবন্ধের এক অংশ।

এই মনে করিয়া আর্য্যগণ ভারতে পদার্পণ করেন। আর্য্যগণ ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী ভারত-ভূমি এতদুভয়ের যোগ্য সম্মিলনে উভয়েরই মঙ্গল হইল, ভারত ধন্য হইল, আর আর্য্যগণ জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য কি শারীরিক কি মানসিক কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়ে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইতে পারিলেন।

আর্য্যগণ প্রথমতঃ পশ্চিমভারতে উপনিবিষ্ট হইয়া ক্রমে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত বসতি বিস্তার করেন। বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অন্য কারণ পরম্পরা মিলিত হইয়া কালে তাঁহাদিগকে সপ্তগ্রাম হইতেও সরিয়া পড়িতে বাধ্য করিল, বাসোপ-যোগী স্থানান্বেষণে তৎপর হইয়া বহুদর্শী আর্য্যগণ দেখিলেন "চট্টল" রমণীয় স্থান, সর্ব্ববিধ সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র, তাহাই তাঁহাদের আশ্রয়ণীয়। এই স্থির হইলে তাঁহাদের কেহ কেহ সপ্তগ্রাম হইতে চট্টলে আসিয়া বসতি করিতে লাগিলেন।

আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে চট্টলে কেবল পার্ব্বত্যজাতির বাস ছিল। ইহাদের আকার-প্রকার, আচার-ব্যবহার, ভাব-ভাষা ইত্যাদি সমস্তই আর্য্যগণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজেই উহারা নবাগত আর্য্যগণের পরিচয় প্রার্থনা করিল এবং প্রত্যুত্তরে বুঝিল যে, এই নবাগত ব্যক্তিদিগের বাসস্থান সপ্তগ্রাম। পার্ব্বত্যগণ প্রায় সম্যক্ উচ্চারণে অপটু, "স" স্থলে "ছ", "ছ" স্থলে "চ" এইরূপ উচ্চারণ তাঁহাদের স্বাভাবিক। এইরূপ উচ্চারণ-বৈকল্যবশতঃ "সপ্তগ্রাম" স্থলে "চট্টগ্রাম" উচ্চারণ অসম্ভব নহে। তখন হইতেই উহাদের মুখে মুখে ইহাদের নিবাস "চট্টগ্রাম" ক্রমে সর্ব্বত্র এইরূপ প্রখ্যাত হওয়াতে—আর্য্যগণের বসতি-স্থান এক্ষণে "চট্টল" হইলেও তাহা "চট্টগ্রাম" নাম ধারণ করিয়াছে। চট্টলের অধিবাসীবৃন্দের সাম্প্রদায়িক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও এই অনুমান সিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়। যে অল্পসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর লোক ব্যবসায়ের জন্য সর্ব্বপ্রথমে চট্টলে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়, তাহারা এক্ষণে "রোসাঙ্গ্যা" অর্থাৎ রোসাঙ্-দেশীয় বলিয়া অভিহিত। তাহাদের সহিত অন্য কোন সম্প্রদায়ের অদ্যাবধি কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। প্রবাদ আছে চট্টলের দক্ষিণাংশে "রোসাঙ্" নামে যে এক জনপদ আছে, তাহা পূর্ব্বে মগরাজের রাজধানী ছিল। রোসাঙ্গের সন্নিহিত "হারভাঙ্" নামক স্থানে রাজকীয় প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। মগরাজের নাম "হারমাদ"। কোনরূপ অন্যায় দেখিলে এতদ্দেশে লোকে এখনও কথায় বলে একি "হারমাদের রাজ্য"? রোসাঙ্ অঞ্চলে এখন মগদিগের বাস। বোধ হয়, রোসাঙ্ অধিপতি মগরাজের রাজ্যে বাস কারণ বলিয়া রোসাঙ্গদিগকে এখনও সাম্প্রদায়িকভাবে একটু দূরে রহিতে হইয়াছে। আর যাহারা ত্রিপুরা, কুমিল্লা প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়াছিল এখানকার ঔপনিবেশিক পশ্চিমদেশীয় আর্য্যগণের কল্পনায় উহাদের নাম হইল বঙ্গদেশী বা বংদেশী। যাহারা সন্দ্বীপ হইতে আগত তাহারা সন্দ্বীপী, এবং যাহারা কৃষ্ণনগর হইতে আগত তাহারা কৃষ্ণনগরী। চট্টগ্রামে এ সকল সম্প্রদায় অল্পমাত্র, আর সমস্ত চট্টগ্রামী। এই কয়টী সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক সীমাতেই আবদ্ধ।

ফলতঃ এইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সপ্তগ্রামের আর্য্যেরাই চট্টলের শুভদিনের অরুণোদয়ে এদেশে সমাগত। তাঁহাদের

বসতিস্থান সপ্তগ্রামের নামেই পৌরাণিক চট্টলের নাম চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রামের পৌরাণিক নাম সম্বন্ধে যোগিনী তন্ত্র—

চন্দ্রশেখরমারভ্য পঞ্চাশদ্যোজনাবধি।
বহিঃ ক্ষেত্রমিদং পুণ্যং দেবানামপি দুর্লভম্।
সার্দ্ধত্রিকোটি দেবানাং বসতিশ্চট্টলে শুভে॥

বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকেন চট্টগ্রাম, "চৈত্য" অর্থাৎ ধর্ম্মস্থান, তাহার গ্রাম এই অর্থ লইয়া চট্টগ্রামের নাম "চৈত্যগ্রাম" ছিল। এই চৈত্যগ্রাম শব্দের অপভ্রংশেই এইক্ষণে চট্টগ্রাম হইয়াছে।

চট্টল জননীর বিভিন্ন অঙ্গে জগদারাধ্য রাম-সীতার পাদচারণ-চিহ্নের যে বহুতর পুণ্য নিদর্শন উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়া অদ্যাবধি শত শত ধার্ম্মিক হিন্দুকে ভক্তির আকর্ষণে দূরদূরান্তর হইতে নিরন্তর লইয়া আসিতেছে; তন্মধ্যে যেমন সীতাকুণ্ড, রামকোট, সীতাঘাট, সীতাপাহাড়; তেমন চট্টগ্রাম সহরের সন্নিহিত কর্ণফুলিনদীর অংশবিশেষ "সীতাগঙ্গা" অন্যতম। সীতাগঙ্গা একদিকে যেমন হিন্দুদিগের তীর্থ, অন্যদিকে তেমন বণিক-সম্প্রদায়ের আশ্রয়, এক বন্দর। বোম্বে, মাদ্রাজ, বিলাত প্রভৃতি বহুদেশীয় জাহাজ-ষ্টিমার-নৌকাদির অবলম্বন। বলা বাহুল্য, কাজেই দেশীয় বিদেশীয় সকলের নিকট "সীতাগঙ্গা" বিশেষভাবে পরিচিত, এজন্য সীতাগঙ্গার নামেই তাহার ক্রোড়স্থিত চট্টগ্রাম সহরের নাম বৈদেশিক ভাষায় সীতা (চিটা) গঙ্গা (গাঁঙ) অর্থাৎ চিটাগাঙ্ (Chitagong) হওয়া অনেকেরই অনুমান-সিদ্ধ।

চট্টগ্রামের আর এক নাম "চাটিগাঁ"। ইহা যাবনিক শব্দ। কিংবদন্তী আছে, চট্টগ্রামের আদিম অবস্থায় সমাকীর্ণ বন-জঙ্গল হইতে পার্ব্বত্য জাতিরা নিরন্তর গ্রামবাসীর উপর নানাবিধ উৎপাত করিত। একদা একখানা জলমগ্ন জাহাজ হইতে দিব্য-কান্তি এক মহা-পুরুষ কাষ্টফলক অবলম্বন করিয়া তীরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার হাতে একটি বৃহৎ "চাটি" অর্থাৎ দীপ ছিল। চাটিটী, তিনি যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সেই খানেই রাখিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের মহিমামণ্ডিত আকৃতি সেই অত্যুজ্জ্বল বিশাল দীপালোকে অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া তথাকার দস্যুগণের ভীতি উৎপাদন করিল। তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন করিল, তখন হইতে গ্রামবাসীরা নিরুপদ্রবে বাস করিতে লাগিল। এই উপক্রমেই গ্রামের পত্তন হইল বলিয়া এই গ্রামের বা দেশের নাম "চাটিগ্রাম" (চাটিগাঁ)।

এই মহাপুরুষের নাম বদর সাহেব, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়া গেল অদ্যাবধি চট্টগ্রামবাসী হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, সকলেরই হৃদয়ে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার স্রোত অব্যাহত। চট্টগ্রাম সহরে তাঁহার সমাধি "বদর সাহেবের পাতি" নামে এক প্রসিদ্ধ স্থানে আছে। তথায় প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোকে চাটি (মোমবাতি ইত্যাদির আলো) প্রদান করিয়া সেই চাটির স্মৃতি রক্ষা পূর্ব্বক তাহার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি-প্রীতির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

চট্টগ্রামে বাজিদ বোস্তামি, সাহামাদার, সাহাপীর প্রমুখ বারজন বিখ্যাত মুসলমান ফকির বাস করিতেন। এজন্য চট্টগ্রামের নাম ছিল "বার আউলিয়া"। ইসলাম খাঁর আধিপত্যকালে "ইসলামাবাদ", বৌদ্ধপ্রভাব-কালে "রম্যভূমি", পর্ত্তুগীজদের সময়

"পোর্টগ্রেণ্ডো" এই কয়েকটি নামও এক এক সময় বিভিন্ন কারণে উৎপন্ন হইয়া চট্টল-জননীকে এইরূপে বিভিন্ন নামে পরিচিত করিয়াছে। যে কয়টী নামের উল্লেখ করা হইল; সমস্তই চট্টগ্রামের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

স্থানের ও কালের অনুরূপ অবস্থা-সংঘটন স্বভাবিক। পুণ্যতীর্থে উপস্থিত হইলে সজ্জনের সাধুভাব, রণভূমিতে উপস্থিত হইলে বীরজনের বিক্রম, ও বিলাসভবনে উপস্থিত হইলে বিলাসী জনের বিলাস-বাসনা আপনা হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। উদ্বেজিত আর্য্যগণ চট্টলে আসিয়া প্রথমতঃ কিয়দ্দিন আপন দুঃখদারিদ্র্যের ভিতরে নীরবে লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু চট্টল তাঁহাদিগকে দীর্ঘকাল এইভাবে থাকিতে দিল না। ক্রমে চট্টলের মহিমা তাঁহাদের অনুভবে আসিল।

চট্টলের মহিমা স্বপ্রকাশ ও অনির্ব্বচনীয়। পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে সন্দীপ, উত্তরে ফেণিনদী ও দক্ষিণে বঙ্গসাগর-সম্মিলিত নাফ নদী, এই ভূভাগ চট্টল, প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র। পুণ্যতোয়া, কত নদ-নদী, জল-অনলের অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়াময় কত হ্রদ, উৎস, নির্ঝরিণী, জলপ্রপাত, অথচ স্তরে স্তরে সীমান্ত-বিসারী মেঘমালার ন্যায় গগন-বিলেপী শৈলশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে বিবিধ তরু, লতা, গুল্মাদি পরিবৃত। অনাবৃত কিংবা শস্য-শ্যামল সমতল, বিলাস প্রান্তর এবং কত বন-উপবন কুঞ্জ অঙ্গে ধারণ করিয়া জননী যেন মূর্ত্তিমতী মহাশক্তিরূপে বিশ্বকে আপন বিশ্বরূপ দেখাইয়া বিস্ময়াপন্ন করিয়া তুলিতেছে।

এইরূপে শৈল-সাগরের সম্মিলন, এক সঙ্গে জল-অনলের ক্রীড়া ও বিচিত্র জলস্থলের সমন্বয়ে প্রকৃতির এইরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য চট্টগ্রাম ভিন্ন আর কোথায়ও নাই।

আবার চট্টল-জননীর আকার-প্রকার দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আলু-লায়িত কেশপাশের ন্যায় অনন্ত কোটি তীর্থ বিস্তার করিয়া উত্তরে ও দক্ষিণে মহাতীর্থ চন্দ্রশেখর ও আদিনাথ দুইটী গিরি যেন চট্টল-জননীর দুইটী মস্তক। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের কত তীর্থ চট্টল-জননীর অঙ্গে অত্যুজ্জ্বল আভরণরূপে নিরন্তর শোভা পাইতেছে। কাঁইবা ও শঙ্খ এই নদী দুইটী মায়ের অমৃতোপম স্তন্যের অফুরন্ত দুইটী ধারা, সমস্ত চট্টল-সন্তানকে পরিতৃপ্ত করিয়া জননীর আসন পর্য্যন্ত সিক্ত করিয়া পরিশেষে সাগরে যাইয়া মিশিতেছে।

সম্মুখে অনন্ত নীলাকাশের নীচে বঙ্গ-সাগরের দিগন্তবিসারী নীলাম্বুরাশি। তাহার তীরে জননী সমাসীনা।

অহর্নিশ সাগরবক্ষে শৈলশৃঙ্গোপম যে উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত হইতেছে, জননী তাহা অঙ্গে বিলীন করিয়া জগজ্জনকে ইঙ্গিতে জানাইতেছেন, আইস আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। তবে তোমাদেরও এইরূপে প্রকৃতিতে লয় হইবে। আর জরামৃত্যুজনিত ক্লেশ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। হিন্দুর শাস্ত্রে বলে "চন্দ্রশেখরমারুহ্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" জননীর এই দৃশ্য বড়ই গম্ভীর, বড়ই আধ্যাত্মিক। দেখ, আবার আর এক দৃশ্য কেমন রমণীয়! সাগর বক্ষ দিয়া ছোট-বড় কত বাণিজ্যতরী, বাষ্পীয়পোত, অর্ণব-যান, বার্ত্তাবহ বিহঙ্গের ন্যায় পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক জননীর বার্ত্তা লইয়া নিরন্তর দিগদিগন্তে উড়িয়া ছুটিতেছে।

মায়ের এ সকল অদ্ভুত মহিমা অবলোকন করিয়া স্বয়ং বারিধিপতি তাহার মহিমান্বিত পদপ্রান্তে (মেহিশখালীর মুখে) ভক্তির সহিত

তরঙ্গে তরঙ্গে অজস্র শঙ্খ, শুক্তি, প্রবালাদি রত্নপুষ্পের অঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। এই আর একটী অতুল মাহাত্ম্য-পূর্ণ দৃশ্য।

চট্টলের সর্ব্বত্র এই উদ্দীপনাময় মহিমা অনুভব করিয়া অভ্যাগত আর্য্যগণের মন-প্রাণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অচিরে সাগর, প্রান্তর, শৈলশৃঙ্গ কাঁপাইয়া তাঁহাদের সাধনের বাতাস বহিতে লাগিল। চিরকালের ঘনঘটা কাটিয়া গেল, চট্টল-আকাশে পূর্ণ আলোক দেখা দিল। চট্টলের মহিমা আরও উজ্জলতর হইয়া উঠিল। এক্ষণেই চট্টলে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য-চেষ্টার পূর্ণ আরম্ভ। বস্তুতঃ চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে যেমন অতুলনীয়, তেমনই কি আধ্যাত্মিকতা, কি শিল্পবাণিজ্য কি সাহিত্য কবিতা কোন বিষয়ে কখনও হীন নহে। পরে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করিব, এক্ষণে কিঞ্চিৎ কবিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

চট্টগ্রাম কবিতার দেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানে শিক্ষিত হইতে নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্ত, অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে অত্যল্প-বয়স্ক বালক-বালিকা পর্য্যন্ত, উত্তম ভদ্রসমাজ হইতে নীচশ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত এবং চট্টগ্রামের আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সকলেরই মুখে চিরদিন দেশ-কালপাত্রভেদে বিভিন্ন প্রকার কবিতার পরিচয় পাই।

প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে দুর্গা-জাগরণের কবি মাধবাচার্য্য এবং বাইশ কবি ও ষটুকবি মনসা-মঙ্গল কাব্যের অনেক কবি চট্টগ্রামের। বাইশ কবির অন্যতম অকিঞ্চন দাস, বিদ্যা-পতি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস গুণাকরের ৮ম পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী, ইঁহার নিবাস পটীয়ার অন্তর্গত কেলিসহর।

শ্রীকর নন্দী—পরাগলি মহাভারতের অনু-বাদেই ইঁহার কবিত্বের পরিচয়। শ্রীকরের নিবাস পটিয়ার সন্নিহিত জঙ্গলখাইন গ্রামে। এই গ্রামে দুইটী প্রাচীন জলাশয় শ্রীকরের কীর্ত্তি রক্ষা করিতেছে। 'রাজস্থানের' কবি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী শ্রীকরের বংশধর, সেই গ্রামেরই অধিবাসী।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই দেশের আরও দুইজন কবি সম্বন্ধে পাওয়া যায়—

ভবাণী শঙ্কর দাস, তুনহরা গ্রামে বাস
লিখে চণ্ডীকাব্য জাগরণ।
সুকবি গোবিন্দ দাস, দেবগ্রামে ছিল বাস
কালিকামঙ্গল বিরচণ।

তুনহরা পটিয়ায়। দেবগ্রাম বর্ত্তমান নামে আনোয়ারা, পটিয়া হইতে ৮ মাইল দূরে।

হিন্দুদের মত মুসলমানদিগের মধ্যেও চট্টগ্রামে অনেক প্রাচীন কবির কবিতা দেখিতে পাই। তন্মধ্যে অধিকাংশ বৈষ্ণব কবি, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

পদ্মাবতী কাব্য ও তাহার কবি আলোয়াল সকলের নিকট পরিচিত। ইঁহার নিবাস হাটহাজির অন্তর্গত ফতেপুর নামক গ্রামে। তথাকার আলোয়ালের দীঘি আরো বহুপরেও তাহার সাক্ষ্য দিবে।

ইঁহারা সকলেই প্রাচীন; নবীনচন্দ্র সেন সেদিনকার লোক। তাঁহার পরিচয় এক্ষণে বাহুল্য মাত্র। তিনি রাউজানের অন্তর্গত নয়াপাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই ত গেল উচ্চশ্রেণীর কাব্য ও কবির কথা। প্রাচীনকাল হইতে অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মুখে চট্টগ্রামে যেরূপ কবিতার বিকাশ হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ভট্টমুখে—চন্দ্রশেখর বর্ণনায় স্বভাবোক্তি—

১। দেখিলাম আদিধাম আদিধাম চট্টগ্রাম
পুণ্যময় দেশ
চন্দ্রশেখর পর্ব্বতপর পার্ব্বতী মহেশ্বর।
যাইতে দরশনে দরশনে স্থানে স্থানে
পুণ্যতীর্থ সব
উত্তরে লবণাখ্য দক্ষিণে বাড়ব। ইত্যাদি

মুসলমান ফকিরের মুখে হকিয়ত—

২। কে তোরে পাঠাল ভবের মাঝে ও
মস্থুরা ভাইরে,
ও মন মনাইরে শুদ্ধ ভাবে উজু কর,
নিবিজির কলমা পড়,
কোরান লামাই কর তেলায়ত।
ইত্যাদি।

৩। মিছা দুনিয়ার পীরিত ছাড়
কাল থাকিতে চেষ্টা কর।
সঙ্কটে তরিতে চাও গুরু কর ভাবনা।
আধার মণ্ডপঘরে, যখন সপিব তোরে,
ভাই বন্ধু আসবে ঘরে ফিরি আর ত
দেখবে না। ইত্যাদি।

৪। জন্মেছি ভবের মাঝে চিন্তায় চিন্তায়
দিন যায়,
হেলায় দিন ঘুমাইলুম, মুর্শিদ না
চিনিলুম,
পাছে হবে কোন গতি ও ভবের মাঝে,
মাটির কায়া মাটিতে যাবে
পুড়িবে হবে ছাই
শকুনে শৃগালে বেড়িয়ে খাবে
এ জীবের ভরসা নাই। ইত্যাদি।

বিরহিণীর মুখে—

৫। উধব উধব প্রাণের উধব
চিত্তে দিলা জ্বালা।
হেলায় ছাড়িয়া গেল চিকনিয়া কালা।
মথুরার পুরী খানি মোর কাছে বিষ
কুবুজা হয়েছে মোর কুলিশ সদৃশ।

মাতৃহীন বালকের মুখে—

৬। ছোটকালে মা মরিগেল্
বাপে কৈল্ল বিয়া,
পোড়েরে পোড়েরে চিত্ত
তুষের আগুন দিয়া। ইত্যাদি।

দুঃখিনী বালিকার মুখে—

৭। ইচা বুড়া মা বাপরে চাণ্ডালিকা ভাই
ধনের লোভে বিয়া দিল
বুড়া জামাই চাই। ইত্যাদি।

গোরক্ষকের মুখে খেলার কবিতা—

৮। ক্ষুধারে ক্ষুধা কিরে ভাই সুধা,
দুধ কাা না দিলি বাঘের ডরে
বাঘে কি বলে মারে ধরে। ইত্যাদি

চাষাদের মুখে হাল্যা "সাইর"—

৯। জোয়ারে ভরিল চানখালির আগা
ফিরি ফিরি চায় আইয়েরনি দাদা।
ইত্যাদি

হাড়ি বাদ্যকরদের মুখে চৈত্র সংক্রান্তিতে
ঢাক বাজাইবার সময় "মুদ্রা"—

১০। আদ্য শঙ্খ অনাদির বর,
তাতে শঙ্খ নিজ ঘর,
শঙ্খের নাম শ্রীহরি
আনে শঙ্খ ডিঙ্গা ভরি। ইত্যাদি—

১১। মরিগো তরাসে সখি মরিগো তরাসে,
টলমল করে নৌকা লিল্লুর্গ্যা বাতাসে।
কি আনন্দময়রে সখি কি আনন্দময়,
নন্দ যশোদার ঘরে কি চাঁদের উদয়।
দেবজানি দেব হর
দেব পুরন্দর। ইত্যাদি

মুসলমানের বিবাহে মুসলমান-রমণীদের
মুখে "হয়লা"—

১২। দরিয়ার কুলেরে নদীয়ার কুলেরে,
পোগন রাজার জল টঙ্গি মুই বাঁধাছিরে
ইত্যাদি

ঘুম পাড়ানি—

১৩। নিদ্রা আসি মাউরে মোর বাড়ী যাইও,
ডালা ভরি চুরা দিব গাল ভরি খাইও।

প্রবাদ বাক্য—

১৪। আকাড়া চাউলের মধ্যের দোকান।

১৫। ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচে।

১৬। যেখানে বাঘের ভয় সেইখানে রাইত হয়।

১৭। নাচতে না জানিলে উঠান বেকা।

১৮। মা গুণে পোয়া ভুঁই গুণে রোয়া।

রাধুনী বউকে উপহাস ছলে নিন্দা—

১৯। এক পাতিলা নারিব শাক সাত পাতিলা পানি।
বাপে পুতে যুক্তি করি পাইয়াছে রাঁধণী

নীতি বিষয়ক—

২০। খাটের না ভাটে বলে,
ধর্ম্মের ঢোল বাঁয়ে বাজে।

ধাঁধা (বুড়ন)—

২১। মাতৃগর্ভে মরি যেবা লভিল জীবন।
তাহার জনক-পিতা রক্ষক সেজন।
তাহার বাহন পিতা যার রথে স্থিত।
তার সুতে আনি মোরে ভ্রমায় নিশ্চিত।

২২। মুসলমানদের মুখে সত্যপীরের গান (সংকীর্ত্তন)।
ও পীর সত্য সত্য,
সত্যপীরের বাওটা নামিল্ দুনিয়ার ভিতর।
মাণিকপীর উঠি বলে সত্যপীর ভাই
মরিয়াছে গোপের গো জিয়াইতে যাই
গোপে বলে আছে দুধ গোপী বলে নাই।
বাথানে মরিল তাহার বাছুর শুদ্ধ গাই।
ইত্যাদি।

শ্রীরজনীকান্ত কাব্যতীর্থ
সম্পাদক, চট্টল-ধর্ম্ম-মণ্ডলী।

রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি *—যে সে ভগীরথ "ত্রিভুবনতারিণী বিমলতরঙ্গা", "দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গা"র আবাহন গাহিতে পারেন না। ব্রহ্মশাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত সগরের বংশ উদ্ধার করিতে হইলে যে সে সাধনায় ব্রতী হইলে চলিবে না। রবীন্দ্রনাথ ভারতের বীণাপাণিকে তুচ্ছ সরঞ্জামে পূজা করেন নাই। ইউরোপের মোহান্ধ মানব-জাতিকে ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য ভারতবাসীর যে ষোড়শোপচারে বাগ্‌দেবীকে আরাধনা করা আবশ্যক, রবীন্দ্রনাথ নানা ছন্দে নানা কণ্ঠে তাহা করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্য বৈষ্ণবের ভক্তিযোগ

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসেবার মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন :—"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম, ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।" রবীন্দ্রনাথও ভারতের সনাতনী বাগ্‌দেবতাকে সেই মন্ত্রেই আজীবন পূজা করিয়াছেন। ভারতবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে আজ সেই মন্ত্র বিরাজ করিতেছে—

* আলোচনা-অধ্যায় 'ছ'-পৃষ্ঠা।

"তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো॥"

আর একজন কবির মাতৃভক্তিও দেখ—"আমি মা তোর পোষা পাখী, যা শিখাস্ মা তাই শিখি, শিখায়েছিস 'তারা' বুলি, তাই ডাকি মা তারা তারা"। মাতৃভক্ত ভারত-সন্তান, তুমি রবীন্দ্রনাথের নিকট যে মন্ত্র পাইয়াছ তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু এই যুগেই চাহ কি?

"তব গৌরবে সকল গর্ব্ব
লাজে যেন সদা লাজে গো।
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো॥"

ভক্তি শিক্ষার জন্য, নিজ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবার জন্য, "স্বদেশের ধূলি"কে "স্বর্ণরেণু" মনে করিবার জন্য আর কোন উপদেশের আবশ্যকতা আছে কি? কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদ মাটি ছুঁইয়া বলিতেন—"এ ত ধূলা নয়, হরির পদরজ।"

শ্রীচৈতন্যময় বঙ্গদেশে, ভক্তিপ্লাবিত ভারতবর্ষে—তুকারাম-কবীর-নানক-জয়দেবের আবির্ভাব-পূত হিন্দুস্থানে আধুনিক বাঙ্গালী কবির ভক্তিপ্রবণতা দেখিলে। আমাদের চণ্ডীদাসই না আত্মভুলান তন্ময়তার গান গাহিয়াছিলেন?—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে,　　জনমে জনমে
প্রাণ-নাথ হৈও তুমি॥
বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি,　　তোমাকে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ　　তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী　　হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥"

ইংরাজীশিক্ষিত ভারতবাসীকে আত্মত্যাগ, সর্ব্বত্যাগ, দেহত্যাগ, "লাজ-মান-ভয়"-ত্যাগ, জীবন-যৌবন-ত্যাগ, কাম-কাঞ্চন-কীর্ত্তি-ত্যাগ শিক্ষা দিবার জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবীয় ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান নাই কি? একজন নূতন কবি তন্ময়ের গান গাহিয়াছেন—

কি আরাম ও গো তায়
সব সুখ দুখ পড়িছে লুটিয়া
একটি ভাবের পায়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই তন্ময়তার, এই বৈষ্ণবীয় ভক্তির অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। আধুনিক বঙ্গভাষায়—আজকালকার নূতন ছন্দে, নূতন শব্দসম্পদে—বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের আত্মত্যাগী প্রেম, ঘরবাড়ী-ছাড়ান এবং জীবন-বিসর্জ্জন-করান তন্ময়তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের প্রাণ, এ কথা বলিলে কোন অত্যুক্তি হইবে না। পাশ্চাত্যশিক্ষিত ভারতসন্তান ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের Immortality Ode এবং টেনিসনের In Memoriam-এ হিন্দুর ভক্তি-যোগ ঈশ্বর-প্রেম ও ভগবৎপরায়ণতা আদর করিতে শিখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সেই "The child is the father of the man"-তত্ত্বকে, সেই "From God who is our home"-তত্ত্বকে, সেই "Behind the veil"-তত্ত্বকে কিরূপ প্রকাশ করিয়াছেন দেখ। যাঁহারা ইংরাজীনবীশ, তাঁহারা ইংরাজীসাহিত্যের এই দুইটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা খুলিয়া বসুন, আর যাঁহারা দেশীয় মহাত্মাদের কথাই শুনিতে চাহেন—তাঁহারা যে কোন বৈষ্ণবপদাবলী খুলিয়া বসুন।

আমাদের আধুনিক ভক্ত কবির বাণী শুনাইতেছি—নিজকে সর্ব্বত্র বিকাইয়া দিবার, বিলাইয়া দিবার, মিশাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা শুনাইতেছি—

"ওগো মা মৃণ্ময়ি

তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত; বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার,—হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া
কম্পিয়া স্খলিয়া, বিকীরিয়া বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্ত ভাগে।

* * * *

সেই সর্ব্বমাঝে আমারে ফিরায়ে লহ
যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে—গুঞ্জরিছে গান
শত লক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু;—
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু;"

এই "বসুন্ধরা"-কবিতাটাকে যেন তেন প্রকারেণ চোথা ইংরাজী গদ্যে প্রচার করিলেও Immortalityকে কাণা করিয়া দিবে। জীবনযৌবন-দেহমনপ্রাণ এ সব সমর্পণ করিয়া তন্ময় হওয়া যুগযুগান্তরব্যাপিনী সাধনার—জাতিগত অভ্যাসের—ফল। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-রামপ্রসাদের উত্তরাধিকারীর পক্ষে ইহা অতি সহজ—বিলাতী কবি অতদূর উঠিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্যের পক্ষে খুব জোর—"Obstinate questionings of sense and outward things," এবং—

"To me the meanest flower that
breathes, can give
Thoughts that often lie
too deep for tears."

কিন্তু প্রায়ই তাঁহার "Another race hath been, and other palms are won;" এবং "Gone is that vision, the melancholy dream." রাধার স্বপ্ন এরূপ ভাঙ্গিত না। যে নেশা ভাঙ্গে তাহার মূল্য কতটুকু? যে ভাবুকতার জন্য পরে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, অথবা অনুতাপ করিতে হয় তাহা আবার ভাবুকতা?

তন্ময়তার স্তর আছে—গভীরতম তন্ময়তা ভারতবর্ষই বুঝেন—বিলাতীর এখনও সাধ্য নাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ রাধার ন্যায় তমালের শাখায় পরিণত হইতে চাহেন নাই—যমুনার কাল জলে গা ঢালিতে পারেন নাই। যে কোন হিন্দু সহজেই তাহা পারেন; প্রতিভাবান্ রবীন্দ্রনাথও পারিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছ কি? বীরবর হনুমানের নেতৃভক্তি দেখিয়াছ কি? হিন্দুদেবতাদের আনুসঙ্গিক বাহন-তত্ত্ব বুঝিয়াছ কি? পশুপক্ষী, তরুলতা আমাদের দেবদেবীগণের এত প্রিয় কেন বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছ কি? হরিপ্রিয়া তুলসীর মর্ম্ম এবং বিষ্ণুরূপী শালগ্রামশিলার মাহাত্ম্য কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? বৌদ্ধজাতক-সাহিত্যে বুদ্ধদেব কীটপতঙ্গ-উদ্ভিদ-জন্তুরূপে কতবার জন্মিয়াছিলেন বোধ হয় জান। আমাদের জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণবের "জীবে দয়া" নিশ্চয়ই জান। আমাদের মীন অবতার, কূর্ম্ম অবতার, বরাহ অবতার, নৃসিংহ অবতার—এ সব কথা নিশ্চয়ই জান। আমাদের অহিংসা-তত্ত্বের কথা বোধ হয়

শুনিয়াছ। কালিদাসের সীতাবর্জ্জন-অধ্যায়ে "অত্যন্তমাসীৎক্রন্দিতং বনেঽপি" পড়িয়া অবশ্যই অশ্রুজল ফেলিয়াছ। সীতাদেবীর "কুররীব বিগ্না" ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-প্রকৃতির, আমাদের বনদেবতার সমবেদনা ও আকুল রোদন কখনও তোমরা ভুলিতে পারিবে না। আমাদের প্রাচীন চিত্রশিল্পের, ভাস্কর্য্যের, কারুকার্য্যের নমুনা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। তাহাতে বানর, হস্তী, মৃগ, গাভীর সখ্যভাব, উপাস্যভাব, শিষ্যভাব বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ। ছেলেবেলায় যাত্রা দলের গান নিশ্চয়ই শুনিয়াছ, ভারতের প্রকৃতিদেবী রামচন্দ্রের কত আত্মীয় তাহা ত জান—সীতাদেবীর পাতাল-প্রবেশও দেখিয়াছ।

"হে বনজ তরুলতা, হে বিহঙ্গকুল,
আমি রাম, সীতাশোকে হয়েছি আকুল।
হে দেব চন্দ্র সূর্য্য হে দেব পবন,
জান কি এ পথে সীতা করেছে গমন ?"—

রামচন্দ্রের এই প্রশ্নগুলির সার্থকতা কি আর ?

"দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে
প্রদীপ জ্বালি।
আমাদের এই কুটীরে দেখেছি মানুষের
ঠাকুরালী।"

ইহারই বা অর্থ কি ?

এই সকল চিরপরিচিত চিরপুরাতন মাধুরীগুলি বুঝিতে পারিলে, তোমার ধারণা জন্মিবে,—প্রকৃতিদেবী—পশুপক্ষী, তরুলতা, কীটপতঙ্গ, নদী-সাগর, অনল-অনিল এ সব হিন্দুর কত পবিত্র, কত আত্মীয়,—এ সব হিন্দুর জীবন কতকাল হইতে কতখানি অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তবেই বুঝিবে—কেন হিন্দু সাধকগণ জলবায়ুর সঙ্গে, বিশ্বদেবতার সঙ্গে এক হইয়া মিশিতে চাহেন—পঞ্চভূতে মিলিয়া রহিতে চাহেন—কেন সাধকশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ বানর সাজিয়াও ভগবানের আরাধনা করিতে ভাল বাসিতেন। তবেই বুঝিবে—কেন স্বদেশ-সেবক দেশের মাটীর সঙ্গে সখ্যস্থাপন করিতে চাহেন—দেশের মাটীকে পূজা করিতে চাহেন। তবেই বুঝিবে কেন মানবসেবক কৃষকের সঙ্গে কৃষক হইতে চাহেন, দীনদরিদ্রদুঃখীর কুটীরে জীবন অতিবাহিত করিতে চাহেন—কেন তিনি জগতের সর্ব্বত্র কর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র খুঁজিয়া পান।

তবেই বুঝিবে কেন দ্বিজেন্দ্রলালের ইচ্ছা ছিল "আমার এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।" তবে বুঝিবে—কেন রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছেন—"আঁখি মেলে তোমার আলো, দেখে আমার চোখ জুড়াল ; ঐ আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।" তবে বুঝিবে কেন বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন "দরিদ্র নারায়ণের" পূজা,—তবেই বুঝিবে কেন বীর সন্ন্যাসী গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—"ভারতের কর্ম্মক্ষেত্র আমার শৈশবের শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, বার্দ্ধক্যের বারাণসী"। তবেই বুঝিবে কেন বঙ্কিমচন্দ্র গাহিয়াছেন—"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাম্, শুভ্র-জ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীং ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল-শোভিনীং, সুহাসিনীং সুস্মিতাং" তবেই বুঝিবে কেন যোগীন্দ্রনাথ তোমার বাল্যাবস্থায় শিখাইয়াছেন—

"জনক যেমন দুহিতারে পালেন যতনে
তেমতি এ হিমাচল দুহিতা ভারতে
জাহ্নবী যমুনারূপা স্নেহধারা দানে
পালিছেন সযতনে। * * *

> বিধাতার কাছে মাগ এই বর বৎস
> মাতৃসম যেন পার পূজিবারে
> নিত্য বঙ্গভূমি মায়ে।"

তাহা হইলেই

> "নির্ঝরের ঝরঝরে পত্রের মর্ম্মরে শুনিবে
> স্বরগগীত।"

তাহা হইলেই বুঝিবে—

> "নন্দনকাননে কিবা শোভা ছার, * * *
> স্বর্গহ'তে সে যে মহা গরীয়ান্"

এত কথা বুঝিলে তবে রবীন্দ্রনাথের "বসুন্ধরা" বুঝিতে পারিবে। এতখানি বুঝিলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রকৃতি-কাব্য 'জলবৎ তরল' সহজবোধ্য হইবে। যদি হিন্দুর সনাতন সূক্ষ্মতম গভীরতম ভাবগুলি তোমার হৃদয়ে আসন পাইয়া থাকে, তাহা হইলে কবিবরের নদী হইয়া যাওয়া, কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী হইয়া যাওয়া, আরবদেশের বেদুইন হইয়া যাওয়া—এ সব কল্পনা হৃদয়ঙ্গম করিতে কিছুমাত্র কষ্ট পাইবে না।

এই সব নদীপর্ব্বত, পশুপক্ষী, লতাপাতা, ফুল-জল আমাদের এত পবিত্র, এত অন্তরঙ্গ বন্ধু কেন জান? ইহারা আমাদেরই মত সচেতন বলিয়া—ইহারা আমাদেরই সুখদুঃখ, দাস্য-সখ্যের অনুভব করিতে পারে বলিয়া। মানুষ যেরূপ ভগবদ্‌ভক্ত হইয়া উঠিতে পারে ইহারা ও সেইরূপ ভক্ত হইয়া উঠিতে পারে। ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস—ইহাই হিন্দুর ধারণা—ইহাই হিন্দুর সংস্কার—ইহাই হিন্দুর বিজ্ঞান, ইহাই হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপুরাতন আবিষ্কার। আর, দীন-দরিদ্র, কুলী-মজুর, মুচি-ম্যাথর,—তাহারাও মানুষ, তাহারা সংসারের ওঁছা-বাছা জীব নয়। নাই বা থাকিল তাহাদের গাড়ী-জুড়ি, ডিগ্রী পাগড়ী—নাই বা থাকিল তাহাদের শিক্ষার ফোড়ন আর সভ্যতার আড়ম্বর। তাহাদেরও হৃদয় আছে, তাহাদেরও প্রাণ আছে, তাহাদেরও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আছে, তাহাদেরও ভক্তি আছে, তাহাদেরও আন্তরিক ব্যাকুলতা আছে। এই জন্যই ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীমান্ ও বিভূতিমান্ পদার্থের তালিকায় বিশ্বচরাচরের কোন বস্তুই বাদ দেন নাই। এই জন্যই ভগবান্ দরিদ্রের ঘরে, কাঙ্গালের ঘরে, দেবতা হইয়া দেখা দিয়াছেন,—পশু অবতারও তাঁহার উপেক্ষিত হয় নাই। শুন গীতার উদাত্ত সঙ্গীত—

> "শুন, সখা, তবে ভগবান্ ক'ন,
> তোমার মনের প্রীতির কারণ
> বিভূতি আমার করিহে কীর্ত্তন,
> অবহিত হ'য়ে শুনহ এবে।
> * * *
> বিষ্ণু আমি, জিষ্ণু আদিত্য মণ্ডলে,
> রবি অংশুমান্ জ্যোতিষ্ক সকলে,
> আমিই মরীচি মরুতের দলে,
> নক্ষত্র-নিকরে সুধাংশু আমি।
> * * *
> শিখরীতে মেরু উন্নত-শিখর,
> বসুতে পাবক আমিই হই;
> * * *
> স্থির জলাশয়ে সরিতের পতি,
> অসীম আকার ধরিয়া রই।
> * * *
> স্থাবরের মধ্যে গিরি হিমাধার
> অশ্বত্থ বিটপি-ভিতরে আমি।
> * * *
> মন্থন করিলে ক্ষীরোদসাগর
> অমৃতের তরে অসুর অমর,
> উচ্চৈঃশ্রবা নামে যে ঘোটক-বর,
> করী ঐরাবত উঠে তাহাতে,
> আমি সে ঘোটক, সেই করিবর;

কামধেনু আমি ধেনুরভিতরে

*　　*　　*

বাসুকীও আমি উরগগণে

*　　*　　*

আমি মৃগরাজ মৃগকুল বনে,
বিনতা-নন্দন বিহগদলে ;
বেগগামিগণে আমি সমীরণ,
শস্ত্রধরে রাম, পবনে পাবন,
মীন মধ্যে আমি মকর ভীষণ
ভাগীরথী আমি প্রবাহ জলে।

*　　*　　*

চরাচরে কিছু নাহিক এমন
আমা ছাড়া যাহা থাকিতে পারে।"

এই বিশ্বাসেই, এই ভক্তিতেই হিন্দু পৃথিবীর সচেতন অচেতন—গঙ্গাগোদাবরী, হিমাচল-বিন্ধ্য—সকলই পবিত্র মনে করে—ইহাদের মূর্ত্তি পূজা করে—সকল দেবতার রূপ কল্পনা করে—মানুষকে অবতার ভাবে, দেবতাকে মানুষের আকার দেয়—প্রকৃতির আরাধনা করে—প্রকৃতির সঙ্গে এক হইয়া থাকিতে চায়। এই জন্য—

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার' পরেই
ঠেকাই মাথা।
তোমাতেই বিশ্বময়ীর, বিশ্বমায়ের আঁচল
পাতা।"—

ইহা কবিতার পদমাত্র নয়—কষ্ট কল্পনা করিয়া মাথা খাটাইয়া একটা কঠিন দর্শন-বাদের অবতারণা নয়,—তোমাদের ব্যব-হারিক বিজ্ঞানের একটা সত্য প্রচার নয়, Geology, Botany, Zoology আওড়াইয়া দেশের natural resources নয়। ইহা জ্ঞানযোগ নয়, কর্ম্মযোগ নয়, ভক্তিযোগ। যে ভক্তিযোগের দৃষ্টান্ত রামায়ণে পাও, কালিদাসে পাও, জৈনশাস্ত্র জাতকশাস্ত্রে পাও, গীতাতে পাও, মধ্ব-রামানুজাচার্য্যের দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতে পাও; যে ভক্তিযোগ কবীর তুলসীদাস-তুকারামে পাও, যে ভক্তিযোগ মধ্বা-চার্য্য-শিষ্য প্রেমাবতার চৈতন্যদেবে পাও, যে ভক্তিযোগ চৈতন্যপাদপদ্মপ্রসূত ভক্তিগঙ্গারূপ বৈষ্ণবপদাবলীতে পাও; যে ভক্তিযোগ আজ পর্য্যন্ত রাধাশ্যামের প্রেম-সাহিত্যের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে, যে ভক্তিযোগ ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতার দৈনিক জীবন পরিচালিত করিতেছে, সেই ভক্তিযোগই ভারতের একজন যথার্থ সন্তান কবি রবীন্দ্রনাথ প্রচার করিতেছেন। কবিবর বলিতে অধিকারী—

"সার্থক জনম আমার,
জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো,
তোমায় ভাল বেসে।"

তিনি ভারতবর্ষকে গভীরভাবে, বৈষ্ণবভাবে, প্রকৃত হিন্দুভাবে বুঝিয়াছেন। তিনি বঙ্গসাহিত্যে আমাদের বৈষ্ণবীয়-ভক্তি পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলেন।

এখন ভক্তিযোগের প্রভাব দেখাইতেছি। তন্ময়তার সাহস দেখ—বৈরাগ্যের শক্তি দেখ—ত্যাগী আত্মার বিপুল উদ্যম দেখ—প্রকৃত সাধকের, যথার্থ ভক্তের অসীম ক্ষমতা দেখিয়া রোমাঞ্চিত হও—

"ভাঙ্গরে হৃদয়, ভাঙ্গরে বাঁধন,

*　　*　　*

সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর ;
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর ?"

"জগতে তখন কিসের ডর?"—ভক্ত ভিন্ন, বৈষ্ণবের রাধা ভিন্ন, যথার্থ প্রেমিক ভিন্ন এ কথা আর কেহ বলিতে পারেন না। "Bread and Butter Philosophy"তে, খাওয়া-পরার সুখ-ভোগে থাকিয়া, "সুখময় নীড়ে" বসবাসের ফলে—টাকা-পয়সা-মান-ধন-কাম-কাঞ্চন-কীর্ত্তিকে জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া কেহ প্রেমিক হইতে পারে না—ভক্তসাধক হইতে পারে না। সকলে ইহা বুঝিবে না। এ অসাধ্য সাধন একমাত্র ভক্তই বুঝেন—যিনি ভগবানের করুণালাভ করিয়াছেন—যে করুণায়

"মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।"

এইবার দেখ পঙ্গু কিরূপে গিরি লঙ্ঘিতেছেন। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" পড়।

"আমি ঢালিব করুণাধারা, আমি
ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া,
আকুল পাগল পারা।

* * *

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
যাইব বহিয়া—যাইব বহিয়া—
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব' প্রাণ, বহে' যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ।"

* * *

"কে আসিবি কে আসিবি, কে তোরা
আসিবি আয়!
পাষাণ বাঁধন টুটি
ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি
ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারা প্রাণ ঢালি দিয়া,
জুড়ায়ে জগৎ হিয়া
আমার প্রাণের মাঝে কে
আসিবি আয় তোরা।"

* * *

"আমি যাব', আমি যাব'—
কোথায় সে, কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ,
গাহিব করুণা গান।"

পাঠকগণ, তোমরা পণ্ডিত, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-ভক্তি কিছু নাই। পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে এই কবিতার জুড়ি যদি বাহির করিয়া দিতে পার তাহা হইলে তোমাদের কেনা হইয়া থাকিব—এ ঋণ আর জীবনে ভুলিব না।

আজকাল আমাদের দেশে Inductive method-এ শিক্ষা দিবার প্রণালী প্রচারিত হইতেছে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের "নির্ঝর" একবারে বুঝিতে অসমর্থ, তাঁহারা এই কবিতার শিশু-সংস্করণ "নদী"টা প্রথমে পড়িয়া লইবেন। তাহা হইলে নির্ঝরে সহজেই "আরোহণ" করিতে পারিবেন। আর বাস্তবিক পক্ষে, ভাবুক কবিগণের অনেক কাব্যই এইরূপে আরোহ-পদ্ধতি অনুসারে বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মসঙ্গীতে ভক্তি দেখিলে—প্রকৃতি-সাহিত্যে ভক্তি দেখিলে। এবার আর একটা কথা বলিব। আমাদের বাঙ্গালীর আধুনিক "জাতীয় সঙ্গীত"গুলি সবই ভক্তি-সাহিত্য। যে ভক্তি, প্রেম, ত্যাগ, বৈরাগ্য,

ব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিকতা পূর্ব্বে আমরা রাধা-কৃষ্ণে অর্পণ করিতাম, হর-গৌরীতে অর্পণ করিতাম, শ্যামামায়ে অর্পণ করিতাম, সেই ভক্তি, প্রেম, ত্যাগ, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিকতারই কিয়দংশ আমরা আজকাল স্বদেশের ধূলির প্রতি অর্পণ করিতেছি—স্বদেশের লোকের প্রতি, সাধারণজনগণের প্রতি অর্পণ করিতেছি, স্বদেশের নদী উপবন, আকরসমীর, পশুপক্ষী, তরুলতায়, অর্পণ করিতেছি—স্বদেশের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে অর্পণ করিতেছি। জাতীয় সঙ্গীত আমাদের সনাতন ভক্তিতত্ত্বেরই এক অধ্যায় মাত্র। ইহা নূতন আমদানী মালও নয়, নূতন আমদানী ভাবও নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাহারায় আসিয়া আমাদের ভক্তিগঙ্গা শুকাইয়া যায় নাই—অথবা অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ন্যায় কেবল যোগী-ঋষি-মুনিগণেরই বোধগম্য হইয়া রহে নাই। তুমি আমি সকলেই সেই ভক্তি দেখিতে পাইতেছি—শ্যামামায়ের সঙ্গে, রাধারাণীর সঙ্গে, গৌরীমাতার সঙ্গে, আমাদের দেশমাতাও মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাইতেছেন—আমাদের সনাতন দেবী-সংসারে জননী জন্মভূমি পরিবারভুক্ত হইয়াছেন।

আমাদের দেবতারা অংশীদারের উৎপত্তিতে দুঃখিত হন না—বহুযুগে বহু দেবতা আমরা গড়িয়াছি। সোপেনহোয়ার বলিতেন Monotheisotic gods are jealous gods. তথাকথিত একেশ্বর-বাদের দেবতারা হিংসা করেন—এক দেবতার সঙ্গে বা পরিবর্ত্তে অন্য দেবতার পূজা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের দেবদেবীগণ সহৃদয় উদার, যে কোন প্রণালীতে তাঁহারা ভক্তের অর্ঘ্য গ্রহণ করেন। আমরা তাঁহাদিগকে সপরিবারে সবাহনে পূজা করি, ঘট-পট, আটচালা, দুয়ার, হাতাবেড়ী, প্রদীপ পর্য্যন্ত পূজা করি, আবার তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন, ও পূজা করি—ইহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের ভক্তিতত্ত্ব বুঝিলে?

এইবার পাশ্চাত্য জাতীয় সঙ্গীতগুলির সঙ্গে তোমাদের জাতীয় সঙ্গীত মিলাইয়া লও। দেখিবে—পাশ্চাত্য সাহিত্য কত নীচে পড়িয়া রহিবে। আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত, ফরাসীর বিপ্লবসঙ্গীতও তোমাদের ভক্তিযোগপ্রসূত স্বদেশী গানের কাছে হতপ্রভ—নকড়-ছকড়া। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিরোধ-তত্ত্ব ও জাগতিক উন্নতিতত্ত্ব আমাদের এই ভক্তি-গঙ্গায় ডুবিয়া যাইবে। আমরা দ্বন্দ্ব ভাবিতে পারি না, সংসারের উন্নতিটাকেই একমাত্র চরম সত্য মনে করিতে পারি না। আমরা ভক্তিদ্বারা, প্রেমের দ্বারা নিজকে ভুলিতে চাই—ফল যাহাই হউক। আমাদের রবীন্দ্রনাথ এই নূতন ভক্তিতত্ত্বেরও একজন বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস।

কবিবরের শাক্তভাব

রবীন্দ্রনাথ শাক্তই কি বড় কম? একজন বাঙ্গালী সাধক গাহিয়াছেন—

"শ্মশান ভাল বাসিস্ বলে
শ্মসান করেছি হৃদি।
শ্মসানবাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি ব'লে নিরবধি।
* * * *
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে রাখিয়ে মা পদতলে,
নাচ দেখি মা তালে তালে
হেরি আমি নয়ন মুদি।"

আর একজন শাক্ত কবি "জগদ্ধাত্রীপূজা"য় গাহিয়াছেন:—

"জননী মোদের জগদ্ধাত্রী,
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্রী,
ঈপ্সিত বর-অভয়-দাত্রী,
অধিষ্ঠাত্রী ত্রিলোকীর।
শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা, অভয়া চরণে
নম্রশির,
সুধু মায়ের চরণে নম্রশির।

কবি রবীন্দ্রনাথও এইরূপ শাক্ত, এইরূপ শক্তিশিষ্য।

আর একজন হিন্দু কবি গাহিতেছেন :—

"ছুটে চল ছুটে চল, হে পদ্মা আমার
পূর্ণ হোক সংহারিণী লীলা।
অন্ধগতি বন্ধহারা নৃত্য তালে তালে
বুকে রুদ্র বাজুক বাজনা।
নিষ্ঠুর ভ্রূভঙ্গে তব চূর্ণ হয়ে যাক্
তরুগ্রাম নগর-কান্তার,
লুপ্ত হয়ে যাক্ শোভা সমস্ত সুষমা ;—
ধন্য হোক্ বাসনা তোমার !
কালী তুমি করালিনী,
নমি তব পায়,
হিয়া মোর জলাঞ্জলি তায়।"

খুঁজিয়া দেখিলে এরূপ শাক্তভাব রবীন্দ্রনাথে অনেক পাইবে। দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া প্রবন্ধ বড় করিব না। রবীন্দ্রনাথ গাহিতেছেন—

আমার প্রভুর চরণতলে
শুধুই কিরে মাণিক জলে ?
ও তাঁর পায়ে পায়ে বাজে কত
কঠিন মাটির ঢেলা রে !
পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে ?
খসে যাবার, ভেসে যাবার ভাঙবারই
আনন্দেরে ?"

রবীন্দ্রনাথ "সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়ে"ও এই শক্তি-পূজার মন্ত্রই প্রচার করিয়াছেন।

কাঁদে গ্রহ, কাঁদে তারা,
শ্রান্ত দেহে কাঁদে রবি,
জগৎ হইল শান্তিহীন,
চারিদিক হইতে উঠিতেছে
আকুল বিশ্বের কণ্ঠস্বর ;—
"জাগ' জাগ' জাগ' মহাদেব,
কবে মোরা পাব অবসর !

* * *

জগতের আত্মা কহে কাঁদে
"আমারে নূতন দেহ দাও ;
প্রতিদিন বাড়িছে হৃদয়ে,
প্রতিদিন বাড়িতেছে আশা,
প্রতিদিন টুটিতেছে দেহ,
প্রতিদিন ভাঙ্গিতেছে বল।
গাও দেব মরণ-সঙ্গীত,
পাব মোরা নূতনজীবন।"

* * *

প্রলয়পিণাক তুলি করে ধরিলেন শূলী,—
পদতলে জগৎ চাপিয়া,
জগতের আদি-অন্ত থরথর থরথর,
একবার উঠিল কাঁপিয়া।

* * *

উঠিলরে মহাশূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ কোলাহল।
ছিঁড়ে গেল রবিশশি গ্রহতারা ধূমকেতু,
কে কোথায় ছুটে গেল.
ভেঙ্গে গেল টুটে গেল,
চন্দ্রসূর্য্যে গুঁড়াইয়া চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে গেল।
মহা অগ্নি জলিলরে,—
আকাশের অনন্ত হৃদয়—অগ্নি অগ্নি শুধু
অগ্নিময়।
মহা অগ্নি উঠিল জলিয়া জগতের মহা
চিতানল।

খণ্ড খণ্ড রবি শশি চূর্ণ চূর্ণ গ্রহতারা,
বিন্দু বিন্দু আঁধারের মত বরষিছে চারিদিক
হতে,
অনলের তেজোময় গ্রাসে নিমেষেতে যেতেছে
মিশায়ে।”

হেমচন্দ্রের "দশমহাবিদ্যা" পড়িয়াছ?

“একে একে জগতের আভরণ খসিল।
চন্দ্র তারা রশ্মিমেঘ অভ্রগনে ডুবিল॥
গিরি নদ পারাবার ছিল যত ভুবনে।
অনুক্ষণ অদর্শন মহাদেব শোষণে॥
স্বর্গপুরি রসাতল হিমালয় ছুটিল।
ধারা-হারা বসুন্ধরা শিব অঙ্গে মিশিল॥”

ইহা হইতে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য কোথায়? আজকালকার সভ্য বাঙ্গালায় যাত্রা উঠিয়া গিয়াছে! রসিক চক্রবর্ত্তীর "কালকেতু" পালা আর শুনিতে পাই না। নাই বা পাইলাম—রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় আমরা কালকেতুর গান শুনিয়া থাকি;

“মাতোর দুর্ল্লভ পদপল্লব দেমা দেমা
মাথে ক্ষেমঙ্করী।
(আমি শুনেছি শুনেছি মাগো),
তুমি দেবের রোদনে দানব নিধনে
নাচ রণে দিগম্বরী।
সেইরূপ রণ-বেশে নাচ হৃদি রঙ্গভূমে শঙ্করী॥
আমি চাইনা শক্তি দে মা ভক্তি
স্বগুণে পরমেশ্বরী॥
হয়ে হৃদি-পদ্মাসনা বিলাস-বাসনা নাশ মা
আমার শুভঙ্করী।”

ইহার সঙ্গে মিলাইয়া লও—

“কিসেরি বা সুখ কদিনের প্রাণ?
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম গান।
অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে॥”

কবিবরের শাক্তভাব দেখিয়া আমাদের সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের কথা মনে পড়ে

“এবার শ্যামা তোমায় খাব।
তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুটোর একটা ক’রে যাব॥”

আর মনে পড়ে—বিবেকানন্দের "নাচুক সেখানে শ্যামা॥”

ইহাকে বলে সাধনা।

ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ যাহাই হউন বা যাহাই বক্তৃতা করুন, কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের সনাতনরীতির শৈবশাক্ত তান্ত্রিক।

এই বৈরাগ্যের বাণী—এই শ্মশানে ঘর করার প্রবৃত্তি—কালী-সাধনার চূড়ান্ত পরিচয়,—ভরাবিশ্বাসে শক্তি-শিবের ধরায় লুটাইবার আকাঙ্ক্ষা—রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যে প্রচুর রহিয়াছে।

“বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে,
কে মোর আত্মপর?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর?
কিসেরি বা সুখ, কদিনের প্রাণ?
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রামগান।
অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে।”

—ইহা বৈষ্ণবের কৃষ্ণপ্রেম, কি শাক্তের কালী-পূজা তাহা জানি না। আমরা হিন্দু—আমরা বুঝি "এত নয় নন্দের তনয়, দুষ্ট বনমালী"; আমরা জানি "যেই কৃষ্ণ সেই কালী।" এজন্য আমরা বলিব,—রবীন্দ্রনাথ আজ বৈষ্ণব, আজ শাক্ত—সাম্প্রদায়িক শব্দব্যবহারে যদি কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকে, তাহা হইলে বলিব—কবিবর ভারতবাসীকে আজ সনাতন বৈরাগ্যের শিক্ষা দিতেছেন। বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন তুচ্ছ করিয়াছিলেন যেজন্য, চৈতন্যদেব সংসার ছাড়িয়া পাগল হইয়াছিলেন যেজন্য, যীশুখৃষ্ট জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন যেজন্য, "পঞ্চ-নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে" শিখগুরু

আত্মবলি দিয়াছিলেন যেজন্য, বাঙ্গালী কবি ভারতবাসীকে (এবং সম্প্রতি সমগ্র মানবজাতিকে) সেই মুক্তির বাণী নূতন ভাষায় শুনাইতেছেন। পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে যখনই যে কোন ব্যক্তি "সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিড়িতে হবে" এই কথা কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত হইবেন, যুগে যুগে দেশে দেশে তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীরই মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইবে। সেই সকল সাধক-ভক্ত বীরপুরুষগণকে সংসারের নিকট, কাম-কাঞ্চনের নিকট, ভোগ্যবস্তুর নিকট, মায়া-মমতার নিকট, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের নিকট বলিতে হইবে :—

"অরুণ তোমার তরুণ অধর,
করুণ তোমার আঁখি।
অমিয় রচন সোহাগ বচন
অনেক রয়েছে বাকি।

* * * *

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর
নির্ম্মম আমি আজি
আর নাই দেরি ভৈরব-ভেরী
বাহিরে উঠেছে বাজি॥

* * *

পাখী উড়ে যাবে সাগরের পার
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার
মহাকাশ হ'তে ঐ বারে বার
আমারে ডাকিছে সবে॥"

ত্রেতাবতার রামচন্দ্রকে জাতীয় জীবনের এক অতি বিষম সমস্যাস্থলে এইরূপ নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর হইয়া স্বকীয় সাধনার ব্রত উদ্যাপন করিতে হইয়াছিল। অমর কবি কালিদাস কর্ত্তব্যপরায়ণ রামচন্দ্রের কঠোর বৈরাগ্য মধুর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—

"বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পঃ
তুষারবর্ষীব সহস্য চন্দ্রঃ।
কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা
ন তেন বৈদেহসুতামনস্তঃ।"

বৈরাগ্য, ভক্তি, সাধনা, প্রেম, ভাবুকতা গৃহত্যাগ, সর্ব্বত্যাগ, জীবনোৎসর্গ—এই সকল বৃত্তিপ্রবৃত্তিগুলি একই ভাবের নামান্তর মাত্র—একই পদার্থের বিভিন্ন মূর্ত্তি—মানব-চরিত্রগত অনুভূতিপুঞ্জের এবং নিগূঢ় চিত্ত-প্রবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন বাহ্য প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। "যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা।" এই কথা মনে রাখিলে দেখিতে পাইবে—শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবে কোন প্রভেদ নাই,—হিন্দু-মুসলমানে কোন দ্বন্দ্ব নাই। বৈরাগ্যের জগতে, স্বার্থত্যাগের জগতে, ভালবাসার জগতে, পূজা-আরাধনার জগতে ছোট-বড়, দীন-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রভেদ নাই, ধর্ম্ম-কলহ, বা সাম্প্রদায়িক গোলমাল নাই।

পরং ত্যাগবলং বলম্

ভাবুকতার আর একটা দিক আছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিয়াছি—"যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা"। এখন আর একটি লক্ষণ বলিতেছি। এই পূজা, ভালবাসা, এই বৈরাগ্য, গৃহত্যাগের সঙ্গে মানবসেবা, লোকহিত, পরোপকার ও স্বদেশ-সেবা অভিন্নসূত্রে গ্রথিত। সকলগুলিই এক বৃক্ষের বিভিন্ন ফল—এক শক্তির বিভিন্ন বিকাশ। যারে বলে আধ্যাত্মিকতা, যারে বলে বৈরাগ্য, তারেই বলে স্বদেশসেবা—তারেই বলে জাতীয়তা। ভাবুকতার এই তত্ত্ব না বুঝিলে বৈষ্ণবকবিগণকে বুঝিতে পারিবেনা—মহাপ্রাণ রামপ্রসাদকে বুঝিতে পারিবে না। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, তুকারাম, চৈতন্য, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কারমসিন, বিবেকানন্দ, টলষ্টয়, রবীন্দ্রনাথ কাহাকেই বুঝিতে পারিবে না।

ভাবুকতার চরম কথা নিজকে ভুলিয়া থাকা; নিজের অহঙ্কার খর্ব্ব করা; অহং বিন্দুগুলি অনন্তসাগরে বিসর্জ্জন দেওয়া; চোখের সম্মুখে যাহা দেখিতে পাইতেছ, কাণ দিয়া যাহা শুনিতে পাইতেছ, তাহাকে সসীম ও নশ্বর জ্ঞান করা। যাহা দেখিতে পাইতেছ না, যাহা শুনিতে পাইতেছ না, ধরা-ছোঁয়া যায় না যাহা—সেই অসীম, অতীন্দ্রিয়, অনাদ্যন্ত, মানবচিন্তার অনধিগম্য, বিরাট সত্তার প্রভাব গ্রহণ করিবার জন্য রাধিকার ন্যায় সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন ভিন্ন সাধকের, ভক্তের, প্রেমিকের, ভাবুকের আর কোন গতি নাই।

"অনাদিমধ্যান্তমজমবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি জগন্নাথং সর্ব্বকারণ-
কারণম্॥

অথবা,

"উপাধিগম্যোঽপ্যনুপাধিগম্যঃ
সমাবলোক্যোঽপ্যসমাবলোক্যঃ।
ভবোঽপি যোঽভূদ ভবঃ শিবোঽয়ং
জগত্যপায়াদপি নঃ স পায়াৎ॥

ইহার নাম ধর্ম্মে ভাবুকতা। এই ভাবুকতা হিন্দুর মজ্জাগত। অনন্তদর্শনে চৈতন্যের উন্মাদ এবং ভূমানন্দ এই ভাবুকতারই এক লক্ষণ।

চৈতন্যদেবকে পাগল বলিতে চাও, বল—স্বদেশসেবককে পাগল বলিতে চাও, বল—ভালবাসাকে পাগলামী বলিতে চাও, বল—প্রকৃতপক্ষে ইহার নাম ভাবুকতা। এই ভাবুকতা না বুঝিলে হিন্দুকে বুঝিবে না।

রবীন্দ্রনাথ এই হিন্দুর সনাতনী ভাবুকতাই নানা উপায়ে দেখাইয়াছেন। তাঁহার আজীবন সাহিত্যসেবায় সেই ভাবুকতা প্রচার করিবার প্রয়াস দেখিতে পাইবে। এই তত্ত্ব মনে রাখিয়া সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হও, দেখিবে—কোথাও কবি পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছেন—কোথাও কবি অর্দ্ধ সফল—কিন্তু তিনি কোথায়ও একেবারে বিফল হইয়াছেন কি না অত বলিতে পারি না। সর্ব্বত্রই এই প্রয়াসের ইতিহাস দেখিতে পাইবে। তাঁহার প্রেম-কাব্যে, তাঁহার প্রকৃতি-পূজায়, তাঁহার হাস্যকৌতুকে, তাঁহার সমাজ-প্রবন্ধে, তাঁহার ধর্ম্ম-বক্তৃতায়, তাঁহার সঙ্গীতে—ঐ এক কথার নাড়াচাড়াই দেখিতে পাইবে—"যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।"

রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতায় বৈষ্ণবের ভক্তি দেখিলে,—কালীর সাধনা দেখিলে—বীণাপাণির পূজা দেখিলে—বৈরাগ্যের উদাত্ত সঙ্গীত দেখিলে। এখন দেখ—ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তক, ভাবুকতার প্রতিমূর্ত্তি বিবেকানন্দের ভেরী-নিনাদ রবীন্দ্রনাথ কি মধুর কণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তাহলে একলা চল রে।
যদি কেউ কথা না কয়, সবাই রহে
মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়,
তা হলে পথের কাঁটা তুই রক্ত মাখা
চরণতলে একলা দলরে।
একলা চল, একলা চল, একলা চলরে॥"

সাধনার পথে একলা তো যাত্রা করিলাম। কিন্তু বায়ু যে মধুর বহিবে—এবং বেয়ে যাব রঙ্গে—তার তো কোন স্থিরতা নাই। তাই সাধকের জানা আবশ্যক যে, ভয় করিলে চলিবে না—বিপদ দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। পূর্ব্বেই জানিয়া রাখ যে,—

"শুনে তোমার মুখের বাণী,
আস্‌বে ঘিরি বনের প্রাণী
হয়তো তোমার আপন ঘরের
পাষাণ হিয়া গলবে না।
তা বলে ভাবনা করা চলবে না॥"

সংসারে আসিয়াছ একাকী—যাইবেও একাকী। তাহা হইলে আর অপরের সাহায্যের কথা ভাবিতেছ কেন? অন্য লোকে কি করিবে তাহার খবর লইতেছ কেন? প্রকৃত সাধক, সন্ন্যাসী, প্রেমিক কাহারও দিকে তাকায় না—দাগী, 'কলঙ্কী' হইতে লজ্জা বোধ করে না, নিজ নিজ অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যায়। ভক্তজানেন—"লাজ মান ভয়, তিন থাকতে নয়।" প্রেমিক জানেন :—

" কলঙ্কী বলিয়া ভাবে সব লোক
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥"

এরূপ তন্ময় না হইলে কি কখনও প্রকৃত ভাবুক হওয়া যায়? যাহা দেখিতে পাইতেছ, সংসারের যে সকল ভোগ বিলাসে প্রলুব্ধ হইতেছ, যে সকল দুর্ব্বলতা ও চরিত্রহীনতায় অন্ধ হইয়া রহিয়াছ, তাহা প্রত্যাখ্যান না করিয়া "ভবিষ্যতের পানে আশা ভরা আহ্লাদে" কেহ কখনও তাকাইতে পারে কি? এই জন্যই বিবেকানন্দ আদেশ করিয়াছেন :—

"তুই যদি একা ঐ ভাবে জীবন গঠন কত্তে পারিস্ তা'হলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ঐরূপ কত্তে শিখবে।"

ভাবুক রবীন্দ্রনাথ আবার বলিতেছেন—

"সকল মহৎ কর্ম্মে পরম প্রয়াসে
সকল চরম লাভে,—দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব্ব ভয়;

* * *

ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির ॥"

স্বার্থত্যাগ শিখাইবার জন্য এই কয় পংক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা আবশ্যক।

একজন বিলাতী কবির বীণায় এইরূপই এক ঝঙ্কার উঠিয়াছিল। দুরন্ত আশার প্রভাবে, দুঃসাধ্য ব্রত-উদ্‌যাপনের আকাঙ্ক্ষায়, অসীম বাসনারাশির তাড়নায় ভাবুক গাহিয়াছিলেন :—

We look before and after
And pine for what is not ;
Our sincerest laughter with some pain is ever fraught ;
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

এই sadকে, বিষাদকে যদি ত্যাগ করিতে চাও, তাহা হইলে সেই sweet, সেই অমৃতের আস্বাদ পাইবে না,—সেই "মহৎকর্ম্মে"র যোগ্য যন্ত্র হইতে পারিবে না। সেই অসীম আনন্দ—সেই মানব-জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য পাইবার জন্য কবিবর চাহিতেছেন—

" নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে' জীবন উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান,
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্দ্ধ নীলাকাশে!
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণ
আম্রবন ছায়ে,
সুপ্ত হয়ে' লুপ্ত হয়ে'
গুপ্ত গৃহবাসে।"

বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠে যে সঙ্গীত-তরঙ্গ উঠিয়াছিল, দেখিতেছি রবীন্দ্রনাথও ললিত-কলায় সেই ধ্বনিই বাঙ্গালীর জীবন-বেদ-রচনার জন্য দান করিয়াছেন। পরানুবাদ, পরানুকরণ, ক্ষুদ্রত্ব, পশুত্ব, নির্জ্জীবত্ব, কূপ-মণ্ডূকত্ব পরিত্যাগ করিয়া মানুষ হইতে হইবে —"সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর"কে সম্মুখে রাখিয়া জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যকলাপ পরিচালিত করিতে হইবে। ইহাই বিবেকানন্দ-রবীন্দ্র-

নাথের বাণী। হেমচন্দ্রও "গগণের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে—বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে" কর্ম্মে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন।

কাব্যে বিপ্লব-তত্ত্ব বা আদর্শ-বাদ

সাহিত্য-সেবায় ভাবুকতা লইয়া আর একটা কথা বলিব। বর্ত্তমানকে ভাবুক কি চোখে দেখেন? যাহা নাই ভাবুক তাহা চাহেন—যাহা আছে তাহাতে তাঁহার সন্তোষ হয় না। আমরা দেখিয়াছি—আধ্যাত্মিকতা, ভালবাসা, স্বদেশসেবা সর্ব্বত্রই ভাবুক অসীম ও অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহেন। সসীমকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, অথবা বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র জীবন হীন গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া—সমাজের বাধাবিঘ্নগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া নূতন জগৎ, নূতন আলোক, নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করাই ভাবুকের প্রকৃতি। বৈষ্ণব কবিদের রাধা এইরূপ বিপ্লব সাধন করিতেন—বিপ্লব সাধন না করিয়া, সোজা পথে চলিয়া, নরম হইয়া কেহ কখনও প্রেমিক হইতে পারেন নাই। এইরূপ বিপ্লব-সাধনের চিত্র আমরা ফরাসী দার্শনিক রুসোর সাহিত্যেও যথেষ্ট পাই। বর্ত্তমানের প্রতি এইরূপ অস্পৃহা, নূতনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, নূতন আদর্শ গড়িয়া তুলিবার প্রবৃত্তি—এক কথায় বিপ্লববাদ-প্রচার খানিকটা ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থে, প্রচুর পরিমাণে শেলির কাব্যে আমরা দেখিতে পাই। বিপ্লবের কথা শুনিয়া চমকাইও না। আমরা মারামারি রক্তারক্তি লড়াইয়ের কথা, স্বদেশ-আত্মার রাক্ষসীমূর্ত্তি-পরিগ্রহের কথা বলিতেছি না। হৃদয়ের যে গূঢ় কন্দরের চিত্তবৃত্তির মধ্যে সর্ব্বমুখিনী উন্নতির আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত থাকে, আমরা সেই অন্তর্জ্জগতের ভাবের খেলার কথা বলিতেছি। কাটাকাটি কামড়া-কামড়ি অপেক্ষা তাহা অতি সূক্ষ্ম, গভীর ও ব্যাপক।

একজন ব্যথিত-পরাণ উদাসভাবে বেহাগ ধরিয়াছেন:—

"সংসার, কি ভয় দেখাও আমারে?
ভাল নাহি বাস যাব চলে দূরে।"

এই জন্যই—

"অত্যন্তবিমুখে দৈবে ব্যর্থে যত্নে চ পৌরুষে।
মনস্বিনো দরিদ্রস্য বনাদন্যৎ কুতঃ সুখম্॥"

এইরূপে বর্ত্তমান হইতে, বাস্তব হইতে দূরে চলিয়া যাওয়া, বনবাসকেই শ্রেয় জ্ঞান করা—"মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান" এই ভাবিয়া 'বৃন্দাবন ধন' সকলই পরিত্যাগ করা—ইহার নাম বিপ্লব। তখন মনে হইবে—

"আকাশের তারা ডাকিছে আমারে,
সমীরণ ডাকে আয় আয় ক'রে।
কে জানে কে মোরে প্রাণের ভিতরে
বলিছে সদাই সকলি তোমার।"

যখন সোজা পথের পথিক কেহ তোমার অশ্রুজল মুছাইবে না, তখন দেখিবে—

"শ্যামলা ধরণী ধবলা যামিনী
শশী দিনমণি সুধার আধার।
সকলিই আমার।"

এবং "আছে কত জন এ বিশ্ব মাঝারে
মুছাইতে আঁখিজল!"

বিপ্লববাদী ভাবুকগণ হয় অতীতের, না হয় ভবিষ্যতের সমাজ চিত্রিত করিয়া শান্তি পান। কেহ ভাব-রাজ্যে কল্পনার স্বদেশ, সুসমাজ ও স্বধর্ম্ম গড়িয়া মনকে প্রবোধ দেন। কেহ প্রকৃতিকে মানবীয় ভাব ও দেবভাব অর্পণ করিয়া তাহারই আশ্রয়ে জীবন মধুময় করেন। বৈষ্ণব কবির ভক্তি-সঙ্গীতে প্রকৃতি-পূজার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। রাধার সংসার

হয় কৃষ্ণময়, না হয় 'নাম'-ময়, না হয় প্রকৃতি-ময়। যমুনা, তমাল, কোকিল, ময়ুর, মেঘ, এই সবই রাধার পরম আত্মীয়। দেশবিদেশের অন্যান্য ভাবুক কবিগণও প্রকৃতিকে জীবন্ত মানুষ অথবা স্বর্গীয় দেবতারূপে কল্পনা করিয়া প্রতিভার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

সুতরাং ভাবুকতাময় কবিগণের নিকট প্রকৃতি খেলার সামগ্রী নয়। কবিতা লিখিতে গেলে কতকগুলি গাছ-পাতা জীবজন্তু আনিয়া খাড়া করা প্রয়োজন,—এই জন্যই ভাবুকের নিকট প্রকৃতি আসেন তাহা নহে। প্রকৃতিই ভাবুকের আদর্শস্থানীয়া। জীবনময়ী প্রকৃতির বিশ্লেষণ করিতে যাইয়াই ভাবুকের দ্বারা সংসারের সকল তত্ত্ব প্রচারিত হয়। প্রকৃতিই ভাবুকের নিকট একমাত্র সত্য, তাঁহার জীবনের গঠনকর্ত্রী, তাঁহার শিক্ষাদাত্রী—তাঁহার জন্মজন্মান্তরের প্রিয়সখী। ভাবুক প্রকৃতির সঙ্গে কথা বলেন—প্রকৃতিকেই উপলক্ষ্য করিয়া দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম সকল সমস্যার মীমাংসা করেন। ভাবুকের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলি এজন্য কখনও প্রাকৃতিক অর্থেই গ্রহণ করিতে পার, কখনও প্রেম ভালবাসার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বুঝিতে পার, কখনও কখনও বা ধর্ম্ম-তত্ত্বের মীমাংসা ভাবে বিবেচনা করিতে পার, কখনও স্বদেশ-সেবকের উদ্বোধন-সঙ্গীতের ন্যায় বিচার করিতে পার। ভাবুক কবির প্রকৃতি-বিষয়ক যে কোন রচনায় নানা অর্থ দেখিতে, নানা তত্ত্ব বুঝিতে, নানা ভাবে সংসারের জটিল প্রশ্নগুলির সমাধান হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে ভাবুকের কাব্য বুঝা হইল না। পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি—যারে বলে ভালবাসা তারেই বলে পূজা, তারেই বলে স্বদেশ-সেবা, তারেই বলে বৈরাগ্য। এখন বলিতেছি তারেই বলে বিপ্লব-বাদ, আদর্শ-বাদ, তারেই বলে প্রকৃতি-ভজনা।

সকল ভাবুকতার একই অভিব্যক্তি দেখিতে পাইবে তাহা নহে। এই নানা অভিব্যক্তির কোন স্থলে একটি, কোন স্থলে দুইটি, কোন স্থলে সবগুলিই হয়ত বর্ত্তমান। কিন্তু ভাবুকেরা সকলেই এক গোষ্ঠীভুক্ত—বিপ্লববাদী, প্রকৃতি-পূজক। রাধা বিপ্লবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি নূতন করিয়া নূতন আদর্শে জগৎ গড়িতে চাহিয়াছিলেন—রুসো নূতন করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন—বিবেকানন্দ নূতন করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথও নূতন করিয়া গড়িতে চাহেন। আদর্শবাদই ভাবুকের স্বধর্ম্ম।

ভবিষ্যতের আদর্শ হইতে, কল্পনার রাজ্য হইতে শক্তিলাভ করাও যায়। তাহাও কম বাস্তব নয়। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক-মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্কভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা,
ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে!
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায়
ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে
ধেয়ে;

* * * *

কবি, তবে উঠে এস, যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে,—তবে তাই কর আজি
দান;
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের
সংসার

বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র,
বদ্ধ অন্ধকার !—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই,
চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল
পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট ! এ দৈন্য
মাঝারে, কবি
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে
বিশ্বাসের ছবি !"

উনবিংশ শতাব্দীর রুশ ভাবুক জুকবস্কি (Jukvosky ১৭৮৩-১৮৫২) রুশিয়ায় এই নূতন আদর্শ-বাদ আনিয়াছিলেন :—

"O sweet remembrance
Of that which has ceased to exist
here below !
O strength of the soul, sweet hope
Of a better and unchanging life !
Blessed is he, who in the midst of
wrecked
Ruins of this life cherishes you in
his soul,
And by your aid the miseries
of the present
Neither heeds nor takes to heart."

এই পংক্তিগুলি The Butter-fly and the Flowers (১৮২৪খৃঃ) নামক প্রকৃতি-বিষয়ক কাব্যে দেখিতে পাই। এই রুশ ভাবুকের রচনায় রবীন্দ্রনাথের "অতীত, কথা কও" খুঁজিয়া পাওয়াও কঠিন হইবে না :—

"And has the past for ever
vanished, and have former days
That were so joyous left no trace
behind them ?
O no ; never shall their strength
be slain ;
To the heart the past is eternal,
And love survives the pang of
separation ;
Death can boast no power over
the heart."

জুকবস্কির যুগে আমাদের ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ রুশ ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। জুকবস্কি স্বয়ং ভাবুকতাময় জার্ম্মাণ ও ইংরাজী কবিতাবলীর একজন অনুবাদক ছিলেন।

জুকবস্কির মৌলিক কবিতায়ও ভাবুকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "যার কেহ নাই, সকলই তাহার"—এই স্বর তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়াই আছে :—

"Everywhere we hear the familiar
voice,
Everywhere we see the
unforgotten face ;
O, the sweetness of the sacred
thought,
That there, far off in the distant
dale,
Thy angel, queen of beauty,
Alone with her grief,
Mourns and weeps her lover.

Even thither does the soul bear
The love and image of the
dear one :
Of these, friends, death can
never rob us,
For there is life and love beyond
the grave.

এই ভাবুকতা, এই আদর্শবাদ, এই আশার বাণী রুশ সাহিত্যের প্রাণ।

প্রকৃতি-পূজা বা স্বাধীনতার গান

প্রকৃতি-বিষয়ক কাব্যে পূর্ব্বে আমরা ভক্তিযোগ দেখিয়াছি—এখন বিপ্লব-বাদ বা আদর্শ-তত্ত্ব দেখিলাম। এ দুই-ই হিন্দুর সনাতন সাহিত্যধারা ও চিন্তাপ্রবাহের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-সাহিত্য পাশ্চাত্য প্রকৃতি-পূজার অনুকরণ নয়—আমাদেরই ঘরের কথার আধুনিক সংস্করণ। এখন রবীন্দ্র-কাব্যের প্রকৃতি-তত্ত্ব আর একদিক হইতে বুঝিব।

বর্ত্তমানের নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা এবং তথাকথিত সভ্যতার আড়ম্বর ও কৃত্রিমতা হইতে ভাবুকগণ দূরে সরিয়া থাকিতে চাহেন। ভাবুকতার যে অভিব্যক্তিস্বরূপ আমরা কবির প্রকৃতি-পূজা দেখিতে পাই, তাহারই আর এক পরিচয় তাঁহার পল্লী-সমাদর। বাস্তবিকপক্ষে পল্লীজীবনকে সরল, স্বাধীন, নৈসর্গিক, অকৃত্রিম এবং সুখময় বিবেচনা করা ভাবুক কবিগণের প্রকৃতি-পূজার একটি প্রধানঅঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহার অসংখ্য পরিচয় আছে।—একটি চিত্র প্রদর্শন করিতেছি।

"বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূ ধূ
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা
দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দুধারে ঘন বন, ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যায় ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয় মাখা।
পথে আসিতে ফিরে আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি'
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি,
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনী ফুলে ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে থাকি
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এধারে পুরাতন শ্যামল তাল বন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁসে।
বাঁধের জলরেখা অলসে যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।"

এই গেল পল্লীর মাধুরী—বনদেবতার অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য—সর্ব্ববাধাহীন পরিপূর্ণতার চিত্র—অনাবদ্ধ প্রকৃতির স্বাধীন বিকাশ। এখানে তরুলতা জীবজন্তু সকলেরই নিজস্ব প্রস্ফুটিত হইতে পায়—কেহ কাহাকে চাপিয়া রাখে না। এই স্বাধীনতার জগতে, এই পূর্ণবিকাশের আবহাওয়ায়—এই সরলতা, স্বাভাবিকতা এবং শান্তিসুখময় গতিবিধির রাজ্যে ভাবুকেরা কৃত্রিম সভ্যতার আওতা হইতে পলাইয়া আসিবার জন্য ব্যগ্র। ইহা কি কম বিপ্লব?

আজকাল কল-কারখানা এবং Factory Systemএর অত্যধিক দৌরাত্ম্যে পাশ্চাত্য জগতে সত্যসত্যই প্রকৃতি-পূজা আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা "Back to the country" "Back to the land"—এই সুর ধরিয়াছেন। ভারতবর্ষের সভ্যতাও কিছুদিন পাশ্চাত্যের প্রভাবে বিপর্য্যস্ত হইতেছিল—এখন 'প্রকৃতিস্থ' হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এইজন্য এখন "পল্লীসেবক" এ দেশে দেখা দিয়াছেন—"গুরুকুল"ও "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম"

প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—স্বাভাবিকী "জাতীয় শিক্ষা" প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

মামুলি সমাজ, সংসার, সহর, সভ্যতাকে তিরস্কার করিয়া নূতন এইরূপ এক জগতে আশ্রয় লইবার প্রয়াসকেই আমরা এক হিসাবে বিপ্লব-সাধন বলিতে পারি। বিলাতী কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ দুঃখ করিতেন—

"If such be Nature's holy plan
Have I not reason to lament
What man has made of man ?"

—মানুষের নিকট সুখ নাই—মানুষই মানুষের শত্রু। "পৃথিবীতে কেহ ভাল ত বাসে না—এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না।" সুতরাং অন্য জগতে চল। বারণ্‌স্, স্কট, হার্ডারের ন্যায় অতীতের কথা প্রচার কর, দরিদ্রের কাহিনী—মফঃস্বলের বাণী,—নিম্নজাতির আকাঙ্ক্ষা প্রচার কর, এবং প্রকৃতির ক্রোড়ে আশ্রয় লও—অথবা স্যার টমাস মোরের ন্যায় কল্পনার দ্বারা একটা ইউটোপিয়া রাজ্য গড়িয়া তোল—কিম্বা রাধার ন্যায় "শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম নাম জপই ছার তনু করব বিনাশ" এইরূপে কৃষ্ণময় জগৎ ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর। ইহারই নাম বিপ্লব। যেখানে মৃত্যুর কথা উঠেনা সেখানে চরম কথা নাই। প্রকৃতি-পূজায়, পল্লীসেবায় রবীন্দ্রনাথও বঙ্গীয় চিন্তাজগতে এই বিপ্লব আনিয়া দিয়াছেন :—

"হায়রে রাজধানী পাষাণ কায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ় বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া!
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া।
কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়া আছে
খুলিতে নারি মন, শুনিবে পাছে
হেথায় বৃথা কাঁদা দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।

*	*	*	*

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা
কেমন ক'রে কাটে সারাটা বেলা!
ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ, কীট,
নাই ক ভালবাসা নাহি ক খেলা।

*	*

দেবে না ভালবাসা, দেবে না আলো
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো
তাহারই কোলে গিয়ে মরণ ভাল!"

সামান্য একটা গার্হস্থ্য চিত্রকে প্রকৃতি-পূজক ভাবুক এক অতি গভীর চিত্তবৃত্তির মনোরম আলেখ্যে পরিণত করিয়াছেন। বন্ধন হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, কৃত্রিমতার কারাগার হইতে সরস জীবনবত্তার উন্মুক্ত উৎসের সমীপবর্ত্তী হইবার বাসনা, অনৈসর্গিক জীবন-যাপন অপেক্ষা মরণকেও শ্রেয়জ্ঞান করিবার প্রবৃত্তি, চিন্তারাজ্যের সেরা extremism বা চরমপন্থিতা সমগ্র কবিতাটিকে স্বাধীনতার করুণ ক্রন্দনে পরিণত করিয়াছে। প্রকৃতি-পূজা ও পল্লীসেবা উপলক্ষে প্রতিভাবান্ কবি এই উপায়েই চিন্তাজগতে বিপ্লব সাধন করেন। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতারাশির সঙ্গে তুলনা কর—এরূপ স্বাধীনতার গান, এরূপ স্বাভাবিকতার উচ্ছ্বাস, প্রকৃতিদেবীর এরূপ মাহাত্ম্যকীর্ত্তন এমন রচনাচাতুর্য্যের সহিত, এমন ভাবসমাবেশের সহিত, এমন শব্দপারিপাট্যের সহিত আর কোন কাব্যে পাইবে না।

কার্য্যকরী ভাবুকতা

তন্ময়তা হইতে আরম্ভ করিয়া বিপ্লব, প্রকৃতি-পূজা, পল্লীসেবা পর্য্যন্ত ভাবুকতার

নানা অভিব্যক্তি আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কতদূর পারিয়াছি জানি না। এখন ভাবুকতার আর দুই একটা কথা বলিয়া বিষয়টা স্পষ্ট করিতেছি। একজন আধুনিক লেখকের রচনা হইতে ভাবুকতার বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। তিনি এখন আমাদের দেশে ভাবুকতার বন্যা চাহিতেছেন—কিন্তু কিরূপ ভাবুকতা? তাঁহার কথায় সেই ভাবুকতার পরিচয় দিব। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কোন কোন অংশ বুঝিতেও তাহার দ্বারা কথঞ্চিৎ সহায়তা হইতে পারে।

"যে ভাবুকতায় লোকে ভবিষ্যতের মহতী সিদ্ধি ধ্যান করিয়া বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি ত্যাগ করিতে পারে, সামান্য আরম্ভের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমগ্রতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতেই সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত হয়, যে ভাবুকতার অনুপ্রাণনায় বিদ্যাবান্ ব্যক্তি নিজের গৌরব বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভ উপেক্ষা করিয়া সমাজের সকলস্তরে বিদ্যাপ্রচারেই আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন,—স্বকীয় উচ্চতর শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা খর্ব্ব করিয়া দেশের জন্য শিক্ষালাভের সুবিধা-সৃষ্টির নিমিত্ত জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হন; যে ভাবুকতায় ধনবান্ স্বয়ং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া সমগ্র সমাজকে বিদ্যায়, ধনে, ধর্ম্মে উন্নীত করিবার জন্য সচেষ্ট হন, এবং ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া জলদান, অন্নদান, ঔষধদান ও বিদ্যাদানের ব্যবস্থা দ্বারা ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারেন; যে ভাবুকতার প্রভাবে ভগবান্ যাঁহাকে যে শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী করিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, তিনি সমাজ-সেবায় এবং সকল প্রকার দারিদ্র্য-মোচনে সেই শক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগকেই জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম বিবেচনা করেন—সেই রূপ বৈরাগ্য-প্রসূতি ভাবুকতার বন্যা না আসিলে কোন দিন কোন সমাজে নূতন অবস্থার সংগঠন হয় না। যে ভাবুকতায় চিত্তের উন্মাদনা না হইয়া উৎপ্রেরণা হয়, যাহার ফলে শক্তি বিক্ষিপ্ত না হইয়া সংহত ও সংক্ষিপ্ত হয়, যাহার বশে সমাজ ও সংসারের উন্নতি-বিধানের জন্য মানব স্থির-সংযতভাবে গৃহত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, আমাদের এখন সেইরূপ ভাবুকতাময় বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর প্রয়োজন হইয়াছে।"

"মিষ্টিসিজ্‌ম্" বা অধ্যাত্মবাদ

আমরা যাহাকে ভাবুকতা বা চরমপন্থিতা বলিলাম, ইংরাজিতে তাহাকে এক্‌ষ্ট্রীমিজ্‌ম্, Idealism বা Romanticism বলিতে পারি। উপরের আলোচনায় বুঝা গিয়াছে যে, মাথায় কতকগুলি উচ্চভাব, ধারণা বা চিন্তা গিজ্ গিজ্ করিলেই কোন ব্যক্তিকে ভাবুক বলা যায় না, তাহার ভাবুকতা আছে স্বীকার করিতে পারি না। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই ভাবুক বলা হয় না—চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ রচনাকেই ভাবুকতার নিদর্শন বা সৃষ্টি বলিতে পারা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এস্, সি, পি, এইচ্, ডি, উপাধি লইয়া বাহির হইলেই, এবং ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারিলেই ভাবুক হওয়া যায় না। ভাবুকতা বা Idealismএর বিশেষ অর্থ আছে। সেই পারিভাষিক অর্থ রবীন্দ্রনাথের কাব্য বুঝিতে গিয়া বোধ হয় কথঞ্চিৎ স্পষ্ট হইয়াছে।

এই Idealism যখন ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করে তখন তাহাকে আমরা ইংরাজীতে Transcendentalism (অতীন্দ্রিয়তা, অসীমবাদ, অনন্তবোধ) অথবা Super-naturalism, Super-materialism (অতি-প্রাকৃত

এবং অতি-মানবীয় ভাব, অর্থাৎ ভগবদ্-ভক্তি), অথবা Mysticism (পরমাত্মজ্ঞান, সূক্ষ্ম-বা-তত্ত্ব দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক ভাবের অতীত অবস্থা) বলিয়া থাকি। আইডিয়েলিজ্‌ম্, মিষ্টিসিজ্‌ম্, ভাবুকতা, রোমাণ্টিসিজ্‌ম্ ইত্যাদির অর্থ উন্মাদ, চ্যাংড়ামি, বাস্তবশূন্যতা, যৌবনের মত্তত', দুর্ব্বলতা, চরিত্রহীনতা, আবলতাবল বকা, বুজরুকি বা অস্পষ্টতা বা হেঁয়ালী বা ক্ষমতার অভাব নয়। যে ব্যক্তি জীবনের প্রতিকার্য্যে প্রতিদিনকার প্রত্যেক ওঠাবসায়, চলফেরায়, আচার-ব্যবহারে transcendentalist অর্থাৎ মিষ্টিক্, তাঁহাকে আমরা—হিন্দুরা—যোগী, ঋষি, মহাপুরুষ ধর্ম্মাত্মা ইত্যাদি জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকি। হিন্দুর আধ্যাত্মিক সাহিত্যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে এইরূপ ব্যক্তিত্ব এবং জীবনযাপন ঋষি-জনোচিত, দেবোপম ইত্যাদি গণনা করা হয়। আমাদের পূর্ব্বাপর সকল মহাপুরুষই এইরূপ মিষ্টিক্, transcendentalist-পদবাচ্য।

ইহজগতের বাহিরে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সংসারের অতিরিক্ত আর একটা জগৎ আছে—সে জগতের তত্ত্ব আমরা কিছুই জানি না—জানিবার উপায় আছে কি না তাহাও জানি না। সেই জগতের ভাবসমষ্টি জীবনে উপলব্ধি করা, তাহার তত্ত্ব প্রচার করা, তাহার দ্বারা এই নশ্বর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময় সংসারকে অরূপ, অসীম, ভূমান্, বিভূতিমানের সংস্পর্শে আনিয়া খানিকটা উন্নত, উদার ও মহান্ করা—এই সকল কার্য্যকেই আমরা ঋষি, মহাপুরুষ, অবতারগণের কার্য্য মনে করি। এরূপ ভাবুক বা মিষ্টিক্ বুদ্ধ চৈতন্য, তুকারাম, যীশুখৃষ্ট। এখানে বলিয়া রাখি—যীশু ইউরোপের গুরু, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুর সন্তান। ইউরোপের জল-হাওয়ায় যীশুর "আধ্যাত্মবাদ" হজম করিতে পারে নাই। উহাদের সমাজে যীশুর হিন্দু বাণী বসে নাই। খৃষ্টসমাজ "জীবন-সংগ্রাম"-টাইপ্রাণে প্রাণে স্বীকার করে—যীশুতত্ত্ব মুখে আওড়ায় মাত্র, কিছুকাল হইতে আওড়ানও বিদায় দিয়াছে! এই চিন্তা হিন্দুর মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট।

অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত ভারতবাসী আজ ৫০০০ বৎসরের শিক্ষার ফলে, অভ্যাসের ফলে, ক্রমবিকাশের ফলে, এবং সংস্কারের ফলে এই অধ্যাত্মবাদের, এই transcendentalismএ, এই mysticism, এই idealismএর উত্তরাধিকারী হইয়া জগতের গুরুরূপে বিরাজ করিতেছে। মিষ্টিসিজম ভারতের খাঁটি স্বদেশী জিনিষ—ইহার জন্যই আমাদের গৌরব। ইউরোপ এ অমৃত পাইলে মুক্ত হইবে। ভারতবাসী, তুমিই তাহার মুক্তির উপায় স্বরূপ হইতে পারিবে—জানিয়া রাখ।

জীবনে এই অত্যুচ্চ ভাব উপলব্ধি করা কথার কথা মাত্র নয়। এই অসীম অতীন্দ্রিয় ভূমানন্দকে কর্ম্মের দ্বারা বুঝা এবং বুঝান, অনুষ্ঠানের দ্বারা বিশ্বাস করা এবং বিশ্বাস করান, মনুষ্যত্বের দ্বারা অর্জ্জন করা এবং প্রচারিত করা বড় সোজা কথা নয়। তথাপি বহু চিন্তাবীর, সাহিত্যসেবী, কবি, শিল্পী, দার্শনিক, পণ্ডিত, চিত্রকর, ভাস্কর ইত্যাদির কৃতিত্ব ও কারুকার্য্যের বর্ণনা করিবার সময় আমরা transcendental, অধ্যাত্মিক, ভাবুকতাময় ইত্যাদি আখ্যা দিয়া থাকি। তাঁহাদের চরিত্র, মনুষ্যত্ব, ব্যক্তিত্ব, দৈনিক কার্য্যকলাপ যেরূপই হউক না, তাঁহাদিগের

সম্বন্ধে বলিব যে, তাঁহারা চিত্রের দ্বারা, সাহিত্যের দ্বারা আধ্যাত্মিকতা, অতীন্দ্রিয়তা, অ-সাংসারিকতা, অনন্তে প্রবৃত্তি, অসীমে বিশ্বাস ইত্যাদির পুষ্টি করিতেছেন। এই সকল গুণী, শিল্পী বা কবি ব্যক্তিকে আমরা transcendentalist, মিষ্টিক্ ইত্যাদি বলিতে আপত্তি করি না। অমুক কবি 'মিষ্টিক'—এ কথা বলিলে বুঝিব,—তাঁহার কাব্যে অধ্যাত্ম জগতের আলোচনা আছে, সেই ব্যক্তির জীবন ঋষি-জনোচিত কি না বুঝিতে পারিব না। ভারতবর্ষের প্রায় সকল সাহিত্যসেবী চরিত্র-হিসাবে না হইলেও অন্ততঃ এই হিসাবে স্বভাবতই mystic. আমাদের উপনিষৎ mystic সাহিত্য আমাদের গীতা মিষ্টিক সাহিত্য, আমাদের অভঙ্গ ও কীর্ত্তন মিষ্টিক সাহিত্য, আমাদের পদাবলী মিষ্টিক সাহিত্য, আমাদের রামপ্রসাদী গীত মিষ্টিক সাহিত্য, "রামকৃষ্ণ-কথামৃত" মিষ্টিক সাহিত্য, হরনাথের "উপদেশামৃত" মিষ্টিক সাহিত্য।

আমাদের আধুনিক কবিবরও এই হিসাবের একজন মিষ্টিক্, তিনি ভারতবর্ষের সনাতনী ধারাই সাহিত্য-জগতে, চিন্তার ক্ষেত্রে, কাব্যজীবনে, দার্শনিক সংসারে প্রবাহিত করিতেছেন।

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়আকাশে
তোমারে দেখিতে দেয় না।"

ইহার নাম Mysticism বা ভগবদ্ভক্তি—রাধার প্রেম—মুমুক্ষুর আকুল ক্রন্দন, অসীমে প্রীতি, অনন্তবোধ—ধরা ছোঁয়া যায় না যাহা তাহা পাইবার অভিলাষ—হিন্দুর "অথা তো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" মুক্তির জন্য, জগদম্বার কৃপালাভের জন্য সসীম মানবের, বদ্ধজীবের, দুর্ব্বলচিত্তের এইরূপেই কাঁদিতে হয়। "হরি, বেলা হ'ল দিন ত গেল পার কর আমারে"—রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই সরল সহজ হিন্দুত্বই, এই করুণাভিক্ষাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইব।

সাধক তাঁহার ষট্‌চক্রভেদের অর্দ্ধপথে বলিবেন:—"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই।" স্বদেশ-সেবক সংশয় ও বিশ্বাসের মধ্যে দোদুল্যমান হইয়া অনেক সময়ে এইরূপই ভাবিয়া থাকেন:—"কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে।" দুর্ব্বলতা কর্ম্মবীরকে বহুকাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে—তখন তাহাকে করুণ স্বরে বলিতেই হয়—

"কি করিলে বল পাইব তোমারে
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।"

পুণ্য কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিতে অভ্যস্ত হইতে থাক—দেখিবে আদর্শকে, জীবনের ধ্রুবতারাকে লাভ করিবার পূর্ব্বে তোমার কত ঘাঁটি, কত স্তর পার হইতে হয়। দুর্ব্বলতা, সঙ্কীর্ণতা, চরিত্রহীনতা, কত বিচিত্র "মার" আসিয়া তোমার যজ্ঞ পণ্ড করিতে থাকে। সসীম শক্তির সাহায্যে অসীমকে পাইতে হইলে, এইরূপ হোঁচট খাইতে খাইতেই চলিতে হইবে। মানবজীবনের ইহা স্বাভাবিক কথা।

আর একটি Mysticismএর চিত্র দিতেছি। তুমি হয়ত তোমার লক্ষ্যকে হৃদয়ের সহিত ধরিতে পার নাই—তোমার ব্রত-উদ্‌যাপনের জন্য তুমি যথেষ্ট আয়োজন কর নাই—তুমি অল্পমাত্র চরিত্র-সম্বল এবং বিশ্বাস ও দৃঢ়তা লইয়া, ভবিষ্যতের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা এবং বাধা-বিঘ্নের

কথা না ভাবিয়া কাজে নামিয়াছ। এই অবস্থায় তুমি জগতের শক্তিগুলি ব্যবহার করিতে পারিবে না—তোমার সন্দিগ্ধচিত্ততা, তোমার অক্ষমতা, তোমার অবিশ্বাস তোমাকে কার্য্যকালে পঙ্গু করিয়া রাখিবে। ইহা ত স্বাভাবিক, তাই—

"কোথায় আলো কোথায় মাল্য, কোথায়
আয়োজন !
রাজা আমার দেশে এল কোথায় সিংহাসন !
হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা
কোথায় সজ্জা !
দু' এক জনে কহে কানে—বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্ত করে শূন্য ঘরে কর অভ্যর্থন।"

তোমার সম্মুখে—পায়ের উপর দিয়া গঙ্গা বহিয়া গেল—হায় তুমি তাহা হইতে এক গণ্ডূষও জল তুলিয়া লইতে পারিবে না !

ভাগ্যবান্ সে, যে পূর্ব্ব হইতে চরিত্র গঠন করিয়া রাখিয়াছে—যে ভগবানের ডাকে সাড়া দিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত,—যে "শুভক্ষণ" উপস্থিত হইবার যথোচিত পূর্ব্বেই বুঝিতে পারে—

"ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সম্মুখপথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহ কাজ লয়ে রহিব
বল কি মতে ?
বলে' দে আমায় কি করিব সাজ,
কি ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন্
বরণের বাস ?"

খৃষ্টান সাহিত্যে "বর" দেখিবার জন্য এইরূপেই প্রস্তুত থাকিবার কথা আছে—আমাদের অদ্বৈত নিত্যানন্দ এইরূপেই মহাপ্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্ব

কবি রবীন্দ্রনাথকে একটা সাম্প্রদায়িক দলের নেতা করিয়া তোমরা বড়াই করিয়াছ—অথবা কবি রবীন্দ্রনাথকে তোমরা একটা সম্প্রদায়-বিশেষের কবি মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গে লড়াই করিয়াছ। এ জন্য কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে গোল বাধিয়াছে। রক্ত-মাংসের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—সুপুরুষ সুরসিক সুগায়ক রবীন্দ্রনাথ, শিলাইদহের রাইয়ত-শাসক, বোলপুরের "ইস্কুল-মাষ্টার" রবীন্দ্রনাথ—কোন লোকের প্রীতির কারণ হইয়া থাকিতে পারেন, কোন লোকের বিরাগভাজন হইয়া থাকিতে পারেন। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ কোন সমাজ-বিশেষের কর্ত্তা থাকিতে পারেন—কোন অনুষ্ঠান-বিশেষের প্রবর্ত্তক থাকিতে পারেন—কোন প্রতিষ্ঠানবিশেষের ধুরন্ধর থাকিতে পারেন ;—ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য স্থলে অসংখ্য মতপরিবর্ত্তন, চরিত্রপরিবর্ত্তন, কর্ম্মপরিবর্ত্তন করিয়া থাকিতে পারেন, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পরস্পরবিরোধী কার্য্যপ্রণালী প্রচার বা অনুসরণ করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে যাইয়া সেগুলির দিকে তাকাইও না। অথবা যদি কোন সংবাদ লও, তাহার দ্বারা কাব্যকে বুঝিতে চেষ্টা কর। সেই ব্যক্তিত্ব তোমার ভাল লাগে কি মন্দ লাগে বলিয়া কবিতারাশিকে ভাল কি মন্দ বলিও না। কবি রবীন্দ্রনাথ কোন দলেরই নেতা নহেন—কবি রবীন্দ্রনাথ কোন সম্প্রদায়েরই পৃষ্ঠপোষক নহেন—তিনি হিন্দু কবি,—অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় মর্ম্মকথার প্রচারক।

ভারতবর্ষকে তোমরা কোন একটা সম্প্রদায় বা গণ্ডী বা দল বা মতবাদে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। হিন্দুও তাহাই,—হিন্দুত্বকে বাঁধাবাধির মধ্যে রাখিতে পারিবে না। ভারতবর্ষ সর্ব্বগ্রাসী, হিন্দুত্ব সর্ব্বগ্রাসী। ভারতবর্ষ যুগে যুগে দেশে দেশে যাহা দিয়াছে তাহাকেই

আমরা হিন্দুত্ব বলিয়া থাকি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই ভারতবর্ষের দান—তিনি আমাদের সেই ক্রমবিকশিত চিরপ্রকাশমান হিন্দু।

বাজে আবরণগুলি লইয়া তর্ক করিও না—তোমার আমার দলাদলিগুলি ভুলিয়া যাও। হিন্দু-ব্রাহ্মের দুদিনকার খেলাধূলাগুলি "সকল ফেলে মায়ের কোলে ছুটে" এস—বঙ্গভারতীর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তানের বাণী শুনিতে থাক। তাঁহার চেহারা ভুলিয়া যাও—তাঁহার ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া যাও, তাঁহাকে তুমি চেন সে কথা মনে রাখিও না। সেই বাণীর মধ্যে, সেই কাব্যের মধ্যে, সেই চিন্তার মধ্যে তুমি ভারতবাসী বিংশশতাব্দীতে যাহা চাও সকলই পাইবে—বলিতেছি, সকলই পাইবে—সমগ্র ভারতবর্ষকে পাইবে—হিন্দুত্বকে পাইবে—যোগ, ধ্যান, মূর্ত্তিপূজা, জাতিভেদ সবই পাইবে—বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র হইতে বন্দা বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সকল রত্নই পাইবে। এই ভাবপুঞ্জের মহাসাগরে ঝাঁপ দেও—চিত্তকলেবর ধৌত স্নাত শুদ্ধ হইবে—স্বাস্থ্য অর্জ্জন করিতে পারিবে—চরিত্র গঠন করিতে শিখিবে। এই শুভ্রচিন্তারাশির অপরূপ মণ্ডল হইতে নিঃশ্বাস গ্রহণ কর—অন্তঃকরণ পূত পবিত্র স্নিগ্ধ হইবে। তোমরা বেদান্ত উপনিষদ্ গীতা বাল্মীকি তুকারাম কবীর রামদাসের নাম মাত্র শুনিয়াছ। হায় শিক্ষিত ভারতবাসী, তোমরা এ সকল অমূল্য গ্রন্থ চোখে দেখ নাই—দেখিলে সংস্কৃত বুঝিবে না, হিন্দী বুঝিবে না, মারাঠী বুঝিবে না! না বুঝ ক্ষতি নাই—আমাদের বাঙ্গালীর 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত' আছে, হরনাথের 'উপদেশামৃত' আছে, প্রসাদী সঙ্গীত আছে—বৈষ্ণবপদাবলী আছে। আর আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ আছেন। ভাবুক রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্য আলোচনা কর—এই বিংশশতাব্দীর উপনিষদ্গীতা-বেদান্তকে—এই বিংশশতাব্দীর 'অভঙ্' 'কীর্ত্তন' মাল্সীকে—বাঙ্গালীর এই "গ্রন্থ সাহেব"কে জীবনের উপদেষ্টা কর—প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিবে, প্রকৃত ভারত সন্তান হইতে পারিবে;—বিংশ শতাব্দীর জন্য তোমার যে গুরু কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহা পালন করিবার উপযোগী মানুষ হইতে পারিবে।

এত কথা বলিলাম। কারণ আছে। আমাদের বিশ্বাস—রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, তাহার ফলে আর যাহাই হউক—তাঁহাকে একটা নূতন সঙ্কীর্ণ সমাজের ছোট-খাট দলভুক্ত একজনরূপে বাড়িয়া উঠিতে হইয়াছে। বিশাল হিন্দু-সমাজের মধ্যে তাঁহার জন্মনিকেতন, তাঁহার আবেষ্টন অনেকটা বিচ্ছিন্ন সমুদ্র-দ্বীপের ন্যায় লোক-হৃদয়ে বিস্ময়মাত্র সৃষ্টি করিত। হিন্দু সমাজ তাঁহাকে এই কারণে তাহার নিজেরই একজন ভাবিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহার সকল কথাকেই বিদেশী মাল, পাশ্চাত্যের আমদানী, ব্রাহ্ম-সমাজের "নূতন আলোক" ইত্যাদি বলিয়া জনসাধারণ সন্দেহ করিয়াছে। এজন্য তাঁহার mysticismকে কেহ বা দুর্ব্বোধ্য অলীকতা, কেহ বা অহিন্দু "নূতন কিছু" ভাবিতেন। আমরা বলিব—এইরূপ বিবেচনা করা হিন্দু-সমাজের আত্মরক্ষার প্রয়াসমাত্র—এই দ্বন্দ্ব অতি স্বাভাবিক। যাহার সঙ্গে সমাজগত কোন যোগ নাই বরং কিছু কিছু রীতিনীতি-বিষয়ক বিচ্ছেদই আছে, তাহার কথা পূর্ণ অন্তঃকরণে কে বিশ্বাস করিতে পারে?

পাঠকগণ, আমরা হিন্দু—ব্রাহ্মভাবে রবি বাবুকে আমাদের একজন আচার্য্য কখনও

মনে করি নাই। হিন্দুভাবে তাঁহার কাব্যের পরিচয় লইয়াছি। আমাদের জ্ঞানে কবি রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় জনসাধারণের হৃদয়, আকাঙ্ক্ষা, চিত্ত ও বুদ্ধি হইতে চুল মাত্র দূরে দাঁড়াইয়া নাই।

আমরা হিন্দুয়ানীর সেবক—আমরা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রচারক। আমরা বলি—হিন্দুসমাজ বর্ণাশ্রমের জন্যই বাঁচিয়া আছে, উন্নত হইয়াছে। ইহারই ফলে বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত সৌর, ব্রাহ্ম সকল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সম্প্রদায়-গুলি নিঃশব্দে নিজ নিজ দাতব্য দান করিয়া বিরাট হিন্দুসমাজকে যুগে যুগে প্রদেশে প্রদেশে বিস্তৃততর ও দৃঢ়তর করিয়া তাহারই মজ্জায় মজ্জায় পরদায় পরদায় মিশিয়া রহিয়াছে। আমাদের ধর্ম্ম-জীবনে ইউরোপের Crusades নাই, Inquisition নাই, Wars of Reformation নাই, Peace of Westphalia নাই! আমাদের ধর্ম্ম-সংস্কারে, আমাদের ধর্ম্ম-পার্থক্যে রক্তারক্তি নাই। আমাদের বর্ণাশ্রমে সাদা ও কাল লোকের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ী, স্বতন্ত্র জাহাজ, স্বতন্ত্র কায়দার উদ্ভব হয় নাই। আমাদের বর্ণাশ্রমের প্রভাবে একে একে সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রকৃত Compulsory Education, নিম্ন জাতির ক্রমিক উত্তোলন, জাতীয় চরিত্র গঠন, এবং স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের সমাজে Suffragette movement নাই। আমাদের বর্ণাশ্রমের নিয়মে বড় চাকুরে এবং ছোট চাকুরে প্রভেদ নাই, মাহিয়ানার অনুপাতে বিবাহ ও জাতি-ভোজন হয় না। আমাদের বিধানে অদূর-দর্শী socialismএর বা সমাজতন্ত্রবাদের আবশ্যক হইত না; strikes, labour-union, ধর্ম্মঘট, কুলীবিভ্রাট ঘটিত না। আমরা বুঝি—জাতিভেদই আমাদের স্থির উন্নতির চিরসহায়, আমরা যুগে যুগে জাতি-ভেদের বিকাশ সাধন করিয়াছি, এখনও উন্নত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্র সৃষ্টির সূত্রপাত করি-তেছি। জাতিভেদের বিনাশ সাধন করিলে আমরা জগতে থাকিব না, পৃথিবী দরিদ্র হইবে। ইহাকে লইয়া ইহারই সাহায্যে আমরা উন্নত হইতেছি। সময় আসিতেছে—যখন আমরা পাশ্চাত্য সমাজ বন্ধনের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, অসম্পূর্ণতা, দুর্ব্বলতা এবং ভঙ্গুরতা প্রমাণ করিতে পারিব। আমরা আমাদের হিন্দুয়ানী স্বীকার করিতেছি। আমরা সাধক রামকৃষ্ণের ভক্ত, পাগল হরনাথের শিষ্য।

এই চোখেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সম্পদকে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দান বুঝিতেছি। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ ইঁহারা যে হিসাবে হিন্দু, রবীন্দ্রনাথ সেই হিসাবে হিন্দু। তাঁহারা বৈষ্ণব, কি শৈব, কি তান্ত্রিক—এ তথ্য জানিয়া আমরা বিচলিত হই না। রবীন্দ্রনাথও ব্রাহ্ম এ তথ্য জানিয়া বিচলিত হইব কেন? রবীন্দ্রনাথ হইতে যখন তুমি কাল-হিসাবে দূরে সরিয়া যাইবে, তখন ত বিচলিত হইবার কারণ থাকিবে না। ইউরোপ আজ স্থান-হিসাবে বহুদূরে। এজন্য তাহারা বৌদ্ধ, সৌর, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম এ পার্থক্য বুঝে নাই। তাহারা ভারত-আত্মার বাণী শুনিয়াছে। এজন্যই তাঁহাদের সমাজে যুগান্তরের পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইতেছি। পাশ্চাত্য জগৎ রবীন্দ্র-নাথকে হিন্দুস্থানের বাণী-মূর্ত্তিরূপে বুঝিয়াছে। হিন্দুস্থানের নর-নারীগণ, তোমরাও সাময়িক এবং স্থূল ও ক্ষুদ্র সীমাগুলি অতিক্রম করিয়া ইহাকে তোমাদের স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি-রূপে গ্রহণ কর।

৭৫ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ সোণার ভারতের কণামাত্র দান করিয়াছেন। সেই কণিকার আস্বাদেই খৃষ্টান আজ হিন্দু-কবির চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে, ইউরোপ দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহারা এক নূতন জগৎ দেখিল, এ জন্যই এত বিভোর, এত আত্মহারা। ভারতবাসী, তোমার বিংশশতাব্দীর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-কাল আগতপ্রায়। দিব্য চক্ষে ভবিষ্যৎচিত্র সুস্পষ্টরূপে দেখিতেছি। ভারতবর্ষ, একজন উদীয়মান কবির কথায় বলিলাম—

> ''তোমারি চরণ তলে
> রহিয়াছে পড়ি
> দৈন্যনাশী ধরণীর সমগ্র রতন।"

বিশ্বচিন্তায় ভাবুকতা

আমরা বলিলাম—ইউরোপ এক নূতন জগৎ দেখিল।

গ্রীকসাহিত্যে হিন্দুর এই বিচিত্র ভাবুকতা পাইবে না। ইস্কীলাস, সফোক্লীস, ইউরিপিডিস, য়্যারিষ্টফেনিসের রচনায় ভাবুকতা আছে—তাহা এ ধরণের ভাবুকতা নহে। তাঁহারা অদৃশ্যজগতের, অনাদ্যন্তের, অসীমের, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ধার ধারেন না। তাঁহাদের দৌড় Fate, Nemesis, দৈব পর্য্যন্ত। হোমার হইতে য়্যারিষ্টটল পর্য্যন্ত সেই এক কথা—ইহজগতের যাহা কিছু তাহাই চরম—গ্রীকেরা "ততঃ কিং" জানিত না।

প্লেটো হিন্দু ভাবুকতার আভাস পাইতেছিলেন। তাহার শেষ স্তর হিন্দু যীশুর অধ্যাত্মবাদে—"My Kingdom is not of this world." যীশুর নূতন জগৎ-কথা আর আমাদের mysticism অভিন্ন। কিন্তু আগেই বলিয়াছি—ইউরোপের মানুষ, খৃষ্টান-সমাজ যীশুতত্ত্বকে জীবনের কাজে উপলব্ধি করিতে পারে নাই—তাহারা যীশুকে বাদ দিয়া খৃষ্টান!

রোমের কথা ছাড়িয়া দাও—তাহারা সাহিত্য-কলা-দর্শনের ধার ধারিত না। তাহারা লড়াই করিয়াছিল—যুদ্ধ জিতিয়াছিল—লোক শাসন করিয়াছিল। ইহাদের নিকট আইন শিক্ষা করিও।

মধ্যযুগে এস—ইতালীর "ডিভাইন কমেডি" পড়—তাহাতে অনেক নূতন নূতন আশা পাইবে—চিন্তার রোমান্টিসিজ্‌ম্ বা চরম-পন্থিতা পাইবে, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলের আলোচনা পাইবে—সর্ব্বত্র মহান্ বৃহৎ উচ্চভাবের পরিচয় পাইবে—ভাবুকতার বহু চিহ্ন দেখিতে পাইবে—কিন্তু হিন্দুর অনন্তবোধ পাইবে না—"তদাত্মানং সৃজাম্যহং" পাইবে না।

চসারের ভাবুকতায় সমাজের প্রতি বিদ্রুপ পাইবে—বেশ গাল ভরিয়া হাসিতে পারিবে—উপকারও হইবে—কিন্তু ক্ষুধা মিটিবে না—পেট ভরিবে না।

সেক্সপীয়র আটলাণ্টিক মহাসাগর—কূল কিনারা পাওয়া কঠিন—সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ ওখানে আছে—সেক্সপীয়রে ইউরোপের 'বিশ্বরূপ' দেখ। তাঁহার ভিতর এক নূতন রকমের ভাবুকতা আছে—বুঝা কঠিন। তাঁহার বেদনামূলক বিষাদাত্মক tragedy গুলি একবার দুইবার তিনবারদশবার পড়—নানা অবস্থায় নানা মনোভাবের সঙ্গে রোমিয়ো-হ্যাম্‌লেট--সীজার-লীয়ার-ওথেলোর সঙ্গে আলাপ কর, ভিন্ন ভিন্ন বয়সে এইগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাও। পরে দেখিবে—ষোড়শ শতাব্দীর পাশ্চাত্য কবিবরের ভাবুকতা কি প্রকার। অনন্ত প্রেম, অনন্ত-

জ্ঞান, অনন্ত কর্ম্ম, অসীম বাসনা রাশি, উদাস জীবন, চাঁদ ধরিবার প্রবৃত্তি, ধরাকে সরাজ্ঞান, নূতন জগৎজয় করিবার জন্য আলেক্‌জাণ্ডারের ন্যায় ক্রন্দন,—সর্ব্বতোমুখিনী অতৃপ্তি—Divine discontent—এই সবের চূড়ান্ত পাইবে। কিন্তু রসিক-প্রবরের ভাবুকতায় দেখিবে, এই সমুদয়ের সঙ্গে বাস্তবের একটা প্রকাণ্ড বিরোধ রহিয়াছে;—দেখিবে প্রকৃতি, জগৎ, সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র, পরিবার—এই সকল সত্যকার ঘটনা—প্রকৃত মানব-জীবনের এই আবেষ্টন (environment) বা বিশ্বশক্তি মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ উদ্যমকে ব্যর্থ করিতেছে, ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া নূতন আকার দিতেছে। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে, প্রথম অবস্থায়—

"প্রভাত কিরণে সকাল বেলাতে, মন লয়ে
সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
*   *   *
আমার কুসুম কোমল হৃদয় সহেনি কখনও
রবির কর,
আমার মনের কামিনী পাঁপড়ি সহেনি
ভ্রমর চরণ ভর,
চিরদিন সখি হাসিত খেলিত,
জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত,"

তার পর—বাস্তবের সহিত পরিচয় ও দ্বন্দ্ব, প্রকৃতি হইতে আঘাত প্রাপ্তি এবং চৈতন্য লাভ, বেদনা, বিষাদ, মত্ততা, মৃত্যু—

"সহসা সজনি চেতনা পেয়ে
সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় আমার হারিয়েছি।"

সুতরাং বেশী লাফালাফি করিও না—যাহা রয় সয় তাহাই কর, দেশের মাটির দিকে তাকাও—সমাজের দিকে তাকাও—মানুষের দিকে তাকাও—এই জগতের দিকে তাকাও। সেক্সপীয়ার আর বেশী দূর উঠিতে পারেন নাই। তিনি সেই সফোক্লীস ইউরিপিডিসের ষোড়শ শতাব্দীর উত্তরাধিকারী,—খাটি গ্রীক সন্তান—এলিজাবেথের যথার্থ প্রজা—ম্যারিষ্টটলের ছাত্র, বেকনের গুরুভাই। তাঁহার ভাবুকতায়—"কত চতুরানন মরি মরি যাওত, নতুয়া আদি অবসান," অথবা "তাতল সৈকতে বারি বিন্দুসম সুতমিত রমণীসমাজে"—এ ধুয়ার ধোঁয়া পর্য্যন্ত পাইবে না।

কবি পোপ সেক্সপীয়ারের সহোদর:—"The proper study of mankind is man."

গেটের ফৌষ্ট দেখিয়াছি। তিনিও সেক্সপীয়রের আত্মীয়। সেক্সপীয়রের প্রকৃতি ও আবেষ্টন (Environment) যা, গেটের মেফিষ্টোফিলিস ও তাহাই। ইঁহাদের বিবেচনায় ভাবুকতার ফল বিফলতা, নৈরাশ্য—পাগলামী। তাঁহার চূড়ান্ত কথা—Your America is here or nowhere. তোমার স্বর্গ এ জগতেই—বাস্। হার্ডার, সিলার, সোপেনহোয়ারের নূতন কাহিনী, নূতন জগৎ-কথা তাঁহার ভাবুকতায় স্থান পায় নাই।

গ্রীকদিগের Fate, Nemesis, সেক্সপীয়রের বাস্তব আবেষ্টন, জার্ম্মানসাহিত্যের Mephistopheles ও পুলিশ প্রহরী এক গোত্রের শক্তি, মানুষের মুগুর—মানুষকে সর্ব্বদা তাহার দুর্ব্বলতা সসীমতা জানাইয়া দিতেছে, তাহাকে বিফল নিরাশ করিয়া সংসারে মজাইতেছে। এজন্যই ইউরোপের বিচিত্র ভোগ-প্রধান সভ্যতা। তাহারা প্রকৃত অসীমের সংবাদ রাখে না।

আধুনিকের মধ্যে ব্রাউনিঙ্গকে আমাদের

ঘরের লোক করিয়া লইতে পারি। প্রয়োজন হইলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের এক পংক্তিতে ভোজন বেশী কঠিন হইবে না। তাঁহার কাব্যে আত্মার কথা আছে—অধ্যাত্মবাদ বুঝিবার প্রয়াস আছে। যোগী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এ সম্বন্ধে বিলাতের গুরু—কিন্তু তাঁহার রচনাবলীর ভিতর এত বাজে মাল আছে যে তাহা হইতে আমাদের কথা টানিয়া বাহির করা কঠিন—করিয়া লাভও নাই। "With gentle hand touch, for there is a spirit in the woods"—তরলীকৃত হিন্দুত্ব কিছু এখানে পাইবে।

শেলীর হৃদয়ে ভাবুকতা ছিল—তিনি ব্রাউ-নিঙ্গের জ্ঞাতি—হয়ত অগ্রজ। কিন্তু আম'দের আধ্যাত্মিকতা তাঁহার ভিতর খুজিতে যাওয়া বৃথা প্রয়াস।

বোধ হয় মিল্টনের সমগ্র সাহিত্য-জীবনটা একটা অখণ্ড হিন্দু ভাবুকতায় পরিপূর্ণ। পাশ্চাত্য জগতে আর ত কাহাকে এরূপ একটানা ভাবুক, এবং এরূপ হিন্দু ভাবুক পাই না। তিনি ভগবানের শক্তিতে বিশ্বাসবান্—তিনি চেষ্টা করিয়া-ছিলেন—to justify the ways of God to man। এ চেষ্টা তাঁহার ক্ষুদ্র কাব্যের, মহাকাব্যের, গদ্য গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। Comus-এ ধর্ম্মের জয় দেখ, পাশ্চাত্য সভ্যতার এবং খৃষ্টান ইউরোপের "বৃত্রসংহার" বা পুরাণ শাস্ত্র Paradise Lost দেখ—স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্ম্ম, স্বাধীনতার প্রবন্ধাবলী দেখ। আর দেখ Paradise Regained—স্বর্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবেই হইবে—পুণ্যের স্রোত কেহ রুধিতে পারিবে না—"যদি পণ করে থাকিস্ তাহ'লে হবেই হবে"—ভগবানের রাজ্যে পাপের প্রশ্রয় নাই। একি আমাদের জন্মান্তর-বাদের কথা নয়?—আত্মার খোলস-ত্যাগের কথা নয়? যুগে যুগে জন্মজন্মান্তরে মানব-আকাঙ্ক্ষা—তোমার আকাঙ্ক্ষা, আমার আকাঙ্ক্ষা, দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের আকাঙ্ক্ষা যে একদিন না দিন পূর্ণ হইবে—এ আশার কথা, এ ভবিষ্যতে বিশ্বাসের কথা ইউরোপে মিল্টন ছাড়া আর কেহ গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রচার করেন নাই। মিল্টন হিন্দু।

বানিয়ানও তাই—কেবল চিন্তায় নয়—বোধ হয় জীবনেও অনেকটা।

একটুকু ফরাসী সাহিত্যে ভাবুকতার পরিচয় দিতেছি। মধ্যযুগের ট্রুভিয়ার ট্রুবেডোরদের প্রেমসঙ্গীত ও বীরগাথার কথা বলিব না। চতুর্দ্দশ লুইয়ের গৌরব যুগ ও বর্ণনা করিবনা, ফরাসী-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা ও কলবার্টের "সংরক্ষণ-নীতি"র পরিচয় ও দিতে চাহিনা। সপ্তদশ শতাব্দীর মোলিয়ার রেসিন প্রভৃতি কবিগণ গ্রীক আদর্শ কিরূপে নূতন প্রচার করিতেছিলেন সে কথা ও বলিব না। আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর রুসো-ভল্টেয়ার-Encyclopaedist দিগের বিজ্ঞান-যুগের কথা বলিতেছি।

তাহাদের ভাবুকতা ছিল—সে হিন্দুর ভাবুকতা নয়। তাহাতে ভগবদ্‌ভক্তির চিহ্ন পাইবে না, অধ্যাত্ম জগতের সংবাদ পাইবে না। তাহাদের ব্যাকুলতা ছিল, আকুল ক্রন্দন ছিল, অতৃপ্ত বাসনা ছিল; কিন্তু তাহারা বৈরাগ্য বুঝিত না, চামড়ার চোক কাণ ছাড়া তাহাদের আর কোন ইন্দ্রিয় ছিলনা—ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের মত "she gave me eyes, she gave me ears" বলিতে শিখে নাই। তাহারা অতীন্দ্রিয়কে চিনিতে চেষ্টা করে নাই। তাহারা যীশুকে

ইউরোপ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল—Reason কে, স্থূল জ্ঞানকে ভগবানের সিংহাসনে বসাইয়াছিল।

সেক্সপীয়ারের ভাবুকতা দেখিয়াছ—তাহাতে মুক্তি নির্ব্বাণ বৈরাগ্যের গন্ধমাত্র নাই। সবই এই জগতের লাফালাফি বাড়াবাড়ি নাচানাচি। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী ভাবুকতায় ও "আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তির" প্রয়াস পাইবে না। এই ছোট সংসারের খেলা ধূলা লইয়াই যা কিছু দুরাশা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা,—'প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভা দুদ্বাহুরিব বামনঃ,"—তাহার বিফলতা, নৈরাশ্য এবং বেদনা।

প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র ফরাসীর জাতীয় জীবনটাই একটা প্রকাণ্ড হ্যামলেট কাব্য—একটা প্রকাণ্ড সীজার কাব্য, একটা প্রকাণ্ড সেক্সপীয়ারীয় "ট্র্যাজেডি" ১৭৮৯ হইতে ১৮১৫ সাল পর্য্যন্ত (এমন কি ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত) ইউরোপের মানব-জীবন ফরাসী ভাবুকতার বেদনা-মূলক নাট্যকাব্য। এ মহাকাব্যের কবি এখনও জন্মেন নাই। কিন্তু জীবন্ত কাব্যটাই দেখ—ইহা সেক্সপীয়ারীয় ভাবুকতার জীবন্ত ও জলন্ত দৃষ্টান্ত।

এই নাটকের কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র মানব-জগৎ। আগেই বলিয়াছি, ফরাসী জাতি যীশুকে বিদায় দিয়াছে—অতীন্দ্রিয়কে বাদ দিয়াছে। তাহাদের যাহা কিছু এই জগতেরই স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে—ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকায় আবদ্ধ। বিধাতা একলক্ষ শার্লামান, পঞ্চাশ হাজার সীজার, পঁচিশ হাজার আলেক্‌জাণ্ডারের উপাদানে একটি জীবগঠন করিয়াছিলেন। সে ইউরোপের বামন অবতার বীরবর নেপোলিয়ন। মানবসংসারের এই বামন মূর্ত্তি ফরাসী রিপাব্লিকের নিকট ত্রিপাদ ভূমি মাগিয়া লইলেন। এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা—ত্রিভুবনে বিরাট তাণ্ডবের আয়োজন হইল। জাগতিক অসীমতার, সেক্সপীয়ারীয় অনন্ত-বোধের চূড়ান্ত দেখ—মানব নটরাজের নৃত্য দেখ—Pleistocene Epoch হইতে Glacial যুগের উৎপত্তি দেখ—আধুনিক ইউরোপের, শিল্প-বিজ্ঞান-স্বরাজের সৃষ্টি দেখ। ইউরোপের মানদণ্ড-স্বরূপ আল্পস্ পর্ব্বতকে শুস্ত করিয়া ফরাসী জাতিটাকে রজ্জু করিয়া, গঙ্গাবক্ষে রাইণবক্ষে এবং মিসিসিপি বক্ষে চরণ রাখিয়া এই বিরাট পুরুষ মানব-সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন।

এ অপরূপ দৃশ্য ধ্যান করিতে পারিলে তবে হিন্দু শাস্ত্রীয় সাগর-মন্থনের আবাহন বা আগমনী মাত্র বুঝিতে পারিবে। সাবধান, দুর্ব্বল চিত্তেরা এ দৃশ্য দেখিওনা, পাগল হইয়া যাইবে, হতাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই বিভীষিকা, এই বিফলতা-নৈরাশ্য, এই হয়রাণ হওয়া, এই বেদনার আর এক দিকও আছে। এখানে আসিলে শক্ত ও সবল হইতে শিখিবে। এই বেদনায়, এই পাছড়া-পাছড়িতে তোমার চিত্তের মাংস-পেশীগুলি হৃষ্টপুষ্ট হইবে। কল্পনার হ্যামলেট-লীয়ার-সীজার-রোমীয়ো, বাস্তবের এ সবই তুমি নেপোলিয়ান,

"কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল?
মোছরে দুর্ব্বল চক্ষু, মোছ অশ্রুজল!"

যাহা হউক, ফরাসী জাতি আল্পস্ পর্ব্বতের শৃঙ্গে চুরমার হইয়া গেল—ফরাসীর মেরুদণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। ফরাসী ইউরোপের চিন্তায় untouchable paria, অস্পৃশ্য নিন্দিত, পদদলিত, চরিত্র-হীন, নীতি-ভ্রষ্ট

সমাজে পরিণত হইল। তাহার দুর্দ্দশা বুঝিতে চাও? ভিক্টর হিউগোর গ্রন্থ পড়। আর ফরাসী উঠিল না, এখনও উঠে নাই। ফরাসী ভাবুকতার হলাহল দেখিলে! এ গরল কে গিলিতে পারিবে?

অমৃত ত সকলেই ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইয়াছেন। ইতালী স্বাধীন হইয়াছে—জার্ম্মাণি যুক্তরাজ্য হইয়াছে—ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে—জাপানেও জাগরণ আসিয়াছে—সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মে ও চিন্তায় নবযুগ দেখা দিয়াছে। কিন্তু ফরাসীকে কে রক্ষা করিবে? ফরাসী বিপ্লবের বিষ ত কেহই পান করিতে চাহিতেছেন না! ফরাসীর সাধ্য নাই, ইউরোপের সাধ্য নাই। যে দেশে যুগেযুগে ভগবদ্ভক্তির নূতন নূতন পরিচয় পাওয়া যায়, যে দেশে বিজ্ঞান কে সঙ্গী করিয়া বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয়, যে দেশের কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার হয়, যে দেশের সংসারে মুক্তির পথ দেখান হয়, সেই দেশের নীলকণ্ঠই এ হলাহল গণ্ডূষ করিতে পারিবেন।

এখনও দেরী আছে—ফরাসীর এখনও চৈতন্য হয় নাই—হতাশ হইয়া পড়িয়াছে—দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে— মুখে রা নাই—তথাপি এখনও "প্রভাত কিরণে সকাল বেলাতে মন লয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,"—ঠিক যেন সেই ভাব! এখনও ফরাসী হিন্দুকে বুঝিল না—হিন্দুকে স্থান দেয় না—হিন্দু চরিত্রকে সম্মান করে না। জার্ম্মাণি হিন্দুকে সম্মান করিয়া থাকে, ইংরাজ জাতিও সম্মান করিতে শিখিতেছে—কিন্তু জানিয়া রাখিও, ভারতবাসী, ফরাসী এখনও তোমাকে বিদ্রূপ করিতেছে—সে শীঘ্র হিন্দুর বাণী বুঝিতে চেষ্টা করিবে না।

একজন রুশ ভাবুকের পরিচয় দিতেছি—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, বায়রণ, রুসো, ফরাসী-বিপ্লব, সংস্কৃত সাহিত্যের "আবিষ্কার," পাশ্চাত্য-জগতে গীতা প্রচার—ইত্যাদির যুগ স্মরণ কর। সেই সময়কার রুশিয়ায় করমসিন (Karamsin ১৭৬৬-১৮২৬) একজন শ্রেষ্ঠ আজীবন সাহিত্যসেবী। তিনি গদ্য, পদ্য উভয় সাহিত্যেই স্মরণযোগ্য, একখানা জগৎ-প্রসিদ্ধ ইতিহাসের রচনা কর্ত্তা—European Messenger নামক সংবাদ-পত্রের সম্পাদক। তাঁহার সাহিত্যসেবার দ্বারা নানা উপায়ে রুশিয়ার সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র সর্ব্বত্র এক নবযুগ আসিয়াছিল—পিটার দি গ্রেটের তিনি সাহিত্য-মূর্ত্তি।

তাঁহার বাণী শুন—

Do you wish to be a writer? Read the history of the accumulated woes of your race; and if your heart does not bleed as you read, throw down your pen, let it only serve to betray the gloomy coldness of your heart."

তিনি কাঁদিতে জানিতেন, কাঁদাইতে পারিতেন। এই জন্য তাঁহার প্রভাব। তাঁহার Poor Louisa পড়, দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিতে পাইবে, উনবিংশ শতাব্দীর রুশ ভাবুকতা বুঝিবে। তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থের ভূমিকা পড়—ভাবুকতার একটা নূতন দিক বুঝিবে:—"One thing above all others we love, and we have but one desire; we love our country, and desire for its happiness ever greater than fame; we pray that it may never betray the fundamental law of its greatness, but that in accordance with the principles of our Government and of our holy religion it may become more and more closely united;

that Russia may flourish for ages to come, as long as it is permitted to moral things to live upon this earth."

করমসিন জার্ম্মাণ ভাবুকগণের ভক্ত—সকল রুশ ভাবুকই নব্যজার্ম্মাণ সাহিত্যের ভাষ্যকার বা অনুবাদক। তথাপি করমসিন গেটের শেষ কথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই—হিন্দুর অনন্তবোধ তাঁহার ধারণার বহির্ভূত ছিল। God alone can know God—ইহাই তাঁহার বাণী। "The proper study of mankind is man"—বিলাতের ডেঁপো কবি পোপের উক্তি। দেখিতেছি, ভাবুক করমসিন ও সেই সেক্‌স্পীয়র, সেই পোপ, সেই গেটে অপেক্ষা উর্দ্ধে উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার ভাবুকতায় "ততঃ কিম্" নাই।

এখন একবার পাতালে আসা যাউক—

"হোথা আমেরিকা, নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্য বলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার ভূমণ্ডল টলে
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।"

ঠিক কথা—আমেরিকার যাহা কিছু সবই লম্বা চৌড়ায় বেশী, বহরে বড়। তোমরা যেখানে এক টাকা খরচ কর, উহারা সেখানে ৫০ টাকা খরচ করে—উদ্দেশ্য একই, কিন্তু কাজকর্ম্ম চাল চলন, সবই বেশী বেশী। 'ইউরোপ' শব্দটাকে বড় করিয়া লিখ, 'আমেরিকা' কি বুঝিতে পারিবে। ঐ যে "নূতন করিয়া গড়িতে চায়," তাহা আর কিছু নয়—ইউরোপেরই এপীঠ ওপীঠ মাত্র। সেই গ্রীক, সেই সেক্সপীয়র, সেই নেপোলিয়ান, সেই বাস্তব জগৎ, সেই অনন্ত-বোধ-শূন্য অতৃপ্ত বাসনা, সেই অধ্যাত্মবাদ-হীন দুরাশা রাশি পুঞ্জীকৃত হইয়া আটলাণ্টিকের অপর পারে আমেরিকা নাম ধারণ করিয়াছে। ওখানে নূতন কিছুই পাইবে না—নূতনের মধ্যে সবই ফাঁপা, হাল্কা, ভাসা ভাসা, ফোঁপড়া, তর্জ্জন গর্জ্জন, বিজ্ঞাপন-প্রচার, অত্যুক্তি, Superlative Degree।

একটা কথা আছে "The poet wants a home." আমরা বলি—"জায়া চ গৃহিণী গৃহং," "প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং," "অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং"। গৃহস্থালী, পরিবার পালন, সংসার যাত্রা, সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণ, পশু-সেবা, অতিথি-সেবা, দেবসেবা, "পঞ্চ মহাযজ্ঞ"—এই সকল না থাকিলে সর্ব্বমুখী চরিত্র গঠিত হইবে কি দিয়া? শতধারায় হৃদয়ের বিকাশ হইবে কি দিয়া?—প্রকৃত অনন্ত বোধ জাগুক বা না জাগুক,—অন্তরের পিপাসা, প্রেম ভালবাসা, স্বার্থত্যাগ, করুণা দাস্যসখ্য প্রীতি স্নেহ—"গৃহিণী সচিবঃ সখা মিথঃ প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"—এ সকল অন্তর্জগতের গভীর ভাব গম্ভীর ভাব আসিবে কোথা হইতে? আমরা জানি কাব্যের অনেক লক্ষণ, তার একটা এই যে "কান্তা সম্মিততয়া উপদেশ যুজে"। এজন্যই রবীন্দ্রনাথের 'মানস সুন্দরী'। কিন্তু আমেরিকাবাসীর ঘর নাই—বাড়ী নাই—পরিবার নাই—সমাজ নাই—দেশ নাই, অতীত নাই, ইতিহাস নাই। ঠিক ঠিক বুঝিয়া লও। তাহাদের সভ্যতায় হোটেল আছে, Restaurant আছে, ফ্যাক্টরী আছে, ব্যারাক আছে, মেস্ আছে, রেলগাড়ী আছে—বড় বড় থামওয়ালা যোজনব্যাপী মালগুদাম নামে বিশ্ববিদ্যালয় বা ছেলের কারখানা আছে, একটি স্ক্রু টিপিলে ৫০০০ মাইল দূরের কল চালাইবার ক্ষমতা আছে—অহরহ গতায়াত

আছে—উহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার nomad তাতার জাতি। স্থিতি নাই—The rolling stone never gathereth the moss. তাই হৃদয়ের সূক্ষ্মভাব, কবিতা, রসিকতা; ওখানে গজিতে পায় না—সবই শুষ্ক কাষ্ঠ, ইট কাঠ কলকজা, সবই কর্কশ নীরস।

দেশই উহাদের এখনও জমাট বাঁধে নাই—যে যাহা পায় তাহাই করে, আমেরিকা "কোম্পানীর নাগড়া," মানব-জাতির "বার-ইয়ারিতলা"—সকলেই এক ঘা লাগাইতে পারে। ভারতবাসী, তোমরাও বেদ বেদান্ত উপনিষৎ পুরাণতন্ত্র মন্দির মূর্ত্তি লইয়া হাজির হও, সাদরে গৃহীত হইবে। প্রকাণ্ড মাঠ ঘাট পড়িয়া রহিয়াছে, জমি চষ, বসবাস কর—কেহ আপত্তি করিবে না। চেষ্টা করিবে কি?

যাহা হউক, ওখানে অসংখ্য বৈচিত্র্য, অসংখ্য দলাদলি, অসংখ্য অনৈক্য, পরস্পর বিভিন্নতা—কেহ কাহাকে চিনে না—একতা বলিয়া পদার্থ তথা-কথিত "যুক্তরাজ্যে" কিঞ্চিৎ মাত্র ও জন্মে নাই। উহারা নাবালক শিশু জাতি।

উহাদের ভাবুকতা দেখিবে? হুইটম্যান পড়—আমেরিকার যে বর্ণনা দিলাম ইহাঁর রচনার সঙ্গে মিলাইয়া লও। চূড়ান্ত কথা ব্যক্তিত্বঘোষণা—চূড়ান্ত কথা Democracy বা স্বরাজ। সেই ইউরিপিডিস্, সেই পেরিক্লীস, সেই রুসো, সেই টকেভিল—এপীঠ ওপীঠ—বিংশশতাব্দী আর অষ্টাদশ শতাব্দী, অথবা খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী। আগেই বলিয়াছি, লম্বা চৌড়া বোল-চালওয়ালা ইউরোপের নাম আমেরিকা। রগড় দেখিবে—ফিলিপাইনের কথা মনে কর। হুইটম্যানের স্বজাতি উড্রো উইল্‌সন আমেরিকার চূড়ান্ত ভাবুক। তিনি ব্যক্তিত্ববাদের পৃষ্ঠপোষক—তাহার অনেক পরিচয় আছে। যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট হইবামাত্রই বক্তৃতা দ্বারা ঘোষণা করিলেন—তাঁহারা ফিলিপাইনকে স্বাধীন করিয়া দিবেন। রোমিয়োর আকাঙ্ক্ষা, হ্যামলেটের দুরাশা, ফরাসীর ভাবুকতা যাহা—এই রাষ্ট্রনৈতিক মিষ্টিসিজ্‌ম, বা রোমাণ্টিসিজ্‌ম, এই কর্ম্ম-জগতের ভাবুকতা ও ঠিক তাহাই। ফিলিপাইনকে স্বাধীন করা হইবে না—তোমাদের ডায়েরীতে লিখিয়া রাখ। "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া!" John Bull ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তোমাদিগকে যে এক "ম্যাগনা কার্টা" দিয়াছেন—তাঁহার মাসতুত ভাই Brother Jonathan ও ফিলিপাইনকে সেইরূপই একটা দলিল দিয়াছেন!

ভারতবর্ষ এরূপ অত্যুক্তি, লম্বাগলা, আস্ফালন জানিত না। ভারতবর্ষ অনৈক্য স্বীকার করে—ছোট বড়, উচ্চনীচ ভেদজ্ঞান করে—যখন তখন যাহা তাহা বকে না—একটা অলীক ঐক্যের কথা, সাম্যের কথা প্রচার করে না। যতটা রয় সয়, যতটা সম্ভবপর, এই সসীম মানব-জগতে যতটা কার্য্যে পরিণত করা চলিতে পারে হিন্দুরা ঠিক ততটুকুই করিয়া থাকে—ঠিক সেই পরিমাণে সেইটুকু স্বাধীনতা দেয়, সেই পরিমাণে সাম্য, ঐক্য প্রবর্ত্তন করে। এই অধিকারি ভেদ, এই ঐক্যবিশিষ্ট অনৈক্য, এবং অনৈক্যযুক্ত ঐক্য হিন্দুর পরকালবাদের ফল, অধ্যাত্ম-জ্ঞানের ফল, অতীন্দ্রিয় ধারণার অভিব্যক্তি।

এই অতীন্দ্রিয়ের ধারণা আমেরিকায় পাইবে না। এমার্সনের কথা বলিতে চাও? প্র্যাগ্‌ম্যাটিজ্‌মের কথা বলিতে চাও? আগেই বলিয়াছি—আমেরিকা ইউরোপেরই ভাষ্য বা অনুবাদ মাত্র। সেক্‌সপীয়রের

Positivism দেখিয়াছ, mysticism-বর্জ্জন দেখিয়াছ—তাহাই আমেরিকার Pragmatism তত্ত্ব। আর এমার্সন? তিনি কার্লাইলের মার্কিন সংস্করণ—কার্লাইল জার্ম্মানের ইংরাজী সংস্করণ—জার্ম্মাণ এমার্সন অর্থাৎ সোপেনহোয়ার ল্যাটিনের জার্ম্মাণ অনুবাদ। ল্যাটিনটা দারাসিকোর ফারসী হইতে তর্জ্জমা। আর, দারাসিকো ভারতের মূল প্রস্রবণের শিষ্য। প্রত্নতত্ত্বের নিয়মানুসারে সন তারিখ মিলিল কি না দেখিও না। চিন্তার ধারাটা বুঝিয়া লও। Yankee অধ্যাত্মবাদ বুঝিবে।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাশ্চাত্য জল হাওয়ায় হিন্দুর যীশুতত্ত্ব হজম হয় নাই—সমাজে কার্লাইল রাস্কিন টলষ্টয় শোপেনহোয়রেরা "একঘরে" হইয়া আছেন। এমার্সনের ও সেই অবস্থা। ইঁহারা দুইজন চারিজন লোক বই লিখিয়া, গান গাহিয়া, ছবি আঁকিয়া অধ্যাত্মের দিকে, হিন্দু mysticism এর দিকে, বৈরাগ্যের দিকে, বেদান্তের দিকে পাশ্চাত্য মানবকে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু দেশের সমাজে, শিল্পে, রাষ্ট্রে, পারিবারিক জীবনে, তাঁহারা সেই বেদান্তবাদ, সেই সসীমে অসীম, ভোগে ত্যাগ কিছুমাত্র প্রবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য জগতের সমাজ, শিল্প, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম সবই Suffragette আন্দোলন, অবিশ্বাস এবং যুক্তিতর্কের কচ্‌কচানি, রেলগাড়ী টেলিগ্রাম, Struggle for existence, সাম্রাজ্যনীতি, 'মুখে বল ভালবাসি, অন্তরে গরলমাখা"—এই তত্ত্ব বরণ করিয়া লইয়াছে। এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই।

বোধ হয় ভাঙ্গিবার সময় আসিয়াছে—এসিয়া জাগিয়াছে—ইউরোপ কাজেই তাহার পুরাতন বুদ্ধিগুলিকে একবার ঝাড়িয়া বাছিয়া নূতন সংস্করণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ফরাসী ত গতপ্রাণ—নবীন ইতালী জার্ম্মাণির নূতন নূতন আশা বাড়িতেছে, বনিয়াদি ইংলণ্ডের ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। আমেরিকা ও নূতন কথা শুনিবার পথে আসিতেছে। তাহার ভাবুকতা এখনও আবেষ্টনের ধাক্কা খায় নাই—শীঘ্রই খাইবে। আমেরিকা এইবার হ্যামলেটের চৈতন্য লাভ করিবে। তাহার Monroe Doctrine আর টিকিল না! ফিলিপাইন সম্বন্ধেও শীঘ্রই তাহাকে ভাবুকতার রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তবে নামিতে হইবে। জাপানের দৃষ্টি বড় লোলুপ। এদিকে নূতন প্যানামা খালের সঙ্গে প্রাচ্যের ভাব—হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমানের প্রভাব আমেরিকায় নবশক্তি আনিয়া দিবে।

এই নবশক্তির একটা অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য। এই জন্যই পাশ্চাত্য জগৎ তাঁহার হিন্দু মিষ্টিসিজ্‌ম্ বিচিত্র একটু ট্রুইজ্‌ম্, বিচিত্র প্রকৃতিপূজা, বিচিত্র অধ্যাত্মবোধ দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছে। তাহাদের আর একবার সেই ষোড়শ শতাব্দীর Renaissance বা 'নব অভ্যুদয়ে'র পুনরাবৃত্তি হইতে চলিল। তাহারা আবার আমেরিকা আবিষ্কার করিল! একটা নূতন জগৎ তাহাদের চোখে পড়িল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ আনিয়া দিয়াছিলেন "The light that never was on sea or land," জার্ম্মাণেরা আনিয়া দিয়াছিলেন বৃহৎ "Ideas," কার্লাইল আনিয়া দিয়াছিলেন 'Natural Super-naturalism' এবং Heroes বা "Great men," এমার্সন আনিয়া দিয়াছিলেন Representative men. কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা মিটে নাই। নূতন

জগৎ চাই—নূতন প্রাণ চাই, নূতন দৃষ্টি চাই, নূতন আশা চাই—নূতন আলোক চাই।

নূতন জগৎ আর কোথায় পাওয়া যাইবে? উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু সবই ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। "গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে" সবই ত প্রায় দেখা হইয়া গেল—ইউরেণাস নেপচুন রাহুকেতুর পরিবর্ত্তে নবগ্রহে বসিলেন—মার্সের সঙ্গে ও ত আলাপ চলিতেছে! কিন্তু "কত চতুরানন মরি মরি যাওতন তুয়া আদি অবসান"—সেই আদি-অবসান-হীনের পরিচয় কে দিবে? এই ভারতবর্ষ—

"এমন দেশটি কোথা ও খুঁজে
পাবে না ক তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে
আমার জন্মভূমি॥"

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ভূমিষ্ঠ হইবার মূল্য নোবেল প্রাইজ। একলক্ষ কুড়িহাজার টাকা মূল্য ত কিছুই নয়—হিন্দুর নিকট পাশ্চাত্যের শিষ্যত্বই প্রকৃত মূল্য।

পশ্চিমা সাহিত্যের ভাবুকতায় অনেকক্ষণ কাটাইলাম। এখন কিছু পূরবী কথা কহি। পূরবী সাহিত্যে অনেকটা নিজের জিনিষই পাইব—সুতরাং বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু দুঃখের কথা—পূর্ব্বকে চিনি নাই—প্রাচ্যকে চিনিতে শিখি নাই—প্রাচ্যকে চিনাইবার কেহ নাই। একজন ছিলেন—এসিয়ার ঐক্যপ্রচারক, হিন্দু-বৌদ্ধের আত্মীয়তা-প্রবর্ত্তক, ভারতের সহৃদয় বন্ধু, প্রাচ্যের মর্ম্মকথা প্রকাশক। সেই ভাবুক, চিত্র-শিল্পী, দার্শনিক, কবি ওকাকুরাকে চিনিতাম। জাপানের সেই সুসন্তান আজ পরলোকে। তাঁহার উদ্দেশে এক ফোঁটা আঁখিজল ফেলি—ভারতবাসী, তোমরাও তাঁহাকে মনে রাখিও। জাপানী তাঁহাকে ভালবাসে নাই!

আর চিনিতাম উনবিংশ শতাব্দীর অশোক, ধর্ম্মপ্রাণ, স্বজাতিবৎসল, প্রজারঞ্জক, জাপানের রামচন্দ্র, পরোলোকগত মিকাডোকে।

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি।
সপিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥"

তাঁহাকে জাপানের পিটার দিগ্রেট অথবা ফ্রেড্রিক দিগ্রেট মনে করিতে পার। তাঁহার ভাবুকতায়ই জাপানে স্বার্থত্যাগ সুরু হয়—এসিয়ার জাগরণ আরম্ভ হয়।

আর একজন জাপানীকে চিনি—তিনি ভাবুক ওকাকুরার উল্টাপক্ষ। কাউণ্ট ওকুমাকে চিনি। তাঁহাকে না চিনিলেই ভাল হইত। তিনি বোধ হয় জাপানকে মজাইবেন—এসিয়াকেও ডুবাইতে বসিয়াছেন। "মজালে রাক্ষস কুলে, মজিলা আপনি।"

জাপানের আর কাহাকেও চিনি না—. চিনিবার প্রয়োজন নাই। একটা লড়াই করিয়া জিতিয়াছে!—কিন্তু আজ তার আস্ফালনে এসিয়ার মুখ নিষ্প্রভ—সমস্ত প্রাচ্য জগৎ তাহার মত্ততায় নির্ব্বাক্। বেশী বলিয়া লাভ নাই। এ নেশা বেশী দিন টিকিবে না। শীঘ্রই তাহারা এসিয়ার মর্ম্ম বুঝিতে বাধ্য হইবে—আবার এসিয়ার পদতলে লুটাইয়া পড়িবে, এসিয়াকে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিবে। সে ডাকে এসিয়াবাসী সাড়া দিবে—ভাইকে ভুলিয়া থাকিবে না।

এখন পর্য্যন্ত জাপান জগৎকে কিছু দেয় নাই—ইউরোপের নকল করিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির দুর্ব্বলতার ফাঁকে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। একবার গা ঝাড়িয়া দাঁড়াইতে পারিলে কিছুদিন চলিয়া যায়। ইহা জগতের নিয়ম—বিজ্ঞানে ইহার নাম inertia। যাহা

হউক, ভগবান্ যা করেন—মঙ্গলের জন্যই—এসিয়া ত জাগিল।

মহাপ্রাণ চীনকে ভুলিও না। সে তোমাদের আত্মীয়—বহুদিনকার কুটুম্ব—এই সেদিনকার পালের বাঙ্গালায় ও তাহাদের সঙ্গে আমাদের লেন দেন বেশ চলিত। চীন ভারতবর্ষকে বুঝে, জাপান দূরে পড়িয়া বেশী বুঝিল না। চীনা সাহিত্যে ভারতবর্ষকে পাইবে—ভারতবর্ষের ভাবুকতা বেশ পাইবে। কলিকাতার বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের মুচি চীনাম্যানদের দেখিয়া চীনাজাতিকে বুঝিও না। তাহাদের দেশে অনেক গভীরতত্ত্ব আছে। আর এই মুচি, কারিগর, শিল্পীদের মধ্যেও অনেকগুণ আছে। চোখ থাকিলে চিনিতে—মানুষ হইলে তাহাদিগকেও বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে।

চীন আমাদের আত্মীয় বটে—কিন্তু তাঁহাকে আমরা একেবারেই চিনি না। পাশ্চাত্যের একজন বলিয়াছেন—"Better fifty years of Europe than a cycle of Cathay." রামায়ণ চোখে না দেখিয়া তাহার সমালোচনা যাহা, চীনের মানচিত্র দেখিয়া তাহার অধিবাসী সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ সেইরূপ। অথবা একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছিলেন—প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি—যে, "সংস্কৃত ভাষাটা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের একটা জালিয়াতি, সংস্কৃত ভাষা বাস্তবিক কোন একটা ভাষা নয়" !! বুঝিলে—পাশ্চাত্যেরাও চীনকে এইরূপই বুঝিয়াছেন। আমরা তাহাদের সস্তা সংস্করণ পড়িয়া "স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ" হইয়াছি।

এই সঙ্গে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি পশ্চিমারা যখন আমাদিগকে নিন্দা করে, সে কথায় বেশী কাণ দিও না। আর যদি ভাল বলে, তাহাতেও গলিয়া যাইও না। সেই প্রশংসার সাহায্যে কাজ হাঁসিল করিবার উপায় বাহির করিও।

যাহা হউক, চীনের সাহিত্য বুঝিবার জন্য সত্বর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তোমরা নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িতেছ—দেশের ইতিহাস বুঝিবার জন্য সাহিত্য পরিষৎ, ভারতীয় চিত্রকলা সমিতি, জাতীয় শিক্ষা সমিতি, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সমিতি, হিন্দুসাহিত্য-প্রচার-পরিষৎ কত কি গড়িতেছ? ভারতবাসীকে চীনের ভাষা, চীনের ধর্ম্ম, চীনের সাহিত্য শিখাইবার কোন ব্যবস্থা করিতেছ না কেন? পালি ভাষা দেশের পণ্ডিত-মহলে অন্ততঃ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এবার চীনাটাকে চালাও।

এখন কিছু মুসলমানের কথা বলিব। মুসলমানদের ভাবুকতা আছে—তাহা আমাদেরই ভাবুকতা—হিন্দুর ভগবদ্ভক্তি। তাঁহারা পীরফকীরকে সম্মান করেন, তাঁহাদের বার মাসে তের পার্ব্বণ আছে। তাঁহাদের আজানানামাজে অনন্তবোধ দেখ—আলমে, পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখ, নিজকে ভুলিয়া পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিবার প্রবৃত্তি দেখ। ভারতের মুসলমান ভারতবর্ষের বাণী বহুকাল শুনিয়াছেন। মুসলমানী সাহিত্য, শিল্প, চিত্র, কায়দা কানুন, সঙ্গীত—এ সবের মধ্যে আমাদের অনেক জিনিষ দেখিতে পাইবে। মুসলমানেরাও আমাদের সাহিত্যে শিল্পে পূজা পাঠে তাঁহাদের অনেক কথা শিখিতে পারেন। এজন্যই মুসলমান সাধুসন্তদের শ্রাদ্ধবাসরে, মহরমের জনতায়, রামলীলা-গম্ভীরা-ভরত বিলাপ ইত্যাদি উৎসবে হিন্দু মুসলমান একপ্রাণ হইয়া যায়। তারপর সুফীধর্ম্মের ভাবুকতা—সে ত আমাদেরই বৈষ্ণব ধর্ম্ম। আরবী "লয়লা মজনুনের" গল্প শুনিয়াছ?

দেখিবে—বাধার প্রেম কাহাকে বলে। মৃত্যুকালে গজনীর মামুদ কাঁদিয়াছিলেন। কেন—ভাবিয়া দেখ। আলেক্‌জাণ্ডার নূতন রাজ্য জয় করিবার জন্য কাঁদিয়াছিলেন। রক্ত-পিপাসু গজনীর মামুদ সেজন্য কাঁদেন নাই। এই ক্রন্দন চিরদুর্ব্বলের আকুল ক্রন্দন—সসীম মানবের অসীমে প্রীতি—"তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম সুতমিত রমণী সমাজে"—সেই ধুয়া। উর্দ্দু ভাষায় সুপ্রচলিত এই ধুয়ারই একটা "বয়েদ" শুনঃ—"নাসির ওঠ, কোমর কো বাঁধো, বিস্তর কো উঠাও, রাত রহে গেই থোড়ী।" সংসার ছাড়িবার "সময় হয়েছে নিকট"—শেষ খেয়ায় পাড়ি দিবার বেলা হইল—"আপন রতন বেছে নেচে চল হরি ব'লে ডাকি"—মুসলমানেরা এসব কথায় অভ্যস্ত।

কালিদাসের পরিপূর্ণ হিন্দুজগৎ

ভাবুকতার এক তরফা গাহিলাম—ইহার আর একদিক আছে। হিন্দুর ভাবুকতা কেবল আশার, আকাঙ্ক্ষার, বাসনার, বিশ্বাসের সামগ্রী মাত্র নয়। হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা কেবল ভাবরাজ্যের, চিন্তারাজ্যের, ধ্যানধারণার বিষয়ীভূত নয়। কেবল গ্রন্থ লিখিবার জন্য হিন্দু মুনিঋষিগণ একটা অধ্যাত্মবাদের, একটা অনাদ্যন্ত অতি-জগতের, জন্মমরণাতীত সংসারের সৃষ্টি করেন নাই। ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজই আধ্যাত্মিকতাময়। ভাবুকতার, অতীন্দ্রিয়তার, ভগবদ্ভক্তির দর্শনবাদ হিন্দুর বাস্তব জীবন হইতে উদ্ভূত, হিন্দুর প্রতিদিনকার কার্য্যকলাপে, প্রতি আচার ব্যবহারে নিবদ্ধ। এই সকলের সাহায্যে mysticismকে আমাদের ঘরে গ্রামে সমাজে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। এই অনন্তবোধ হিন্দুর ভোগ-সংসার-গৃহস্থালীকে, বিবাহ-শ্রাদ্ধকে, রাষ্ট্র-শিল্প-সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আমাদের রীতিনীতি, আমাদের জন্মান্তরবাদ, আমাদের পরকালবাদ, আমাদের দিগ্বিজয়, আমাদের কৃষি, পশুপালন, ব্যবসায়, অতিথি-সেবা, পল্লীসভ্যতা, আমাদের সঙ্গীত, মূর্ত্তিগঠন-কারুকার্য্য, আমাদের বৈরাগ্য, আমাদের ব্রহ্মচর্য্য, আমাদের গার্হস্থ্য, আমাদের বানপ্রস্থ, আমাদের সন্ন্যাস—জীবনের সকল অভিব্যক্তিই এই বিচিত্র ভাবুকতার, আধ্যাত্মিকতার, এই অতীন্দ্রিয়তার সাক্ষী—আজও, এই অবনত ভারতেও, তাহার জীবন্ত প্রমাণ।

সেই জন্যই আমাদের কেবল উপনিষদ্‌গীতা-বেদান্ত আছে তাহা নহে। আমাদের মহাভারত পুরাণতন্ত্রসংহিতাও আছে। আমাদের কেবল যোগ, ধ্যান সূক্ষ্মদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, নিষ্কাম কর্ম্ম, কৈবল্যপ্রাপ্তি মুমুক্ষুত্ব আছে তাহা নহে—এই সমুদয়ের অতিরিক্ত, এবং এই গুলিকে চিত্তে ও কর্ম্মে, অভ্যাসে ও জ্ঞানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের অধিকারিভেদ, জাতিভেদ, মূর্ত্তিপূজা, সকাম সাধনা, ব্রত, আরাধনা, পূজাপাঠ, উৎসব আমোদ সঙ্গীত সবই আছে। আমরা অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিয়া থাকি—যেখানে সেখানে বেকুবের মত, পাগলের মত Don Quixoteএর "লিবার্টি, ফ্রেটার্নিটি, ইকোয়ালিটি" জাহির করিয়া বেড়াই না। আমরা বৈচিত্র্য স্বীকার করি—অথচ ঐক্যকে, সাম্যকে বাদ দিইনা।

সুতরাং হিন্দু ভাবুকতার সকল দিক বুঝিতে হইলে—ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের, আমাদের জাতীয় আধ্যাত্মিকতার সম্পূর্ণ চিত্র দেখিতে হইলে কেবলমাত্র আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভক্তি,

যোগ, নির্ব্বাণ, মুক্তি, অনন্ত, অসীম, ভূমানন্দ বুঝিলে চলিবে না। হিন্দুর সৌন্দর্য্যবোধ বাস্তবকে, Positiveকে বাদ দিয়া, শিল্প-বিজ্ঞান-জড়পদার্থকে বাদ দিয়া, ইহ জগৎকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সংসারকে তুচ্ছ করিয়া বিকশিত হয় নাই। ভোগের দিক, রসের দিক, প্রবৃত্তির দিক, সমাজবন্ধনের দিক, রাষ্ট্র-শাসনের দিক, শারীরিক শক্তির দিক, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জাহাজতত্ত্ব, আকরতত্ত্ব—সকলই হিন্দুর অধ্যাত্মজ্ঞানে তাহাদের যথানির্দ্দিষ্ট স্থান পাইয়াছে।

কাব্যে হিন্দু জগৎ দেখিবে—সাহিত্যে সোনার ভারত দেখিতে চাও—আধ্যাত্মিকতার দুই দিক—ভাবুকতার উভয় পক্ষ—হিন্দু সমাজের সনাতনী বাণী—উপলব্ধি করিতে চাও?—বিক্রমাদিত্যের কালিদাসকে গুরু কর। তাঁহার শকুন্তলা-মেঘদূত নয়, এমন কি কুমারসম্ভবও নয়—রঘুবংশকে চির সহচর কর। রঘুবংশের সমাজ সংসার গৃহস্থালী, রাষ্ট্রশাসন, রঘুবংশের আদর্শ, দর্শনতত্ত্ব, চিন্তাপ্রণালী, কর্ম্মপ্রণালী ধ্যান করিবে। বুঝিবে তোমরা কি—তোমাদের প্রাণ কোথায়, বিশেষত্ব কোথায়—বুঝিবে প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে, যথার্থ গৃহস্থ কাহাকে বলে, ধর্ম্মের জয়, পাপের পরাজয় কাহাকে বলে। দিলীপ রঘু রাম-চন্দ্রের সাধনা বুঝিও—অগ্নিবর্ণের অধঃপতন বুঝিও—প্রজারঞ্জন দেশহিত পরোপকার বুঝিও—এবং এই নশ্বর জগতের শেষ কথাটা বুঝিও। রামচন্দ্রের অযোধ্যা "কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা" কেন হইয়াছিল* বুঝিও, পবিত্র রঘুবংশ অগ্নিবর্ণে লয় পাইল কেন বুঝিও। "তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম" সবই অস্থায়ী—কিছুই থাকিবে না, যতই লাফালাফি কর, কিছুই টিকিবে না—এই তত্ত্ব বুঝিয়া জীবন গঠন করিতে শিখিও; আর হিন্দুর ভবিষ্যতে বিশ্বাসটা বুঝিও—এই জন্য "রঘুবংশে"র উনবিংশসর্গের শেষ শ্লোকটা গভীরভাবে ধ্যান করিও—কেন অগ্নি-বর্ণের সাধ্বীপত্নী "অন্তর্গূঢ়ং ক্ষিতিরিব নভোবীজমুষ্টিং দধানা" রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। সূর্য্যবংশ ছারখার হইল—তথাপি হিন্দু কবি আশা ছাড়িলেন না।

রঘুবংশের এই শেষ কথা—হিন্দুর চরম কথা—গীতার আশা-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতেছি—

"তব চরণের আশা, ওগো মহারাজ
ছাড়ি নাই! এত যে হীনতা, এত লাজ,
তবু ছাড়ি নাই আশা!
তোমার নির্দ্দিষ্ট কালে
মুহূর্ত্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে।
আছ তুমি অন্তর্যামী এ লজ্জিত দেশে,
সবার অজ্ঞাত সারে হৃদয়ে হৃদয়ে
গৃহে গৃহে রাত্রি দিন জাগরূক হয়ে
তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ!
আমি ছাড়ি নাই আশা, ওগো মহারাজ!"

কালিদাসের কারিগরী—কালিদাসের জগৎ-সৃষ্টি দেখাইতেছি। কালিদাসে ভাবুকতার positive পক্ষ এবং transcendental পক্ষ, উভয়পক্ষই বুঝাইতেছি। কবিবরের বীর রঘু নিজ বাহুবলে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেন—দিগ্বিজয় করিয়া রোমীয় সেনানায়ক-গণের ন্যায় অসংখ্য রাজা মহারাজা সামন্ত মহাসামন্তকে বন্দী ও ভৃত্যভাবে ধরিয়া আনিলেন,—

"ইতি জিত্বা দিশো জিষ্ণুর্ন্যবর্ত্তত রথোদ্ধতম্।
রজো বিশ্রাময়ন্ রাজ্ঞাং ছত্রশূন্যেষু মৌলিষু॥
কিন্তু ধরিয়া রাখিলেন না—শীঘ্রই বিদায়

দিলেন। সেই সকল উন্নতশির বীরগণের মস্তক রাজ-দরবারে প্রকাশ্য সভায় রঘুবীরের শ্রীচরণ স্পর্শ করিল—

তে রেখা ধ্বজ কুলিশাতপত্র চিহ্নং
সম্রাজ শ্চরণ যুগং প্রসাদ লভ্যং।
প্রস্থান প্রণতিভি রঙ্গুলীষু চক্রুঃ
মৌলিস্রক্‌চ্যুত মকরন্দ রেণুগৌরম্‌॥

ভোগের চূড়ান্ত—ক্ষাত্রধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা—সাংসারিকতার শেষ নিদর্শন! আলেক্‌জাণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ন তাঁহাদের কীর্ত্তি বর্ণনার জন্য এরূপ স্তাবক এখনও পান নাই।

কিন্তু আমাদের ভারতীয় নেপোলিয়ন দিগ্বিজয়ের পর মুহূর্ত্তেই কি করিলেন জান?—ইউরোপের হোমার হইতে এমার্সন-ইবসেন্‌ পর্য্যন্ত কাহারও মাথায় তাহা আসিবে না। পাশ্চাত্য ভোগী মানব-সমাজ, তাহা তোমার বোধগম্য হইবে না—কাণের ভিতর ঢুকিলে ও মরমে পশিবে না। রঘুবীর শিখিয়াছিলেন-—তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, তোমাদের রেসিডেন্‌শ্যাল্‌ মঠে বসিয়া নয়—গুরুগৃহে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে জীবন যাপন করিয়া শিখিয়াছিলেন:—

"ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাং।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং॥"

দেদার টাকা রোজগার কর—কিন্তু কিসের জন্য? কেবল দান। বেশী কথা বলিও না। তাবন মূর্খশ্চ শোভতে যাবৎ কিঞ্চিন্নভাষতে! মূর্খতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে! সেই ভয়ে? তাহা নহে—পাছে সত্য হইতে দূরে সরিয়া পড় সেই কারণে সুসংযতবাক্‌ হইবে। অসংখ্য শত্রু জয় করিবে—কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রোশ ও বর্ব্বরতার প্রশ্রয় দিও না। রোমীয় সেনানায়কেরা যে ভাবে বন্দিগণকে শকটের পশ্চাতে বাঁধিয়া লইয়া "triumph" করিতেন সে ভাবে নয়। "স্বশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ"—কেবল যশের জন্য, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মপালনের জন্য, আত্ম-সুখভোগের আকাঙ্ক্ষায় নয়। গৃহস্থ হইও—দার পরিগ্রহ করিও—কিন্তু বর্ব্বরোচিতপশু-স্বভাব-নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়লালসায় নয়—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—পুত্রলাভ তোমার ধর্ম্মকর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বুঝিয়া রাখিও।

রঘুবীর সংসারে সন্ন্যাস, ভোগে বৈরাগ্য, প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তির এইরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন। সুতরাং দিগ্বিজয়ের চূড়ান্ত বিলাসের পর—

"স বিশ্বজিত মাজহ্রে যজ্ঞং সর্ব্বস্বদক্ষিণম্‌।
আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব॥"
এবং "কাকুৎস্থ শ্চির বিরহোৎসুকা বরোধান্‌।
রাজন্যান্‌ স্বপুর নিবৃত্তয়েহনুমেনে॥"

ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য দেখ—সসীমে অসীমের প্রভাব দেখ। বাস্তবে অতীন্দ্রিয়ের বিকাশ দেখ—Positiveএ mysticismএর আধিপত্য দেখ। "জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ" দেখ। সেক্সপীয়র mysticism বাদ দিয়া positive. কালিদাস পজিটিভ্‌ বাদ না দিয়া, পজিটিভ্‌কে সঙ্গে লইয়াই মিষ্টিক্‌। সেক্‌সপীয়রে বাস্তব এবং অধ্যাত্মের বিরোধ দেখ, এবং শেষ পর্য্যন্ত বাস্তবের জয়লাভ দেখ। কালিদাসে এই দুইএর সন্ধি দেখ, সমন্বয় দেখ। সেক্‌স্‌পীয়রের উল্টা কালিদাস, কালিদাসের উল্টা সেক্‌সপীয়র। উঁহারা ইউরোপ—আমরা ভারত।

রঘু এমন এক যজ্ঞ করিলেন—যাহার দ্বারা হাতে কলমে প্রমাণ করিয়া ছাড়িলেন "সব ধর্ম্ম মাঝে ত্যাগ-ধর্ম্ম সার ভুবনে।"—সর্ব্বস্ব দান করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন।

দধীচির অস্থিদান এই ভারতেই হইয়াছিল। জনকরাজা বুদ্ধদেব এই হিন্দুস্থানেই জন্মিয়াছিলেন। এই ভারতেই মহারাজ অশোক ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র বৈষয়িক রাজ্যকে ভগবদ্দত্ত দেবোত্তরমাত্ররূপে পালনীয় মনে করিয়াছিলেন। এই হিন্দুস্থানের শিক্ষা-প্রভাবেই যীশু প্রাণ দিতে শিখিয়াছিলেন। এই ভারতেই হর্ষবর্দ্ধন, ধর্ম্মপাল, রাজেন্দ্র-চোল একাধারে নেপোলিয়ন ও যীশুখৃষ্ট—একাধারে সীজার ও পোপ—রাষ্ট্রবীর ও ধর্ম্মগুরু—তোমরা যাহার খারাপ দিকটাকে বল Cæsaro-Papist.

রঘুবীর বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সমাধা করিলেন। ভারতের নেপোলিয়ান ফকির হইলেন! দেখিলে ভাবুকতার দুইদিক—দেখিলে আধ্যাত্মিক আদর্শের জগৎ গঠন। এই 'জীবন্মুক্ত' রাজার আর একটা চিত্র দিতেছি। বরতন্তু-শিষ্য কৌৎস গুরুদক্ষিণার জন্য ১৪ কোটি মুদ্রা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন—এত আদায় করিবার জন্য কোথায় আর যাইবেন? হিন্দু সমাজ রাজতন্ত্র—হিন্দুর রাজা বিদ্যা ও ধর্ম্মের একজন প্রধান 'সংরক্ষক' ও পরিপোষক। কৌৎস "বর্ণাশ্রমাণাং গুরুবে" রঘুর নিকট আসিলেন—ফকিরে ফকিরে মিলন হইল। রঘু পূর্ব্বেই যে "মৃৎপাত্রশেষামকরোদ্-বিভূতিং"—তাহা ত সমাবর্ত্তমান নবীন স্নাতকের জানা নাই। রঘু মাটির ভাঁড়ে করিয়া খুদকণা দান করিতে আসিলেন। ভিখারী দেখিল, ধনকুবের স্বয়ংই আজ "সর্ব্বত্যাগী শঙ্করে"র উপাসক—বর্ষার মেঘ আজ একেবারেই জলশূন্য। অতএব "আসি মশায়,

"স্বস্ত্যস্তু তে নির্গলিতাম্বুগর্ভং
শরদ্ঘনং নার্দ্দতি চাতকোঽপি॥"

ইহার নাম হিন্দু ধর্ম্ম—হিন্দুজাতি-ভেদ—হিন্দুর বর্ণাশ্রম—হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা। আগে গভীর ভাবে বোঝ—দুইপাতা হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, প্র্যাগম্যাটিজম আর কার্লমার্কস্ পড়িয়া পাশ্চাত্য "ঋষির" ভাবুকতায় মুগ্ধ হইও না!

হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মের আদর্শ এই দেখিলে—হিন্দু কবির পূর্ণ ভাবুকতা দেখিলে—আদর্শ হিন্দু চিন্তাবীরের শিল্প-নৈপুণ্য, কারিগরি, জগৎসৃষ্টি দেখিলে। আমরা পূর্ব্বে অনেকবার এসব কথা বলিয়াছি। ভারতীয় চিত্র সমালোচনার উপলক্ষ্যে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা আবার বলিতেছি:

"যে কোন উপায়ে বাস্তব জগতের অপদার্থতা ও নশ্বরতা প্রমাণ করিলেই হিন্দু সভ্যতা প্রকাশ করা হইল না। ইহসংসারকে হীন দেখাইলেই আধ্যাত্মিকতা প্রমাণিত হইল না। অঙ্গের সৌষ্ঠব নষ্ট করিলেই, শরীরকে ক্ষীণ ও অবসন্ন ভাবে আঁকিলেই ধর্ম্মপ্রাণতা ভাবুকতা ব্যক্ত করা হইল না। হিন্দুর 'শিল্পশাস্ত্রে' মাপজোকের খুঁটিনাটি বড় কম ছিল না। হিন্দুর 'নীতি-শাস্ত্রে' দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন বিষয়ে সামান্য মাত্র নিয়ম ভঙ্গের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা ছিল। এখনও নগণ্য পল্লী গ্রামের রমণীরাও জানেন যে, মূর্ত্তিগুলিকে বিকৃত ভাবে গড়িলে শিল্পী ও গৃহস্থের প্রতি আরাধ্য দেবদেবীগণ অসন্তুষ্ট হন।

হিন্দুর বিচারে—শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্। হিন্দু বিষয়-কর্ম্মে অমনোযোগী ছিলেন না, সংসারকে বাস্তবজগৎকে অবহেলা করেন নাই—পরিবার পালনকে, গৃহস্থ-ধর্ম্মকে উপেক্ষা করেন নাই। হিন্দু ইন্দ্রিয়ের জগৎকে

বিনষ্ট করেন নাই—তাহার উপর অতীন্দ্রিয়ের ছাপ মারিয়াছিলেন; হিন্দু ভোগকে বর্জ্জন করিতেন না, ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা, অনাসক্তির দ্বারা ভোগবাসনাকে শান্ত সংযত নিয়ন্ত্রিত করিতেন। হিন্দুর বিধানে মানবজীবনের সকল অভিব্যক্তিই—পার্থিব সকল অনুষ্ঠানই যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে। এইজন্য হিন্দুর বৈরাগ্য, হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা এবং হিন্দুর পরকালবাদ অলীক ধারণা মাত্র ছিল না—হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত না। পরন্তু সংসারের কার্য্য-কলাপসমূহই ধর্ম্মভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইত, ভোগের অনুষ্ঠানগুলিই আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত হইত, সমাজের সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠানই বৈরাগ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত।

ইহার ফলে হিন্দুর ভাবুকতা,—হিন্দুর সন্ন্যাসে, ব্রহ্মচর্য্যে, গার্হস্থ্যে, রাষ্ট্রে, শিল্পে, পল্লীজীবনে, সকলের অভ্যন্তরেই স্বকীয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কার্য্যতঃ সকল ক্ষেত্রে সন্ন্যাস ও সংসারের সমন্বয়, ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য বিধান, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্ধিস্থাপন, ইহাই হিন্দুর সনাতন সাধনা। তাই হিন্দুর আদর্শ কবি কালিদাস হিন্দুর আদর্শ গৃহস্থ-নরপতির জীবন চিত্রিত করিয়াছেন :—

জুগোপাত্মান মত্রস্তো ভেজে ধর্ম্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ॥

তিনি আত্মরক্ষা করিতেন, কিন্তু ভয়ের জন্য নয়; তিনি ধর্ম্মের নিয়ম পালন করিতেন—কিন্তু অনুতাপের বশে নয়। তিনি ধন গ্রহণ করিতেন—কিন্তু লোভের প্রভাবে নয় তিনি সুখ ভোগ করিতেন,—কিন্তু আসক্তির জন্য নয়।

সুতরাং হিন্দুর সনাতন আদর্শে—আত্মরক্ষা, ধর্ম্মের নিয়ম পালন ও সুখভোগ—সকলেরই যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এই সকল জাগতিক, সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্য্যাবলী হিন্দুর বিচারে গর্হিত ও নিন্দনীয় নহে।”

রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণতা

কবি রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু ভাবুকতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াছি—কিন্তু তাঁহার কাব্যনাট্যহাস্য-গদ্যের মধ্যে হিন্দু সমাজের পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবাদের, হিন্দুর সনাতন সৌন্দর্য্যবোধের, উভয়-পক্ষবিশিষ্ট ভাবুকতার পরিচয় পাইব কি?

আমাদের বিশ্বাস—কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে কালিদাস-বিবেকানন্দের ন্যায় প্রকৃত হিন্দুর আকাঙ্ক্ষা ও আশা দিয়াছেন, আমাদিগের হৃদয়ে অনাদ্যন্ত অসীমে প্রীতি জাগাইয়াছেন, উৎকট-বৈরাগ্যের শিক্ষা দিয়াছেন, ভবিষ্যতে জ্বলন্ত বিশ্বাস রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি কিছু গড়েন নাই। তাঁহার প্রতিভার সীমা এইখানে।

হিন্দু যেমন গড়িত তিনি তেমন কিছু গড়েন নাই। তাঁহার কাব্যে আমরা জীবনের আদর্শ পাইয়াছি—কিন্তু কিরূপ জগৎ গড়িয়া তুলিব —কিরূপ সমাজ গড়িয়া তুলিব—কোন্ সংসারে বাস করিব— সাধারণ গৃহস্থালীর মধ্যে ভাবুকতা, আধ্যাত্মিকতা, অতীন্দ্রিয়তা কি উপায়ে কতখানি প্রবেশ করিবে, সেই রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবারের সকল অঙ্গের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ থাকিবে—সে সব কারিগরী তিনি শিখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তাঁহার ‘গোরা’-‘স্বদেশীসমাজ’-‘প্রকৃতির প্রতিশোধে’ বিংশশতাব্দীর সেই সসীমে অসীম, গার্হস্থ্যে সন্ন্যাস, ভোগে ত্যাগের সংসারযাত্রা দেখিতে পাই না।

তাঁহার ‘নদী’ সাগরে যাইয়া অনন্ত সুখ পাইয়াছে জানি। কিন্তু নদীর উৎপত্তিস্থান

সম্বন্ধে 'শিশু'র যে curiosity, যে ব্যাকুল প্রশ্ন, সেই প্রশ্ন আমরা আমাদের ভারতীয় জীবন-গঙ্গার অনতিদূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

বিংশশতাব্দীর ভারতীয় "মহা মিলনের," সেই সাগর সঙ্গমের পরিপূর্ণ চিত্র তিনি আঁকিতে পারেন নাই। যাহা আঁকিয়াছেন তাহা তাঁহারই প্রচারিত আশা-বিশ্বাস-আদর্শের অনুরূপ হয় নাই।

হোমার একটা জগৎ গড়িয়াছিলেন—সফক্লীস ইউরিপিডিস গড়িতে জানিতেন—দান্তে গড়িয়াছিলেন—সেক্সপীয়র, মিল্টন গড়িয়াছিলেন। ইউরোপের শেষ কারিগর জর্জ্জ ইলিয়ট, টেনিসন ও গেটে।

ইঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ গড়িয়াছেন—evolution-বাদের যুগ গড়িয়াছেন—জড়বিজ্ঞানের যুগ গড়িয়াছেন—কর্ম্ম-বিজ্ঞানের যুগ গড়িয়াছেন। ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত এই যুগ চলিয়াছে—এখনও আর কিছু কাল টেনিসন-গেটে-ইলিয়টের বিজ্ঞান-কর্ম্ম-রাষ্ট্র-অভিব্যক্তিবাদময় যুগে পাশ্চাত্য জগৎ চলিবে। নূতন গড়া এখনও ওদেশে আরম্ভ হয় নাই—পুরাতন জগৎই এখনও চলিতেছে। কার্লাইলের প্রভাব স্থায়ী হয় নাই—ব্রাউনিঙ্গ ও ভাসিয়া যাইতেছেন। পাশ্চাত্য জগতে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও ভাসিয়া যাইবে। নবীন ইউরোপ-গঠনের এখনও দেরী আছে। ভাবুকতা mysticism, আধ্যাত্মিকতা উহাদের সমাজের মজ্জায় ঢুকিতে দেরী লাগিবে। যীশু হইতে আজ ২০০০ বৎসর হইয়া গেল—এখনও ইউরোপ যথার্থ ভাবুক হইতে শিখিল না!

রবীন্দ্রনাথ গড়িতে পারেন নাই। তিনি হিন্দুর আদর্শ দিয়াছেন—বিংশশতাব্দীর ভারতীয় জন সাধারণের মুখে আধ আধ ভাষা দিয়াছেন। আমরা উড়িতে শিখিয়াছি—কিন্তু এখনও আস্তানা খুঁজিয়া পাই নাই। রবীন্দ্রনাথ একটা বিংশশতাব্দীর হিন্দু জগৎ গড়িতে পারেন নাই। এই খানেই তাঁহার প্রতিভার সীমা।

কবি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের জগৎ গড়িতে পারেন নাই—বিংশশতাব্দীর "রঘুবংশ" তিনি রচনা করিতে পারেন নাই। বিক্রমাদিত্যের যুগে কালিদাস হিন্দু সমাজের পূর্ণ প্রতিবিম্ব। কালিদাসের কাব্যে চতুর্থ শতাব্দীর পরিপূর্ণ হিন্দুত্ব দেখিতে পাইবে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক হিন্দুর এক অর্দ্ধ—প্রথম অর্দ্ধ—আশার অর্দ্ধ—"ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশাভরা আহ্লাদে"—সেই অর্দ্ধ;—"আসিবে সেদিন আসিবে"—সেই অর্দ্ধ। অপর অর্দ্ধ কে পূরণ করিবে? বিংশ শতাব্দীর হিন্দু মহাকাব্য কোন্ কবিবর গঠন করিবেন?—এ কাব্য যে সমগ্র জগতেরই মহাকাব্য হইবে।

বোধ হয় গড়িবার সময় আসে নাই। বোধ হয় কৃষ্ণচরিত্র-মেঘনাদ-বৃত্রসংহার-চন্দ্রগুপ্ত-দুর্গাদাস-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস-রৈবতকে তাহার সূচনা হইতেছিল। বোধ হয় সময় এখনও আসে নাই বলিয়া সেই মালমশলাগুলি রবীন্দ্রনাথে ছড়াইয়া পড়িয়া হীরার টুকরায় পরিণত হইল। রবি-দ্বিজেন্দ্র-মাইকেল-হেম-নবীন-বঙ্কিম-ভূদেবের যৌথ উত্তরাধিকারী কে হইবে? বিংশ শতাব্দীর বৈরাগ্য-বিজ্ঞানাবতার পূর্ণ-কালিদাসকে কবে আমরা মাথায় করিয়া নাচিব?

যে শক্তি লইয়া কালিদাস জন্মিয়াছিলেন, সেই শক্তি লইয়াই রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছেন। নিজ মানস-সুন্দরীর প্রতি কালিদাসের যে ভক্তি ছিল—তাহার জীবনদেতার প্রতি,

রাজরাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ও ঠিক সেই ভক্তি রহিয়াছে। কালিদাসে ও রবীন্দ্রনাথে চিন্তার হিসাবে আদর্শের হিসাবে তফাৎ করিতে পারিবে না। কালিদাস ভারতবর্ষকে, হিন্দুত্বকে যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও ঠিক সেই রূপই বুঝিয়াছেন। দুইজনেই সসীমে অসীমকে সমান ভাবে উপলব্ধি করিতেছেন, Postiveযুক্ত Mysticismকে, বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ভাবুকতাকে একই প্রণালীতে ধরিতে পারিয়াছেন। 'রঘুবংশে'র মূলমন্ত্রের কিছু পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন দেখ সেই মূলমন্ত্র রবীন্দ্রনাথে কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে :—

"হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্ম্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব্ব কর্ম্মস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার!
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্য কর্ম্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে!"

এই তত্ত্বেরই ক্ষীরটুকু, এই উভয় পক্ষবিশিষ্ট ভাবুকতার সারাংশ কথঞ্চিৎ দার্শনিক ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে—"ধূপ আপনারে মিলাইতে চায় গন্ধে"—সেই কবিতায়।

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ—
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।"

ইহা হেঁয়ালি নয়—বুজরুকি নয়—দুর্ব্বোধ্য অলীক অস্পষ্টতা নয়। ইহা 'রঘুবংশে'র বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ভাবুকতা—হিন্দুর খাঁটি স্বদেশী mysticism.—হিন্দুর জাতিভেদ ও বৈদান্তিক সাম্য, মূর্ত্তিপূজা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। "ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং" শ্লোকটা আর একবার ধ্যান কর।

এই তত্ত্বকে রঘুবংশের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা মনে করিও, এবং "বন্দেমাতরং" মন্ত্রের বিস্তৃত ভাষ্য রূপে গ্রহণ করিও।

রবীন্দ্রনাথে ও কালিদাসে উনিশবিশ করিও না। কালিদাস একটা হিন্দুর সম্পূর্ণ সংসার—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের সংসার গড়িয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথ তাহা গড়েন নাই। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের সমাজ-জীবন গড়েন নাই। এই প্রভেদ। যদি আর কোন প্রভেদ দেখিয়া থাক—তাহা হইলে সেটুকু চতুর্থ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দীর প্রভেদ, এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের কায়দায় এবং বঙ্গ ভাষাও সাহিত্যের কায়দায় প্রভেদ। যদি তাহার উপর আর কিছু প্রভেদ দেখ—তবে বলিব—তুমি কালিদাসকে ত বুঝই নাই—রবীন্দ্রনাথকে ওবুঝিলেনা। বোধ হয় ভারতবর্ষকে তুমি কোন দিনই বুঝিবেনা। দুর্ভাগ্য আমরা!

শেষ কথা

এখন আমরা কাব্যামোদী পাঠকগণকে একটি কথা বলিয়া বিদায় হইব। কাব্যের সমালোচনা, সাহিত্যের রসবোধ ইত্যাদির অর্থ কোন লেখককে বা কোন ব্যক্তি বিশেষকে নিন্দা বা প্রশংসা করা নহে। সুতরাং সেই ব্যক্তি বিশেষের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন

তথ্য জানা নাই—এইভাবে সাহিত্য-সমালোচনায় অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। আজ কালিদাস জয়দেব চণ্ডীদাস কাশীরামকে ভারতবাসীরা যে নিরপেক্ষ চোখে দেখিতেছেন, সেই চোখেই বঙ্কিম-মাইকেল-হেম নবীন-দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথকেও সেইরূপ সমালোচনার বস্তু ভাবেই দেখিতে হইবে। ইঁহাদের জীবন বৃত্তান্তের যেটুকু ঐতিহাসিক তথ্য আমরা জানি সেইগুলির সাহায্য লইয়া তাঁহাদের রচনা মাত্র বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহাদের মনুষ্যত্বের, মতামতের, দোষগুণের, চরিত্রবত্তার দিক হইতে যে সকল কথা উঠিবে তাহা অন্যান্য কারণে অতি প্রয়োজনীয় হইতে পারে কিন্তু সাহিত্য সমালোচনা হিসাবে অবান্তর।

কিছুকাল হইতে পশ্চিমদেশে 'Art fo Art's sake-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে তাঁহারা বিবেচনা করেন—কাব্য, সাহিত কারুকার্য্য, চিত্র, শিল্প ইত্যাদির দ্বারা ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই, সমাজের চরিত্র গঠিত হইতেছে কি অধঃপতিত হইতেছে তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই বই পড়িতেছ পড়, ছবি দেখিতেছ দেখ—এসব বেশী তলাইয়া দেখিও না—সমাজের উপর-ইহাদের কি প্রভাব তাহা আলোচনা করিও না।

আমরা এ মতের পক্ষপাতী নহি—আমরা সমালোচনা-বিজ্ঞানের যে সূত্র প্রচার করিলাম তাহাকে ইংরাজী বুক্‌নিতে বলা যাইতে পারে —'Art, not artist' অথবা 'Principle, not person.' অর্থাৎ কাব্যকে, সাহিত্যকে, মতবাদকে, ভাস্কর্য্যকে, চিত্রকে গভীরতম ভাবে বুঝ—তলাইয়া মজাইয়া বোঝ—ইহাদের ভিতরকার কথা টানিয়া বাহির কর—সমাজের উপর, দেশের উপর, ধর্ম্মের উপর এইগুলির প্রভাব ভাল কি মন্দ তাহা অবশ্যই 'যাচাইয়া,' খুব কঠিন কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখ। কিন্তু যে লোক ছবি আঁকিয়াছেন, যে গুণী কবিতা লিখিয়াছেন, যে সাহিত্যসেবী সাহিত্যসৃষ্টি করিতেছেন তাঁহার ব্যক্তিত্ব, জীবনযাপন ইত্যাদি জানিবার জন্য বেশী উদ্‌গ্রীব হইও না।

সাহিত্যসেবী সম্বন্ধে আমাদের এই মত—কিন্তু ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, জননায়ক প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের মত স্বতন্ত্র। তাহা আগে বলিয়াছি।

আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা করিলাম না। কবিহিসাবে রবীন্দ্রনাথকে চিনিতে চেষ্টা করিলাম। প্রকৃত সমালোচনা করিতে হইলে দেশের কথা, দশের কথা, সমাজের কথা, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কথা, আমাদের ভবিষ্যতের কথা, কবির সাহিত্য-জীবনের উপাদানের কথা, রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবিকাশের কথা ইত্যাদি জগতের সকলপ্রকার ভাব ও কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিতে হইত। সেই শক্তিপুঞ্জের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব কোথায় এবং মনুষ্যত্ব কোথায় তাহা বিশ্লেষণ করিতে হইত। কিন্তু সেরূপ ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও তুলনা-মূলক সমালোচনার সময় এখনও আসে নাই। এমন কি বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-ভূদেব-নবীনেরও এরূপ প্রাণ-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজ-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সমালোচনার সময় আসে নাই। কাজেই এখন আমরা রবিবাবুর সাহিত্যজীবনের কয়েকটা মোটা কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

কবিহিসাবে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত ভক্ত, কবিহিসাবে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত শাক্ত, কবি

হিসাবে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত প্রেমিক। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যের ন্যায় অসীমেরও ভূমানন্দের উপাসক। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের ন্যায় স্বদেশ-ভক্ত—সর্ব্বত্যাগী শঙ্করের পূজাপ্রবর্ত্তক। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবের প্রতিমূর্ত্তি—প্রকৃতি-রাজ্যের প্রজা—পল্লীরাণীর ভৃত্য—স্বাধীনতার চারণ।

আর যদি ভারতবর্ষ কখনও বিক্রমাদিত্যের গৌরবযুগ ছাপাইয়া উঠিয়া জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে মাথা তুলিতে পারেন—সেই দিনকার ভারত-বাসী ভারতবর্ষকে কালিদাসের জন্মভূমি অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি বিবেচনা করিয়া গৌরব করিবেন;—সেদিন যদি না আসে—তাহা হইলেও কালিদাসও রবীন্দ্র-নাথকে একই সিংহাসনে বসাইয়া তুল্য আনন্দ উপভোগ করিবেন। আমাদের জাতীয় জীবন ভবিষ্যতে যেরূপ দাঁড়াইবে তাহার উপরই কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের তুলনার আসন-বিভাগ নির্ভর করিতেছে।

লেখক যতক্ষণ নরজগতে জীবিত থাকেন ততক্ষণ তাঁহার ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিক্ তাঁহার সাহিত্যসেবার উপর পাঠকগণের একটা প্রীতি বা অপ্রীতি না আনিয়া যায় না। ততক্ষণ, 'Art, not artist'—কবির কাব্য দেখ, ব্যক্তিত্ব দেখিও না—এই তত্ত্ব সুপ্রচলিত হওয়া কঠিন। লেখকের পক্ষেও সেই ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া রাখিয়া জনসাধারণের মতামত আকৃষ্ট করা অসম্ভব। সেই অবস্থায় স্বয়ং কবিই ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিতে বাধ্য হন:—

দুর্ব্বল মোরা কত ভুল করি,
অপূর্ণ সব কাজ!
নেহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা
আপনি যে পাই লাজ।
তা বলে' যা পারি তাও করিব না?
নিষ্ফল হব ভেবে?
প্রেম ফুল ফোটে, ছোট হ'ল ব'লে
দিবনা কি তাহা সবে?

কিন্তু ব্যক্তিত্ব মানুষের চিরকাল থাকে না—ব্যক্তিত্বের প্রভাব জনসমাজ হইতে জীবনলীলার সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়—

"তুমিও রবে না আমিও র'ব না
দুদিনের দেখা ভবে।"

মানুষ যখন লোকের স্মৃতি মাত্রে পর্য্যবসিত হয়,—কবি যখন লাভ-দুঃখের সংসার এবং কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্বময় নশ্বর জগতের অতীত হন, যখন তিনি মানুষের হিংসা-দ্বেষ-প্রীতি-সৌহার্দ্দ্যের দান শরীরি ভাবে গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তখন, বলাবাহুল্য, এ সঙ্কোচ বোধ করিবার কেহ থাকেন না—কর্ত্তৃত্বাভিমান লইয়া কাহাকেও বিব্রত হইতে হয় না, নিন্দা প্রশংসার প্রভাবে কাহারও চিত্ত-বিকারের উদ্ভব হয় না। সেই সময়ে সমাজের ভবিষ্য সন্তানগণ 'Art, not artist'-তত্ত্ব নিরপেক্ষভাবে বুঝিতে পারে,—দেশবাসীরা কোন সাময়িক উত্তেজনার প্রভাব অতিক্রম করিয়া বিশ্বাস করিতে পারে—

"কত প্রাণ পণ, দগ্ধ হৃদয়,
বিনিদ্র বিভাবরী,
জান কি বন্ধু উঠেছিল গীত
কত ব্যথা ভেদ করি?
রাঙা ফুল হ'য়ে উঠিছে ফুটিয়া
হৃদয়-শোণিতপাত,
অশ্রু ঝরিছে শিশিরের মত
পোহাইয়ে দুখরাত।
জীবনে যে সাধ হয়েছে বিফল
সে সাধ ফুটেছে গানে।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্য যখন সেই সমালোচনা-বিজ্ঞানের যুগে আসিয়া উপস্থিত হইবে—তখন ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সমা-লোচকগণ ভারতবর্ষের উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, বিজ্ঞানবীর ও

সাহিত্যবীর দিগের পরস্পর-সম্বন্ধ ও পরস্পর-প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া নব্যভারত-গঠনে প্রত্যেকের কৃতিত্ব বিচার করিবেন, দেশের ও জগতের ভাবুকগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, এবং স্বীকার করিবেন, যে রবীন্দ্রনাথ নিজ কাব্য সমালোচনা নিজে যেরূপ করিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য :—

"কোন ফুল যাবে দুদিনে ঝরিয়া
কোন ফুল বেঁচে রবে।
কোন ছোট ফুল আজিকার কথা
কালিকার কানে কবে।
হয়ত এ ফুল সুন্দর নয়
ধরেছি সবার আগে,
চলিতে চলিতে আঁখির পলকে
ভুলে কারো ভাল লাগে।
যদি ভুল হয় ক'দিনের ভুল!
দুদিনে ভাঙ্গিবে তবে।"

সমসাময়িক সাহিত্যসেবিগণ, সেই ভবিষ্যৎ ভারত-সমাজের সমালোচনায় সেই, 'Art, not artist'-তত্ত্বের নিয়মানুসারে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য কি হইবে তাহা যদি এখনই কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলেই আপনাদের কাব্যরসজ্ঞতা সার্থক হইল। সমসাময়িক স্বদেশবাসিগণ, আমাদের বংশধরেরা হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাব্য-সংস্করণ রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে যে সকল মন্ত্র বেদবাক্যের ন্যায় জপ করিবে, তাহা যদি এখন হইতেই নিরপেক্ষ ভাবে আপনারা বাছিয়া লইতে পারেন, তবেই আপনাদের অভিভাবকত্ব সফল হইবে : সে শক্তি ও সে নিরপেক্ষতা যদি না থাকে তাহা হইলে বৃথা আমাদের সাহিত্য-সাধনা, বৃথা আমাদের স্বদেশ-সেবা, বৃথা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ব বোধ।

কর্ম্মবীর 'সুয্যে'র স্বদেশ-সেবা

(রাজতরঙ্গিণী অবলম্বনে)

কাশ্মীর-রাজ্য যে সময়ে অবন্তিবর্ম্মার শাসনে অবস্থিত ছিল, সেই সময়ে দেশ-মধ্যে জলপ্লাবন-নিবন্ধন বর্ষে বর্ষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছিল। সিন্ধু ও বিতস্তার জলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উভয় তীরবর্ত্তী ভূভাগ প্লাবিত করিতেছিল, সেই মহাবার্ষিক জলপ্লাবন-নিবন্ধন কাশ্মীর-দেশে ধান্যের মূল্য যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের অকাল-মৃত্যুর কারণ-স্বরূপ হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে একখারী ধান্যের মূল্য তৎকালে দশশত পঞ্চাশ দীনার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রকৃতিপুঞ্জের হাহাকার-ধ্বনি কাশ্মীর ভূ-স্বর্গকে নরকের দৃশ্যে পর্য্যবসিত করিয়াছিল। সেই ঘোরতর দিনে যে স্বদেশপ্রেমিক, ত্যাগবীর, সেবাব্রতে দীক্ষিত মহাপুরুষের কল্যাণে দুর্ভিক্ষকালেও একখারী ধান্যের মূল্য দুইশত দীনারের অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই, আমি সেই মহাপুরুষের জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিব বলিয়াই এই ক্ষুদ্র অথচ মহৎ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলাম।

মার্গমার্জ্জনকারিণী সুয্যা-নাম্নী চণ্ডালীর পালকপুত্র, চণ্ডালিনী-স্তন্যপানকারী চণ্ডাল-

জাতিসদৃশ নীচজাতীয় মহাত্মার নাম জগতে স্বর্গবাসী দেবতাগণের যশ মলিন করিয়া রাখিয়াছে। যদিও কবিগণ সেই মহাপুরুষকে চণ্ডালিনী-স্পর্শজনিত অপবিত্রতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার মানসে শূদ্রজাতীয়া রমণীর স্তন্যপানে পরিবর্দ্ধিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু সেই মহাপুরুষ চণ্ডাল-রমণীকেই জননীর ন্যায় ভক্তিপূর্ব্বক চণ্ডালিনী সুয্যা-মাতার নামে নিজ নাম 'সুয্য' রাখিয়া এবং চণ্ডালিনী মাতার স্নেহের স্মরণ-চিহ্নার্থ মহানুভবতার পরিচয় প্রদানে আদৌ কুণ্ঠিত হন নাই। নীচ চণ্ডাল যে জগতের হেয় জীব নহে, এক সুয্যই তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সেবা ও ত্যাগ-বলে বলীয়ান্ চণ্ডালও যে দেবশ্রেষ্ঠ, তাহা আমরা কাশ্মীরের ইতিহাস পাঠে অবগত হই; এই কারণেই হয়ত মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডাল-মিত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া থাকিবেন! চণ্ডাল হেয় নহে—যে হৃদয়ে ত্যাগ ও সেবার উজ্জ্বল জ্যোতি প্রতিভাত হয়, তাহা দেবজ্যোতিকেও মলিন করিতে সমর্থ, ইহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। কর্ম্মই মানবের জাতীয়ত্ব বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে। বৃথা জাত্যভিমান প্রকৃত উচ্চ আদর্শ প্রদানে সক্ষম হয় না। জাত্যভিমান প্রকৃত জাতীয়ত্বের পরিচায়কও নহে।

চণ্ডালিনী-পুত্র, শূদ্রাণী-পালিত সুয্য বাল্যকালে উন্নত শিক্ষালাভ করিতে সক্ষম হন নাই। যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়া তিনি এক গৃহস্থের পুত্রগণের শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপনাকে চণ্ডালিনীসুয্যা-পুত্র অথবা শূদ্রাণীপালিত বলিয়াই অবগত ছিলেন। আত্মসংযমরূপ ব্রতস্নানাদি নিয়ম-পালনে তিনি কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হন নাই। পরোপকার, পরসেবা, আত্মত্যাগ দ্বারা তিনি স্বদেশসেবায় মগ্ন, প্রাণ ও দেহ অর্পণ করিয়া কাশ্মীরবাসী পণ্ডিতগণের একান্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বদেশ-ভক্তি ও স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি হইলে সুয্যের নাম প্রকৃতিপুঞ্জের শ্রুতিমধুর হইয়া উঠিল। কর্ম্মবীর সুয্যের বুদ্ধিমত্তার কথা রাজসভায় উপস্থিত হইল এবং পণ্ডিতগণের সহায়তায় সুয্য কাশ্মীররাজসভায় স্থানপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা; আত্মসংযম ও স্বদেশ-ভক্তি সভাস্থ পণ্ডিতগণকে এতাদৃশ মোহিত করিয়াছিল যে, সভামধ্যে পণ্ডিতগণ সুয্যকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার মুখনিঃসৃত জ্ঞানগর্ভবাক্য শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সুয্য কাশ্মীর-জনপদ ভ্রমণপূর্ব্বক কাশ্মীরের ভৌগোলিক অবস্থা এবং প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা পর্য্যালোচনা দ্বারা স্বদেশসম্বন্ধে বিপুল জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রতি পল্লী, হ্রদ, নদ, নদী ও কৃষিক্ষেত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাঁহার ভূয়োদর্শনজনিত যথেষ্ট জ্ঞান লাভ য়াছিল। যদিও ইতিহাস-লেখকগণ তাঁহার এই নীরব সাধনার কথা উল্লেখ করেন নাই, তত্রাচ তাঁহার কার্য্যাবলীর পারম্পর্য্যশৃঙ্খলা দৃষ্টে তাঁহার কাশ্মীর সম্বন্ধে যে বহুদর্শনের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা কূপমণ্ডূকগণের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

দৈবযোগে একদা মহারাজ অবন্তিবর্ম্মার সভায় দেশের দুরবস্থাবিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ আলোচিত হইতে হইতে স্থির হইল—জলপ্লাবনই এ দেশের দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। জলপ্লাবন নিবারণ দ্বারা কাশ্মীর-ভূমি শস্যশালিনী করিবার উপায় চিন্তনকালে সুয্য বলিলেন—

"আমি জলপ্লাবননিবারণের উপায় অবগত আছি, কিন্তু আমি দরিদ্র অর্থহীন—অর্থহীনের দ্বারা এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার নহে।" সভ্যগণ সুয্যকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিল, কিন্তু সুয্য প্রতিদিন বারম্বার এই মহৎবাক্য উচ্চারণ করিয়া সভ্যগণের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াও—বাতুল বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াও—বিরত হইলেন না।

কর্ম্মবীর সুয্য মহারাজের চিত্তাকর্ষণের জন্যই প্রতিদিন সভাস্থলে উক্ত বাক্য প্রয়োগ করিতেন। একনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত সাধকের বাক্য ভগবৎ-প্রসাদে মহারাজের কর্ণগোচর হইলে, মহারাজ সুয্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"তুমি জলপ্লাবন সম্বন্ধে কি বলিতেছ ?" সুয্য জীবনের একমাত্র সাধনায় ভাবী সিদ্ধির আশায় দৃঢ়নিশ্চিত ছিলেন। তিনি বলিলেন "মহারাজ! আমি জলপ্লাবন নিবারণের উপায় অবগত আছি—কিন্তু কপর্দ্দকশূন্য দরিদ্রের কার্য্য নহে বলিয়া সফলকাম হইতে পারিতেছি না।" সভ্যগণ 'সুয্য বাতুল হইয়াছে' বলিয়া মহারাজকে নিবেদন করিলেও অবস্তিবর্ম্মা সুয্যকে অভয় দানপূর্ব্বক তাঁহার বুদ্ধি-পরীক্ষার জন্য বলিলেন, "আমার ধনাগার তোমার জন্য উন্মুক্ত রহিল—তুমি যথা ইচ্ছা ব্যয় করিতে পার।" মহারাজের ধনরক্ষক সুয্যকে ধনাগার উন্মুক্ত করিয়া দিল—দরিদ্র যুবক বহু সুবর্ণদীনারপূর্ণ ভাণ্ড প্রাপ্ত হইয়া গর্ব্বিত হইলেন না—স্বীয় সুখাভিলাষের জন্যও কপর্দ্দক গ্রহণ করিলেন না—নির্লোভী পর-সেবারত কর্ম্মী ত্যাগের পথে আপনাকে পরিচালিত করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই জল-প্লাবনের মূলকারণ নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি সুবর্ণদীনারপূর্ণ ভাণ্ড সহ নৌকাযোগে বিতস্তানদী-বক্ষে মড়ব-রাজ্যান্তর্গত জলমগ্ন নন্দক-নামক গ্রাম-সীমায় একান্তে একভাণ্ড দীনার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনগণের জ্ঞাতসারে জল-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপর ক্রমরাজ্যের অন্তর্গত যক্ষোদর-নামক স্থানের বহুদূরব্যাপী প্রস্তরখণ্ড-সমাকীর্ণ স্বল্পতোয়া নদীগর্ভে আরও দীনার-ভাণ্ড নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। এই উভয়স্থানের নদীগর্ভ বিতস্তা-স্রোতবেগাগত প্রস্তরখণ্ডে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। নদীগর্ভ প্রস্তরদ্বারা পূর্ণ হওয়া নিবন্ধন তথায় বিতস্তার জলরাশি তীরভূমি প্লাবিত করিয়া নিম্নদেশে প্রবাহিত হইতেছিল। সভ্যগণ সুয্যের এই অসম্ভব কার্য্যের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া বাতুলতার পরিচায়ক বলিয়া মহারাজের শ্রবণগোচর করিল। নৃপতি সুয্যের এবংবিধ কার্য্যের শেষ ফল দর্শনাশায় সভ্যগণের বাক্য উপেক্ষা করণান্তর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অর্থলোভী প্রকৃতিপুঞ্জ পিপীলিকার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে সুবর্ণদীনার লাভাশায় সেই উভয় স্থানের নদীগর্ভে পতিত হইয়া প্রস্তররাশি উত্তোলনপূর্ব্বক তীরে স্তূপাকার করিয়া সুবর্ণের অন্বেষণে বদ্ধ-পরিকর হইল। দশ বৎসরে যে কার্য্য সমাধা হইবার সম্ভাবনা ছিল না, মাসেকের মধ্যে ততোধিক কার্য্য সম্পাদিত হইয়া গেল। নদীগর্ভ প্রস্তরখণ্ড-মুক্ত হইল, নদীর জল তীরদেশ ত্যাগ করিয়া আপনার উন্মুক্ত গর্ভ-পথেই প্রবল বেগে প্রধাবিত হইয়া অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডকে স্রোতবেগে বহুদূরে অপসারিত করিয়া নদীগর্ভ সুগভীর করিয়া দিল। জলমগ্ন নন্দক ও যক্ষোদর নামক বহু গ্রাম উপস্থিত জলপ্লাবনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিল। কর্ম্মই

কর্ম্মীর কর্ম্মপথ সুপ্রশস্ত করিয়া দেয়। সুয্যের সাধনা সিদ্ধিপথাবলম্বী হইলে সুয্য নিয়ত উক্ত কর্ম্মচিন্তা দ্বারা বিপুল জ্ঞানের অধিপতি হইয়া উঠিলেন—নিত্য নিত্য নূতন কর্ম্মদ্বারা সুয্যের কর্ম্মবুদ্ধি প্রখরা হইয়া উঠিল। একজন বিদ্যাহীন শূদ্র যুবক অসামান্য স্থাপত্য-বিশারদের যশোলাভে সমর্থ হইলেন। কীর্ত্তি স্বীয়মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চণ্ডালিনী-পুত্রের কণ্ঠে যশমালা পরাইয়া দিলেন। সভ্যগণ নির্ব্বাক হইল, মহারাজ হর্ষান্বিত হইয়া কর্ম্মবীরের পূজার আয়োজন করিলেন।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণ সুয্যের নিকট প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যত্নবান হইল। দেখিতে দেখিতে বিতস্তার বহু শাখার প্রস্তর-রুদ্ধ মুখ উন্মুক্ত হইয়া গেল—বিতস্তার জলস্রোত প্রত্যেক শাখানদী-পথে প্রবাহিত হইয়া মূল স্রোতবেগ মন্দীভূত করিয়া দিল। সুয্য বুদ্ধিবলে সমবেত জনগণের সাহায্যে বিতস্তার স্রোত এক স্থানে প্রস্তর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া উহার গর্ভস্থ বহু স্থানের শিলাখণ্ড উত্তোলিত করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে স্রোত মুক্ত করিলেন। এই প্রকারে সিন্ধুর গভীরতা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। বর্ষাপ্লাবনে এবং বন্যা-প্রবাহকালে যে যে স্থান ভগ্ন হইবার সম্ভব ছিল, সেই সেই স্থানে নব নব নদীগর্ভ বিনির্ম্মিত হইল।

বিতস্তা ও সিন্ধুর সঙ্গমস্থল পূর্ব্বে বৈশ্য-স্বামীর মন্দির সন্নিকটে ছিল। বুদ্ধিমান সুয্য দেশের হিতকল্পে সঙ্গমস্থল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। সুদীর্ঘ সেতু নির্ম্মাণ দ্বারা মহাপদ্ম হ্রদের জলরাশি নিয়ন্ত্রিত করণানন্তর বিস্তীর্ণ কর্ষণোপযোগী ভূমির বৃদ্ধিসাধন করিয়া বহু পল্লী-স্থাপনের উপায় বিধান করিলেন। যে সমুদায় নিম্ন স্থান বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকিত, তিনি তথাকার জল-নিষ্কাষণ ও সেতু-সংস্থাপন দ্বারা তাহা কৃষিক্ষেত্রে পর্য্যবসিত করিয়া শ্যামলক্ষেত্রে শোভিত করিলেন। তিনি বহুশাখাবিশিষ্টা বহুফণাযুক্তা কৃষ্ণসর্পী-সদৃশী বিতস্তা, সিন্ধু, অস্থনা, প্রভৃতি নদীগুলিকে তাঁহার শাসনে আনয়ন করিয়া কাশ্মীর-দেশের প্রতিনগর ও পল্লীসমূহে লহর খনন দ্বারা নদী-জল প্রবাহিত করিয়া দিলেন; ইহার ফলে গ্রামবাসিগণকে আর বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হইল না। যখন যে গ্রামে জলাভাব উপস্থিত হইত বা কৃষিক্ষেত্রে জলের প্রয়োজন হইত, তখন লহরের সাহায্যে বিনাক্লেশে কৃষিক্ষেত্র জলপূর্ণ হইয়া যাইত। এই প্রকার স্বদেশ-সেবায় তাঁহার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়া তিনি কাশ্মীরবাসীর অতি প্রিয় হইয়াছিলেন। সুয্যের ত্যাগ ও সেবা-বলে কাশ্মীর ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষ দেশত্যাগ করিয়া চির-বিদায় গ্রহণ করিল, সুভিক্ষ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল। শত শত নূতন পল্লী শস্যক্ষেত্রের মধ্যে শোভিত হইল। দেশ-বাসিগণ একখারী ধান্য ছত্রিশ দিনার মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইল।

যে স্থলে বিতস্তা নদী মহাপদ্ম হ্রদ হইতে বহির্গত হইতেছে, সেই স্থানের সন্নিকটে মনোহর নগর নির্ম্মাণ করাইলেন এবং চণ্ডালিনীসুয্যা-জননীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সুয্যনগর নামে অভিহিত করিলেন, এবং 'সুয্যাকুণ্ডল' নামক গ্রাম প্রতিষ্ঠা এবং সুয্যাসেতু নামক সুন্দর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া চণ্ডালিনী মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সুয্যাকুণ্ডল গ্রামটি ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন।

সমগ্র কাশ্মীরবাসিগণ দেবতার নামের স্থায় সুষ্যের নাম ভক্তিপ্রণত হৃদয়ে উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল। সুষ্য কাশ্মীর-বাসীর নিকট আপনার জন অপেক্ষা আপন হইলেন। রাজার অনুগ্রহে দরিদ্রতা বিদূরিত হইলেও, তাঁহার অর্থ স্বদেশ-সেবায় ব্যয়িত হইয়াছিল। কখন স্বীয় সুখ-বিলাসের জন্য ব্যয়িত হয় নাই।

তিনি ধন, মান, সম্ভ্রমে কাশ্মীর মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াও চণ্ডালিনী মাতাকে ভুলিয়া যান নাই। তাঁহার হৃদয়ে গর্ব্ব বা অহঙ্কার উদয় হয় নাই। আজীবন স্বদেশ-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া অন্তিমে জননী জন্মভূমির স্নিগ্ধ ক্রোড়ে মহানিদ্রায় শান্তিলাভ করিয়াছেন। কাশ্মীরবাসী পণ্ডিতগণ অদ্যাপি কর্ম্মবীর সুষ্যের যশ ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—

"কশ্যপ অথবা বলভদ্র জনপদবাসীর যে উপকার করিতে পারেন নাই, সুকর্ম্মা সুষ্য অনায়াসে সেই মহৎ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন। জলপ্লাবন হইতে ধরিত্রী দেবীর উদ্ধার, উপযুক্ত ব্রাহ্মণকে পৃথিবী-দান, জলরাশিতে প্রস্তরময় সেতুবন্ধন ও কালীয়-নাগের দমন এই সমুদায় কার্য্য ভগবান বিষ্ণু চারি অবতারে সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ম্মবীর সুষ্য ত্যাগ ও সেবাবলে একজন্মের মধ্যেই তাহা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।"

ত্যাগ ও সেবাপরায়ণ কর্ম্মবীর চণ্ডালিনী-পুত্র সুষ্যের এই পুণ্যময় উপাখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করিলে স্বদেশভক্তিপরায়ণ জনগণের স্বদেশভক্তি প্রবৃদ্ধ হইবে, ত্যাগ ও সেবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিবে এবং যাঁহারা পোষাকী স্বদেশভক্তিপরায়ণ তাঁহারা প্রকৃত স্বদেশভক্ত হইবেন। এবং অপর সাধারণ নরনারীর হৃদয়ে ত্যাগ ও সেবার মধুরবাণী প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় মধ্যে স্বদেশভক্তির বীজ অঙ্কুরিত করিয়া দিবে।

শ্রীবনওয়ারীলাল দত্ত।

মফঃস্বলের বাণী

ধর্ম্মের আন্দোলন আবশ্যক

মানব-জন্মের প্রকৃত সার্থকতা যেখানে, মানবমণ্ডলীর প্রকৃত গৌরব যাহা লইয়া, মানবত্বের উন্মেষ ও পূর্ণ বিকাশ যাহার অনুশীলনে ও একনিষ্ঠ সাধনে, এক কথায় বলিতে গেলে, একমাত্র যাহার উপরে সমগ্র মানবসমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত, ঢাকার হিন্দুগণ সেই পরমবস্তু ধর্ম্মের সহিতই পরিচিত হওয়ার সুযোগ-সুবিধা পায় না। ঢাকায় এমন কোনও স্থান আছে কি, যেখানে হিন্দুসমাজের জনসাধারণ সকাল-সন্ধ্যায় সম্মিলিত হইয়া অধ্যাত্মতত্ত্বালোচনা ও শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তনাদি করিয়া অনন্ত জীবনপথে চিরোজ্জ্বল জ্যোতি সংগ্রহ করিতে পারেন!

যে ধর্ম্মের অমৃত-উপলব্ধিতে ত্রিতাপ-তাড়নার আশঙ্কা থাকে না, যে ধর্ম্ম শ্রান্তি, ক্লান্তি, বিষাদ, অবসাদ প্রভৃতি বিতাড়িত করিয়া মানবমনকে এক অপূর্ব্ব সজীবতায় উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখে, সেই ধর্ম্মের আলোচনা জাতিনির্ব্বিশেষে চলিতে পারে, এমন একটুকু স্থান এই বিশাল সহরের বক্ষে বহু চেষ্টাতেও খুঁজিয়া পাইতেছি না।

ঢাকার হিন্দুসমাজ ত জনশূন্য নহে, তবে আজিও এই সমাজে ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য একখানি

কুঁড়ে-ঘর-নির্ম্মাণের উদ্যোগ দেখিতেছি না কেন?

যে স্থানে ও যে সমাজে বহু কুবেরকল্প ধনী বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানে সেই সমাজে অর্থের অভাবে এই বাঞ্ছিত ব্যাপারে ব্যাঘাত উপস্থিত করিতেছে বলিয়া ত মনে হয় না।

বহু ধনবান্ হিন্দুর বাসভূমি ঢাকা-নগরীতে হিন্দুসাধারণের প্রবেশযোগ্য ধর্ম্মসভা ও ধর্ম্মভবন নাই, ইহা প্রকৃত পক্ষেই অতীব লজ্জার কথা।

মণ্ডলী-গঠনের একটা মাহাত্ম্য আছে আলোচনা-আন্দোলনের একটা ফল আছে ঢাকায় ধর্ম্মচর্চ্চার একটী স্থান নির্দ্ধারিত হইলে মণ্ডলী গঠন করিয়া যথারীতি শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা, ধর্ম্মবিষয়ক বিবিধ জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি বহু অবশ্য-করণীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারিত। আলোচনায় অন্ধতা দূর হয়, আলোচিত বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মে। এখন অনেক হিন্দুর ঘরেই পারিবারিক ধর্ম্ম-শিক্ষা নাই, বিদ্যালয়ে প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধানে কেহ বড় একটা যত্ন চেষ্টা করেন না, চারিপাশের সংসর্গও এখন পার্থিব ভোগজালে জড়িত, সুতরাং হিন্দুসমাজের ধর্ম্মভাব যেন দিন-দিনই মলিনতা প্রাপ্ত হইতেছে। জীবন-প্রভাতে যাহার সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটিল না, সুতরাং যৌবন-মধ্যাহ্নেও তাহার অনুসন্ধানে কোনও প্রকার আগ্রহ উৎসাহ জন্মিল না। এই রূপেই কিন্তু আমরা এখন জীবন-সন্ধ্যায় বা বার্দ্ধক্যের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি। শক্তিহীন জীর্ণদেহে বা নিশার আঁধারে অনুতাপ ছাড়া আর করিবার কি থাকে?

ভারতবর্ষ সুখময় শান্তিনিকেতন ছিল, কেন? প্রাচীন ভারতবাসী বা আর্য্যগণ পার্থিব একান্ত নশ্বর উন্নতিকে ঘৃণায় পদদলিত করিয়া পরাৎপর 'মহতো মহীয়ান্‌কে' পাওয়ার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষার গুণে তখন পার্থিব সুখের স্ফুরণে বা দুঃখের পীড়নে কেহ হৃষ্ট বা ক্লিষ্ট হইতেন না। প্রাচীন ভারতে অনেকেই ইহলোক বিস্মৃত হইয়া পরকালের জন্য প্রস্তুত হইতেন, ইহারা দু'দিনের পৃথিবী-বাসকে অতিথিশালায় রাত্রি যাপন মনে করিতেন, কাজেই তাঁহাদের মনোমন্দিরে অসুখ, অশান্তি, পাপতাপ কিছুই প্রবেশ করিতে পারিত না। ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মভাবই এই দেশের প্রাচীন সামাজিকদিগকে সর্ব্বদা সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত রাখিত। পারিবারিক ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রবল-প্রভাবে তখন বিবিধ অপকর্ম্ম সমাজে খুব কমই অনুষ্ঠিত হইত। এখন আর সেদিন নাই, অতীতের পথে বিস্মৃতির গভীর তিমিরে আমাদের সেই অধ্যাত্ম যুগ মহাপ্রয়াণ করিয়াছে। পারিবারিক ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাব হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মানসিক দুর্গতি দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

পূর্ব্বের মত ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজে প্রবর্ত্তিত না হইলে আমাদের সামাজিক অসুখ-অশান্তি কিছুতেই দূরীকৃত হইবে না। এখনকার পরিবারে বৈষয়িক কর্ম্মানুরাগ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্থান অধিকার করিতেছে। বর্ত্তমান সমাজে বিদ্যানুশীলনের উদ্দেশ্য অর্থ-উপার্জ্জন, ধর্ম্মনীতির উন্নতি-সাধন নহে। প্রায় পরিবারের অভিভাবকই কেবল ছেলেদের পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সম্পূর্ণ

বৎসরে একমাত্র পরীক্ষার সংবাদ সংগ্রহ করিয়াই তাঁহারা অভিভাবকের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য পালন করিলেন বলিয়া অন্তরে তৃপ্তি লাভ করেন। অভিভাবকগণ একবার ভুলিয়াও অনুসন্ধান করেন না, ভবিষ্যতের ভরসা স্নেহভাজন সন্তানেরা কে কোন্ পথে চলিতেছে, কাহার সহিত মিশিতেছে, কি ভাবে দিন অতিবাহিত করিতেছে! যদি পিতা, পিতৃব্য প্রভৃতি ভবিষ্যদ্দর্শী হইতেন, সন্তানগণের প্রকৃত মঙ্গলপ্রার্থী হইতেন, তবে তাঁহারা ছেলেদের শুধু পাঠশালায় উপস্থিতি ও পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার অনুসন্ধান লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না, নিশ্চয় উঁহাদের আচার-ব্যবহার-সংসর্গের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতেন। সকল দিকে অভিভাবকগণের সযত্ন অনুসন্ধান ও শাসন থাকিলে অবিনয়-অশিষ্টতা প্রভৃতি আমাদের বালক-সমাজকে কখনই আংশিকভাবে গ্রাস করিতে পারিত না। সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতার উৎপীড়নে বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। শীঘ্র ইহার প্রতীকার চাই। আবার হিন্দুর গৃহে গৃহে ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা বিহিত হউক। সকল অবস্থায় সকল শ্রেণীর সমবেত ভাবে ধর্ম্মচর্চ্চার সম্মিলনক্ষেত্র শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হউক। নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে আবার আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হইবে, ধর্ম্মোন্নতিতে আমাদের মানসিক বল বৃদ্ধি পাইবে; চরিত্রে দৃঢ়তা, ত্যাগে সত্যে প্রসন্নচিত্ত হইলেই আমরা যে কোনও মহৎকার্য্য সম্পাদনের প্রকৃত অধিকারী হইব।

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় হিন্দু ধনীদিগকে দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। এত ধনবান্ শক্তিমান্ ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকিতেও এখানে হিন্দুগণের একটীও সাধারণ আলোচনা-গৃহ নাই, ইহা কি ঢাকার পক্ষে লজ্জার কথা নহে! ধনী নির্ধন বহু হিন্দুর লীলাক্ষেত্র এই ঢাকা নগরীতে শাস্ত্রসম্মত একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইলে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে হয়। অনেক সময়ে ঐ কারণে এই স্থানে হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপে বিপদ উপস্থিত হয়।

ঢাকায় হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা-ভবন সংস্থাপিত হইলে একটি চতুষ্পাঠির প্রতিষ্ঠা অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। চতুষ্পাঠীর দর্শন স্মৃতি প্রভৃতির অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেই উপরিলিখিত অভাব-অসুবিধা বেশীদিন থাকিতে পারিবে না।

কেহ এই সদনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইলে সম্ভবতঃ সফলতায় উপনীত হইতে তাহাকে বেশী কিছু ক্লেশভোগ করিতে হইবে না। কেবল উদ্যোগীর আন্তরিক যত্ন চেষ্টা চাই। আশা করি, আমরা শীঘ্রই ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মভবনের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইব, ঢাকার এই অনাকাঙ্ক্ষনীয় অভাব শীঘ্রই দূরীভূত হইবে।

বিশ্ববার্ত্তা।

রাসোৎসবে লোকশিক্ষা

প্রতি বর্ষে পূর্ণিমারজনী ভক্তহৃদয়ে সেই সুদূর অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া সকলকে নির্ব্বাক্যে শিক্ষা দিতেছে, "কীর্ত্তিযস্য স জীবতি"। যুগযুগান্তর অতীতের বিরাট-ছায়ার পশ্চাতে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সেই লোক-চক্ষুরুন্মীলনকারিণী বৃন্দাবন-লীলা কেহই বিস্মৃতিতে নিমজ্জিত করিতে পারেন নাই। চর্ম্মচক্ষে এ লীলার দৃশ্য উপহাসাস্পদ বা অন্য কোনরূপ হইতে

পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিকনেত্রে ইহা বড় মধুর, প্রীতিপ্রদ, ভগবদ্ভক্তির প্রস্রবণ। দার্শনিক বিচারে ইহার অভ্যন্তরে অতি মধুময় উপদেশ, শিক্ষা এবং ভাব নিহিত রহিয়াছে। অবশ্য এ সমস্ত বিষয় আমার বিচার্য্য বা বর্ণনীয় না হইলেও মুখবন্ধে কথাটী উল্লেখ করা দোষের হইবে না মনে করিয়াই বর্ণিত হইল।

কুচবিহারে রাসোৎসব অতি আড়ম্বর সহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এবার তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় নাই। বিগত দ্বিসপ্তাহের প্রারম্ভ হইতেই সকলে এই আনন্দোৎসবে যেন আত্মহারা হইয়া উঠেন। নানা দিগ্‌দিগন্ত হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাবৃন্দ "রাস ঠাকুর" সন্দর্শনাভিপ্রায়ে ভক্তি-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নানা কষ্ট-অসুবিধা সহ্য করিয়া সমাগত হইয়াছিল। শীতের প্রচণ্ড-প্রকোপ উপেক্ষা করিয়া সুদূরসমাগত দর্শক-যাত্রিগণ উন্মুক্ত পাদপতলদেশে রাত্রি-যাপন করিয়াছে। সারাদিন পথপর্য্যটন-পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াও ঠাকুর-দর্শনে তাহাদের সমস্ত কষ্ট বিদূরিত হইয়াছে, তাহারা আপনা-দিগকে কতই না পুণ্যাত্মা ও কৃতার্থ মনে করিয়াছে। ধূসরতুষারবসনাবৃতা সন্ধ্যাদেবী ধরণীতলে স্বীয় অঞ্চল বিস্তৃত করিবার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে সেখানে—বৃক্ষতলে শত শত ইন্ধনানল, শীতনিবারণানল পরিদৃষ্ট হইয়াছে। এ দেশীয়গণের এই সমস্ত কষ্টের কথা সম্যক্ চিন্তা করিলে ইহাদিগের ভগবদ্‌ভক্তি কেমন অচলা, তাহা অবগত হইয়া বিস্ময়ার্ণবে নিমজ্জিত হইতে হয়।

রাস-মণ্ডপ প্রাচীর-বেষ্টিত এবং সুবিস্তৃত। অনেকগুলি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং আধুনিক দৃশ্য অতি পরিস্ফুটভাবে প্রদর্শন করান হইয়াছে। মহারাজ দুষ্মন্ত অদূরস্থিত-মৃগ লক্ষ্য করিয়া শরাসনে শর-যোজনা করিলে মুনিগণ উহা নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিতে করিতে তাঁহার রথপার্শ্বে উপনীত। সারথি অশ্ববল্গা আকর্ষণ করিয়া রথ নিশ্চল করিয়াছে,—রাজা রথ হইতে অবতরণ করিয়া ঋষিসম্মুখে দণ্ডায়মান্। মৃগটী মুনিপার্শ্বে ঊর্দ্ধমুখে নৃপতি-পানে স্থিরদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ধন্য কালিদাস! তোমার লেখনীকে শত ধন্যবাদ! কে বলে মানব মৃত্যুর অধীন? একলব্যের গুরুদক্ষিণা দৃশ্যটীতে গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। রাবণ সীতাকে বামহস্তে ধারণ করিয়া বীরবর পক্ষিরাজসঙ্গে মহাযুদ্ধ করিতেছে। কে সীতার এ দুর্দ্দশাদর্শনে অশ্রুসংবরণ করিতে পারে? কমলেকামিনী দৃশ্যটী বড়ই মনোরম হইয়াছে। কিন্তু কামিনী-ক্রোড়ে হস্তিতুণ্ড-শিশুটী না থাকায় দৃশ্যটী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। ব্যাধের (বেদের) বানর ও ছাগল খেলার দৃশ্যটী এবং সাপুড়ের দৃশ্যটি হঠাৎ দর্শনে সজীব বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া বিচিত্র নহে। সংকীর্ত্তন-দলটী ঠিকই যেন নবদ্বীপ হইতে আনীত হইয়াছে। ধাত্রীপান্নার দৃশ্যটী বেশ হইয়াছে। কেমন করিয়া প্রভুভক্তি দেখাইতে হয় তাহা এই ধাত্রীই শিখিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন। এ জগতে এমন কে আছেন যিনি পরপুত্ররক্ষার্থে চোখের উপর স্বীয়সন্তানের নির্দ্দয়হত্যা নীরবে দেখিতে পারেন? এইরূপ নানাবিধ দৃশ্য অতি পরিস্ফুট ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণাদি মূর্ত্তি-সমূহ ধাতু-নির্ম্মিত এবং মন্দিরাভ্যন্তরে স্থাপিত। বাহির হইতেও বেশ পরিদ্রষ্টব্য।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া রাস-মেলা বেশ চলিয়াছে। প্রত্যহ অসংখ্য নরনারীর

সমাগম দর্শনে ৺কালীবাবুর "লোকারণ্য" শীর্ষক প্রবন্ধের মর্ম্মামৃত বোধ রসনায় বড়ই মিষ্টতা প্রদান করে। ক্রয়-বিক্রয় বেশ হইয়াছে। বিবিধ বিপণি মেলা-ক্ষেত্রে শৃঙ্খলতার সহিত সজ্জিত। তন্মধ্যে মিঠাইয়ের দোকানই অধিক এবং ইহাতে বিক্রয়ও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মেলার মিঠাইসমূহের ভালমন্দ-পরীক্ষক কেহ নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া বোধ হইল না। ময়রাগণের ঘৃত সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য। উহা জ্বালে দিলে এমন বিকট দুর্গন্ধ বিনির্গত হয় যে, তথায় তিষ্ঠান ভার। ইহাতে বোধ হয়, ঐ ঘৃত বেশী পরিমাণে চর্ব্বীমিশ্রিত। এই অখাদ্য ঘৃতপক্ব মিষ্টান্ন প্রত্যহ শত শত নরনারীর উদরস্থ হইতেছে। ইহাতে যে কত মহানিষ্ট ঘটিতে পারে তাহার সংখ্যা নাই।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ

আবার সেই অতি পুরাতন অথচ অতি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে; এ আলোচনা দেশের মধ্যে যতই হইবে ততই স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে দেশবাসীর কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রবুদ্ধ হইবে। বাঙ্গালার মনস্বিগণ বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যহানি দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন; আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র, মনস্বী প্রফুল্লচন্দ্র স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কতবার বাঙ্গালীকে সাবধান হইতে বলিয়াছেন; কিন্তু কে তাঁহাদের কথা শুনে? তাঁহাদের উপদেশ-বাণী "অরণ্য-রোদনে" পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাই মনে হয় এ জাতি বুঝি জাগিবে না; তিল তিল করিয়া অবনতির অন্ধগুহায় নিমজ্জিত হইবে! অনাগত ভবিষ্যতে বাঙ্গালী জাতীয় অস্তিত্ব হরাইয়া ফেলিবে! ফল কথা, অবিলম্বে বাঙ্গালী স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোযোগী না হইলে তাহাদের ভবিষ্যৎ বড় ভয়াবহ, বড় শোচনীয়! আজ আমরা চারিদিকে জাতীয় মৃত্যু-বিভীষিকা দেখিতেছি, তাই আজ কর্ত্তব্যের অনুরোধে সেই বহু পুরাতন কথার অবতারণা করিলাম।

"সুজলা সুফলা" বঙ্গভূমি আজ মহা-শ্মশানে পরিণত, এখানে কেবল হাহাকার—কেবল আর্ত্তনাদ! বঙ্গ-সংসারে এখন একটী হাসিভরা মুখ দেখিবে না—কোথাও হাস্য-কলরব শুনিবে না; দেখিবে কেবল স্ফীতোদর, কোটরগত চক্ষু, কঙ্কালসার জীবগণের মূর্ত্তি, আর শুনিবে কেবল হতাশের আক্ষেপ, পুত্রবিরহিতের মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন! কেন এমন হইল? বঙ্গবাসীর কোন্ পাপের ফলে বঙ্গভূমির এ দুর্দ্দশা? এখন তাহাই ভাবিবার বিষয়। কেমন করিয়া সর্ব্বগ্রাসী কালের মুখ হইতে বাঙ্গালী জাতি রক্ষা পায়—তাহাই করিতে হইবে ও অবশ্য-কর্ত্তব্য জ্ঞানে সেই পন্থা-অবলম্বন ভাবিতে হইবে। নচেৎ রোগে শোকে বর্ত্তমান বাঙ্গালী ভুগিবে, তাহা নহে তাহাদের উপেক্ষার জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরগণও কষ্ট পাইবে। তাহাতে মহান্ প্রত্যবায় সুনিশ্চিত।

বাঙ্গালী স্বাস্থ্যরক্ষায় অবহেলা করিলে তাহার ধর্ম্ম বল, সাহিত্য বল, সমাজ বল,—কিছুই সম্যক্ রক্ষা পাইবে না! বাঙ্গালী তাহার আরাধ্য পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট ও দেবতার নিকট প্রত্যবায়ভাগী হইবে। স্বাস্থ্য-রক্ষা মানবের ঈশ্বরাদিষ্ট কর্ত্তব্যকর্ম্ম—এ কর্ম্মে অবহেলা করিলে তাহারা ইহকালে সুখ পাইবে না, পরকালেও সুগতি হইবে না—প্রাচীন আর্য্য-ঋষির উপদেশের মর্ম্মই এইরূপ। বাঙ্গালী আমরা—আমাদের কাছে

এ উপদেশ নূতন নহে; আমরা জানি "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মূলমুত্তমম্"। কিন্তু জানিলে কি হয়? আমরা জ্ঞান-পাপী বলিয়া আমাদের ভাগ্যে শাস্তির পরিমাণও যেন অধিক।

আমরা যে আজ অবনতির চরম স্তরে পড়িয়া আছি—তাহার মূল কারণ আমাদের স্বাস্থ্যহানি। আমরা সকল বিষয়ে সংযমকে পরিত্যাগ করিয়া বিলাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। সে কালের লোকেরা কত বলিষ্ঠ কত কার্য্যক্ষম, কত চিন্তাশীল ছিলেন,—সে কেবল তাঁহারা সংযমী ছিলেন বলিয়া। কিন্তু হায় এখন আমাদের আহারে, বিহারে, প্রত্যেক কার্য্যে সংযমের পূর্ণ অভাব। তাই আমাদের এই হেয় ঘৃণ্য অধঃপতিত অবস্থা; আমরা স্বাস্থ্যসুখ বিনিময়ে বিলাসের দাস সাজিয়াছি।

বিলাসের মোহময় আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা যে কেবল স্বাস্থ্য-ধনে বঞ্চিত হইতেছি, তাহা নহে—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমাদের আস্থা—সরল বিশ্বাস হ্রাস পাইতেছে। আমাদের স্বাস্থ্যের খর্ব্বতা হেতু নৈতিক অবনতি সংঘটিত হইতেছে—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে; কারণ দেহ ও মন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ। একের ক্রমোন্নতিতে অপরেরও ক্রমোন্নতি। এ সকল নৈতিক কথার আলোচনার ক্ষেত্র এ নহে—তবে প্রসঙ্গক্রমে এ কথা আমাদের বলিতে হইবে। মোট কথা—আমরা ক্রমশই হীন হইতেছি—আমাদের চির ঈপ্সিত মহান্ আদর্শ হইতে আমরা ক্রমশঃ স্খলিত হইতেছি। বাহ্য-প্রকৃতির সহিত শরীরের যে চির সম্বন্ধ আছে তাহা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি—হিন্দুশাস্ত্রের বিধি-নিষেধকে ইংরাজী শিক্ষার দম্ভভরে অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছি। শরীরপালন-তত্ত্বের সরল নিয়মগুলি পালনে পর্য্যন্ত অবহেলা করিতেছি! আমরা এখন প্রত্যেকে পুরাদস্তুর স্বার্থপর হইতেছি; নিজের সুখলালসার বহ্নিতে বিলাসের আহুতি প্রদান করিয়া শরীরকে ব্যাধিমন্দির করিয়া তুলিতেছি।

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

বঙ্গে গোজাতি

দানবীর জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় নেত্রকোণার "প্রান্তবাসী" পত্রিকায় বঙ্গে গোজাতির উন্নতি-কল্পনায় একটা সাধু প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

"বঙ্গদেশে একটা প্রবাদ আছে, 'গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।' আমাদের হইয়াছে এখন ঠিক তাই। আমরা দেশ, জাতি, সমাজ, রাজনীতি, অবশেষে স্বদেশী লইয়া দেশময় আন্দোলন করিয়া না কি প্রবল ইংরেজ-শক্তিকেও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছি,—প্রবন্ধ লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া দেশের ছেলের দল আকুল করিতেছি, কিন্তু দেশটা কিসে রক্ষা হয়, জাতিটা কি করিলে বাঁচে, সমাজটা কিসে উন্নত হয়, তাহার মূল অনুসন্ধান জন্য একবারও ভাবি না। আর যদিও বা কখন ভাবি, তবু কার্য্যে কিছুই করি না।

৺শারদীয় পূজায় দেশে আসিয়া দেখিলাম—শস্যশ্যামল ধন-ধান্য-ময়, বঙ্গলক্ষ্মীর প্রিয় নিকেতন ময়মনসিংহে আসিয়া দেখিলাম—টাকায় ✓২ দুই সের দুধ! তাহাও বড়-লোকের ভাগ্যেই জুটে। কারণ তাঁহাদের দু'চা'র জন গোয়ালা প্রজা আছে, তাহারা মনিবের হুকুম তামিল করিবার জন্য প্রাণপণ

প্রয়াসে ৮।১০ মাইল খুঁজিয়া পাতিয়া কতকটা দুধ সংগ্রহ করে; মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রদের শিশুসন্তানের জীবন-রক্ষার জন্য কিংবা একটু ঔষধ খাইতে অনেক সময়ে ১৲ টাকা ব্যয়েও একটুকু দুধ জুটাইতে পারে না। মনে একটা দারুণ যাতনা উপস্থিত হইল! বিষয়টার গুরুত্ব, অবস্থার শোচনীয়তা অনেক ভাবিয়া দেখিলাম। কারণ অনুসন্ধানে যাহা বুঝিলাম, তাহাই আজ আমার দেশবাসী শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের নিকট নিবেদন করিতেছি। অবশ্য আমার উদ্দেশ্য নয় যে, অশিক্ষিত কৃষক বা অন্য ব্যবসায়িগণকে উপেক্ষা করি। তবে দেশের সমুদয় লোককে আমার একাকী বুঝাইবার চেষ্টা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় যদি আমার এই নিবেদনের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পারেন তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহার প্রতি-বিধানকল্পে অগ্রসর হইবেন এবং দেশময় এই সংবাদ প্রচারিত হইবে।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে গো-জাতির স্থান সমাজের শীর্ষস্থানীয়, ব্রাহ্মণের উপরেও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহা নিতান্ত কুসংস্কার বা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নহে। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যতই নিজকে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করি না কেন, সে কালের নিতান্ত গ্রাম্য-প্রচলিত নিয়মগুলির সারবত্তাও ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। তাই আমরা মাতৃতুল্য উপকারিণী গো-জননীর রক্ষা ও সেবায় এতদূর অবহেলা করিতেছি। অযত্নে, অনাহারে সহস্র সহস্র গাভী হীনস্বাস্থ্য বিকৃতাবয়ব হইয়া অকালে কালের কবলে পতিত হইতেছে। আমরা হিন্দুসন্তান হইয়া আর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া মহাগৌরব করিয়াও আমাদের একতম প্রধান কর্ত্তব্য পালনে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছি। কথাটা যে কেহই বুঝেন বা ভাবেন না এমন নহে। কিন্তু সকলেই অপরের মুখাপেক্ষী হইয়াই নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন। বিশেষতঃ কাজ করিতে হইলেই আমাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গালীর প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য—দই, দুধ, ঘি, ক্ষীর, সর, মাখন, ছানা প্রভৃতির কথা দূরে যাউক, এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকিলে চাউল-ডাইলের অভাবও যে অতি নিকটবর্ত্তী তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। এদেশে চাষের জন্য গোজাতিই উপযুক্ত, কিন্তু দিন দিন যেরূপ দ্রুতগতিতে এই জাতির অপকর্ষ ঘটিতেছে, তাহাতে অন্নের জন্যও বোধ হয় আমাদিগকে অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। কৃষির উন্নতির জন্য আমরা কতই বক্তৃতা করিতেছি, বিদেশে যুবকদিগকে পাঠাইয়া কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিতেছি, কিন্তু কৃষির মূল যে গো-জাতি তাহার প্রতি একটু লক্ষ্য করিতেছি না। দেশময় ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে এবং দিন দিনই প্রকোপ বাড়িতেছে, ইহার একটা প্রধান কারণ—আমাদের পুষ্টিকর পবিত্র খাদ্যের অভাবজনিত দৈহিক দৌর্ব্বল্য। বাঙ্গালী জাতির পক্ষে গোদুগ্ধ ও তদুৎপন্ন দ্রব্যাদিই যে ধাতু ও প্রকৃতির উপযুক্ত বলকর খাদ্য ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং যাহাতে গোজাতির উন্নতি সাধন করিয়া আমাদের জীবন, সমাজ ও জাতি রক্ষা করিতে পারি তদ্বিষয়ে আলোচনা করাই সঙ্গত।

উন্নতির উপায় উদ্ভাবনা করিতে হইলে, অবনতির কারণগুলির বিচার করা প্রয়োজন।

প্রাচীনকালে ধীসম্পন্ন মহর্ষিগণ গোজাতির উপকারিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াই গাভীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রত্যহ গাভীর পরিচর্য্যা না করিয়া গৃহী মাত্রেরই জল গ্রহণ নিষিদ্ধ এরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। গো-চারণ হীনকর্ম্ম নহে বলিয়াই বুঝি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপালরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর আমরা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, বিলাসিতায় ডুবিয়া সেই মহাত্মাগণের শাস্ত্র-বচন অমান্য করিতেছি। ইহাই গোজাতির হীনাবস্থার প্রধান কারণ নহে কি? লোভের ও স্বার্থের বশীভূত হইয়া গোচারণ-ভূমির লোপ করিতেছি। গাভীর পরিচর্য্যা দূরে থাকুক, দিনান্তেও গাভীর অবস্থাটা একবার ভাবি না। শাস্ত্রীয় গো-গ্রাস-প্রদানের ব্যবস্থা এখন আর নাই। সাধে কি গোজাতির অবনতি হইয়াছে? তার পর আর একটী প্রধান কারণ গোজাতির উন্নতি ও রক্ষাকল্পে আমরা রাজশক্তি হইতে তেমন সহানুভূতি পাইতেছি না। সত্য বটে—গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি দিয়া বিদেশ হইতে যুবকদিগকে কৃষি বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া এদেশে নানাস্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনপূর্ব্বক নানাবিধ শস্যোৎপাদন ও বিভিন্ন সার-ব্যবহারের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু যে গোজাতি ভিন্ন দেশের কৃষি রক্ষা হওয়াই অসম্ভব, সেই গোজাতির উন্নতি ও রক্ষার প্রতি তাদৃশ যত্ন লইতেছেন না। পূর্ব্বে গোজাতির উন্নতি ও রক্ষার প্রতি প্রজার কোন অত্যাচার বা পরিচর্য্যার ত্রুটী দেখিতে পাইলেই রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হওয়ার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা গবর্ণমেণ্ট হইতে সেরূপ সাহায্যে বঞ্চিত। আমাদের সহস্র চেষ্টায় যে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন, গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিত মাত্রে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া যায়, ইহা সুনিশ্চিত।

যে যে কারণে গোজাতির বর্ত্তমান দুরবস্থা, তাহা আমরা আলোচনা করিলাম। এক্ষণে কিরূপে গোজাতির উন্নতি হইতে পারে তৎবিষয়ে সমগ্র দেশবাসীর সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। স্থানে স্থানে এ সম্বন্ধে আলোচনা ও কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য এক এক কেন্দ্রস্থ সাধারণের একত্র হওয়া এবং একমতে কার্য্যারম্ভ প্রয়োজন। দেশের জমিদার, তালুকদার এবং উকিল-মোক্তার প্রভৃতি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেরই এই দিকে লক্ষ্য রাখা এবং যতদূর সম্ভব নিজদের কর্ত্তব্য-সাধন এবং যাহা আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, তদ্বিষয়ে আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করা প্রয়োজন। শুধু প্রবন্ধ বা কথায় যাহাতে ইহার অবমাননা না হয়, তজ্জন্য আমরা এই কার্য্যে অদ্য হইতেই যোগদান করিলাম। যাঁহারা আমাদের এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় বর্ত্তমান কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদিগকে জ্ঞাপন করিলে আমরা ক্রমশঃ পত্রিকাতে তাহা প্রকাশ করিব। বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে যাহাতে এই বিষয়ের আলোচনা হয় এবং শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসমূহ লইয়া স্থানে স্থানে এই জন্য গো-রক্ষা-সমিতি স্থাপিত হয় তৎপক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এই কার্য্য বহু অর্থ-সাপেক্ষ তাহা বলাই বাহুল্য। সর্ব্বসাধারণের এ বিষয়ে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য প্রয়োজন। কে কি ভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন তাহাও আমাদিগকে জানাইলে এক পত্রেই দুইটী কার্য্য সাধিত হইতে পারে। আমরা অন্যান্য সংবাদপত্র-সম্পাদক মহোদয়গণকে

সবিনয়ে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন অন্ততঃ প্রতিমাসে একবার আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা এবং ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া এই দেশের প্রতি তাহাদের এক প্রধান কর্ত্তব্য সাধন করেন। আমরা এ স্থলে ইহাও আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের জনৈক বিশেষ বন্ধু এইজন্য সম্প্রতি এক হাজার টাকা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।"

প্রান্তবাসী।

পল্লীর সেকাল ও একাল

পল্লীবাস বড়ই সুখের ছিল। পল্লীবাসীরা প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে একত্রে একপ্রাণ হইয়া বাস করিত। তাহাদের মধ্যে হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি কিছুই ছিলনা। জলকষ্ট যে কি তাহা তাহারা জানিত না, ব্যাধির দৌরাত্ম্য বুঝিত না, সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। এখন এমন অনেক বৃদ্ধ আছেন, যাঁহারা সারা জীবনে ঔষধ গ্রহণ করেন নাই। তখন ক্ষেত্রে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হইত, সকলের গৃহেই গাভী ছিল, জলাশয়ে যথেষ্ট মৎস্য থাকিত। ক্ষেতের ধানের ভাত, পুকুরের মাছ এবং গাভীর দুগ্ধে সকলেরই সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। লোকের বিলাসিতা ছিল না। একান্নবর্ত্তী পরিবারে বহুগোষ্ঠি লইয়া সকলে একত্র বাস করিত। কেহই প্রবাসী হইয়া থাকিত না। পরান্ন-ভোজীর ন্যায় প্রবাসীব্যক্তিও লোকের নিকট ঘৃণার ভাজন ছিল। কিন্তু আজকাল পল্লীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই তাহার কিছুই নাই। সর্ব্ব বিষয়েই বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। বলিতে কি, এক সময়ে যে পল্লীভবন এত সুখের স্থান ছিল, এক্ষণে তাহা বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

পল্লীবাসীর এখন আর একপ্রাণতা নাই। প্রত্যেক গ্রামেই দলাদলি লাগিয়া আছে, মামলা মোকদ্দমা সর্ব্বদাই চলিতেছে, লোকের সৎকার্য্যে মনোযোগ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, অসৎকার্য্যেই প্রশ্রয় পাইতেছে। প্রত্যেক পল্লীতেই জলকষ্ট পানীয় জলের নামে গৃহে গৃহে রোগবীজ পূর্ণ মান্ধাতার আমলের পানা-পুকুরের বদ্ধমান জল উদরস্থ হইতেছে। এক্ষণে জলাশয়-প্রতিষ্ঠার আর চেষ্টা নাই। যে ধনবান্ যে একটী পুকুর দিতেছেন, তাহা তাঁহাদের উপাদানের মত, গ্রামবাসীর উপকারে আসে না। পল্লীর পথঘাট এতই খারাপ যে বর্ষাকালে বাটীর বাহির হওয়াও দায়। বর্ষার সময় অনেক পথে এতই জল জমিয়া থাকে যে, তাহা শীতকালে শুকায় না। অধিকাংশ পল্লী আজকাল জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে। অনেক গ্রামে বন্যবরাহ প্রভৃতির এতই অত্যাচার যে সন্ধ্যার পর গৃহের বাহির হওয়াও কঠিন। পল্লীতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘরে ঘরে। চোরদস্যুর তাড়নায় লোকের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। অন্নগতপ্রাণ বাঙ্গালীর দেশে পাটের আবাদ আসিয়া অন্নকষ্ট দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। জমিগুলিও দিন দিনই অজন্মা হইয়া পড়িতেছে। কৃষককুলও ঋণ-দায়ে জর্জ্জরিত। আমাদের বড় সুখের একান্নবর্ত্তী পরিবার নামে আছে, কাজে কিছুই নাই। প্রায় পল্লীতেই দেখিতে পাই খুড়া, জেঠা, খুড়তত, জেঠতাত ভাই লইয়া একান্নে বাস করা দূরে থাকুক, পিতৃবিয়োগের পরদিনই আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া পড়ি। প্রতিবৎসর ভীষণ বন্যায় অনেক পল্লীর সুখের গ্রাম ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। পুরাকালের পল্লীর সহিত এখনকার পল্লীর কত প্রভেদ!

পূর্ব্বে পল্লীর প্রধান ছিলেন জমিদারশ্রেণী। যে গ্রামে জমিদার বাস করিতেন, সে গ্রামের সমুদয় অভাব তাঁহারাই পূরণ করিতেন। তাহা ভিন্ন তাঁহাদের এলাকাভুক্ত গ্রামগুলির প্রতিও তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিত। পূর্ব্বকালে জলাশয়-প্রতিষ্ঠা অতি পুণ্যজনক কার্য্য ছিল।

তাই জমিদারগণ নিজের এলাকায় যথেষ্ট জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিতেন। কোন গ্রামেই জলকষ্ট ছিল না। এখনও প্রত্যেক গ্রামে সেই সমস্ত জলাশয়ের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। জমিদারগণও কোন একটী নূতন গ্রাম স্থাপন করিলে অগ্রেই জলাশয়ের সূচনা করিতেন। গ্রামবাসীর অধিকাংশ মামলা-মোকদ্দমা তাঁহারাই মিটাইয়া দিতেন। লোকে কথায় কথায় সহরে ছুটিত না। লোকও ধর্ম্মভীরু ছিল। সকল কার্য্যেই লোকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া চলিত। জমিদারকে প্রজা দেবতার মত সম্মান করিত। জমিদারও প্রজাপালন প্রধান ধর্ম্ম বিবেচনা করিতেন। সে সময়ে পল্লীবাসীর দিন অতি আনন্দেই কাটিয়া যাইত। এক্ষণে জমিদারগণ কেহই পল্লীবাস পছন্দ করেন না। তাঁহাদের অধিকাংশই সহরবাসী হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের জলাশয়-স্থাপন প্রভৃতি পুণ্য কার্য্যের অর্থ রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর প্রভৃতি আখ্যার জন্য জলের মতই খরচ হইতেছে। এক্ষণে তাঁহারা প্রজাপালন ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রজাপীড়ক চাঁদার জন্য সর্ব্বদাই হস্ত প্রসারণ করিতেছেন। তাই জমিদার ও প্রজার দিন দিনই সদ্ভাবের অভাব ঘটিতেছে।

পল্লীতে জমিদার নাই, আবার শিক্ষিত লোকেরও একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু পল্লীই শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জন্মভূমি। আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই পল্লীতে থাকিতে পারেন না। কারণ পল্লীতে থাকিলে তাঁহাদের চলে না। তাই তাঁহারা হাকিম, উকিল, প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়া সহরে অথবা উন্নত স্থানে অবস্থান করেন। এই সমস্ত শিক্ষিত লোকদ্বারা সংসারের অনেক উপকার হইতেছে। এই সমস্ত লোক প্রবাসী, কাজেই তাঁহাদের দ্বারা পল্লীর উপকার হয় না।

আজকাল পল্লীবাসী বলিলে আমরা এই বুঝি, কতকগুলি কৃষকশ্রেণীর জাতি, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার প্রভৃতি ব্যবসায়ী, যাহারা পল্লিবাসীর অভাব পুরণ করিয়া থাকে; আর জোতদার শ্রেণীর লোক। এই জোতদার শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা পৈত্রিক ভবনে থাকেন না। তাঁহাদের অধিকাংশই চাকরী-ব্যাপদেশে সহরে অবস্থান করেন, বাস্তু-ভিটাতে আলো প্রদান করেন না। ইহারাই কিন্তু পল্লীগ্রামে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত। ভাবিতে গেলে সম্প্রতি ইহারাই পল্লীবাসের সুখস্বচ্ছন্দরূপ বংশদণ্ডে চূর্ণরূপ কীটের মত অবস্থান করিতেছেন। ইহারাই গ্রামে স্কুল স্থাপন করেন, পোষ্টাফিস বসান। আবার ইহারাই সম্পাদক, মেম্বর প্রভৃতি সাজিয়া বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটাইয়া থাকেন। অচিরেই স্কুলটিকে নষ্ট করিয়া হিংসানামক বৃত্তিটাকে চরিতার্থ করেন। কিছুদিনের মধ্যে পোষ্টাফিসটীও চক্ষুশূল হইয়া উঠে। গ্রামের দলাদলির জের শেষে স্কুল ও পোষ্ট অফিসের উপর পড়ে। পেটে বিদ্যা-বুদ্ধি সেরূপ না থাকিলেও গ্রামের মাষ্টার-পণ্ডিতের বিদ্যার সমালোচনা সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। ইহারাই মামলামোকদ্দমার নেতা। গ্রামে একটী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, ইহারা কোন না-কোন পক্ষে যোগ দান করেন। এক পক্ষে শ্যামবাবু উপস্থিত হইলে অপর পক্ষে রামবাবুর অভাব হয় না। ইহারা মিটমাটের দিকে যাইতে নারাজ। তিলকে তাল করিতে খুবই পটু। গ্রামটীকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া অন্ততঃ দুই ভাগ না করিলে, ইহাদের শরীরের মধ্যে টাটানি নামক এক প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হয়। ইহারা আজ যাহাকে বড় করেন, কাল তাহাকে ছোট করিয়া থাকেন। পরকুৎসা না করিলে ইহাদের রসনায় উত্তেজনার উদ্ভব হয়। এই যে প্রতিগ্রামে এত জলকষ্ট, ইহা দেখিয়া যদি কেহ একটী পুকুর দিতেও চাহে, এই সৎকার্য্যেও ইহারা বাধা দিতে সুযোগ খুঁজিয়া থাকেন। এইরূপ প্রত্যেক সৎকার্য্যেরই ইহারা প্রতিদ্বন্দ্বী। পল্লীর সেকালের সহিত একালের ভাবনা যেদিক দিয়াই ভাবিনা কেন, প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে।

সুরাজ।

পরিশিষ্ট

তং তথা ভোগসংসর্গ-প্রমত্তমজিতেন্দ্রিয়ম্।
সুবাহুর্নাম শুশ্রাব ভ্রাতা তস্য বনেচরঃ ॥ ৭ ॥
তং বুবোধয়িষুঃ সোঽথ চিরং ধ্যাত্বা মহীপতিঃ।
তদ্বৈরিসংশ্রয়ং তস্য শ্রেয়োঽমন্যত ভূপতেঃ ॥ ৮ ॥
ততঃ স কাশিভূপালমুদীর্ণবলবাহনম্।
স্বরাজ্যং প্রাপ্তুমাগচ্ছদ্বহুশঃ শরণং কৃতী ॥ ৯ ॥
সোঽপি চক্রে বলোদ্যোগমলর্কং প্রতি পার্থিবঃ।
দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্ ॥ ১০ ॥
সোঽপি নৈচ্ছত্তদা দাতুমাজ্ঞাপূর্ব্বং স্বধর্ম্মবিৎ।
প্রত্যুবাচ চ তং দূতমলর্কঃ কাশিভূভৃতঃ ॥ ১১ ॥
মামেবাভ্যেত্য হার্দ্দ্যেন যাচতাং রাজ্যমগ্রজঃ।
নাক্রান্ত্যা সম্প্রদাস্যামি ভয়েনাল্পামপি ক্ষিতিম্ ॥ ১২ ॥
সুবাহুরপি নো যাচ্ঞাঞ্চকার মতিমাংস্তদা।
ন ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্যেতি যাচ্ঞা বীর্য্যধনো হি সঃ ॥ ১৩ ॥

ভ্রাতার এ হেন দশা করিয়া শ্রবণ,
সুবাহু ভ্রাতার হ'লো চিন্তাযুক্ত মন। ৭।
ভ্রাতা অলর্কেরে ত্বরা প্রবুদ্ধ করিতে
উপায় চিন্তিয়া বহু আপনার চিতে,
বৈরীর আশ্রয় ধীর করিয়া গ্রহণ
শ্রেয়ঃ সাধিবারে তা'র করিলা মনন। ৮।
তবে মহাবলবান কাশিরাজ পাশে,
উপনীত হৈলা নিজ রাজ্যলাভ আশে।
বলে "রাজা লইলাম তোমার শরণ
পৈত্রিক রাজত্ব মোরে করহ অর্পণ।" ৯।
কাশিরাজ শুনি' তবে সব বিবরণ
অলর্কের পাশে দূত করিলা প্রেরণ।
বলে রাজা—"সুবাহু যে অগ্রজ তোমার
পিতৃরাজ্য ন্যায্য প্রাপ্য জানিহ তাহার।
অতএব তা'রে রাজ্য করহ অর্পণ,
নহিলে নিশ্চয় হ'বে যুদ্ধ সংঘটন।" ১০।
অলর্ক শুনিয়া সেই দূতের বচন,
ক্ষত্রধর্ম্মোচিত বাক্য বলিল এমন। ১১।
অগ্রজ সদয় হ'য়ে আসি' মোর পাশ
শাসিতে পৈত্রিক রাজ্য করে যদি আশ,
তাঁ'রে দিতে রাজ্য, মোর কিছু দ্বিধা নাই
কিন্তু রাজা তব বাহুবলে না ডরাই।
তব ভীতি-প্রদর্শনে না ডরি অন্তরে
তাহে অল্প ভূমিখণ্ড না দিব কাহারে। ১২।
সে বচন দূত আসি, শুনায় রাজায়।
সুবাহু বলিলা ইথে মন নাহি চায়।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হেন নহে সুনিশ্চয়,
যাচ্ঞা করি ধন রাজ্য কারো কাছে লয়।
বলে রাজ্য জিনি লব করিয়াছি মনে
এ কার্য্যে সাহায্য চাই তোমার সদনে। ১৩।

ততঃ সমস্তসৈন্যেন কাশীশঃ পরিবারিতঃ।
আক্রান্তমভ্যগাদ্রাষ্ট্রমলর্কস্য মহীপতেঃ ॥ ১৪ ॥
অনন্তরৈশ্চ সংশ্লেষমভ্যেত্য তদনন্তরম্।
তেষামন্যতমৈর্ভৃত্যৈঃ সমাক্রম্যানয়দ্বশম্ ॥ ১৫ ॥
অপীড়য়চ্চ সামন্তাংস্তস্য রাষ্ট্রোপরোধনৈঃ।
তথা দুর্গান্তপালাংশ্চ চক্রে চাটবিকান্ বশে ॥ ১৬ ॥
কাংশ্চিচ্চোপপ্রদানেন কাংশ্চিদ্ভেদেন পার্থিবান্।
সাম্নৈবান্যান্ বশং নিন্যে নিভৃতাস্তস্য যেঽভবন্ ॥ ১৭ ॥
ততঃ সোঽল্পবলো রাজা পরচক্রাবপীড়িতঃ।
কোষক্ষয়মবাপোচ্চৈঃ পুরঞ্চারুধ্যতারিণা ॥ ১৮ ॥
ইত্থং সম্পীড্যমানস্তু ক্ষীণকোষো দিনে দিনে।
বিষাদমাগাৎ পরমং ব্যাকুলত্বঞ্চ চেতসঃ ॥ ১৯ ॥
আর্ত্তিং স পরমাং প্রাপ্য তৎ সস্মারাঙ্গুরীয়কম্।
যদুদ্দিশ্য পুরা প্রাহ মাতা তস্য মদালসা ॥ ২০ ॥
ততঃ স্নাতঃ শুচির্ভূত্বা বাচয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্।
নিষ্কৃষ্য শাসনং তস্মাদ্দদৃশে প্রস্ফুটাক্ষরম্ ॥ ২১ ॥
তত্রৈব লিখিতং মাত্রা বাচয়ামাস পার্থিবঃ।
প্রকাশপুলকাঙ্গোঽসৌ প্রহর্ষোৎফুল্ললোচনঃ ॥ ২২ ॥

তবে কাশী নরেশ্বর সর্ব্বসৈন্য ল'য়ে
আক্রমিল অলর্কেরে ত্বরাপর হ'য়ে। ১৪।
সহজে যুদ্ধেতে জয় লভিবার তরে,
করিতে উপায়, তা'র ভৃত্য বশ করে। ১৫।
সাম দান ভেদ দণ্ড করিয়া আশ্রয়।
সামন্তগণেরে বশ করে সমুদয়।
এইরূপে অলর্কেরে অল্পবল করে।
শত্রুবলে পীড়া বহু পাইল অন্তরে।
পুরী রুদ্ধ শত্রুসৈন্যে, হইল অস্থির;
ধনক্ষয়ে মন হৈল চঞ্চল অধীর। ১৬-১৮।
দিনে দিনে অধীরতা বাড়ে অতিশয়,
বিষাদে হইল অতি আকুল হৃদয়। ১৯।

সেই কষ্টে মাতৃদত্ত অঙ্গুরীর কথা
মনেতে পড়িল—যাহে ঘুচিবেক ব্যথা।
মাতা মদালসা যেবা বলিল বচন
এবে সেই কথা তাঁ'র হইল স্মরণ। ২০।
তবে স্নান করি' রাজা হ'য়ে শুচিকায়,
দ্বিজবরে আনি স্বস্তিবাচন করায়।
পরে সে অঙ্গুরী হ'তে করি' উন্মোচন,
মাতার শাসন-বাক্য করে দরশন। ২১।
মাতার লিখিত সেই উপদেশ-সার
পড়িতে অন্তরে হ'লো পুলক সঞ্চার।
পুলকিত হ'লো অঙ্গ হর্ষ অতিশয়,
লোচন প্রফুল্ল অতি—হৃদি সুখময়। ২২।

সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ স চেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥ ২৩॥
কামঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ো হাতুঞ্চেচ্ছক্যতে ন সঃ।
মুমুক্ষাং প্রতি তৎ কার্য্যং সৈব তস্যাপি ভেষজম্॥ ২৪
বাচয়িত্বা তু বহুশো নৃণাং শ্রেয়ঃ কথং ত্বিতি।
মুমুক্ষয়েতি নিশ্চিত্য সা চ তৎসঙ্গতো যতঃ॥ ২৫॥
ততঃ স সাধুসম্পর্কং চিন্তয়ন্ পৃথিবীপতিঃ।
দত্তাত্রেয়ং মহাভাগমগচ্ছৎ পরমার্ত্তিমান্॥ ২৬॥
তং সমেত্য মহাত্মানমকল্মষমসঙ্গিনম্।
প্রণিপত্যাভিসম্পূজ্য যথান্যায়মভাষত॥ ২৭॥

অলর্ক উবাচ।

ব্রহ্মন্ কুরু প্রসাদং মে শরণং শরণার্থিনাম্।
দুঃখাপহারং কুরু মে দুঃখার্ত্তস্যাতিকামিনঃ॥ ২৮॥

দত্তাত্রেয় উবাচ।

দুঃখাপহারমদ্যৈব করোমি তব পার্থিব।
সত্যং ব্রূহি কিমর্থং তে দুঃখং তৎ পৃথিবীপতে॥ ২৯।

লেখা তায় দেখে রায় বচন মাতার—
"সঙ্গ ত্যজ্য সতত জানিহ সবাকার।
সঙ্গ ত্যাগ করিতে সামর্থ্য যদি নয়
সাধুসঙ্গ কর—তাহা ঔষধ নিশ্চয়। ২৩।
কাম অতি হেয় তাহা ত্যজ্য সর্ব্বভাবে,
না ঘটে অভাব কিছু তাহার অভাবে।
করিতে কামনা ত্যাগ সাধ্য যদি নয়,
মুক্তিকামনায় রত রাখহ হৃদয়।
কামনা ত্যাগের অন্য উপায় ত নাই—
ঔষধ তাহার মুক্তি-কামনা সদাই।" ২৪।
বহুবার পড়ে রাজা মায়ের লিখন,
মনে নানা চিন্তা পরে করে আগমন।
শেষে মোক্ষপদ লাভে হইল বাসনা;
ত্যজিল নরেশ যত অসার ভাবনা। ২৫।
সাধুপদাশ্রয়-আশে হইয়া কাতর,
গেলা মহাভাগ দত্তাত্রেয়ের গোচর। ২৬।
নিষ্পাপ নিঃসঙ্গ সেই মহাত্মার পায়,
নতি আর পূজা করি' বাসনা জানায়। ২৭।
"ব্রহ্মণ, প্রসন্ন হও শরণ্যের প্রতি,
শরণার্থী তব—মোর নাহি অন্য গতি।
কামনার বশে আমি বড় দুঃখ পাই
দুঃখ নাশিবার মোর আর কেহ নাই।" ২৮।
বলিলেন দত্তাত্রেয়, "শুনহ, রাজন
অদ্যই তোমার দুঃখ করিব হরণ।
বল, মোরে, কি কারণে দুঃখ তব প্রাণে
গোপন কোরো না কিছু মম সন্নিধানে। ২৯

কস্য ত্বং তস্য বা দুঃখং তত্ত্বমেতদ্বিচার্য্যতাম্।
অঙ্গান্যঙ্গীনিরঙ্গঞ্চ সর্ব্বাঙ্গানি বিচিন্তয়ঃ ॥ ৩০ ॥

দ্বিজপুত্র উবাচ।

ইত্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস স রাজা তেন ধীমতা।
ত্রিবিধস্যাপি দুঃখস্য স্থানমাত্মানমেব চ ॥ ৩১ ॥
স বিমৃষ্য চিরং রাজা পুনঃপুনরুদারধীঃ।
আত্মানমাত্মনা ধীরঃ প্রহস্যেদমথাব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥

অলর্ক উবাচ।

নাহমুর্ব্বী ন সলিলং ন জ্যোতিরনিলো ন চ।
নাকাশং কিন্তু শারীরং সমেত্য সুখমিষ্যতে ॥ ৩৩ ॥
ন্যূনাতিরিক্ততাং যাতি পঞ্চকেঽস্মিন্ সুখাসুখম্।
যদি স্যান্মম কিং ন স্যাদন্যস্থেঽপি স্থিতং ময়ি ॥ ৩৪ ॥
নিত্যপ্রভূতসদ্ভাবে ন্যূনাধিক্যান্নতোন্নতে।
তথা চ মমতাত্যক্তো বিশেষেণোপলভ্যতে ॥ ৩৫ ॥
তন্মাত্রাবস্থিতে সূক্ষ্মে তৃতীয়াংশে চ পশ্যতঃ।
তথৈব ভূতসদ্ভাবং শারীরং কিং সুখাসুখম্ ॥ ৩৬ ॥

তুমি কা'র ?—দুঃখ কা'র—ভেবে দেখ মনে
দুঃখের এ ভাব মনে আসে বা কেমনে ?
এই তত্ত্ব মনে মনে করহ বিচার,
অঙ্গ কিবা ?—অঙ্গী কেবা ? ভাব তত্ত্ব তার।
নিরঙ্গ কে ?—সর্ব্বাঙ্গ বা কাহার সংসারে ?
এই তত্ত্ব চেষ্টা কর প্রাণে বুঝিবারে। ৩০।
দ্বিজপুত্র বলে—"পিতা, করহ শ্রবণ,
সাধুর মুখেতে শুনি' এ হেন বচন,
মনে মনে চিন্তা রাজা বহুক্ষণ ক'রে,
আত্মার দুঃখের স্থান ভাবিল অন্তরে। ৩১।
পুনঃ পুনঃ চিন্তাফলে মনে হ'লো তাঁ'র।
হাসিয়া বলিলা হেন নিকটে তাঁহার। ৩২।

ক্ষিত্যপ-তেজ-মরুদ্ব্যোম কিছু আমি নই,
শারীর হইয়ে—সুখ-আশে ব্যস্ত রই। ৩৩।
ন্যূনাতিরেকের ফলে এই পঞ্চকেতে,
সুখাসুখ বোধ সদা আসে ত মনেতে।
অন্যস্থে আমার হিত হয় কি না হয়,
এই ভাবি হয় প্রাণে সুখদুঃখোদয়। ৩৪।
সতত প্রভূত বস্তু লাভ যদি হয়—
কিম্বা হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে সকল সময়,
মমতার ত্যাগ যদি ভাগ্যফলে হয়
তবেই বিশেষ সুখ লভয়ে নিশ্চয়। ৩৫।
দেখিতে যে জানে, সেই জানে এই কথা
পঞ্চভূতাত্মক দেহে সুখ দুঃখ কোথা ? ৩৬।

মনস্যবস্থিতং দুঃখং সুখং বা মানসঞ্চ যৎ।
যতস্ততো ন মে দুঃখং সুখং বা ন হ্যহং মনঃ ॥ ৩৭।
নাহঙ্কারো ন চ মনো বুদ্ধির্নাহং যতস্ততঃ।
অন্তঃকরণজং দুঃখং পারক্যং মম তৎ কথম্ ॥ ৩৮

নাহং শরীরং ন মনো যতোঽহং
পৃথক্ শরীরান্মনসস্তথাহম্।
তৎ সন্তু চেতস্যথবাপি দেহে
সুখানি দুঃখানি চ কিং মমাত্র ॥ ৩৯ ॥
রাজ্যস্য বাঞ্ছাং কুরুতেঽগ্রজোঽস্য
দেহস্য চেৎ পঞ্চময়ঃ স রাশিঃ।
গুণপ্রবৃত্ত্যা মম কিং নু তত্র
তৎস্থঃ স চাহঞ্চ শরীরতোঽন্যঃ ॥ ৪০ ॥
ন যস্য হস্তাদিকমপ্যশেষং
মাংসং ন চাস্থীনি শিরাবিভাগঃ।
কস্তস্য নাগাশ্বরথাদিকোষৈঃ
স্বল্পোঽপি সম্বন্ধ ইহাস্তি পুংসঃ ॥ ৪১ ॥
তস্মান্ন মেঽরির্ন চ মেঽস্তি দুঃখং
ন মে সুখং নাপি পুরং ন কোষঃ।
ন চাশ্বনাগাদি বলং ন তস্য
নান্যস্য বা কস্যচিদ্বা মমাস্তি ॥ ৪২ ॥

মনেতে উপজে মাত্র সুখ দুঃখ আর,
মন নহি আমি—তাহা নহে ত আমার। ৩৭।
মন বুদ্ধি অহঙ্কার কিছু আমি নই,
তা'রা পর—পরদুঃখে দুঃখী কেন হই ? ৩৮।
সেই মন হ'তে আমি পৃথক্ নিশ্চয়,
দুঃখ দেহাদির মাত্র, কিছু মম নয়। ৩৯।
মিথ্যা রাজ্য-বাঞ্ছা মনে—দেহ পঞ্চময়
গুণ বশে আছি তাহে, দেহ আমি নয়। ৪০
হস্ত আদি আর মাংস-অস্থি-শিরা-সার
দেহের সম্বন্ধে, ধন আদি কি আমার ? ৪১।
বুঝেছি প্রাণেতে আমি অরি মোর নয়,
দুঃখ, সুখ, রাজ্য, ধন আদি সমুদয়,
হস্তি-অশ্ব-সৈন্য-আদি কিবা বল কা'র ?
এ সবার সনে নাহি সম্বন্ধ আমার। ৪২।

যথা ঘটী-কুম্ভ-কমণ্ডলুস্থং
আকাশমেকং বহুধা হি দৃষ্টম্।
তথা সুবাহুঃ স চ কাশিপোঽহং
মন্যে চ দেহেষু শরীরভেদৈঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে অলর্কচরিতে আত্মবিবেকো নাম
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঘটী কুম্ভ কমণ্ডলু মাঝেতে যেমন
এক সে আকাশ বহু হয় দরশন;
সেইরূপ, কাশিরাজ, সুবাহু সে আর
সর্ব্বঘটে আমি-দেহভেদমাত্র সার। ৪৩।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে অলর্কচরিতে আত্মবিবেক নামক
সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়।

দ্বিজপুত্র উবাচ।

দত্তাত্রেয়ং ততো বিপ্রং প্রণিপত্য স পার্থিবঃ।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং প্রশ্রয়াবনতো বচঃ॥ ১॥
সম্যক্ প্রপশ্যতো ব্রহ্মন্ মম দুঃখং ন কিঞ্চন।
অসম্যগ্‌দর্শিনো মগ্নাঃ সর্ব্বদৈবাসুখার্ণবে॥ ২॥
যস্মিন্ যস্মিন্ মমত্বেন বুদ্ধিঃ পুংসঃ প্রজায়তে।
ততস্ততঃ সমাদায় দুঃখান্যেব প্রযচ্ছতি॥ ৩॥
মার্জ্জারভক্ষিতে দুঃখং যাদৃশং গৃহকুক্কুটে।
ন তাদৃঙ্মমতাশূন্যে কলবিঙ্কেঽথ মূষিকে॥ ৪॥
সোঽহং ন দুঃখী ন সুখী যতোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
যো ভূতাভিভবো ভূতৈঃ সুখদুঃখাত্মকো হি সা॥ ৫

দ্বিজপুত্র বলে "শুন কুতূহলে
বলি সার বিবরণ।
দত্তাত্রেয় পায় ভূতলে লুটায়,
মনোসুখে সে রাজন।
করিয়ে প্রণতি, বলে নরপতি
প্রশ্রয়াবনত হ'য়ে
পুলকিতান্তরে সুমধুর স্বরে
চরণের ধুলি ল'য়ে। ১।
"দিব্যদৃষ্টি মোরে দিলে কৃপা ক'রে
প্রত্যক্ষ বুঝিনু এবে'
দুঃখ মোর নাই আমি ত সদাই
সর্ব্বত্র রয়েছি ভবে।
সম্যক দর্শন না করে যে জন,
সে জন ভবে নিশ্চয়,
দুঃখের সাগরে ডুবে চিরতরে
থাকে, কভু মিথ্যা নয়। ২।
আমার আমার যত দিন যা'র
তত দিন সেই জন,
বহু দুঃখ পায়, সন্দেহ কি তায়
না ঘুচে মনোবেদন। ৩।
গৃহেতে পালিত কুক্কুটাদি যত
মার্জারে ভক্ষিলে হায়,
যেই দুঃখ লোকে ভুঞ্জে তা'র শোকে
বচনে বলা না যায়।
কলবিঙ্ক আর মূষিক অপার
নরের ঘরেতে থাকে;
যদি সে সবারে বিনাশে মার্জারে,
দুঃখ নাহি তা'র পাকে। ৪।
প্রকৃতির পর আমি নিরন্তর,
দুঃখী, সুখী আমি নই,
পঞ্চে আত্ম বোধ করে যে নির্ব্বোধ
ভবেতে সে সুস্থ কই?
পঞ্চভূত হ'তে ভবে নানা মতে
সুখ দুঃখ সদা পায়।
পরাধীন হ'য়ে পরেরে লইয়ে
সদা সে দিন কাটায়"। ৫।

দত্তাত্রেয় উবাচ।

এবমেতন্নরব্যাঘ্র যথৈতদ্ ব্যাহৃতং ত্বয়া।
মমেতি মূলং দুঃখস্য ন মমেতি চ নির্বৃতেঃ॥ ৬॥
মৎপ্রশ্নাদেব তে জ্ঞানমুৎপন্নমিদমুত্তমম্।
মমেতি প্রত্যয়ো যেন ক্ষিপ্তঃ শাল্মলিতূলবৎ॥ ৭॥
অহমিত্যঙ্কুরোৎপন্নো মমেতিস্কন্ধবান্ মহান্।
গৃহক্ষেত্রোচ্চশাখশ্চ পুত্রদারাদিপল্লবঃ॥ ৮॥
ধনধান্যমহাপত্রো নৈককালপ্রবর্দ্ধিতঃ।
পুণ্যাপুণ্যাগ্রপুষ্পশ্চ সুখদুঃখমহাফলঃ॥ ৯॥
অপবর্গপথব্যাপী মূঢ়সম্পর্কসেচনঃ।
বিধিৎসাভৃঙ্গমালাঢ্যো হৃদ্যজ্ঞানমহাতরুঃ *॥ ১০॥
সংসারাধ্বপরিশ্রান্তা যে তচ্ছায়াং সমাশ্রিতাঃ।
ভ্রান্তিজ্ঞানসুখাধীনাস্তেষামাত্যন্তিকং কুতঃ॥ ১১॥
যৈস্তু সৎসঙ্গপাষাণ-শিতেন মমতাতরুঃ।
ছিন্নো বিদ্যাকুঠারেণ তে গতাস্তেন বর্ত্মনা॥ ১২॥

বলিলেন দত্তাত্রেয়—"শুনহ রাজন,
বলিলে যে কথা, মিথ্যা নহে কদাচন।
মমতা দুঃখের মূল—সন্দেহ কি তা'য়?
মমতা ঘুচিলে তবে, ভবে সুখ পায়। ৬।
প্রশ্ন সনে প্রাণে তব উপজিল জ্ঞান,
ভাগ্যবান নাহি হেরি তোমার সমান।
শাল্মলির তূলা যথা স্বতোৎক্ষিপ্ত হয়,
জ্ঞানের বিকাশ তব তেমতি নিশ্চয়। ৭।
অহং-জ্ঞান-অঙ্কুরেতে যাহার জনম
মহাস্কন্ধ হয় যা'র আমি আর মম,
গৃহ ক্ষেত্র আদি যা'র শাখা সুনিশ্চয়,
পুত্র দারা আদি যা'র পল্লব নিচয়,
ধন ধান্য আদি পত্র অতি সুশোভন—
এক কালে বৃদ্ধি নাহি পায় কদাচন,
পুণ্যাপুণ্য পুষ্প যা'র—সুখ দুঃখ ফল
অপবর্গ পথে বাধা যাহা অবিরল,
বিধিৎসা ভৃঙ্গের দল ঘুরে যা'র পাশে,
অজ্ঞানতা মহাতরু;—শ্রান্তি-নাশ-আশে
আসিয়া সংসার-পথ-শ্রান্ত পান্থচয়
সুখ-লাভ-আশে, ছায়া করয়ে আশ্রয়।
ভ্রান্তি জ্ঞান সুখ তাহে পায় অনুক্ষণ
শ্রান্তি নাহি যায়, পায় কষ্ট অগণন। ৮-১১।
সৎসঙ্গ পাষাণে যেবা শাণিত করিয়া,
এই তরু কাটে, বিদ্যা-কুঠার ধরিয়া,
সেই পারে সুখে যেতে অপবর্গ পথে,
আরোহিয়া সদশ্ব-যোজিত মনঃ-রথে। ১২।

* কার্য্যজ্ঞানমহাতরুরিতি পাঠান্তরম্।

হিন্দু-সাহিত্য-প্রচারক

ভাবুকশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবীর দার্শনিকপ্রবর
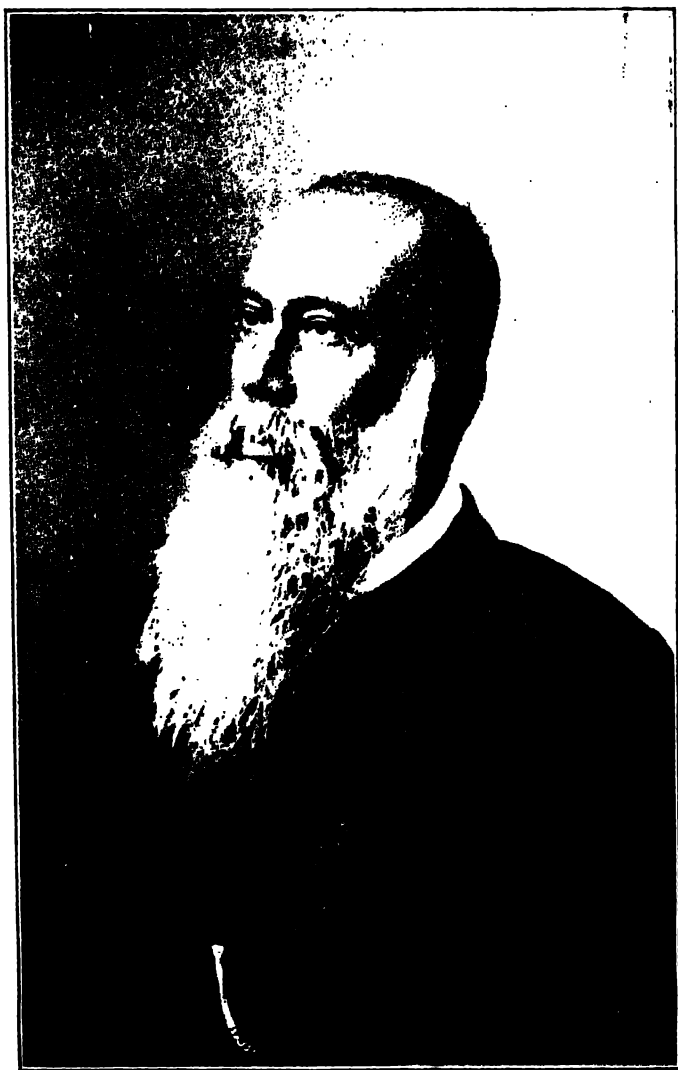
ক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ—
সকলেই এক ভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের
দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক।

'ভারতবাসী 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরজাতি-পীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটি মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

ভূদেব

৫ম খণ্ড
৫ম বর্ষ

মাঘ, ১৩২০

৪র্থ সংখ্যা

আলোচনা

১। মাসিক পত্র

বঙ্কিম-মণ্ডলের শেষ জ্যোতিষ্ক, প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'গৃহস্থ'কে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইয়া মাসিকপত্র-সম্পাদন বিষয়ে দুই একটা কথা বলিয়াছেন। সাহিত্যসেবিগণের পক্ষে তাহা প্রয়োজনীয় হইতে পারে বিবেচনা করিতেছি। এজন্য নিম্নে তাঁহার পত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

"গৃহস্থ বাঙ্গালা মাসিকপত্রে একটি নূতন যুগ আনিয়াছে। সেই প্রথম যুগের 'বঙ্গদর্শন' হইতে এখন পর্য্যন্ত মাসিকপত্রের একরূপ ধরণ-ধারণ, ছন্দ-শ্রী ছিল, গৃহস্থ নূতন ছন্দ নূতন শ্রী আনিয়াছে। সে যুগের সেই আখ্যায়িকাংশ নাই, এ যুগের ছোট গল্প বা সুশ্রী বিশ্রী ছবিও নাই।

গৃহস্থ আমাদের এ সময়ের যে সকল কথা সমাজে প্রয়োজনীয় সেই সকল কথারই

আলোচনা করিতেছেন। আর আলোচনার পন্থাও অতি নূতন ধরণের। তাহাতে কাব্যাংশ প্রায়ই থাকে না, আসল কথা কখন সংক্ষেপে কখন বিস্তারিত ভাবে থাকে। সকল বিষয়েই, আত্মদৃষ্টি ফুটাইবার বিশেষ চেষ্টা আছে।

তবে (একটা কথা না বলিলে, আমার আপনার প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখান হয় না) বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-নাশের কথাটা আর একটু ভাল করিয়া না বলিলে, বোধ হয়, আর সকল আলোচনাই বৃথা হইবে। সেই দিকে আমি গৃহস্থ-লেখকগণের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।"

২। পাবনার ভক্তকবি

পাবনা জেলার সাপ্তাহিক "স্বরাজ" অতি শিশু সংবাদপত্র, কিন্তু সুসম্পাদিত হইতেছে। আমরা অনেক সময়ে "মফঃস্বলের বাণী"তে স্বরাজের রচনাবলী উদ্ধৃত করিয়াছি।

সম্প্রতি 'স্বরাজে'র পাঠকবর্গকে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় পাবনা জেলার একটী অজ্ঞাত, উপবনজাত, অনাঘ্রাত শুষ্ক কুসুমের কাহিনী উপহার দিয়াছেন।

সংসারের কত নিভৃতস্থানে, লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে কত কুসুম আপনি ফুটিয়া, আপন সৌরভে আপনি মজিয়া, অগৌরবেই অকালে শুকাইয়া যায়, কে তাহার ইয়ত্তা করে? আমরা বলিতে পারি,—ভক্তসাধকগণের নিকট এই শুষ্ক কুসুমের যথাযোগ্য আদর হইয়াছে ও হইবে। আমরা চৌধুরী মহাশয়ের রচনা উদ্ধৃত করিলাম :—

"পাবনা জেলার অন্তর্গত তাঁতিবন্দ নিবাসী শ্রীগোপালচন্দ্র মৌলিক মহাশয় আনুমানিক ৪০ বৎসর বয়সে গত প্লাবকাশে তাঁহার একমাত্র সহধর্ম্মিণীকে অকূল বৈধব্যসাগরে ভাসাইয়া ধরাধাম হইতে চির-অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রামের এক কোণে নির্জ্জন কুটীরে তাঁহার বাসস্থান ছিল। একমাত্র সহধর্ম্মিণীই তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনের সঙ্গিনী ছিলেন। পুত্রাদি কিছুই হয় নাই। পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইয়া তিনি জীবনে বড়ই দুঃখ অনুভব করিয়া গিয়াছেন। আর্থিক অবস্থাও তত স্বচ্ছল ছিল না। লেখা পড়া বেশী জানিতেন না। স্থানীয় অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়দিগের এষ্টেটে সামান্য ৮৲ বেতনে জমানবীশি চাকুরী করিতেন। কিছু জমিজমা ছিল এবং এই চাকুরীলব্ধ আয়ে একরূপ নিরুদ্বেগেই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। ইঁহার জীবন-কথা সম্বন্ধে এইটুকু বলিয়াই আপাততঃ আমরা তাঁহার ভগবদ্ভক্তি, দেশপ্রীতি ও সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

জীবিত সময়ে তিনি বিনা আড়ম্বরে প্রশান্তচিত্তে, আপনভাবে মজিয়া যে কতকগুলি গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই গুলিই উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ভগবৎপ্রেম, দেশপ্রীতি ও সাহিত্যচর্চ্চার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব ইঁহার একটী প্রধান ক্ষমতা এই ছিল, যখনই কেহ তাঁহাকে কোন বিষয়ের জন্য গান বা কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করিত, তিনি তদ্দণ্ডেই তাহা এমন সুন্দর সরস মৌলিকভাবে রচনা করিয়া তাহাতে নিজেই সুরসংযোগ করিয়া গান করিয়া দিতেন যে তাহাতে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে প্রাণ ভরিয়া উঠিত। দেশীয় নানা উৎসবে, তিনি অবলীলাক্রমে গ্রাম্যছড়া বাঁধিয়া দিতেন।

সাধারণ লোকে এই সমস্ত ছড়া আবৃত্তি করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিত। বসন্ত-কালে দোলোৎসবের সময়, স্থানীয় জমিদার ভবনে যখন গ্রামান্তর হইতে গ্রাম্য কবির দল আসিয়া কবিগান করিত, তখন তিনি স্থানীয় সাধারণ লোক সংগ্রহ করিয়া নিজেই একদল গঠিত করিয়া, অদ্ভুত ক্ষমতাবলে তদ্দণ্ডেই স্বরচিত গান আরম্ভ করিয়া দিতেন এবং বিপক্ষকে পাল্টা ছড়াতে পরাস্ত করিয়া দিতেন।

পাঠক নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী ভক্তিরসাত্মক গানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তাঁহার ভগবৎপ্রেমের আভাস কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাউল সুর

তাঁরে ডাক্‌বার মতন ডাক্‌তে পার্‌লে,
পেতে পারিস্ মন রসনা।
মিছে এদেশ সেদেশ ঘুরে মরিস্ সেটা
কেবল বিড়ম্বনা॥
তাঁর দয়ায় বেঁচে আছ, তাঁরই রাজ্যে বাস করিছ, তাঁরই সৃষ্ট খাদ্য খাচ্ছ, পর্‌ছ তাঁরই
রত্ন সোণা॥
চর্ম্মচক্ষুর অগোচরে, আছেন তিনি হৃদ্‌মাঝারে, দেখ্‌তে যদি চাস্‌রে তাঁরে, এ চক্ষু দুটী কর না
কাণা।
না চিনে মন সে রতনে, সার হ'লে তোর
আনা গোনা
দ্বিজ গোপাল বলে, হৃদয় খুলে, মন্‌রে একবার
ডেকে নে না॥

এই গানটিতে কতখানি আকুল আকাঙ্ক্ষা, ভগবানে কতখানি আত্মনির্ভরতা, মনের প্রতি কতখানি গভীর অথচ সরল উপদেশ, কেমন একটা অটল, প্রগাঢ় বিশ্বাস ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইতেছে। তাঁহাতে দৃঢ় আস্থা স্থাপন কর, বাহিরের নয়ন দুটী কাণা করিয়া, দিব্যচক্ষে আপন অন্তরের রত্নসিংহাসনে তাঁহাকে বসাইয়া প্রাণ ভরিয়া পূজা কর। বৃথা গলাবাজি করিয়া জীবনকে ব্যর্থ করিও না। নিজের ঘরের দিকে তাকাও; অকারণ বাহিরে তাঁকে খুঁজিলে কি হইবে? তিনি কি বাহিরের জিনিষ? নিজকে ভাল করিয়া চিনিয়া লও। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ, কে তুমি, তিনিই বা কে?

এই সামান্য একটী গানের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস এবং হিন্দুতত্ত্বের সার প্রতিভাত, তাহা বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে। স্থানে স্থানে অনুকরণগন্ধ থাকিলেও ইহা যে তাঁহার প্রাণের কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষাও বেশ সরল, অবাধ অপ্রতিহত গতিতে চলিয়া গিয়াছে। কোথাও কোন কষ্টকল্পনা নাই। এ স্থানে সমস্ত গান উদ্ধৃত করিয়া দেখান অসম্ভব। সুতরাং ভগবদ্‌বিষয়ে আর একটী গান উদ্ধৃত করিয়া অদ্যকারমত ক্ষান্ত হইব।

যখন যাবে রে জীবন পাখী উড়ি'।
প্রাণশূন্য দেহ তোমার রবে ভূমে পড়ি'॥
ভাইবন্ধুদারাসুত যা'রা তোমার অনুগত,
কাঁদিবে অবিরত, চারিদিকে ঘেরি;—
আসি' স্বজাতি-বাহকদলে, লয়ে যাবে হরিবলে,
চিতানলে দিবে ভস্ম করি'॥
কুদিনে হ'য়ে মত্ত, কুকার্য্য করিলি কত,
না করিলি তত্ত্বভ্রমে, নিত্য সত্য হরি;—
এখন চলেছ যার কাছে, তার কাছে সব লিখা
আছে, সে রাজার শাসন সর্ব্বোপরি॥
যত কিছু দেখ ভবে, কিছু নাহি সঙ্গে যাবে,
একদিন পারে যেতে হবে, নাই কো
ছাড়াছাড়ি;—

দ্বিজ গোপাল বলে বচন,

এই বেলা মন করি যতন,

দিন থাকিতে ধর হরির, অভয় চরণ-তরী ॥

এই গানটীতে একটা সহজ সত্যের ঘোষণা, ভগ্ন-উদাস প্রাণের কাতর ক্রন্দন সমুজ্জ্বল। এ সংসার অনিত্য। এই পুত্র-কলত্রাদি, এই বাসভবন,—এই আত্মীয়স্বজন এই পোষাক পরিচ্ছদ, এমন কি এই দেহ সমস্তই অসার, 'নলিনীদলগত জল মতিতরলং'। যাহাকে তুমি আপন আপন বল,—যাহাকে তুমি বড় আগ্রহে—অধীর আবেশে বুকে চাপিয়া ধর,—তাহারা কিন্তু তোমার দিকে ফিরিয়াও চাহে না। সময়কালে হয়ত, তাহারা শুধু ক্ষণিকের জন্য একটু মায়াকান্না কাঁদিবে, তারপরই সব চুপচাপ। তাহা হইলে এদেহের কি মূল্য আছে? এদেহের পরিণতিই বা কি? যদি বুঝিতেছ, এদেহ শুধু ভূতের বোঝা বহন করার জন্যই, অথচ বিনিময়ে—কোনরূপ উপকার লাভ দূরের কথা, সামান্য একটু আদর ও কৃতজ্ঞতা পাইবারও আশা নাই; যদি বুঝিতেছ —এই অনাদৃত, শ্রান্তক্লান্ত দেহের পরিণতি শ্মশানভস্মে, তবে আর কেন? এই সময়েই কুপথ ছাড়িয়া সেই অনাথদীনতারণ শাশ্বত সত্য হরির শ্রীপাদপদ্মে স্মরণ লও। ঠিক এইরূপ একটা ভাবের দ্যোতনা লইয়া গানটী রচিত হইয়াছে।

বারান্তরে ইঁহার রচিত কতকগুলি স্বদেশ-সঙ্গীতের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।"

এরূপ আলোচনা বঙ্গসাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবে। স্বরাজের পন্থা অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার অন্যান্য সাপ্তাহিক সমূহ স্বদেশ-সেবায় ব্রতী হউন।

***

৩। হিন্দু-সাহিত্য-প্রচার

বঙ্গে হিন্দু-সাহিত্যের প্রচার ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। কিন্তু আমরা আমাদের এই জাতীয় সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য এখনও সত্যরূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আরও কিছুকাল পর্য্যন্ত হিন্দু দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞানের অনুবাদ-ব্যাখ্যা-ভাষ্যের যুগই চলিবে। পরে গভীর ও ব্যাপক ভাবে আলোচনা করিবার সময় আসিবে।

হিন্দুর আবিষ্কৃত জ্ঞানগুলি আমাদের প্রাচীন সমাজকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করিত, এবং এখনও কতখানি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া কেহ দেখেন নাই। সমগ্র জগতের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞান কোন্ স্থান অধিকার করিবে তাহা কেহ দেখান নাই। এমন কি, বর্ত্তমান কলকারখানা-প্লাবিত যুগে সেই দর্শন-প্রতিষ্ঠিত সমাজ কোন্ আকার ধারণ করিয়া ভবিষ্যতে আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইবে তাহার আলোচনায়ও কেহ অগ্রসর হন নাই।

বিবেকানন্দ এ পথ কিছু কিছু দেখাইতেছিলেন—তাঁহার তিরোভাবের পর সে পথ কেহ ধরেন নাই।

একজন ধরিতে সমর্থ। তিনি আমাদের ভাবুকশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-বীর দার্শনিকপ্রবর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। আমরা বহুবার বলিয়াছি—"বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ—সকলেই এক ভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক।"

আমরা ব্রজেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যোন্নতি কামনা করি। আমাদের ভরসা আছে—তিনি বিশ্বচিন্তায় ভারতীয় দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের যথার্থ স্থান প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়া

ভবিষ্যৎ মনীষিগণের জন্য রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

প্রয়াগের "পাণিনি-কার্য্যালয়ে"র ন্যায় কলিকাতার 'উদ্বোধন'-কার্য্যালয় হিন্দুসাহিত্য-প্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র। আমরা এই কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত "শ্রীরামানুজাচার্য্য-চরিতে"র সংবাদ পাঠকগণকে দিতেছি। এ যাত্রায় গ্রন্থ পরিচয় দিব না। সম্পাদকের ভূমিকা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ভক্তাচার্য্য মহানুভব শ্রীরামানুজ স্বামি-পাদের জীবন-ঘটনা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের জনসাধারণের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। কখন কখন, শাস্ত্রজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তি ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা করিতে যাইয়া তাঁহার নাম ও তৎকৃত শ্রীভাষ্যের কথা শুনিতে পাইতেন, এবং বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদরূপ শ্রীরামানুজ প্রচারিত মতটিকে মহামহিমাচার্য্য শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতমতের প্রতিদ্বন্দ্বী মতবিশেষ বলিয়া একটা মোটা-মোটি ধারণা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন। আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ স্বামিজীই বর্ত্তমান কালে নিজ বক্তৃতা সকলে বিশদ ভাষায় শ্রীরামানুজ ও তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈত মতের সারোল্লেখ করিয়া তদ্বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট করেন; এবং গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাম কৃষ্ণানন্দ স্বামিজীই প্রথম আচার্য্য রামানুজের জন্মভূমি মান্দ্রাজ অঞ্চলে দীর্ঘকাল বাস ও মূল-গ্রন্থ সকলের সহায়ে ঐ আচার্য্যের অপূর্ব্ব জীবন, মত ও কার্য্য-কলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া বঙ্গের জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত উহা উদ্বোধন-পত্রিকায় ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত করিতে থাকেন।"

যাঁহারা দর্শনের কূটতত্ত্ব এবং পারিভাষিক শব্দ আয়ত্ত করিতে কষ্ট বোধ করেন তাঁহারাও এই গ্রন্থ পাঠ করিলে অশেষ উপকার লাভ করিবেন। প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির অনেক তথ্য এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা এই জীবন-চরিতে দাক্ষি-ণাত্যের সমাজচিত্র অতিস্পষ্টরূপে পাইয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছি। ঐতিহাসিক রচনা হিসাবে গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের রত্ন-বিশেষ।

স্বাধীন মহীশূর-রাষ্ট্রের শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়্যাঙ্গার মহাশয় রামানুজের জীবন-বৃত্তান্ত এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনা করিয়াছেন। তিনি পুরাতন তামিল-সাহিত্য মন্থন করিয়া যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা তাঁহার Ancient India নামক গ্রন্থে প্রকা-শিত হইয়াছে। আপনারা এই ইংরাজী গ্রন্থের সঙ্গে মিলাইয়া পাঠ করিলেও উদ্বোধন-কার্য্যা-লয়ের গ্রন্থপাঠে সবিশেষ প্রীতি ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। ভারতীয় ইতিহাস ও দর্শন অনুরাগী ছাত্রগণ এবং ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজ-সেবকগণ সকলেই এই সুবৃহৎ উপাদেয় বাঙ্গালা গ্রন্থখানি একবার পড়িয়া দেখিবেন।

এই সঙ্গে আমরা একখানি পুস্তিকার প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহা নবীন হিন্দুসমাজের তীর্থক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধে লিখিত। নাম 'শ্রীদাক্ষিণেশ্বর'। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধনস্থানের পরিচয় কে না লইতে চাহেন?

তারপর, কলিকাতার লোটাস্ লাইব্রেরী। ভক্ত স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইতিপূর্ব্বে উপনিষদের একটী সুন্দর সটীক সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হইয়া হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বির-

চিত সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ মূল, অন্বয়, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ এবং তাৎপর্য্য সহ প্রকাশ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এই অমূল্য গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান গ্রন্থে বেদান্ত-শাস্ত্রের সমস্ত বিষয়গুলি সহজভাবে বর্ণিত এবং উপনিষৎসমূহের তাৎপর্য্য সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং সে হিসাবে হিন্দুর কাছে আলোচ্য গ্রন্থের উপযোগিতা ও মূল্য বড় কম নহে। বর্ত্তমান সময়ে চরিত্র-গঠন-কার্য্যেও ইহা যথেষ্ট সহায়তা করিবে। বঙ্গ ভাষায় হিন্দু সাহিত্য প্রচার কল্পে "লোটাস্ লাইব্রেরী" যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেছেন। বঙ্গীয় পাঠকবর্গ কি তাহার যথোচিত সমাদর করিবেন না? 'গৃহস্থ'-বিজ্ঞাপনী পাঠ করিলে ইঁহাদের নিয়মাবলী জানিতে পারিবেন।

এতদ্ব্যতীত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয় নানা বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া ইতিমধ্যে সাধারণ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত ও প্রকাশিত পঞ্চদশ টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ এক অপূর্ব্ব ও উপাদেয় গ্রন্থ। সম্প্রতি তিনি সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের একটী সুন্দর ও সচিত্র সংস্করণ প্রকাশে যত্নবান হইয়াছেন। ইহার প্রথম খণ্ড আমরা পাইয়াছি। ইহাতে মূল, অন্বয় এবং বঙ্গানুবাদ (শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা অবলম্বনে) আছে। অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল। এরূপ বহুব্যয় সাপেক্ষ শ্রীমদ্ভাগবতের সচিত্র সংস্করণ সম্পূর্ণ হইলে, আমাদের উপকার হইবে।

৪। তামাকের চাষ

তামাক অনেক গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। প্রতিবৎসর আমাদের বাঙ্গালাদেশে কম তামাক উৎপন্ন হয় না। প্রায় প্রত্যেক গৃহেই ন্যূনাধিক পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হয়। সেই সকল গৃহস্থ নিজের প্রয়োজনীয় তামাক রাখিয়া কিছু কিছু বিক্রয় করিতে পারে। এই তামাকের চাষ কোন সময় কি প্রকারে হয় তাহাই বর্ণন করিব।

সাধারণতঃ তামাকের চাষ আশ্বিন মাস হইতেই বাঙ্গালাদেশে আরম্ভ হয়। আশ্বিন মাসে গৃহস্থ-গৃহে খানিক মাটী চাষ করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। সেই বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইলে তাহা কর্ষিত ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। সাধারণতঃ এক হইতে দেড় হাত অন্তর এক একটী চারা রোপণ করিতে হয়। যখন চারাগুলি বাঁচিয়া উঠিবে তখন চারার গোড়ায় মাটী দিতে হয়। চারা লাগাইয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, ঢাকিয়া না দিলে রৌদ্রতাপে মরিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। চারার গোড়ায় মাটী দেওয়া হইলে প্রত্যহ গাছের গোড়া হাতড়াইয়া দিতে হয়। তাহাতে গাছগুলি ক্রমে বলিষ্ঠ হইয়া উঠে।

গাছগুলি অর্দ্ধহস্ত পরিমিত লম্বা হইলে তাহার ডগা কাটিয়া দিতে হয় ও যাহাতে বেশী সংখ্যক পাতা বর্দ্ধিত হইতে না পারে তাহা করিতে হয়। পাতা বেশী হইলে পাতাগুলি ছোট হয় ও পাতার মাল কম হয়। এইরূপ দুই তিনবার ডগা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। যে সকল গাছ বীজের জন্য রাখিতে হইবে তাহার ডগা ভাঙ্গিতে হইবে না, ঐ সকলের ডগা বিস্তৃত হইয়া আগায় বীচি হয়। যে বৎসর বৃষ্টি কম হয় সেই বৎসর গাছের গোড়ায় জল দিতে হইবে। যে মাটী

সারযুক্ত ও সরস তাহাতেই তামাক প্রচুর জন্মায় এবং সেই স্থলের গাছ বলিষ্ঠ হয় ও অধিক মাল সংযুক্ত হয়।

আমাদের দেশে তামাক নানাজাতীয়। বাহিরবন্দর, শিবের জট, মতিহার, বিলাতি প্রভৃতি জাতীয় তামাক গাছ। ইহাদের চাষ এক সময়েই হয়। তবে বিলাতি জাতীয় তামাকের চাষ কিছু পরে করিতে হয়। তামাক চাষ করিয়া মাঝে মাঝে গাছের গোড়ায় মাটী খুঁড়িয়া দিতে হয়, তজ্জন্য বিস্তৃত-ক্ষেত্রস্বামী এক প্রকার কাষ্ঠ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র লাঙ্গল ব্যবহার করে, তাহা দিয়া গাছের গোড়ার মাটী ওলট পলট করিয়া দেয়। আমাদের দেশে রঙ্গপুরে বাহের বন্দর তামাকের চাষ বেশী হয়।

রঙ্গপুর জেলার বাহেরবন্দর পরগণায় এই জাতীয় তামাকের চাষ প্রচুর হয়, তজ্জন্য ইহার নাম "বাহেরবন্দর" তামাক হইয়াছে। এই তামাক বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন দিনাজপুর, কুচবেহার, জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় তামাকের চাষ প্রচুর হয়।

তারপর গাছগুলি বড় ও পাতা বাতি হইলে গাছগুলি কাটিয়া লইতে হইবে। গাছ কাটিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। ঘরে আনিয়া ছায়ায় রাখিয়া শুকাইতে হইবে। রৌদ্রে শুকাইলে তামাকগুলির হানি হইবে। ছায়ায় শুষ্ক করিলে তামাকের তেজ রক্ষা হয়। পাতাগুলি শুষ্ক হইলে গাছ হইতে পাতা, পাতার গোড়ায় কাটিয়া বাহির করিয়া আবার কাটিতে আটকাইয়া শুকাইতে হইবে। এইরূপে শুকান শেষ হইলে পাতাগুলিকে জাতায় রাখিতে হইবে, তারপর জাতা হইতে বাহির করিয়া খড়-নির্ম্মিত ভুরুয়াতে বাঁধিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। তৎপর প্রয়োজন মত এই ভুরুয়া হইতে মাঝে মাঝে বাহির করা যাইতে পারে।

এই তামাক পাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া লালী সংযোগে মিলাইয়া খাদ্যোপযোগী করিতে হয়। ইহা প্রস্তুতের জন্য কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মুসল, উদুখল আছে, অথবা ঢেঁকিতেও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যাহারা তামাকের চাষ করে তাহারা প্রচুর লাভবান হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্র নিজের বাসবাটীর নিকটেই করিয়া থাকে, তবে বিশিষ্ট লোকগণ দূরে বিস্তৃত ক্ষেত্রও করিয়া থাকে। ব্যবসায়-হিসাবে তামাকের চাষে লাভ প্রচুর।

অল্প বা বিনা পুঁজিতে প্রচুর লাভ অন্য ব্যবসায়ে হয় না। কোন কোন বৎসর অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন গাছ কাটিবার পোকা দৃষ্টি হয়। এই সকল পোকা পাতাগুলি কাটিয়া সচ্ছিদ্র করিয়া দেয়। এই সকল পোকা গাছের যথেষ্ট ক্ষতি করে। এই সকল পোকার দৌরাত্ম্য হইতে গাছগুলিকে নানা উপায়ে রক্ষা করিতে হয়। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট তামাক সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তটুকু পাইয়াছি।

*
* *

৫। প্রাচীন ভারতের নবাবিষ্কৃত কাববর

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের লক্ষাংশের এক অংশও এখন পর্য্যন্ত "আবিষ্কৃত" হয় নাই। প্রতিদিন প্রাচীন ভারতের নূতন নূতন কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদির বৃত্তান্ত শুনিতে পাইতেছি। সম্প্রতি দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুর হইতে ত্রিবেন্দ্রমবাসী পণ্ডিত গণপতি

শাস্ত্রী মহাশয় ভাস কবির নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন—১। স্বপ্ন বাসবদত্তা; ২। প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ; ৩। পঞ্চরাত্র; ৪। চারুদত্ত; ৫। দূত ঘটোৎকচ; ৬। অবিমারক; ৭। বালচরিত; ৮। মধ্যম ব্যাযোগ; ৯। কর্ণভার; ১০। উরুভঙ্গ;

আমরা ভাসকবির নাম বহুদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু তাঁহার কোন গ্রন্থ এতদিন আমাদের চক্ষে পড়ে নাই। শাস্ত্রী মহাশয় এতদিনকার একটা অভাব ঘুচাইয়াছেন। তাঁহার গবেষণা ও পরিশ্রমের জন্য ভারতবাসী মাত্রেই কৃতজ্ঞ।

ভাসকবি কোন্ সময়ের লোক, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। আমরা আশা করি শীঘ্রই তাহা নিরূপণের জন্য বিশেষ অনুসন্ধান আরব্ধ হইবে। "পণ্ডিতেরা বিচার করে লয়ে তারিখ, সাল।" এই বিচারের সূত্রপাত হইয়াছে—তাহা এখন পর্যান্ত 'অনুমান' মাত্র। তবে জয়দেব মিশ্র (পক্ষধর), রাজশেখর, বাণভট্ট এবং কালিদাস প্রভৃতি যখন তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তিনি যে ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই হিসাবেই বুঝিতে পারি ভাসকবি নিতান্ত অর্ব্বাচীন নহেন। তাঁহার গ্রন্থে আমরা আমাদের জাতীয় সভ্যতার যে চিত্র পাইতেছি, তাহাও আমাদের অতি প্রাচীন সমাজের বিবরণ।

অতএব ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ভাসের প্রতি আকৃষ্ট হইবার আমাদের যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ—তাঁহার কবিত্ব। কি সুন্দর সহজ-সরল প্রাণস্পর্শী রচনা! কেমন সংযত ভাব! চরিত্র-অঙ্কনে কিরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য! আমরা ভবিষ্যতে তাঁহার চারুদত্ত, পঞ্চরাত্র, স্বপ্ন-বাসবদত্তা, যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিব—আলোক-চিত্রের ন্যায় তাঁহার কি সুন্দর প্রকৃতি-বর্ণনা! মনোবিজ্ঞানে তাঁহার কি সূক্ষ্ম দৃষ্টি! 'নীতি-শাস্ত্রে' তাঁহার জ্ঞান কত গভীর!

কলম্বস আবিষ্কৃত নবভূমগুলের ন্যায় নবাবিষ্কৃত ভাস কবির গ্রন্থাবলী বাস্তবিকই আমাদের কাছে বড় কৌতুকপ্রদ, বড়ই আনন্দদায়ক। আমরা এতদিন কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি প্রভৃতি কবির গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ভাস আমাদিগকে আবার নূতন বাঁশী শুনাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

আমরা আশা করি, অচিরেই ভাস-গ্রন্থাবলী বিশ্ববিদ্যালয়-টোল প্রভৃতিতে পাঠ্য পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইবে। সংস্কৃত বৌদ্ধ কাব্য "সৌন্দর-নন্দের" ন্যায় ভাস-গ্রন্থাবলীর কয়েকখানা আমরা 'গৃহস্থের' জন্য বঙ্গ ভাষায় প্রচার করিব—সঙ্কল্প করিয়াছি।

* *
*

৬। দেবোত্তরসম্পত্তি

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এস্, সি মহাশয় হিন্দুসমাজের একজন বিচক্ষণ সেবক। তিনি আমাদের দোষ নিবারণের জন্য সময়ে সময়ে আলোচনা উত্থাপন করিয়া থাকেন। আশা করি, তাঁহার প্রশ্নগুলি সহৃদয়তার সহিতই আলোচিত হইবে। এবার তিনি দেবোত্তর সম্পত্তির প্রতি দেশবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

যাঁহারা পাওনাদার ঠকাইবার জন্য বা মাতাল ছেলেরা যাহাতে বিষয়টা নষ্ট না করে সেইজন্য নিজের সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া

থাকেন তাঁহাদের কথা কিছু বলিতে চাহি না। কিন্তু তীর্থস্থানের যে সকল বড় বড় দেবালয়ের সম্পত্তি আছে—যাহা সাধারণের প্রদত্ত অর্থ হইতেই সঞ্চিত হইয়াছে—তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করিবার জন্য সাধারণকে আহ্বান করিতেছি।

বর্ত্তমানকালের হিন্দুর প্রধান দোষই দেখি কেহ বিচার করিতে চাহে না, কোন্ কাজটা ভাল হইতেছে কোন্‌টা মন্দ হইতেছে সেটা যুক্তির সাহায্যে অবধারণ না করিয়া তাহারা অন্ধভাবে পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিয়া চলিবে। এরূপ অবস্থায় সমাজের কোনও রূপ উন্নতি অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

আমি একজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোককে বলিয়াছিলাম "আপনার গুরুঠাকুর বড় বিলাসী এবং তাঁহার কয়েকটা আচরণ ভাল বলিয়া মনে হয় না"। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "বাপরে! গুরু নিন্দায় অধোগতি, ঠাকুর মশায়ের কোনও নিন্দা আমার কাছে করিবেন না।" বাস্, এক কথায় সব চুকিয়া গেল। গুরু যথেচ্ছ আচরণ করিতে থাকুন শিষ্যের গুরুভক্তি তাহাতে টলিবে না। এমন না হইলে কি আজ এত ভণ্ড প্রতারক গুরুগিরির ব্যবসা চালাইয়া মজা লুটিতে পারিত?

যদি কোনও ব্যক্তির পীড়া হইল তাহার বাড়ীর মহিলাগণ 'মানসিক' করিলেন, পীড়া আরোগ্য হইলে কোনও প্রসিদ্ধ দেবতার পূজা দিবেন। কিন্তু কেহ কি ভাবিয়া দেখেন না এই যে তাঁহারা দেবতাকে অর্থ দিলেন, সে অর্থকে ব্যবহার করিবে, কিরূপ কার্য্যে ব্যবহার করিবে? দেবালয়ের মোহন্ত মহারাজেরা ও পাণ্ডা প্রভুরা এই সকল চিন্তাহীন ব্যক্তির অর্থে ধনী হইয়াছেন, কাজেই যদি এই দরিদ্র লেখক তাঁহাদের নাম ধাম দিয়া তাঁহাদের দুষ্কার্য্য সকলের কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে অবিলম্বে মানহানির অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হইবে। আর যাঁহারা এই সকল দেবালয়ে অর্থ দেন তাঁহারা কি জানেন না তাহার কিরূপ সদ্ব্যয় হইবে? খুব জানেন। কিন্তু চক্ষু থাকিতেও যে অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও যে বধির, তাহার আর উন্নতির আশা কোথায়?

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এদেশে এতগুলি ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদপত্র রহিয়াছে, তাহাতে কত ইউরোপীয় রাজনীতির বিশ্লেষণ, আরবদেশীয় উটের যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা বাহির হইতেছে, কিন্তু এই দেবোত্তর-সম্পত্তির অপব্যবহার সম্বন্ধে একটী কথাও ত দেখিতে পাই না। ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি সমস্ত সংবাদপত্রে যদি দিনের পর দিন এ বিষয়ে লেখা হইতে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মোহন্তগণের চৈতন্যোদয় হয় এবং সাধারণের অর্থ ভোগ বিলাসে ব্যয়িত না হইয়া দরিদ্রের সেবায় নিয়োজিত হয়। এ বিষয়ে কোনও আইন হওয়া সম্ভব নয়, কেননা ইংরাজ গবর্মেণ্ট আমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কিন্তু যদি আমরা, যাহাদের অর্থে এই দেবোত্তর সম্পত্তি পুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, দেখিতে চাই যে দেবতার অর্থ দেবতার প্রিয় কার্য্যে ব্যয়িত হইবে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ না হউক আংশিক রূপে যে আমরা কৃতকার্য্য হইব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জানি না কবে দেশের মধ্যে সে ন্যায়বুদ্ধি ও যুক্তির আবির্ভাব হইবে। যতদিন তাহা না হয় ততদিন শ্রদ্ধাস্পদ গৃহস্থগণের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁহারা মা কালী ও বাবা মহাদেবের নামে যে পূজা

'মানসিক' করেন, তাহা তীর্থস্থানের কলঙ্কস্বরূপ পাণ্ডা ও মোহন্তগণের হস্তে না দিয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবায় লাগাইবেন। ব্যবসাদার ভিখারীদের কথা বলিতেছি না। আপনার বাড়ীর আশেপাশে যে সকল ভদ্রলোক ১৫।২০৲ টাকায় সংসার প্রতিপালন করিতেছেন তাহাদের অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট সন্তানগুলিকে 'মানসিকে'র অর্থে খেলনা ও মিষ্টান্ন কিনিয়া দিন। শিশুর মুখে হাসি ফুটিবে, দেবতা আপনার উপর প্রীত হইবেন।

সম্প্রতি প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানবিৎ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় "সাহিত্য"-পত্রে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি' শীর্ষক প্রবন্ধে দেশের আর কয়েকটি অভাব আলোচনা করিবার জন্য সাহিত্য-সেবিগণকে আহ্বান করিয়াছেন। আশা করি,—বঙ্গের লেখকগণ বর্ত্তমান সমস্যাগুলির প্রতি সবিশেষ মনোযোগী হইয়া সাহিত্য সেবার দ্বারা জাতীয় জীবনকে উন্নত করিতে সচেষ্ট হইবেন।

*
* *

৭। অস্বাস্থ্যের প্রতীকার

জন-সাধারণের শক্তি বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টায় নিয়োজিত হইবার যে আভাষ দেখা যাইতেছে তাহা দেশের পক্ষে সুলক্ষণ। এতদিন লোকে কিসে অর্থ উপার্জ্জন হইবে এই চিন্তায় সদাই ব্যস্ত থাকিত বর্ত্তমানে দেশে যদিও মহার্ঘতাই দুর্ভিক্ষের রূপান্তর হইয়াছে—লোকে যদিও ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের মধ্যে কেবল অর্থকেই উপাসনা করিতে প্রয়াসী থাকিতেছে, তথাপি শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক জীবনের উন্নতির দিকে লোকের আকাঙ্ক্ষা ও জাগিয়াছে। এখন লোকে সেই জন্য "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে শিখিতেছে।

বঙ্গে শুভ স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বালক যুবক বৃদ্ধ সকলেই শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য পূর্ণ উদ্যমে লাগিয়াছিল। পরে সরকারের কুদৃষ্টিতে যখন উদ্যম সমূলে বিনষ্ট হইল—যখন সমিতি মাত্রেই রাজ-দ্রোহিতার প্রধান আড্ডা বলিয়া বিবেচিত হইল, তখন বলিষ্ঠ যুবক মাত্রেই ডাকাতের প্রধান সর্দ্দার বলিয়া ধৃত হইতে লাগিল। শুনিতে পাই, আজকাল খুলনা যশোহর প্রভৃতি জেলায় সুস্থ সবল বালক মাত্রেরই উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়িয়াছে! বাঙ্গালীর সুরেন্দ্রনাথ, এ সম্বন্ধে কি তুমি আন্দোলন তুলিবে না?

সন্তানের শক্তি স্বাস্থ্য-সামর্থ্যই যখন পিতা-মাতার যথার্থ ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল, তখনই বাঙ্গালা আবার জুজুর দেশে পরিণত হইল। যুবক যেন আবার কঙ্কালসার বালক; লাবণ্য ও শ্রী দেশ ছাড়িয়া পলাইল। দেশ আজকাল ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি নানাবিধ বিজাতীয় খেলায় পূর্ণ হইতেছে। ফলে কাহারও হস্ত কাহারও পদ ভগ্ন হইতেছে। তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই, কিন্তু তাহারা পরিশ্রমানুযায়ী খাদ্যাভাবে অস্থিকঙ্কালসার হইয়া নানাবিধ ব্যাধির আকর হইতেছে—অমৃত বোধ হয় গরলে পরিণত হইতে চলিয়াছে। অপরদিকে বিদেশী জিনিষে স্বদেশীর তর্পণ হইয়া বিদেশীয় বণিকের বেশ দক্ষিণান্তও হইতেছে। ঝাড়ের বাঁশ ঝাড়েই শোভা পাইতে লাগিল—দেশী মুদ্গর কাহারও আঙ্গিনায় কাহারও চুল্লিতে আশ্রয় পাইল। যাহা হউক, বালক আবার সুবোধ সুশীল হইয়াছে—যুবক আবার উত্তম কেরাণী

নিষ্কর্ম্মা স্কুলমাষ্টার বা ওকালতনামাহীন উকীল হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিল—বৃদ্ধ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—পিতামাতা সুস্থির হইলেন—সরকারও নিরাপদ বিবেচনা করিলেন! বুঝিলে—স্বাস্থ্যের দেবতা কেন বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছেন?

এখন প্রায় সকল পীড়ার মূল কারণ ম্যালেরিয়া বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। এক ম্যালেরিয়ায় বঙ্গ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। বীরভূম প্রভৃতি দুই একটী জেলা ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দৃষ্ট হয়। এই ম্যালেরিয়া কিরূপে কি উপায়ে দেশ হইতে বিতাড়িত করা যায় এখন ইহাই গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের মহা সমস্যা।

অনেকে দেশের দূষিত জল-বায়ুই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। আমাদের বিবেচনায় ম্যালেরিয়ার কারণ দুইটী—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক। জলবায়ুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অমনোযোগ বাহ্যিক কারণ হইতে পারে; কিন্তু আমরা যে অনাহারী বা অর্দ্ধাহারী এবং বস্ত্রহীন ইহাই ম্যালেরিয়ার প্রধানতম কারণ বলিলে অন্যায় হইবে কি? ধন-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ, আপনাদের কি মত?—স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ, আপনারা কি ধন-বিজ্ঞানের সাহায্য না লইয়া লোক সমাজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে সাহস করেন? অন্নবস্ত্রের অভাব যতদিন আছে, ততদিন স্বাস্থ্য বঙ্গে আসিবেন না।

খাঁটি গব্যঘৃত ম্যালেরিয়া-নাশক—শাস্ত্রেও কথিত আছে—"ঋণম্ কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"। কিন্তু প্রধানতঃ অর্থাভাবেই আমাদিগকে ইহার উপকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। আজ কাল দেশে সব জিনিসই ভেজাল—অকৃত্রিম দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য—ইহাই পীড়ার একটা প্রধান কারণ। সমাজে, দেশে, বাজারে এত ভেজাল মাল কেন চলিতেছে? আমাদের দোকানদারেরা সকলেই অসাধু, দুশ্চরিত্র ও অসৎ—এ কথা বলিলে চলিবে না। উহা superficial মত মাত্র, একটা ভাসা ভাসা অগভীর অনুসন্ধানের পরিচয়। যে কারণে দুর্ভিক্ষের সময়ে লোকে ঘাশ পাতা খাইয়াও বাঁচিতে চেষ্টা করে, সেই কারণেই আমরা সাধারণ সময়ে অপুষ্টিকর, স্বাস্থ্য-হানিকর খাদ্য পাইলেই কৃতার্থ বোধ করি।

দুর্ভিক্ষ আমাদের লাগিয়াই আছে—কাজেই আমরা—মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী সকলেই কোন উপায়ে শরীর ধারণ করিতে পারিলেই বাঁচিয়া যাই। ভেজালেও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না—ভেজালই আমরা চাই। আমরা দরিদ্র, শিল্পহীন, দুনিয়ার মুটে মজুর,—সুতরাং আজ "সুবোধ বালক—যা পাই তাই খাই"! অতএব দুর্ভিক্ষের সময়ে লোকেরা যাহা চায়, যাহা demand করে, আমরা খুব সুখের সময়েও তাহা অপেক্ষা পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যকর মাল demand করিতে পারি না! ইহা তোমাদের ধন-বিজ্ঞানের মত। এইমত যদি খণ্ডন করিতে পার, তবে তোমাদের এম্, এ, পি, এইচ্, ডি, ডিগ্রীর বাহাদুরী দিব। গবর্মেণ্ট ও মাঝে মাঝে অনুসন্ধান-সমিতি বসাইতেছেন। "বিশেষজ্ঞগণ" বস্তা বস্তা রিপোর্ট বোধ হয় প্রকাশ করিয়াছেন। সেগুলি পড়িতে পড়িতে আয়ু ফুরাইয়া আসিবে—স্বাস্থ্য ফিরিবে না। সরকার বাহাদুর কি practical হইবেন না? দুর্ভিক্ষের অবস্থা কাটিয়া গেলেই ভেজাল আর চলিবে না—স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে।

দেশ রেলে ছাইয়া ফেলিল—বাণিজ্যের

সৌকর্য্যার্থে অনেকেই ইহার অনুমোদন করেন সত্য। কিন্তু ইহা একদিকে যেমন উপকার দর্শাইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ জলের চলাচল বন্ধ করিয়া দেশে ম্যালেরিয়ার বীজ উৎপাদনে, সদাই নিয়োজিত। যেখানে জলপ্লাবন হয়, সেখানে প্রায়ই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দৃষ্ট হয় না। বড় বড় নদীর উপরে প্রকাণ্ড সেতু নদীর স্রোত বন্ধ করিতেছে। ইহাও ম্যালেরিয়ার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। "অমৃত বাজার পত্রিকা" এ সব কথা চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন।

আজকালকার সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত মানব অধিক পরিমাণে সহরবাসী হইতেছেন—দেশ ছাড়িতেছেন—গ্রাম উজাড় হইতেছে। সন্ধ্যা-সকালে হরিনামে যে গ্রাম উদ্ঘোষিত হইত—শঙ্খ ঘণ্টায় দিক মুখরিত হইত—ধূপ-ধুনার গন্ধে দিক আমোদিত থাকিত—জন-কোলাহলে সদাই জীবনের লক্ষণ সূচনা করিত, এখন সেখানে শিবার চীৎকার, কাকের কা কা শব্দ, লতা-পাতায় পূতিগন্ধ ও স্থির নির্জ্জনতা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ সূচনা করিতেছে। গ্রামের পতনের সহিত বঙ্গের পতন অনিবার্য্য—বঙ্গের শৌর্য্য-বীর্য্য, বুদ্ধি-প্রাখর্য্য সবই এই গ্রামের পরিপক্ক ফল। প্রতাপ, সীতারাম, কেদার রায় সকলেই গ্রামবাসী ছিলেন—গ্রামই ইঁহাদের লীলা-ক্ষেত্র, গ্রামই ইঁহাদের উন্নতির, মান-মর্য্যাদার প্রধান সোপান। এই গ্রামকে উন্নত করিতে না পারিলে দেশ উন্নত হইবে না। সহরবাসী আর কয়জন?—মুষ্টিমেয়, হৃদয়হীন, ক্ষীণকণ্ঠ, অস্থি কঙ্কাল-সার সহরবাসীর সংখ্যা কত? কিন্তু ঐ যে সহস্র সহস্র শত শত লোক গ্রামে বাস করিতেছে—ঐখানে দেশের প্রাণ—ঐখানে দেশের শক্তি—ঐখানেই দেশের সব আশা ভরসা। এখন যে পল্লীতে স্বাস্থ্য নাই তাহার জন্য প্রধানতঃ ধনবান এবং বিদ্বানেরাই দায়ী।

আজকাল সবাই ডাক্তার সবাই কবিরাজ, সবাই চিকিৎসক। এক বোতল জল, দুই এক শিশি কুইনাইন এবং একটী আলমারি হইলেই আজকাল ডাক্তারী চলে! অবশ্য, এরূপ 'হাতুড়ে' ডাক্তার না থাকিলে আবার অনেক দরিদ্রের কুটিরে হাহাকার লাগিয়াই থাকিত। তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু ইহাও সত্য যে,—এই অভিনব চিকিৎসক-সম্প্রদায় দেশের পীড়ার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছেন। কুইনাইন একেই এদেশের লোকের ধাতে অসহ্য, তাহাতে আবার ইহার অপ্রয়োগ, এ দুয়ের সংমিশ্রণে দেশের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। তবে আমরা এ কথা বলি না যে ইহাদের মধ্যে দু'দশ জন যথার্থ মানব-হিতের জন্য চিকিৎসা-ব্রত অবলম্বন না করিয়াছেন—যাঁহারা এরূপ দায়িত্ব লইয়াছেন, ভাব হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য। এদিক সরকার বাহাদুর "মেডিক্যাল বিল" জারি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহার প্রভাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এক্ষণে লোকহিত-ব্রত সুশিক্ষিত চিকিসকের উদ্ভব একান্ত আবশ্যক।

একদিকে যেমন ডাক্তারের প্রাদুর্ভাব, অপর দিকে অনেকে দুই একখানি রসায়ন-শাস্ত্র, ভৈষজ্য-রত্নাবলী প্রভৃতি পুস্তক ক্রয় করিয়া গাছগাছড়া সামান্য চিনিলেই কবিরাজ বলিয়া আখ্যাত হইতেছেন। ইহাতে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের সুনামের পরিবর্ত্তে দুর্ণাম রটিতেছে। যে শাস্ত্র দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার জন্য মহাতপা

ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হওয়ায় মুনি ঋষিদিগের তপস্যাদির বিঘ্ন হওয়ায় অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, আত্রেয় চ্যবন, কাত্যায়ন মৈত্রেয় প্রভৃতি মহর্ষিগণ—

"দিব্যভূতা সদারোজ্য প্রাদুর্ভূতা শরীরিণাম্
তপোপবাসাধ্যয়নব্রহ্মচর্য্য ব্রতযুষাম্ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।"

ইত্যাদি শ্লোকে প্রজাদিগের দীর্ঘায়ু সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভরদ্বাজের নিকট যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করেন, মিত্রতা পরায়ণ পুনর্ব্বসু সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ ছয় জন শিষ্যকে যে পবিত্র আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র শিক্ষা দেন, তৎপরে অগ্নিবেশ প্রভৃতির সংগ্রহ সকল যাবতীয় মহর্ষির অনুমোদিত হইয়া যে শাস্ত্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ভূতগণের মঙ্গল সাধন করিয়াছে, আজ তাহার এই দুর্দ্দশা! আজকালকার মহামহোপাধ্যায় কবিরাজগণ পাচন-বড়ীর দোকানদারী করেন মাত্র, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নবজীবন সঞ্চারিত করিতে তাঁহাদের অল্পই চেষ্টা দেখা যায়।

ওষধিদিগের প্রয়োগ, নাম ও রূপ অবগত না হইয়া আজকাল অনেকেই উদ্ভিদবিৎ হইতেছেন—উদ্ভিদবিদ্যা-বিশারদ না হইয়াই, আজকাল অনেকে দেশ, কাল ও ব্যক্তিভেদে ওষধি প্রয়োগ না করিয়াই ভিষক-শ্রেষ্ঠ হইতেছেন।

যে ভারত উদ্ভিদের দেশ—যেখানকার উদ্ভিদ দেশবিদেশে প্রেরিত হইয়া ভিন্নাকারে এখানে বহুমূল্যে বিক্রয় হইতেছে—তাহার এই দশা! কেবল উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে দেশের নানাবিধ অকল্যাণ হইতেছে, দেশীয় পাঁচনের যে কত ফল তাহা কি কাহারও অবিদিত? এই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের যত উন্নতি হইবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

খাদ্যাখাদ্যের বিচার শরীর রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকারী—দেশের জলবায়ুভেদে খাদ্য-দ্রব্যের তারতম্য হয়। শীত ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এইজন্যই খাদ্য বিভিন্ন। কিন্তু আমরা এতই অনুকরণ-প্রিয় যে, খাদ্যাখাদ্যের অবিচার কারণ, অনেক সময়ে পীড়াকে ডাকিয়া আনি।

শরীর ও মন অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ—একের অশান্তিতে অন্যের অশান্তি। যতদূর সম্ভব মনের শান্তি রাখিয়া সুখে জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য। অনাচার, অত্যাচার, অবিচার, অবিবেচনা, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি নানা কারণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য অবসন্ন। এই অবসাদ ও অশান্তি দূরীকরণের প্রধানতম কর্ত্তা সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বশক্তির আধার ন্যায়বিচারক জগদীশ্বর—তাঁহার করুণার উপর নির্ভর কর।

সর্ব্বশেষে যুবকবৃন্দের নিকট আমাদের নিবেদন—তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী সন্তান হইতে যাইয়া যেন শারীরিক পরিশ্রম হইতে একেবারে বিরত না হন। কেতাব মুখস্থ করার জন্য অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম, সাধারণ ছাত্রাবাসের অপুষ্টিকর খাদ্য, বহুজনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের দূষিত বায়ু গ্রহণ, আহারান্তে বিশ্রামাভাব, জীবনে উৎসাহাভাব প্রভৃতি নানা কারণে—তাঁহাদের শরীরে, অস্বাস্থ্যের বিষ প্রবেশ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনও যেন ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে—তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিসত্বে অনেকে সামান্য চাকুরীর অভাবে যেন দিশাহারা পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায়, স্রোতোমুখে তৃণের ন্যায় ভাসিতে থাকেন! ইহাই তাঁহাদের মানসিক দুর্ব্বলতার প্রমাণ। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে মানসিক বৃত্তি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতেছে—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পুষ্টিকর খাদ্য, নির্ম্মল বায়ু, শারীরিক পরিশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য, সৎ সাহস, আশা-ভরা আহ্লাদ, সাধুচিন্তা, এবং স্বাধীন-প্রবৃত্তি, শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির প্রকৃত সহায়।

যেরূপ ভীষণ ব্যাপার দেখিতেছি, একমাত্র গবর্মেণ্টের প্রবল শক্তিই স্বাস্থ্যকে বঙ্গদেশে ফিরাইতে পারিবে। সমগ্র সমাজব্যাপী এ দুর্দৈব প্রতিকার নিবারণ করা অর্থহীন দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টার ও কিছু ফল আছে, সে চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হইবে। আর আমরা যেন স্বাস্থ্যের জন্য চিরকাল কাঁদিয়াই মরিতে শিখি,—"এস ফিরে, এস ফিরে, এস ফিরে গো।" এ ক্রন্দন বিধাতা শুনিবেন।

* *
*

৮। ঢাকার নমঃশূদ্র গায়ক ৺কুশাই সরকার

কুশাই সরকারের জন্মস্থান ঢাকা জেলার অন্তর্গত কেরাণিগঞ্জ থানার অধীন শুভাড্যা গ্রাম। গত কার্ত্তিক মাসে তিনি তিনটী পুত্র রাখিয়া যাইট বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কুশাই নমঃশূদ্র (চণ্ডাল) বংশসম্ভূত। তাঁহার বাল্যজীবনে পারিবারিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। সুতরাং বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি নিজ চেষ্টা ও উদ্যমশীলতা দ্বারা ঘরে বসিয়াই সামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন।

তাঁহার কবিতা-রচনাশক্তি অতিশয় প্রবল ছিল। অতি অল্প সময়ে তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। বিংশ বৎসর বয়সে তিনি দেশীয় ভাটদের ন্যায় নানাবিষয়িণী কবিতা লিখিয়া পূর্ব্ববঙ্গের গণ্যমান্য লোকদিগকে উপহার দিতেন। তিনি পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাদের নিকট হইতে যাহা কিছু পাইতেন উহাই তাঁহার পরিবারস্থ লোকদের ভরণপোষণ পক্ষে যথেষ্ট হইত। পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ রাজা, জমিদার ও ধনীর নিকটে তিনি বার্ষিক বৃত্তিও প্রাপ্ত হইতেন। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাস হইতে তিনি এই বৃত্তি সংগ্রহ করিতে বহির্গত হইতেন। এক কি দেড় মাস মধ্যে বৃত্তির টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। বৃত্তিলব্ধ অর্থ দ্বারা তিনি প্রতিবৎসর সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীঈশ্বরী ভগবতীর পূজা নির্ব্বাহ করিতেন।

তিনি সুন্দর সুন্দর গান রচনা করিয়া, বাউলের ন্যায় রাস্তায় রাস্তায়, পল্লীতে পল্লীতে ও সহরে সহরে গান করিয়া বেড়াইতেন। এই উপায়েও তাঁহার অর্থ উপার্জ্জন হইত। বহুলোকে তাঁহাকে সমাদর করিয়া নিকটে বসাইয়া তাঁহার গান শুনিত এবং দু'চার পয়সা বকশিস দিয়া বিদায় করিত। এই উপায়ে তিনি দৈনিক ১৲ হইতে ২৲ টাকা অর্জ্জন করিতেন। ইহা দ্বারাই তাঁহার পারিবারিক ব্যয় সঙ্কুলন হইত এবং অর্জ্জিত অর্থের কতকাংশ প্রতিমাসেই মজুত থাকিত। বৃত্তিলব্ধ অর্থ তিনি দেবপূজায় ও সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। ক্রমে তাঁহার অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার পরিবারবর্গ এইক্ষণে বিশেষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে।

তাঁহার কবিতা ও গান রচনা করিবার আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। তাঁহার রচিত কবিতাগুলি পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার কবিতা-পুস্তক মধ্যে যে কয়েকখানি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার আলোচনা গৃহস্থে প্রকাশিত হইবে।

আমরা ময়মনসিংহের উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানবিৎ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহের নিকট এই কবির পরিচয় পাইয়াছি।

* *

৯। বাঙ্গালীর শিল্প ও ব্যবসায়

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা আমাদের শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তাহার প্রতি জনগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। আমরা এ সম্বন্ধে আরও নূতন তথ্য প্রকাশিত করিতেছি।

(১) মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ সরকার লিখিয়াছেন :—

আপনার বিখ্যাত গৃহস্থ পত্রিকায় "বাঙ্গালীর শিল্প ও ব্যবসায়" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে বড়ই সুখী হইয়াছি, কিন্তু উহাতে মুর্শিদাবাদের কোন ব্যবসায়ের কথা না থাকিলে ঐ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ দেখায়। এই বিবেচনা করিয়া মুর্শিদাবাদের ব্যবসার কিঞ্চিৎ আভাষ দিলাম।"

মুর্শিদাবাদ

এখানে অনেক মুসলমান শিল্পী আছেন,

তাঁহারা উৎকৃষ্ট বিদরীর কার্য্য করেন ও অনেকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নৈচা তৈয়ার করেন। এখানকার অনেক কারিগর কাগজের নানাবিধ ফুল তৈয়ার করিতে অদ্বিতীয়। এখানে উৎকৃষ্ট বালাপোষ (শীতবস্ত্র) তৈয়ার হয়।

খাগড়া

এখানকার খাগড়াই মুড়কি ও ছানাবড়া বিখ্যাত। এখানকার ন্যায় উৎকৃষ্ট কাঁসার বাসন অন্যত্র কোথাও হয় না; যেরূপ সুগঠন তেমনই পালিস করা, যেন চাঁদির বাসন বলিয়া ভ্রম হয়। এখানকার অনেক দরিদ্র বাসনের কার্য্যে অন্নসংস্থান করে।

বালুচর

এখানকার ন্যায় পট্টবস্ত্র (রেশমবস্ত্র) অন্য কুত্রাপি হয় না। রেশমী কাপড়ে নানারূপ ফুল ও লতাপাতা (বুটীদার) বিশিষ্ট কাপড় বিখ্যাত। কিন্তু কালের গতিতে এ সব শিল্প নষ্টপ্রায় হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে বুটীদার কাপড়ের তাঁত প্রায় দুই সহস্রাধিক ছিল, কিন্তু উপস্থিত এক শত মাত্র বর্ত্তমান; তাহার মধ্যে ২।৩ খানা তাঁতই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক্ষণে এই সব কাপড় আধুনিক বাবুগণের পছন্দনীয় হইতেছে না, তৎপরিবর্ত্তে বোম্বাই, পার্শি সাড়ী ব্যবহৃত হইতেছে।

এখানে আর একটী বিখ্যাত শিল্প আছে, হাতীর দাঁতের খেলানা প্রায় শতাধিক কারিগরে প্রস্তুত করে এবং দিল্লী নগরীতেই অধিকাংশ খেলানা বিক্রয় হয়। জঙ্গলী সাগর ষ্টীলট্রাঙ্ক ও একটী বিখ্যাত শিল্প। মুর্শিদাবাদের প্রধান বা একমাত্র বন্দর জিয়াগঞ্জ বাজার, এস্থানে নানাবিধ ভূষিমাল ও পাট যথেষ্ট আমদানি হয়; জিয়াগঞ্জ রেশমবস্ত্রেরও বন্দর, বিভিন্নস্থানের মহাজনগণ এইস্থান হইতে খরিদ করিয়া লইয়া যান।

মির্জ্জাপুর

এখানকার রেশমবস্ত্র অধুনা অধিক ব্যবহৃত হইতেছে। এখানকার কাপড়ের বিশেষত্ব— সুদীর্ঘ কাল টেঁকসহি, পাড়পাট্টা, রুচিমার্জ্জিত এবং ধোপেও নষ্ট হয় না।

ইসলামপুর—চক্

এখানকার মটকার কাপড়ই উৎকৃষ্ট। তদ্ব্যতীত এখানে রেশমের চাদর প্রস্তুত হয়, কিন্তু সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। এখানে বিলাতের জন্য আর একপ্রকার ৭ গজি রেশমের থান প্রস্তুত হয়, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে ইহার কাটতি হ্রাস হইয়াছে।

জঙ্গিপুর ও বেলডাঙ্গা

এই দুইস্থানে বহু রেশম সুতা তৈয়ারির ছোট ও বড় কুঠী আছে। ঐ কলে বা কুঠীতে বহু শ্রমজীবিগণ খাটিয়া অন্ন সংকুলান করে।

ধুলিয়ান

মুর্শিদাবাদের ব্যাঙ্ক সাহেবের ১টী ছোট বন্দর, এখানে পাট ও অন্নবিস্তর ভূষিমাল আমদানি হয়।

মরঙ্গাবাদ

এখানকার কম্বল বিশেষ উল্লেখযোগ্য; এখানে কার্ম্মী নামী ভাল ভাল কম্বল ও কম্বলের আসন তৈয়ারি হয়।

(২) বাঁকুড়া জেলা হইতে শ্রীযুক্ত রামানুজ কর লিখিয়াছেন—

বাঁকুড়া-গোপীনাথপুর, বিষ্ণুপুর, কেঞ্জাকুড়া ও রাজগ্রামে তসর ও রেশমের ধূতি, শাড়ি, চাদর, জামার থান, গতিস্থতি, বিছানার চাদর, টেবলক্লথ, কেউার চাদর ধূতি ও শাড়ী প্রস্তুত হয়। শুশুনিয়ার পাহাড়ে পাথরের খাদ আছে। এখানে নানা প্রকার খোদাই দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। গৃহের মেজে বাঁধিবার পাথর, দরজা, জানালা, ইট, শীল, মাইলষ্টোন, প্লাটষ্টোন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কেঞ্জাকুড়া ও শুশুনিয়াতে কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয়। বিহারপ্রদেশে এই বাসনের খুব আদর। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের ছড়ি ও পেন্‌হোল্ডার প্রসিদ্ধ। বাঁকুড়া সহরে বিড়ির একটী ও ষ্টীলট্রাঙ্কের তিনটী কারখানা আছে। কেঞ্জাকুড়ায় দুলিচায়া, গামছা, কাচা, লেপের কাপড়, এক খেড়ুয়া প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এখানকার মহানন্দ বরার কাটা বিলাতি কাঁটা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। একটি কাঁটার

মূল্য এক পয়সা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত। দা ও জাঁতি, খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। চারি আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে দা বিক্রয় হয়। ছুরি, কুড়োল, কোদাল, ধান্যাদি মাপিবার পাই প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তত হয়। এখানে এক তোলা হইতে একমণ পর্য্যন্ত কাঁসার বাটি প্রস্তত হয়।

এ জেলায় গালা, ধান, চাল, লাইমষ্টোন, ভাঙ্গা পাথর, হরিতকি প্রভৃতি দ্রব্যের বিদেশে রপ্তানি অধিক। স্থানে স্থানে অভ্রও দৃষ্ট হয়।

জামতাড়া ও লোকপুরে নীলের বড় বড় কুঠী ছিল, এখন উহা লোপ পাইয়াছে। বাঁকুড়ার বয়ন-বিদ্যালয় বেশ সুন্দর ভাবে চলিতেছে।

নূতনচটী ও কোতুলপুরের জুতা প্রসিদ্ধ, কেঞ্জাকুড়ার 'মাদল' বিখ্যাত। ইহা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে বেশ নাম করিয়াছে। রামসাগরের সিন্দুর স্ত্রীলোকদিগের আদরের সামগ্রী। লোকপুরে মেষের লোম হইতে মোটা কম্বল ও আসন প্রস্তত হয়। মালাতোড়ের চাবি গৃহস্থের ব্যবহারযোগ্য।

প্রধান মেলা

১। চৈত্রসংক্রান্তিতে একেশ্বর হরিহরপুর ও সারেশ্বর। ২। বৈশাখের প্রথম তিনদিন কেঞ্জাকুড়ায়। ৩। বারুনিতে শুশুনিয়ায়।

(৩) খুলনা জেলার সাতক্ষীরা গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঘোষ লিখিয়াছেন:—

প্রসিদ্ধ বন্দর ও ব্যবসাস্থান

শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় যে সমস্ত স্থানের নাম করিয়াছেন, তাহুর সাতক্ষীরা মহকুমার ঝাউডাঙ্গা, আগরদাঁড়া, কোকানতলা ও বাঁশদহা এই স্থানগুলি প্রসিদ্ধ ব্যবসাস্থান। বাঁশদহার বস্ত্র অদ্যাপিও বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এখানে প্রায় সহস্র মুসলমান বস্ত্রশিল্পীর বাস। আগরদাঁড়ীর হাটে (আবাদের হাটে) যত গরু বিক্রয় হয়, খুলনা জেলায় এরূপ আর কুত্রাপি হয় না। প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে এখানে হাট হয়। ৩০।৩২ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে লোক এই হাটে আসে। আগরদাঁড়ীর নিকটবর্ত্তী গোদাঘাট্টা নামক স্থানে অত্যুৎকৃষ্ট তাম্র ও আনারস পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ মেলা

সাতক্ষীরায় রথের বাজার এখন আর হয় না। তবে রাসের ও দোলের বাজার হয়। ঝাউডাঙ্গায় স্নানযাত্রার মেলা মাসাধিক কাল থাকে এবং কলিকাতা হইতে অনেক বড় বড় দোকান আসে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মেলায় ৫০০।৬০০ বারবনিতার সমাগম হইয়া থাকে।

আগরদাঁড়ীর কর্ম্মকারেরা সুন্দর লৌহ অস্ত্র গড়িতে পারে। এই গ্রামের জনৈক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা সূক্ষ্ম কার্পাসসূত্র কাটার জন্য খুলনা শিল্পপ্রদর্শনী হইতে পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এখানে একব্যক্তি দেবমূর্ত্তিগঠনকারে, সে তুলনায় কুমারটুলির কারিগর অপেক্ষা ভাল প্রতিমা গঠন করিতে পারে।

আগরদাঁড়ীর নবকালী (লৌখালি) নামক পুরাতন প্রসিদ্ধ নদী এখন মজিয়া গিয়াছে। নদীটি যদি কাটা হয় তাহা হইলে উহার তীরবর্ত্তী স্থানগুলি শিল্পবাণিজ্যে উন্নত হইয়া খুলনা জেলার মধ্যে অত্যুজ্জলরূপে শোভা পাইবে।

প্রতিভাবিকাশের সুযোগ

[সমাজ-বিজ্ঞানের এখন শৈশব অবস্থা। ভারতবাসীর দৃষ্টি এদিকে অতি অল্পই আকৃষ্ট হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে প্রচারিত সকল মতই অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। এই সূত্রসমূহ আমাদের দেশে প্রযোজ্য কি না তাহা হিন্দুসমাজের সকল বিধি-নিষেধগুলি গভীর ও ব্যাপকভাবে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

শ্রীযুক্ত ওডিন্ ফরাসীদেশের একজন বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্। তিনি বহুপরিশ্রম-ফলে যে কয়টী সমাজ-সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধটী লিখিত হইয়াছে।

আশা করি, আমাদের মধ্যে যাঁহারা ধন-বিজ্ঞান রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও প্রাণ-বিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা এই গবেষণা-প্রণালীর প্রয়োগ অভ্যাস করিবেন।]

সমাজ-বিজ্ঞান বলিয়া থাকে সমাজ অতীব স্থিতিশীল। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞান ইহাও বলে যে, যদিও সমাজ স্থিতিশীল, তবুও প্রত্যক্ষভাবে ইহাকে রূপান্তরিত করিতে না পারিলেও পরোক্ষভাবে সমাজের অবস্থা পরিবর্তিত করিতে পারা যায়। সমাজ-সংস্কারের অর্থ—সমাজের উন্নতিকল্পে সমাজের রীতিনীতির কালোচিত পরিবর্ত্তন। কোনও জিনিষের পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে হইলে সেই জিনিষটীর বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। সেইরূপ সমাজ সংস্কার করিতে হইলেও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। তাই সমাজ-বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর 'ফলিত'-সমাজ-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। কারণ, কেমন করিয়া, কি নিয়মের ভিতর দিয়া সমাজ ধীরে ধীরে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে, সমাজ-বিজ্ঞান প্রধানতঃ কেবল তাহারই আলোচনা করিয়া থাকে। অপর দিকে 'ফলিত' সমাজ-বিজ্ঞান সেই সকল তথ্য অবগত হইয়া সমাজের উন্নতিসাধন এবং তৎকল্পে সমাজ-আচারের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে প্রয়াস পায়।

পৃথিবীস্থ প্রত্যেক মানবই তাহার স্ব স্ব বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালনে সমান অধিকারী। সমাজের কর্ত্তব্য প্রত্যেককে সেই অধিকার প্রদান করা। কারণ, সমাজের ভিত্তি মানব। সমাজের উন্নতি-অবনতি ব্যক্তিগত উন্নতি-অবনতির উপর নির্ভর করে। যে সমস্ত সমাজ-আচার উক্ত অধিকার প্রদানের বিরোধী এবং তন্মধ্যে যেগুলির পরিবর্ত্তন বা সংশোধন মানবশক্তির আয়ত্ত, সমাজের উন্নতিকল্পে সেগুলির পরিবর্ত্তন বা সংশোধন একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই উপায়ে অনেক নষ্ট শক্তির উদ্ধারসাধন হইবে; এবং সমাজ বলশালী হইবে।

মানব তাহার স্বাভাবিক ধীশক্তিপরিচালনে অক্ষম হওয়াতেই সমাজে অনেক বৈষম্য ও দুর্দ্দশার সৃষ্টি হয়। সমাজ যদি তাহার উন্নতি-অবনতির মূলস্বরূপ প্রত্যেক মানবকে স্বকীয় বিকাশের স্বাধীনতা প্রদান করিতে কৃপণতা না করিত, তাহা হইলে বোধ হয় সমাজ অধিকতর পুষ্টিলাভ করতঃ জগতে শান্তিবাণী আনয়ন করিতে সমধিক কৃতকার্য্য হইতে পারিত। সভ্যজগতে জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাব বেশী দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু এখনও ব্যক্তিত্ব বিকাশোপযোগী

স্বাধীনতার অভাব খুবই দেখিতে পাওয়া যায়।

শিল্পী যেমন তাহার যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে যত্নবান হয়, সমাজকেও তদ্রূপ করিতে হইবে। কিন্তু সমাজের কলকব্জা কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলেই চলিবে না; ইহাদিগকে আহারও দিতে হইবে। কারণ, যে যন্ত্রপাতি-দ্বারা সমাজের কার্য্যাবলী পরিচালিত হইতেছে, তাহা শিল্পীর জড়পদার্থ নহে—তাহা জীবজগতের শ্রেষ্ঠ সোপানে অধিরূঢ় চৈতন্য-সম্পন্ন মানবজাতি। কিন্তু মানুষকে কেবলমাত্র সাড়াপ্রদানক্ষম (Responsive Power) দেহ বলিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। প্রেম, ভক্তি, উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা, বিবেক প্রভৃতি মানসিক ধর্ম্মের অস্তিত্ব নিবন্ধন মানব-জন্তু মনুষ্যোচিত গুণরাশিতে অলঙ্কৃত। সুতরাং একদিকে যেমন দেখা গেল মানুষ সাড়াপ্রদানক্ষম কোষ্ঠ-সমষ্টি (cell-organism) বলিয়া তাহার শরীর-সংরক্ষণোপযোগী খাদ্যের প্রয়োজন, পক্ষান্তরে সে মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সমষ্টি বলিয়া তাহার জ্ঞান-খাদ্যেরও প্রয়োজন। এই জ্ঞান-খাদ্যের বিতরণ, পরিমাণ ও উহার বিশেষত্বানুসারে মানবগণ সমাজের কার্য্যকারী হইবে। সমাজ যদি তাহার এই কর্ত্তব্য-সাধনে অবহেলা বা পক্ষপাতিত্বের পরিচয় প্রদান করে, তাহা হইলে জীর্ণ-যন্ত্র-পরিচালিত সমাজের উন্নতিমার্গে উত্থিত হইবার আশা কোথায়!

সমাজের কর্ত্তব্যসাধনে, যে দেশে যত লোক অগ্রসর হইবার উপযুক্ত হইবে, সে দেশের উন্নতির আশা তত অধিক। দুই চারিটী জ্ঞানী লোকের দ্বারা সমাজ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে হেগের (Hague) শান্তিনিকেতনের আশা এতদিনে ফলবতী হইয়া যাইত। জনসাধারণের মতামতের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত। তাই, জ্ঞানিগণের গবেষণার ফল যাহাতে সমাজস্থ জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে, সমাজকে সে পথ সতত প্রশস্ত রাখিতে হইবে। সমাজ উক্ত কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না বলিয়াই আমাদের জনসাধারণ অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন। এ পর্য্যন্ত জগতে অনেক সত্য, অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু জনসাধারণ তাহার কয়টী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে? যাহাতে জগতের আবিষ্কৃত তথ্যরাশি সমাজের প্রতি অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে পারে, ফলিত-সমাজ-বিজ্ঞান তাহারই পথ অনুসরণ করিতে প্রয়াসী।

সুখ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজে সত্য এবং অসত্যের পরিমাণ উহার জ্ঞান-সমষ্টির উপর নির্ভর করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমাজের অধিকাংশ লোকই এখনও অজ্ঞানতায় বাস করিতেছে। তাই, অল্প-সংখ্যক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সমাজ-নিয়ন্তা। যাহারা কোনও কারণবশতঃ পূর্ব্বাবধি নিম্নশ্রেণীভুক্ত বলিয়া অবজ্ঞার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের উত্থানের আশা খুব কম। সমাজের নেতৃবর্গ তাহাদিগকে সহায়তা করিতে বিমুখ। কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে,—যদিও প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে প্রতিভাবিকাশে ব্যক্তিগত তারতম্য দৃষ্টিগোচর হয়, বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের তুলনা করিয়া দেখিলে ধীশক্তির মধ্যে কোনও সমষ্টিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়

না। ডাক্তার কিড্ তাঁহার Social Evolution নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে—এমন কি নিউজিল্যাণ্ডস্থিত মেওরিনামক অতি অসভ্যজাতিরাও ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শ গ্রহণে কিছুমাত্র অনুপযুক্ত নহে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, সমাজ-সেবায় উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যার উপরই সমাজের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে। এই উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের উৎপাদন দুইটী প্রধান উপকরণের মিলনসম্ভূত—ব্যক্তি-গত ধীশক্তি ও পারিপার্শ্বিক বা বিশ্ব-শক্তি (Environment)। প্রত্যেক ব্যক্তিই ধীশক্তিসম্পন্ন হইতে পারে না। গ্যাল্টনের মতে ধীশক্তি পুরুষপরম্পরাগত। যদি তাহাই হয়, তবে ধীশক্তিসম্পন্ন পরিবারকে ক্রমশঃ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে দেখিতাম। কিন্তু, বস্তুতঃ, আমরা ইহার বিপরীত ঘটনা অবলোকন করিয়া থাকি। প্রায়শই দেখা যায় ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম হঠাৎ হইয়া থাকে। প্রাণ-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহার দুইটী কারণ স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ঐরূপ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির ২।৩ পুরুষের মধ্যে তাদৃশ ব্যক্তির পরিচয় না পাওয়া গেলেও তদূর্দ্ধে কোন পুরুষ সেইরূপ গুণসম্পন্ন ছিল; এবং গুণ-ক্ষেপণ বা য়্যাটাভিজ্মের (atavism) প্রভাবে মধ্যবর্ত্তী পুরুষসমূহে গুণরাশি প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী পুরুষে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সে ব্যক্তি বংশপরম্পরাগত কোন গুণের অধিকারী না হইয়াও স্বয়ং তাহার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ধীশক্তিসম্পন্ন হইয়াছে। এই দুইটী কারণ ব্যতীত পৃথিবীতে ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইতে পারে না।

জীবজগতে অনেক সময় পারিপার্শ্বিক আমাদের শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হয়। উদ্ভিদ-জগতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই আমরা স্পষ্টরূপে ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারি। বন-জাত ফলফুলগুলি যখন মনুষ্য-হস্তে বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক হইতে মুক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন তাহাদের স্বাদ ও শোভার কত পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়! উদ্ভিদ-জগতের ন্যায় আমাদিগের মনের স্বাভাবিক গতিও বাহ্য-জগতের প্রভাবদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। মানব-মন এই সকল বন্ধন হইতে স্বাধীন হইতে চায়। স্বাধীনতা পাইলেই বিরুদ্ধ-পারিপার্শ্বিক-নিপীড়িত সমাজের প্রচ্ছন্ন-শক্তি কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশমানা হইতে পারে এবং ইহাকে উত্তরোত্তর বিবর্ত্তনমার্গে পরি-চালিত করিতে পারে। সমাজে বাস্তব শক্তির অপেক্ষা প্রচ্ছন্নশক্তির প্রভাব কত অধিক!

সমাজে প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সংখ্যা এক-প্রকার নির্দ্দিষ্ট; মানবের চেষ্টায় ধীশক্তি নির্ম্মিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং সমাজের মধ্য হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে স্ব স্ব প্রচ্ছন্নশক্তি প্রকাশে সমর্থ হয়, সমাজকে তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উপায়েই আমরা সমাজস্থিত প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব। যদিও মানুষকে লইয়াই সভ্যতা, তথাপি তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রতিভাসম্পন্ন, কেবল তাহারাই জগৎ চালিত করিয়া আসি-তেছে। জনসাধারণের কর্ত্তব্য, ধীমানগণের প্রদর্শিত পথ স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা পরীক্ষা করিয়া তাহাতে সম্মতি বা অসম্মতি প্রদান করা।

আমদিগের চতুর্দ্দিকস্থ যে সকল অবস্থা ধীশক্তি-প্রকাশে সহায় হয়, আমরা এখন সেই বিশ্ব-শক্তি পুঞ্জের, সেই আবেষ্টনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

১। প্রাকৃতিক আবেষ্টন

আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে, মানবের বুদ্ধি বা শ্রেষ্ঠত্ব অনেকটা প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশের লোকদিগের "বুদ্ধিমত্তার" কারণ খুঁজিতে যাইয়া অনেক সময় আমরা প্রাকৃতিক অবস্থার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। ফরাসীদেশের সুবিখ্যাত সমাজ-তত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত ওডিন্ দেখাইয়াছেন যে, জ্ঞানী লোকের সংখ্যা ভৌগোলিক অবস্থার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না। তিনি ফরাসী-ভাষা-ভাষী দেশসমূহের বিভিন্নপ্রকার ভৌগোলিক প্রভাববিশিষ্ট জনপদের জ্ঞানী লোকের সংখ্যা গণনা করিয়া ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তৎকর্তৃক প্রদত্ত বহু উদাহরণের মধ্যে আমরা একটিমাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম। সুইস্-দেশে ভেলয় ও ফরাসী-দেশে ভড্ নামক দুইটী জেলা আছে। উভয় জেলাই সমভাবে পর্ব্বতাকীর্ণ। কোন নির্দ্দিষ্ট কালবিশেষের মধ্যে ভেলয় একজনও প্রসিদ্ধ লেখক উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। অপরদিকে সেই একই সময়ের মধ্যে ভড্ জেলায় প্রতি এক লক্ষ লোকের মধ্যে ২২ জন সুবিখ্যাত লেখক জন্মিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ওডিন্ আরও দেখাইয়াছেন যে, কয়েকটী বিভিন্নপ্রাকৃতিক-অবস্থাসম্পন্ন স্থানেও জ্ঞানী-লোকের সংখ্যার কোন ব্যবধান দৃষ্ট হয় নাই। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে "নৈসর্গিক প্রভাব ব্যতীত নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ" এই বৈষম্য সৃষ্টি করিবার জন্য "প্রচ্ছন্ন আছে।" সুতরাং ভৌগোলিক অবস্থা ধীশক্তি-প্রকাশের সহায় বা বিরোধী নহে।

২। মানবের জাতি-গত প্রকৃতি

(বংশ বা রক্তের প্রভাব)

সাধারণের বিশ্বাস যে, বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে শারীরিক অপেক্ষা মানসিক ব্যবধানই অধিক। কোন কোন জাতি কেবল যে জ্ঞানে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহা নহে; অনেকের বিশ্বাস, ঐ সকল জাতির মধ্যে জ্ঞান আহরণ করিবার শক্তিরই অভাব আছে। তাঁহারা বিবেচনা করেন, একজাতি-সম্ভূত অথচ বহুকালাবধি বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন-দেশবাসী শাখা-জাতিসমূহের আলোচনা করিলেও এই তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত ওডিনের পরীক্ষার ফলদ্বারা আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিব।

ফরাসী দেশে ৫টী প্রধান বিভিন্ন জাতির বাস। ইহারা প্রত্যেকেই এক এক নির্দ্দিষ্ট অংশে বাস করিয়া থাকে।—মধ্যভাগে গলগণ, উত্তর-পশ্চিমে সিম্ব্রিয়ান্‌গণ, দক্ষিণ-পশ্চিমে আইবেরীয়ান্‌গণ, দক্ষিণ-পূর্ব্বে লিগুরিয়ানগণ ও উত্তর-পূর্ব্বে বেলজীয়ানগণ। এই সকল বিভিন্ন জাতির মধ্যে তিনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক-গণের সংখ্যার কোনই তারতম্য দেখিতে পান নাই। ফরাসী দেশে ব্যাস্ক ও কেটেলান্ প্রভৃতি অনার্য্যজাতিরও বাস। ব্যাস্ক-পিরাণীস্ জেলায় প্রায় ⅓ লোকের অধিক ব্যাস্ক ও কেটেলান্ জাতি। এই অনার্য্য-জাতিদ্বয় কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে ১৬ জন প্রসিদ্ধ লেখক উৎপাদন করিয়াছে; কিন্তু সেই একই জেলাস্থিত ফরাসীগণ বহুসংখ্যক হইয়াও মাত্র ১৪ জন প্রসিদ্ধ লেখক উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রে নীচ-জাতিই অধিকতর ফলবান্ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল! ওডিন্ কেবল ফরাসীদেশ পরীক্ষা

করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। জার্ম্মেণী, ইতালী, সুইজারলণ্ড, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশও পরীক্ষা করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার মতে জাতিগত, বংশগত, রক্তগত পার্থক্য কর্ম্ম-ক্ষমতার কিছুমাত্র তারতম্যের উৎপাদক নহে।

৩। স্থান-মাহাত্ম্য

আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে, অধিকাংশ প্রতিভাবান্ ব্যক্তিই পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা কেবল সাধারণ লোকের অনুমান নহে, বড় বড় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও * এই ধারণার বশবর্ত্তী ছিলেন। ইউরোপের ও আমেরিকার প্রতিভাবান্ লোকের ফলিত-তথ্য আলোচনা করিলে দেখা যায়—তথাকার অধিকাংশ প্রতিভাবান্ ব্যক্তির জন্মই সহরে। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা তত খাটিবে কি না সন্দেহ। কারণ আমাদের দেশে সহরবাসী লোকের সংখ্যা অতীব কম। তবে ইহা সত্য যে, বর্ত্তমান ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রতিভাবান্ ব্যক্তিই তাঁহাদের পাঠ্যাবস্থা সহরে কাটাইয়াছেন। †

* বেঙ্গহট্; রিটার, লোম্বোসো, লেণী, গিডিংস্ (আমেরিকা) প্রভৃতি।

† (আধুনিক) বঙ্গদেশের বিখ্যাত লোকদিগের জন্মস্থান ও পাঠাবস্থার স্থান নিম্নে দেওয়া গেল।

(ক) সহরে জন্ম ও শিক্ষা; —

(১) মহম্মদ মোসিম (হুগলী)
(২) রাধাকান্ত দেব (কলিকাতা)
(৩) প্রসন্নকুমার ঠাকুর (ঐ)
(৪) দ্বারকানাথ ঠাকুর (ঐ)
(৫) তারানাথ তর্কবাচস্পতি (কালনার সন্নিকটে)
(৬) রামতনু লাহিড়ী (কৃষ্ণনগর)
(৭) রামগোপাল ঘোষ (কলিকাতা)
(৮) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঐ)
(৯) রাজেন্দ্রলাল মিত্র (কলিকাতা)
(১০) হরীশচন্দ্র মুখার্জ্জি (কলিকাতা)
(১১) কেশবচন্দ্র সেন (ঐ)
(১২) কৃষ্ণদাস পাল (ঐ)
(১৩) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (ঐ)
(১৪) রমেশচন্দ্র মিত্র (ঐ)
(১৫) কালীপ্রসন্ন সিংহ (ঐ)
(১৬) নরেন্দ্রনাথ সেন (ঐ)
(১৭) মনোমোহন ঘোষ (কৃষ্ণনগর)
(১৮) উমেশচন্দ্র বানার্জ্জি (কলিকাতা)
(১৯) গুরুদাস বানার্জ্জি (ঐ)
(২০) কালীচরণ বানার্জ্জি (ঐ)
(২১) দুর্গাচরণ বানার্জ্জি (ঐ)
(২২) সুরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি (ঐ)
(২৩) রমেশচন্দ্র দত্ত (ঐ)
(২৪) লালমোহন ঘোষ (কৃষ্ণনগর)
(২৫) নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (বগুড়া)
(২৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা)
(২৭) বিবেকানন্দ (ঐ)
(২৮) আশুতোষ মুখার্জ্জি (ঐ)

(খ) সহরে শিক্ষা ;—

(১) রামমোহন রায়
(২) গঙ্গাধর কবিরাজ
(৩) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(৪) অক্ষয়কুমার দত্ত
(৫) পিয়ারীচাঁদ মিত্র
(৬) মধুসূদন দত্ত
(৭) রাজনারায়ণ বসু
(৮) ভূদেব মুখার্জ্জি
(৯) আবদুল লতিফ
(১০) দীনবন্ধু মিত্র
(১১) দ্বারিকানাথ মিত্র
(১২) মহেন্দ্রলাল সরকার
(১৩) বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়
(১৪) চন্দ্রমাধব ঘোষ
(১৫) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৬) শিশিরকুমার ঘোষ
(১৭) কালীপ্রসন্ন ঘোষ,
(১৮) রাসবিহারী ঘোষ।
(১৯) নবীনচন্দ্র সেন।
(২০) আনন্দমোহন বসু।
(২১) শিবনাথ শাস্ত্রী।
(২২) সারদাচরণ মিত্র।
(২৩) জগদীশচন্দ্র বসু
(২৪) প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বঙ্গদেশে কেবলমাত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবই এই লিষ্টদ্বয়ের বাহিরে যাইবেন.

ইউরোপের উক্ত ভ্রমধারণা দূর করিবার জন্ম জেকবি ও তৎপর ওডিন্ বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারই সারমর্ম্ম এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। ওডিন্ দেখাইয়াছেন যে, পল্লীগ্রাম হইতে উৎপন্ন বিখ্যাত লোক অপেক্ষা সহর হইতে উৎপন্ন তাদৃশ ব্যক্তির সংখ্যা তেরগুণ অধিক। কিন্তু, তিনি বলেন যে, প্রতিভাবান্ ব্যক্তির উৎপত্তির সম্ভাবনা সহরের কেবল লোকসংখ্যার উপর নির্ভর করে না, তাঁহাদের উদ্যমশীলতা ও কার্য্যকারিতার উপরও নির্ভর করে।

জ্ঞানী লোকগণ যে সচরাচর সহরে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা শিক্ষাকাল তথায় যাপন করেন তাহার কারণ সহজেই বোধগম্য। নিম্নে তাহার কয়েকটী কারণ দেওয়া গেল—

(১) সহরগুলিই সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় ও বিচারালয়সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানসমূহের কেন্দ্রস্থান। উক্ত কারণে

(২) সহরে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যসেবী, বৈজ্ঞানিক, শিল্পবিদ্যাবিদ্ ও নানাপ্রকার জ্ঞানী ও ধনশালী লোকের সমাবেশ হয়। এজন্য উহা জ্ঞানানুসন্ধানের উত্তমস্থানে পরিণত হয়। এই সকল প্রতিভান্বিত ব্যক্তিগণের ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদানের ফলে নানা সত্যের আবিষ্কার হয়।

(৩) বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, সংগ্রহালয় (যাদুঘর) প্রভৃতি শিক্ষামন্দির সমূহ কেবল সহরেই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিপক্ষগণ বলিতে পারেন যে, ওডিনের মত কেবল ফরাসীদেশেই খাটিবে, অন্যান্য দেশে যে এইরূপ হইবে তাহার প্রমাণ কি?—বিশেষতঃ, ওডিন্ কেবল 'সাহিত্যিক'-গণেরই ফলিত-তথ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু গ্যাল্টনের "Englishmen of Science" নামক পুস্তকেও আমরা ওডিনের মতসমর্থনোপযোগী তথ্য দেখিতে পাই। গ্যাল্টন্ ইংলণ্ডের ১০০ জন সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদের জন্মস্থান নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত হইয়াছে—

লণ্ডনে......................২১ জন
অন্যান্য বড় সহরে.........১৮ "
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সহরে...২১ "
অন্যান্য স্থানে................৪০ "

তিনি শেষোক্ত ৪০ জনের বাসস্থান-নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়াছিলেন।

ওডিন্‌ও ইতালী, স্পেন, ইংলণ্ড ও জার্ম্মেণী হইতে সাহিত্যিকগণের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ওডিনের এই সকল ফলিত-তথ্য আলোচনা করিয়া আমরা দেখি যে, "পল্লীগ্রামই যে ধীমান্‌গণের উৎপাদনে বিশেষ উপযোগী এরূপ ধারণার মূলে কোনই ভিত্তি নাই।" *

৪। আর্থিক অবস্থা

জ্ঞানিগণের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য অবগত হওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। আমাদের অনেকেরই মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, প্রতিভাশালী ব্যক্তি যে অবস্থাতেই বিচরণ করুন না কেন, সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি তাঁহার ক্ষমতা জগৎসমক্ষে প্রকাশিত করিতে কৃতকার্য্য হইবেনই। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জীবন-চরিত-লেখকগণও তাদৃশ ব্যক্তিগণের আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন

* বঙ্গদেশের ধীমানগণের জীবনী আলোচনা করিয়াও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি কিনা দেখিবার বিষয়

না। যদি কোন বৈজ্ঞানিক ১০ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর নূতন কিছু আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীকে আশ্চর্য্য করিয়া ফেলেন, জীবন-চরিত-লেখকগণ তাহা অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেই দশ বৎসর কিরূপভাবে তাঁহার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়াছিল অর্থাৎ এই দশ বৎসর তাঁহার আয়ের পন্থা কি কি ছিল, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া যান। এই ভ্রমবশতই মনীষিগণের আর্থিক অবস্থা জানিতে এত বেগ পাইতে হয়। ডে ক্যাণ্ডোল্, ওডিন্ ও গাল্টন্ বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উঁহাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বলেন যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরই আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। *

"প্যারী একাডেমির" ১০০জন বিদেশী সভ্যকে ডে ক্যাণ্ডোল নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন—

জমিদার ও ধনী পরিবার হইতে উৎপন্ন	৪১
মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে উৎপন্ন	৫২
শ্রমজীবী হইতে উৎপন্ন ...	৭
	১০০

তিনি ফরাসী দেশের ৩৬ জন মনীষীর সামাজিক অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন—

ধনশালী পরিবার হইতে	১০, শতকরা	২৮
মধ্যবিত্ত	১৭ "	৪৭
শ্রমজীবী	৯ "	২৫
	৩৬	১০০

এই শেষোক্ত তালিকাটী আমাদিগকে একটুকু বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইবে। বলা হইয়াছে—৩৬জন ধীমানের মধ্যে শতকরা ২৮জন ধনশালী, ৪৭জন মধ্যবিত্ত ও ২৫ জন শ্রমজীবী। এই সংখ্যাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদিগকে উপরোক্ত শ্রেণীত্রয়ের জনসংখ্যা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ধনশালী ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকসংখ্যা হইতে শ্রমজীবিগণের সংখ্যা অনেকগুণ বেশী। সেইজন্য শ্রমজীবিগণের শতকরা ২৫ একপ্রকার নগণ্য সংখ্যা মাত্র। পক্ষান্তরে, সমাজে ধনশালী লোকের সংখ্যা অতীব কম। সুতরাং, ধনীলোকের শতকরা ২৮ সংখ্যা দৃশ্যতঃ কম হইলেও বস্তুতঃ অনেক অধিক।

ওডিন্ চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত ৬১৯ জন প্রতিভাবান্ সাহিত্যসেবীর (ফরাসীদেশের) আর্থিক অবস্থা খাঁটিরূপে জানিতে পারিয়াছেন। এই ৬১৯ জন সাহিত্যিককে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ধনী, জ্ঞানের জন্য যাহাদের অর্থাভাবে কোন বেগ পাইতে হয় নাই; (২) "গরীব", যাহাদের কিঞ্চিদধিক বেগ পাইতে হইয়াছে। তিনি নিম্নলিখিতরূপে ইহার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন—

* হোমারের বীরপুরুষগণ অতুল ধনের অধিকারী ছিল। থেলস্ হইতে য্যারিষ্টট্ল প্রভৃতি দার্শনিকগণ সকলেই রাজন্যবর্গের অর্থে অর্থশালী ছিলেন। ইস্কাইলাস, সফোক্লীস, আর্কিমিডিস্ও ধনশালী ছিলেন। মধ্যযুগ ও বর্ত্তমান সময়েও তদ্রূপই দৃষ্ট হয়।

	ধনী	গরীব
১৩০০—১৫০০	২৪	১
১৫০১—১৫৫০	৩৯	৪
১৫৫১—১৬০০	৪২	...
১৬০১—১৬৫০	৮৪	৫
১৬৫১—১৭০০	৭৩	৪
১৭০১—১৭২৫	৩৬	৩
১৭২৬—১৭৫০	৫৩	৯
১৭৫১—১৭৭৫	৮৬	৮
১৭৭৬—১৮০০	৫২	১২
১৮০১—১৮২৫	৭৩	১১
মোট ...	৫৬২	৫৭

এই তালিকা-পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ডে ক্যাণ্ডোল্ বৈজ্ঞানিকদিগের আর্থিক জীবন আলোচনা করিয়া যে ফল পাইয়াছিলেন অন্যান্য সাহিত্যসেবিগণের জীবনী আলোচনা করিয়াও ওডিন্ তদ্রূপ ফল পাইয়াছেন।

৫। সামাজিক অবস্থা

ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশে সামাজিক অবস্থা অনেকটা আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কিন্তু, তথাপি, ইউরোপ ও আমেরিকাতেও সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সকল সময়ে পরস্পর সংযুক্ত নহে। ওডিন্ ফরাসী সমাজকে ৫ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—জমিদার, রাজকর্ম্মচারী, শিক্ষাব্যবসায়ী, বণিক ও শ্রমজীবী। তিনি ৬২৩ জন বিখ্যাত সাহিত্যসেবীকে উপরোক্ত পাঁচটি সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া যে একটি তালিকা প্রস্তত করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সামাজিক শ্রেণী	সংখ্যা	শতকরা
জমিদার	১৫৯·০	২৫·৫
রাজকর্ম্মচারী	১৮৭·০	৩০·০
শিক্ষা-ব্যবসায়ী	১৪৩·০	২০·০
বণিক	৭২·৫	১১·৬
শ্রমজীবী	৬১·০	৯·৮
	৬২৩·০	

এই তালিকাপাঠে দেখা যায়, ফরাসীদেশের সাহিত্যিকগণের মধ্যে চারি ভাগের তিন ভাগই প্রথম তিনশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত শ্রেণীসমূহের লোকসংখ্যা সমান নয় বলিয়া তালিকার তাৎপর্য্যও ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না। তজ্জন্য ওডিন লোক-সংখ্যার সমানুপাত অনুসারে তালিকাটীকে পুনরায় নিম্নলিখিতভাবে প্রস্তত করিয়াছেন :—

	বুদ্ধিমান্		ধীমান্		প্রত্যেক শ্রেণীর লোক সংখ্যার সহানুপাতে ধীমান্ ও বুদ্ধিমান্গণের আপেক্ষিক সংখ্যা *
শ্রেণী	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	
জমিদার	১২৫·০	২৪·৫	৩৪·০	৩০·৪	১৫৯·০
রাজকর্ম্মচারী	১৫৭·৫	৩০·৮	২৯·৫	২৬·৩	৬২·০
শিক্ষাব্যবসায়ী	১১৬·৫	২২·৮	২৭·০	২৪·১	২৪·০
বণিক	৬২·০	১২·১	১০·৫	৯·৪	৭·০
শ্রমজীবী	৫০·০	৯·৮	১১·০	৯·৮	০·৮
মোট	৫১১·০		১১২·০		

* ওডিন্ গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তৎকালে সমাজে শতকরা ৮০জন শ্রমজীবী, ১০ জন বণিক; ৬জন শিক্ষাব্যবসায়ী; ৩ জন রাজকর্ম্মচারী ও ১ জন জমিদার। তিনি প্রতিশ্রেণীর মোট জন সংখ্যাকে তাহার শতকরা দিয়া ভাগ করিয়া শেষ স্তম্ভের ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উপরোক্ত তালিকার শেষ কলমটীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বিদ্যার্জ্জন অনেক পরিমাণে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। ইত্যালী, ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী প্রভৃতি দেশেও ওডিন্ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, সর্ব্বত্রই সাহিত্যজগতে জমিদার ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরই প্রভাব অধিক।

৬। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আমরা অনেকেই মনেকরি—প্রতিভাশালী ব্যক্তির শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। সে স্বয়ংই নিজকে শিক্ষিত করিতে সমর্থ। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেখা যায় যে, শিক্ষা ভিন্ন প্রতিভান্বিত ব্যক্তি স্বীয় প্রতিভাস্ফুরণে সমর্থ হয় না। যে সকল সহরে উচ্চ বিদ্যালয়, পুস্তকাগার ও তাদৃশ অনুষ্ঠানের বাহুল্য, সে স্থান হইতেই ফ্রান্সের ও অন্যান্য দেশের ধীশক্তিসম্পন্ন লোক সকলের উদ্ভব হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, সহর জ্ঞানার্জ্জনের অনুকূল স্থান। তন্মধ্যে যে সকল সহরে আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক নানাবিধ সুযোগ বর্ত্তমান আছে, সেই সকল সহরই প্রতিভাবান্ ব্যক্তির প্রতিভা-বিকাশের উপযোগী স্থান। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, স্বচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ হইতেই সাহিত্যিকগণের উৎপত্তি হইয়াছে। অবশ্য তাহার কারণ কেবল ধন নহে। অর্থচিন্তা-বিরহিত লোকের অবসর অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা অনেক বেশী। এই অবসর জ্ঞানার্জ্জনের একটি প্রধান সহায়। সামাজিক অবস্থাও সাহিত্যিক-উৎপাদনে অনুকূল দেখিয়াছি। জমিদার-শ্রেণী এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম। তৎপরবর্ত্তী ৪টী শ্রেণী তাহাদের নিরূপিত কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। কঠোর পরিশ্রমের পর কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত শক্তিটুকুই তাহারা নিরূপিত কার্য্যের বাহিরে ব্যয় করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্থানীয় উপকরণ, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা এই সকলগুলিই শিক্ষার্থীকে শিক্ষার্জ্জনের সুযোগ-সুবিধা আনিয়া দেয় মাত্র। এই নিমিত্তই শিক্ষা-সংসর্গের আলোচনা সর্ব্বশেষে করিতে মনস্থ করিয়াছি।

ওডিন্ ১৪শ শতাব্দী হইতে ১৯ শতাব্দী পর্য্যন্ত ৮২৭ জন সুবিখ্যাত লেখকগণের শিক্ষা-লাভ সম্বন্ধে তথ্য-আবিষ্কারে সক্ষম হইয়াছেন। পূর্ব্বের মত তিনি এই লোকদিগকে দুইটী প্রশস্তভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) যাহারা শিক্ষা পাইয়াছে; (২) যাহারা অল্পশিক্ষিত বা মোটেই শিক্ষা পায় নাই। ওডিনের এই তালিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই তাঁহার অনুসন্ধানের তাৎপর্য্য পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে—

সময়	শিক্ষিত	অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত
১৩০১—১৫০০	৩৩	—
১৫০১—১৫৫০	৫৮	২
১৫৫১—১৬০০	৫২	—
১৬০১—১৬৫০	১০১	৭
১৬৫১—১৭০০	৯১	—
১৭০১—১৭২৫	৫৬	—
১৭২৬—১৭৫০	৮৯	১
১৭৫১—১৭৭৫	১১৬	২
১৭৭৬—১৮০০	৮৩	২
১৮০১—১৮২৫	১৩২	২ (১?)
সমষ্টি	৮১১	১৬ (১৫?)

ইহা হইতে দেখা যায় যে, শতকরা ৯৮ জন লেখক যৌবনে উপযুক্তভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল; এবং কেবল শতকরা ২ জন মাত্র অল্পশিক্ষিত বা মোটেই শিক্ষা পায় নাই। ইহা হইতে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? এখনও কি আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে, ধীমান্‌দিগের শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, তাঁহারা স্বীয় ক্ষমতাতেই প্রতিভাবান্ হন? যে ১৬ অথবা ১৫ জন শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়াও প্রসিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবন-চরিত আলোচনা করিয়াও দেখা গিয়াছেযে, তাঁহাদের মধ্যে ৭টীর জন্ম প্যারীসহরে, ২টীর রোম সহরে ও আর ৩টীর জন্ম সহরে হইয়াছিল। ইতালী, স্পেন, ইংলণ্ড ও জার্ম্মেণীর সাহিত্যিকগণের ফলিত-তথ্য অনুসন্ধান করিয়াও ওডিন্ এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

আমরা এ যাবৎ আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, দুইটী বস্তুর সংমিশ্রণে মানবের প্রতিভা বিকশিত হয়—ধীশক্তি ও বিশ্বশক্তি। এই দুইটী উপকরণকে পৃথক করিয়া রাখ, ফল কিছুই পাওয়া যাইবে না। অম্লযান ও জলযানের সংমিশ্রণে যেমন সলিল উৎপন্ন হইয়া সমাজের জীবকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতেছে, তদ্রূপ এই দুইটী পদার্থের সংযোগেও সমাজশরীর সবল হইয়া উঠে। এই সংযোগজাত ধীমান্‌গণের সংখ্যা সমাজে যত বৃদ্ধি পাইবে ততই ইহার উন্নতি।

বিদ্যার্জ্জনের অনুকূল পারিপার্শ্বিক কি কি তাহা আলোচনা করা গিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে সমাজে প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার আন্দোলনকারী ধীমান্‌গণের সংখ্যা কত। পূর্ব্বেই আভাস দেওয়া গিয়াছে যে, ফলিত সমাজ-বিজ্ঞানের মতে সমাজের প্রত্যেক স্তরেই ধনী, নির্ধন ও জাতি-নির্ব্বিশেষে লোকসংখ্যার সমানুপাতানুসারে ধীশক্তি সুপ্তাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। কিন্তু যে শেষ চারিটী পারিপার্শ্বিকের সংযোগে মানব তাহার জ্ঞানরাশি-বিকাশে সমর্থ হয়, সমাজের অধিকাংশ জনগণ তাহার সুযোগ মোটেই প্রাপ্ত হয় না। এই নিমিত্তই আমরা দেখিতে পাই, প্যারি সহরে প্রতি লক্ষ জনে ৬৭ জন প্রতিভাবান্ ব্যক্তির জন্ম হয়, আর পল্লীগ্রাম প্রতি লক্ষ জনে মাত্র একজন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। সমাজে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল আনয়ন করিতে হইলে, এই বিপুল সুপ্ত শক্তিপুঞ্জকে সঞ্জীবিত করিবার পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগকেও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। ওডিন্ ফলিত-তথ্য-সাহায্যে দেখাইয়াছেন—যেখানেই স্ত্রীলোকগণ জ্ঞানোন্মেষণের সুযোগ পাইয়াছে সেখানেই তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে। স্ত্রীলোকগণ পুরুষদিগের ন্যায় আত্মপ্রকাশে সুবিধা পায় না বলিয়াই জ্ঞান-জগতে তাহাদের প্রতিপত্তি এত কম।

মানুষ পরস্পরের সহযোগিতা ব্যতিরেকে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। আমরা অনেক সময় "আত্ম প্রতিষ্ঠ" ব্যক্তির কথা বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু উক্ত কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা অতীব কঠিন। ওডিন্ ফলিত-তথ্য-সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ লোকদিগের মধ্যে শতকরা ৮০ জনের সহরে জন্ম, এবং অবশিষ্ট সকলেই বাল্যকাল হইতে সহরে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাদের শতকরা ৯০ জনই "ধনী"বংশোদ্ভব এবং ৯৮ জনই উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত। সুতরাং দেখা যায়—ইহারা নানা সুযোগের ফলেই উন্নত হইতে পারিয়াছিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত

সমাজতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ওয়ার্ড তথাকথিত আত্মশক্তিতে উন্নত ব্যক্তিবর্গের জীবনী আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারাও * নানা সুযোগের সংস্পর্শে আসিয়াই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ধীশক্তি বিরুদ্ধ শক্তিনিচয়ের মধ্যে পরিস্ফুট হইতে পারে না। ইহা বিনম্র, অনুকূল অবস্থার সমাগমেই ইহার প্রকাশ। সুযোগ খুঁজিয়া আনিবার শক্তি ইহার বেশী নাই।

অনেক সময় আমরা মন ও শরীরকে একই পদার্থ বলিয়া ধরিয়া লই, এজন্য বিষম ভ্রমে পতিত হই। মস্তিষ্ক প্রভৃতির ন্যায় মন শরীরের কোন অংশবিশেষ নহে। মানব-মন বিভিন্ন; কারণ, বিভিন্ন ভাব ও সামগ্রী দ্বারা মানবের মন পরিপূর্ণ থাকে। সকল মানবের পারিপার্শ্বিক বা আবেষ্টন এক নহে; তজ্জন্যই এই বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের ঘাত-প্রতিঘাতে মানব-মনের উপর বিভিন্ন প্রকার ছাপ পড়িয়া থাকে। সভ্যসমাজোদ্ভূত ও অসভ্যসমাজোদ্ভূত শিশুর মনে কোনই পার্থক্য দৃষ্ট হইবে না। অভিজ্ঞতাশূন্য মন একখণ্ড সাদা পত্রিকা ছাড়া আর কিছু নহে। লেখকের ইচ্ছানুসারে যেমন অনাবিল কাগজটী অনুরূপ ধারণ করিবে, মনও চতুর্দ্দিকস্থ সামগ্রীর প্রভাবে পড়িয়া নানা প্রকার ভাবে ও চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়। বুদ্ধির তারতম্যের ইহা একটি প্রধান কারণ।

অনেকে আবার তৎপার্শ্ববর্ত্তী জগৎ হইতে তাহার কর্ত্তব্য খুঁজিয়া পায় না। সমস্তই তাহার নিকট অর্থশূন্য বলিয়া বোধ হয়। ইহারও কারণ আছে। মানব-মনের রুচি বিভিন্ন। অপরীক্ষিত মানবের বুদ্ধিমত্তা অনুমান করা অতীব কঠিন; তাহার রুচি অনুমান করা আরও কঠিন। সেইজন্য সমাজকে তাহার হিতার্থে কেবল জনগণের অবসর সৃষ্টি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, শিক্ষার ভিতরে বৈচিত্র্য আনিতে হইবে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে তাহার রুচি ও ধীশক্তি অনুসারে শিক্ষিত হইতে পারে, সমাজের তদ্রূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। ইহার নাম 'স্বাভাবিক' বা 'জাতীয়' শিক্ষা।

সাধারণের জ্ঞানসমষ্টি আবিষ্কৃত জ্ঞানসমষ্টির তুলনায় অনেক কম। জনসাধারণ তাহা উদরস্থ করিতে এখনও সমর্থ হয় নাই। একমাত্র উপরোক্তভাবে শিক্ষাবিস্তার দ্বারাই আবিষ্কৃত জ্ঞানরাশি সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিবে। এখানে অনেকে বলিতে পারেন যে, জগতের বর্ত্তমান জ্ঞানরাশিই যদি জনসাধারণ উদরস্থ করিতে না পারিল তবে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার বাড়াইয়া ফল কি? কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক নয় কি? আমরা উপার্জ্জিত জ্ঞানরাশি "হজম" করিতে পারি না, কারণ আমাদের বাজার এখনও অতি ক্ষুদ্র; ক্রেতার সংখ্যা অতি কম। সমাজকে এক্ষেত্রে শিক্ষা বিস্তার করিয়া জ্ঞানোৎপাদিত সামগ্রী-সমূহের জন্য ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

শত সহস্র আইন-প্রণয়ন দ্বারা বা অন্য কোনপ্রকার চেষ্টায় সমাজের অসম্পূর্ণতা নিবারিত হইবে না। আমাদিগকে দোষের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। সমাজের উচ্চশ্রেণী নীচশ্রেণীকে ঘৃণা করে, কারণ তাহারা অজ্ঞ। সমাজস্থিত অনেক প্রকার ব্যবসায় হেয় বলিয়া বিবেচিত, কারণ সেই সকল ব্যবসায় অশিক্ষিত লোকের দ্বারা

---

* ডেলেম্বার, রবার্ট বার্ণস্, জন্ বানীয়ান্, স্পেন্সার, লাপ্লাস্ প্রভৃতি।

পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় শিক্ষিত অশিক্ষিতের মিলন অসম্ভব ব্যাপার। চরিত্র ও শিক্ষার যথাসম্ভব সমতাই সমাজের বিভিন্নশ্রেণীসমূহের মধ্যে প্রকৃত একতা আনিয়া দিতে সমর্থ হইবে। তখনই সমাজের প্রকৃত উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে। তাই, আমাদের কর্ত্তব্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা এবং সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা। প্রাচীন ভারতে ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব বিকাশের যে সকল সুযোগ ছিল তাহার প্রচলন এখন সম্ভবপর কি না বৈজ্ঞানিকগণ ভাবিয়া দেখিবেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত,
উইস্‌কন্‌সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়,
মেডিসন্, আমেরিকা।

কবি কালিদাসের বাসভবন

ইতিহাসের উপাদান

ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের ইতিহাস না থাকায়, বা না পাওয়ায়, তাহার পুনরুদ্ধার-কল্পে, ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিদ্বৎ-সমাজে, অনেক দিন হইতে খুব আলোচনা চলিতেছে। কবি কালিদাস ভারতীয় জ্ঞান-রাজ্যের একটি বৃহৎ কেন্দ্রস্বরূপ; তাঁহার আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করা ঐতিহাসিকদিগের একটি প্রথম কল্প। এ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ, পুস্তক, পুস্তিকা ও বাদানুবাদ লিখিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ডাঃ রামদাস সেনের প্রবন্ধ, অক্ষয়-কুমার দত্তের পুস্তক, রমেশচন্দ্র দত্তের প্রবন্ধ ও ইতিহাস, East & West পত্রে প্রকাশিত কালিদাস-সম্বন্ধে সমালোচনা, আমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। ইঁহারা সকলেই কালিদাস-সম্বন্ধে স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইতে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত, যাঁহার অনুভবে যাহা আসিয়াছে, তিনি সেই বর্ষেই কালিদাসের আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। যথারীতি-লিখিত ইতিহাস না থাকায়, কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করা ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ব-উদ্ধারের আমাদের আর কোন পন্থা নাই। কাজেই সকলেরই অনুমান প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় নূতন ইতিহাস, কালিদাসের কাব্যের সমালোচনা বা নূতন সংস্করণ, আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই, তাহাতে আবার কালিদাসের আবির্ভাব-কাল, কোন শতাব্দী লিখিত হইল, ইহা দেখিবার আমার একটু কৌতূহল হইত।

কালিদাসের সময়-বিচার

১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি এক স্থানে দেখিলাম, কালিদাসের গ্রন্থাবলীর সমালোচনা করিয়া একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাগুক্ত কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার জন্য, আমি তাহার ঐতিহাসিক কথা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। তাহাতে একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, "সম্প্রতি একজন জর্ম্মান্ মনীষী, Dr. T. Bloch ও বারাণসীর শ্রীযুক্ত রামাবতার শাস্ত্রী, যুগপৎ, রঘুবংশের অভ্যন্তর ভাগ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, কালিদাস খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, গুর্জ্জরের রাজা চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা বলেন—

রঘুবংশের 'আসমুদ্রক্ষিতীশানাং' ইত্যাদি শ্লোকার্থ—সমুদ্রগুপ্ত হইতে যে বংশের উৎপত্তি হইয়াছে ইহাই বুঝাইতেছে। 'আকুমারকথোদ্ঘাতং' ইত্যাদি শ্লোকে, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তেরই গুণ গান করা হইয়াছে। 'কুমারসম্ভবং' অর্থে কুমার-গুপ্তের জন্ম কথা ঘোষিত হইয়াছে। 'তস্মি গোপ্যাঃ স ভার্য্যায় গোপত্রে' ইত্যাদি শ্লোকে গুপ্তবংশেরই রাজত্বের কথা বলা হইতেছে। 'পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ' এখানে চন্দ্রমা শব্দে চন্দ্রগুপ্তকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আরও চন্দ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয় অবলম্বন করিয়াই রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনা করা হইয়াছে।"

রঘুবংশের প্রথম সর্গ পড়িলেই মনে হয়, কবি কালিদাস রঘুবংশ-জাত কোনও রাজার পূর্ব্বপুরুষদিগের স্তুতিগান করিতেছেন, কারণ কবিদের এরূপ অভ্যাস আছে। অলঙ্কার-শাস্ত্রে আছে—"গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতির্বীরুধ উচ্যতে।" কাজেই মনীষীদ্বয়ের অনুসন্ধান যে অভ্রান্ত হইয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিদ্বৎসমাজ এই অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া, এক বাক্যে অনেক দিনের বিবাদ মিটাইয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষের সমুদয় স্কুলপাঠ্য পুস্তিকাদিতে পর্য্যন্ত, কবি কালিদাস খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে জাত হইয়াছিলেন বলিয়া, পূর্ব্ব পাঠ সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছে। আমরা, পাঠকগণও, অনেক দিনের উৎকণ্ঠা হইতে শান্তি লাভ করিয়াছি।

আমার অনুসন্ধানে আকাঙ্ক্ষা

এই মুখবন্ধ পড়ার পর হইতে, আমার মনে তীব্র অনুসন্ধিৎসা উপস্থিত হইয়াছিল। জর্ম্মান্‌-পণ্ডিত মহাশয়ের এই আবিষ্কার [illegible] বন্ধের মধ্যে জাতীয় ইতিহাস উদ্ধার [illegible] স্পৃহা আরও বর্দ্ধিত কেন যে [illegible] চেষ্টা করিয়া আমি স্থির [illegible] না। তদবধি কল্পনারাজ্যে [illegible] পাগারে থাকি, আর এই [illegible]

[illegible] অনুসন্ধেয়

[illegible] সহিত সংস্রব রাখিয়া, [illegible] দুইটি ভাবনার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। "বিশ্বকোষ" অভিধানের ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দীয় খণ্ডের মলাটে লিখিত ছিল "আগাড়ুম বাগাড়ুম" ইত্যাদি গ্রাম্য কবিতোক্ত শব্দাবলীর যদি কেহ অর্থ করিয়া দিতে পারেন, তবে অনুগৃহীত হই।" তদবধি, অনেক আলোচনা করিয়া, আমি ঐ সকল কবিতাবলীর একটা অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছিলাম। ১৯০০ খৃঃ অব্দে "সাহিত্য-পরিষদ্‌-পত্রিকায়" ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "ছড়ায়" দেখিলাম ঐ সকল কবিতাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমার সংগৃহীত ছড়াগুলির মধ্যে একটি ছড়া অপর কোনও সংগ্রহের মধ্যে নাই এবং তাহা নদীয়া জেলার নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়াই মনে করিলাম। আবশ্যক বিধায় এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ;—

ওপারের ডগ্ডাঙ্গ গাছে জস্তি বড় ফলে,
'গো জস্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।
প্রাণ করে আই ঢাই, গলা করে কাঠ ;
কতক্ষণে যাবরে ভাই হড়গড়ায়ের মাঠ ॥
হড়গড়ায়ের মাঠেতে ভাই পাকা পাকা পান ;
পান কিনব চুন কিনব, নন্দে ভাজে খাব,
একটি পান হারালে দাদাকে বলে দিব।
দাদা দাদা ডাক পাড়ি, দাদা নাইক বাড়ি ;
সুবন সুবন ডাক ছাড়ি সুবন আছে বাড়ি ॥

আজ সুবনের অধিবাস কাল সুবনের বিয়ে,
সুবনকে নিয়ে গেল দিগনগর দিয়ে।
দিগ্‌নগরের মেয়ে দুটি নাইতে লেগেছে,
চিকণ চিকণ চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে।
হাতে তার দেব-শাঁখা মেঘ লেগেছে,
গলায় তার কণ্ঠমালা রক্ত ছুটেছে॥
ওপারে দুটো শিয়াল চন্দন মেখেছে,—
কে দেখেছে কে দেখেছে? দাদা দেখেছে!!
দাদার হাতের বাজবন্দুক ছুড়ে মেরেছে,
দুই দিকে দুই কাত্‌লা মাছ ভেসে উঠেছে॥
একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলেন টিয়ে,
টিয়ের বাপের বিয়ে, লাল গামছা দিয়ে।
গৌরী বেটি ক'নে, নকা বেটা বর,
ঢ্যাম কুড়ু কুড়ু বাদ্যি বাজে, চড়ক ড্যাঙ্গায় ঘর॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার একটা ভাবার্থ, অনেক দিন হইতেই বাহির করিয়াছিলাম। এই ছড়ায় নদীয়া জেলারই * অবস্থা বর্ণনা করিতেছে; কিন্তু দিগ্‌নগর স্থানটি নদীয়া জেলার কোন্ স্থানে বর্ত্তমান ছিল, কেবল তখন তাহাই নির্ণয় করিতে পারি নাই। বর্ত্তমানে, শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার পথে, দিগ্‌নগর নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম আছে। সেখানে এক্ষণে একটি রেল ষ্টেশনও স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনকালে সেখানে এমন বৃহৎ সরোবর বা নদী ছিল না যে, যাহার বর্ণনা করিয়া এত বড় ছড়া লেখা যাইতে পারে। এহেন বর্ণনীয় দিগ্‌নগর কোথায়? ইহা আমার একটি পুরাতন চিন্তনীয় বিষয় ছিল।

তাহার উপর, আমার আর একটি বিশেষ অনুসন্ধিতব্য বিষয় জুটিয়া আসিয়াছিল। প্রায় দশ বর্ষ হইতে, আমি ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তির মূলতত্ত্ব উদ্ধারের চিন্তায় মগ্ন আছি। সামর্থ্য ও সুযোগাভাবে, আমি এ সম্বন্ধীয় কোন বিশিষ্ট পুস্তক, ফলক বা স্তম্ভ-গাত্র পড়িতে পাই নাই; কেবল মাত্র ভারতের দেশে দেশে যে সকল মুদ্রিত বর্ণমালা প্রচলিত আছে, তাহার ছাপার পুস্তক দেখিয়া তাহারই আলোচনা করিতেছিলাম এবং তাহা হইতেই মোটামুটি সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিলাম যে, ভারতীয় বর্ণমালার তিনটি স্তর। ১ম—কোঠিয়ালী বর্ণমালা, কুঠিয়াল নাগরী বা মহাজনী। এই লিখন-প্রণালী মারবাড়ী জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহার উৎপত্তি-স্থান কাঠিয়াড় বা তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ। ২য়—নাগরী বর্ণমালা। এই স্তরে মরাঠি, গুজরাটী ও বিহারী কায়থী নাগরী গঠিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি-স্থান নাগপুর বা তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ। বক্রী ৩য় স্তর—দেবনাগর বর্ণমালা। এই স্তরে, ভারতবর্ষ, তিব্বত, পূর্ব্ব-উপদ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের সমুদয় বর্ণমালা গঠিত। ইহার উৎপত্তি-স্থান দেবনগর। এখন এই দেবনগর কোথায়?

যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ অবস্থিত ছিলেন বা আছেন, সেই দেবনগর কোথায়? ভারতে জ্ঞানের গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে; তাহা হইলে, নাগপুরের পূর্ব্বদিকে, দেবনগর

* এই ছড়াটি যে নদীয়া জেলা-নিবাসিনী কোনও রমণীর রচনা, তাহা স্থির করিবার আর একটি কারণ আছে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একটি কক্ষে দুইটি শুভ্রবর্ণের শৃগাল এখনও রহিয়াছে; ঐ কক্ষের দ্বারে ইংরাজী অক্ষরে লিখিত আছে, "White fox, caught near Ranaghat, Nadiya Dist". পরে তত্রত্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট অনুসন্ধানে জানিলাম "Found nowhere else." ছড়া-বর্ণিত চন্দন-মাখা শৃগাল (শুভ্র শৃগাল) নদীয়া জেলার বিশেষত্ব।

কোথায়? উৎকলে দেবনগর নাই, ছোট-নাগপুরে দেবনগর নাই, বিহারে দেবনগর নাই,—তবে দেবনগর কোথায়? গৌড়ে দেবপল্লী আছে, দেবগ্রাম আছে, কিন্তু দেব নগর নাই কেন?

যদি, অনন্তাদি নাগগণ যে বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার নাম "নাগর" বর্ণমালা হইয়া থাকে, তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সেই বর্ণমালার সংস্কার করিয়া যে বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার নাম "দেবাক্ষর" না হইয়া "দেবনাগর" কেন হইল? সংস্কৃত ভাষার নাম "দেবভাষা," তাহার অক্ষরের নাম "দেবাক্ষর" কেন না হইল? ভারতে সমুদয় ভাষারই এক একটি পৃথক বর্ণমালার অস্তিত্ব আছে, সংস্কৃত ভাষার একটি পৃথক বর্ণমালা নাই কেন? সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালার নাম "দেবনাগর" বর্ণমালা কেন হইল?

প্রথম আবিষ্কার—সমুদ্রগড় *

গত অগ্রহায়ণ মাসের একদিন সুন্দরবনের সেই বিজন প্রান্তরে বসিয়া ভাবিতেছি, "আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্"—এই বচনটিতে সমুদ্রগুপ্ত হইতে যে বংশের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদিগকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। সাধারণ্যে এই বিশ্বাস বলবতী থাকিলেও, অনেক চিন্তা ও গবেষণার ফলে আমার ধারণা হইয়াছে যে, ঐ উদ্ধৃত বচনটি সমুদ্রগুপ্তকে লক্ষ্য না করিয়া নদীয়া জেলার সমুদ্রগড় নামক স্থানকেই উল্লেখ করিতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে—পাড়া, পুর, গ্রাম, নগর, প্রভৃতি দেশে, সেই সকল ছাড়িয়া, "গড়" কেন হইল? বাঙ্গলাদেশে ত কোনও দুর্গাদি নাই, তবে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র পল্লীর নাম "সমুদ্রগড়" কেন হইল? নিকটেও কোনও সমুদ্র নাই, তবে নদীতীরের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের নাম একেবারে "সমুদ্রগড়" কেন হইল? বাঙ্গালী কোনও ব্যক্তির নামও সমুদ্র হয় না, তবে এখানে "সমুদ্রগড়" কেন আসিল? চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বপুরুষ, সমুদ্রগুপ্তের নাম হইতে ত এই গ্রামের নাম "সমুদ্রগড়" হয় নাই?

বিদ্যানগর †

জনশ্রুতি অনুসারে "বিদ্যা" কালিদাসের পত্নীর নাম ছিল। তাঁহার নগর "বিদ্যানগর।" সমুদ্রগুপ্তের নামের পার্শ্বে, [illegible] বিদ্যার নাম কেন? মেঘদূতের এক চরণে আছে, "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে কালিদাস পণ্ডিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে, বিদ্যা কালিদাসের পাণ্ডিত্য দেখিয়া হর্ষ বিষাদে বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই চরণের ভাবার্থ আলোচনা করিলে, বিদ্যা যে [illegible] প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা অনুভূত হয় না। এই চরণ পড়িলে মনে হয়, বিদ্যা

* সমুদ্রগড় নবদ্বীপের দক্ষিণে [illegible] দেশের মধ্যে স্থিত একটি পল্লী, এখানে নূতন রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশন হইয়াছে, এখানে বড় বড় অধ্যাপকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [illegible] প্রাচীন [illegible]। ভগ্ন বাটীগুলি রেল ষ্টেশন হইতেই দেখা যায়।

† জনশ্রুতি ব্যতীত কালিদাসের পত্নীর নাম যে বিদ্যা ছিল [illegible] র লিপিতে কোনও প্রমাণ আছে কি না তাহা কালিদাসের পুস্তকাবলী হইতে অনুসন্ধান করা [illegible] বিদ্যানগর নবদ্বীপের উত্তরে ১ মাইল দূরস্থিত একটি ক্ষুদ্রপল্লী। এখানে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু [illegible] পড়িয়াছিলেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এখানকার অধ্যাপকগণ নবদ্বীপের নৈয়ায়িকদিগকে ব্যাকরণ পড়াইতেন। এখানকার মাটিতে মৃদঙ্গের খোল গঠিত হয়। বৈষ্ণবগণ ভক্তিভাবে সেই মাটি চাটিয়া খান [illegible] এই মাটিতে খোল হয়।"

অনেকদিন রুগ্ন শয্যায় শয়ানা থাকিয়া, প্রাচীমূলে কলামাত্রশেষা হিমাংশুর তনুর মত ক্ষীণা হইয়া, দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। যদি সেই বরেণ্য দেহ, এই ভাগীরথীর এই বালুকা-শয্যাতেই ত্যক্ত হইয়া থাকে, আর সেই শ্মশান-ক্ষেত্রেরই নাম "বিদ্যানগর" হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা এ কথা কেন না অনুমান করিতে পারিব ?

ঘটনাগত সাক্ষ্য বা Circumstancial evidence

যাঁহার পত্নী এইরূপ ক্ষীণা হইয়া, ক্রমে ক্রমে মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই শোক-গাথায় "প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ" এইরূপ ছত্রটি শোভা পায়। এটা অনুভবের কথা মাত্র, প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নাই। পার্শ্ববর্ত্তী কার্য্যসমূহ হইতে কারণের অনুমান মাত্র। ভারতে প্রত্নতত্ত্বই একটি বিরাট অনুমেয় জ্ঞান মাত্র। কালিদাসের কাব্যত্রয় পড়িলেই মনে হয়, সেগুলি একটি ধারাবাহিক করুণ আর্ত্তনাদ। তিনি তাঁহার পত্নীর জন্য কাঁদিতেছেন, আর তিনিই সেই কাঁদাটা, সাদা কাগজে কালির অক্ষরে, ধরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। জগৎ শত সহস্র বর্ষ পরেও সেই আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইবে। সেই আর্ত্তনাদেই যখন ধ্বনিত হইতেছে, তাঁহার পত্নী প্রাচীমূলে কলামাত্র-শেষা হিমাংশুর তনুর মত, ক্ষীণা হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন তিনিই যে এই বিদ্যানগরেই অনন্তশয্যায় শয়ানা হন নাই, এ কথা কে বলিতে পারে ?

"প্রাচীমূলের ক্ষীণকলা" বাক্যগুলি হইতে, আরও বুঝা যায় যে, কালিদাস বিদ্যার রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে, অনেক রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছিলেন। প্রাচীমূলে ক্ষীণা চন্দ্রকলা রাত্রি-শেষে উদিতা হন। এবং সেদিন কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর শেষ রাত্রি। এ সব অনুভববেদ্য কথা, তর্ক-যুক্তি এখানে খাটে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের ইতিহাস আলোড়ন করিতে হইলে অধিকাংশ স্থলেই অনুমানেরই উপর মাত্র নির্ভর করিতে হইবে।

দিগ্‌নগর

তাহার পর আর একদিন, মেঘদূতের আর এক চরণ মনে পড়িল। "দিগ্‌নাগানাং পথি পরিহরণস্থূলহস্তাবলেপান্" * "কালিদাসস্য প্রতিযোগী দিগ্‌নাগাচার্য্যো নাম"। মল্লিনাথ। "দিগ্‌নাগাচার্য্য একজন বড় দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন।" প্রথমে সমুদ্রগড়, পরে বিদ্যানগর ও তৎপরে দিগ্‌নগরের দিঙ্‌-নাগাচার্য্য এইগুলির স্বাভাবিক পারম্পর্য্য দর্শনে আমার অনেক দিনের সমস্যার সমাধান পাইলাম।—দিগ্‌নাগাচার্য্য = দিগ্‌-নগরের আচার্য্য। এখন আর নদীয়া জেলার মধ্যে দিগ্‌নগর কোথায়, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে কোনও কষ্টই নাই। কারণ, দিগ্‌নগরের মেয়েগুলির চুল চিকন, হাতে দেবশাঁখা এবং গলায় কণ্ঠমালা। গ্রাম্য ছড়াতে আছে,—

"উলার মেয়ের কল্‌কলানি,
গুপ্তিপাড়ার চোপা।
শান্তিপুরের হাত নাড়ানি, নবদ্বীপের খোঁপা॥"

ইহাতে প্রাচীন দিগ্‌নগর যে এক্ষণে নবদ্বীপ

* দিগ্‌নাগাচার্য্যের বাটী এই নাম অনুযায়ী অনেক দূর হইতেছে। ইহা পরে বিচার্য্য। রামগিরির নিকটে হইতেছে না। দিগ্‌নাগাচার্য্যের ভয়ে কালিদাস ভীত ছিলেন। এখনও দিগ্‌নাগাচার্য্যের দেশে কালিদাসের বংশধরগণের কোনও সম্মান নাই।

হইয়াছে, তাহা পাওয়া গেল। বর্ত্তমান সময়েও নবদ্বীপের রমণীগণ সুকেশিনী ও সুন্দরী এবং নবদ্বীপের শঙ্খাভরণ দেশ বিখ্যাত। গ্রাম্য ছড়ায় আরও আছে—

"পাগলি লো ছাগলি, তোর ছাগল
কোথা চরে ?
দিগ্‌নগরে।
কোন্ গন্ধ খায় ?
আঁশের পাতা, বাঁশের পাতা তিন গন্ধ খায় ॥"

ইহাতেও বুঝা যাইতেছে, দিগ্‌নগরে বড় বড় বাঁশঝাড় এবং আশশ্যাওড়া বন আছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপ এজন্যও বিখ্যাত। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা এই জন্য ব্যঙ্গ করিয়া বলে,—

"বাঁশ বাকস ডোবা, তিন ন'দের শোভা।"

ইহাতে প্রাচীন দিনগ্‌গর ও বর্ত্তমান নদীয়া যে অভিন্ন, তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইল। নদীয়া জেলার স্ত্রীলোকেরা নবদ্বীপকে "নগদ্বীপ" বলিয়া থাকে, তাহাতেও নবদ্বীপ এবং দিগনগর যে একই স্থান, তাহা বুঝিতে আর কোনও বাধাই নাই এবং নবদ্বীপ দ্বীপনগর।

শব্দবিদ্যার বলেও "দিগ্‌নগরই যে "দেব-নগর," তাহাও নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। দিগনগর—দ্বীপনগর, দেপনগর,=দেবনগর। এমতে দ্বীপনগরে যে বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার নাম দেপনাগর বা দেবনাগর। প্রাচীন দ্বীপনগর নূতন সংস্করণে নবদ্বীপ হইয়াছে ইহা নিশ্চয়। নওদিয়াড় বা দেয়াড় এই শব্দ হইতে "নদীয়া" বা নূতন চড়া এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। নবদ্বীপে এখনও "দেয়াড়ে পাড়া" নামে একটি পল্লী আছে। দেয়াড়=চড়া; নদীয়া=নূতন চড়া। নদীয়ার বিশুদ্ধ বা সংস্কৃত কথা নবদ্বীপ। ইহাতেও প্রমাণ হইল, দিগ্‌নগর, দ্বীপনগর, দেবনগর এবং নবদ্বীপ এক স্থানেরই বিভিন্ন সময়ের নাম, অথবা বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উচ্চারিত এক স্থানেরই নাম। এই ভাবে, আমার অনেকদিনের একটি অনুসন্ধিত বিষয়ের সমাধান পাইলাম। আমি "দেবনাগরের" অনুসন্ধানে আসিয়াছিলাম, দিগ্‌নগর পাইলাম, দেবনগর পাইলাম, এবং দিগনাগাচার্য্য নামক একজন বড় দার্শনিকের জন্মভূমি পাইলাম।

সমুদ্রগুপ্ত, বিদ্যা, ও দিগনাগাচার্য্যের অনুসন্ধান পাশাপাশি পাওয়া গেল, বাকী থাকিলেন কালিদাস। নবদ্বীপের পশ্চিম পার্শ্বে কোনও কালিগঞ্জ, কালিনগর, বা কালিদাসপুর আছে কি না, তাহা আমার স্মৃতিপথে আপাততঃ আসিতেছে না।*

মাতৃগুপ্ত

বহরমপুরের বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্, ডাঃ রামদাস সেন, প্রায় ৪০ বর্ষ পূর্ব্বে, কোনও পত্রিকায়, "কালিদাস" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি তাহা পুস্তিকাকারে পুনঃ মুদ্রিত করিয়া, বান্ধব মধ্যে বিতরণ করেন। তাহাতে তিনি রাজতরঙ্গিণী হইতে প্রমাণ করেন যে, কালিদাসের নামান্তর মাতৃগুপ্ত ছিল। বিক্রমাদিত্য কাশ্মীর জয় করিয়া, কালিদাসকে কাশ্মীরের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। মাতৃগুপ্ত বড় কবি ছিলেন। তিনি কিছুদিন কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়া, অন্তিম বয়সে গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। কালিদাস সম্বন্ধে আমি অন্যূন ৪০।৫০ জনের মতামত পাঠ করিয়াছি,

* বিদ্যানগরের পার্শ্বেই "কালিদহ" বা "কালি দা" নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তাহাকেই কালিদাসের নাম স্মারক গ্রাম বলিয়া জানিলাম।

কিন্তু কালিদাসের নামান্তর যে মাতৃগুপ্ত, তাহা ৺রামদাস সেন ব্যতীত, আর কাহারও প্রবন্ধে দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। বহরমপুরে তাঁহার বিরাট পুস্তকালয়ে তাঁহার পুস্তক পাওয়া যাইতে পারে।

মাতৃনামের গ্রামাবলী

কালিদাসের নামান্তর যে মাতৃগুপ্ত ছিল, তাহা লিখিত শাস্ত্র বা শাসন দ্বারা প্রমাণ করিতে না পারিলেও, নবদ্বীপের অতি সন্নিকর্ষে নদীয়া, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার সম্মিলন-স্থানে মাতৃগুপ্ত নামে কোনও ব্যক্তি, কোনও সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বা বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা শব্দ-বিদ্যার অনুশাসন অনুযায়ী স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। (১) মাতাপুর, মাতৃ শব্দের রূপান্তর। (২) মামগাছি, মাম= মাতুল, এই প্রতিবচন সমুদয় টীকাকারগণই স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই মামগাছি অর্থেও মাতৃভবন। (৩) ধাত্রীগ্রাম. ধাত্রী এবং মাতা একার্থবাচক। (৪) অম্বিকা (কালনা) মাতৃবাচক শব্দ। (৫) মায়াপুর (গৌরাঙ্গের জন্মস্থান) মায়া-শব্দ মেয়েমানুষ শব্দ হইতে জাত হইয়াছে ধরিলে ইহাও মাতৃ-শব্দের প্রাকৃত রূপ। (৬) অম্বিকা কালনার সহিত সংযোগ গুপ্তপল্লী মাতৃগুপ্তকে আহ্বান করিতেছে। (৭) ব্রাহ্মণীতলা,—ইহা মামগাছির একটি অংশ। এখানে প্রতিবর্ষে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন একটি মেলা হইয়া থাকে। এখানে ব্রহ্মাণী, নাগিনী বা মনসা নামে পরিচিতা। কিন্তু শাস্ত্রে ব্রহ্মাণী সরস্বতীর নামান্তর। তন্ত্রে মাতৃকান্যাসের মধ্যে "মাতৃকা সরস্বতী দেবতা" এইরূপ আছে; এবং সাধারণে মা ব্রহ্মাণীও বলিয়া থাকে। তাহাতে মাতৃনামেরও আভাস আসিতেছে। (৮) নবদ্বীপের পোড়ামাতলাকেও ইহার সহিত ধরিতে পারি।

মাতৃকা-বর্ণাবলী

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দ্বীপনগর হইতে যে বর্ণমালার উৎপত্তি, তাহার নাম "দেব-নাগর" কিন্তু তন্ত্রে দেখি যে, যে বর্ণাবলী আমরা উচ্চারণ করি, তাহার নাম মাতৃকা-বর্ণাবলী—"অথ মাতৃকা-বর্ণন্যাস: অথাস্ত-মাতৃকা অং নমঃ, আং নমঃ" ইত্যাদি। "অথ বাহ্যমাতৃকা পঞ্চাশৎ লিপিভিঃ বিভক্ত" —ইত্যাদিতে বাক্‌দেবতার ধ্যান আছে। এই মাতৃকাবর্ণাবলীই দেশান্তরে গিয়া "দেবনাগর" বর্ণমালা হইয়াছে। ইহাতেও মাতৃগুপ্তের সম্বন্ধ রহিয়াছে। (কালিদাস, মা সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে, কালিদাস বিদ্যার গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া সরস্বতীর সাধনা করিয়া, রাতারাতি অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। এই কালিদাসের সাধন-স্থান যে, মামগাছির ব্রহ্মাণী তলা নহে, এ কথা কে বলিতে পারে?) মাতাপুর হইতে অম্বিকা (কালনা) পর্য্যন্ত এই ছয়ক্রোশব্যাপি স্থান মধ্যে এত মাতৃবাচক গ্রাম কেন? ইহার কি উত্তর হইতে পারে? বিদ্যা-নগরের পার্শ্বে, এত মাতৃবাচক গ্রাম দেখিয়া, মাতৃগুপ্তই যে কালিদাসের নামান্তর, এ কথা কেন না স্বীকার করা যাইবে?

মাতৃগুপ্ত ও বৈদ্যজাতি

রাজতরঙ্গিণীর মতানুসারে, মাতৃগুপ্ত একজন বড় কবি ছিলেন; তাঁহার কাব্য কোথায় গেল? "অম্বিকা-কালনা" এই যুগলগ্রাম হইতেও মাতৃগুপ্ত কালিদাসের

আভাস আসিতেছে। অম্বিকা কালনায় যত গুপ্ত বৈদ্যের বাস; তাঁহারা মাতৃগুপ্তের আত্মীয় এবং কুটুম্ব, এ কথাও অনুমান করা যায়। এক সময়ে, বৈদ্যগণ আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারিতে, যে বৈদ্য-কায়স্থ-সংঘর্ষ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর আপনাকে বৈশ্য বলিয়াই * পরিচয় দিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের বংশধরগণ যদি এদেশে আসিয়া বৈশ্য হইয়া থাকেন, এবং যদি তাঁহাদের কন্যা বিবাহ করিয়া, কালিদাস মাতৃগুপ্ত এই আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার ঔরসে, বিদ্যার গর্ভজাত পুত্রগণ বৈদ্য নামে কেন অভিহিত না হইবেন? "ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াং জাতোঽম্বষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ"; এখানেও অম্বষ্ঠ শব্দে মাতৃগুপ্তের আভাস আসিতেছে। অম্বষ্ঠ হইতে বৈদ্য জাতি যদি পৃথক বর্ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাদের সম্বন্ধে, ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্য-কন্যার গর্ভজাত বলিয়া অনেক বচন শুনা যায়। যে ব্রাহ্মণ এইরূপ সঙ্কর পুত্রের জন্ম দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ধন্বন্তরি ছিল। এই মাতৃগুপ্তই সেই ধন্বন্তরি; কারণ গুপ্ত-উপাধিধারী সকল বৈদ্যই ধন্বন্তরি-গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দেন। কবি মাতৃগুপ্ত যদি বৈদ্যদের পূর্ব্বপুরুষ ধন্বন্তরি হন, তবে তিনি নবরত্নের অন্যতম ধন্বন্তরি হইতেও পারেন। এবং তাঁহার পূর্ণ নাম এই কারণে "মাতৃগুপ্ত ধন্বন্তরি" হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তিনিই কবিরাজ বা রাজকবি বা কবিশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কবিরাজ কথাটির আভিধানিক সংজ্ঞা অন্যরূপ হইলেও, ঐতিহাসিক সংজ্ঞা ও লোকাচারবশতঃ সমুদয় বৈদ্যগণই আপনাদিগকে কবিরাজ বলিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা কবিরাজ মাতৃগুপ্ত ধন্বন্তরির শাসকবংশীয়, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

পূর্ব্বোক্ত প্রথা-মতে, কালিদাসের গ্রন্থ হইতে কালিদাসের নাম বাহির করিতে না পারিলেও, মাতৃগুপ্তের নাম নিরাপদে উদ্ধার করা যায়; যথা,—"উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা, পশ্চাৎ উমাখ্যাং সুমুখী জগাম।" (কুমার।) ইহা হইতে অনুমান করা যায়, কালিদাস বৈশ্যরাজ-কন্যা বিবাহ করিবার পরে উমাকালী অম্বাদাস, বা মাতৃগুপ্ত এইরূপ কোনও নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাকে সুন্দরী বৈশ্যরাজকন্যা বিবাহ করিতে অনেকেই নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এই তপস্যা বা সমাজোত্তাপকারী কার্য্য করিতে বিরত হয়েন নাই।

মাতৃগুপ্ত ও ধন্বন্তরি

জ্যোতির্বিদাভরণ-গ্রন্থে, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভার কথা লিখিত আছে। জ্যোতির্বিদাভরণ-গ্রন্থ কালিদাস প্রণীত বলিয়া তাহাতেই লিখিত আছে। তাহাতে কালিদাস-প্রণীত কাব্যত্রয়ের নামোল্লেখ

* তদবধি বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ চুরমার হইয়া গিয়াছে—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্যে চুলোচুলি ঝগড়া হইতেছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আত্মীয়তা ছিল; এখন আর সে ভাব নাই, ঘোরতর শত্রুতা আসিয়া পড়িয়াছে। সেইরূপ স্থলে এইরূপ পাঠ্য লিখিয়া তাহাদের সহিত অসম্প্রীতি আরও বৃদ্ধি হইবে আশঙ্কা করিতেছি। অথচ এ কথা আলোচনা না করিলেও মাতৃগুপ্তের ইতিহাস স্পষ্ট হয় না। প্রবাদ আছে যে, কবি কালিদাস লম্পট ছিলেন।

আছে, নাটকত্রয়ের উল্লেখ নাই। তদনুযায়ী নাটকত্রয়ের প্রণেতা বলিয়া, অপর একজন কালিদাস স্বীকার করা যাইতে পারে। আরও, যে শ্লোকে নবরত্নের সভার কথা লিখিত আছে, তাহার বর্ত্তমান ব্যাখ্যাতেও একটু ত্রুটি আছে বলিয়া অনুভব হয়। সেই শ্লোকটি এই :—

"ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু,
বেতালভট্ট ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতৌ বরাহ-মিহিরৌ—নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্ন্নব বিক্রমস্য॥

সভাটি বিশ্ব-বিশ্রুত নবরত্নের বটে, কিন্তু আমরা শ্লোকের অধুনাতন ব্যাখ্যা মতে রত্ন পাইতেছি দশটি। কাজেই ব্যাখ্যাটির অসামঞ্জস্য বিধায়ে, একটু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়াছে। সাধারণ লোকে বরাহ-মিহির একই ব্যক্তির নাম বলিয়া মনে করে, কিন্তু এখানে দ্বিবচনান্ত প্রযুক্ত হওয়ায়, বরাহ এক ব্যক্তি এবং মিহির অপর ব্যক্তি সূচিত হইতেছে। আমি এই শ্লোকানুসারে, নয় জন বিক্রমাদিত্যের এই দশ জন রত্ন ছিলেন, এইরূপ ব্যাখ্যা বুঝিয়া, মাতৃগুপ্ত-ধন্বন্তরিকে চতুর্থ শতাব্দীর লোক ধরিতেছি এবং নাটকত্রয়ের প্রণেতা দ্বিতীয় কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুভব করিতেছি। তবে তিনিও বাঙ্গালী ছিলেন, যেহেতু, কালিদাস এই নামটিই বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তি।

নবদ্বীপে গুজরাটী উপনিবেশ

চন্দ্রগুপ্ত গুর্জ্জরের রাজা ছিলেন, তাঁহার নামীয় "গড়" গাঙ্গ্যরাষ্ট্রে কেন হইল? চন্দ্রগুপ্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন; তাঁহার বংশধরগণ গুর্জ্জরের মরুদেশ ত্যাগ করিয়া, ভারতের শ্রেষ্ঠ ভূমি শস্য-শ্যাম গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে আসিয়া, বাস করিয়াছিলেন,—এইরূপ অনুমান এখানে অসঙ্গত হয় না। আরও, এখনও সমুদ্রগড়ের অধ্যাপকগণ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণই আছেন; অথচ তাঁহারা বৈদ্যের কর্ণে মন্ত্র দিয়া থাকেন,—ইহাতেও তত্রত্য বৈদ্যদের নৃপবংশীয়ত্বের পরিচয় দিতেছে। অপিচ, গুর্জ্জরের লোকেরা যে কোনও সময়ে, গাঙ্গ্যরাষ্ট্রে বাস করিয়াছিলেন, গুজরাটী ভাষার সহিত গাঙ্গ্যরাষ্ট্রীয় ভাষার অধিকতর সামঞ্জস্যও তাহার এক প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত, পূর্ব্বোক্ত "উলার মেয়ের কল্‌কলানি" ইত্যাদি ছড়াও একটি সংস্কৃত শ্লোকের বিকৃতি। সেই সংস্কৃত শ্লোকটিতে, গুজরাটী স্ত্রীলোকদিগের প্রশংসা আছে। তাহাও গুজরাটীরাই এদেশে আনিয়াছেন। ব্রহ্মাণীতলার নাগোৎসব হইতেও বুঝা যায় যে, গুর্জ্জরের নাগপূজক জাতি কোনও সময়ে গাঙ্গ্যরাষ্ট্রে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। নদীয়া জেলায় কয়েক ঘর "ফণী"-উপাধিধারী লোক আছেন, তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা "ফণী ভাষ্য" প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বংশ-বৃদ্ধির অনুপাত

আদমসুমারীতে দেখা যায় ১৯০০ খৃঃ বাঙ্গালা দেশে ১১,৬২,৫৪৭ জন ব্রাহ্মণ, ৯,৮২,০০০ জন কায়স্থ এবং ৮৪,৬২০ জন মাত্র বৈদ্য বর্ত্তমান। বংশবৃদ্ধির অনুপাত ধরিলে, বৈদ্যজাতিকে নবদ্বীপের মূল জাতি বলিতে পারা যায় না; কিন্তু উহাকে ব্রাহ্মণজাতির পতিত শাখা ধরিয়া, মাতৃগুপ্তের সহিত সমন্বয় করা যাইতে পারে। ফাহিয়ানের সময়ে, গাঙ্গ্যরাষ্ট্র ক্ষুদ্র পল্লীময় ছিল; গুর্জ্জর হইতে সেই সময়েই উন্নত জাতির আগমন কল্পনা করিলে, বৈদ্যজাতিকে তাহাদের

কালিদাসের সাধন-পীঠ
৺ব্রহ্মাণী তলা, নবদ্বীপ

India Press, Calcutta.

একটি ক্ষুদ্র শাখাও মনে করা যায়। বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসে বৈদ্যজাতির নাম নাই। লোক-প্রবাদেও নাই, যথা—

"উলু কট্ ঢুলু কুট্ নলের বাঁশী,
নল গড়েছে একাদশী।
একানল পঞ্চদল, কে কে যাবি কামার শাল॥
কামার মাগি খড় খড়ানি, খড়ের উপর
তোলে পানি।
অগ্নন, দগ্নন, কুরি, কে'স্ত, বেরাম্ভন॥"*

ইত্যাদি কোনও গ্রাম্য ছড়াতেই, কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির সহিত এক পর্য্যায়ে, বৈদ্যজাতির উল্লেখ না থাকায় তাহাদিগকে নবীন জাতি ও মাতৃগুপ্তের কুটুম্ব বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

নামের স্থায়িত্ব

শেষ কথা, খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে যে গ্রামের নাম যাহা ছিল, খৃঃ বিংশ শতাব্দীতেও যে সেই গ্রামের নাম তাহাই আছে, তাহার প্রমাণ কি? প্রায় ৮।১০ বর্ষ হইল, কাটোয়ার নিকটে একখানি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তদানীং তত্রত্য মুন্সেফ ৺বেনওয়ারিলাল গোস্বামী, তাহার একটি বঙ্গানুবাদ করিয়া, সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন, তাহাতে দেখা যায়, খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে যে গ্রামের নাম যাহা ছিল, তাহার বার শত বর্ষ পরে বর্ত্তমান কালেও সেই গ্রামের নাম ঠিক তাহাই আছে, বিন্দুমাত্র বিকৃত হয় নাই। কাটোয়া, নবদ্বীপ হইতে ১০।১২ ক্রোশ উত্তর। যেখানে বার শত বর্ষে গ্রামের নাম বিকৃত না হয়, সেখানে পনের শত বর্ষেই বা গ্রামের নাম কেন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে?

মামগাছির লোকেরা কালিদাসের সত্ত্ব অবগত আছেন কি না? এ কথার উত্তরে, ২৭শে শ্রাবণ ১৩২০ সনে, মামগাছিতে সভা করিতে গিয়া অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে ধারাবাহিক অনুসন্ধান করিলে এই সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। কোনও ভগ্ন স্তূপের কোন ইতিহাস, তত্রস্থ কোন দেশীয় লোকে দিতে পারে নাই। রাজস্থানের চিতোর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা, চিতোর সম্বন্ধে কোনও তথ্যই অবগত নহে। এইরূপ সারনাথ, খণ্ডগিরি, রাজগৃহ প্রভৃতি সম্বন্ধে মহৎ ব্যক্তির সন্ধান কেহই রাখে না।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

কালিদাস তথা অনুসন্ধানকালীন, নানারূপ উপাদান সাহায্যে, কালিদাসের জীবনেতিহাস কল্পনা করি। যাহা যাহা সামঞ্জস্য করিতে পারিয়াছি, এক্ষণে তাহাই বিবৃত করিলাম। সমুদ্রগুপ্তের বংশীয় কোনও ব্যক্তির একটি অলোকসামান্যা রূপবতী ও বিদুষী কন্যা ছিলেন। তিনি সাবিত্রীর মত পতির অন্বেষণে বেড়াইতেছিলেন। গ্রাম্য ছড়ায় আছে—

"দাদা দাদা ডাক ছাড়ি, দাদা গেছে
কার বাড়ি।"
"ও দাদে যেও না গো, বঁধু এসেছে;
বঁধুর পান খেও না গো, ভাব লেগেছে;—
ভাব ভাব-কদমের ফুল ফুটে উঠেছে—
হাত বাড়িয়ে তুলতে গেলাম দাদা রয়েছে—
দাদার হাতের বাজুবন্ধক ছুড়ে মেরেছে—
উহুহু বড্ড লেগেছে" !!!

এই ছড়া আলোচনা করিলে বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যা সাঁওতালী কন্যাদিগের মত বা

* অগ্নন=আলেপনকারী, চিত্রকর; দগ্নন=নাপিত; কুরি প্রভৃতি—নদীয়াজেলাতেই দ্রষ্টব্য; কে'স্ত—কায়স্থ; বেরাম্ভন=ব্রাহ্মণ।

সাবিত্রীর মত "মরদ ধর্‌তে" বাহির হইয়াছিলেন। তিনি মরদদের হাতে পান দিয়া তাহাদিগকে বশ করিতেছিলেন। ভট্ট অম্বাকালী বা কালিদাস নামে একজন ধনুর্দ্ধর অসাবধান নব্য ও মূর্খ ব্রাহ্মণ যুবককে তিনি বিবাহ করেন, কিন্তু বিদুষী স্বামীকে অত্যন্ত মূর্খ জানিয়া পরে গৃহ হইতে বিতাড়িত করেন। কালিদাস গাঙ্গারাষ্ট্রে আসিয়া, ব্রহ্মাণীতলায় সরস্বতীর সাধনা করিয়া, অসাধারণ জ্ঞানী হইয়া উঠেন। এবং দেশে ফিরিয়া পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পত্নীর প্রশ্নানুযায়ী মুখে মুখে "ঋতু-সংহার" রচনা করিয়া তাহার সমাধান করেন। পরে "শ্রুতবোধ" রচনা করিয়া তাহার নূতন ছন্দ সকলের তথ্য তাঁহাকে অবগত করান। তিনি বিদ্যার সহিত গাঙ্গারাষ্ট্রে আসিয়া, শ্বশুরবাড়ী বাস করেন। সেখানে বিদ্যার মৃত্যু হইলে, শ্বশুরবাড়ীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক রহিত হইয়া যায়। তিনি পুনরায় গুর্জ্জরে যাইয়া, তত্রত্য কাব্যামোদী রাজা চন্দ্রগুপ্তের সন্তোষার্থ রঘুবংশাদি তিনখানি কাব্য রচনা করিয়া, কাশ্মীরের শাসকত্ব-পদবী লাভ করেন। পরে তিনি আবার এই গাঙ্গারাষ্ট্রে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার অসবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণ পরে মাতুল-কুলের সহিত মিশিয়া বৈদ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি পরে আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই সবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের নাম সুবর্ণ-লক্ষণ ভট্ট। তাঁহার বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া কবির ভগিনী "ওপারের জস্তি গাছটি" ইত্যাদি ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। ইনি পরে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার নামানুসারে সুবর্ণবিহার নামক গ্রাম হইয়াছে। তাহারই বৌদ্ধ নাম "ক্ষপণক"। তাহার পরে কালিদাস নামে আর একজন কবি এই গাঙ্গারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও তিনখানি নাটক রচনা করিয়া যান।

উপসংহার

আমি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, ভারতের যথারীতি ইতিহাস না থাকায় মহাপুরুষদের আবির্ভাব-কাল লইয়া বড়ই বিসম্বাদ যাইতেছিল। তাম্রফলক ও সমসাময়িক পুস্তকাবলী হইতে কোনও কথারই সুমীমাংসা হয় নাই। সম্প্রতি আভ্যন্তরীণ শ্লোকাবলী হইতে কালিদাসের আবির্ভাবকাল অভ্রান্তরূপে অনুমিত হইয়াছে। সেই রীতি অবলম্বন করিলে, সমুদ্রগুপ্তের নামানুযায়ী সমুদ্রগড়, বিদ্যার নামানুযায়ী বিদ্যানগর, দিগ্‌নাগাচার্য্যের নামানুযায়ী দিগ্‌নগর নামক গ্রাম সকল পাশাপাশি ভাবে নবদ্বীপের নিকট পাওয়া যাইতেছে। কালিদাসের নামে ও মাতৃগুপ্তের নামে ৬ খানি গ্রাম পাওয়া যাইতেছে। মাতৃগুপ্ত একজন রাজকবি ছিলেন। মাতৃগুপ্ত কালিদাসের নামান্তর বিবেচনা করিয়া কবি কালিদাসকে গাঙ্গ্যরাষ্ট্র-বাসী বাঙ্গালী বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

বিদ্বৎসমাজে প্রার্থনা

এক্ষণে বিদ্বৎসমাজে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমি অতি দীন ব্যক্তি, যথারীতি অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ গুরুতর বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আপনাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে, এই বিষয়ের স্থানীয় অনুসন্ধান ও শাস্ত্রীয় সমালোচনা করিয়া, কালিদাস কোন্ দেশীয় ব্যক্তি ছিলেন, তাহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দেশের লোকের প্রাণে আর একটু বল বৃদ্ধি করিয়া দিন। আমাদের দেশের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব

বিদেশীতে উদ্ধার করিতেছে, বলিয়া আমাদের যে কলঙ্ক আছে, তাহা ক্ষালিত করুন। আমরা আপনাদের কার্য্য দেখিয়া ধন্য হই।

নবদ্বীপ-নিবাসী এবং নড়াল ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে শ্রুত হইলাম যে, ৺ব্রহ্মাণী পীঠের নিকটে রাজাপাড়া নামক একটি পল্লী আছে। স্থানীয় লোকে বলে এই পীঠের ভিতরে একটি রৌপ্য ঘট আছে এবং একটি রৌপ্য ত্রিশূল আছে। জন-প্রবাদ এই যে, এইস্থানে রাজা বিক্রমাদিত্যের গঙ্গাস্নানের বাটি ছিল; তাঁহার পাড়া, সেই জন্য সেই স্থানের নাম রাজাপুর বা পাড়া। সেখানকার অনেক প্রাচীন বাটি ঐ স্থানের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।

৺ব্রহ্মাণী পীঠটি প্রাচীন ইষ্টকাবদ্ধ বেদীর উপর বটবৃক্ষ তলায় কয়েকটি ঘট মাত্র। স্থানীয় জমিদার শ্রীহরিদাস সাহা মহাশয় বলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজা ৺গিরিশচন্দ্র রায় এখানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনিই সেই ইষ্টকাবদ্ধ বেদী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

নবদ্বীপের প্রধান ও প্রাচীন অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন—এই ব্রহ্মাণী তারারূপিণী নীলসরস্বতীর প্রতিমূর্ত্তি। এই ঘট কয়টিই এই পীঠের অতি প্রাচীনত্বের প্রমাণ। নবদ্বীপের ৺পোড়ামাতা, শান্তিপুর বাগচড়ার ৺বাগ্‌দেবী প্রভৃতি অতি প্রাচীন পীঠ মাত্রেই এইরূপ কয়টি ঘট-সমষ্টি মাত্র। এই নিকট-বর্ত্তী জাননগরে জহ্নু মুনির আশ্রম ছিল। তাঁহার নামানুসারে এখানকার গঙ্গার নাম জাহ্নবী হইয়াছে। "গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে কতি-ক্রোশাশ্চ জাহ্নবী"—ছাপঘাটীর মোহনা হইতে ত্রিবেণীর ঘাট পর্য্যন্ত এই ৩০।৪০ ক্রোশ স্থানবর্ত্তী ভাগীরথীর নাম তাঁহার নামানুসারে জাহ্নবী হইয়াছে। এই ঘাটে কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু পার হইয়া মায়াপুরে গিয়াছেন। এই ব্রহ্মাণীর পীঠে তিনি তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। তাহা ভিন্ন শ্রীমন্ত সওদাগর, লখিন্দর, প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এই ঘাটে এবং এই ঘটে পূজা দিয়া গিয়াছেন। এক কালিদাস কেন, অনেক কবি, অনেক সাধু, অনেক কালিদাস এই ঘাটে ও ঘটে তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছি ইহারই নিকটে রাক্ষসীপোতা নামক একটি স্থান আছে। সেখানে কবি কালিদাসের প্রতিযোগী রাক্ষসগণ বাস করিতেন। সেখানে একটি শিবলিঙ্গ আছেন যাঁহার মস্তকে [illegible] এই অক্ষর খোদিত

[illegible] অর্থে চন্দ্রগুপ্ত। আরও সন্ধানে জানিয়াছি এক ব্যক্তির গৃহে চন্দ্রগুপ্তের একটি প্রাচীন টাকা আছে। তাহা সত্বরেই সন্ধান করিয়া দিব

বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের কালনাস্থ চিকিৎসক ডাঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ নাগ বলেন—"কবি কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন, কালিদাস এই নামই তাহার প্রমাণ। বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ কোমল ও মধুর, তাঁহার রচনা-প্রণালীও তদ্রূপ কোমল ও মধুর, তাঁহার রচনা যেন বাঙ্গলা ভাষার অনুস্বার ও বিসর্গ-সংযুক্ত সংস্করণ মাত্র। তাঁহার রচনায় অনেক এমন গাছ লতা পাতা পাখী প্রভৃতির নাম আছে, যাহা বাঙ্গালাদেশ ভিন্ন অন্য দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রচনাতে অনেক নায়কের চরিত্র বাঙ্গালীর চরিত্রের অনুরূপ। মালদহে ফজলি আম চিরকালই

হয়, সিংহল চিরকালই মুক্তার আকর, এই শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি চিরকালই কাব্যজননী। মহাকবি কালিদাস কি এই আম-কাঁঠালের বন ছাড়িয়া রাজপুতনার মরুভূমিতে জন্মিয়াছিলেন? মানবের মনোবৃত্তি-গঠনের পক্ষে তদ্দেশজ বাহ্য উপাদান সহায়তা করে। এ কথা চিকিৎসা ও মনস্তত্ত্ব-শাস্ত্রানুমোদিত। যেদেশে অজিতনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; যেদেশে প্রেমের অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যেদেশ জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণের সংগীত লহরীতে মুখরিত, মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি সেই দেশ ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে না। তিনি এই ব্রহ্মাণীতলায় যে গান গাহিয়া গিয়াছিলেন, তিনি চলিয়া গেলেও এই প্রান্তরে সেই সঙ্গীতের একটা রেশ বা প্রতিধ্বনি ছিল, যাহা এই গাঙ্গারাষ্ট্র-বাসীর কাণে বাজিতেছিল, তাই এই দেড় হাজার বর্ষ তাঁহার সুরের অনুকরণে সুর করিয়া গাঙ্গ্যরাষ্ট্রবাসী বড় কবির জাতি হইয়া উঠিল। ভারতের কোন্ বিভাগে এত কবি হইয়াছে?"

কালিদাসের জাতি

কবি কালিদাস কি জাতি ছিলেন বিচার করিলেও তাঁহাকে বঙ্গদেশীয় বলিয়া বুঝা যায়। প্রমাণ-পরম্পরায় প্রতিপন্ন হয়, কবি কালিদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যদি ব্রাহ্মণ হন, তবে বাঙ্গালার বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ নহেন। কারণ রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ "বসুবেদবান" শাকে বা ৬২৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা-দেশে আগমন করেন। বৈদিক-শ্রেণীয়গণ তৎপরবর্ত্তী কালে শ্যামলবর্ম্মের রাজত্বে বাঙ্গালা-দেশে প্রবেশ করেন। আমার অনুসন্ধান-অনুযায়ী কবি কালিদাস চতুর্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তখন রাঢ়ীয়, বরেন্দ্র বা বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কেহই এদেশে আসেন নাই। তবে কালিদাস কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন? আদিশূরীয় ব্রাহ্মণগণের এই বাঙ্গালায় শুভাগমনের পূর্ব্বে এই দেশে এক শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে আদিশূরীয়গণ "সপ্তশতী" এই আখ্যা দিয়াছিলেন। কবি কালিদাস "সপ্তশতী" ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই বুঝা যায়। অথবা, তিনি "ভাট" নামক প্রাচীন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণও হইতে পারেন। শান্তিপুরে 'ভাট'বংশীয় অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। অনেক কবিওয়ালা 'ভাট'-জাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কালিদাসের ভাট ব্রাহ্মণ হওয়াও অসম্ভব নহে। কতকগুলি গ্রাম্য ছড়ায়ও এ আভাস পাওয়া যায়।

ছড়ার নমুনা—

"কি কথা? ব্যাঙের মাথা
কি ব্যাং? সরু ব্যাং
কি সরু? বামুন গরু
কি বামুন? ভাট বামুন।"

এই 'বামুন গরু' জগতের তৃতীয় কবি ভট্ট কালিদাস, এই ছড়া সকল তাহার কাব্যকে ঠাট্টা করিয়া লিখিত। বামুন গরু অর্থে তিনি বাল্যকালে সাংসারিক বিষয়ে মূর্খ ছিলেন। যে ডালে বসিয়াছিলেন সেই ডালই কাটিতেছিলেন। যত গ্রাম্য ছড়া তাঁহার সমসাময়িক। এবং অধিকাংশ গ্রাম্য ছড়াই কবি কালিদাসের ভগিনী সুদক্ষিণা দেবীর রচনা।

কালিদাসের দ্বিতীয় বিবাহ

কবি কালিদাস যে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাহা কাশ্মীরের রাজধানী

শ্রীনগরে করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ছড়া হইতে বুঝা যায়—

আগাডুম বাগাডুম
ঘোড়াডুম সাজে।
ডাম্‌্বুর গেল ঝাঝর বাজে।
বাজাতে বাজাতে পেল ঢু'লি
ঢু'লি গেল কমলাপলি।
কমলাপুলির টিয়েটা
ঘুঘ্নি মামার বিয়েটা।
হাড় মর্ম্মর কেলেজিরে
বয়ুন কুসুম জ্বালের বিড়ে
আয় রঙ্গ দাটে যাই গুয়াগঙ্গ টাকিথইানে
একটি লাল কোপড়া
মায় ঝিয়ে ঝগড়া
হলুদবনে কলুদ ফুল
তাহার নাম টগর ফুল।

ইহার মধ্যস্থিত "কুমলা পুলি" শব্দ কাশ্মারের রাজধানী শ্রীনগরকে লক্ষ্য করিতেছে। কারণ "কমলা শ্রীহরিপ্রিয়া" যেমন কুসুমপুর ও 'পুষ্পপুর' পাটলিপুত্রের নাম সেই রূপ কমলাপুর ও শ্রীনগর উভয়ই শ্রীনগরের নাম। আর যে রূপ Seleucus শব্দে শিলোকায় বা পর্ব্বতায়ন বা মলয়কেতু হইয়াছে সে রূপে শ্রীনগরই এ দেশে আসিয়া কমলাপুর হইয়াছে। এবং খুঘ্নি মামা শব্দে মাতৃগুপ্ত ধন্বন্তরি নামক কাশ্মীরী রাজাকে বুঝিতে হইবে। কালিদাস কাশ্মীরী রাজকন্যাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন তিনি হিমালয়ের পার্শ্বে বসিয়াই কুমারসম্ভবের হিমালয় বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহার সহিত কাশ্মীরী রাজকন্তার সংযোগ হইতেই তিনি কুমারসম্ভবের উমার সহিত শিবের সম্মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি যে মেঘদূত লিখিয়াছেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় কালিদাস বিক্রমাদিত্যের কোপে পড়িয়া কিছুদিন রামগিরিতে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর যে বিরহ অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই "মেঘদূত" নামে অভিহিত হইতেছে।

কালিদাসের ভাষা

কালিদাসের ভাষা যে বাঙ্গালা ছিল তাঁহার কাব্য হইতে বেশ বুঝা যায়। তাঁহার ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোক হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

"প্রচণ্ডসূর্য্যঃ স্পৃহনীয়চন্দ্রমা
সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ।
দিনান্ত বাক্যা ভূপ ব্যাপ্ত মথয়ে,
নিদাঘকালঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে॥

এখানে দুইটি বিসর্গ তুলিয়া দিলেই এই শ্লোকটি বাঙ্গালা ভাষা হইল।

"কুমার সম্ভবের" প্রথম শ্লোকই বাঙ্গালা—
"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ"
রঘুবংশের তৃতীয় শ্লোকও বাঙ্গালা—

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যু পহাস্যতাং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ"॥

যে শ্লোকে কালিদাস সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলেন তাহাও বাঙ্গালা—

জয় জয় দেব-চরাচর সাগর
কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে
বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।
"নমো বিষদ কুসুম তুষ্টা
পুণ্ডরীকোপবিষ্টা
ধবল চন্দন বেশা
মালতী বন্ধ কেশা"

ব্রহ্মাণীতলার একটি মুসলমানের নিকট

সংবাদ পাইলাম একখানি বাঙ্গালা পুস্তক তাহার নিকট আছে, তাহাতে লিখিত আছে ব্রাহ্মণী তলার নিকটে বিক্রমাদিত্য নামে একজন রাজা ছিলেন। সেই পুস্তকের অনুবাদ করিতে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমন্মথ নাথ ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালায় জল-প্লাবন

সেদিন দামোদর-নদের উন্মাদনায় যে তাণ্ডবের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহ কেহ চর্ম্মচক্ষে কেহ বা মানস-নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এই প্লাবনটী যে বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার বক্ষ মথিত করিয়া দিয়াছে, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। অধিকন্তু, ইহার আবিল উচ্ছ্বাসে সমগ্র বঙ্গের ও উত্তর ভারতের দেহের উপর পলি-মৃত্তিকার একটা স্থূল প্রলেপ পড়িয়াছে। সে বিষয়েও আর সন্দেহ নাই। ইহাতে ভারতের মধ্যে একটা নবীন শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতীয় কৃষকগণ নূতন বলে ভারতভূমি কর্ষণে মনোযোগী হইয়াছেন। বন্যার হাহাকার ধীরে ধীরে মধুর হাস্যে পরিণত হইবে বলিয়া আশা আছে। এই মহান শুভ-বন্যাপ্লাবনের ফলে যে এক প্রস্থ উর্ব্বর স্থূলস্তর দেশের সর্ব্বত্র সঞ্চিত হইয়াছে, ভূতত্ত্বহিসাবে ইহাকে একটী নূতন যুগ-লক্ষণের অন্তর্গত ধরিয়া লইতে পারা যায়। সেই নবস্তরের উপর আমাদের নবযুগের কর্ম্ম ও জীবনের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। এই যুগের নাম "জন-সাধারণের অভ্যুদয়-যুগ"।

পূর্ব্বকালে খণ্ড-প্রলয়-মানসে যখন দামোদর নদ তাণ্ডব করিতেছিলেন, সেই সময়ের সহস্র সহস্র চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কালের ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত জীর্ণশীর্ণ দামোদরের চিত্র সমষ্টি অবলম্বনে দেশময় বিবিধ প্রকার কাব্য রচিত হইয়া গীত হইয়া আসিতেছে। সে বিষাদের গীত, সে মরণের গীত, সে বিচ্ছেদের গীত গান করিতে করিতে দেশবাসিগণ এখনও কাতর হয়েন নাই। আমরা বাঙ্গালীর সেই সমুদয় সনাতনী গীতিমালা হইতে আধুনিক কালের "নবযুগ লক্ষণ"গুলি বাছিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছি।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে দামোদর

প্রকৃতি-দেবীর রঙ্গমঞ্চে 'মৃতের মিলন' অভিনয় হইতেছিল। যাহারা অভিনয় করিতেছিল, তাহাদের প্রকৃত পরিচয় আজিও অজ্ঞাত রহিয়াছে। সেই অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন— "যাহারা অভিনয় করিত তাহারা অতিশয় দুর্ব্বল ও কৃশ, উঠিতে বসিতে যষ্টির সাহায্য লইত।" কে তাহাদের অন্তরালে দাঁড়াইয়া অবিশ্বাসের কথা শুনাইত, দেহে ও প্রাণে ভেদনীতির তপ্তশ্বাস ফেলিত, তাহা বুঝিতে তাহারা পারিত না।

সে অনেক দিনের কথা, তখন দামোদর স্বাধীন ছিল। দামোদরের দেহ হইতে বাহুর ন্যায় উভয় পার্শ্বে অনেক স্রোত সুশ্যামসুন্দর পল্লীসমূহের পদপ্রান্তে রজত-রেখার ন্যায় শোভা পাইত। তখন দামোদর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ন্যায় দেশ রক্ষা করিত। সে কথা অনেক পুরাতন হইয়া গিয়াছে। আকবরের সময়েও কবিকঙ্কণ দামোদর,

তারপর দামোদরের বাহু অতিক্রম করিয়া, দামুন্না হইতে আড়রায় গিয়াছিলেন। তখন দামোদরকে লোকে চিনিত, মধ্যে মধ্যে ভয়ও করিত, কিন্তু দামোদরের প্রেম এক-পার্শ্বিক ছিল না। দুকূল ভাসাইয়া নৃত্য করিত, সে নৃত্য তত ভয়ঙ্কর হইত না। দামোদর তাহার পর স্বাধীনতা হারাইয়া অনিচ্ছায় দেশের মিত্রতা ভুলিয়া শত্রুভাবের পরিচয় দিতেন, সেটা বোধ হয় অভিমান। তখন দামোদর আপনজনের উপর অভিমান বশতঃ অভিশাপ দিতেন। দু'দিন পরে সেটা ভালবাসায় সমাপ্তি হইত। তখনও দেশবাসী দামোদরের শ্রীমুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুখী হইত। দামোদরের অভিশাপ যে দেশবাসীর উপর পড়িয়াছে তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। দামোদর কত কর্ম্মময় উপদেশ দিলেন, কতবার আহ্বান করিলেন। কেহই তাঁহার সে আহ্বান শুনিতে পাইল না। তাই দামোদর মহারুদ্রের মূর্ত্তিতে "মৃতের অভিনয়" ভাঙ্গিয়া দিবেন স্থির করিয়া নীরব ছিলেন।

আপনার জন্মভূমি, লীলাভূমি আজ দামোদরের নিকট পর হইয়া গিয়াছে। লীলাভূমির প্রতিরেণুতে আপনার জীবন ঢালিয়া নিজকে বিলাইয়া দিতে না পারিয়া দামোদরের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। মাটির সঙ্গে দেহ মিশাইতে না পারিলে, নিজের সমগ্র মনটুকু তাহার হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া আপনাকে ভুলিতে না পারিলে প্রেম পূর্ণাঙ্গ হয় না :—

"প্রেমে চায় ষোল আনা প্রাণ"।

আংশিক প্রাণ পাইয়া দামোদর স্ফীত হইলেন, মরমে মরমে ক্রন্দন-কোলাহল উঠিলে স্ফীত-বক্ষ প্রেমবন্যায় উথলিয়া উঠিল। প্রেমপূর্ণ দামোদর-হৃদয় উদ্দামভাবে ছুটিল।

দামোদর কোথায় ছুটিলেন? মঙ্গলময়ী শক্তিরূপিণী চণ্ডিকার নিকট। তিনি জগন্মাতা, সন্তানের অশ্রুধারা তাঁহার পদতল সিক্ত করিল। দামোদরের ক্রন্দন চণ্ডীর হৃদয়ে বাৎসল্য-স্নেহ জাগরিত করিয়া দিল। "আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কর্ম্মভূমি, লীলা-নিকেতনে আজ আমার অধিকার নাই, মা! আমি আপন হারা হইয়া আপনজনের নিকট পর হইয়াছি। দে মা হৃদয়ে শক্তি, দে মা হৃদয়ে ভক্তি, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করে দে মা!" এই বলিয়া দামোদর আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিয়া চণ্ডিকার পদ বেষ্টন করিলেন। সন্তানের কাতরতায় মাতার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাৎসল্য প্রেম অধিকতর বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। চণ্ডিকা আজ পুত্রকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন —

"হাজাব কলিঙ্গদেশ, বসাব নগর।
ঘোষণা রাখিব বীরের অবনী-ভিতর।"

কবিকঙ্কণ।

প্রেমবীর দামোদরের হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হইল। দামোদর কর্ম্মভূমির সহিত সুদৃঢ় প্রেম আলিঙ্গনের আশায় নির্জ্জন শিলা-নিকেতনে আপন জনের প্রেম-মূর্ত্তির চিন্তায় বিভোর হইলেন।

প্রলয়-মিলন

মিলন মধুর বটে, কিন্তু যাহার পক্ষে মিলন তাহার পক্ষেই মধুর। অক্রুর যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গিয়াছিলেন, তখন অক্রুরের সহিত মিলন মথুরার পক্ষে আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। ভগবান মথুরায় রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মথুরার প্রাণে মিলিত হইয়াছিলেন, মথুরা ভগবানের

প্রেম-বন্যায় প্লাবিত হইয়া মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু একবার প্রেমপূর্ণ বৃন্দাবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, সেস্থান গোপ-গোপিনীগণের হাহাকারে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাই বলিতেছি, মিলনটীর অপর দিকে প্রলয় ও হাহাকার। এখন বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না আমাদের দামোদর কোন্ মথুরা-উদ্দেশ্যে দৌড়িয়াছিলেন—আমরা রথনেমি-নির্ঘোষ ধ্বনি ও রথচক্রাবর্ত্তনের সুগভীর চিহ্নমাত্র দর্শনে দামোদরের মিলনজনিত প্রলয়-চিহ্ন দর্শন করিতেছি মাত্র। একাধারে বিচ্ছেদ ও মিলনের অভিনয় দেখিবার ইচ্ছা যদি থাকে, তাহা হইলে ভগবান দামোদরের লীলা-মাহাত্ম্য চিন্তনে মনোনিবেশ করুন। দামোদরের প্রেম যে নিদারুণ বিশ্বপ্রেম, তাহা কি আমরা অদ্যাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি!

"মহাকোপে কম্পমান হয় সর্ব্ব গা।
যোজন যোজন হইতে পড়ে এক পা॥"

কবিকঙ্কণ

মাতৃমূর্ত্তি কি এতাদৃশ ভীষণ। সন্তান মায়ের লীলা কি করিয়া বুঝিবে! বীরের জন্য জগদ্ধাত্রীর এ কি মূর্ত্তি! কবিকঙ্কণ, তুমি মাতৃমূর্ত্তি সন্তানের চক্ষে এমন ভীমামূর্ত্তিতে অঙ্কিত করিলে কেন!

স্বাধীনতাহীন দামোদর, ক্ষীণ, কৃশ, দুর্ব্বল, অস্থিপঞ্জরদেহ দামোদর, নববর্ষাগমে ধারাধরের বীর্য্যে নববল ধারণ করিলেন, তাঁহার স্বচ্ছ রজতধারা আরক্তিম হইয়া উঠিল। দামোদরের আরক্তিম নেত্র-প্রান্ত হইতে একটা মহাজ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দামোদরের উন্মাদনাময় নৃত্য ক্রমশ তাণ্ডবের পূর্ব্বাভাস সূচিত করিল। দামোদর স্বাধীনের ন্যায়, প্রকৃত বীরের ন্যায় হুঙ্কার শব্দ করিলেন। দামোদরের উন্মাদনা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল, ততই তাঁহাকে অধীনে রাখিবার জন্য, তাঁহার প্লাবনের মাদকতা অপনীত করিবার জন্য বন্ধন সুদৃঢ় করিবার আয়োজন হইল। দামোদর সেই দারুণ বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য হুঙ্কার করিতে করিতে স্ফীত হইলেন। জনপদবাসিগণ বহুবার দামোদরের বীর্য্যবত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে, দামোদর-চরিত্র তাহারা ভাল করিয়া বুঝিয়াছে। তাহারা দামোদরের আস্ফালনে সামান্য হাস্য করিল। শত শত কর্ম্মকারগণ দামোদরের হস্তপদে শৃঙ্খল দ্বারা বেষ্টন করিতে আরম্ভ করিল। দামোদরের আস্ফালনে শৃঙ্খল ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নব নব শৃঙ্খল দামোদরের পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইল। আজ দামোদর বীরবেশে সজ্জিত হইয়াছেন। হুঙ্কারের পর হুঙ্কার গগণভেদ করিয়া উঠিল। বীরের হৃদয় চণ্ডীর বরে বলীয়ান হইয়াছে। দামোদরের চিন্তা নাই, আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। দামোদর চণ্ডীর বরে মিলনের পথে ছুটিয়াছেন।

"এমত শুনিয়া ইন্দ্র চণ্ডীর বচন।
হাতে হাতে চারি মেঘ কৈল সমর্পণ॥"

(কবিকঙ্কণ)

কারাবদ্ধ মেঘ-চতুষ্টয় চণ্ডীর বরে উন্মুক্ত হইয়াছে, চণ্ডিকা মেঘ-চতুষ্টয়কে বলিলেন—

"শুন শুন মেঘগণ, কর ঝড় বরিষণ,
কলিঙ্গে হইয়া প্রতিকূল।
মোর যজ্ঞ-ভঙ্গ-কালে আকুল করিয়া জলে,
যেন নন্দ-গোপের গোকুল॥
পাণ লহ ওহে দ্রোণ, শোধহ আমার লোণ,
শীঘ্র চল চণ্ডিকার সঙ্গে।

পুণ্ডরীক ঐরাবতে, দুই গজ লয়ে সাথে
বৃষ্টি করি ডুবাও কলিঙ্গে।
চলহ পুষ্কর মেঘ, দুষ্কর তোমার বেগ
সঙ্গে লহ কুমুদ বামন।
তুমি যদি মনে কর, প্রলয় করিতে পার
কলিঙ্গের কোথায় গণন॥"

(কবিকঙ্কণ)

দামোদর চণ্ডীমাতার নিকট মেঘের গর্জ্জন বা প্রলয় প্রার্থনা করেন নাই। মাতা সন্তানের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য আপনার শক্তি মেঘাকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দামোদর চাহিয়াছিলেন, "মিলন" জগন্মাতা 'মিলনে'র উপায়স্বরূপ প্রলয়-প্লাবনের ব্যবস্থা করিলেন। যাহা চাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহা পাই না, তাহার পরিবর্ত্তে একটা অভূতপূর্ব্ব চিন্তাতীত ভীষণতার সহিত প্রথমে দর্শন হয়! কর্ম্মস্রোত অতিকুটীল গতিতে কর্ম্মের সমাপ্তি আনয়ন করে। লীলাময়ীর লীলা মানবের বুঝিবার সাধ্য নাই। দামোদর চাহিয়াছিলেন 'মিলন' কিন্তু প্রাপ্ত হইলেন প্রলয়, মেঘের গর্জ্জন, মুষলধারায় বৃষ্টি। সকলি অদ্ভুত!

প্লাবনের প্রারম্ভিক অবস্থা

এ বৎসর যে প্রকার বৃষ্টি ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে দামোদর প্রভৃতি বহু নদনদী প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। এতাদৃশ অতিবৃষ্টির প্রয়োজন কি? তাহা মানবে বুঝিবে না। ইহাকে সুবৃষ্টি বলিতে পারি না। প্রতি পল্লীবাসী বৃষ্টির প্রভাবে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ধান্যরোপণের সুবিধার অভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেবলমাত্র বৃষ্টিপাতেই নিম্নভূমি জলময় হইয়া উঠিতেছিল। কৃষকের দুশ্চিন্তা পূর্ণভাবে হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। পাটের আশা অনেকেই ত্যাগ করিয়াছিল। কৃষকের ধান্যক্ষেত্র জলপূর্ণ হইয়াছে, অতিকষ্টে ধানের চারাগুলি রোপণ করিতেছে। ইক্ষুর অবস্থা মন্দ, কলাই চাষ বড় ভাল হয় নাই। পল্লীবাসিগণ প্রচুর জল স্বত্বেও কৃষিকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে না পারিয়া ভবিষ্যৎ অন্নচিন্তায় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। বৃষ্টির বিরাম নাই, দিনরাত ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টিপাত হইতেছে। ইহাকে পল্লীবাসিগণ ইন্দ্রের আদেশ বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যৎ অমঙ্গলাশঙ্কায় আকুল হইয়া পড়িল।

"ইন্দ্রের আদেশ পায়, শীঘ্রগতি মেঘ ধায়,
ঊনপঞ্চাশ পবনে করি ভর।
ঝড়েকেতে বায়ুবেগে, গগন জুড়িল মেঘে,
চতুর্দ্দিকে কলিঙ্গ নগর!!!"

(কবিকঙ্কণ)

কৃষকগণ কর্ম্মহীন জীবন লইয়া বিলাসিতা-বর্জ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরে স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবারবর্গের চিন্তা করিতেছে। কেহ কেহ পাট কাটিতেছে, দড়ি পাকাইতেছে। গবাদি খাদ্য অভাবে গোয়াল-গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া দ্বারদেশাভিমুখে সকাতর দৃষ্টি সঞ্চার করিতেছে। বর্দ্ধমানবিভাগের কোন কোন পল্লীতে গো-বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কৃষিসম্বল গাভী গোয়াল শূন্য করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কৃষকগণের হৃদয় নব নব দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া উঠিয়াছে। মাঠ, ঘাট, পথ সমুদয় জলে ডুবিয়াছে। অতিবৃষ্টিতে তণ্ডুলের অভাব পল্লীগৃহে দেখা দিয়াছে, অথচ ধনিগণের বিলাস-নিকেতনে আনন্দ স্রোত পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত হইতেছে! বলিতে পারি না এই আনন্দ সকল ধনিগণের গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কি না।

এদিকে পূর্ব্ব হইতে প্রত্যেক পল্লীবাসীর কর্ম্ম ও চিন্তাস্রোত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ

থাকিয়া আবর্ত্তিত হইতেছিল। জাতিগত ভেদাভেদ, বড়ছোটভাব সমাজকেন্দ্রকে পরিধির দিকে আকৃষ্ট করিতেছিল। হিংসা, দ্বেষ, দলাদলি পল্লীসমূহকে শ্রীহীন করিয়া তুলিয়াছে। তদুপরি জীবন-সংগ্রাম; পল্লী-সমাজ হইতে সমাজহীন নগর পর্য্যন্ত অশান্তি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 'বিশ্বাস, একতা ও প্রেম কৃত্রিমতাপূর্ণ হইয়াছে। এই প্রকার ঘোরতর অনৈক্যের দিনে পল্লীচিত্র কীদৃশ সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইতেছিল, তাহা হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। নীরব চিন্তা সমাজকেন্দ্রের স্তরে স্তরে অব্যক্তভাবে সঞ্চিত হইতেছে। নীরব সাধনা দামোদরের তাড়নায় মূকত্ব ত্যাগ করিয়া বাচালতা লাভ করিয়াছে। অতিবৃষ্টি নিবন্ধন ভবিষ্যৎ অন্নচিন্তা ক্লিষ্ট পল্লীবাসিগণ আকুল হইলেও ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইতে পারে নাই। তাহাদের ভাব-কেন্দ্র সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছে। পল্লীময় কেবল অশান্তি, কেবল অভাব, কেবল বিদ্বেষ-বহ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। সুখের আশায় অমৃত-বোধে গরল পান করিতেছে, আলোক-প্রাপ্তির আশায় ক্রমাগত গভীরতম অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইতেছে। একদিকে উন্মার্গী অন্যদিকে বিলাসী অহঙ্কারী সমাজ-শাসনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

দামোদরের বিপুল মত্ততা

এইরূপে পল্লীসমূহে যখন অশান্তি, অনৈক্য, ক্ষুদ্রত্ব, নীচাশয়তা, দরিদ্র দুঃখ ও দৈন্য বিরাজ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে দামোদরের ভীষণ হুঙ্কার চতুর্দ্দিকে বায়ুবেগে প্রচারিত হইল। সার্ব্বজনীন জীবন-মরণের সমস্যার মীমাংসার জন্য একটা কলরব উত্থিত হইল। বর্দ্ধমানের প্রতি পল্লীতে একটা সাড়া পড়িল। প্রমত্ত স্ফীতবক্ষ দামোদর শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়াছে—গো গ্রামস্থ কারা-প্রাচীর ভেদ করিয়া ছুটিয়াছে। সকলেই দেখিতেছে একা দামোদর কাহার প্রেমে পাগলের মত দৌড়িয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে একা দামোদর-দেহে সহস্র নদনদী প্রবেশ করিয়াছে, এ যে জগজ্জননী চণ্ডিকার আদেশ—

"আজ্ঞা দিল ভবানী, চলিল মন্দাকিনী,
ছাড়িয়া গগণে স্থিতি।
সঙ্গে মকর জাল, ছাড়িয়া পাতাল,
বেগে ধায় ভোগবতী॥"

ইহাকি সামান্য ব্যাপার, সামান্য কারণ, সামান্য উদ্দেশ্য! ইহা যে দামোদরের বহু সাধনার ফল, দামোদর আজ বন্ধন-মুক্ত হইয়া অপার আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। চণ্ডী তার সহায় হইয়াছেন! দামোদর কোটী নদনদীর বল আপন অঙ্গে প্রাপ্ত হইয়াছে। দামোদর দিক্ বিদিক মথিত করিয়া চলিবে, কাহার সাধ্য তাহার সম্মুখে দাঁড়ায়, চণ্ডীর আদেশে দামোদরের মন্থনে অমৃত উঠিবে, যদি হলাহল উঠে তাহা শিবকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইবে। অশিবনাশিনী শিবানী সকলি শিবময় করিয়া দিবেন। দামোদর একাকী হইয়াও বহুবল ধারণ করিয়াছে, বহুবল-ধারিণী তাঁহার বলসমূহ সন্তানের বাহু ও মনে চাপিয়া দিয়াছেন। ঐ দেখুন দামোদর-দেহে—

"আমোদর দামোদর, ধাইল দারুকেশ্বর,
শিলাই চন্দ্রভাগা।
দেবাই দানাই, ধাইল দুইভাই,
বগড়ির খানা ধার বাগা॥
ধাইল ঝুম্ ঝুমি, করিয়া দামাদামি
বিষাই মুষাই সঙ্গে।
ধাইল তারাজুলি, গুস্করা কুতুহলী,
রতনা চলিল রঙ্গে॥

খরতর লহরী,　　ধাইল গোদাবরী
কাণাধার দামোদর।
থালি জুলি সঙ্গে,　　চলিলা রঙ্গে,
বুড় মন্ত্রেশ্বর।
গঙ্গা যমুনা　　ধাইল বরুণা
অজয়া সরস্বতী
ধাইল কুন্তী,　　বাঁকা ধায় গোমতী
সরযূ সুধাবতী
ধাইল কাঁসাই,　　মহানদী বিড়াই
খর ধার বামন থানা।
চারি দিকে জল,　　হইয়া ধবল
কলিঙ্গ জুড়িয়া বহে ফেনা॥"
(কবিকঙ্কণ)

দামোদরের সাধনা অসম্ভব সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। সাধনার মত সাধনা করিতে পারিলে, অসম্ভব সম্ভব হইয়া উঠে। দামোদর প্রেম-বন্যার তরঙ্গ তুলিয়া মনের আনন্দে মিলনের পথে প্রলয়-তুফান তুলিয়া চলিয়াছে। কবি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছেন যে, ভারতের সমগ্র নদনদী আবশ্যক-বোধে দামোদরের দেহে মিলিয়াছে। কবি নদনদীর একতা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—ভ্রাতার কার্য্যে দেশ-দেশান্তর হইতে সকল ভাই ভগ্নী একত্রিত হইয়াছেন। এই স্থানেই কবির স্বদেশ-ভক্তি উছলিয়া উঠিয়াছে! দামোদর ভারত-প্রবাহি নদনদীর আগমনে অনন্ত সমুদ্রের বল ধারণ করিয়াছে। "জলে মহী একাকার পথ হৈল হারা।" সমাচার বর্দ্ধমানের প্রতি পল্লী মধ্যে প্রচারিত হইবামাত্র পল্লীমধ্যে একটা নূতন সাড়া পড়িয়া যাইল।

"জলে মহী একাকার পথ হৈল হারা।"

পল্লীজনগণের সকলের হৃদয়ে মরণের ভেরী বাজিয়া উঠিল। ব্যক্তিগণের বিভিন্ন চিন্তাস্রোত একটি পথ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। ব্যক্তিগত বিপদে ব্যক্তিগত শক্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে, ইহা যে ব্যক্তিগত বিপদ নহে। এ বিপদ সমগ্রপল্লীবাসীর, সমগ্র জেলাবাসীর! যে সে বিপদ নহে। উপেক্ষা করিবার শক্তি নাই। অপেক্ষার অবসর নাই! ব্যক্তিগত মৃত্যু তত বিভীষিকা উৎপাদনে সমর্থ হয় না। এ যে সার্ব্বজনীন মৃত্যু, এ বিপদ সমগ্র পল্লীর। যদি মুক্ত হইবার উপায় কিছু থাকে তাহা পল্লীবাসীর সমবায়-শক্তির বলে হইবে, কোন ব্যক্তিগত শক্তি দামোদরের মহাশক্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। ক্রমে পল্লী-বাসীর শক্তিগোচর হইল—জীবজন্তু ঘরদ্বার, ধনরত্ন সকলি জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, বর্দ্ধমান ডুবিয়াছে! ভীষণ কথা ক্রমশ ভীষণ ভাব ধারণ করিল।

"গর্ত্ত ছাড়ি ভুজঙ্গম ভেসে যায় জলে।
নাহি কি নিস্তল স্থল কলিঙ্গ মণ্ডলে॥
*　　*　　*
চণ্ডীর আদেশে ধায় বীর হনুমান।
মুষ্ট্যাঘাতে ঘরগুলা করে খান খান॥
চারি দিকে ধায় ঢেউ পর্ব্বত বিশাল।
উঠে পড়ে ঘর গুলা করে দোল মাল॥"
(কবিকঙ্কণ)

বৃদ্ধেরা বলিলেন "বর্ত্তমানের যুবকগণ 'হুজুগ' প্রিয়। আমরাও একদিন যুবক ছিলাম। তখন তোমাদের মত এতাদৃশ বাগাড়ম্বরপ্রিয় ছিলাম না। দু'একবার দামোদরের বন্যা দেখিয়াছি, কিন্তু তোমাদের মত এতাদৃশ লম্ফ ঝম্প করি নাই।

তোমরা আকাশ সমান জল দেখিতে চাও! তোমাদের সকলই বাড়াবাড়ি, খুব জোর, যদি বাণ আসে ঐ মাঠের ধান ডুবাইয়া দিবে, যদি উহা অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে কাহার-পাড়ায় জল প্রবেশ করিবে।"

ধান্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইবে শুনিয়া দরিদ্র কৃষকগণ আকুল হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল "এবার মন্বন্তর" দেখা দিবে। তাহারা উদাস প্রাণে ধান্যক্ষেত্রে গমন করিল। রমণীমহলে একটা উদ্বেগ প্রবেশ করিল। পুত্রকন্যার জন্য তাঁহারা ভাবিয়া আকুল হইলেন। যুবকগণ বন্যার কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছে। বৃদ্ধগণ উপহাস করিতেছে, দরিদ্র পর্ণকুটীরের জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীময় একটা উৎকণ্ঠার সাড়া পড়িয়াছে। হৃদয়ে সুখ নাই। কর্ম্মে আস্থা নাই। প্রাণের মধ্যে শূন্যভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। সূর্য্য অস্ত যাইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব রহিয়াছে এমত সময়ে জনৈক পথিক দ্রুতবেগে চলিয়াছেন—যাহাকে দেখিতে পাইতেছেন তাহাকেই বলিতেছেন "বাণ সব দেশ ডুবাইয়া আসিতেছে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়া পুত্র-কন্যার জন্য বাড়ী দৌড়িয়াছি। শীঘ্র এ গ্রামে বাণ পড়িবে।" পথিকের প্রমুখাৎ এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া যুবকগণের মধ্যে কেহ পদব্রজে কেহ কেহ বা অশ্বারোহণে নিজপল্লী হইতে যে গ্রামে বাণ পড়িয়াছে সেই গ্রামাভিমুখে ধাবিত হইল। ক্ষণকাল মধ্যে তাহারা গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিল "ভয়ঙ্কর বন্যা, গ্রাম ডুবিবে, কেহই বাঁচিবে না।" মাঠ হইতে কৃষকগণ দৌড়িয়া পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিল। মাঠ হইতে গরুর পাল ঊর্দ্ধপুচ্ছে হাম্বারবে পল্লী প্রবেশ করিল, পক্ষীকুল বৃক্ষশাখে ব্যাকুল ভাবে কলরব করিতে আরম্ভ করিল—মুহূর্ত্ত মধ্যে 'প্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ' বলিয়া মনে হইল।

নব-শক্তি

সে এক অদ্ভুত ব্যাকুলতা, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। উচ্চ, নীচ, মিত্র শত্রু ভেদাভেদ ভুলিয়া পল্লীবাসী মুহূর্ত্ত মধ্যে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লইল। কাহাকেও বলিতে হইল না, কেহ কাহার আদেশের অপেক্ষা করিল না। পল্লী-রক্ষার জন্য, প্রাণ-রক্ষার জন্য ঐরাবতের বল স্বর্গ হইতে নামিয়া প্রত্যেক কর্ম্মীর হৃদয়ে প্রবেশ করিল। সমগ্র পল্লীর বিপদ, নিজের জন্য কিম্বা অপরের জন্য তাহারা সমবেত হইয়া কার্য্য করিতেছে তাহা তাহারা তৎকাল বুঝিতে পারে নাই। অন্যদিকে লক্ষ্য নাই, যে কোন উপায়ে পল্লীরক্ষা করিতে হইবে। দেখিলাম মানাপমান, 'ছুৎ'মার্গ, হিংসা, দ্বেষ দূরে চলিয়া গিয়াছে, খলতা কপটতা বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। রামা মুচী মাটি কাটিতেছে, হরনাথ ভট্টাচার্য্য সেই মাটি মস্তকে করিয়া বাঁধ বাধিতেছেন। আর দেখিলাম বাহুতে মত্ত হস্তীর বল। যে কাজ শত জনে এক ঘণ্টায় করিতে পারে, দেখিতে দেখিতে দশ জনে অর্দ্ধ ঘণ্টায় তাহার পরিসমাপ্তি করিয়া ফেলিল।

পল্লীবাসী বহুদলে বিভক্ত হইয়া পল্লীমধ্যে বন্যাপ্রবেশ-পথ রোধ করিল। বলুন দেখি তাহাদের বাহুতে এত শক্তি কে দিল? চকিতের মধ্যে, পলকের মধ্যে কোন্ শক্তিবলে পল্লীবাসী উচ্চ, নীচ ভেদ-জ্ঞান ভুলিয়া ভ্রাতৃভাবের সৃষ্টি করিয়া দিল। যেন যাদুমন্ত্রে হিংসা, দ্বেষ শূন্যে উড়িয়া গেল। এ প্রাণ, এ মন, এ শক্তি, এ পল্লীভক্তি, এ আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা পল্লীবাসীর হৃদয়ে কি যথার্থই আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছিল? ঐ সকল শক্তিবীজ মানব-হৃদয়ে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাদের সাড়া পাইতে হইলে ঐ রকম দামোদরের তাণ্ডব আবশ্যক হইবে।

দামোদরের বন্যা পল্লীবেষ্টনীর উপর প্রবল বেগে 'আছাড়িয়া' পড়িল। ভীষণ শব্দ, চতুর্দ্দিকে 'গেল গেল' শব্দ উঠিল। পুষ্করিণীর ভিতর বন্যা প্রবেশ করিল, পুষ্করিণীর ঘাট-পথে বন্যা গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিল। রাম ও যত্নর মধ্যে ভীষণ শত্রুতা ছিল, উভয়ে পল্লী-দলের নেতা—'গ্রাম্য দেবতা'! অথচ আজ তাহারা সে ভাব ভুলিয়া গিয়া পল্লীর রমণী-বালক-বৃদ্ধকে ছাদের উপর, কতক পুষ্করিণীর উন্নত পাগাড়ে লইয়া চলিল। সত্যকথা তাঁহারা তৎকালে রাম-লক্ষণের ন্যায় ভ্রাতৃ-ভাবে, কৃষ্ণার্জ্জুনের ন্যায় বন্ধুভাবে দৃঢ় হইয়া গিয়াছেন। কে তাঁহাদের কঠোর প্রাণ নিমেষে কোমল করিয়া দিল!

খোঁয়াড়ের মুনশী আবদ্ধ গোগুলিকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, কে কাহার গরু লইয়া পুষ্করিণীর পাগাড়ে উঠিতেছে তাহা আপনারা বলিতে পারিবেন না। তৎকালে সমগ্র পল্লীটি যেন একটি গৃহস্থের বাসভবন বলিয়া বোধ হইতেছে। পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমান যেন এক পরিবারভুক্ত হইয়াছেন। ধন্য দামোদর, তোমার কল্যাণে প্রত্যেক পল্লী অমরাবতী হইয়াছে! তুমি আবার ভাসাও, বন্যাপ্রভাবে সমগ্র ভারত প্লাবিত কর। ধরায় স্বর্গ নামিয়া আসিবে!

চতুর্দ্দিকে বন্যার প্রবাহ ছুটিয়াছে; ঘর, প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ধান্য, গৃহস্থালীর আবশ্যক দ্রব্য জলস্রোতে কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যা আসিয়া সেই ভীষণ দৃশ্য আপন ধূসর বাসে আচ্ছাদিত করিলেন।

পল্লীবাসিগণ উন্মুক্ত পুষ্করিণীর পাগাড়ে কোথাও বা একতল গৃহের উন্মুক্ত ছাদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মৃত্যুভয়ে, আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুভয়ে সাধারণের চিত্ত ব্যাকুলিত। পদতলে পার্শ্বে দামোদরের প্রবল প্রবাহ, উর্দ্ধে অন্ধকারের মত অন্ধকার মেঘে গগণ আচ্ছাদিত করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে প্রবল বায়ু ও মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

"মেঘে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার।
চিনিতে না পারি ভাই তনু আপনার ॥
ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুড় দুড় ॥
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল ॥
কলিঙ্গে উড়িয়া মেঘ করে ঘোরনাদ।
প্রলয় দেখিয়া প্রজা ভাবয়ে বিষাদ ॥"

"দুঃখিত কলিঙ্গ রায় হাতী ঘোড়া ভেসে যায়
অট্টালিকা উঠে রামাগণ।
মহলে প্রবেশে জল রহিতে নাহিক স্থল,
খাট পালঙ্গ ভাসে নানা ধন ॥"

বিপদ একাকী কখন আইসে না, সঙ্গে করিয়া তাহার সহচরগণকে লইয়া আইসে। সেই উন্মুক্ত পুষ্করিণীর পাগাড়ে রমণী ও শিশু, বৃদ্ধ ও পীড়িতের রক্ষার জন্য সকলে যে প্রকার ত্যাগবলের পরিচয় দিয়াছিল তাহা স্বর্গের পক্ষেও শোভা পাইয়া থাকে। কে পল্লীবাসীর হৃদয়ে অসীম ত্যাগবল প্রদান করিয়াছিলেন?

ধন্য কবি! ধন্য মুকুন্দরামের প্রতিভা! দামোদরপ্লাবনের চিত্রটি তিনি যেরূপ নিখুঁতভাবে অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, তেমনটি আর কে পারিবে? দামোদর, তুমি জনমে জনমে এই দৃশ্য দেখাইও! পল্লীগুলি স্বর্গের শোভায় পূর্ণ হইবে। ত্যাগ ও সেবাধর্ম্মে প্রচার হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ সরকার।

ওল-কচুর চাষ *

এমরফোফেলাস—AMORPHO-
PHALLUS—ওলকচু।
N. O. Aroideæ.

এই নামে নানাজাতি মূলজ উদ্ভিদ আছে। ইহাদের অধিকাংশই ওলকচুজাতীয় উদ্ভিদ। উদ্ভিদ্‌বেত্তাগণ ইহাদিগকেও কচুজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের স্বভাব ঠিক কচু (Arum) জাতির তুল্য নহে। কচুজাতীয় উদ্ভিদ মাত্রই আর্দ্রতা ও উত্তাপ-প্রিয়। ইহারা অতিশয় আর্দ্রতা-প্রিয় নহে। কিন্তু উত্তাপ-যুক্ত স্থানে বিশেষ স্ফূর্তিলাভ করে। তদ্ভিন্ন কচুজাতির সহিত ইহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য নাই। অধিকাংশ কচু-জাতিই বায়ব্যমূল (Aerial roots) বিশিষ্ট। কিন্তু ইহাদের মূল (শিকড়) তদ্রূপ নহে। বলিতে গেলে ইহারা গুচ্ছমূল (Fibrous-rooted) যুক্ত উদ্ভিদ। ইহাদের কোন কোন জাতি ছায়াতেও স্ফূর্তিলাভ করিয়া থাকে। ইহারা ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জঙ্গলী (wild) গাছের ন্যায় জন্মিয়া থাকে। ইহাদের চাষে বিশেষ যত্নের আবশ্যক হয় না। অধুনা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র লাভের বা সখের হিসাবে ইহাদের চাষ হইতেছে। শীতপ্রধান দেশে ইহাদের চাষে বিশেষ যত্নের আবশ্যক হয় ফার্ণহিটের তাপমান-যন্ত্রের ৫৫ হইতে ৮০ ডিগ্রি উত্তাপ-বিশিষ্ট স্থানই ইহাদের চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। সমুদ্রোপকূল হইতে ২০০০।৩০০০ হাজার ফুট উচ্চেও কোন কোন জাতির চাষ হইতে পারে। ইহাদের জন্মস্থান ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, সিংহল ও সুমাত্রা দ্বীপ। ইহাদের কোন কোন জাতির পাতা দেখিতে অতিশয় সুন্দর ও আশ্চর্য্যজনক। সখের অপেক্ষা লাভের জন্যই এদেশে ইহাদের কোন কোন জাতির চাষ হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে প্রায় সখের জন্যই ইহাদের চাষ হইয়া থাকে। কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপের সৃষ্টি করিয়া ঐ সকল দেশে সবুজ গৃহে ইহাদের চাষ হইয়া থাকে। কেবল সখের জন্যই ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী ইহার চাষের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। এ পোড়া দেশে লাভের জন্যও কেহ ইহাদের চাষে বিশেষ যত্নপর নহে। অথচ এদেশে বলিতে গেলে একরূপ বিনাব্যয়ে ইহাদের চাষ হইতে পারে। ইহাদের কোন কোন জাতি অধিক আর্দ্রতা সহ্য করিতে অক্ষম। কোন কোন জাতি আর্দ্র স্থানেও জন্মিয়া থাকে। ⅔ দোয়াশ মৃত্তিকার সহিত ⅓ ভাল পাতার সার মিশ্রিত করিয়া যে মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় উহাতে ইহাদের চাষ হয়। কেবল সখের চাষের জন্যই এরূপ মৃত্তিকার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। লাভের চাষের জন্য ইহাদের চাষের ব্যবস্থা স্বতন্ত্ররূপ। যথাস্থানে উহার বিবরণ লিখিত হইবে। গো-বিষ্ঠার সার ইহাদের চাষে অপকৃষ্ট সার।

ইহাদের যে সকল জাতি ছায়াপ্রিয়, সবুজ গৃহে উহাদের চাষ হইয়া থাকে। সবুজ গৃহ অভাবে অর্দ্ধছায়াযুক্ত স্থানই ইহাদের চাষের পক্ষে উপযোগী। পাত্রে ইহাদের কোন কোন জাতির চাষ হইতে পারে। পাতার,

* মৎপ্রণীত "উদ্ভিদের বিশ্বকোষে"র পাণ্ডুলেখ্য হইতে উদ্ধৃত।

কাণ্ডের ও ফুলের সৌন্দর্য্যের জন্য উদ্যানে বা সবুজ গৃহে কোন কোন জাতির চাষ হইয়া থাকে। কোন কোন জাতির কাণ্ড নানাবর্ণে চিত্রিত। উহারা দেখিতে অতিশয় সুন্দর। ইহাদের প্রকৃত কাণ্ড নাই। মূলই ইহাদের প্রকৃত কাণ্ড। এইজন্য ইহারা কন্দমূল বা কাণ্ডমূল উদ্ভিদ মধ্যে গণ্য। বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইহাদের মূল হইতে কাণ্ডসদৃশ একটী রসাল ও কোমল ডাঁটা বহির্গত হইয়া থাকে। উহার উপরেই পত্র সকল অবস্থিত থাকে। পত্রগুলি খণ্ডিত ও বহুভাগে বিভক্ত।

সাধারণতঃ মূলের গাত্রস্থ চক্ষু দ্বারা ইহাদের গাছ উৎপন্ন হয়। কোন কোন জাতির গাছ বীজ দ্বারাও উৎপন্ন হয়। আবার কোন কোন জাতির পত্রফলকের মেরুদণ্ড ও অস্থির উপরিভাগে মূলের আকারবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটী (nodule) উৎপন্ন হয়। ঐ সকল জাতির গাছ এই গুটী দ্বারাই উৎপন্ন হয়। খাস বীজ (seed proper) হইতে গাছ উৎপন্ন হওয়াই প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম। মূল, শাখা, কাণ্ড ও পার্শ্বাঙ্কুর দ্বারাও কোন কোন উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফুল হইতে ফল ও ফল হইতে বীজ উৎপন্ন হয়। বীজ হইতেই উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই বীজকেই খাস বীজ (seed proper) কহে। এই জাতীয় উদ্ভিদের ফুল হয়। কিন্তু কোন কোন জাতির ফুল হইতে বীজ উৎপন্ন হয় না। ইহাদের পত্র-ফলকের অস্থি ও মেরুদণ্ডের উপরে গুটীর ন্যায় যে মূল উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহারাই বীজের কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। এই বীজ হইতেই ইহাদের গাছ উৎপন্ন হয়। বিধাতার সৃষ্টি-রহস্য ভেদ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। বর্ষাকালেই পূর্ব্বোক্ত গুটী সকল পরিপক্ক হইলেই ভূপাতিত হয়। গ্রীষ্মকালের আরম্ভ মাত্রই ইহারা অঙ্কুরিত হইয়া নূতন গাছ উৎপন্ন করে। শীতকালে ইহাদের পাতা মরিয়া যায়। ইহাদের ফুল সৌন্দর্য্য সাধন ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজন সাধন করে না। ইহারা নানা জাতি, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী জাতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১। এমরফোফেলাস কেম্পানিউলেটাস্— Amorphophallus Campanulatus. *Syn.* Arum Campanulatus. Telinga Potato ওলকচু।

ইহাই আসল ওলকচু। ইহা রক্ত ও শ্বেতভেদে দ্বিবিধ। প্রথমজাতীয় ওলের মাংস রক্তাভ প্রবালবর্ণ ও দ্বিতীয়ের মাংস পীতাভ শ্বেতবর্ণ। এই দুই জাতির জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ইহা বঙ্গদেশের যথা তথা অযত্নে উৎপন্ন হয়। শীতকালে ইহাদের গাছ মরিয়া যায়। ইহাদের ডাঁটা ও পাতা পচিয়া ক্রমে শুষ্ক হইয়া গাছ মরিয়া যায়। গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইবার পর যখন প্রথম বৃষ্টিপাত হয়, তখন হইতেই ইহার মূল হইতে নূতন ডাঁটা ও পাতা বাহির হইতে থাকে। ইহার পাতা খণ্ডিত। প্রত্যেক খণ্ডের পার্শ্বদেশ সূক্ষ্মশিরাবৎ মাংসল সূত্র দ্বারা বেষ্টিত। ইহার কন্দমূল হইতে শিকড় বহির্গত হয় না, ডাঁটার পাদ-দেশ হইতে উহা বহির্গত হয়। এই সকল শিকড় সূত্রবৎ। গোছা গোছা হইয়া বহির্গত হয়। এই জন্য ইহাদিগকে গুচ্ছমূল বলা যাইতে পারে। উহারাই ভূমি হইতে রস ও খাদ্য সংগ্রহ করিয়া কন্দের, ডাঁটার ও পাতার পরিপুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। আসল মূলের (কন্দমূলের) রসশোষক শক্তি নাই। ইহার কাণ্ডাবরণ বা মূলের বাহ্যদেশ

শিয়ালী বা শিয়ালি-মিশ্রিত ধূসরবর্ণ। ইহার ডাঁটা কখন কখন ৪।৫ ফুট উচ্চ হয়। ডাঁটার উপরিভাগ বন্ধুর ও কণ্টকবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হুল * দ্বারা বেষ্টিত। স্থানে স্থানে সবুজ বর্ণের ফোটা থাকে। কাণ্ডের গাত্রাবরণ দেখিতে গিরগিটী নামক জন্তুর পৃষ্ঠদেশের ন্যায়। পত্র খণ্ডিত ও ছত্রাকার। ইহার কন্দ-মূলের উপরিভাগ হইতে ডাঁটা বা কৃত্রিম কাণ্ড বহির্গত হয়। ঐ ডাঁটাই পত্র ধারণ করিয়া থাকে। ডাঁটা মরিয়া গেলে উহার পাদদেশে (কন্দের উপরিভাগে) একটী গোলাকার গর্ত্তবৎ চক্ষু দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ গর্ত্তই ভাবী গাছের আধার। উহাতেই প্রচ্ছন্ন জীবনীশক্তি নিহিত থাকে, শীত ঋতুর শেষ ভাগ হইতে গ্রীষ্ম ঋতুর আরম্ভকাল পর্য্যন্ত ইহার মূলের বিশ্রাম সময়। উপরে গর্ত্তবৎ যে চক্ষুর কথা বলা হইয়াছে, উহা হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গাছের পাদদেশ হইতেই সূত্রবৎ শ্বেতবর্ণের গুচ্ছমূল বহির্গত হইয়া থাকে। উহারা কথিত চক্ষুর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ভূমিতে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহার স্কন্ধমূল স্বভাবতঃ গোলাকার; উপরি-ভাগ চেপ্টা (flat)। দৈব কারণে ইহারা অন্য আকারও ধারণ করিয়া থাকে। ইহার কন্দমূলের গাত্রে বহুসংখ্যক স্ফীত গুটীবৎ মূল উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে চক্ষু (eye or tuber) কহে। উহারা পাটলাভ ও শ্বেতবর্ণের। উহারাই ভাবী বংশ উৎপত্তি করে। ইহাদিগকে বীজমূল বলা যায়। ইহা হইতেই এই জাতির নূতন গাছ উৎপন্ন হয়। ইহার ফুল হয়। ফুল বৃহৎ; সবুজাভ বেগুনে বর্ণ, দেখিতে সুন্দর।

ইহার দেশীয় নাম ওলকচু। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ইহা "বাক" নামে পরি-চিত। ইহার ইংরাজী নাম টেলিঙ্গা পটেটু (Telinga Potato)। ইহার মূল বিলাতি টেলিঙ্গা পটেটু নামক উদ্ভিদের মূলের আকার বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। ইহার ল্যাটীন নাম এমোরফফেলাস্ কেম্পানি-উলেটাস্। সংস্কৃত নাম তুল্যকন্দ ও শূরণ।

"তুল্যকন্দ শূরণঞ্চ"।

বচনান্তর যথা:—"শূরণঃ কন্দ ওলশ্চ কন্দলোঽর্শঘ্ন ইত্যাপ।" অর্থাৎ ইহার নাম শূরণ, কন্দ, ওল ও অর্শঘ্ন।

দেশভেদে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। ইহাকে সিংহলে ফিডারণ; হিন্দুস্থানে শূরণ; আসামে ওলকচু; তৈলঙ্গে মঞ্চাকান্দা; তামিলে শূরণ ও শূর্ণা; মহারাষ্ট্রে পোড়াশূণ; গুজরাটে শূরণ ও পারস্য ভাষায় ওলকাছ। † ইহাই গ্রাম্য ওল।

ইহা অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কটুকষায় রস, কণ্ডু-কারক, বিষ্টম্ভী, রুচিকারক ও লঘু। ইহা কফ, অর্শ, প্লীহা ও গুল্মরোগবিনাশক। ইহা অর্শরোগের সুপথ্য। উভয় জাতির মূল বা কন্দ ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন বৈদ্যের মতে বন্য শূরণ বিশেষ উপকারী, গ্রাম্য শূরণ সুখাদ্য। ইহা শ্লীপদ, বল্মীক, গোদ, অর্ব্বুদ, মন্দাগ্নি, শূল ও দন্তশূল রোগেরও মহৌষধ।

নব্যমতে (ডাক্তারীমতে) ইহা পাচক, ও বলকারক। ইহা দ্বারা অর্শ, গ্রহণী ও দৌর্ব্বল্য রোগ নাশ হয়।

ইহার মূল সুখাদ্য। মূল রোপণের পরে ৭।৮ মাস মধ্যেই ইহা খাইবার উপযুক্ত হয়।

---

* অগ্রভাগ সরু ও পাদ-দেশ স্থূল এইরূপ কণ্টকবৎ পদার্থকে হুল বলা যায়।

† ওল গ্রাম্য ও বন্য ভেদে দ্বিবিধ।

২।৩ বৎসরের বা ততোধিক সময়ের পুরাতন ওল বৃহদাকার হয়। পুরাতন ওলই খাইতে অধিক সুস্বাদু। ওল সিদ্ধ করিয়া লবণ, তৈল ও মরিচ সংযোগে খাওয়া যায়। ইহা তরকারীতেও সুখাদ্য হয়। ওল সিদ্ধ করিয়া উহাকে হস্তদ্বারা গুলিয়া লইলে উহা অতিশয় কোমল হয়। ঐ কোমল শস্য সহিত লবণ ও সামান্য পরিমাণ লঙ্কার (মরিচ) গুড়া বা লঙ্কা বাটা মিশাইয়া তৈলে ভাজিয়া উহার বরা প্রস্তুত করিলে উহাও সুখাদ্য হয়। ইহার ডাঁটা ও কোমল (কচি) পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া তৎপর ব্যঞ্জনে ব্যবহার করা যায়। কেহ কেহ ওলকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ইহার শুঁঠ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই শুঁঠও ব্যঞ্জনে খাওয়া যায়। মূলজ সব্জী মধ্যে ওল বিশেষ উপকারী। কার্ত্তিক মাসেই সাধারণতঃ ওলের মূল সংগ্রহ করা হয়। এই সময়েই ইহা খাইতে সুস্বাদু হয়। এ সম্বন্ধে দেশ-প্রচলিত একটী কথা আছে। উহা এই—

"ভা'দ্রে তালের পিঠা, আশ্বিনে শশা মিঠা।
কার্ত্তিকে ওল, অঘ্রানে (অগ্রহায়ণ মাসে)
খলিসার ঝোল ॥
পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল (সর্ষপ তৈল।)
ফাল্গুনে গুড় আদা বেল ॥
চৈতে গিমা তিতা, বৈশাখে ঘৃত নালিতা।
জ্যৈষ্ঠে খই, আষাঢ়ে দই।
শ্রাবণে ঘোল পান্তা, তবে হয় শরীরের কান্তা ॥"

অর্থাৎ ভাদ্রমাসে তালের পিঠা (তালের রস, চাউলের গুড়া ও চিনি সংযোগে তৈলে ভাজিয়া ইহা প্রস্তুত হয়) সুস্বাদু হয়। আশ্বিন মাসে শশা মিষ্টাস্বাদ হয়। কার্ত্তিক মাসে ওল সুস্বাদু হয়। অঘ্রাণে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে খলিসা (অধিক কণ্টকযুক্ত মৎস্য বিশেষ)। মৎস্যের ঝোল সুস্বাদু হয়। পৌষ মাসে কাঞ্জি (পর্য্যুষিতান্নের অম্লজল।) সুস্বাদু হয়। ইহা দৈহিক উপকারও সাধন করিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত নাম কাঞ্জিক (কাঞ্জিক) বা কাঞ্জিকা।

"কাঞ্জিকং রোচনং রুচ্যং পাচনং বহ্নিদীপনং।" অর্থাৎ ইহা রোচক, আহারে রুচিজনক, পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক। পর্য্যুষিত অন্নকে কয়েকদিন জলে ভিজাইয়া পচাইলে উহা হইতে যে অম্লাস্বাদ জল প্রাপ্ত হওয়া যায় উহাই কাঞ্জি। কোন কোন দেশের লোকে ইহাকে অতিশয় প্রিয় বস্তু বলিয়া ভোজন করিয়া থাকে। মদ্রদেশীয় লোকেরা সকলই ত্যাগ করিতে সক্ষম, কিন্তু কাঞ্জির ব্যবহার ত্যাগ করিতে পারে না। মাঘ মাসে তেল অর্থাৎ সর্ষপ তৈল মিষ্টি হয়। ফাল্গুন মাসে গুড় (পাকাগুড়), আদা ও বেল সুস্বাদু হয়। চৈত্র মাসে গিমা নামক তিক্ত শাক খাইতে সুস্বাদু হয়। বৈশাখ মাসে ঘৃত ও নালিতা শাক (লাল পাট শাক—সাধারণতঃ পাট শাক) সুখাদ্য ও উপকারী হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে খই ও আষাঢ় মাসে দই (দধি) খাইতে সুস্বাদু হয়। শ্রাবণ মাসে ঘোল ও পান্তা (পান্তা ভাত) সুস্বাদু ও উপকারী হয়। দুগ্ধের সর বাটিয়া উহা মন্থন করিলে উহা হইতে নবনীতের অর্থাৎ মাখনের ভাগ উঠাইয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ঘোল বা তক্র। দধি মন্থন করিয়াও এই দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্ব দিনের পর্য্যুষিত অন্নে জল দিয়া রাখিলে পরের দিন উহাকে পান্তা ভাত বলা যায়। ঘোল ও পান্তা ভাত শ্রাবণ মাসে ভক্ষণে শরীরের কান্তা অর্থাৎ কান্তি বৃদ্ধি হয়। ঋতু ও তিথি-ভেদে কোন কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে দেহের উপকার

সাধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রব্য সকল মধ্যেও কোন কোনটী ঐ সকল সময়ে ব্যবহার করিলে দৈহিক উপকার সাধিত হয়।

ওলের চাষে বিশেষ লাভও আছে। এক বিঘা জমিতে ওলের চাষ করিলে প্রতি বৎসর ন্যূনকল্পে ১০০৲ টাকা লাভ হইতে পারে। অথচ ইহার চাষে বিশেষ যত্ন বা অর্থ-ব্যয়ের আবশ্যক হয় না। যে ভূমিতে ওলের চাষ করিবে, উহাকে মাঘ-ফাল্গুণ মাসে কোদালী দ্বারা উত্তমরূপে কোবাইয়া দিবে। তৎপর উহাতে পাতার সার অভাবে সামান্য পরিমাণ পুরাতন গো-বিষ্ঠার সার, ও গো-বিষ্ঠার বা কাষ্ঠ-ভস্মের ছাই ছড়াইয়া দিবে। ওল-ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অতিশয় হাল্‌কা হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে ওলের মূল সত্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ওল-ক্ষেত্র কোদাল দ্বারা কোবাইবার পরে যে সকল ঢিলা উৎপন্ন হইবে উহা শুষ্ক হইলে মুগুর দ্বারা উহাদিগকে পিটাইয়া ভাঙ্গিয়া দিবে। তৎপর পুনঃ পুনঃ চাষ ও মই দিয়া মৃত্তিকাকে ধূলিবৎ করিবে। পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকা উলট পালট্ করিবার পরে যখন উহা কোমল হইবে তখন উহাতে মূল রোপণ করিবে। যে স্থানে বর্ষার জল না দাঁড়ায় এইরূপ স্থানই ওলের চাষের পক্ষে উপযোগী। উচ্চ ভিটি-জমিই ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দোয়াশ মৃত্তিকাতেই সুবিধামত ইহার চাষ হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে একহাত অন্তর অন্তর সারি করিয়া মূল রোপণ করিবে। প্রত্যেক সারিতে একহাত অন্তর অন্তর একটি মূল রোপণ করিবে। মূলের আকারানুসারে ৪ হইতে ৬ ইঞ্চি মৃত্তিকার নীচে মূল রোপণ করিবে। ১৫।২০ দিনেই উপর হইতে গাছ বাহির হইবে। গাছ বাহির হওয়ার পরে উহারা যখন অর্দ্ধহাত পরিমাণ উচ্চ হইবে তখন উহার গোড়া ৪।৫ ইঞ্চি মৃত্তিকা দ্বারা বাঁধিয়া বেদীর ন্যায় উচ্চ করিবে। পরে সময় সময় উহার গোড়ার মৃত্তিকা খুরকি বা পাসন দ্বারা আলগা করিয়া দিয়া জঙ্গল ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া দিবে। গাছ অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উহার ডাঁটা সামান্য পরিমাণে মোচ্‌ড়াইয়া দিয়া উহার বৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইবে। কেননা পাতার ও ডাঁটার বৃদ্ধি হইলে মূল-বৃদ্ধির ব্যাঘাত হইবে। ইহা ভিন্ন ইহার আর অন্য কোন পাইট নাই। ওল গাছের গোড়ার মৃত্তিকা আলগা থাকিলেই উহার মূল সত্বরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

একবিঘা জমিতে ৬৫৬১টী মূল রোপণ করা যাইতে পারে। রোপণের ৬।৭ মাস পরেই ইহার মূল ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। প্রত্যেকটী মূল তখন ৴০ এক আনা হইতে ৵০ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। গড়ে প্রত্যেকটী মূল এক আনা মূল্যে বিক্রয় করিলে একবিঘা জমিতে ৪১০৴০ উৎপন্ন হইতে পারে। উক্ত মূল মধ্যে সকলই একই সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিক্রয়োপযোগী হয় না। ইহার মূল বৃদ্ধির কার্য্যকে এদেশে "ওলান" কহে। প্রথম বৎসরে অর্দ্ধেক সংখ্যক মূল ওলাইলেও $৬৫৬১ \times \frac{১}{২} = ৩২৮০$টী বিক্রয়োপযোগী মূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার প্রত্যেকটী গড়ে এক আনা মূল্যে বিক্রয় করিলেও এক বিঘায় উৎপন্ন ২০৫৲ টাকা হয়। নিম্নের হিসাব মত উহা হইতে চাষের ব্যয় ১০৪।০ বাদ দিলেও ১০০৷০ লাভ হয়।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

সঙ্করজাতি ও তাহার বন্ধ্যতা

[আমাদের উচ্চশিক্ষিতগণের একটা ভুল বিশ্বাস আছে যে, আধুনিক 'প্রাণ-বিজ্ঞানে'র (Biology) কতকগুলি নিয়ম ভারতীয় সমাজ-জীবনের আলোচনায় প্রয়োগ করিতে পারিলেই চূড়ান্ত 'বৈজ্ঞানিকতা'র পরিচয় দেওয়া হইল। যেন এই উপায়েই হিন্দুর সমাজ-তত্ত্ব, জাতি-তত্ত্ব, বংশ-তত্ত্ব সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হইয়া গেল!

পাঠকগণের নিকট আমাদের নিবেদন—(১) নব্য প্রাণ-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি সবই সর্ব্ববাদি-সম্মত নয়। কোন একখানা পাশ্চাত্য মৌলিক গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, প্রায় প্রত্যেক মতেরই স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি-তর্ক আছে। পরবর্ত্তী লেখকেরা নিজ নিজ রুচি অনুসারে সেই সমুদয় তর্ক-জাল হইতে মত বাছিয়া লয়েন। (২) প্রাণ-বিজ্ঞানের নিয়ম সমাজ-তত্ত্বের (Sociology) আলোচনায় প্রয়োগ করিতে যাইয়া পণ্ডিতেরা "নানা মুনির নানা মত" প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং কোন বাঙ্গালী লেখকের রচনায় সমাজ-বিজ্ঞানের আড়ম্বর দেখিয়া বেশী চমকাইয়া যাইবেন না, অথবা তাঁহার প্রচারিত মতগুলিকেই 'বিজ্ঞান-সম্মত' মনে করিয়া মাথায় তুলিতে বসিবেন না। (৩) ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে অতি অল্প তথ্যই ঐতিহাসিক ভাবে নির্ণীত হইয়াছে। এস্থলে প্রাণ-বিজ্ঞানের দুই চারিটা 'বুকনি' লাগাইতে পারিলেই যথার্থ, বিজ্ঞান-সম্মত, নিরপেক্ষ মত প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আমাদের যে লেখকের যতখানি বিদ্যার দৌড়, তিনি ততখানি আমাদিগকে শিক্ষিত করিতেছেন, এই রূপই মনে করা উচিত। এই লেখার জন্যই তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের পক্ষপাতী বা বিরোধী বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

সমাজ-বিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান, রক্ত-মিশ্রণ, আবেষ্টন বা বিশ্বশক্তি (Environment), বংশতত্ত্ব (Heredity) ইত্যাদি বিষয়ক বাঙ্গালা প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে আপনারা মত গঠন করিতে অভ্যস্ত হইবেন। আমরা এই সকল বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও বহু আলোচনা করিব।]

প্রাচীনকালের প্রাণবিজ্ঞানবিদ্‌গণের ধারণা ছিল যে, সঙ্করজাতিরা সন্তানোৎপাদনে সম্পূর্ণ অপারগ। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা কুলীনজাতি সমূহের কুলীনত্ব প্রতি-পাদনের নিমিত্ত তদুৎপন্ন সঙ্কর-সন্ততিদিগের বন্ধ্যতাকেই মানদণ্ডস্বরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, কোনও এক জাতীয় বিভিন্ন বর্ণের জন্তুসমূহের মধ্যে বাহ্যতঃ যতই প্রভেদ থাকুক না কেন, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সঙ্গম দ্বারা সন্তানোৎপন্ন হয়, এবং তজ্জাত বর্ণসঙ্করেরাও স্ববর্ণে সঙ্গম সংযোগে বংশবৃদ্ধি করিতে ও তাহার কুলীনত্ব সংস্থাপন করিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাহ্যসাদৃশ্য বর্ত্তমান্ থাকা সত্ত্বেও তাহাদের সহবাস বন্ধ্যতায় পরিণত হয়। যদি কোনও দুই জাতির সঙ্গমের ফলে বন্ধ্যতা না হইয়া তাহা হইতে সন্তান জন্ম পরিগ্রহ করে এবং জাতিসঙ্করগণও যদি স্বজাতিসঙ্গমে বংশবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে এই মূলজাতিদ্বয় জাতিপদবাচ্য হইতে পারে না, ইহারা দুই বিভিন্ন বর্ণান্তর্গত। বর্ণসম্বন্ধে ঠিক ইহার বিপরীত কথা বলা যাইতে পারে। যদি এমন দেখা যায় যে কোনও দুই বর্ণান্তর্গত জন্তুসকল পরস্পরের সহিত সঙ্গম সাধন করিয়া সন্তান-জননে অক্ষম, অথবা যদি

কোন দুই বর্ণপ্রসূত সঙ্করসমূহ স্ববর্ণসংযোগে বংশবৃদ্ধি করিতে না পারে তাহা হইলে মূলবর্ণগণ প্রকৃত বর্ণ নহে, উহারা জাতি।

তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাই যে, অনেক স্থলেই আধুনিক প্রাণবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগানুযায়ী প্রকৃত জাতি বর্ণ, ও প্রকৃত বর্ণ জাতিরূপে বিবেচিত হইত। আধুনিক শ্রেণিবিভাগে নিম্নলিখিতরূপ জাতিতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। অধ্যাপক টম্‌সন্ বলেন, "জাতিসম্বন্ধে জ্ঞানটা সর্ব্বসম্মতিক্রমে তুলনামূলক; যখন আমরা কোনও একদলের কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্যসম্পন্ন কতিপয় সংখ্যক একককে একটী ক্ষুদ্র গণ্ডীর দ্বারা পরিবেষ্টন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, তখনই সুবিধার অনুরোধে এই পরিভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি। জাতি-শব্দটা প্রায়শঃ কেবলমাত্র অতীব নৈকট্য-সম্পন্ন জীবমণ্ডলীর অংশ-প্রকাশক। এতদ-সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা ফলিত-তথ্যমূলক; এবং বাহেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য ক্রম-পরিবর্ত্তন সহকারে বিভিন্ন প্রকারের বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া এক জাতি হইতে নূতন জাতির অভিব্যক্তি বশতঃ কোন জাতিরই লক্ষণসমূহ কল্পান্তস্থায়ী নহে। এই জন্য ইহা স্বীকার করিতে হইবেই যে, চরিত্রবন্ধন আমাদিগেরই কৌশল মাত্র, এবং এক এক জাতির অন্তর্গত একক-গণের বর্ণনির্ণয়ের বিচিত্রতা সেই জাতিসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। অনেক সময় এরূপও ঘটিয়া থাকে যে, আমাদের অজ্ঞানতা-নিবন্ধন কোন কোন জাতির নামকরণ গগনস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তবুও ইহা সুবিধাজনক।"

পূর্ব্বকালের মতবাদ জাতিসমূহের স্থিরতানুমোদক। এই মতবাদক্রমে জাতি ও বর্ণ একেবারে বিভিন্ন পদার্থ; সুতরাং উৎপত্তির ধারাটাও সম্পূর্ণ পৃথক কিন্তু আধুনিক কোনই প্রাণবিজ্ঞানবিৎ লিনিয়াসের মতের পরিপোষক নহেন। কেহই জাতীয় চরিত্রের স্থিরতা স্বীকার করেন না। এখন ছাত্রেরা শিক্ষা করে এক জাতি অপর জাতিতে পরিণত হয়, আবার পক্ষান্তরে আমরা ইহাও বলিয়া থাকি যে, যে গুণ-রাশিকে মানদণ্ডস্বরূপ ব্যবহার করিয়া প্রাণবিজ্ঞানে শ্রেণিবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারা চঞ্চলপ্রকৃতিবিশিষ্ট; কিন্তু সে চাঞ্চল্য অতীন্দ্রিয়। যুগযুগান্তরের চরিত্র-চাঞ্চল্যের সমষ্টিই অনুভূতিসাপেক্ষ। তখনই বৈজ্ঞানিকের চক্ষুসমক্ষে এক নূতন জাতি উদীয়মান হয়।

প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আরও কতকগুলি সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

সঙ্করতা-সাধন—শ্রেণিবিভাগানুমোদিত দুই বিভিন্ন গণ্ডীর অন্তর্গত একক সমূহের মধ্যে সঙ্গম-সাধনের নাম "সঙ্করতা-সাধন"। এতদুৎপন্ন সন্তানগণ 'সঙ্কর' আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে, সঙ্করের পিতামাতা বিভিন্ন 'জিনাসে'র, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন উপজাতির ও বিভিন্ন বর্ণের হইতে পারে। পারি-ভাষিক ভাবে বলিতে গেলে, দুই পৃথক জাতি-সম্ভূত শঙ্করকে আমরা 'জাতিশঙ্কর' বলিব; এবং ভিন্নবর্ণাত্মক পিতামাতা-সম্ভূত সঙ্করকে 'বর্ণ-সঙ্কর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। সজ্যোদ্বর্ত্তন,—কোনও গণ্ডীবিশেষের একক-সমষ্টির উদ্বর্ত্তন, অর্থাৎ প্রত্যেক এককের উদ্বর্ত্তনের সমবায়।

এক্ষণে আলোচ্য বিষয়ের একটী সার মর্ম্ম প্রদান করা হইল—

১। জাতি সমূহের সঙ্করতাসাধন; ইহার ফল।
২। বর্ণ সমূহের মধ্যে সঙ্করতাসাধন; ইহার ফল।
৩। ঐরূপ ফলোৎপত্তির কারণ;
৪। সঙ্গোদ্বর্ত্তনে ঐ ফলরাশির ক্রিয়া;
৫। বন্ধ্যতার ক্রিয়া বত্তার কৌশল।

ক। জাতিসমূহের সঙ্করতাসাধন; ইহার ফল

ডারুউইন্ উল্লেখ করিয়াছেন "খাঁটি জাতি-সমূহের ও তাহাদিগের সঙ্কর-সন্ততিগণের বন্ধ্যতা বিকাশের তারতম্যে অসংখ্য ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্রম শূন্য হইতে সম্পূর্ণ উর্ব্বরতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।" এই ঘটনাবলী তিনি তাঁহার "The different forms in plants of the same species" নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

ওয়ালেস্ এ সম্বন্ধে কতিপয় উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি এস্থলে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ গৃহপালিত রাজহংস (য়্যান্সার্ ফার্ণস্) ও চীনা রাজ হংস (য়্যাঃ সিগ্নইডিস্) একই 'জিনাসে'র-দুই পৃথক জাতি। ইহারা এত পৃথক যে কোনও কোনও প্রাণিবিজ্ঞানবিৎ ইহাদিগকে দুই ভিন্ন জিনাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করেন। তবুও ইহাদের মধ্যে সঙ্গমসাধন সম্ভবপর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঈটন্ এই দুই জাতীয় পিতা-মাতা হইতে একই প্রসবে আটটী ছানা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে ডারউইন্ এক জোড়া সঙ্কর হইতে সুন্দর সুন্দর শাবকোৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্লিথ ও ক্যাপ্টেন্ য়্যান্টন বলেন যে, ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই এই জাতি-সঙ্কর-দিগকে রক্ষা করা হইয়া থাকে। এই সকল স্থানে মূলজাতির নাম-গন্ধও নাই। কেবলমাত্র সঙ্করদিগেরই ব্যবসায় করা হয়।

ভারতবর্ষের ককুদবিশিষ্ট ও সাধারণ গোজাতির বিষয়ও কম রহস্যজনক নহে। ইহারা বাহ্য আকৃতি-প্রকৃতিতে বিভিন্ন-ভাবাপন্ন তো বটেই, তদ্ব্যতীত অস্থিসংযোজন ও অঙ্গসংস্থান বিষয়েও ইহাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। সুতরাং ইহারা যে কোন কালেই নৈকট্যবিশিষ্ট নয়, তাহা সন্দেহাতীত। তথাপি এই দম্পতী সন্তান-প্রসূ। ডারুউইনের অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, ইহাদের জাতিসঙ্করেরাও স্বজাতি-সঙ্গম দ্বারা কুলীন-বংশ সংস্থাপনে সমর্থ।

কুকুরের সহিত নেকড়া ও শিয়ালের সঙ্গমজাত সঙ্করেরাও বংশকৌলীন্য রক্ষা করিতে সম্পূর্ণই পারগ,—এরূপ উদাহরণ বিরল নহে।

তাহা হইলেই প্রতীয়মান হইতেছে, বিভিন্ন জাতির সঙ্গম যে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ্যতা-মূলক তাহা ভ্রান্তিযুক্ত। উদ্ভিদ্‌জগতে দৃষ্টিপাত করিলে উল্লিখিত উদাহরণরাশির মত ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদিগের নয়ন গোচর হয়। ডিন্ হার্বার্ট বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্ লইয়া অতীব সুকৌশল ও সাবধানতার সহিত বহুসংখ্যক পরীক্ষা সম্পাদন করেন, তিনি ক্রিনাম্ ক্যাপেন্‌স্ জাতীয় উদ্ভিদের গর্ভকেশরে একাশয়ে ক্রিঃ পিডাঙ্কুলেটাম্, ক্রিঃ ক্যানালিকুলেটাম্ ও ক্রিঃ জেফিক্যাম্ জাতির রেণু সেচন করেন। ফলে জাতি-সঙ্করের উৎপত্তি তো হইয়াছিলই, তদ্ব্যতীত সঙ্করগণ বর্ণকৌলীন্যও প্রতিস্থাপন করিয়াছিল।

খ। বর্ণসমূহের মধ্যে সঙ্করতাসাধন; ইহার ফল

উর্ব্বর জাতি-সঙ্করের তুলনায় উর্ব্বর

বর্ণসঙ্করের সংখ্যা অধিক, এবং তাহাদের উর্ব্বরতা-শক্তিও অধিকতর বলবতী। এমন কি, সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, বর্ণ-সঙ্করের মধ্যে বন্ধ্যাতা অতি বিরল। এ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত গেট্নার্ কতকগুলি সুপরীক্ষিত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, যদ্দ্বারা বর্ণসঙ্করক্ষেত্রে বন্ধ্যাতার আভাস পাওয়া যায়। ইহার পরীক্ষাগুলি উদ্ভিদ-সম্বন্ধীয়। এক জাতীয় বর্ণ-সঙ্কর সম্পূর্ণরূপেই বন্ধ্যাতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। জন্তু-জগতে কিন্তু এ যাবৎ ইত্যাকার দৃষ্টান্তের আভাস পাওয়া যায় নাই। এ সম্বন্ধে প্রাণি-বিজ্ঞানে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার সংখ্যা অতি সামান্য। সুতরাং তৎপ্রসূত ফলের উপর নির্ভর করিয়া কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচিন নহে। এক্ষণে আমরা সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি যে "খাঁটি জাতিসমূহের ও তাহাদের সঙ্কর-সন্ততিগণের বন্ধ্যাতা-বিকাশের তারতম্যে অসংখ্য ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্রম শূন্য হইতে পরিপূর্ণ উর্ব্বরতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।"

গ। ঐরূপ ফলোৎপত্তির কারণ

বহু নৈসর্গিক ও দৈহিক ঘটনাবলীর বিচিত্র সমাবেশে জীবদেহ হত-প্রতিহত হইয়া তাহার সন্তানপ্রসূ শক্তিকে নিত্যই নূতন সাজে সজ্জিত করিতেছে। বন্ধ্যাতা-উৎপত্তির তথ্য সংগ্রহ করিতে যাইয়া পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত কারণত্রয়কে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বিবেচনা করেন—

(১) জননেন্দ্রিয়ের সংস্কার গ্রহণ বা সাড়াপ্রদান যোগ্যতা;
(২) শারীর সংস্থান ও বর্ণ বৈচিত্র্যের পারস্পারিক নির্ভরতা,
(৩) দৈহিক নির্ব্বাচন।

(১) জননেন্দ্রিয়ের সংস্কার গ্রহণ বা সাড়া-প্রদান যোগ্যতা,—হাতী, খেঁকশিয়াল, ইন্দুর, খরগোস, কাঠবিড়াল ইত্যাদি রোডেন্ট্ বা 'দন্তুর' পরিবারের জন্তু, ও নানাজাতীয় পক্ষী গৃহপালিতাবস্থায় যে বন্ধ্য হইয়া পড়ে তাহা সর্ব্বজন বিদিত। উদ্ভিদ্-জগতেও এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই জনন-শক্তির পরিবর্ত্তনের জন্য পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিক ব্যতীত আর কে দায়ী? এই উপলক্ষ্যে ডার্উইন্ বলেন "একই উদ্যানের মধ্যে স্থানপরিবর্ত্তনবশতঃ উক্তরূপ ফললাভ ঘটিয়া থাকে।"

(২) শারীর-সংস্থান ও বর্ণ-বৈচিত্র্যের পারস্পারিক নির্ভরতা—শ্রীযুক্ত টেগেট্মাইএর্ ডার্উইনের নিকট কতকগুলি ঘটনার বিবরণ প্রেরণ করেন। শারীরসংস্থান ও দৈহিক বর্ণ এতদুভয়ের মধ্যে যে বিশিষ্ট সম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহার সত্যতার প্রমাণ এই বিবরণসমূহ হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। জন্তু ও উদ্ভিদ উভয়ের মধ্যেই প্রত্যেক জন্তু ও উদ্ভিদকে তুল্যরূপ খাদ্য প্রদান করায় উহাদের মধ্যে নানারূপ শারীরিক দুর্ঘটন ঘটিতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ খাদ্য-গ্রহণের ফল প্রত্যেক জন্তুও উদ্ভিদের বর্ণের উপর নির্ভর করে। যখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, একই খাদ্য বর্ণের বিচিত্রতানুসারে ভক্ষকের উপর আধিপত্য বিস্তার করে; এবং পূর্ব্বসন্দর্ভে যখন জননেন্দ্রিয়ের সংস্কারগ্রহণ-যোগ্যতা প্রমাণিত হইয়াছে তখন নিঃসন্দেহে শারীর-সংস্থান ও বর্ণবৈচিত্র্যের পারস্পারিক নির্ভরতাকে বন্ধ্যাত্বোৎপাদনের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বন্ধ্যাতা দৈহিক পরিবর্ত্তনের ফলস্বরূপ তো বটেই, অধিকন্তু এরূপ দৃষ্টান্তও

লিপিবদ্ধ হইয়াছে যদ্দ্বারা বন্ধ্যতাকে প্রয়োজিত পদার্থের প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া প্রমাণিত করা যাইতে পারে। এই প্রত্যক্ষ ফলরাশিও বর্ণানুসারে বিকশিত হয়।

(৩) দৈহিক নির্ব্বাচন,—'নির্ব্বাচনিক বন্ধ্যতা' নামক ব্যাপারের সম্যক আলোচনা দ্বারা বৈজ্ঞানিক রোমেনেস্ 'দৈহিক নির্ব্বাচন'-সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কোনও একটী জন্তু স্বজাতীয় অপর জন্তুর সঙ্গমে সুসন্তান প্রসব করে; কিন্তু সেই প্রসূতিই তজ্জাতীয় অন্যতম জন্তুর সহিত সঙ্গমে পূর্ণমাত্রায় বন্ধ্যা। এই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারটীর প্রতি রোমেনেস্ বৈজ্ঞানিকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ঘ। সজ্ঞোদ্বর্ত্তনে এই ফলরাশির ক্রিয়া

এ পর্য্যন্ত আমরা কেবলমাত্র কি প্রকারে কোন জাতি ও বর্ণের একক বা ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে বন্ধ্যতার উৎপত্তি হইতে পারে তাহারই আলোচনা করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে দেখা যা'ক অপর জাতির সংযোগে কোনও জাতির ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অথবা জাতিসঙ্করদিগের মধ্যে একবার বন্ধ্যতার বীজ রোপিত হইলে তাহা কেমন করিয়া সমগ্র মূলজাতির উপর প্রভাব বিস্তার করে, এবং কি প্রকারেই বা তদ্দ্বারা বিবর্ত্তন বা অভি-ব্যক্তিমার্গে সেই সেই জাতির ইষ্টানিষ্ট সাধিত হয়।

উল্লিখিত কারণসমূহদ্বারা অর্থাৎ জন্তুদিগের ব্যবহারিক ও দৈহিক পরাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জননশক্তিরও পরাবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এখন এই পরাবর্ত্তন যদি কোন এক ব্যক্তিবিশেষে নিরপেক্ষভাবে উদিত হয়, এবং অন্যান্য বহুবিধ সাময়িক পরাবর্ত্তনের ন্যায় সমগ্র জাতির ইষ্টানিষ্টের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই না থাকে, তাহা হইলে এরূপ পরাবর্ত্তনের সহিত, অর্থাৎ বন্ধ্যতার সহিত, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনেরও কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। এই শ্রেণীর বন্ধ্যতার আদান্ত ও কার্য্যকারিতা কেবলমাত্র ব্যক্তি-গত জীবনেই আবদ্ধ। কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, বিভিন্নজাতির বন্ধ্য-সঙ্গম সেই সেই জাতির উদ্বর্ত্তনের সহায়। যে যে জাতির সঙ্গম বন্ধ্য, সেই সেই জাতি উর্ব্বরসঙ্গম জাতিসমূহ অপেক্ষা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনক্ষেত্রে যোগ্যতর। এ সম্বন্ধে ওয়ালেসের সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ হইল।

(১) ধরা যা'ক কোন একটী জাতি পরাবর্ত্তনপ্রভাবে দুইটী বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। এ দুই বর্ণের প্রত্যেকেই বর্ত্তমান পারি-পার্শ্বিকের কোন কোন বিষয়ে মূল জাতি অপেক্ষা যোগ্যতর, সুতরাং ইহাদের প্রভাবে মূল জাতি টিকিতে পারিবে না।

(২) এই দুই সমগুণশালী বর্ণ একই স্থানে বাস করিয়াও যদি পরস্পরের সহিত সঙ্গমপরায়ণ না হয়, তাহা হইলে নির্ব্বাচন-প্রভাবে প্রত্যেকে আরও অধিকতর আবশ্যক পরাবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া অতি নৈকট্যযুক্ত দুইটী পৃথক জাতিতে পরিণত হইবে।

(৩) কিন্তু ঐ দুই বর্ণ যদি নির্ব্বিবাদে সঙ্গম-পরায়ণ হয় ও বর্ণসঙ্কর প্রসব করে, এবং এই বর্ণসঙ্করেরাও যদি স্ববর্ণ-সঙ্গমে সন্তানোৎ-পাদন করে, তাহা হইলে ঐ বর্ণদ্বয়ের নূতন জাতিতে পরিণতি বাধা প্রাপ্ত হইবে; যে হেতু বর্ণসঙ্করেরা ঐ উভয় বর্ণজাত কুলীন-সন্ততি অপেক্ষা পারিপার্শ্বিকান্তর্গত অবস্থা

সমূহে অল্প যোগ্য হইলেও তাহাদের মিশ্রজন্ম-বশতঃ কুলীন সন্তানাপেক্ষা অধিকতর দুর্দ্ধর্ষ।

(৪) এক্ষণে বর্ণসঙ্করগণের কিয়দংশও যেন পিতৃমাতৃ জীবনের বা অপর কোন প্রভাবে ন্যূনাধিক বন্ধ্যাতা প্রাপ্ত হইল।

(৫) এরূপ স্থলে সঙ্করবংশ কুলীনবংশদ্বয়ের মত বৃদ্ধিশীল হইবে না, এবং পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয়ে বর্ণদ্বয়ের অধিকতর যোগ্যতা নিবন্ধন ইহারা সত্বরেই সঙ্কর-গণাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হইয়া পড়িবে। এই প্রকার অবিরত জীবন-সংগ্রামের দ্বারা তাহারা কতিপয় পুরুষের মধ্যেই বর্ণসঙ্কর-গণের লোপসাধন করিবে।

(৬) পক্ষান্তরে উক্ত বর্ণদ্বয়ের বাসস্থানের যে অংশে উহাদিগের মধ্যে অবাধে সঙ্গমসাধন হইতে থাকে, তথায় নানাবিধ পরাবর্ত্তন-সংযুক্ত বর্ণসঙ্করদিগের উৎপত্তি হইবে। ক্রমে ক্রমে ইহাদের সংখ্যা মূলজাতীয় এককগণের অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং বিভিন্ন বর্ণে অবাধ সঙ্গম দ্বারা উহাদের পাট চিরকাল তরে উল্টাইয়া যাইবে।

(৭) তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে একই জাতীয় দুই বিভিন্ন বর্ণের বাসস্থানের একাংশে সামান্য বন্ধ্যাতালক্ষণ প্রকাশ পাইলেই শেষ পর্য্যন্ত ঐ অংশের অধিকাংশ এককই কুলীন-বংশের প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারিবে। অপরাংশে কুলীনসংখ্যা নগণ্য। রোমেনেসের মতানুসারে এই ব্যাপারটীকে প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, যাহাদিগের মধ্যে দৈহিক পরাবর্ত্তন প্রকাশ পাইবে তাহারা এই পরাবর্ত্তনবিহীন এককগণকে জীবন-যুদ্ধে পরাজিত করিবে।

(৮) জীবন-যুদ্ধ যখন অতীব তীব্র হইয়া উঠে, তখন যোগ্যগুণবান্ বর্ণ অপর-গুলিকে সম্পূর্ণরূপেই নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। সুতরাং যে সকল বর্ণ অপরবর্ণের সঙ্গমে বন্ধ্যা, তাহারাই প্রকৃতি-নির্ব্বাচিত হইবে, ও একমাত্র তাহারাই অধিষ্ঠান লাভ করিবে।

(৯) বর্ণবিহীন জাতিতেও উল্লিখিত নিয়মসমূহ প্রযোজ্য।

৬। ক্রিয়াবত্তার কৌশল

বন্ধ্যতা প্রকাশকালে জননেন্দ্রিয়ে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে এবং শুক্রকোষ ও গর্ভকোষের কোন্ বিশেষ অবস্থার উপর উহার ক্রিয়াবত্তা নির্ভর করে সম্প্রতি তাহারই আলোচনা করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। উইস্‌কন্‌সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গায়ার্ সঙ্করপারাবতের ও ক্যানানামক একজাতীয় শ্বেতসার-বহুল উদ্ভিদের সঙ্করের শুক্রপুষ্টি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি উভয় স্থলেই কতকগুলি অনৈসর্গিক সংঘটন লক্ষ্য করেন; এবং ইহাদিগকে উভয়ক্ষেত্রেই তুল্যরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি অঘটনগুলিকে নিম্নলিখিত তিনটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ;—

(১) জনন-কোষের পঙ্গুতা; সুতরাং (২) কোষ-সংবিভাগে অস্বাভাবিকতা; (৩) শুক্র-কোষের দৈহিকবিকৃতি।

বিষয়টীকে সুচারুরূপে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত তাঁহার স্বলিখিত বিবরণ হইতে নিম্ন-লিখিত অংশটী উদ্ধৃত করা হইল। "বন্ধ্য সঙ্করগণের শুক্রকোষে সুস্পষ্টভাবে পঙ্গুতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শুক্রকোষের মুণ্ডের মধ্যস্থলে উন্নত ব্রণটীই রহস্যময় দৃশ্য। বস্তুতঃ এই উন্নতাংশটী ব্রণ বা মস্তকের স্ফীত দৈহিক কলা নহে; মস্তকের সম্যক পুষ্টির অভাবেই ঐ স্থানটী বর্ত্তুলবৎ প্রতীয়মান্ হইতেছিল।

স্বাভাবিক শুক্রপুষ্টির তুলনায় কোষ-কেন্দ্র ও সম্যক্ পুষ্টিলাভ করে নাই।"

শেষতঃ অধ্যাপক ক্যানন্ লিখিত "Studies in plant hybrids" নামক প্রবন্ধের একটী প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া উদ্ভিদ্‌জগত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। "সাধারণ ভাবে সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলনসূত্রে আমি বলিতে পারি যে, সঙ্কর-কার্পাসের পরাগকোষে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উভয় অবস্থারই সমাবেশ চক্ষুগোচর হয়। * * কোষ পুষ্টিসংক্রান্ত কোষ-সংবিভাগকালে কোষকেন্দ্রে অনেকানেক বিকৃতি লক্ষিত হইয়াছিল। এই কোষকেন্দ্র বিভক্ত না হইয়া প্রনষ্ট হইয়া যায়। * * এইরূপ অনৈসর্গিকতার মধ্যে এমন কতকগুলি পরাগমাতৃকোষ দৃষ্ট হইয়াছিল যাহার কোষকেন্দ্রে দুইটী সংবিভাগ-রেখাগুচ্ছ ও দৈহিককোষের মধ্যস্থ রঞ্জনসূত্রের সমান-সংখ্যক রঞ্জনসূত্র বর্ত্তমান ছিল।" অর্থাৎ এই সামান্য কয়টী মাত্র কোষ প্রাকৃতিক অবস্থার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল।

পরিশিষ্ট

এই প্রবন্ধে যে সকল পারিভাষিক শব্দের সঙ্কলন করা হইয়াছে, তাহাদের ইংরাজী প্রতিশব্দসমূহ পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ করা হইল। জীবন-সংগ্রাম, প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন, পরাগকোষ ইত্যাদি কতকগুলি শব্দের ব্যবহার বঙ্গীয় সমাজে সুপরিচিত। এজন্য তাহাদের প্রতিশব্দ প্রদান করিলাম না। আমাদের দেশের ভাষায় একটী ধাতু হইতে একশত আশিটী শব্দ গঠনাগঠন করা যায়। তথাপি এখনও আমাদিগকে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতে হয়! আমাদের দেশে যাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়াছেন তাঁহারা ইংরাজীপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বিদ্যার পরিচয় প্রদান ও অধ্যাপনের পথ প্রশস্ত করিয়াই ক্ষান্ত। সকলেরই মূল মন্ত্র হওয়া উচিত "জগতের জ্ঞান রাশি ভারতের ভাষায় ভারতবাসীর জন্য আহরণ করিব।"

পরিভাষা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি। অ্যামিবা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাইমেট্‌স্ পর্য্যন্ত, এবং উদজান হইতে ইলেক্‌ট্রোন্ পর্য্যন্ত—যত যা আছে সকল গুলিরই ইচ্ছামত এক একটা বাঙ্গালা নাম প্রদান করা একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থের বোঝা মাথায় লওয়া রূপ বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এটাকে বোঝা বলিলাম এইজন্য যে, উচ্চ জ্ঞানান্বেষীকে ল্যাটিন্ গ্রীক্‌মূলক শব্দগুলি শিখিতে হইবেই, কারণ বিজ্ঞানের উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়া জগতের সহিত ভাব বিনিময় ব্যতীত শিক্ষার সার্থকতা কোথায়? জাপানেও এই মতের পোষকতা দেখা যায়। তথায় বিদ্যাশিক্ষা করা হয় জাপানী ভাষায়। অপেক্ষাকৃত সহজ অর্থাৎ যে গুলিকে প্রাথমিক ও সাধারণ সাহিত্যাঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে সেই সকল পরিভাষার জন্য জাপানী প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়। শিক্ষাজগতে জাপানের সমস্যা অনেকটা আমাদেরই মত বলিয়া তাহার উদাহরণ প্রদান করা হইল; কিন্তু পাশ্চাত্য খণ্ডে এ নিয়ম বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। তারপর Taxonomic Botany বা উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ-সম্বন্ধে হেগ্‌সভাসমিতি কর্তৃক লিপিবদ্ধ নিয়মাবলীও অবশ্য স্মরণীয়।

বিজ্ঞান মাত্রেরই যে সকল শব্দ জ্ঞান-মহীরুহের উচ্চাঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট সে স্থলে ল্যাটিন্‌গ্রীক্‌মূলক শব্দই ব্যবহার্য্য; যেহেতু

এ স্থলে শুধু জাপান, ভারতবর্ষ বা জার্ম্মেণী লইয়া থাকিলে চলিবে না। এ জ্ঞান-মন্দাকিনীতীর্থে আর জাতিভেদ নাই বিশ্বজনীন উন্নতির জন্য এই মহামিলনের যখন একান্তই দরকার, তখন পাকাভিত্তির উপর নূতন দেওয়াল না তুলিয়া নূতন পত্তনে শক্তির অপচয় করি কেন? ভারতের শিক্ষা-জগতে উদীয়মান কর্ম্মিগণের ইহাও মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।

তারপর জন্তু ও উদ্‌ভিদ্‌গণের Binomial nomenclature বা দ্বৈয়িক নামকরণ সম্বন্ধে আমাদিগকে এক বৃহৎ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। জিনাস্‌ নামের প্রথম অক্ষর সর্ব্বদাই বড় হাতের, ও জাতিবাচক নামের প্রথম অক্ষর ছোট হাতের,—বঙ্গ-ভাষায় দ্বৈয়িক নাম লিখিবার জন্য এই প্রণালীই উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে। 'ক্রুপাস্‌ ক্যাপেন্‌স্‌' এই নামটীর প্রথম অংশ জিনাস্‌বাচক বলিয়া বড় অক্ষরে লেখা হইয়াছে। জাতিবাচক শব্দ সর্ব্বদাই সাধারণভাবে লিখিত হইবে।

পারিভাষিক শব্দ

নির্ব্বাচনিক বন্ধ্যাতা	Selective sterility.
একক বা ব্যক্তি	Individual.
কুলীন জাতি	Pure line.
কোষ-কেন্দ্র	Nucleus.
জাতি	Species.
জাতি-সঙ্কর	Hybrid.
জনন-কোষ	Germinal cells.
জিনাস্‌	Genus.
দৈহিক নির্ব্বাচন	Physiological selection.
দৈহিক কলা	Organic tissue.
দৈহিক কোষ	Somatic cell.
পরাবর্ত্তন	Variation.
পরাগ মাতৃকোষ	Pollen mother-cell.
বর্ণ	Variety.
বর্ণসঙ্কর	Mongrel.
রঞ্জন-সূত্র	Chromosome.
শুক্রপুষ্টি	Spermatogenesis.
সঙ্করতাসাধন	Hybridization.
সজ্যোদ্বর্ত্তন	Phylogeny.
সংবিভাগ রেখাগুচ্ছ	Spindles of a dividing cell.

শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র
আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা

সমুদ্র-যাত্রা

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক বৃহন্নারদীয় বচনের ব্যাখ্যা।

২। Foreign Travel and Hindu Shastras. A Judgment in the Benares Caste Case. The 18th September, 1911.

৩। Indian Shipping—A History of the Sea-borne trade and maritime activity of the Indians

from the earliest times by Radha Kumud Mukerjee M. A. 1912.

৪। কলিকাতা অধিবেশনে সমগ্র কায়স্থ-মণ্ডলীর কায়স্থের সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ।

৫। বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে অভিমত।

৬। বঙ্গবাসীতে শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মত।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ একখানি উপপুরাণ। কিন্তু উপপুরাণ বলিয়া নগণ্য নহে।

কমলাকরের নির্ণয়সিন্ধুতে রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বে, হেমাদ্রির এবং বহুতর আধুনিক সংগ্রহ-গ্রন্থে বৃহন্নারদীয়ের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ও মত গৃহীত হইয়াছে।

বৃহন্নারদীয়ে আছে :—

সমুদ্র-যাত্রা-স্বীকারঃ কমণ্ডলু-বিধারণম্
দ্বিজানাম্ অসবর্ণাসু কন্যাসূপায়মাস্তথা
দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ মধুপর্কে পশোর্বধ
মাংসদানম্ তথা শ্রাদ্ধে বাণপ্রস্থাশ্রমাংস্তথা
দত্ত ক্ষতায়া কন্যায়া পুনর্দানম্ পরস্ব চ
দীর্ঘকালম্ ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ
মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধাম্ চ তথা মখম্
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জান্ আহুর্মনীষিণাঃ

এই চারিটি শ্লোকও হেমাদ্রি এবং রঘুনন্দন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং এই শ্লোকগুলি যে প্রামাণিক নয়, তাহা কেহ বলিতে পারেন না।

এই শ্লোক কয়টির উপরই প্রধানত নির্ভর করিয়া, কলিতে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ, এরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন।

বহুদিন হইল, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় মত প্রকাশ করেন যে, এই শ্লোকগুলিতে ভারতবাসী সাধারণ হিন্দুর পক্ষে নৌযানে সমুদ্র-যাত্রার কোনরূপ বাধা হয় না। যে সমুদ্র-যাত্রা ইহাতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা একরূপ প্রায়শ্চিত্ত, একটা ধর্ম্ম-কর্ম্ম। এই কথাটি একটু বিস্তৃত করিয়া পরে বলিব।

তাহার পর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেবল উপপুরাণের একটি শ্লোকে নির্ভর করিয়া সমুদ্র-যাত্রা কি নিষিদ্ধ হইয়াছে? তিনি উত্তর করেন, "তা কেন? যখন স্বয়ং মনু সমুদ্র-যায়ীকে অপাংক্তেয় করিয়াছেন, তখন সমুদ্র-যাত্রা যে একরূপ নিষিদ্ধ ছিল, তাহার আর সন্দেহ কি?"

সমুদ্র যায়ী বন্দী তৈলিকঃ কূটকারকঃ প্রভৃতি বহুতর ব্যক্তি অপাংক্তেয়। কিন্তু সমুদ্র-যায়ী কাহাকে বলে?—কুল্লুক বলেন :—সমুদ্র-যায়ী—"সমুদ্রে যো বাহিত্রাদিনা দ্বীপান্তরং গচ্ছতি," তাহা হইলে, সমুদ্রযায়ী অর্থে Sailor হইল—ব্যবসায়ী দাঁড়ী মাঝি হইল। ব্রাহ্মণে দাঁড়ী মাঝীর ব্যবসা করিলে অপাংক্তেয় হইবে, বিচিত্র নহে। সমুদ্রযায়ী—যে পুনঃ পুনঃ সমুদ্র গমন করে—সে দাঁড়ী মাঝি ব্যতীত আর কে হইতে পারে? এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া কুল্লুক সমুদ্রযায়ী শব্দের এরূপ অর্থ করিয়াছেন কি না বলা যায় না। যাহা হউক, কুল্লুকের অর্থ ঠিক হইলে সাধারণ-যাত্রীর পক্ষে সমুদ্র গমন নিষিদ্ধ হইল না।

বারাণসী ধামে দুইজন আগরওয়ালা বৈশ্য মধ্যে এই সমুদ্র-যাত্রার কথা লইয়া ১৯১১ সালে একটি প্রবল মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত সবজজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় কাশীস্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-গণের সাহায্যে সেই মোকদ্দমার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়াছেন। সেই বিচার-পত্রে

বৃহন্নারদীয় পুরাণের শ্লোক কয়টির তন্নতন্ন বিচার আছে। তাহার একটু আভাস দিতেছি।

শেষ শ্লোকের শেষ দুই পদে দেখিবেন "ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যান্ আহু-র্মণীষিণঃ"—এই সকল ধর্ম্ম কলিযুগে বর্জ্জ্য। সখের সমুদ্র-যাত্রা ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতেই পারে না। শ্লোক-সমষ্টিতে ১৩টি কাজ বর্জ্জন করিবার কথা। সমুদ্র-যাত্রা ছাড়া আর ১২টি এই :—কমণ্ডলু ধারণ, দ্বিজদিগের অসবর্ণ কন্যা-বিবাহ; দেবর দ্বারা সন্তানোৎপত্তি, মধুপর্কে পশুবধ; শ্রাদ্ধে মাংস দান, বাণপ্রস্থাশ্রম, দত্তকন্যার পুনর্দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য; নরমেধ, অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থান, গোমেধ। এই সকলগুলি অন্য অন্য যুগে ধর্ম্ম-কার্য্য মনে করিবার বিধি থাকিলেও, কলিতে বর্জ্জনীয়। ঐ বারটির সঙ্গে সাধারণ সমুদ্র-যাত্রা কিরূপে নিষিদ্ধ হইবে? তবে ঐ প্রথম কথাটাকেই বিশেষরূপ "সমুদ্র-যাত্রা স্বীকার" ধরিতে হইবে। স্বীকার কথা দ্বারা বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে। এই কথাই বহু পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, বারাণসীর ও কয়জন পণ্ডিত এই মোকদ্দমাতে তাহাই বলিয়াছেন।

কিরূপ সমুদ্র-যাত্রার কথা বৃহন্নারদীয় বলিয়াছেন, তাহা পারাশরীস্মৃতি হইতে এবং কূর্ম্মপুরাণ হইতে বুঝা যায়।

চতুর্বিদ্যোপপন্নে তু বিধিবৎ ব্রহ্মঘাতকে।
সমুদ্র সেতু-গমনং প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ॥
[পরাশর]

গত্বা রামেশ্বরং পুণ্যং স্নাত্বা চৈব মহোদধৌ।
ব্রহ্মচর্য্যাদিভিঃ যুক্তাঃ দৃষ্টা রুদ্রং বিমোচয়েৎ॥

সুতরাং ঐ সমুদ্র-যাত্রা স্বীকার যে সাধারণ সমুদ্র-যাত্রা পক্ষে নহে তাহা একরূপ নিশ্চয়। বারাণসীর ঐ মোকদ্দমায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা সাক্ষীস্বরূপ যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, বেদ, পুরাণ, ইতিহাস সর্ব্বত্রই সমুদ্র-যাত্রার কথা আছে, এবং সমুদ্র-যাত্রা যে সদাচার বা শিষ্টাচার মধ্যে গণ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, কল্কি-পুরাণ, বরাহপুরাণ, ইতিহাস, রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থে সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ আছে।

ঐ মোকদ্দামার বিচার-পত্র পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সমুদ্র-যাত্রা কোন কালেই নিষিদ্ধ ছিল না। ব্রাহ্মণের পক্ষে জাহাজে দাঁড়ী মাঝীর ব্যবসায় হেয় হইলেও, ভারতবর্ষের সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর পক্ষে নিষিদ্ধ কখনই ছিল না। আর উত্তর ভারতবাসীর পক্ষে জীবিকার্থে ঐরূপ ব্যবসায় শিষ্টাচার-সম্মত ছিল।

ব্রাহ্মণের পক্ষে যখন ঐরূপ, তখন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের পক্ষে কোথাও কোনরূপ বাধাই ছিল না। বন্ধু-বিচারপতি এই বিষয়ে সুন্দর যুক্তি দেখাইয়া মীমাংসা করিয়াছেন :—

Thus it follows that the sea-voyage is not prohibited to any one of the three lower castes throughout India, and only the profession of sea-trade is prohibited by Baudhayana to the Brahmins of the South. The sea-voyage for the purposes of study or foreign travel or to spread one's religion or knowledge is not prohibited to any caste even by him.

ইহার অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। উপরে একরূপ দেওয়া হইয়াছে। বৌধায়নের সূত্র

লইয়া বসু-বিচারপতি অনেক পরিশ্রম করিয়া ঐ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। এরূপভাবে সামাজিক বা শাস্ত্র কথার বিচার এক দ্বারকানাথ মিত্রের ছাড়া আর প্রায় কাহারও দেখা যায় না। উভয়কেই কায়স্থকুলতিলক বলিতে হয়।

এই বিচার ১৯১১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর শেষ হয়। তাহার ১৫ মাস পূর্ব্বে বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থের (Indian Shipping 'ভারতে জাহাজ চালান') রচনা শেষ করেন। কিন্তু গ্রন্থ ১৯১২ সালে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় এই গ্রন্থ হইতে কোন সাহায্য পান নাই। এই গ্রন্থের কিয়দংশ যে ডন্ মাগেজিনে খণ্ডশ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও বোধ হয় দেখেন নাই।

রাধাকুমুদ বাবুর ইংরাজী গ্রন্থ আমাদের বাঙ্গালীর গৌরব। গ্রন্থ পাইয়াই আমি লিখিয়াছিলাম, এই গ্রন্থের সমালোচনা আর কি করিব, ইহা হইতে আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। শুধু শিক্ষা নহে, রাধাকুমুদ বাবুর গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত হইয়াছি। আমরা ভারতবাসী, ভারতের কিছুই জানি না বলিলেই হয়, সাহেবরা যা বলা কহা করেন, প্রধানত তাহাই কপ্চাইয়া থাকি—লর্ড কর্জন একজন এ সকল বিষয়ে পণ্ডিত লোক, পাণ্ডিত্যবলেই 'রাজত্ব' করিয়া গিয়াছেন। তিনি পুস্তক পাইয়া বলিয়াছেন যে, এই পুস্তকে, ভারত সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের জ্ঞানভাণ্ডার বর্দ্ধিত হইল। বাস্তবিক এত অজানা কথা আমাদিগকে জানান হইয়াছে যে, আমরা প্রতিপত্রে বিস্মিত হই।

এই পুস্তক ইংরাজিতে লিখিত হওয়াতে বিদেশে ইহার বিশেষ যশ হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজি-অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীমণ্ডলে তেমন প্রচারলাভ করে নাই। বাঙ্গালী পাঠকের নিকট পরিচয় প্রদানার্থই এই ক্ষীণ হস্তে যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব।

গ্রন্থের প্রধানত দুইভাগ—

১। হিন্দু-সময়। ২। মুসলমান-সময়। হিন্দু সময়ে যে সমুদ্রে নৌচালনা বিলক্ষণ ছিল, তাহা দেখান হইয়াছে। *

বেদে আছে যে, তুগ্র রাজর্ষির পুত্র ভজ্যুকুমার পিতৃ-আজ্ঞায় শত্রুদিগের বিরুদ্ধে দূরস্থ দ্বীপপুঞ্জে পোতারোহণে গমন করেন; সমুদ্র-পথে প্রবল বাত্যায় তাঁহার পোত নষ্ট হয়, এবং তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক তাঁহাদের শতদণ্ড পোতের দ্বারা রক্ষা পান। কিন্তু বেদের কথা, দেবতার কথা, না হয়, ছাড়িয়া দিলাম। রামায়ণে বহুস্থলে সমুদ্র-গমনের কথা আছে। অযোধ্যা কাণ্ড, ৮৪ অধ্যায়ে, ০৮ শ্লোকে আছে,—

নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতং শতং
সন্নদ্ধানাং তথা যূনাস্তিষ্ঠন্‌ত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ ॥

শত শত বর্ম্মাচ্ছাদিতবপু যুবক কৈবর্ত্তগণ পঞ্চশত নৌকায়, শত্রুর পথ রোধ করিবার নিমিত্ত, অপেক্ষা করুক।

ঐরূপ নৌ-যুদ্ধের কথা আছে। আর

* মনুর যে শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সমুদ্র-যাত্রার প্রশস্ততা আমাদিগকে দেখান, সেই শ্লোকের সমুদ্র-যায়ী অর্থে রাধাকুমুদ বাবু A Brahmin who has gone to sea বলেন। আমরা মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের ব্যবস্থার আভাসে, পরে শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বিচার-পত্রের বিস্তৃত যুক্তির বলে, দেখাইয়াছি যে ঐ সমুদ্রযায়ীর অর্থ যাহারা দাঁড়ী মাঝির মত পুনঃপুনঃ সমুদ্রে গমন করে, সুতরাং রাধাকুমুদ বাবুর গ্রন্থে চন্দ্রে কলঙ্কের মত একটু ভুল রহিয়াছে।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে সুগ্রীব অনেককেই সমুদ্র-মধ্যস্থ দ্বীপপুঞ্জে গিয়া সীতাদেবীকে অন্বেষণ করিতে বলিয়াছেন।

মহাভারতে দেখা যায়—সভাপর্ব্বে নকুল তাম্রদ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়া ম্লেচ্ছ, রাক্ষস, নিষাদ-দিগকে জয় করিয়াছিলেন। সংস্কৃতভাষা অতি বিপুল অবয়ব। বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ, আখ্যায়িকা রাশি রাশি ইহাতে আছে; রাধাকুমুদ বাবু আশ্চর্য্য অধ্যবসায়, ধৈর্য্য এবং পরিশ্রম সহকারে সমগ্র সংস্কৃত ভাষা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে, পোত-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যেখানে যাহা পাওয়া যায়, সমস্তই সংগ্রহ করিয়াছেন। কেবল মুদ্রিত পুস্তক নহে, সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারে একখানি হাতের লেখা গ্রন্থ আছে, তাহাতে জাহাজ-গঠনের কথা আছে, সেখান হইতেও তিনি বিস্তর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, জাহাজ কিরূপে গড়িতে হয়, কত বড় করিতে হয় ইত্যাদি। গ্রন্থখানির নাম "যুক্তি-কল্পতরু!" কেবল সংস্কৃত বলিয়া নহে, আরবী, পারসীর ইংরাজি অনুবাদ হইতে, বৌদ্ধ ইতিহাস হইতেও তিনি বিস্তর সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার পর যেখানে যাহা খোদিত বা চিত্রিত আছে, কেবল ভারতবর্ষে নহে, সুদূর যবদ্বীপে, সিংহলে যাহা আছে, তাহারও প্রতিকৃতি দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। ৺জগন্নাথ-মন্দিরের গাত্রে, ভুবনেশ্বরের বিন্দু সরোবরের পশ্চিম পার্শ্বের এক মন্দিরের শিরোদেশে, অজন্তার গুহায়, মাদুরার পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ চিত্রে—ভারতের সর্ব্বত্র স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া তিনি সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, ধন্য তাঁহার অধ্যবসায়! ধন্য তাঁহার পরিশ্রম! সুখের কথা এই যে, এই অগাধ পরিশ্রম, এবং ঐকান্তিক অধ্যবসায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশে সার্থক হইয়াছে। সার্থক হইয়াছে কেন বলিতেছি তাই বলি। আমাদের সমস্ত বঙ্গদেশে এই সমুদ্র-যাত্রার ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে।

কলিকাতায় গত বৎসর যে ভারতের সমগ্র কায়স্থ জাতির সম্মিলন হয় (All India Kayastha Conference), তাহাতে সংকল্প স্থির হইয়াছে যে, কায়স্থগণ স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সমুদ্র যাত্রা করিতে পারিবেন। অর্থাৎ অন্যদিকে ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিলে, কেবল সমুদ্রযাত্রায় ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না।

উত্তর পশ্চিমে ওস্‌য়াল্ বণিকদিগের মধ্যে যে মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি—বিচারাসনের বিচারে স্থির হইয়াছে, ঐ জাতির মধ্যে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ নহে।

বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণমণ্ডলী সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতে সমবেত হন—কিন্তু সে কথা ঘোষণা করিতে নিরস্ত হইয়াছেন।

বঙ্গবাসীর স্তম্ভে শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক-চূড়ামণি মহাশয় স্বীয় সুবিস্তৃত মত প্রচার করিয়াছেন—এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু উপক্রমণিকার ভাবে বোধ হইতেছে, তাঁহার মত যে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া কেবলমাত্র সমুদ্র-যাত্রায় কোনরূপ অধর্ম্ম নাই।

তাই বলিতেছিলাম রাধাকুমুদ বাবুর বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের বিপুল শ্রম এবং অধ্যবসায় সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। দেশের হাওয়া ফিরিয়া গিয়াছে। এখন জনকতক ধনশালী লোক হিন্দু-জাহাজ চালাইতে পারিলেই,—আমাদের এই সুদীর্ঘ সমালোচনা সার্থক হয়। সুযোগ্য গ্রন্থকারকে একটি অনুরোধ, তিনি যেন এই গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ অচিরে প্রকাশ করেন।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

দুর্গা পূজার শাস্ত্রীয় প্রমাণ *

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত অংশকে চণ্ডী বলে। উহাতে দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগণ পুনঃ পুনঃ অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয় স্বামিত্ব ও অধিকার ভ্রষ্ট হন, তখন তাঁহারা দেবীর শরণাপন্ন হন। দেবীও তাঁহাদিগের জন্য অসুরগণের সহিত মহাসমরে নিযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে নিধন করতঃ দেবতাগণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করেন। পুনঃ পুনঃ অসুরগণের সহিত সংগ্রামে দেবীর জয়-বৃত্তান্ত লইয়াই চণ্ডী রচিত হইয়াছে। উহা তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগে মধুকৈটভ-বধ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা প্রথম অধ্যায়েই শেষ। দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায় লইয়া। উহাতে মহিষাসুর বধ বিবৃত আছে। তৃতীয় ভাগে পঞ্চম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় আছে। উহাতে শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের বর্ণনা। ত্রয়োদশ অধ্যায় পরিশিষ্ট-স্বরূপ। উহাতে সুরথ রাজা ও বৈশ্য কর্ত্তৃক দেবীর পূজা বর্ণিত হইয়াছে। সুরথ রাজা দেবীর বরে স্বীয় ভ্রষ্ট রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং বৈশ্য স্বীয় প্রার্থিত আত্মজ্ঞান লাভ করে।

এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে দেবতাগণ কর্ত্তৃক দেবীর স্তবও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং চণ্ডীর মাহাত্ম্যও বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর উপাখ্যান-ভাগ লিপিবদ্ধ করা হইল।

দেবতাগণের সর্ব্বদাই বিপদ। দুর্দ্দান্ত অসুরগণ কখন বা দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত করিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে, কখন বা দেবতাবিশেষকে আক্রমণ পূর্ব্বক হত্যা করিতে উদ্যত, কখন বা প্রধান প্রধান দেবতাগণকে জয় করিয়া অসুরগণ ভৃত্যরূপে কার্য্য করাইয়া লইতেছে। এ সকল বিপদ হইতে ত্রাণকর্ত্রী মহাদেবী। দেবতাগণের এইরূপ বিপদকালেই দেবীর আবির্ভাব হয়।

"দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।" (২।৫৮)

মহিষাসুর-বধের পর দেবতাগণ দেবীকে স্তবে সন্তুষ্ট করিলে পর দেবী তাঁহাদিগকে বর প্রদানে উদ্যত হইলে, দেবতাগণ ঐরূপ বরই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হে মহেশ্বরী কৃপাপূর্ব্বক যদি আমাদিগকে বর প্রদান করেন, তবে আমরা এই বর যাচ্ঞা করিতেছি যে, আমরা যখন বিপদে পতিত হইব তখন আপনাকে স্মরণ করিলে আপনি আসিয়া আমাদিগকে আপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।

"যদি বাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি।
সংস্মৃতা সংস্মৃতাত্ব নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ॥"
(৪।৩৫)

দেবীও "তথাস্তু" বলিয়া ঐ বর প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুসারে পুনরায় যখন শুম্ভ-নিশুম্ভনামক দৈত্যদ্বয় দেবতাগণকে আপনাপন অধিকার ও প্রভুত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া স্বর্গ হইতে দূর করিয়া দিল, তখন দেবতাগণ দেবীর শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন— "হে দেবি! আপনি পূর্ব্বে আমাদিগকে বর দিয়াছেন যে, আমরা যখন বিপদে পতিত হইব, তখন আপনাকে স্মরণ করিলে আপনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাদিগকে সকল আপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।"

* আমাদের গত শারদীয় সংখ্যার জন্ত প্রাপ্ত

"ত্বয়াস্মাকং বরো দত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলাঃ।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ॥"
(৫।৬)

দেবীও পুনরায় শুম্ভনিশুম্ভ বধ করিয়া দেবতাগণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করিলেন।

শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের পর দেবতাগণ ভবিষ্যতের সকল প্রকার আপদুদ্ধারের জন্য দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন।

"সর্ব্ববাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্॥"
(১১।৩৯)

দেবীও ভবিষ্যতে যে সকল অসুর নিধন করিবেন, তাহার বিবরণ দিয়া শেষে বলিলেন—

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥"
(১১।৫৫)

এইরূপে যখন যখন দৈত্যগণ ত্রৈলোক্যের পীড়ার কারণ হইবে, তখন আমি অবতীর্ণা হইয়া শত্রুসকল সংহার করিব।

দেবতাগণ স্বার্থপর নহেন। তাঁহারা কেবলমাত্র নিজহিতার্থে দেবীর নিকট বর প্রার্থনা করেন নাই। জগতের হিতার্থে সমগ্র জীবের মঙ্গলের জন্যও দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

"যশ্চ মর্ত্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বং স্তোষ্যত্যমলাননে।
তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্॥
বৃদ্ধয়েঽস্মৎপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্ব্বদাম্বিকে॥"
(৪।৩৬ ৩৭)

হে দেবি! আমরা আপনার নিকট আর প্রার্থনা করিতেছি যে, যে মনুষ্য আপনার এই স্তোত্র পাঠ করতঃ আপনাকে তুষ্ট করিবে আপনি কৃপাপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহার ধন-সম্পত্তি ও পুত্র-কলত্রাদি বৃদ্ধি করিবেন।

দেবী তাঁহাদিগকে সে বরও দান করিয়াছিলেন। দেবী আরও বলিলেন "যে ব্যক্তি সংযত চিত্তে আমার এই সমস্ত স্তুতিবাক্যে আমার স্তব করিবে এবং মাহাত্ম্য-কথা শ্রবণ করিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহার বাধা-বিঘ্ন সকল বিনষ্ট করিব।"

এভিঃস্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ
সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্॥"
(১২।২)

তাহাদের কখন কোন পাপ বা পাপজনিত আপদ্-বিপদ বা দারিদ্র্য-দুঃখ, অথবা প্রিয়জনবিয়োগজনিত শোক-তাপ উপস্থিত হইবে না। তাহাদের শত্রুভয়, দস্যুভয়, জলভয় ইত্যাদিও থাকিবে না।

"ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্॥
শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি॥"
(১২।৫-৬)

এতদ্দ্বারা মহামারীজনিত অশেষ উপসর্গ এবং ত্রিবিধ উৎপাত শান্তি হইয়া থাকে।

"উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম॥"
(১২।৮)

এমন কি শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি নিবন্ধন পৃথিবী জলশূন্যা হইলে এবং লোক সকল দুর্ভিক্ষে অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া স্বীয় দেহ হইতে শাক সমুৎপন্ন করতঃ তদ্দ্বারা লোক সকলকে ভরণ পোষণ করিবেন, এই আশ্বাস-বাণীও আমাদিগকে দিয়াছেন।

"ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।

*   *   *   *

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥"

(১১ ৪৬,৪৮)

এক্ষণে আমরা এই দেবীমাহাত্ম্য-বর্ণনে নিযুক্ত হইব।

একদা প্রলয়কালে যখন সমস্ত জগৎ জলময় এবং ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া অনন্তশয্যায় শয়ান, তখন তাঁহারই কর্ণমূলোৎপন্ন মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয় বিষ্ণুনাভিপদ্মস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ব্রহ্মা তখন এই মহাদেবীকে স্তবদ্বারা সন্তুষ্ট করিলে তিনি আবির্ভূত হইয়া বিষ্ণুকর্ত্তৃক উদ্ভূত সেই অসুরদ্বয়কে নিহত করিয়া তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। (মার্কণ্ডেয়চণ্ডী ১।৫৯—৬১ ; ৮৭—১০১)

আর একবার মহিষাসুর নামক দৈত্যাধিপতির সহিত দেবগণের শতবর্ষব্যাপী সংগ্রাম হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে অসুরগণ কর্ত্তৃক দেবগণ ও দেবসৈন্য সকল পরাভূত হইলে, মহিষাসুর দেবতাদিগকে জয় করতঃ ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবতা সকলের অধিকার গ্রহণ করে, এবং দেবগণকে স্বর্গ হইতে দূরীকৃত করে। দেবতাগণ তখন মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যদিগের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকেন।

"সূর্য্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দুনাং যমস্য বরুণস্য চ।
অন্যেষাঞ্চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি॥
স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা॥"

(২।৬-৭)

তখন পরাভূত দেবগণ একত্র হইয়া ব্রহ্মাকে সহায় করিয়া তাঁহার সহিত হরিহর-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক মহিষাসুরের অত্যাচার আনুপূর্ব্বিক তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিলেন।

তাহাতে তাঁহারা অতিশয় কোপযুক্ত হইলেন, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর ও ইন্দ্রাদি দেবগণের মুখমণ্ডল হইতে মহাতেজ নির্গত হইয়া একত্রিত হইল এবং সেই অনুপম তেজঃপুঞ্জ নারীরূপে পরিণত হইল। শঙ্করের তেজ হইতে তাঁহার মুখমণ্ডল, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণুর তেজে বাহুদ্বয়, চন্দ্রের তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রতেজে কটিদেশ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরুদেশ, ধরণীর তেজদ্বারা নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজ হইতে পদদ্বয়, সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুলি সকল, বসুগণের তেজদ্বারা হস্তদ্বয়ের দশাঙ্গুল, কুবেরের তেজঃপ্রভাবে নাসিকা, দক্ষাদি প্রজাপতিগণের তেজ হইতে দশনসমূহ, অনলের তেজে ত্রিনয়ন, সন্ধ্যার তেজে ভ্রূযুগল, বায়ুর তেজ হইতে কর্ণদ্বয়, এবং অন্যান্য অমরবৃন্দের তেজঃপ্রভাবে অপরাপর অবয়ব সমুদয় সম্ভূত হইল।

"ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥

যদভূচ্ছাম্ভবস্তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্।
যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা॥
সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যং চৈন্দ্রেন চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরুনিতম্বস্তেজসা ভুবঃ॥
ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা॥
তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা॥

"ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা॥"

(২।১০—১৮)

তখন পিণাকধারী ত্রিপুরারি শূল হইতে অন্য শূল নির্গত করতঃ সেই দেবীকে দিলেন। কৃষ্ণও স্বীয় চক্র হইতে সমুৎপন্ন অন্যচক্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন, সমুদ্র শঙ্খ, অগ্নি শক্তি, পবনদেব ধনু ও বাণপূর্ণ তূণীর, ইন্দ্র ঐরাবত হইতে ঘণ্টা এবং নিজবজ্র হইতে আর এক বজ্র উৎপাদন করত সেই দেবীকে প্রদান করিলেন। যম কালদণ্ড ও বরুণ পাশ, প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু প্রদান করিলেন। দিবাকর দেবীর সমস্ত লোমকূপে আপন কিরণ দিলেন এবং কাল খড়্গ ও নির্ম্মল চর্ম্মবর্ম্ম দান করিলেন। ক্ষীরোদসাগর বিমল হার, অবিনশ্বর অম্বর, দিব্য মুকুট, কুণ্ডল, বলয়, শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র, সমস্ত বাহুভূষণ, কেয়ূর, নির্ম্মল নূপুরদ্বয়, উৎকৃষ্ট কর্ণভূষণ এবং সমস্ত অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয়ক সকল প্রদান করিলেন। আর বিশ্বকর্ম্মা অতি নির্ম্মল কুঠার, অন্যান্য নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র সকল এবং অভেদ্য কবচ দান করিলেন। জলনিধি শিরোদেশে ও গলদেশে অমল কমল মালা এবং সুশোভন শতদল হার অর্পণ করিলেন, হিমালয় বাহন জন্য সিংহ এবং অশেষ ধনরত্ন দান করিলেন ও ধনাধিপতি কুবেরও সুধাপূর্ণ পান-পাত্র প্রদান করিলেন। অনন্তদেব মহামণিবিভূষিত নাগহার দান করিলেন, এবং অন্যান্য দেবগণও বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ও নানা প্রকার অলঙ্কার দান করিয়া দেবীকে সম্মানিত করিলেন।

শূলং শূলাদ্বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্মৈ পিণাকধৃক্।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ॥
শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্যৈ হুতাশনঃ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী॥
বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ।
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্গজাৎ॥
কালদণ্ডাদ্ যমোদণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দ্দদৌ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুম্॥
সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ।
কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম্ম চ নির্ম্মলম্॥
ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে।
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ॥
অর্দ্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান্ সর্ব্ববাহুষু।
নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্গ্রৈবেয়কমনুত্তমম্॥
অঙ্গুরীয়করত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ।
বিশ্বকর্ম্মা দদৌ তস্মৈ পরশুঞ্চাতিনির্ম্মলম্॥
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনম্।
অম্লানপঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাম্॥
অদদজ্জলধিস্তস্মৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনম্।
হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ॥
দদাব শূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ॥
শেষশ্চ সর্ব্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতম্।
নাগহারং দদৌ তস্মৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্॥
অন্যৈরপি সুরৈর্দ্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা।"

(২।১৩—৩২)

মহিষাসুর দেখিতে পাইল এক মহা ভয়ঙ্করী দেবীর সেই দ্যুতি দ্বারা ত্রিলোক উজ্জ্বলীকৃত, পদভরে মেদিনী অবনত, এবং কিরীট দ্বারা আকাশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, আর তিনি ধনু ও জ্যা-শব্দে জগৎ সংক্ষুভিত করিয়া সহস্র ভুজ বিস্তার পূর্ব্বক দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করতঃ অবস্থিতি করিতেছেন।

"তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ।
অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ॥
চক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ॥

(২।৩৩—৩৪)

সদদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়ত্বিষা।
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্‌॥
ক্ষোভিতাশেষপাতালং ধনুর্জ্যানিস্বনেন তাম্‌।
দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ব্যাপ্য সংস্থিতাম্‌॥
(২।৩৮—৩৯)

তখন মহিষাসুর ও তাহার সৈন্যাধ্যক্ষগণ কোটি কোটি রথ, বাজী ও গজে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই দেবীর সহিত মহা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। সংগ্রাম সময়ে দেবীর নিশ্বাস হইতে শত সহস্র প্রমথগণ উৎপন্ন হইল এবং দেবী প্রদত্ত শক্তি দ্বারা বলবন্ত হইয়া অসুরগণের সহিত রণে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষণ কালের মধ্যে দেবী, অগ্নি যেমন তৃণকাষ্ঠাদি ভস্মসাৎ করে, তেমনি দৈত্যদলের মহাসৈন্য সকলকে বিনাশ করিলেন।

"ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা"
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্‌॥
(২।৬৮)

সৈন্যদলের বিনাশের পর অসুর সেনাপতিগণ একে একে দেবীর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইল। দেবীও কাহাকে শূলে, কাহাকে বাণে, কাহাকে শিলা বা বৃক্ষাদি দ্বারা, কাহাকে গদাঘাতে, কাহাকে ভিন্দিপাল প্রহারে, কাহাকে অসির আঘাতে, সংহার করিলেন।

তখন স্বয়ং মহিষাসুর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া খুরের দ্বারা ভূ-বিদারণ করতঃ শৃঙ্গদ্বারা অত্যুচ্চ গিরি-নিকরকে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ পূর্ব্বক উচ্চনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে তাহার দ্রুতবেগে ভ্রমণ নিবন্ধন বসুমতী বিশীর্ণা হইয়া পড়িল। মধ্যে মধ্যে সে তাহার লাঙ্গুলদ্বারা সমুদ্রকেও আঘাত করায় সাগরের জলরাশি উদ্বেলি হইয়া সিকড় সকল প্লাবিত করিল এবং বিধূত বিষাণ দ্বারা জলদরাশি বিদীর্ণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিল এবং তাহার নিশ্বাস বায়ুবেগে ধরাধরচয়কে শূন্যমার্গে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে লাগিল।

সোঽপি কোপান্মহাবীর্য্যঃ খুরক্ষুণ্ণমহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ।
বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্য্যত।
লাঙ্গুলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্ব্বতঃ॥
ধুতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ॥"
(৩।২৫—২৭)

এইরূপে মহিষাসুর সবেগে দেবীর দিকে আগমন করিল এবং দেবীকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। তখন দেবী তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যতা হইলে সে মায়া বলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে একমূর্ত্তি হইতে অপর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। পরিশেষে দেবী তাহাকে নিধন করিলেন।

আবার একবার শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই দৈত্য মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বলপূর্ব্বক ইন্দ্রের ত্রিলোকাধিপত্য, দেবগণের যজ্ঞভাগ অপহরণ. সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ দেবের প্রভুত্ব এবং অনিল ও অনলের কার্য্য অধিকার করিয়া লইয়া দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিদূরিত করিয়া দিল। (৫।১—৫) সে দেবরাজ পুরন্দরের নিকট হইতে ঐরাবত নামক গজরাজ, উচ্চৈঃশ্রবা নামে শ্রেষ্ঠ অশ্ব এবং পারিজাত বৃক্ষ, হংস-সংযুক্ত পরমরমণীয় ব্রহ্মার রত্নবিমান, ধনেশ্বর কুবের হইতে মহাপদ্ম এবং বারিনিধি কিঞ্জল্কিনী নামক চির-অম্লান পঙ্কজমালা, বরুণের সুবর্ণপ্রসূ ছত্র, প্রজাপতির অত্যুৎকৃষ্ট রথ, যমের উৎক্রান্তিদা-নাম্নী শক্তি, বরুণের পাশ, সমুদ্রের যত

উৎকৃষ্ট রত্ন অনঙ্গদেবের অদাহ্য বস্ত্র-যুগল প্রভৃতি ত্রিদিবগণের সমস্ত ধন-রত্নই হস্তগত করিয়াছিল। (৫।৯৩—৯৯)

তখন দেবতাগণ পুনরায় অনন্তোপায় হইয়া দেবীর শরণাপন্ন হইলেন।

তখন দেবীর শরীর-কোষ হইতে এক অসামান্যা সুন্দরী ললনা প্রাদুর্ভূতা হইলেন। এবং তাঁহার দেহকান্তিতে দিক সকল সমুদ্ভাসিত হইল।

"স্ত্রীরত্নমতিচার্ব্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা।
সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি॥"
(৫।৯২)

তাঁহার সেইরূপ শুম্ভনিশুম্ভের চণ্ড-মুণ্ড নামক ভৃত্যদ্বয় দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে বলিল:—"দৈত্যরাজ সমস্ত ধনরত্নই আপনাদের হস্তগত হইয়াছে, তবে আপনারা কি জন্য সেই সুলক্ষণা সুরূপা স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করেন নাই?"

"এবং দৈত্যেন্দ্র রত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে।
স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে।"
(৫।১০০)

চণ্ডমুণ্ডের মুখে এই কথা শুনিয়া শুম্ভ এক মহাসুরকে দূতস্বরূপে দেবী সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। সে গিয়া দেবীকে বলিল,—"হে দেবী শুম্ভ নামক দৈত্যরাজ সম্প্রতি ত্রৈলোক্যে ঈশ্বর হইয়াছেন। তিনি তোমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে,—'হে দেবী ত্রিলোকের সমস্ত রত্নই আমাদের অধিকার। তাই তোমা হেন স্ত্রীরত্ন আমাদেরই ভোগ্যা। অতএব তুমি আমাদিগকে আশ্রয় কর।"

"স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবি লোকে মন্যামহে বয়ম্।
সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভুজো বয়ম্"॥
(৫।১১২)

দেবী দূতকে বলিলেন—"তুমি যা বলিলে সবই সত্য। কিন্তু আমি অল্পবুদ্ধিবশতঃ পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যিনি আমায় সমরে পরাজয় করিতে পারিবেন তিনিই আমার পতি হইবেন। সে প্রতিজ্ঞা কিরূপে লঙ্ঘন করি? অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? মহাসুর শুম্ভই হউন বা নিশুম্ভই হউন এখানে আসিয়া আমায় পরাজয় করতঃ শীঘ্রই আমার পাণিগ্রহণ করুন্।"

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিত্ত্বয়োদিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ॥
কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্।
শ্রূয়তামাল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা॥
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥
তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ।
মাং জিত্বা কিঞ্চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্লাতু মে লঘু॥"

তখন দূত দেবীকে বহু প্রকারে তাঁহার ধৃষ্টতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া দৈত্যরাজ সমীপে নিবেদন করিলে, দৈত্যরাজ তাঁহার সেনাপতি ধূম্রলোচনকে বলপূর্ব্বক তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেনাপতি ষষ্টিসহস্র অসুর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ত্বরায় দেবীর নিকট গমন করিয়া দেবীকে স্বীয় প্রভুর ইচ্ছা প্রকাশ করিল। দেবী বলিলেন—"তুমি অসুরেন্দ্র শুম্ভকর্ত্তৃক প্রেরিত, বিশেষতঃ স্বয়ং মহা বলবান এবং পরাক্রান্ত সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত। তুমি যদি বলপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাও তবে আমি আর কি করিব?" (ক্রমশঃ)

শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায় বি, এল্।

বঙ্গের উদীয়মান কাব্য-সাহিত্য

এবার আমরা প্রবীণের কথা বলিব না, দুই এক জন নবীনের কিছু পরিচয় দিব। বিক্রমপুরের গোবিন্দদাস, চট্টগ্রামের শশাঙ্ক-মোহন, কলিকাতার অক্ষয় বড়াল, পাবনার 'ত্রিদিব-বিজয়'-লেখক শশধর ইত্যাদি কবিগণ বঙ্গের সাহিত্যে এক একটা পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। সে পথগুলি এবার দেখাইতে চাহি না। এবার আমাদের কয়েকজন শিশুকবির রচনা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বাঙ্গালীর চিন্তা অনতিদূর ভবিষ্যতে কোন্ ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিবে, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র দিব মাত্র। নব্য বঙ্গ-কাব্যের এই ধারা ও গতি বুঝাইবার জন্য দুই এক-জনের কোন কোন রচনার উল্লেখ করিব মাত্র। কোন কবি-বিশেষের নিন্দা বা প্রশংসা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বরিশালের বালক সতীশচন্দ্র রায় ১৩১০ সালে ২২ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। স্বদেশী আন্দোলন তিনি দেখিয়া যান নাই।

এই শিশুর স্বপ্ন শুনাইতেছি। ১৩০৯ সালের ৯ই বৈশাখের ডায়েরীতে লিখিত আছে—"একদিন গাইব। সেই সঙ্গে সমস্ত জীবনের গান একদিন গাইব।

এখনো অনেক মিথ্যাকে দূর করিতে হইবে। সমস্ত স্বদেশকে, জগৎকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে,—এখনো প্রাণকে শান্ত হইতে শান্ত, নিবিড়-লীন হইতে নিবিড়লীন করিতে হইবে। এখনো আলস্য পরিত্যাগ করিয়া পর্য্যবেক্ষণশক্তিকে সুমার্জ্জিত করিতে হইবে।

কবিতা-রচনার মত নিবিড় ব্যথা আমি কোন দিন ধরিতে পারিব না? জানি না—কিন্তু আজ অন্ততঃ এটা নিশ্চয় দেখিতে পাইতেছি যে, একটা ভবিষ্যতের সাহিত্যের মধ্য দিয়া একটি শান্ত-সুন্দর গদ্যধারা বহিয়া যাইতেছে, উহাই আমার। ঐ ধারা কল্পনা-সৌন্দর্য্য এবং বিলাসের আক্রমে বড় এবং বিচিত্র নিবিড় কিন্তু বেদনায় সুগভীর না হইতেও পারে। আমার চিত্তক্ষেত্রে বিচরণ-শীল এই তেজস্বী কল্পনামূর্ত্তিগুলি কবে বাহির হইবে?—আমি essentially Indian—ভারতের রস আমার প্রাণে বসিয়াছে।"

ইহার নাম সাহিত্য সাধনা। ইহার সিদ্ধি কোথায় হইত অনুমান করিতে পারি; কিন্তু লাভ নাই। Paradise Lost লিখিবার পূর্ব্বে মিল্টন এইরূপ শিক্ষা, চরিত্র-দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করিতেছিলেন।

সতীশচন্দ্র কতকগুলি সাহিত্য-সমালোচনা লিখিয়া গিয়াছেন—সেগুলি বঙ্গসাহিত্যে অমর হইবে। তিনি যে বয়সে ইংরাজ-সমালোচকগণের প্রদর্শিত পথে ব্রাউনিঙ্গের দুই তিনটি কবিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আজ পর্য্যন্ত কোন প্রৌঢ় বাঙ্গালীর ক্ষমতায় কুলায় নাই। ভারতবর্ষে Browningএর কবিতাবলী এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য নির্ব্বাচিত হয় নাই। এজন্য এখনো এদেশে ব্রাউনিঙ্গের পশার জমে নাই! সতীশচন্দ্র বি, এ, পড়িতে পড়িতেই ব্রাউনিঙ্গ বুঝিতে-ছিলেন। ইহাকে বলে প্রতিভা।

সতীশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন। বোলপুরের অজিতচক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার রচনাবলী প্রকাশ করিয়াছেন; ভালই হইয়াছে। এই ছাপা, আদর্শস্থান,

চিন্তাহীন, বাগাড়ম্বরপূর্ণ কবিতারাশির দিনে সতীশচন্দ্রের গভীরতা, গাম্ভীর্য্য, ওজস্বিতা ও ভাবুকতা উদীয়মান লেখকসম্প্রদায়কে সাধনার প্রণালী দেখাইয়া দিবে। বোধ হয় সতীশচন্দ্র তোমাদের নিকট কর্কশ, নীরস, শ্রুতিকঠোর বোধ হইবে, কিছু দুর্ব্বোধ্যও মনে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার প্রাণময়ী কবিতার মধ্যে পাইবে "জীবন, জীবন ভাই, আনন্দ জীবন।" সতীশচন্দ্র পালোয়ান— বিভীষিকার সঙ্গে, দুঃখের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিতেছেন। তিনি দৃঢ়পদে জীবন-সমুদ্র-মন্থনে ব্যাপৃত। সতীশ মানুষ, মেষ সুলভ দুর্ব্বলতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই।

"রৌদ্র-মগ্ন কবির চিঠি" বাঙ্গালায় নব যুগ আনিতেছিল—উদারতার যুগ, বিপুলতার যুগ, Sublimityর যুগ, সবলতার যুগ, যথার্থ ক্ষমতার যুগ, জীবনের যুগ।

"মনে পড়ে সে বালকে? বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্য্যের যেন এক দান—
বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে?
চৌদিকে প্রকৃতি তার হাস্য প্রসারিছে
আনন্দ ভ্রূকুটিমুক্ত, উদার নবীন।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
গরু রাখি তরুছায়ে, তরুমূলে শুয়ে,—
সমুদ্র নয়ন, মাথা হস্ত পরে থুয়ে,
রৌদ্র করে অনুভব, সিন্ধু অনুভব,
সুখ স্পৃষ্ট প্রাণে প্রতি বিন্দু অনুভব।

* * *

কত ফিরিলাম,—
কোথা লোক? প্রাণ যার মুক্ত? পৃথিবীর
সর্ব্ব ছাপ পড়ে যেথা? লঘু কি গভীর—
প্রতি কণ জড় জীবে রন্ধ্র এক করি'
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি?
দৃঢ়-বাহু ওই জেলে ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্র মাঝে করিয়া ক্ষেপণ
নিজেরে সহসা, বহু ডুলিয়া ডুবিয়া
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া—
হাস্যমুখে ফলাশ্বস্ত ফেলে কর্ম্মজাল—
"নিশ্চয় উঠিবে মৎস্য"—ধৈর্য্য-দৃঢ় ভাল।
সে লোক নিশ্চয় অতি ঘোর ভাল বাসে
—তা' ন'লে কি জলে পড়ি ওইরূপে হাসে?
—জীবন, জীবন ভাই। আনন্দ জীবন।

এ কলিকাতায়
দাঁড়াইয়া পরাণের সমুদ্র-বেলায়
দিনু ছুঁড়ি পত্র খানি। ওগো কবিগণ,
তোমরা বুঝিয়া লও কি এ জলপন।"

অকালে পরলোকগত প্রতিভাবান কবির কথা উঠিলে বিলাতী কীট্‌সের নাম মনে পড়ে। কিন্তু ব্রাউনিঙ্গ-সুলভ এ ক্ষমতা সৌন্দর্য্যোপাসক কীট্‌সের বেশী আছে কি? সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে এ উদাত্তসঙ্গীত কতবার উঠিয়াছে? এ যে বিবেকানন্দের "নাচুক সেথায় শ্যামা" ইহার জন্য বিপুল অথচ সরল আয়োজন আমরা ইহার ক্রমবিকাশ বুঝিবার জন্য অন্যান্য অপ্রকাশিত কবিতাগুলি দেখিতে পাইলে সুখী হইতাম। অজিত বাবু "সে গুলির কোনটাই তেমন আকার প্রাপ্ত হইয়া উঠে নাই" বলিয়া চাপিয়া রাখিয়াছেন।

সতীশচন্দ্রের 'জন্মদগ্ধা,' 'চণ্ডালী,' 'দুঃখদেবতার মূর্ত্তি,' 'ভগ্ন-নগরে প্রেম-সম্মিলন,' 'ভগ্নবাড়ির দেবতা,' আজকালকার 'ঝরা ফুল' 'ফুলের ফসল' 'বিল্বদল' 'একতারা' 'রেখা' 'লেখা' হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কবিতাবলীর নামগুলিতেই আকাশ-পাতাল পার্থক্য! সতীশচন্দ্র একটা নূতন রাজ্য গড়িতেছিলেন— তাঁহার কল্পিত কাব্য-প্রাসাদের অন্দরমহলে

প্রবেশ করিবার অধিকার তাঁহার সমসাময়িকগণ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

করুণানিধান—সত্যেন্দ্র দত্ত—কুমুদরঞ্জন—কুমুদনাথ—যতীন্দ্র বাগ্‌চি প্রভৃতি কবিকুল অন্তর্জ্জগৎ, প্রকৃতির ভিতরকার কথা, মানবের ভিতরকার কথা, জীবনের গূঢ় রহস্য এ সব বিশ্লেষণ করিতে পারেন না। তাঁহারা রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন—ভাষার কসরত, স্বল্পমাত্র নিম্নশ্রেণীর intellectual gymnastics, কলাচাতুর্য্য, শিল্পনৈপুণ্য, চামড়ার চোখ-কান, বাহিরের আবরণ ইত্যাদি লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত। সতীশচন্দ্রের গাম্ভীর্য্য ও sublimity লাভ করা ত দূরের কথা—ইঁহারা তাহার সংবাদই এখনও পান নাই।

করুণানিধানের নবপ্রকাশিত 'শান্তিজলে' এই উদীয়মান কবিগণের ক্ষমতার দৌড় ও সীমা দেখাইতেছি। কবি তাজমহল দেখিতেছেন—বিশ্বসংসারকে, মানবজগৎকে, প্রকৃতিকে ইঁহারা সকলেই এই স্থূলচোখেই দেখিয়া থাকেন—

"আসিয়াছি আজি প্রবাসী পান্থ
হেরিতে কান্তি রাশি—
বসিয়া তোমার অলিন্দতলে
হেরিব বিমল হাসি।
বিরাট্‌ দুর্গ-সোপান বাহিয়া
যমুনায় তুমি আসিতে নামিয়া,
কি সুর ধরিতে, মুকুতা তরীতে—
সখীরা বাজাত বাঁশী,
কত না আদরে প্রেমের পেয়ালা
আধেক করিয়া খালি,
মল্লী মুকুল- তুল্য তোমার
অধরে দিত কে ঢালি?
রক্তিম উঠিত ফুল্ল কপোল,
চুম্বন রাগে বিলোল বিভোল,
আনার অঙ্গুর রসে-পরিপূর
স্নেহ-উপহার ডালি।"

ইঁহার সঙ্গে rugged বা শ্রুতি-তিক্ত কিন্তু গাম্ভীর্য্যময় সতীশচন্দ্রের 'বামুন শূদ্র তফাৎ'—ভাষায়, ভাবে, ছন্দে, 'প্রেরণায়'। অথচ এই খানেই আমাদের নব্য কবিকুলের generic style বা সাধারণ রচনা-কৌশল। ইঁহাদের প্রায় সকলের মধ্যেই টেনিসনের ঝঙ্কার পাইবে—শব্দসম্পদ পাইবে—অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি পাইবে—সুললিত লিপিভঙ্গী পাইবে—অলঙ্কার পাইবে—ভাব-দারিদ্র্য ঢাকিবার জন্য সহজ সরল অথবা কষ্ট-কল্পনা-প্রসূত ভাষার ছটা এবং ছন্দের গরিমা পাইবে। পাইবে না কেবল ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নবজীবন—"she gave me eyes, she gave me ears!" পাইবে না হিন্দুর অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্মবিচার, গভীর চিন্তাশক্তি। পাইবে না—

"আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা"

—সেই situation বা দেশ-কাল-পাত্র সৃষ্টি করিবার যোগ্যতা। পাইবে না রবীন্দ্রনাথের গভীরতর শিল্পনৈপুণ্য, সূক্ষ্মতর আর্ট—যাহার চাপে মানবাত্মা এবং প্রকৃতি-হৃদয় লুপ্ত ও হতপ্রভ হয় না—বরং যে কলাচাতুর্য্যের সাহায্যে বিশ্বের জীবন-স্পন্দনই পাইবে না আমরা প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতে পারি। জগৎকে বুঝিবার ক্ষমতা, ভিতরকার কথা টানিয়া বাহির করিবার প্রয়াস। পাইবে না সতীশচন্দ্রের "ছায়ায়াং গর্ভসম্ভূতং"-কবিতা নিবদ্ধ যথার্থ কল্পনাশক্তি। পাইবে না ব্রাউনিংএর—

The other side, the novel
Silent silver lights and darks
undreamed
Where I hush and bless
myself with silence."

একবার নীরব হইতে শিখ, চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে শিখ, সাধনা করিতে শিখ—তবে জগৎকে শিখাইতে পারিবে—তোমাদের রচনাগুলি টিকিয়া যাইবে—বন্ধুর-পাঠ এবং শ্রুতিকঠোর হইলেও অমর হইতে পারিবে।

'বিল্বদলে'র শেষ কবিতায় শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী এই নীরব সাধনার কথা তুলিয়াছেন—

"চুপ্ কর—শান্ত মোর গতিবিধি আজ।
আলোক-বাতাস-বন্যা ছুটে চলি যায়,
পিয়ে লব তরুসম পাতায় পাতায়,
কোথা গুপ্ত রহে রস পাতালের মাঝ,
পাঠায়ে শিকড় তারে লইব শুষিয়া!
কুসুমে সুষমা মাখি', শেষে একদিন
ফুটিয়া রহিব চেয়ে বিরাম বিহীন!
সহসা, কে জানে, অলি কেমনে আসিয়া
গোপনে পরাগ ঢালি গর্ভকোষে মোর
ফলেরে জনম দেবে! সেদিন সুদিন,
দীপিবে জীবন মোর সফল নবীন,
ব্যাপিবে সারাটা দেহে পুলকের ঘোর।"

কুমুদ লাহিড়ী বেশী কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। 'বিল্বদল' হইতে বাঙ্গালী দশ বিশ লাইন স্মরণযোগ্য কথা পাইবে মাত্র। 'তুমি', 'পদ্মা', 'স্বাস্থ্য', 'তন্ময়' প্রভৃতি কবিতায় গাম্ভীর্য্যের পরিচয় আছে—একটা নূতন সুর উঠিতেছে। কিন্তু অত অনুসন্ধান করিয়া কে পাঠ করিতে বসিবে?

করুণা-নিধানও 'চণ্ডীদাসে' এই নীরবতা, অপ্রগল্‌ভতা এবং তন্ময়তার কথঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাইয়াছেন—

"বারটি বছর চেয়েছিল কভু
কহ নি একটি কথা,
ঝরিত তোমার আঁখির পাতায়
স্বরগ-নির্ম্মলতা!
এমনি করিয়া ফুরাইত দিন,
তোমার হিয়ার মাঝে
কেহ জানিত না রসমূর্চ্ছনা,
সুধার রাগিণী বাজে!"

এই "কেহ জানিত না"-অবস্থা হইতেই গাম্ভীর্য্যের, গভীরতার, ব্যাকুলতার উদ্ভব হয়। এই "কেহ জানিত না"-অবস্থা আমাদের কবিকুলের বড় অল্প। তাঁহারা নিজে মজিবার পূর্ব্বেই অন্যকে কিছু দিতে চাহিতেছেন!

তোমরা অমর হইতে চাহ? তাহা হইলে মরজগতের ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া যাও, নিজকে ভুলিয়া যাও, নিজকে ডুবাইয়া ফেল; আত্মহারা তন্ময় হইয়া পড়, নিজের যাহা সত্য সত্যই দিবার আছে দিয়া যাও, পাওনার কথা ভাবিও না। কর্ত্তব্য করিয়া চল, দেখিবে সমগ্র ভারত অমর হইবে। ভারতের অমরতার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমি, রামা শ্যামা, মুচি ম্যাথর, কুলী মজুর, আমাদের দাঁড়কাক ময়ূর, প্রতি ধূলিকণা—সবই অমরতা লাভ করিবে। ভবিষ্য সমাজ অতীতের নীরব সরব সকলকেই টানিয়া বাহির করিবে—জননী কাহাকেই ভুলিয়া থাকিবেন না—যাঁহার যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু তাঁহাকে দিবেন। এ বিশ্বাস তোমার হৃদয়ে নাই? তবে বৃথাই তুমি কবি সাজিয়াছ!

চোখ খুলিয়া জগতের অবস্থা দেখিতে চেষ্টা করিলে বুঝিবে—আজকাল রবীন্দ্রনাথ বিদেশে যে পূজা পাইতেছেন তাহার প্রধানতম কারণ বিশ্বে ভারতের গৌরবপ্রচার। ভারত-মাহাত্ম্যেই পাশ্চাত্য জগতে রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা

ঘটিয়াছে। ভারতের গৌরব ও প্রভাব পূর্ব্ব হইতেই পাশ্চাত্যেরা অনুভব করিতেছিলেন। এইজন্যই তাঁহারা আজ রবীন্দ্র-প্রতিভাকে সম্মান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। সেইরূপ ভারত-মাহাত্ম্যেই তোমাদেরও কীর্ত্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে।

সত্যেন্দ্রনাথের "আমরা বাঙ্গালী সাত-কোটি ভাই বাস করি সেই বঙ্গে"-কবিতাটি অমর হইবে। এখনই ইহা দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশে'র সমকক্ষ—ভবিষ্যৎ সমালোচনায় আরও উন্নত হইবে। বঙ্কিমের 'বন্দে-মাতরং' জগতের ভক্তি-সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাহার সঙ্গে তুলনা কোন রচনারই চলিতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গের জাতীয় সঙ্গীতে যে নূতন শক্তি ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন তাহারই ক্রমবিকাশ সত্যেন্দ্রনাথের এই গানে দেখিতে পাইতেছি।

সাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া সুন্দর চিত্র আঁকিতে সত্যেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। তাঁহার অনুবাদ-কবিতাগুলিও অতি মনোরম। এগুলি বঙ্গসাহিত্যের ঐশ্বর্য্য ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা সত্যেন্দ্রনাথকে একটা 'বরাত' দিতেছি। তিনি আমাদের সাহিত্যে দরিদ্রের ক্রন্দন—অশিক্ষিতের আর্ত্তনাদ—জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা—মফঃস্বলের বাণী—তুলিতে আরম্ভ করুন। সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে ইহা সম্ভব—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র অঙ্কনের দ্বারা ইহা সহজেই সাধিত হইবে। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও আধুনিক ঐতিহাসিক অনুসন্ধানগুলি আলোচনা করিলে বহু দেশ কাল পাত্র পাইবেন। বিলাতী বারণস্, চ্যাটারটন, অসিয়ান, জার্ম্মান্ হাডার, এবং রুশ করমসিনের সূত্র ধরিলে বঙ্গসাহিত্যে একটা অপূর্ব্ব জগৎ আনিয়া ফেলিতে পারিবেন। সে ক্ষমতা তাঁহার আছে দেখিয়াছি।

এই নূতন জগতে—

"নেতা তাদের তরুর মত স্তব্ধ দৃঢ় দুঃখজিৎ,
নিজের মাথায় বজ্র ধরেন, বিজয় তাঁহার
সুনিশ্চিত।

* * *

সুরু হ'ল নূতন নাট্য সূত্রধরের নূতন নাট,
সাগর পারে গান্ধী করে জাতীয়তার নান্দী
পাঠ।"

* * *

"ধর্ম্ম আচার করছে তারা যাচ্ছে জেলে
সস্ত্রীকই,
বিনা অস্ত্রে করছে যুদ্ধ, রুখবে তাদের অস্ত্রে
কি?"

আমরা অনেকবার বলিয়াছি এটা, আমাদের নবজীবনের দ্বিতীয় যুগ চলিতেছে। তাহার এক লক্ষণ "জন সাধারণের" অভ্যুদয়। সত্যেন্দ্রনাথ এই "জনসাধারণের যুগে"র কবি হইতে পারিবেন। দরিদ্রের সংসারে সত্যেন্দ্রনাথ বিচরণ করিতে পারেন। দারিদ্র্যের মহানাট্যে পঠনোপযোগী 'নান্দী' তিনি রচনা করিয়াছেন:—

"নির্ব্বিরোধী ভারত-প্রজা আড়কাটিদের
অত্যাচারে
স্থান হারায়ে মান হারায়ে প্রবাসী আজ
সাগর পারে,
কেউ বা করে দিন মজুরী, কেউ বা
ক্ষুদ্র দোকান দার,
তাদের শ্রমে শ্যামল আজি মরুস্থলী
আফ্রিকার।
রবার-গাছের ছায়ায় তাদের পঞ্চায়তের
হয় জনতা,
বো-বাব গাছের তলায় ব'সে রামায়ণের
কথকতা।

মৃদং বাজে, সারং বাজে, মাদল বাজে,
মন্দিরা,
ভারত-স্বপন জাগায় যেথা পরবাসের বন্দীরা।
আজকে তাদের বন্ধ সারং মাদল মৃদং
মৌন হায়!
সবাই যদি মনে কর তো আবার তারা
সাহস পায়,
সবাই যদি মনে কর তো চেষ্টা তাদের
হয় সফল,
দেশের সুনাম বজায় রাখে উকীল-কুলী-
বেনের দল।
অপমানের ঐক্যে আজি এক হয়েছে
ভারত-প্রজ।
হিন্দু মুসলমানের মিলন অসম্মানে হচ্ছে
সোজা।"

করুণানিধান ভারতবর্ষের বিচিত্র স্থান-গুলিকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার শিল্পে আমাদের ঐতিহাসিক ও ধর্ম্ম-জগৎ প্রধান স্থান পাইয়া থাকে। বাঙ্গালীকে মাতাইবার পক্ষে এই আলোচনাই বিশেষ কার্য্যকরী। করুণানিধান আমাদের জাতীয়-জীবন গঠনোপযোগী দুইটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বাছিয়া লইয়াছেন। তিনি অতীতকে কথা কহাইবার প্রয়াস পাইতেছেন, এবং আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে কবিতায় প্রকাশ করিবার ভার লইয়াছেন।

কিন্তু দেশের মাটিটাকে আর একটুকু ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করুন। তাহা না হইলে রচনাগুলি মরমে পশিতেছে না। কেবলমাত্র হিন্দুর পবিত্র জনপদসমূহের আলোচনা করিলেই হিন্দুত্ব বুঝান হইল না। হিন্দু সাহিত্য, ধর্ম্ম ও দর্শনের কয়েকটা পারিভাষিক শব্দ ছড়াইতে জানিলেই হিন্দুর বাণী প্রচারিত করা হয় না।

বাগ্‌ছি মহাশয়ের একটা স্বাভাবিকতা, সরলতা আছে। কিন্তু পূর্ব্বেঃ বলিয়াছি নব্যকবিগণ সকলেই বাহ্য প্রকৃতির মাধুরী লইয়া নাড়াচাড়া করেন। ভাব অতি অল্প-মাত্র—ইঁহাদের বলিবার কথা বড় বেশী নাই—কেবল আর্ট-ফলান—কথা কাটাকাটি। এক কথাই সত্যেন-যতীন-করুণানিধান 'খাড়া থোরবড়ী' 'থোরবড়ী খাড়া' 'বড়ী খাড়া থোর' রূপে প্রকাশ করিতেছেন। এই শ্রেণীর কবিতাগুলির নীচে যদি লেখকের নাম প্রকাশিত না থাকে তাহা হইলে অনেক সময়ে যতীন, সত্যেন, করুণানিধান ইত্যাদি প্রভেদ করা অসম্ভব। বোধ হয় কাল-হিসাবে করুণানিধান এই যুবকদলের প্রবর্ত্তক।

'একতারা'র লেখক কুমুদ মল্লিককে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি:—"একতারাতে একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজা।"

"উজানীতে" আপনার 'তার'। বাঙ্গালায় অনেক উজানী আছে—সেগুলিকে কাব্যে চিত্রিত করুন। রামপাল, রামাবতী, রাম-কেলী, কেন্দুবিল্ব, বিক্রমপুর, সপ্তগ্রাম, কামাখ্যা, শ্রীহট্ট ইত্যাদি অসংখ্য ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক তীর্থক্ষেত্র বঙ্গের ভাবুকগণকে আহ্বান করিতেছে। আমরা দেখিয়াছি, কুমুদ-রঞ্জন পল্লীর "মূক মুখে ভাষা দিতে" পারেন। আমাদের বিশ্বাস—তিনি ধর্ম্মভাবে বাণীপূজায় অগ্রসর হইলে দশবৎসর পরে পল্লীরাণীর ভগ্নবুকে আশা ধ্বনিয়া তুলিতে পারিবেন।

মাঝে মাঝে শুনিতে পাই—এটা "রবীন্দ্র-সাহিত্যের যুগ"। মিথ্যা কথা। রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল সূত্র কোন উদীয়মান লেখকই ধরিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ 'ভাবুকতা'র প্রতিমূর্ত্তি। ভাবুকতা কাহাকে বলে গত

সংখ্যায় তাহার আলোচনা করিয়াছি। আমাদের এই শিশু কবিগণের মধ্যে যে ভাবুকতা একেবারেই নাই বলিলে ইঁহাদিগকে নিতান্তই নিন্দা করা হইবে না, কারণ সে ভাবুকতার অধিকারী হওয়া ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ। আমাদের প্রধান দুঃখ এই যে, দেশে সাধারণ ধরণের চিন্তাশক্তি এবং ভাবেরই যৎপরোনাস্তি অভাব পড়িয়াছে—যথার্থ ভাবুকতার দুর্ভিক্ষ ত লাগিবেই। আমাদের কবিগণের অন্তর্জ্জগৎ বড়ই অন্তঃসারশূন্য—বড়ই দরিদ্র, "বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার!" রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে আমরা ত্রিশ বৎসরের ভিতর পাইব কিনা জানি না।

ভাবের এত দৈন্য আসিল কোথা হইতে?

যুবক বাঙ্গালার অন্যান্য মহলে ভাবের ত অভাব দেখি না—বরং যথার্থ ভাবুকতাই যথেষ্ট দেখিতে পাই। কেবল কবি-মহলে ভাবের দৈন্য আসিল কোথা হইতে?

সতীশচন্দ্রের ন্যায় ইঁহাদের সাধনা নাই বলিয়া—অথবা সতীশচন্দ্রের ন্যায় ইঁহারা "স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি" লইয়া নৈসর্গিক প্রতিভা লইয়া জন্মেন নাই বলিয়া।

এই কবিকুল ভাব-সাগরে ডুবিতে পারেন না, ভাব সৃষ্টি করিতে পারেন না। নিজে তন্ময় হইতে জানেন না—অন্যকে মজাইতে পারেন না। ইঁহারা সাধারণতঃ দুই একটা ভাব এখান ওখান হইতে—দুই চারি পাতা ইংরাজী কাব্য, দুই চারিখানা রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র ঘাঁটিয়া সংগ্রহ করেন মাত্র। সেই দুই একটা পরকীয় ভাব নিজের কথায় নানা ঘটনার সাহায্যে ফলাইতে যাইয়া শব্দের আড়ম্বর এবং ভাষার কছরত করা হইয়া থাকে। কেবল মাত্র যে স্থলে সাময়িক ঘটনা, অথবা একটা পল্লীচিত্র, অথবা কোন ঐতিহাসিক স্থান বর্ণনা করিতে হয়, সেখানে কবি-ক্ষমতা দেখিতে পাই বটে, কিন্তু বেশী কিছু শিখিতে পাই না—আমরা মাতিয়া উঠি না। এখনও ইঁহাদের স্বতন্ত্র "message" বা বাণী কিছুই পাই নাই।

আমরা এখনও শিল্পের আসরে, কাব্যের আসরে, সমালোচনার আসরে, ইতিহাসালোচনার আসরে সর্ব্বত্রই "পরমুখে ঝাল" খাইতেছি। পরানুকরণের যুগ এখনও আমরা পূর্ণরূপে কাটিয়া উঠিতে পারি নাই। এজন্য সৃষ্টি করার শক্তিও বাড়িতেছে না—রসাস্বাদনের ক্ষমতাও বাড়িতেছে না। চট্টগ্রামের কবি পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী সরল সহজ প্রাণের কথায় আমাদের এই পরনির্ভরতা দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার "নন্দিরা" পাঠ করুন

"শরীর না হেরি সাজ, দেখি আহা
বাঙ্গালীর প্রাণ মজে।
পর মুখে সবে শুধু ঝাল খায়
নিজে কিছু নাহি বুঝে।
প্রবীণ পণ্ডিত লিখেছে ভূমিকা
তাই ভাল বহি খানি।
প্রসিদ্ধ লেখক ছাত্র বাবু মুখে
শুনিয়ে প্রশংসা বাণী।
সপ্তাহে মাসিকে পাক্ষিকে দৈনিকে
হইতেছে তোলপাড়।
কান ঝালা পালা হুজুগেতে আহা
অসংখ্য গ্রাহক তার।

* * *

সুন্দর বাঁধানো লেখা স্বর্ণাক্ষরে
রূপে ঝক ঝক করে।
এত প্রলোভনে ধৈরয রাখিতে
পাঠক কভু কি পারে?
সম্পাদক কিবা সমালোচকেরা
লেখকের হলে ভাই।

মাতুল শ্বশুর শালা শালিপতি
সম্বন্ধীর কথা নাই!
ডালি ভেটী কিবা কিছু দক্ষিণান্ত
করিতে যে জন পারে।
সাহিত্য আসরে তার নাম আগে
উঠে জয় জয় কারে!
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম
লেখকেতে ভাগ আছে।
কার্য্যক্ষেত্রে আগে দেখি রেষারেষি
নব্য বাঙ্গালীর কাছে।
বিচারি না দেখে লেখার ভিতর
কিবা ভাব কিবা রস।
আড়ম্বরে আগে ভুলি যায় সবে
বিজ্ঞাপনী দেখি বশ!
হেন সুপণ্ডিত আছে বহু জন
বহি খানা নাহি পড়ি।
মতামত তার করিছে প্রকাশ
শুধু তার নাম হেরি:
কুবেরের নামে উৎসর্গ দেখিয়া
পাঠক ভুলিয়া যায়!
হায় আধুনিক বঙ্গীয় পাঠক
পর মুখে ঝাল খায়।'

কথাগুলি বড় তীব্র—কিন্তু বড় মধুর। ইহা মফঃস্বলের বাণী—এই জন্যই এত সরস, সজীব, স্বাভাবিক, স্বাধীন। পূর্ণচন্দ্রের কবিতায় আন্তরিকতা, সহৃদয়তা অন্যত্র দেখিয়াও পুলকিত হইয়াছি। পূর্ণচন্দ্র এ পথে চলিতে পারিলে সমাজে ও সাহিত্যে সংস্কার সাধিত হইবে।

বঙ্গে ইহা উন্নতির যুগ চলিয়াছে। উদীয়মান বঙ্গসমাজ আমাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন দেখাইতেছে—নূতন কর্ম্মের প্রণালী, অভিনব চিন্তার প্রণালী, যথার্থ সাধনার প্রণালী দেখাইতেছে। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র আমরা সাহিত্য সাধক, পল্লীসেবক, শিক্ষা-প্রচারক, মানব সেবক, কর্ম্মবীর ও ধর্ম্ম প্রচারকের অভ্যুদয় দেখিতেছি অর্দ্ধোদয় যোগে—দামোদরের বন্যায় আমরা সেই নবীন শক্তির পরিচয় দিয়াছি। এই সর্ব্বময় উন্নতির কালে সাহিত্যের কাব্য-বিভাগই কি সকলের পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে? নব্যবঙ্গের কাব্য সাহিত্য কি বাঙ্গালা দেশকে নূতন কোন বস্তুই উপহার দিবে না? কোন mission, কোন ধর্ম্ম, কোন বাণীকে হৃদয়ের অন্তর্যামী না করিয়াই কি ইহার জন্ম হইয়াছে?

হে নবীন কবি-সম্প্রদায়, তোমরা কি মাতিয়া উঠিবে না? তোমরা কি বলিতে শিখিবে না?—

"আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।"

তোমাদেরই কোন [illegible] কথায় বলিতেছি:—

"চাহ চাহ মতিমান্,
[illegible] দিশাল জগতে,
[illegible]দের কর্ম্মধারা
কত দিকে আবর্ত্তিয়া ধায়।
কত সাধ কত আশা
জেগে ওঠে সাধিতে কল্যাণ!
মানুষের শক্তি লয়ে
কীট সম ব্যর্থ কর তারে?"

সুতরাং—"ভুলে যাও বর্ত্তমানে,
ভেঙ্গে ফেল জড়তা-শিকল
দূর ভবিষ্যতে চাহি'।
ভাসে ধরা আলোক-বন্যায়—
দুয়ারে পাখীর মত,
আজি তোমা ডাকি প্রাণ পণে
বাহির হবে না তুমি?"

কলিগ্রামের

শিবমন্দির

India Press, Calcutta

উদীয়মান কাব্য-সাহিত্যে ভাষা-বৈভবের উল্লেখ করিলাম—ভাব-দৈন্যের কথাও বলিলাম। এখন কাব্যে আলোচিত বিষয়ের কথা কিছু বলি। এদিকে একটা লাভই হইয়াছে—আমাদের সাহিত্য-সম্পদ বাড়িতেছে। বাঙ্গালা দেশটা আমাদের কাব্যে স্থায়ী হইয়া যাইতেছে।

ভারতের নদ-নদী, বন-উপবন, পল্লী-নগর, এবং নরনারী, গাড়োয়ান জেলে মাঝি ম্যাথর মজুরের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বিশেষতঃ করুণানিধানের কাব্যে হিন্দুজগতের চিত্র উজ্জ্বল হইতেছে। ঢাকার 'প্রতিভা'য় দেখিলাম শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন কুশারীর "পল্লী"-নামক কবিতা-গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এইরূপে বাস্তব সমাজ-সংসারের অলিগলি খুঁটিনাটি আমাদের চিন্তার সামগ্রী হইতে চলিয়াছে। সাহিত্য-সম্মিলন, নৈশ-শ্রমজীবি-শিক্ষালয়, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান,'বৈষয়িকতথ্য-সংগ্রহ,' 'জাতীয় শিক্ষা,' হিন্দু-মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয়, পল্লীসেবা, 'দরিদ্র-নারায়ণে'র পূজা, জনশ্রুতি-প্রবাদ-ব্রতকথা-ভাটিয়াল গান-সংগ্রহ, ভারতীয় সমুদ্র-বাণিজ্য-ও জাহাজ-তত্ব এবং চিত্রকলা, রসায়ন, আকর-বিজ্ঞান, ও উদ্ভিদ্-তত্ব, 'চাকমা জাতির ইতিহাস,' 'আদ্যের গম্ভীরা' এবং 'গৌড়রাজ-মালা'র যুগে বঙ্গ-কাব্যের এই মূর্ত্তি নিতান্তই স্বাভাবিক।

ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাসের নবাবিষ্কৃত অনেক দৃশ্য ও ঘটনা কাব্যে এবং শিল্পে চিত্রিত হইবার যোগ্য ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। উদীয়মান কবি ও চিত্রকরগণ, কেতাবপাঠ বন্ধ কর, পরানুকরণ পরানুবাদ বিদায় দাও, দেশের মাটির সঙ্গে গভীরতর আত্মীয়তা স্থাপন কর। দেশমাতার নিকট হৃদয়ের সহিত কাঁদিয়া বলিতে শিখ:—

"ও গো মা মৃন্ময়ি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই।
* * * * *
আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্ব্বমাঝে; যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্র রূপে।"

ভাবের জন্য আর ভাবিতে হইবে না,—ভাবুকতার দুর্ভিক্ষ ঘুচিয়া যাইবে। ভারতাত্মার উৎস হইতে ভাবের বন্যা ছুটিবে—এই সরস সজীব ভাবপুঞ্জ আবার নিজেই তাহার বিচিত্র ভাষা গড়িয়া লইবে। তখন প্রয়োজন হইলে তোমরা সতীশচন্দ্রের ব্যাকুল আত্মার ন্যায় আবেষ্টনকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া, ভাষাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাহির হইতে পারিবে।

পল্লী-পরিচয় *

মালদহের কলিগ্রাম

আজি এই শুভদিনে এই সামান্য ক্ষুদ্র পল্লীতে যে পরহিতৈষী মনস্বিগণের শুভাগমন ও একত্র সমাবেশ হইয়াছে ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। সাহিত্য-সমালোচনা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার দর্শিলেও যথেষ্ট মনে করা যাইবে।

লোকে ছানা মাখন দিয়াও অতিথি সৎকার করিয়া থাকে, আর যাহার কিছুই

* কলিগ্রামের মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত, কার্ত্তিক, ১৩২০।

সম্বল নাই, সে খুদ-কুঁড়া দিতেও লজ্জাবোধ করে না। সেইরূপ আমাদের এই সামান্ত গ্রামে এমন বিশেষ কোন ঘটনাবলী না থাকিলেও আমরা দিদিমার কাহিনী লইয়াই উপস্থিত হইতেছি।

এই গ্রামের অনতিদূর পশ্চিমে চাঁচল গ্রামের নিম্ন দিয়া মহানন্দা নদী প্রবাহিত হইত, তাহা আজকাল মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। চারিদিকে বিল-ভূমি। মাঝে মাঝে দ্বীপের মত বাসোপযোগী যৎসামান্ত উচ্চভূমি ছিল। তাহাতে প্রথমতঃ কতকগুলি পাঠানবংশীয় মুসলমান, রায়বংশীয় তিলিগণ ও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন আসিয়া বাস করেন। তারপর ক্রমে ক্রমে পুরোহিত ব্রাহ্মণ, গোস্বামী বংশ, লাহিড়ী-বংশ ও কাঁসারী, নাপিত, গোয়ালা প্রভৃতি নানা জাতি বাস করায়, ইহা বৃহৎ পল্লীতে পরিণত হয়। এখানকার প্রধান অধিবাসী পাঠান-বংশ, গোস্বামী-বংশ ও লাহিড়ী-বংশের বর্ণনা করিতে গেলে জ্ঞাতব্য বিষয় সকল অনেক পরিমাণে পরিস্ফুট হইতে পারে।

মুনিকান্ধা, প্রতাপপুর, কৃষ্ণপুর, আলিগঞ্জ, নুরগঞ্জ, মহতাপাড়া, ভবানীপুর, সবদলটোলা ও মনোহরটোলার সমষ্টি কলিগ্রাম বলিয়া অভিহিত। তন্মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে চারি পাঁচটী পাড়া একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ লোক-সংখ্যা শোনা যাইত এক্ষণে গ্রামে তাহার একচতুর্থাংশও আছে কি না সন্দেহ।

পূর্ব্বে এই গ্রামের ব্যক্তিগণ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। ভদ্রবংশ-সম্ভূত মুসলমান ও ব্রাহ্মণের হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে আরবি, পারসি ও উর্দ্দু ভাষা শিখিয়া জ্ঞানসম্পন্ন হইতেন; এবং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা যথেষ্ট জ্ঞানোপার্জ্জন করিতেন। কৃষি, শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে অনেকের অনুরাগ ছিল। তৎকালে নৌকাপথে দূরদেশ হইতে মাল আমদানি-রপ্তানি হইত। কৃষিকার্য্য দ্বারা নানা জাতীয় শস্য, ধান্য, শণ, নীল প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। এই গ্রামের সন্নিকটে নবগ্রামে ও চাঁচলে বৃহৎ বৃহৎ নীলের কুঠি ছিল, এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ কিছু কিছু রহিয়াছে। প্রায় ৪।৫ মাইল দূরে ডুমরাহাল গ্রামে যথেষ্ট দোলো বা ভুরা চিনি প্রস্তুত হইত। এই গ্রামে এবং এই প্রদেশে বহু তাঁতীর বাস ছিল। তাহারা বহু মূল্যের ভাল ভাল ধুতি, চাদর, গামছা, মশারি ও এমন কি ৩০।৪০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের অতি সূক্ষ্ম তঞ্জেবের থান প্রস্তুত করিত। নানা স্থান হইতে ব্যাপারী আসিয়া মুর্শিদাবাদ, পুর্ণিয়া, পাটনা, নেপাল ও ভোটান প্রভৃতি নানা স্থানে কাপড় চালান দিত। গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি গোলা-গঞ্জ ও ডচ্‌দিগের একটী সুবৃহৎ কাপড়ের কুঠি ছিল। স্থানীয় জমীদারদিগের সহিত বিবাদে ঐ কুঠিটী উঠিয়া যায়। অল্প দিন হইল কুঠির ভগ্ন প্রাচীরের স্তূপগুলি এখান হইতে অপসারিত হইয়াছে। এই সভার এই স্থানেই সেই ডচ্‌ফ্যাক্টরি ছিল।

অনাথা বিধবা রমণীগণ টেকোতে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কার্পাসতন্তু নির্ম্মাণ করিয়া মাসে মাসে ২৫।৩০ টাকা পর্য্যন্ত উপায় করিত। এখানকার কাঁসারীদিগের নির্ম্মিত বাসনের মধ্যে পাল্লা-পিটা ঘটী একটী প্রসিদ্ধ জিনিস, যেমন টেঁকসই, তেমনই সুশ্রী; আজকাল যদিও চাদরের পিতল দ্বারা সুন্দর পসন্দসহি

ঘটী নির্ম্মিত হয় কিন্তু সেরূপ নহে। এখনও অনেক স্থানে কলিগেঁয়ে ঘটী ও কাপড়ের প্রসিদ্ধি আছে। আজিও যে কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ ইষ্টক-নির্ম্মিত জিন্দাপীরের বাঙ্গালা মসজিদ্‌খানি ও শিব-মন্দিরটী মস্তক উন্নত করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা এই গ্রামের শিল্পী দ্বারাই নির্ম্মিত। ঐ বাঙ্গালাগৃহ ও মন্দির-নির্ম্মাতা চিকু খলিফার মত রাজমিস্ত্রী ২৫।৩০ টাকা বেতন দিয়াও আজকাল পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, কিন্তু তৎকালে মাসিক ৪'৫ টাকা বেতনে ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে এই সুদীর্ঘ রাণীদিঘি ও শিব-মন্দিরটী জেলা পুর্ণিয়ার অন্তর্গত সাঁউরিয়াধিশ্বরী রাণী ইন্দ্রাবতী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

কলিগ্রাম-নিবাসী সজ্জুখাঁর চরণোদক পান করিলে কুষ্ঠব্যাধি নিবারিত হইবে দুরস্থ কোন ব্রাহ্মণের প্রতি বাবা বৈদ্যনাথের এইরূপ প্রত্যাদেশ হয়। তিনি অতি গোপনে ও সুকৌশলে সজ্জুখাঁর স্নানকালীন নর্দ্দমার জল পান করিয়া ঐ দুরারোগ্য ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সজ্জুখাঁ অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং ঈশ্বর-উপাসনায় মগ্ন থাকিয়া কালাতিপাত করিতেন। এমন কি কখন কখন ২।৩ দিন পর্য্যন্ত তিনি একাসনে অনাহারে ধ্যান মগ্ন হইয়া থাকিতেন। দৈবাৎ ঘটনাচক্রে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তাঁহার চরণোদক পানের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হওয়ায় তাঁহার জীবনের প্রতি অনাস্থা জন্মে। তিনি কয়েক দিনের উপযোগী খাদ্যাদি লইয়া জীবিত অবস্থায় গুহায় সমাধিস্থ হন।

তাঁহার অধস্তন বংশধর কর্ত্তৃক সমাধির উপরে এই বাঙ্গালা-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা বহুদিনের কথা নহে, প্রায় পৌনে দুইশত কি দুই শত বৎসরের কথা হইবে। তিনি জীবিত অবস্থায় গোর লইয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান জিন্দাপীর নামে অভিহিত হইয়াছে; এবং এই বাঙ্গালাটী জিন্দাপীরের মস্‌জিদ্‌ বলিয়া অভিহিত।

দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ করিয়া দিল্লী হইতে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দের কিছুদিন পূর্ব্বে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ধনরত্ন স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে কতকগুলি পাঠান বংশীয় মুসলমান বাণিজ্য করিবার জন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার পর স্বীয় স্বীয় নামে এক একটী পাড়ার নাম নির্দ্দেশ করিয়া বসতি করেন। যথা—নূর খাঁর নূরগঞ্জ, আলি খাঁর আলিগঞ্জ, সবদল খাঁর সবদলটোলা, মেহেমান খাঁর মেহেমান-টোলা, মনোহর খাঁর মনোহরটোলা ও কালে খাঁর কলিগাঁও বা কলিগ্রাম। সবদলটোলা বাসের অনুপযোগী মনে করিয়া পরে সবদল খাঁ কলিগ্রামের মধ্যস্থলে সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। উক্ত ব্যক্তি-গণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ও কোট্যধিপতি ছিলেন। তখন তিনিই কলিগ্রামের ভূস্বামী এবং সমগ্র রোকনপুর পরগণাটী তাঁহারই অধিকৃত ছিল। জীবিকা ও বসতির জন্য ব্রহ্মোত্তর ও মহোত্তর দিয়া বহু লোকের বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে সদাব্রত ও যথেষ্ট সদনুষ্ঠান ছিল। তাঁহার বাড়ীর তোরণটী আমরাও দেখিয়াছি, অল্পদিন হইল ঐ বাড়ীটী বিক্রীত হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র আচার্য্য তাহার অস্তিত্ব লোপ করিয়াছেন। তাঁহার বংশধরের মধ্যে একমাত্র ঘসীটের পুত্র খুদি খাঁ বর্ত্তমান আছে। কালে খাঁর বাড়ীটী সম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিয়াছি। যখন ঐ বাড়ীর বিবিরা মালদহে জামাতা

মবারক আলি খাঁর বাড়ী চলিয়া গেলেন তখন মোসাহেব খাঁ ও মরফুদ্দিন খাঁ বিক্রী করিয়া ঐ বাড়ীটী নষ্ট করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সজ্জু খাঁ ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ।

রায়চৌধুরী-বংশ

রাজসাহী বগুড়া অঞ্চলে তিন প্রকার তিলি ছিল। শিরস্থানে, মহাস্থানে ও দাস পঠি। যাহারা আত্রেয়ী নদীর ধারে বাস করিত তাহারা শিরস্থানে, আর যাহারা করতোয়া নদীর ধারে মহাস্থান প্রভৃতি জায়গায় বাস করিত তাহারা মহাস্থানে ও যাহারা দাস্যবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহারা দাসপঠি। এখানে মহাস্থান হইতে যে সকল তিলি আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে আটবংশ (নন্দী, কুণ্ডু, দে, পাল, চোঙ্গদার, বসাক, মল্লিক ও ত্রিমোহণী) মিলিয়া যে একটী সমাজ গঠন করিয়াছিল, তাহাদের নাম আটঘরিয়া। এ প্রদেশে পূর্ব্ব হইতে যে সকল তিলি বাস করিত, তাহাদের মধ্যে স্বীয় পরিজন অর্থাৎ জামাতা বা ভগিনীপতি মিলিয়া প্রত্যেকে এক একটী সমাজ গঠন করিত ; সেই জন্য তাহাদের নাম স্বঘরিয়া। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সমাজগত বিভিন্নতা হওয়ায় ভাষাগত ও ব্যবহারগতও অনেক বিভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু উভয় শ্রেণীই বারেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। নানা স্থান হইতে সমাগত লোকের বাসের জন্য আমাদের গ্রামে প্রত্যেক জাতির মধ্যে সামান্য রূপে ভাষার বিভিন্নতাও প্রচলিত আছে। এই স্থান মালদহের অন্তর্গত হইলেও সময় সময় পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর জিলার দেওয়ানী কোর্টের অধীন থাকায় এবং পূর্ণিয়া ও দিনাজপুরের সীমান্তস্থানের নিকটবর্ত্তী বলিয়া এখানকার প্রচলিত ভাষা প্রায় পূর্ণিয়া, দিনাজপুর এবং রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

প্রথমতঃ মহাস্থান হইতে ভগবতীনারায়ণ রায় (খাঁ) চাকুরির উপলক্ষে স্বপরিবারে অর্থাৎ পিতা-পিতামহ সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পর অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুগণকে আনাইয়াছিলেন। ভগবতীনারায়ণের পিতার নাম শ্যাম রায়, পিতামহের নাম অচ্যুতানন্দ রায় (খাঁ)। ভগবতীনারায়ণ সবদল খাঁর প্রধান কার্য্যকারক (দেওয়ান) ছিলেন। সবদল খাঁর পুত্র গাগড়া পরগণাটী খরিদ করিয়াছিলেন। তাহা লাভজনক বিবেচিত না হওয়ায় দেওয়ান ভগবতীনারায়ণের মাসিক বেতন হইতে দুই টাকা করিয়া কর্ত্তন করিয়া লইবে এই চুক্তিতে ধারে ৮০০৲ আটশত টাকা মূল্যে তাহার নিকট সবদল খাঁ উক্ত জমিদারী বিক্রয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে সমস্ত গাগড়া পরগণা—যাহা ভগবতীপুর, মালঞ্চা, মথুরাপুর ভাণ্ডারিয়া, যদুপুর এই পাঁচ তরফে বিভক্ত—তাহার বার্ষিক আয় প্রায় ১৫।১৬ হাজার টাকা হইবে। গাগড়া পরগণা তালুকটী সবদল খাঁর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া ভগবতী নারায়ণ, রায় চৌধুরী উপাধি ধারণ এবং স্বীয় নামে ভগবতীপুর গ্রাম নির্ম্মাণ ও পিতার নামে শ্যাম রায় ঠাকুর স্থাপিত করেন। ঐ ভগবতীপুর গ্রামে ভৈরবীনামে* যে একখানি পাষাণ-মূর্ত্তি (প্রতিমা) আছে তাহা কি প্রকারে কবে আসিল সে বিষয়ে অনেকরূপ জনশ্রুতি আছে, কিন্তু কালাপাহাড়ের কাটা থাকায় বহু প্রাচীন বলিয়া অনুমেয়। যেহেতু কালাপাহাড় ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৮০

* এই মূর্ত্তির পরিচয় ও প্রতিকৃতি 'গৃহস্থে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

কলিগ্রামের জিন্দা পীর

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও দেব মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন।

ভগবতীনারায়ণ রায়ের পাঁচ পুত্র—১ম পুত্র মুকুন্দ চন্দ্র, ২য় নন্দকিশোর, ৩য় প্রতাপচন্দ্র, ৪র্থ বদনরাম ও ৫ম পরাণচন্দ্র। তন্মধ্যে ৪র্থ পুত্র বদনরাম সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী এবং সংসারের ভারপ্রাপ্ত। রাজ-দরবারে পরগণা গাগড়ার খাজনা দিতে না পারায় সেই অপরাধে বাঙ্গালার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁর নিকটে কশাঘাতে জর্জ্জরিত ও গঙ্গা-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। কিছুক্ষন পরে তাহার বিশ্বস্ত কোন ভৃত্য কর্ত্তৃক ঐ গহ্বর হইতে উত্তোলিত হওয়ায় সে মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বাড়ী পলাইয়া আইসে। কিছুদিন পরে খাজনা-প্রদানে অসমর্থতা বিজ্ঞাপন করিয়া শুষ্ক গাত্রের কশাঘাতজনিত ক্ষত স্থানের চর্ম্ম টাকার আকারে তুলিয়া থলিতে পূরণকরতঃ খাজানার পরিবর্ত্তে তাহা মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে নবাব বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করে। তৎপরে বদনরাম নবাব বাহাদুরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিল যে, পরগণা গাগড়া হইতে যাহা কিছু আয় হয় তাহা দ্বারা তাহার পরিবারের ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদন সঙ্কুলান হওয়া সুকঠিন। তাহার নিজের ভোজনের জন্যই প্রত্যহ একমণ ভক্ষ্যবস্তুর আবশ্যক হইয়া থাকে, এমত অবস্থায় সম্পূর্ণ খাজনা চালান তাহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব। নবাব বাহাদুর দৈনিক একমণ ভোজনের বিষয় শ্রবণকরতঃ অতীব কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পরীক্ষার জন্য তাহাকে নিজের সম্মুখে একমণ সন্দেশ খাইতে দিয়াছিলেন। বদনরামকে তাহা অবলীলাক্রমে খাইতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছিলেন এবং কৃপাপরবশ হইয়া উক্ত জমিদারীর কর কমাইয়া দিলেন এবং তাহাকে বাকী খাজানার দায় হইতে অব্যাহতি দিলেন। বদনরামের যথেষ্ট বদন্যতা ছিল বলিয়া তাহার নিকট হইতে অনেক ব্রাহ্মণ দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর লাভ করিয়াছিলেন। পরে ইহারা তরফ মথুরাপুর, ভাণ্ডারিয়া, যদুপুর, মালঞ্চা ও ভগবতীপুর পাঁচভ্রাতায় যথাক্রমে বিভক্ত করিয়া লইয়া পাঁচতরফে বিভক্ত হয়। এখনও তাহাদিগের অধস্তন বংশধরগণ বর্ত্তমান আছে। ইহারা ধার্ম্মিক, ভক্তিপরায়ণ ও পরোপকারী বলিয়া গ্রামের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া সম্মানাস্পদ হইয়াছে।

গোস্বামী-বংশ

সাণ্ডালবংশীয় পুরুষোত্তম অদ্বৈতবংশ গোস্বামীর দৌহিত্র ও শিষ্যব্যবসায়ী বলিয়া গোস্বামী উপাধী ধারণ করেন। তাঁহার আদিবাস রাজসাহীর অন্তর্গত ভাণ্ডারপুরের নিকট পুথুরিয়া, তারপর মালদহে গৌড়ের নিকট বাবলা, পরে চূড়ামনের উত্তরে বৌসা গ্রামে কিছুদিন ছিলেন, শেষে কলিগ্রামে পশ্চিমপ্রান্তে পরিশেষে মধ্যগ্রামে আসিয়া বসতি করেন। সপরিবারে মদনগোপাল ঠাকুর মাত্র সম্বল লইয়া এখানে আইসেন। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে সবদলখাঁর নিকট হইতে মধ্যগ্রামে অর্থাৎ যেখানে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ গোস্বামী বাস করিতেছেন সেইস্থানে বাসের জন্য স্বীয় নামে ১৭২১ খৃষ্টাব্দে বদনরামের নিকট হইতে ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাধাবল্লভ গোস্বামী সুকবি ছিলেন, তাঁহার কবিত্বের নিদর্শনস্বরূপ সংস্কৃত ভাষায় রচিত সত্যনারায়ণের পাঁচালিখানি এখনও

রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বপ্রথম কলিগ্রামের ব্যবস্থাপক পণ্ডিতের পদ পাইয়াছিলেন। ইঁহাদের অধস্তন প্রায় সকলেই পুরাণ ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ছিলেন, এবং আজিও তাঁহাদের অধস্তন বংশধরগণের চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা হইতেছে। পুরুষোত্তম হইতে আজ পর্য্যন্ত এখানে তাঁহাদের নয় পুরুষে ২৫৮ দুইশত আটান্ন বৎসরের বাস হইল। পুরুষোত্তম গোস্বামী একজন ক্রিয়ানিষ্ঠ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ, তিনি গঙ্গাতীরে চূড়ামন নিবাসী ব্রাহ্মণেতর জমিদারের প্রদত্ত কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রতিগ্রহ-বিমুখ হইয়া তাঁহাকে মন্ত্র প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন উক্ত দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত জমিদারের শাসন-বাক্যে ভীত হইয়াই তিনি বাসস্থান ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

লাহিড়ী-বংশ

রাজসাহীর অন্তর্গত ভাণ্ডারপুর-নিবাসী রামরাম লাহিড়ী পুরুষোত্তম গোস্বামীর প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করিয়া কলিগ্রামে বাস করেন। তিনি সুপণ্ডিত, তাঁহার একটী পারস্য ভাষায় নজুম অর্থাৎ জ্যোতির্ব্বিদ উপাধি দেখিতে পাই। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আশানন্দ, আশানন্দের দ্বিতীয় পুত্রের পৌত্র শ্যামধন বিদ্যালঙ্কার এখনও নাটোরে আছেন। তিনি খ্যাতনামা শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর রাজসাহী প্রদেশে প্রধান পণ্ডিতের পদ অধিকার করেন। তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসর হইয়াছে। তৎপুত্র যোগেন্দ্র-নারায়ণ কাব্যতীর্থ, স্মৃতিরত্ন, স্মৃতিতীর্থ উপাধিতে অলঙ্কৃত। আশানন্দের প্রথম পুত্র অনুপনারায়ণ লাহিড়ী (বিদ্যালঙ্কার)। ইনি একজন ভাল জ্যোতিষী, সেইজন্য কলি-গ্রামের ডচ্‌ফ্যাক্‌ক্টরীতে তাঁহার বার্ষিক ৩৪ শত টাকা পরিমাণে বৃত্তি ছিল। তাঁহার পৌত্রগণ মধ্যে কিশোর লাহিড়ী সুপ্রিমকোর্টের ব্যবস্থাপক পণ্ডিত, রামকুমার লাহিড়ী উকীল এবং মধুসূদন লাহিড়ী মৎপিতৃদেব একজন দেশপ্রসিদ্ধ কলাবিৎ। তাঁহার প্রণীত দুইখানি সঙ্গীত গ্রন্থ আছে, একখানি মুদ্রিত হইয়াছে, অপরখানি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রহিয়াছে। রামরাম অবধি আজ পর্য্যন্ত এখানে আট-পুরুষে ২৫৬ দুইশত ছাপ্পান্ন বৎসরের বাস হইল। এই বংশের প্রায় সকলেই সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। রাম রাম এখানে বাসের জন্য ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে সবদল খাঁর নিকট হইতে এবং ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের গোপাল সিংহের নিকট হইতে ব্রহ্মোত্তর লাভ করিয়াছিলেন।

ভগবতী নারায়ণ রায় চৌধুরীর পুরোহিত রামদেব চক্রবর্ত্তী মহাশয় সবদল খাঁর নিকট হইতে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে বাসের জন্য ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি ভগবতীনারায়ণ ও সবদল খাঁর সমসাময়িক লোক, তাঁহার অধস্তন বংশধর নীরদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমান আছেন। এখন হিসাব করিয়া দেখিলে ১৬২৪-১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৮৯ বৎসর হইল, ইহার সামান্য কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বসতি আরম্ভ হইয়াছিল। এই গ্রামটী ১৬২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সবদল খাঁদিগের অধিকারে ছিল, তৎপরে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দ অবধি মালদহের অন্তর্গত পুখুরিয়াধীশ্বর মহারাজা বঙ্গাধিকারী মহাশয়ের অধিকারে ছিল। তাহার পর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত সাঁউরিয়ানিবাসী রাজা শ্রীনারায়ণ রায় ও রাজা ললিতনারায়ণ রায় মহাশয়দিগের অধিকারে আইসে; শেষে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রাতঃস্মরণীয়া চাঁচলের

রাণী সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণী মহাশয়ার অধিকৃত হইয়াছে। ইনি রাজা শ্রীমৎ শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের দত্তক-গ্রহীত্রী-মাতা। আজিও কলিগ্রাম উক্ত রাজাবাহাদুরের অধিকারেই আছে।

আমাদের গ্রামে আঁটীর আম অতিশয় উৎকৃষ্ট হয়, যেমন মিষ্টি তেমনই সুস্বাদু। গোলকান্ত, শঙ্করশীলা, ও বৃন্দাবনী আমের জন্মস্থান এই কলিগ্রাম। মুর্শিদাবাদে গোল-কান্তের নাম গুলকন্দ, মালদহে শঙ্করশীলার নাম গোপালভোগ হইয়াছে। গোলকান্ত ও শঙ্করশীলার গাছটী এখনও রহিয়াছে। বৃন্দা-বনীর গাছটী মারা গিয়াছে। আমাদের গ্রামের চতুঃপার্শ্বে আমের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা; অথচ ১০।১২ বৎসর হইতে কি পুরাতন কি নবীন গাছে পূর্ব্বের মত প্রচুর আম্র ফলিতেছে না। বৈজ্ঞানিক প্রণালীদ্বারা ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সন ১৩১৭।২৬শে ফাল্গুন মোং ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ তারিখে লোকগণনা-কালে এই গ্রামের লোকসংখ্যা ৩০২৯।

পরিশিষ্ট

সন ১৩১৭　মোং ১৯১০　লোক-সংখ্যা

জাতি	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট সংখ্যা মেহেমান টোলা ও মনোহর টোলার সহিত
ব্রাহ্মণ	৮৮	৭২	১৬০
ক্ষত্রিয়	৬	০	৬
বৈদ্য	১	০	১
কায়স্থ	০	৩	৩
তিলি	৪৩৯	৪১৬	৮৫৫
মালাকার	১	৩	৪
গোপ	৫	০	৫
নাপিত	৪০	৪৩	৮৩
কাঁসারি	৫০	৩৯	৮৯
কুম্ভকার	১৩	৯	২২
স্বর্ণকার	৮	১১	১৯
তিয়র	৩	০	৩
বাউরি	৯	৮	১৭
জেলে	৮৯	৯৫	১৮৪
কোচ	১৪	৯	২৩
শুঁড়ি	১৩	১২	২৫

সন ১৩১৭ মোট ১৯১১ লোকসংখ্যা

জাতি	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট সংখ্যা মেহেমান টোলা ও মনোহর টোলার সহিত	
তাতমা	৩০	৩৫	৬৫	
সুনিয়া বেনদার	১৮	১২	৩০	
ধোপা	৩২	৩২	৬৪	
কুরমি	২	০	২	
বৈরাগী বা বৈষ্ণব	১০	১৪	২৪	
কুরল	১০৪	১০৬	২১০	
হারি	৬১	৪৫	১০৬	
তেলি বা কলু	৫	৩	৮	
বেশ্যা	২	৭	৯	
কৈবর্ত্ত	১১	১২	২৩	
মেথর	৬	৪	১০	
মুসলমান	১৮৮	১৮২	৩৭০	
মুসলমান	৯৩	১০২	১৯৫	
হিন্দু	০	০	১১২	সবদল টোলা
হিন্দু	০	০	১৫	আলিগঞ্জ
মুসলমান	০	০	২৮৭	নূরগঞ্জ
			৩০২৯ মোট সংখ্যা	নূরগঞ্জ

শ্রীরামচন্দ্র লাহিড়ী।

সেখের দীঘি *

(১)

মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন জঙ্গীপুরের তিন ক্রোশ দক্ষিণে "সেখেরদীঘি" নামে এক সুবৃহৎ সরোবর আছে। ইহা কিঞ্চিদূন এক মাইল লম্বা, প্রস্থের পরিমাণও মানানসই। ছোট খাট পাহাড়ের মত উচ্চ পাহাড়। উহা বহু কাল প্রস্তুত হইলেও এমন সুদৃঢ় ও পরিপাটী ক্রমে সজ্জিত রহিয়াছে যে দেখিলেই মনে হয় ইহা যেন সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত পাহাড়ের উপর বড় বড় অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ। পুষ্করিণীটী বহুকালের, তজ্জন্য ঢল পড়িয়া পড়িয়া ক্রমে ক্রমে ইহার জলারও

* "বীরভূমবাসী" হইতে উদ্ধৃত।

কিয়দংশ পূরিয়া গিয়াছে। উহা এক্ষণে শস্তক্ষেত্রে পরিণত। পুষ্করিণীর উত্তরদিকস্থ অর্দ্ধেক জলা ব্যাপিয়া পদ্মবন। তজ্জন্য অর্দ্ধেক পুষ্করিণী যেন সবুজ আস্তরণে মণ্ডিত। সহস্র সহস্র রক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া মধুর গন্ধে মন প্রাণ হরণ করিতেছে। দক্ষিণানিল এই মধুর সৌরভ রাশি বহন করিয়া পথিক ও দর্শকদিগকে সস্নেহ উপহার বিলাইতেছে। অসংখ্য ভ্রমর মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুণ গুণ রবে প্রকৃতিদেবীর স্তুতিগানে নিযুক্ত। দক্ষিণ অংশটী বোধ হয় অতি সুগভীর, তজ্জন্য তথায় পদ্ম কি অন্য জলজ উদ্ভিদ নাই। উহার কাচস্বচ্ছ সুনির্ম্মল বারিরাশি তরঙ্গ খেলিয়া খেলিয়া পিপাসার্ত্ত নরনারীকে সুমিষ্ট জলপান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। সাধারণতঃ এই দীর্ঘিকার উত্তরদিক অপেক্ষা দক্ষিণদিক নীচু। ইহার পশ্চিমদিকের সমুন্নত পাহাড়ের তলদেশে কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান পল্লী। পূর্ব্ব দিকে বাদসাহী সরাণ।

(২)

এই পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে জমুয়ার নামে একখানি গ্রাম আছে। বহুকাল পূর্ব্বে তথায় পরমানন্দ রায় নামে এক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তিনি গৌড়ের নবাব সরকারে পূর্ত্ত বিভাগে একটী উচ্চ চাকরী করিতেন। হোসেন সা তখন বঙ্গ বিহারের নবাব। পরমানন্দের উপর এই দীর্ঘিকা খনন করাইবার ভার ছিল। তিনি হিন্দুদিগের প্রথামত উত্তর দক্ষিণে লম্বা করিয়া এই সুবৃহৎ সরোবর প্রস্তুত করাইলেন। এই কথা হোসেন সাহার কর্ণে গেল। পরমানন্দ এইরূপভাবে পুষ্করিণী প্রস্তুত করা হেতু নবাবের নিকট ভর্ৎসিত ও বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইলেন। কিন্তু তখন পুষ্করিণী প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য নবাব বাহাদুর এই পুষ্করিণী হিন্দু প্রথামত প্রস্তুত হইলেও ইহা যে মুসলমানগণের খনিত তাহা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য উহার নাম "সেখেরদীঘি" রাখিলেন। নবাবের এইরূপ অনুমান নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে। এখনও এই পুষ্করিণী উত্তর দক্ষিণে লম্বা হেতু অনেকেই উহা হিন্দুর খনিত বলিয়া সন্দেহ করেন, এবং রায় পরমানন্দের খনিত এই কথা বলিতে সঙ্কুচিত হন না। কিন্তু সূক্ষ্ম চিন্তায় অনুমিত হইবে ইহা পরমানন্দের নিজের অর্থে খনিত নহে। নবাবের অর্থে এই পুষ্করিণী ও আরও শত শত এইরূপ সুবৃহৎ সরোবর বাদসাহী সরাণের ধারে ধারে প্রস্তুত হইয়া ছিল। ঠিক দুই দুই ক্রোশ অন্তর অন্তর এইরূপ এক এক দীর্ঘিকা তিনি খনন করাইয়াছিলেন। সেখেরদীঘির চারি মাইল দক্ষিণে বোখরার দীঘি বাদসাহী সরাণের পূর্ব্বধারে শোভা পাইতেছে। ইহা আজিমগঞ্জ লাইনের বোখরা ষ্টেশন লাইনের ঠিক দক্ষিণ দিকে। উক্ত জমুয়ার গ্রামে রায় পরমানন্দের আবাস গৃহের এখনও ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। উহা এক্ষণে মৃত্তিকা প্রোথিত। স্থানে স্থানে খনন করিলে এখনও তথায় প্রচুর পরিমাণে ইষ্টক রাশি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৩)

বঙ্গের স্বাধীন নবাব প্রাতঃস্মরণীয় হোসেন সাহার বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন। ইনি বঙ্গের রাজধানী গৌড়নগর হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত একটী সুবিস্তৃত রাস্তা প্রস্তুত করান। উহাই এদেশে—বাদসাহী সরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার বিস্তার ৮০ হাত।

তিনি বঙ্গদেশের নবাব, কিন্তু তাঁহার প্রস্তুত সরাণের নাম কেন "বাদসাহী সরাণ" হইল এ কথা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে-পারেন। তাহার উত্তর এই, বঙ্গবিহারের একমাত্র স্বাধীন রাজাকে সম্রাট বলিলেও কোন দোষ হয় না। বঙ্গের নবাব গণ প্রথমে দীল্লিশ্বরের অধীন ছিলেন কিন্তু সামসুদ্দিনের সময় হইতে দাউদের সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়া ছিলেন। দীল্লিশ্বরের সহিত তাঁহাদের কোনরূপ দাসত্ব সম্বন্ধ ছিল না। এই জন্য সুবাবাঙ্গালার স্বাধীন নবাব হোসেন সাহা বাদসাহ নামে অভিহিত হইবেন তাহা বিচিত্র নহে। হোসেন সা শুদ্ধ রাস্তা প্রস্তুত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। এই রাস্তার ধারে ধারে দুই ক্রোশ অন্তর অন্তর এক একটী সুবৃহৎ সরোবর, এক একটী মস্‌জিদ ও তৎ সংলগ্ন পান্থশালা প্রস্তুত করেন। এই রাস্তা মালদহ হইতে বহির্গত ও ফরোক্কার নিকট পদ্মা পার হইয়া ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, বোখরা হইয়া খড়গ্রাম থানার ভিতর দিয়া বীরভূমে প্রবেশ করিয়াছে। তৎপর বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর দিয়া উড়িষ্যাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। হোসেন সাহা বহুদিন হইল স্বর্গে গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার খনিত এইরূপ শত শত সরোবর এখনও তাঁহার অমল কীর্ত্তি-রাশিকে সমুজ্জ্বল রাখিয়াছে। এখনও উক্ত রাস্তার ধারে ধারে প্রতি দুইক্রোশ অন্তর অন্তর এক একটী মস্‌জিদ ও পান্থশালার ভগ্না-বেশেষ পূর্ব্ব স্মৃতির সাক্ষ্যদান করিতেছে। উল্লিখিত "সেখেরদীঘি"টি উক্ত বাদসাহী সরাণের পশ্চিম পার্শ্বে। এই পুষ্করিণীর পশ্চিম পাহাড়ের উপর এখনও একটি মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। তথায় একখানি সুবৃহৎ কৃষ্ণপ্রস্তর পটে পারসী ভাষায় কি লেখা আছে। গ্রামের মুসলমানগণ বলিলেন এই পুষ্করিণীর বিবরণ উহাতে খোদিত আছে। উহা অতীতের একখানি স্মৃতিফলক—প্রাচীন-কালের একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস। মুর্শিদাবাদের সাহিত্য পরিষদ গৃহে ইহার স্থান হইবে না কি? নবাব হোসেন সার সময় এদেশে শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। ধনধান্যে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নবাব বাহাদুর প্রজার রক্তসম রাজকর অপব্যয় না করিয়া বড় বড় দীর্ঘিকা ও রাস্তা এবং অন্যান্য সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকেরা সুবর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন। নিমন্ত্রিত সভায় যিনি যে পরিমাণ সুবর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন তিনি সেই পরিমাণ আদর সম্মান লাভ করিতেন। হায় রে সে কাল!!

(৪)

মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের আমোদ্ প্রমোদ জন্য স্থানে স্থানে এক একটি রমণা অর্থাৎ বিহার স্থান ছিল। তথায় নবাবেরা সময় সময় হরিণ শিকারে ও বেগমদিগের সহিত নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকে অতিবাহিত করিতেন। এইরূপ বাইশটি রমণা অর্থাৎ বিহার-স্থানে মুর্শিদাবাদের নবাবেরা অনেক সময় আমোদ আহ্লাদে ক্রীড়া কৌতুক মগ্ন থাকিতেন। কথিত সেখেরদীঘি এইরূপ একটি "রমণ"। উহার দক্ষিণ পাহাড়ের নীচে সমতল ভূমিতে নবাবের একটি সুন্দর রাজপ্রাসাদ ছিল। বেগমদিগের বাসের জন্য একটি সুপ্রশস্ত চত্বর নয়নের তৃপ্তিসাধন করিত। কালের কি কুটিলা গতি! সেই লোকনয়ন মুগ্ধকর প্রাসাদাবলী এক্ষণে ধান্যক্ষেত্রে পরিণত। বেগমদিগের চত্বরের চারিদিকের চারিটি স্থূল স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ

কিছুদিন পূর্ব্বে লোক নয়নের তৃপ্তি সাধন করিত। কিন্তু উহাও এক্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। হ্রদের ন্যায় সুবৃহৎ কাচসচ্ছ সরোবরের অতুল শোভায় তখন মুগ্ধ হইত না এরূপ নরনারী নিতান্ত বিরল যখন নৈদাঘ উষার মধুরতা, চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িত, পক্ষিকুলের প্রভাতী গানে প্রকৃতি দেবীর নিদ্রাভঙ্গহইত, সুস্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণের মৃদু মৃদু কম্পনে সরোবরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি নৃত্য করিত, সেই সুস্নিগ্ধ উষায় বেগম সাহেবেরা তরণী সহযোগে এই সুনীল সরসীবক্ষে জলক্রীড়ায় নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা নিজে নিজে উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানসী গুলির দাঁড় বাহিতেন। কেহ বা হালি ধরিতেন। নবাব মহোদয় তদুপরি এক মহার্ঘ উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়া বেগমদিগের এইরূপ জলক্রীড়া দর্শন করিয়া আনন্দে গলিয়া যাইতেন। তন্বীরা একসুরে সারিগান গাহিতে গাহিতে তরণীগুলি পরিচালিত করিতেন।

তরণীগুলির পাছে পাছে রাজহংসদল শ্রেণীবদ্ধভাবে শ্বেতরেখা সাজাইয়া জলক্রীড়া করিত। সারস কুলের অব্যক্তশব্দ সরোবর মধ্যে শব্দিত হইত। কুন্দপুষ্পনিভ শ্বেতবর্ণ বলাকারাজি ধীরে ধীরে এক একটি করিয়া সরসীর কুলে আপনআপন স্থানাধিকার করিয়া উপবিষ্ট হইত।

এই দীর্ঘিকাও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলি এখনও মুর্শিদাবাদের নবাবের জমিদারী। ইহার পশ্চিম পাহাড়ের পশ্চিমদিগের পাহাড়তলী 'মিস্ত্রীগ্রাম' নবাবদিগের গুরুকুলের জায়গীর। মুর্শিদাবাদের নবাবগণ রাজ্যচ্যুত হইলে পর স্বনামধন্য 'কাণকাটা হরিজীরায়ের' বংশধরেরা এই দীর্ঘিকার দক্ষিণ পাহাড় কাটিয়া দিয়া উক্ত দীর্ঘিকার জল বাহির করতঃ বেলুড়িয়া ফুলশিয়রী প্রভৃতি গ্রামের শস্য রক্ষা করেন; কারণ এই দীর্ঘিকার দক্ষিণে ২।৪ কিতা জমির পরই উক্ত রায় বংশের সুবিস্তৃত আকবরসাহী পরগণা জমিদারী। সে সময় মুর্শিদাবাদের নবাববংশীয়েরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়াছিলেন। তথাপিও এই সেখের দীঘির দক্ষিণপাহাড় রক্ষার জন্য তাঁহারা একটী হস্তী ও কতকগুলি ফৌজ পাঠাইয়া দিয়া উক্ত পাহাড় বন্ধ করিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু হরিজী রায়ের বংশধরেরা তাঁহাদের সমস্ত আকবরসাহী পরগণার প্রজাগণকে লইয়া উহাদের সহিত একটি ছোটখাট যুদ্ধ করেন। নবাবের হস্তীটি প্রবল আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দীঘির নিকটে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আজও 'হাতীমারা' নামে অভিহিত। এই গোলযোগের পর মুর্শিদাবাদের নবাব-পরিবারেরা উক্ত পাহাড় বাঁধাইবার জন্য আর কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। বহুদিন পর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট বাদী হইয়া উক্ত পাহাড় পুরাইয়া দিবার জন্য হরিজীরায়ের বংশধরগণের উপর এক দেওয়ানী মোকদ্দমা স্থাপন করেন। কিন্তু প্রতিবাদিগণ বহুদিন ধরিয়া ঐ ক্ষতি দিয়া দীঘিকার জল শস্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিতেছেন এইরূপ প্রমাণ হওয়ায় মোকদ্দমার কোন ফল হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত দক্ষিণ পাহাড়ে জল নিকাশের সেই প্রাচীন নর্দ্দমা বিদ্যমান আছে। এই স্থান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী বেলুড়িয়া, ফুলশিয়রী গ্রামের সমস্ত জমিতে ঐ নর্দ্দমা দিয়া জলস্রোত প্রবাহিত হয়। তজ্জন্য উক্ত গ্রামের চাষআবাদ পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। এই দুই গ্রামের শস্য নাশের কথা প্রায়ই শুনা যায় না। হরিজিরায় বীরভূম-

জেলার অন্তর্গত দক্ষিণগ্রামের প্রাতঃস্মরণীয় বিশেশ্বর রায় মহাশয়ের বংশধর। উভয়েরই সংক্ষিপ্ত জীবনী বীরভূমবাসীতে ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরামতারণ রায়।

মফঃস্বলের বাণী

১। ভারতে এলুমিনিয়মের কারবার

মিঃ অ্যালফ্রেড্ চ্যাটার্টন এক্ষণে মাদ্রাজ-গবর্ণমেণ্টের অধীনে শিল্প-সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান-বিভাগের ডাইরেক্টার। পূর্ব্বে ইনি মাদ্রাজ আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহারই যত্নে ভারতীয় এলুমিনিয়মের বাসন সর্ব্বপ্রথমে ঐ স্কুলে প্রস্তুত আরম্ভ হয়। সেই এলুমিনিয়মের কারবার গবর্ণমেণ্ট-স্কুলে রাখা অপছন্দ করিয়া উহা একটী কোম্পানীর হস্তে দেন। উহাই ভারতের প্রথম বে-সরকারী এলুমিনিয়মের কারবার। এক্ষণে বোম্বাইয়ের আর একটী কারখানায় এলুমিনিয়মের বাসন প্রস্তুত হইতেছে।

সাধারণ গৃহস্থালীর ব্যবহারে এলুমিনিয়মের বিশেষ উপযোগিতা আছে। ইহা কাচ বা পাথরের ন্যায় ভঙ্গপ্রবণ নহে; অথচ কাঁসা পিতলের ন্যায় অম্লাদি দ্রব্যে বিকৃত হয় না। ছেলেদের দুধ রাখিতে, হোমিওপ্যাথি ঔষধাদি থাইতে আহার্য্যদ্রব্য অবিকৃত অবস্থায় অধিক্ষণ রাখিতে, অম্লাদি দ্রব্য রন্ধন করিতে এলুমিনিয়মের বাটী, ছোট গেলাস, বড় কৌটা, কড়া এবং হাঁড়ির ন্যায় অন্য কোন উপযোগী দ্রব্য নাই। সমানাকার কাঁসা পিতলের বাসন অপেক্ষা এলুমিনিয়মের বাসন অনেক হাল্কা এবং সস্তা। এঁটেল মাটী চূর্ণ করিয়া এবং বাছিয়া তাহার দ্বারা এলুমিনিয়মের বাসন অযথা বলপ্রয়োগ ব্যতীত মাজিলে উহা সহজে পরিষ্কার হয় এবং উহা অনেক দিন টেঁকে। এখনও উহার সম্বন্ধে একমাত্র দোষ এই যে দেশময় সহর অঞ্চলে উহার ঢালাই ও পেটাই জন্য কোনও কারখানা না থাকায় ভাঙ্গা এলুমিনিয়মের বাসন বদল দিবার কিম্বা বিক্রয় করিবার কোনরূপ সুবিধা নাই। সে সম্বন্ধে ভাঙ্গা কাঁসা পিতলের সুবিধা আছে। উহা অর্দ্ধ মূল্যে সকল স্থলেই বিক্রয় হইয়া যায়। এখনও ভারতে এলুমিনিয়ম ইয়ুরোপ হইতে আমদানী হইয়া বাসন প্রস্তুতের কারখানা চলিতেছে, অথচ ভারতবর্ষে যত এলুমিনিয়মের 'ওর' বা অশুদ্ধ খনিজ ধাতু পাওয়া যায়, তত পৃথিবীর কুত্রাপি নাই।

বক্সাইট হইতে এলুমিনিয়ম বাহির করা হইয়া থাকে। কাশ্মীরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এরূপ পাহাড় আছে, যাহা সমস্তটাই প্রায় বক্সাইট্। একটা বড় বক্সাইটের কারখানা ভারতের জন্য একান্তই প্রয়োজন। ইহার জন্য নূতন যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠার কোন আবশ্যক হইবে না। যাঁহারা মধ্য প্রদেশের লৌহময় কঙ্কর হইতে লৌহ এবং ইস্পাত প্রস্তুত জন্য এসিয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান লোহার কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, সেই টাটা আয়রণ ষ্টীল কোম্পানী কাশ্মীর দরবারে আবেদন করিয়া তথায় এলুমিনিয়মের জন্য একটা শাখা-কারখানা সহজেই খুলিতে পারেন। তাহা করিলে কাশ্মীরের রাজা এবং

শ্রমজীবী প্রজা উভয়েরই উপকার। ভারতের এলুমিনিয়মের দর সস্তা হইয়া ভারতীয় প্রজারও উপকার হইবে। বিদেশ হইতে এলুমিনিয়মের আমদানী কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, মিশ্র ধাতু বক্সাইট হইতে এলুমিনিয়ম বাহির করায় কারখানায় কত অধিক লাভ হওয়া সম্ভাবনা। ১৯০৪-৫ অব্দে এলুমিনিয়মের আমদানী ৮৯০ হন্দর বা ১২১৩ মন ২৭ সের এবং (মূল্য ১ লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা); এবং ১৯১২-১৩ অব্দে ৩৫৮০৯ হন্দর বা ৪৮৪৮৯ মণ মূল্য ২৫ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা)।

এডুকেশন গেজেট

২। বেগুন চাষ

বেগুনের natural order—Solanaceae. ল্যাটীন নাম Solanum Molongena. ইংরাজীতে বেগুনকে Brinjal বলে। হিন্দিতে বৈংগন, ভণ্টা, ভাটা; মহারাষ্ট্রে বাংগে, গুজরাটে রিংগনা, রিগনী; কর্ণাটে বদনে, তৈলঙ্গে বংকয়া, ফরাসীতে বাদংগান বলিয়া থাকে।

সংস্কৃতে বার্ত্তাকু, ভণ্টাকী, ভণ্টিকা ও বৃন্তাক বলে। বেগুনের চাষ কেবলমাত্র আমাদের এই ভারতবর্ষেই হইয়া থাকে।

ইহার চাষে বেশ দু'পয়সা আছে। সকলেরই ইহার চাষে মনোযোগী হওয়া উচিত।

কবিরাজী শাস্ত্রে ইহার গুণ কি, নিম্নে লিখিত হইল।

বৃন্তাকং স্ত্রী তু বার্ত্তাকুর্ভণ্টাকা ভাণ্টিকাপি চ।
বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকমপিত্তলম্।
জ্বরবাত বলাসঘ্নং বৃদ্ধং পিত্তকরং গুরু।
বৃন্তাকং পিত্তলং কিঞ্চিদঙ্গার পরিপাচিতম্।
কফমেদোঽনিলামঘ্নমত্যর্থং লঘু দীপনম্।
তদেব হি গুরু স্নিগ্ধং সতৈলং লবনাঞ্চিতম্।
অপরং শ্বেত বৃন্তাকং কুক্কুটাণ্ড সমং ভবেৎ
তদর্শঃ সু বিশেষণ হিতং হীনঞ্চ পূর্ব্বতঃ।
বার্ত্তাকী কটুকা রুচ্যা লঘুবা পিত্তনাশিনী
বলপুষ্টিকরী হৃদ্যা গুরুর্বাতেষু নিন্দিতা।

(ভাবপ্রকাশ)

বেগুনের গুণ:—মধুর রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, অপিত্তকর, অগ্নিদীপক, শুক্রজনক, লঘু। ইহা জ্বর বায়ু এবং শ্লেষ্ম-বিনাশক।

বেগুনের গুণ-ভেদ:—কচি বেগুন কফ ও পিত্তনাশক। পাকা বেগুন পিত্তকারক ও গুরুপাক। অঙ্গার-দগ্ধ বেগুন—কিঞ্চিৎ পিত্তকর, অত্যন্ত লঘু, অগ্নিদীপক হইয়া কফ মেদ বায়ু এবং আম দোষের শান্তিকারক।

বেগুন পোড়া লবণ ও তৈল মিশ্রিত করিলে গুরু ও স্নিগ্ধ হয়। ডিমের মত এক রকম শাদা বেগুণ আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বেগুন হইতে হীন গুণ, কিন্তু অর্শরোগে বিশেষ উপকারী।

বেগুন নানা জাতীয় তন্মধ্যে দুই জাতিই প্রধান। এক রকম বেগুন আকারে গোল—মুক্তকেশী, মাকড়া ও এলোকেশী ঐ শ্রেণীভুক্ত; ইহার ল্যাটীন নাম Solanum Melongena। আর এক রকম বেগুন সরু সরু আঙ্গুলের মত—তাহাকে শ'লে বা কুলি বেগুন বলে। এই জাতীয় বেগুনের ল্যাটীন নাম Solanum esculeatum Dren বেগুন বারমাস সকল ঋতুতেই জন্মিয়া থাকে। পুরাতন গাছের বেগুনে এক প্রকার ক্ষার জন্মে। তাহা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। কিন্তু নূতন গাছের বেগুন কোন অনিষ্ট করে না। এই জন্য, বোধ হয়, চৈত্র

মাসের শেষে গাছগুলি তুলিয়া ফেলা হয়। আর পুরাণ গাছের বেগুনের খোসা পুরু হয়, খাইতে তত মিষ্ট লাগে না। এক বৎসর হইতে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত একই জমিতে বছরের শেষে বৈশাখ মাসে গাছের ডাল কাটিয়া দিয়া জমিতে নূতন করিয়া চাষ ও সার দিয়া বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিয়া বাঁচাইয়া রাখিলে, অসময়ে অল্পাধিক পরিমাণে ফল পাওয়া যাইতে পারে। অসময়ের বেগুন লোকে ভাল মন্দ বিচার করে না—ব্যবসায়েও বেশ লাভ হয়। কিন্তু আমাদের দেশের চাষীরা তাহা করে না।

ঋতুভেদে আমাদের দেশে ইহার দুইবার চাষ হয়। আউসে বেগুনের চারা জ্যৈষ্ঠ মাসে পোঁতা হয়, ভাদ্র আশ্বিনে ফলে। আমুনে 'হৈমন্তিক' বেগুনের চারা শ্রাবণ ভাদ্র মাসে পোঁতা হয়—আশ্বিন কার্ত্তিকে ফলে।

দোয়াঁশ অল্প উচ্চ মাঠাল জমিই বেগুন চাষের উপযুক্ত। পতিত জমিতে বেশ ভাল হয়। এই জমিতে কোন প্রকার সারের দরকার করে না। মাঘ ফাল্গুনে বৃষ্টির পর ভাল ক'রে ৩।৪ বার চাষ ও মই দিয়া জমি ফেলিয়া রাখিবে। পরে গোবর সার, ছাই, পাঁক ও ঘরের নোণা-মাটী অল্পে অল্পে সংগ্রহ করিয়া ঐ জমিতে দিবে। যেমন বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইবে অমনি ঐ জমি আড়ে দীর্ঘে ৪।৫ বার মই দিয়া মাটী সমান, ধুলার ন্যায় ও তৃণশূন্য করিয়া জৈষ্ঠের "যো" পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের জলে "যো" হইলেই ঐ জমিতে চারা পুঁতিবে। আষাঢ় মাসে এক এক দিন বড় রোদ হয়। সেই সময় মধ্যে মধ্যে এক একটু জল দিলে খুব ভাল হয়, চারাগুলির মরিবার সম্ভাবনা থাকে না। বৃষ্টির জল পেলে ঐ চারাগুলি বেশ সতেজ ও ঝাড়াল হইয়া উঠে।

আউসে বেগুণ চারা একটু বড় হইলেই আমুনে বেগুণ ক্ষেতে বসাইবে। এর আগে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জমি তৈয়ারি করিয়া রাখা উচিত।

আউস, আমন ছাড়া আমাদের দেশে চৈত্র মাসে এক প্রকার বেগুণ হয়, তাহাকে 'চৈতে' বেগুণ বলে। মাঘ মাসের মধ্যে ঐ বেগুণের চারা তৈয়ারি করিয়া ফাল্গুন মাসের প্রথমে ঐ চারা ক্ষেতে পুঁতিলে, চৈত্র মাসে নিশ্চয়ই ফল ধরিয়া থাকে। এ বেগুণের গাছ বেশী বড় হয় না বটে, কিন্তু গাঁটে গাঁটে থলে থলে বেগুণ হয়।

তিন বার ক্ষেতে বেগুণ বসাইবার কথা বলা হইল, বাস্তবিক বেগুণ বার মাসই বসান যাইতে পারে। খনা বলেন, বছরে দশ মাস বেগুণ বসাইতে পারা যায়। যথাঃ—

বলে গেছে বরাহের পো, দশটী মাস
বেগুণ রো!
চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ, ইতে নাই
কোন বিবাদ।
পোকা ধরলে দিবে ছাই, এর ভাল
উপায় নাই।
মাটী শুকালে দিবে জল, সকল মাসে
পাবে ফল।

হাপর।—চারা তৈয়ারি করার স্থানকে হাপর বলে। উঠানে, গোয়ালের কাছে অথবা অন্য কোন স্থানে ৪।৫ হাত জমি আড়ে দীর্ঘে কোপাইয়া আন্দাজ মত সার (গোবর-সার) ও ছাই দিয়া ঐ হাপর প্রস্তুত করিবে। হাপরে সার না দিলেও ক্ষতি নাই। ঐ স্থানে ২।০ কি ৩ তোলা বেগুণের বীজ পোঁতা চলে। ইহাতে যে চারা হয়, তাহা

এক ১/• বিঘা জমির উপযুক্ত। বীজ পোতার দিন থেকে এক মাসের মধ্যেই চারা-গুলি ক্ষেতে বসাইবার উপযুক্ত হয়। ছাপরে চারা ১০।১২ আঙুল বড় হলে ক্ষেতে পুঁতিবে। বেশী লম্বা চারা ভাল নয়। পুঁতিবার সময় লম্বা সারি দিয়া লাইন করিয়া দুই হাত অন্তর ঠিক সমান দূরে দূরে চারা-গুলি পুঁতিবে। চারাগুলির শিকড় একটু কাটিয়া ফেলিও। এই প্রকার খাশী করা গাছ বেশ ঝাড়াল হয় ও বেশী ফল দেয়। এক পশলা বৃষ্টির পর চারা পুঁতিলে প্রায়ই মরে না।

রাণাঘাট বার্ত্তা।

৩। পশুবলিদান সঙ্গত কি না?

পশূৎসর্গের সময় যখন পুরোহিত "অগ্নিঃ পশুরাসীৎ" ইত্যাদি বেদমন্ত্র পাঠ করেন, তখন যজমানের পক্ষে দেবতার নিকট এই ওকালতি করা হয় যে—"অগ্নি পূর্ব্বে পশু ছিলেন, যজ্ঞে নিহত হইয়া অগ্নিত্ব লাভ করিয়াছেন; সেইরূপ অদ্য এই পশুও যজ্ঞে নিহত হইয়া অগ্নিলোক প্রাপ্ত হউক। দেবতা কর্ত্তৃক এই পশুর হৃদয়ে দেবলোকে গমনোপযোগী সংস্কার সঞ্চারিত হউক।" এ বিষয়ে কেহ কেহ এই আপত্তি করিতে পারেন যে, পশুর অন্তস্তলে দেবলোক-প্রাপ্তির উপযুক্ত কোন সংস্কারই নিহিত নাই; সুতরাং দেবতা তেমন সংস্কার বিকাশ করিয়া দিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে আমার উত্তর এই যে, এই আপত্তি ভিত্তিহীন। মন্ত্রশ্রুতি আছে—"তস্মর্ত্ত্যাস্ত দেবত্বমাজানমগ্রে" অর্থাৎ সমস্ত মর্ত্ত্য প্রাণীই প্রথমে স্বয়ংজাত দেবতা ছিল। সুতরাং এই পশুও অগ্রে আজান দেবতা থাকাতে, তাহার মধ্যে যে দেবত্বপ্রদ সংস্কার নিশ্চয়ই নিহিত রহিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমি কিন্তু ঐ পশুর মধ্যে তত ঊর্দ্ধ কালের সংস্কারও ফুটাইয়া উঠাইবার কথা বলিতেছি না; আমি বলি সেই স্বয়ংজাত দেবত্ব হইতে অবনত হইয়া এই পশুকে অনেকবার পিতৃমাতৃজাত অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে; সেই সমস্ত দেব-জন্মের সংস্কার নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে নিহিত আছে। দেবতা প্রসন্ন হইয়া এখন সেই সংস্কারের উন্মেষ করিয়া দিন—পশুর স্বর্গগতি হউক।

পশূৎসর্গের অপর দুই একটী মন্ত্র হইতেও বলিদান-ব্যাপারে পশুর কল্যানকামনা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। দেবতার উদ্দেশ্যে পুরো-হিত প্রার্থনা করিতেছেন:—

মযোৎসৃষ্টঃ পশুরয়মপশুত্বঞ্চ দীয়তাম।
উপযোগস্তয়া কার্য্যো যথাকালং সদৈব হি॥

অর্থাৎ হে দেবতে! আমি যে এই পশু প্রদান করিলাম, তুমি ইহার পশুত্ব রহিত করিয়া ইহাতে অপশুত্ব অর্থাৎ দিব্য ভাবের সঞ্চার কর। এ জন্য যাহা কিছু করা আবশ্যক তৎ সমুদয় তোমাকেই করিতে হইবে।

"ইমং পশুং প্রদর্শয়। স্বর্গং নিয়োজয় মুক্তিং প্রয়োজয়।" অর্থাৎ উপরিস্থ দেবতা দিগকে এই পশু দেখাও, স্বর্গের জন্য নিয়োগ কর, মুক্তি প্রয়োগ কর।

উৎসর্গের পর পুরোহিত যজমানের পক্ষে পশুকে এই বলিয়া নমস্কার করেন।

"দেবতাপ্রীতিহেতুত্বং সমাংসরুধিরৈঃ সদা।
দাস্তুরাপদ্বিনাশায় ছাগলায় নমোনমঃ॥"

হে পশো! তোমাতে বিশিষ্ট প্রকার মাংস রুধির থাকাতে তুমি দেবতাদিগের সর্ব্বদা প্রীতি সম্পাদক হও; তোমাকে দেবোদ্দেশে

দান করিলে, দেবতারা দাতার আপদ নাশ করিয়া থাকেন। সেই আপদ বিনাশক ছাগলকে নমস্কার করি।

নমস্কারের পর ক্ষমাপ্রার্থনা—

"পশুরূৎপাদিতো দেবৈর্জ্ঞসিদ্ধ্যৈ বিশেষতঃ।
তস্মাত্বমত্র যজ্ঞার্থে হন্তব্যোঽসি ময়া পশো॥
খড়্গাঘাতোত্থবং দুঃখং ধত্তে মনসি বর্ত্ততে।
তৎ ক্ষমস্ব পশো ছাগ গান্ধর্ব্বং লোকমাপ্নুহি'॥

দেবতারা যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত বিশিষ্টপ্রকারে তোমাকে পশুরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; সে জন্য এই যজ্ঞে তুমি আমা কর্ত্তৃক হন্তব্য হইয়াছ। এতদুপলক্ষে খড়্গাঘাতজনিত যে মহদ্দুঃখ তুমি পাইবে, তাহা ক্ষমা কর; কারণ, তৎফলে তুমি পশুদেহের পরিবর্ত্তে স্বর্গীয় গন্ধর্ব্ব দেহ ধারণ করার উপযুক্ত হইয়েছ।

এই সকল মন্ত্র হইতে কি প্রতিপন্ন হয় না যে, আত্মকল্যাণের সহিত পশুর কল্যাণসাধনাই বলিদানের একমাত্র উদ্দেশ্য। অহিন্দুরা বলিবেন, এসকল মন্ত্রতন্ত্রের মূল্য কি? ঐ সকল মন্ত্রের যে মূল্য আছে এবং মন্ত্র দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় যুক্তি ও বিজ্ঞান দ্বারা তাহা অখণ্ডনীয়রূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে। হিন্দুর জন্য সে সকল আলোচনা অনাবশ্যক; কারণ, এসকল মন্ত্র না মানিলে, সমগ্র পূজা পদ্ধতিই মিথ্যা বলিতে হয়। সুতরাং যে কর্ম্ম দ্বারা পশু নিকৃষ্ট পশুজন্ম পরিহার করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট দেবত্বলাভের অধিকারী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দাতারও পরমকল্যাণ হইয়া থাকে, সেই বলিদানকে অন্যায় বলিয়া দোষারোপ করা কি বাতুলতার কর্ম্ম নহে?

এখন কথা উঠিতে পারে, পশু বলিদান যদি সর্ব্বথা সুসঙ্গতও হয়, তাহা হইলে এই কার্য্যে পুরোহিত ব্রাহ্মণের প্রয়োজনীয়তা কি? সকলেই তো এরূপ অনুষ্ঠান করিতে পারে। উত্তরে আমরা বলিব, ব্রাহ্মণই একার্য্যে একমাত্র অধিকারী। কথাটা বুঝাইয়া বলিতেছি। আমাদের ভাবে প্রাচীনদিগের ভাবে স্বর্গ-মর্ত্ত্য ব্যবধান। আমরা নিজকে অধম পাপিষ্ঠ দেখাইয়া এবং উপাস্যকে দয়াময় পিতা বলিয়া তাঁহার দয়া ভিক্ষা করিয়া থাকি; কিন্তু আর্য্যগণ উপাস্য দেবতার ও নিজের মধ্যে একতা দেখাইয়া পূজাফল লাভ করিতেন। অনুগ্রহ ভিক্ষা অপেক্ষা একত্ব প্রদর্শন দ্বারা যে সমধিক ফল লাভ হয়, আমাদের কার্য্যাদিতেও তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। মনে কর, ভিক্ষার্থীরা নানা প্রকার কাকুতি মিনতি করিয়া তোমার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করিল; এইরূপ দয়ার ফলে, তাহারা তোমার নিকট হইতে, কত টাকা আদায় করিতে পারে? নিতান্ত দাতাকর্ণ হইলেও তুমি তাহাদিগকে তোমার সম্পত্তির অতি সামান্য মাত্রই প্রদান করিয়া থাক; কিন্তু তোমার ভ্রাতা পিতার দেহে তোমার সহিত তাহার একত্ব দেখাইয়া পৈতৃকসম্পত্তির অর্দ্ধেক অধিকার করিয়া থাকে এবং তোমার পুত্র তোমার সহিত একতারা দেখাইয়া তোমার ষোল আনা সম্পদেরই উত্তরাধিকারী হয়; সুতরাং অনুগ্রহভিক্ষা অপেক্ষা একত্ব প্রদর্শন যে সমধিক ফলপ্রদ একথা অস্বীকার করিবার উপায় কোথায়? আর্য্যগণ এইরূপে পূজাকালে দেবতার সহিত আপনার একত্ব সম্পাদন করিয়া অভীষ্টসিদ্ধি করিতেন।

দেবতার সহিত নিজের একতা প্রদর্শন সামান্য মনুষ্যের কর্ম্ম নহে—স্বাভাবিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও আস্তিক্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণই উপাস্য-উপাসকে তেমন একত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ। এজন্য অপর বর্ণের পক্ষে ব্রাহ্মণ বর্ণই পৌরহিত্য (প্রতিনিধিত্বে) বৃত হন।

("জ্ঞানবিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্")" প্রভৃতি শ্লোক গীতাতে দ্রষ্টব্য।

পুরোহিত কিরূপে আপনাকে দেবতারূপে উন্নীত করিতে পারেন, অতঃপর তাহা বলা যাইতেছে। নব্যদিগের উপাসনাতে যেমন উদ্বোধন প্রভৃতি অঙ্গ আছে, ব্রাহ্মণের দেবার্চ্চনাতেও তেমন, "ভূত-শুদ্ধি" নামক এক বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। ঐ ভূত-শুদ্ধির বিধানমতে পুরোহিত নিজে দেবতারূপ ধারণ করিতে বাধ্য; যথা—"ইতি মন্ত্রেণ জীবং স্বস্থানে সংস্থাপ্য দেবতারূপমাত্মানং বিচিন্তয়েৎ।" তৎপর দেবতারূপ ধ্যান করিবার সময় পুরোহিত একটী পুষ্প লইয়া ধ্যেয়রূপ চিন্তা করতঃ সেই পুষ্প প্রথমে স্বীয় মস্তকে প্রদান পূর্ব্বক মানসপূজা সম্পাদন করেন এবং তদবসানে বাহ্য ব্যাপারের অনুরোধে পুনরায় তেমন পুষ্প লইয়া দেবপ্রতিমার মস্তকে প্রদান পূর্ব্বক বাহ্য পূজা সমাধা করিয়া থাকেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ঐ মানসপূজাই মুখ্য, বাহ্য পূজা গৌণ; সেই মানসপূজাতে পুরোহিত স্বয়ং দেবতাভাবে উন্নত হইয়া পূজ্যপূজকের একতা সম্পাদন করেন। এতাদৃশ পুরোহিত কর্ম্মে "জ্ঞানবিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্" এইরূপ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও অধিকার থাকিতে পারে না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পুরোহিতের পূজা যদি এতই উচ্চ ব্যাপার, তবে তাহাতে পশুবলিদান কেন? সেই উন্নতমনা পুরোহিত যজমানের জন্য এমন কঠিনহৃদয় হইয়া পশুবধের সহায়তা করিতে পারেন কিরূপে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, 'ভূতশুদ্ধি' করার সময় পুরোহিত আপন দেহকে দেবদেহে পরিণত করেন না, পরন্তু দেহগত জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে স্থাপন করিয়া তিনি আপনাকে দেবতারূপে চিন্তা করিতে সমর্থ হন। ইহাতে পুরোহিত দেহের সহিত জীবাত্মার পার্থক্যানুভব করিয়া থাকেন; সুতরাং তিনি সাধারণের ন্যায় আর দেহের পক্ষপাতী থাকেন না। এইরূপে পুরোহিত যখন দেবতা হন, তখন বলিযোগ্য পশুর জীবাত্মাতে ও পূজ্যদেবতাতে একত্বানুভব করিতে থাকেন; এই জন্যই তিনি তখন এই বলিয়া পশূৎসর্গ করিতে পারেন যে'—"বরুণমণ্ডলাধিষ্ঠিতবিগ্রহহায়ৈ পশুরূপচণ্ডিকায়ৈ ইমং পশুং প্রোক্ষয়ামি।" অর্থাৎ বরুণমণ্ডলাধিষ্ঠিত দেহধারিণী পশুরূপিণী চণ্ডিকাকে এই পশু অর্পণ করিলাম। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি আপনার পূজ্যদেবতাকে পশুর অপকৃষ্ট পদে অবনমিত করিতে সমর্থ? এইরূপে দেবতাতে ও বলির পশুতে একতা সম্পাদনের পর পশুদেহ ধ্বংসে পুরোহিতের কষ্ট হইতে পারে না।

এখনকার মনুষ্যগণ এ সকল কথার ভাব বুঝিতে অসমর্থ; তাহারা জানে মৃত্যুতেই সব ফুরাইয়া যায়, মৃত্যুই সকলের শেষ। এজন্য কোন কোন সভ্যজাতি নাকি রাজবিধানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রে তাহাদিগের নিধন সাধন করিয়া থাকেন। ইহাতে মরণকালে ছট ফট করিতে হয় না; ইহাতেই যে কিছু অনুগ্রহ করা হয়। কিন্তু তাঁহারা যদি পরকালের ভাব বুঝিতেন, তাহা হইলে উদ্বন্ধন-মৃত্যু, বৈদ্যুতিক যন্ত্রে মৃত্যু প্রভৃতি অপেক্ষা তাঁহারা খড়্গাঘাত মৃত্যুর অধিকতর উপযোগিতা স্বীকার করিতে পারিতেন। পুরোহিত যে বলিতেছেন—"হে পশো! জন্মিলে মরণ অবধারিত,

আমি এমন প্রক্রিয়া সহযোগে তোমার মৃত্যু ঘটাইতেছি যে, তদ্দারা অতঃপর তুমি গন্ধর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হইবে; এই সুবিধা পাইয়া আমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত খড়্গাঘাত-কষ্ট ক্ষমা কর” এ কথার ভাব আজ কাল বুঝিবে কে? আমরা বলি, যাহারা দেশবাসীর সুবিধার জন্য যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা গৌরবজ্ঞাপক মনে করে, স্বর্গলাভের জন্য পশু দেহ পাত করা কি তাহাদিগের নিকট এতই শোচনীয়! যে সকল বাবুরা এখন বলি উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাঁহারা এখন কি বলিতে চাহেন?

বাবুরা দেবার্চ্চনাতে বলিদান রহিত করিয়া দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে তৎপর, কিন্তু মাংসভক্ষণ রহিত করিতে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি দেখা যায় না; এরূপ হয় কেন? এ বিষয় চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—এই সকল দয়ালুগণ ‘অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ’ বলিয়া জন্মান্তরে বৈদিক যজ্ঞ লোপ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন; এজন্মে তাঁহারা মাংসভক্ষণের লোভ ত্যাগ করিতে পারেন না, অথচ বৈদিক কর্ম্ম লোপ করার সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করাতে ধর্ম্মসঙ্গত পশুবলি উঠাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

ঢাকা প্রকাশ

৪। খেজুর চিনি।

যে যশোহর আজ ম্যালেরিয়ার বাসভূমি, যে যশোহর ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জঙ্গলাকীর্ণ ও জনহীন হইতে বসিয়াছে, যে যশোহর এখন শিল্পবাণিজ্যহীন হইয়া শ্রীভ্রষ্ট অবস্থায় বর্ত্তমান—যে যশোহরের নদী সমূহ মজিয়া উঠিয়া শৈবালসমাচ্ছন্ন বক্ষ হইতে কেবল বিষবাষ্প বিস্তার করিতেছে, অল্পকাল পূর্ব্বে সেই যশোহরে চিনির কারবারের প্রধান আড়ং ছিল। যশোহরের খেজুর-চিনি ভারতের সর্ব্বত্র—এমন কি, ভারতের বাহিরেও রপ্তানী হইত। কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, কেশবপুর প্রভৃতি স্থানে বহু কারখানা ছিল। চিনির ব্যবসায়ে লাভ দেখিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে গ্লাডষ্টোন ওয়াইলী কোম্পানী চৌগাছায় চিনির কল বসাইয়াছেন। তখন বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক—ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কলিকাতা হইতে নৌকায় মাল চালান হইত, আর যশোহর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তাও ছিল।

সেই গতায়াতের অসুবিধার সময় চৌগাছায় কল বসাইয়া য়ুরোপীয় ম্যানেজার পাঠান কিরূপ লাভের আশায় সম্ভব হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। কোটচাঁদপুরেও কল ছিল—সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, তখন চৌগাছা খেজুর গাছে পূর্ণ ছিল। চৌগাছার কল অনেক দিন পরে বন্ধ হয়। তাহার পর মিষ্টার নিউহাউস চৌগাছায় আবার কল বসান ও বেগ ডানলপ কোম্পানী সেই কল চালাইয়া পরে বন্ধ করেন। কল বন্ধ হইবার বিশেষ কারণ ছিল। ১০ হাজার টাকার মাল ১ লক্ষ টাকায় কিনিলে মূলধনের সুদ পোষাইয়া লাভ হয় না। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল। যশোহরকে কেন্দ্র করিয়া নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার কোন কোন স্থানেও চিনির কারবার চলিয়াছিল। এখন সে কাজ বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গলার একটা প্রধান ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে—সহস্র সহস্র লোক কাজ হারাইয়াছে। লর্ড কর্জ্জন একবার বিদেশী—“রাজসাহায্যপুষ্ট” চিনির উপর শুল্ক বসাইয়া এ দেশের চিনির ব্যবসা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লর্ড কর্জ্জন একবার বলিয়াছিলেন, সরকারের কোন কাজে নামিতে কিছু বিলম্ব হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। বর্ত্তমানে লোক চিনির ব্যবসায়ের সর্ব্বনাশ হেতু খেজুর বাগান কাটিয়া মাঠান জমি করিয়া ধানের ও পাটের চাষ করিতেছে। এখন সরকার কিসে খেজুর চিনির ব্যবসা রক্ষা পায় তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে যে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ১৮৩৬।৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে ১৬ হাজার টন চিনি রপ্তানী হইয়াছিল, আর ১৮৪০।৪১ খৃষ্টাব্দে রপ্তানীর পরিমাণ ৬৩ হাজার টন হয়। এখন এই দুর্দ্দশার সময়েও বঙ্গে ১ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয় ও তাহার মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা। আমাদের বিশ্বাস লেখক চিনির দাম লিখিতে গুড়ের দাম লিখিয়াছেন।

সরকার হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, প্রতি একারে ৩৫০টি গাছ বসাইলে তাহা হইতে ৩ টন গুড় পাওয়া যায়। ইক্ষুর চাষে এত গুড় পাওয়া যায় না। আবার ইক্ষুর চাষ অনিশ্চিত—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পোকা প্রভৃতিতে কোন কোন বৎসর চাষের অসুবিধাও হয়। খেজুর গাছে সে অসুবিধা নাই। রসের পরিমাণে বড় তারতম্য হয় না। আবার ইক্ষুর চাষে আকমাড়াই কল কিনিতে অনেক খরচ করিতে হয়। খেজুর গুড় করিতে সে ব্যয় বাঁচিয়া যায়। সত্য বটে, আকের চিনি করিতে আকের সিটাতেই জালানি হয়, খেজুর চিনি করিতে জালানি কাষ্ঠ কিনিতে হয়; কিন্তু খতাইয়া দেখিলে ইহাতে অধিক খরচ পড়ে না। আবার খেজুর গাছের সঙ্গে সঙ্গে তালগাছ বসাইলে বড়ই সুবিধা হয়। শীতের সময় খেজুরের ও গ্রীষ্মের সময় তালের রস পাওয়া যায়। তাহাতে সমস্ত বৎসরই কাজ চলিতে পারে।

পূর্ব্বে উত্তর আমেরিকার আদিম নিবাসীরা গুড় প্রস্তুত করিত। তাহারাও গাছে চাচ দিয়া যশোহর জেলায় ব্যবহৃত নলির মত নলি ব্যবহার করিত। গামলায় রস ঢালিয়া তাহারা তপ্ত প্রস্তরখণ্ড রসে ফেলিয়া গুড় প্রস্তুত করিত। ইহার পর তাহারা রস জাল দিয়া গুড় করিত। এখন তথায় উন্নত প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হইতেছে।

সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, গুড় অনেকটা ভাল করা যাইতে পারে। এক্ষণে মৃৎপাত্রে রস জাল দেওয়া হয়। পাত্রগুলি প্রত্যহ ধৌত করা হয় না—পাত্রে পোড়া গুড় জমিয়া থাকে। তাই গুড় পরিষ্কার হয় না—কৃষ্ণবর্ণ হয়। ১৮৯২।৯৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র বসু যশোহরে গুড় প্রস্তুতের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি মৃৎপাত্রের পরিবর্ত্তে লৌহ কটাহ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছিলেন—গুড় ভাল হয়, আর সেই গুড় হইতে সেন্ট্রিফিউগাল কলে চিনি করিলে চিনি বেশ সাদা হয়। দেশে লৌহকটাহে রস জালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল গুড় প্রস্তুত করা যাইবে। আর এক কথা গুড় জাল দিবার সময় রস ঢাকিয়া লওয়া প্রয়োজন; নহিলে গুড় পরিষ্কার হয় না।

বাঙ্গালায় পাটশেওলা দিয়া গুড় পরিষ্কার হইয়া থাকে। ইহাতে অর্থ ব্যয় অতি সামান্য বটে, কিন্তু চিনি প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। সেন্ট্রিফিউগাল কল ব্যবহার করিলে গুড় হইতে অতি শীঘ্র চিনি প্রস্তুত হয়; তাহাতে টাকা বহুবার ঘুরিয়া আসাতে লাভ হয়। ভূপাল বাবু বলেন ভাল গুড় লইয়া

তিনি সেণ্ট্রিফিউগাল কলে অতি উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার মত এই যে, এই কল ব্যবহৃত হইলে চাষীরা উৎকৃষ্ট গুড় প্রস্তুত করিবে।

রস ধরিবার প্রথারও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ভাঁড়ের বদলে ঢাকনিওয়ালা ধাতু-পাত্র ব্যবহার করিতে না পারিলে পাত্র সাফ করিবার ব্যবস্থা হইবে না। এনামেল করা পাত্রে রস ধরিয়া দেখা গিয়াছে, ভাঁড়ে ধরা রস অপেক্ষা সে রস ভাল। ইহার কারণ এই ভাঁড় সাফ করা হয় না। তাই ভাঁড়ে রস খারাপ হয়।

রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে গুড় ভাঁড়ে না পুরিয়া পিপায় বা ক্যানেস্তারায় পুরিলে সুবিধা হয়। সময় সময় নাগরীর খাব্‌রা গুড়ের সঙ্গে কলে পড়ে। তাহাতে কলের ফিল্টার ব্যাগের কাপড় ছিড়িয়া যায়। আবার গরুর গাড়ীতে আনিবার সময় নাগরী ভাঙ্গিয়া গুড় নষ্ট হয়। পিপা বা ক্যানেস্তারা ব্যবহার করিলে সে ভয় থাকে না।

রিপোর্টে দেখা যায় সেণ্ট্রিফিউগাল কল বসাইয়া রস কিনিয়া চিনি প্রস্তুত করিলে যথেষ্ট লাভ হয়। ইহার জন্য বড় বড় কার-খানা সংস্থাপিত করিলে যে লাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

একটী কথা জানা প্রয়োজন। রিপোর্টে যে কলের কথা বলা হইয়াছে, সে কল কিরূপে চলিবে? তাহাতে কিরূপ ব্যয় পড়িবে? আমাদের বোধহয় চাষীদিগের পক্ষে এরূপ কল সংস্থাপন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং যদি বড় বড় আড়ংএ কেহ কল সংস্থাপন করেন, তবেই ফল হইতে পারে। ইহাতেও কিছু অসুবিধা যে নাই এমন নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি চিনির ব্যবসায়ে অসুবিধা বুঝিয়া অনেকে খেজুর বাগান কাটিয়া মাটান জমি করিয়া চাষ করিতেছে। কোন্ আশায় আবার তাহারা খেজুর বাগান করিবে? খেজুরগাছ বড় হইয়া রস দিবার উপযোগী হইতে সময় লাগে। যতদিন নূতন গাছ বড় হইয়া রস দিবার মত না হয় ততদিন রসের পরিমাণ অধিক হইবে না—কলেও যথেষ্ট কাজ হইবে না, আবার রস না বাড়িলে লোক বাগানও বাড়াইবে।

যাহা হউক, সরকার যদি আমদানী চিনির উপর শুল্ক বসাইয়া বা অন্য কোন উপায়ে খেজুর চিনির ব্যবসায়ে নূতন জীবন সঞ্চারের উপায় করেন, তবে লোকের আয়ের উপায় হইবে।

এ বিষয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রবর্ত্তক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকে অবগত নহেন, কেবল ব্যবসা বজায় রাখিবার ও কারখানা-ওয়ালাদের উৎসাহ দিবার জন্য তিনি অনেক দিন লোকসান দিয়াও একটা কারখানা চালাইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া ও চৌগাছার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের নিকট হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া সে সকল অমৃত-বাজার পত্রিকায় প্রকাশ করেন ও সেই সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই সকল প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখন যদি সরকার চেষ্টা করিতেন তবে বোধহয় এই ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধার সহজসাধ্য হইত। এখন সে কাজ আর সহজসাধ্য নহে।

সরকার যদি রিপোর্ট বাহির করিয়াই নিশ্চিন্ত না হন, পরন্তু যাহাতে বঙ্গে খেজুর চিনির ব্যবসা রক্ষা পায় তাহার উপায় করেন তবে বঙ্গবাসীর মহদুপকার সাধিত হইবে—শত শত নিরন্ন বাঙ্গালীর অন্নের উপায় হইবে। আমরা আশাকরি, সরকার সে বিষয়ে অবহিত হইবেন; আর বিদেশগত সরকারী সাহায্যে পুষ্ট চিনির সহিত প্রতি-যোগিতার আবশ্যকীয় উপায় করিবেন।

জাগরণ।

পরিশিষ্ট

গোলাকার চক্র অঙ্কিত করলেও দক্ষিণাবর্ত্তে রাশি কল্পনা ক'রে গ্রহাদি স্থাপন করা উচিত। এইবার আমি পাশ্চাত্য পঞ্জিকার সাহায্যে পাশ্চাত্য প্রণালীতে গণনার পন্থা বলি।

আমি। তা'র আগে ভাব-চক্র-প্রস্তুত-প্রণালী বলুন।

গুরুদেব। তা'ই বলচি। প্রথমে দশম সাধন ক'ত্তে হ'বে। সকল দেশের জন্যই দশম সাধন জন্য লঙ্কোদয়-খণ্ডাই ব্যবহার্য্য।

আমি। কেন?

গুরুদেব। এই যে লগ্নে চরসংস্কার করলে তা'র হেতুটা কি? বুঝেছ কি?

আমি। ঠিক বুঝিনি। তবে অনুমান করি যে পূর্ব্ব-পশ্চিম দেশান্তর হিসাবে যেমন একটা কালান্তর-সংস্কার করা হয়, অক্ষ-অনুসারে ওটাও একটা সংস্কার-বিশেষ।

গুরুদেব। সংস্কার বিশেষ বটে, কিন্তু প্রয়োজন কি? সেটাত বোঝা উচিত। পূর্ব্বে ব'লেছি বিষুবত ও ক্রান্তি বৃত্ত পরস্পর তির্য্যকভাবে অবস্থিত। উভয়ের সম্পাতস্থলে প্রায় ২৩ অংশ ২৮ কলা কোণ আছে (ইহার পরিমাণ নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হ'চ্চে) এখন ভেবে দেখ, বিষুবতস্থিত দেশের পক্ষে, রাশিচক্রটি সমান দু'ভাগে বিভক্ত সুতরাং সম্পাত বিন্দুর সন্নিহিত রাশি, চতুষ্টয়ের অর্থাৎ মেষ, মীন, তুলা ও কন্যার উদয়-পরিমাণ অল্প ও একবিধ, চাপের মধ্যস্থিত রাশি চতুষ্টয় অর্থাৎ মিথুন, কর্কট, ধনু ও মকরের উদয়কাল সকলের চেয়ে বেশী ও একবিধ অপর চারিটীর উদয়-পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইলেও মেষাদি অপেক্ষা অধিক ও একবিধ; তা' তুমি পূর্ব্বেই দেখেছ। রেলযাত্রী যেমন নিকটস্থ বৃক্ষকে দূরতর বৃক্ষ অপেক্ষা দ্রুতগামী মনে ক'রে এও কতকটা সেই রকম মনে ক'ত্তে পার। কিন্তু বিষুবতের উত্তরস্থিত কোনও অক্ষ হ'তে দেখলে, সেই অক্ষ যদি ২৩ অংশের উত্তরে হয়, তবে অবশ্যই কর্কট সন্নিহিত ও মকর দূরতর হ'বে, অন্যান্য অক্ষের পক্ষেও উত্তরার্দ্ধস্থিত রাশি ছয়টি সন্নিহিত ও দক্ষিণার্দ্ধ স্থিত রাশি ছয়টি দূরতর হ'বে সন্দেহ নাই, বিষুবতের দক্ষিণস্থ অক্ষের পক্ষে ঠিক বিপরীতই হ'বে। তা'র পর লগ্ন যেমন জন্মস্থানের পূর্ব্বাকাশে, তাৎকালিক ক্রান্তি অনুসারে উদিত হয়, দ্বিতীয় ও দ্বাদশ তাহার দক্ষিণস্থ কোনও দূরতর অক্ষের এবং একাদশ ও তৃতীয় তদপেক্ষা দূরতর অক্ষের অর্থাৎ বিষুবত সন্নিহিত অক্ষের উপরে হ'বে আর দশম অবশ্যই সকল অক্ষের পক্ষে বিষুবত্তের উপরে বা ০ অক্ষে বা নিরক্ষে অবস্থিত, একটা গোলক নিয়ে দেখলে এ কথাটা বেশ ভাল ক'রে বুঝতে পারবে।

আমি। আচ্ছা আমি তাই করবো।

গুরুদেব। দশম সাধনের জন্য একটি লঙ্কোদয়-সারিণী ক'ত্তে হ'বে।

আমি। ঐ লগ্ন-সারিণীর মত ক'রে ত?

গুরুদেব। হাঁ।

আমি। আমি তবে সে সারিণী করি—

লঙ্কোদয় বা দশম-সারিণী।

রাশি	মেষারম্ভ হইতে অংশমান	লঙ্কোদয় মান পল	মেষারম্ভ হইতে পল	ভোগ্য
১ মেষ	৩০	২৭৮	২৭৮	২৯৯
২ বৃষ	৬০	২৯৯	৫৭৭	৩২৩
৩ মিথুন	৯০	৩২৩	৯০০	৩২৩
৪ কর্কট	১২০	৩২৩	১২২৩	২৯৯
৫ সিংহ	১৫০	২৯৯	১৫২২	২৭৮
৬ কন্যা	১৮০	২৭৮	১৮০০	২৭৮
৭ তুলা	২১০	২৭৮	২০৭৮	২৯৯
৮ বৃশ্চিক	২৪০	২৯৯	২৩৭৭	৩২৩
৯ ধনু	২৭০	৩২৩	২৭০০	৩২৩
১০ মকর	৩০০	৩২৩	৩০২৩	২৯৯
১১ কুম্ভ	৩৩০	২৯৯	৩৩২২	২৭৮
১২ মীন	৩৬০	২৭৮	৩৬০০	২৭৮

গুরুদেব। হাঁ হ'য়েছে। এই সারিণী অনুসারেই সর্ব্বত্র দশম গণিত হ'বে; কেন তা'ত বুঝেছ। এখন কি করে গণনা ক'ত্তে হ'বে সেইটা বুঝ। দশম লগ্নটা যে তৎকালে ঠিক খ-স্বস্তিকের সমসূত্রে যে মধ্যরেখা উত্তর দক্ষিণে আছে—তা'রি উপর হ'বে, তা বোধ হয় বুঝেছ; এখন বেশ মন সংযোগ ক'রে ভেবে দেখ—দশমের স্ফুট ও অবশ্য মেষারম্ভ হ'তে কত দূরে তা স্থির ক'রে নিতে হয়। গণনার সময় সূর্য্যের স্থানটিই আমাদের জানা আছে লগ্নস্ফুট নির্ণয় সময়ে যেমন সায়ন সূর্য্যের স্ফুট পরিমাণকে পল ক'রে জন্মসময়ের পল তা'তে যোগ করে লগ্ন পাই; কিন্তু দশমের সময় সর্ব্বত্র সে

কথা খাটে না। কারণ যদি পূর্ব্বাহ্ণে জন্ম হয়, তা'হ'লে দশম সূর্য্যের স্থানের পরে থাকবে,
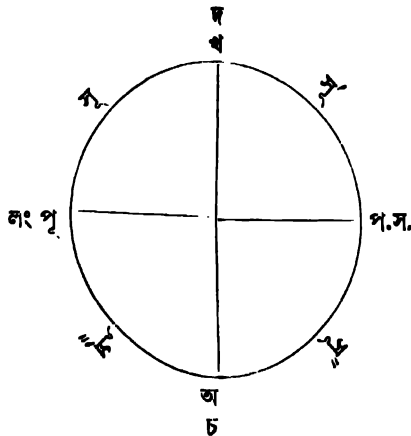
আর পরে হ'লে সূর্য্য পরে থাক্‌বে। সূর্য্য যদি 'সূ' চিহ্নিত স্থানে থাকে, তবে সূর্য্য স্ফুট হ'তে 'সূদ' বাদ দিলে দশম স্ফুট হবে। যদি 'সূ' চিহ্নিত স্থানে থাকে, তবে সূর্য্যস্ফুটে সূ'দ দূরত্ব যোগ করা চাই। সূ" স্থানে থাক্‌লেও যোগ কর্‌লে চল্‌বে। সূ''' স্থানে বিয়োগ ক'ত্তে হয়। অথবা সর্ব্বত্র বামাবর্ত্তে যোগ ক'রে চক্র বাদ দিলেও হ'তে পারে। অর্থাৎ যথাক্রমে সূ পূ সূ' চ সূ" প সূ''' খ এই চাপের, যতটুকু যোগ করবার, ততটুকু যোগ কর্‌লেই হ'বে।

আমি। ঐ দূরত্ব কি ক'রে বা'র ক'ত্তে হয় ?

গুরুদেব। কিছু অনুমান ক'ত্তে পার না ?

আমি। ভেবে ত পাই না।

গুরুদেব। লগ্ন ও সূর্য্য যদি এক স্থানে থাকে ?

আমি। তা হ'লে বোধ হয় দিবার্দ্ধই ঐ দূরত্ব। আর পূর্ব্বাহ্ণে হ'লে বোধ হয় দিবার্দ্ধ থেকে যতটুকু বেলা হ'য়েছে ততটুকু বাদ দিলে যা থাক্‌বে সেই টুকুই সেই দূরত্ব আর অপরাহ্নে হ'লে মধ্যাহ্নের যতটুকু পরে ততটুকুই সেই দূরত্ব আর প্রথম রাত্রেও তাই—আর শেষ রাত্রেও ত তাই হ'তে পারে।

গুরুদেব। পারে বটে, কিন্তু দিবার্দ্ধের সঙ্গে যতটুকু রাত্রি আছে সেটুকু যোগ করে বাদ দিলে সোজা হয়। আর বামাবর্ত্তের কথা কি রকম ; বুঝ্‌লে কি ?

আমি। বোধ হয় সূ প (পূর্ব্বাহ্নের বেলা) + পূ সূ' অ সূ" প (সমস্ত রাত্রি) + পূ সূ" খ (দিবার্দ্ধ) এইটুকু বা ইহার প্রয়োজনীয় অংশ যোগের কথা বলেছেন।

গুরুদেব। হাঁ। এখন এই দুই উপায়ে ঐ লগ্নের দশম এই লঙ্কোদয়-সারিণীর সাহায্যে কর দেখি।

আমি। ঐ দিনের দিনমান ৩৩। ৩২ সুতরাং দিবার্দ্ধ ১৬। ৪৬—জন্মসময় ২। ৩৫ ঘণ্টাদি =৬। ২৭। ৩০ দণ্ডাদি, কি বলেন ?

গুরুদেব। তা হলে হয় না। বারটার সময় সব দিন দিবার্দ্ধ নয়, এ দিন ত নয়ই।

আমি। তবে উদয় ৫।২১ মি. ১২ থেকে বাদ দিয়ে হ'ল ৬ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট তা'র সঙ্গে ৮টা ৩৫ মিনিট যোগ করে হ'লো ৯ ঘণ্টা ১৪ মিনিট বা ২৩ দণ্ড ৫ পল। দিবামান ৩৩;৩২ থেকে বাদ দিয়ে বাকি রৈল ১০ দণ্ড ২৭ পল বেলা থাক্‌তে জন্ম। দিবার্দ্ধ ১৬।৪৬ থেকে ঐ ১০ দণ্ড ২৭ পল বাদ দিয়ে পেলাম ৬।১৯ দণ্ডাদি। মধ্যাহ্নের এই ৬।১৯ দণ্ডাদি বা ৩৭৯ পল পরে জন্ম এইটা সূর্য্যস্ফুট লব্ধ পলে যোগ করি ?

গুরুদেব। হাঁ।

আমি। তৎকাল সূর্য্যলব্ধ— ৮৮২ পল

+ ৩৭৯ "

= ১২৬১

মেষারম্ভ হ'তে ৪ কর্কট পর্য্যন্ত ১২২৩

৩৮ পল

∴ সিংহের মান (লঙ্কোদয়) ২৯৯
∴ ২৯৯ : ৩৮ :: ৩০ : কত ?

$$\frac{৩৮ \times ৩০}{২৯৯} = \frac{১১৪০}{২৯৯} = ৩ । ৩৯$$

∴ ৪ । ৩ । ৪৯ সায়ন দশম স্ফুট।
− ০ । ২১ । ৪৭
৩ । ১২ । ২ নিরয়ণ দশম স্ফুট।

অপর গুলির জন্য স্বতন্ত্র উদাহরণ না হ'লে হ'বে কি ক'রে ?

গুরুদেব। যখন এটা পেরেছ, অপর গুলাও হ'বে। এখন দ্বাদশ ভাব ক'রে ও ভাব সন্ধি নির্ণয় ক'রে কিরূপে আমাদের দেশের মতে ভাবচক্র আঁকতে হয় শোনো। লগ্নে ছয় রাশি যোগ ক'ল্লে সপ্তম, আর দশমে ছয় রাশি যোগ ক'ল্লে চতুর্থ ভাব হ'বে। যেমন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পেয়েছ লগ্ন (নিরয়ণ) ৬।১৯।৩৫ আর নিরয়ণ দশমস্ফুট পেলে ৩।১২।২ সুতরাং নিরয়ণ সপ্তম ০।১৯।৩৫ এবং নিরয়ণ চতুর্থ ৯।১২।২ ; সায়ন লগ্ন ও দশম থেকে সায়ন সপ্তম ও চতুর্থ ক'ত্তেও পার তা'তে সায়ন ভাব হ'বে। তারপর লগ্ন ও চতুর্থের অন্তরের তৃতীয়াংশ লগ্নে যোগ ক'ল্লে দ্বিতীয় বা ধন ভাব, তা'তে আর এক তৃতীয়াংশ যোগ ক'ল্লে তৃতীয় বা সোদর ভাব আর লগ্ন ও দশমের অন্তরের তৃতীয়াংশ দশমে যোগ ক'ল্লে একাদশ বা আয়ভাব তা'তে আর এক তৃতীয়াংশ ক'ল্লে দ্বাদশ বা ব্যয় ভাব পাওয়া যা'বে, একাদশে ছয় যোগ কল্লে পঞ্চম বা সুতভাব, দ্বাদশে ছয় যোগে ধর্ম্ম বা রিপুভাব, দ্বিতীয়ে ছয় যোগ ক'ল্লে অষ্টম বা আয়ুভাব তৃতীয়ে ছয় যোগে নবম ধর্ম্মভাব পা'বে। লগ্নকে তনুভাব, চতুর্থকে বন্ধুভাব, সপ্তমকে জায়া ও দশমকে কর্ম্মভাব বলে। পর পর দুটিভাবের সমষ্টির অর্দ্ধেক ভাবসন্ধি। এই ভাবসন্ধিতে স্থিত গ্রহ কোন ভাবেই ফল দেন না। শুভ গ্রহ, ভাবের শুভ এবং অশুভ গ্রহ অশুভ বিধান করেন এই সাধারণ সূত্র। বিশেষ নিয়ম বিচার প্রসঙ্গে বলা যা'বে। এখন ভাব ও ভাবসন্ধি ক'সে চক্র অঙ্কিত কর।

আমি। যে আজ্ঞা

∴ লগ্ন ৬ । ১৯ । ৩৫
দশম ৩ । ১২ । ২
৩) ৩ । ৭ । ৩৩
১ । ২ । ৩১

দশম ৩ । ১২ । ২ কর্ম্মভাব
+ ১ । ২ । ৩১
একাদশ ৪ । ১৪ । ৩৩
+ ১ । ২ । ৩১
দ্বাদশ ৫ । ১৭ । ৪ ব্যয়ভাব।

এবং চতুর্থ ৯ । ১২ । ২
লগ্ন ৬ । ১৯ । ৩৫
৩) ২ । ২২ । ২৭
০ । ২৭ । ২৯

∴ লগ্ন ৬ । ১৯ । ৩৫ তনুভাব।
+ ০ । ২৭ । ২৯
দ্বিতীয়ে ৭ । ১৭ । ৪ ধনভাব।
+ ০ । ২৭ । ২৯
তৃতীয় ৮ । ১৪ । ৩৩ সোদরভাব।

এই গুলির সপ্তম যথাক্রমে

চতুর্থ ৯।১২। ২ বন্ধুভাব।
পঞ্চম ১০।১৪।৩৩ পুত্রভাব।
ষষ্ঠ ১১।১৭। ৪ রিপুভাব।
সপ্তম ০।১৯।৩৫ জায়াভাব।
অষ্টম ১।১৭। ৪ আয়ু বা মৃত্যুভাব।
নবম ২।১৪।৩৩ ধর্ম্ম ভাব।

এখন এই সকল ভাবের পর পর দু'টির অর্দ্ধ নিলে সেই দুই ভাবের সন্ধি হ'বে। অতএব ঐ সন্ধিগুলি নির্ণয় করি।

গুরু। হাঁ, এইবার একটি চক্র অঙ্কিত ক'রে তা'তে ভাব ও ভাব সন্ধি কিরূপে নির্দ্দেশ ক'র্ত্তে হ'বে তা দেখ—
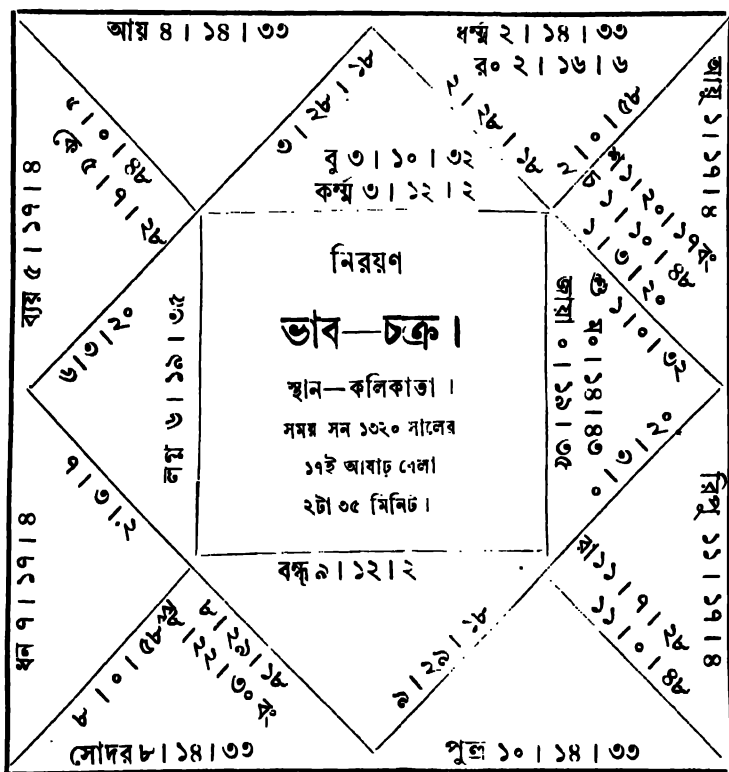
গুরুদেব। আমাদের দেশীয় মতে ভাবচক্র প্রস্তুত ক'র্ত্তে ত শিখ্‌লে এখন র‍্যাফেলের পঞ্জিকার সাহায্যে কিরূপে লগ্ন করতে হ'বে তা দেখিয়ে দিচ্ছি—আমাদের অভীষ্ট দিন ১লা জুলাই, খ্রীঃ ১৯১৩ অব্দ বেলা ২টা ৩৫ মিঃ অপরাহ্ন—

র‍্যাফেলের পঞ্জিকার ১৪ পৃষ্ঠায় দেখ—

১লা জুলাইয়ের গ্রীণীচ মধ্য-মধ্যাহ্নে নাক্ষত্রকাল ৬ ঘ ৩৫ মি ৪৪ সে

আমি। কৈ গ্রীণীচ মধ্য মধ্যাহ্ন ত লেখা নাই।

গুরুদেব। পঞ্জিকার মলাটে লেখা আছে।

আমি। হাঁ পেয়েছি। তা'র পর—

গুরুদেব। ১লা জুলাই গ্রী,ম,ম, না, কাল = ৬ । ৩৫ । ৪৪
+২ । ৩৫ । ০
+সংস্কার ঘ ২।৩৫ মিনিটে ০ । ০ । ২৫

জন্ম সময়ে নাক্ষত্রকাল = ৯ । ১১ । ৯

এখন এই অঙ্ক (৯ । ১১ । ৯) সাহায্যে দ্বিবিধ উপায়ে লগ্ন নির্ণীত হ'তে পারে। প্রথমতঃ কলিকাতার লগ্ন-সারিণী দৃষ্টে। দ্বিতীয় ত্রিকোণমিতির সাহায্যে। এই র‍্যাফেল প্রণীত কলিকাতার লগ্ন-সারিণীতে (Raphæl's Tables of Houses) দেখ—

৯ঘ, ১৩ মি, ৫২ সে, এবং ৯ঘ, ৯মি, ৫৩সেকেণ্ডে

দশম = সিংহের ১৬°—সিংহের ১৫°

একাদশ = কন্যার ১৮°—কন্যার ১৭°

দ্বাদশ = তুলার ১৮°—তুলার ১৭°

লগ্ন = বৃশ্চিক ১৪°-২—বৃশ্চিকের ১৩°-১০'

দ্বিতীয় = ধনু ১৪°—ধনু ১৩°

তৃতীয় = মকর ১৪°—মকর ১৩°

সহজেই বোঝা যা'চ্চে এ সারিণীতে কেবল লগ্নটি সূক্ষ্মভাবে আছে আর পাঁচটি ভাবের পরিমাণ স্থূল ভাবেই নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে।

৯ । ১৩ । ৫২ ৯ । ১৩ । ৫২ বৃ ১৪-২
৯ । ৯ । ৫৩ ৯ । ১১ । ৯ বৃ ১৩-১০ :

সুতরাং লগ্নের ৩,৫৩ : ২।৪৩ :: ০-৫২ অপরগুলির ৬০

$$বা \frac{২ ৪৩ \times ৫২}{৩ । ৫৯} = \frac{১৬৩ \times ৫২}{২৩৯} = \frac{৮৬৭৬}{২৩৯} = ৩৬$$

$$এবং অপর গুলির \frac{১৬৩ \times ৬০}{২৩৯} = \frac{৯৭৮০}{২৩৯} = ৪১$$

অতএব কলিকাতার জন্য সায়ন—

লগ্ন ৭।১৩।২৬, দ্বি ৮।১৩।১৯, তৃ ৯।১৩।১৯, চ ১০।১৫।১৯ প, ১১।১৭।১৯, ব ০।১৭।৩৪

সপ্তম ১।১৩।২৬, অ ২।১৩।১৯, ন ৩।১৩.১৯, দ ৪।১৫।৩৫ এ ৫।১৭ ১৯, দ্বা ৬।১৭। ১৯

চক্র এঁকে, তা'র পর পঞ্জিকা থেকে গ্রহগণের তাৎকালিক স্ফুট নির্ণয় ক'রে এই চক্রে বসা'লেই ভাবচক্র পূর্ণ হ'লো। পঞ্জিকাতে ঔদয়িক স্ফুট আছে।

আমি। আচ্ছা, আমি কসি। ভুল হয় কি না আপনি দেখুন। উদয় থেকে জন্মকাল পেয়েছি ২৩ দণ্ড ৫ পল।

১৮ই আষাঢ় – ১৭ই আষাঢ় = ৬০ দণ্ডের গতি অংশাদি।

রবি	২।১৬।৪১ –	২।১৫।৪৪	= +	০।৫৭
চন্দ্র	১।১৮।৩৭ –	১। ৫।৩৫	= +	১৩। ২
মঙ্গল	০।১৬।৯ –	০।১৫।২৬	= +	০।৪৩
বুধ	৩।১১।১৮ –	৩।১০। ১	= +	১।১৭
বৃহ	৮।২২।২৫ –	৯।২২।৩৩	= –	০। ৮
শুক্র	১। ১। ৭ –	১। ০।১০	= +	০।৫৭
শনি	১।২০।১৫ –	১।২০।১৭	= –	০। ২
রাহু	১১। ৭।২৬ –	১১। ৭।২৯	= –	০। ৩
কেতু	৫। ৭।২৬ –	৫। ৭।২৯	= –	০। ৩

১৭ই তারিখের ২৩ দণ্ড ৫ পলের তাৎকালিক

	ঔদয়িকস্ফুট		গতি অংশাদি		স্ফুট
রবি	২।১৫।৪৪	+	০।২২	=	২।১৬।৬
চন্দ্র	১। ৫।৩৫	+	৫।১৩	=	১।১০।৪৮
মঙ্গল	০।১৫।২৬	+	০।১৭	=	০।১৫।৪৩
বুধ	৩।১০। ১	+	০।৩১	=	৩।১০।৩২
বৃহ	৮।২২।৩৩	+	০। ৩	=	৮।২২।৩০
শুক্র	১। ০।১০	+	০।২২	=	১। ০।৩২
শনি	১।২০।১৭	–	০। ০	=	১।২০।১৭
রাহু	১১।৭।২৯	–	০। ১	=	১১।৭।২৮
কেতু	৫। ৭।২৯	–	০। ১	=	৫।৭।২৮

এইবার এ গুলিকে ঐ ভাবচক্রে লিখি।

গুরুদেব। লেখো। বৃহস্পতি আর শনিতে (বঃ) বক্রী লেখ।

এইরূপে এই সারিণীর সাহায্যে অনায়াসে কলিকাতা অঞ্চলের সায়ন লগ্নাদি নির্ণয় ক'র্ত্তে পারো! অবশ্য বিদগ্ধ-তোষিণীর মতে যে লগ্ন পাবে, তা'র সঙ্গে এর অনৈক্য হ'বে; কিন্তু কেন হয় তা তোমায় এর পর বুঝিয়ে দিব এবং এও দেখিয়ে দিব যে এই অঙ্কও সূক্ষ্ম নয়। কলিকাতার এই লগ্ন সারিণীও তুমি চট্টোপাধ্যায়ের ফলিত জ্যোতিষের দ্বিতীয় খণ্ডে পাবে। শ্রীযুক্ত অ্যালেন লিও সাহেবের গ্রন্থেও বিস্তৃতভাবে সকল অক্ষের লগ্ননির্ণয় সারিণী আছে, এবং তাহার ব্যবহার প্রণালীও সেই গ্রন্থেই পাবে।

এখন ত্রিকোণমিতির সাহায্যে কিরূপে লগ্ন নির্ণীত হ'তে পারে তা'র উপায় বল্‌তিছি—লগ্নটি জাতকের অক্ষে উদিত কিন্তু চক্রটি তির্য্যকভাবে আছে বলে, দ্বিতীয় ও দ্বাদশের অবস্থিতি অক্ষ পরিমাণ অবশ্য লগ্নাপেক্ষা অল্প এবং তৃতীয় ও একাদশের অক্ষ আরও অল্প এবং দশমের অক্ষ শূন্য, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি এই ভিন্ন ভিন্ন অক্ষকে, সেই সেই গৃহের পোল (Pole) বলা হয়। আমরা যাহাকে চর বলি। ইহা নির্ণয়ে উপায় পাশ্চাত্য মতে এইরূপ—

প্রথমতঃ প্রত্যেক গৃহের উদয়াস্তর নির্ণয় করতে হ'বে। তাহার নিয়ম এই—

লগ স্পর্শিনী (Log tan) ক্রান্তি-পরমাপক্রম (ক্রা.প) এবং জন্ম স্থানের অক্ষাংশাদির লগ. স্পর্শিনীর যোগে,, তৎস্থানের উদয়ান্তর-জ্যার লগ লব্ধ হয়। যথা—কলিকাতার অক্ষ ২২৷৩৩ তাহার লগ স্পর্শিনী ৯·৬১৮২৯৫

অতএব Log. tan. Latitude ৯·৬১৮২৯৫

\+ লগ, ক্রা, প, স্প Log tan Obliquity of the Eclptic ৯·৬৩৭৪৯৬
– উদয়ান্তর জ্যা Log Sine Asc. Dif. ১০°-২৩′ = ৯·২৫৫৭৯১

এই উদয়ান্তরের তৃতীয়াংশের জ্যা, ক্রা, প, লগ কো-স্পতে (Log cotan) যোগ করলে প্রথম একাদশাদি (১১.৩৷৫৷৯) গৃহ চতুষ্টয়ের এবংদুই তৃতীয়াংশ যোগে দ্বাদশাদি (১২৷২৷৬৷৮) গৃহ চতুষ্টয়ে পোল বা চর হইবে।

উদয়ান্তর পাইয়াছি ১০ অংশ ১৩ কলা তাহার তৃতীয়াংশ—

$$\frac{১০।২৩}{৩} = ৩।২৭·৭ \text{ এক তৃতীয়াংশ}$$

সুতরাং দুই তৃতীয়াংশ = ৬।৫৫

অতএব লগ, ক্রা প, কোস্প Log cotan O. E. = ১০·৩৬২৫০৪
\+ লগ জ্যা Log sine – ৩৷২৮ = ৮·৭৮১৫২৪
লগ স্প চর Log tan I. Pole = ৭,৫৬ ৯·১৪৪০২৮

এবং

লগ ক্রা, প, কো-স্প Log cotan O. E. = ১০·৩৬২৫০৪
\+ লগ জ্যা Log sine ৬।৫৫ = ৯·০৮০৭১৯
লগ স্প চর Log tan II. pole ১৫।৩০ = ৯ ৪৪৩২২৩

অতএব পাইলাম কলিকাতার জন্য

একাদশাদির – ৭।৫৬ বা ৮
দ্বাদশাদির – ১৫।৩০ বা ১৫
এতদ্ব্যতীত লগ্নের তদ্দেশীয় অক্ষ ২২।৩৩
এবং দশমের বিষুবদক্ষ ০। ০

এইবার ভাব গণনার সূত্র শোনো—

কোনও গৃহের বক্রোত্থান-চাপের লগ কোজ্যা (Log Cosine) + ঐ গৃহের চর-(Pole) কো-স্প-লগ (Log Cotangent) = ক কোণের কো স্প-লগ (Log Cotan)গৃহের চাপ ৯০ অংশে কম ও ২৭০ অংশের বেশী হয় তবে ক-কোণে পরমাপক্রমের (obliquity of the ecliptic) অংশাদি যোগ করিলে খ কোণ হইবে, অন্যথা উভয়ের অন্তরই খ-কোণ।

তৎপরে ক কোণের কোজ্যা-লগ (Log cos) + গৃহের স্প-লগ (log tan) হইতে ঐ খ কোণের কোজ্যা লগ (Log cos) বিয়োগ করিলেই লগ্নের স্প-লগ্ (Log cos) হইবে। গৃহের বক্রোত্থান পরিমাণ তুলা বা মেষ হইতে এরূপে ঋণাত্মক বা ধনাত্মক অংশাদির দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হইবে যেন ৯০° অংশের অধিক না হয়।

"বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ,—
সকলেই একভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক
ভারতবাসীর ইউরোপ-বিজয়ের ইহাঁরাই প্রথম সেনাপতি।"

India Press, Calcutta.

"মনে পড়ে সে বালকে? বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্য্যের যেন এক দান—
বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে?
চৌদিকে প্রকৃতি তার হাস্য প্রসারিছে
আনন্দ ভ্রকুটিমুক্ত, উদার, নবীন।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
গরু রাখি তরু ছায়ে, তরুমূলে শুয়ে,—
সমুদ্রে নয়ন, মাথা হস্ত পরে থুয়ে,
রৌদ্র করে অনুভব, সিন্ধু অনুভব,
সুখস্পৃষ্ট প্রাণে প্রতিবিন্দু অনুভব।
* * * * *
* * * * * কত ফিরিলাম,—

কোথা লোক? প্রাণ যার মুক্ত? পৃথিবীর
সর্ব্বছাপ পড়ে যেথা? লঘু কি গভীর—
প্রতিক্ষণ জড়জীবে বন্ধু এক করি'
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি?
দৃঢ়বাহু—ওই জেলে-ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্র মাঝে করিয়া ক্ষেপণ
নিজেরে সহসা, বহু ঝুলিয়া ডুবিয়া
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া—
হাস্যমুখে ফলাশক্ত ফেলে কর্ম্মজাল—
"নিশ্চয় উঠিবে মৎস্য"—ধৈর্য্যদৃঢ় ভাল।
সে লোক নিশ্চয় অতি ঘোর ভালবাসে
—তা না'লে কি জলে পড়ি ওইরূপ হাসে?
—জীবন, জীবন, ভাই, আনন্দ জীবন।"

৺সতীশচন্দ্র রায়।

৫ম খণ্ড
৫ম বর্ষ

ফাল্গুন, ১৩২০

৫ম সংখ্যা

আলোচনা

১। সাহিত্যে কাঠিন্য-ধর্ম্ম

আমরা গতবার "বঙ্গের উদীয়মান কাব্য-সাহিত্য" আলোচনায় পরলোকগত ভাবুক-কবি সতীশচন্দ্র রায় সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম, "সতীশচন্দ্র পালোয়ান—বিভীষিকার সঙ্গে, দুঃখের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ করিতেছেন। তিনি দৃঢ়পদে জীবনসমুদ্র-মন্থনে ব্যাপৃত। সতীশ মানুষ, মেয়ে-সুলভ দুর্ব্বলতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই।"

প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে "সাহিত্য"-পত্রে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ৺উমেশ চন্দ্র বটব্যাল সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে

গিয়া প্রায় এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে তখনকার সাহিত্য-সমাজের প্রতি ত্রিবেদী মহাশয় একটা তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন।

"এই দুর্ভাগ্য দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় সমগ্র প্রদেশটা যে সেনা-কর্ত্তৃক অধিকৃত, সেই সেনাভুক্ত বীরপুরুষগণের বীরত্বের আস্ফালন যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাঁহাদের শরীরে মেরুদণ্ডের ও অস্থিকঙ্কালের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে ঘোর প্রমাণাভাব। রামায়ণের আমলে ও হোমারের আমলে বীরপুরুষেরা বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বাগ্‌যুদ্ধটাকে একেবারে অনাবশ্যক বলিয়া জানিতেন না; তবে বাহুযুদ্ধটা একবার আরম্ভ হইলে তাহার ফল শত্রুর পক্ষে বড় বিষম হইত। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রের বীরেরা যে বাক্য-বাণ প্রয়োগ করেন, তাহার তীক্ষ্ণতা কখন অনুভবের বিষয় হয় না; এবং তাঁহারা যে অস্ত্রের আস্ফালন করেন, তাহা কাহারও পৃষ্ঠে কখন কাটিয়া বসে না। এক শ্রেণীর লেখকের অত্যাচারে মনে হয়, কি অশুভক্ষণেই এ দেশে কমলাকান্তের দপ্তর ও উদ্ভ্রান্তপ্রেমের প্রকাশ হইয়াছিল। আর এক শ্রেণীর লেখক নিতান্ত পুরাতন জীর্ণ সত্যকে জীর্ণতর বেশভূষায় কথঞ্চিৎ সজ্জিত ও আবৃত করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করেন, তাহার প্রতিও কোনরূপ অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। বঙ্গভূমি স্বয়ং যে ব্রীহিশস্য বর্ষে বর্ষে উৎপাদন করেন, তাহা, শুনিতে পাই, একান্ত নাইট্রোজেনবর্জ্জিত; আর বঙ্গের বাগ্‌দেবতা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করেন, তাহা "ধূম-জ্যোতিঃসলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ;" বঙ্গদেশে কাঠিন্য-ধর্ম্মবিশিষ্ট সামগ্রীর এত অভাব কেন, তাহা সুধীগণের আলোচ্য।

উমেশচন্দ্র বটব্যালে বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। উচ্ছ্বাসের হাওয়া ও বাক্যের কুয়াসা কাটাইয়া উন্মুক্ত আলোকে ও কঠিন মৃত্তিকায় দুই দণ্ড দাঁড়াইবার অবসর দিয়া তিনি আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। তাঁহার উদ্যত অস্ত্রে কেবল ঔজ্জ্বল্য ও ক্ষমতা ছিল না; তাহাতে ধার ছিল; যে বাহুতে তিনি সেই অস্ত্র ধারণ করিতেন, তাহাতে অস্থি ও পেশী বর্ত্তমান ছিল। কেবল পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিরক্তি জন্মাইতেন না। তিনি প্রায়ই নূতন কথা বলিতেন, এবং পুরাতন কথাকেও নূতন ভাষায় বলিতেন। নূতন সামগ্রীর আস্বাদনে আমাদের রসনা নিত্য নিত্য পরিতৃপ্ত হইত; নূতন নূতন তথ্যের আভাস পাইয়া আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় বহির্মুখে আসিত ও তন্দ্রাত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিত। এদেশের লেখকের পক্ষে ইহা সামান্য প্রশংসা নহে; এবং এদেশের পাঠকের পক্ষে ইহা সামান্য সৌভাগ্য নহে।"

আমরা বঙ্গের নব্য কবি ও লেখকগণকে রামেন্দ্রসুন্দর-প্রচারিত কাঠিন্য-ধর্ম্মের সাধনা করিতে আহ্বান করিতেছি। এই জন্য গত সংখ্যায় বলিয়াছিলাম, "এই ফাঁপা, আদর্শহীন, চিন্তাহীন, বাগাড়ম্বরপূর্ণ কবিতারাশির দিনে সতীশচন্দ্রের গভীরতা, গাম্ভীর্য্য, ওজস্বিতা ও ভাবুকতা উদীয়মান লেখকসম্প্রদায়কে সাধনার প্রণালী দেখাইয়া দিবে। বোধ হয় সতীশচন্দ্র তোমাদের নিকট কর্কশ, নীরস, শ্রুতিকঠোর বোধ হইবে, কিছু দুর্ব্বোধ্যও মনে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার প্রাণময়ী কবিতার মধ্যে পাইবে, 'জীবন, জীবন, ভাই, আনন্দ জীবন।' * * এই সরস সজীব ভাবপুঞ্জ আবার নিজেই

তাহার বিচিত্র ভাষা গড়িয়া লইবে। তখন প্রয়োজন হইলে তোমরা সতীশচন্দ্রের ব্যাকুল আত্মার ন্যায় আবেষ্টনকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া, ভাষাকে ভাঙিয়া চুরিয়া বাহির হইতে পারিবে।"

* *
*

২। পাঠকসমাজ

আমরা সাহিত্যে কাঠিন্য-ধর্ম্ম কামনা করিতেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইতেছে, বঙ্গের পাঠক-সমাজকে সেই কাঠিন্য উপভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তাঁহারা অনেক দিন ধরিয়া ম্যাদামারা প্যানপ্যানে ভাবকেই উপভোগ করিতে অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু ক্রমশ তাঁহাদিগকে সবল ও কঠোর ভাব এবং গম্ভীর ও গভীরতর চিন্তা-রাশি গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইতে হইবে।

গত সাত আট বৎসরের মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যের পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশব্যাপী শিক্ষা ও সাহিত্যের আন্দোলনের ফলে সমাজের সকলস্তরে সাহিত্য-রস-পিপাসা জাগ্রত হইয়াছে। ইহা আমাদের এই যুগের একটা সুলক্ষণ। কিন্তু এই খানেই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না।

এখন নূতন নূতন তত্ত্ব, নূতন নূতন তথ্য, নূতন নূতন জগৎ-কথা, নূতন নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময়ে সেই বিষয়গুলি অনেক পাঠকের কাছেই কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য ও কঠিন বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া পশ্চাৎপদ হইবার প্রয়োজন নাই। সে গুলিকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে—সে গুলি নবশিক্ষার্থীর ন্যায় শিক্ষা করিতে হইবে।

বঙ্গভাষা নানা উপায়ে অপূর্ব্ব শ্রী লাভ করিতেছে। এক্ষণে মামুলী উপায়ে আমরা তাহাকে কিছুতেই বুঝিতে পারিব না। ভাষার প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে পুরাতন মাপকাঠি এখন সর্ব্বাংশে প্রযোজ্য হইবে না বুঝিয়া রাখা উচিত। আজ কাল সময় সময় লেখকগণের ভাষা কঠিন বোধ হইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ—আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিই নূতন। যাঁহারা নূতন কথাগুলি শিষ্যের ন্যায় বুঝিবার জন্য সাধনা করিতে অসমর্থ, তাঁহারাই ভাষার অপ্রাঞ্জলতা ও দুর্ব্বোধ্যতা কল্পনা করিয়া ভীত হইতেছেন! প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গের নূতন-তত্ত্ব-প্রচারকগণের ভাষা সকল স্থলে দূষণীয় নহে। সুতরাং পাঠকগণ ধৈর্য্য এবং মনোযোগ সহকারে নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করিতে যদি প্রস্তুত না থাকেন, তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে বাঙ্গালা-সাহিত্য দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, এবং বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি জগতের দুরূহ সমস্যা-গুলি বিশ্লেষণ করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না।

আমাদের আশা আছে, বঙ্গীয় পাঠক বাঙ্গালী জাতিকে সেই নিন্দনীয় ও শোচনীয় অবস্থায় অধঃপতিত হইতে দিবেন না, এবং বাঙ্গালার সমালোচক ও সম্পাদক মহাশয়-গণও এই বিষয়ে তাঁহাদের গুরু দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

* *
*

৩। বঙ্গভাষায় প্রাণ-বিজ্ঞান

বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষা, সমাজ, ধন-সম্পত্তি ও রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু প্রাণ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সেরূপ কিছু দেখা যাইতেছে না। অথচ এই বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ব্বোক্ত কোন

বিষয়ের আলোচনা বা জ্ঞান কিছুতেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

সুখের কথা দুই একজন লেখক এইদিকে অগ্রসর হইয়াছেন। গতবর্ষের "অর্চনা"য় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ বি,এল্ মহাশয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, যথা, 'সৃষ্টিবৈচিত্র্য,' 'স্বাভাবিক নির্ব্বাচন,' 'প্রাণের বিকাশ,' 'জীব ও উদ্ভিদ,' 'জীবন-সংগ্রামে স্বাভাবিক নির্ব্বাচন,' 'জীবের স্বতঃ উৎপত্তি,' 'আদি প্রাণ' এবং 'গৃহপালিত জীবের শ্রেণীবৃদ্ধি।' শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্, এ, বি, এল মহাশয় বহুদিন হইতেই 'নব্যভারতে' এই বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সেই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে—নাম 'মানব-সমাজ।' এই পুস্তকখানি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। নবীন ও প্রবীণ পাঠক এবং লেখকগণ সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মহলে সুপ্রচলিত তত্ত্বগুলি সহজেই অধিকার করিতে পারিবেন। অক্ষয়কুমার দত্তের "বাহ্যবস্তু ও মানবপ্রকৃতি" গ্রন্থের পর বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর গ্রন্থ বাহির হয় নাই। আধুনিক প্রাণ-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত-গুলির মোটামোটি জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীরা অগ্রসর হইবেন না কি? আমরা রায় মহাশয়ের ভাষায় বলিতেছি—

"আর 'সৌন্দর্য্য'-উপভোগের সময় নাই; আমরা ক্রমেই অধঃপতিত হইতেছি। হিতকর বৈজ্ঞানিক আলোচনা কষ্টকর হইলেও, এক্ষণে তাহাতেই ধীরভাবে মনোনিবেশ করা আমাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই।"

৪। যুক্ত-প্রদেশে শিক্ষা-সমস্যা

হিন্দুস্থান অঞ্চলে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষার পাঠ্যপুস্তকগুলি দেশীয় সন্তান সন্ততির পক্ষে উপযোগী নয়। তথাকার জননায়কগণ পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচন প্রণালীর সংস্কার করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের জনগণ শিক্ষাব্যাপারে এত পশ্চাৎপদ কেন? ইহার প্রধানতম কারণ এই যে এখানে উর্দ্দুর মধ্য দিয়া সাধারণ শিক্ষা দান চলিয়া থাকে। কিন্তু উর্দ্দুর মধ্যে আরবিক ও পার্শী শব্দের বড় মিশ্রণ। ইহার অক্ষর গুলাও বড় কঠিন এবং বিদেশী। সেইজন্য যদিও এ ভাষা আদালত এবং শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত, অধিকাংশ লোকই ইহা ভাল রকম বুঝিতে পারে না।

পঞ্জাব প্রদেশেও প্রায় যুক্তপ্রদেশের মতই অবস্থা। সেখানেও এই উর্দ্দু ভাষার প্রচলন। কিন্তু যুক্তপ্রদেশের কুমায়ুন বিভাগে আদালত স্কুল প্রভৃতিতে উর্দ্দু ব্যবহৃত হয় না। সেখানে নাগরীর চলন। সেইজন্য সেখানে শিক্ষিতের সংখ্যা হাজার করা ১২১ জন। তারপর এলাহাবাদের সংখ্যা—৭৩ জন। অন্যান্য বিভাগে, যেখানে হিন্দী ভাষার প্রাবল্য, শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী। বারাণসীতে হাজার করা ৭১ জন শিক্ষিত। কিন্তু রোহেলাখণ্ডে উর্দ্দুর প্রাবল্য। সেইজন্য সেখানে হাজার করা ৪৪ জন মাত্র শিক্ষিত। ফয়জাবাদ এবং লক্ষ্ণৌতে, হাজার করা ৫০ এবং ৫৬ জন, কারণ সেখানেও উর্দ্দুই বেশী প্রচলিত।

তারপর দেখা কর্ত্তব্য—যে সমস্ত বালক গ্রাম্য স্কুলে উর্দ্দুতে পাঠ সমাপন করে, তাহাদের কি পরিমাণ সংখ্যা পার্শী পড়িতে ও লিখিতে পারে—শিকস্তা লিখিতে ও

পড়িতেই বা তাহাদের কত বৎসর লাগে। কিন্তু নাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী সম্বন্ধে এ সব প্রশ্ন আদৌ উঠে না। যে কোন বালক দুই তিন বৎসর গ্রাম্য পাঠশালা বা অন্য কোথায়ও এই ভাষা শিক্ষা করিবে, সে তাহার সমস্ত জীবনই এই ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে পারিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। আজকাল স্কুলে যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত হয়, তাহাদের ভাষা বড়ই কদর্য্য। অনেক সময়েই তাহা শ্রতিকটু এবং অস্পষ্ট। ইহার কারণ পাঠ্যপুস্তক-গুলির লেখকেরা সাধারণতঃ খুব শিক্ষিত অথবা প্রথিতনামা সাহিত্যিক নহেন। তারপর শোনা যায় যে পাঠ্যপুস্তকগুলি প্রথমতঃ ইংরাজীতে লেখা হয়, এবং শেষে হিন্দী ও উর্দ্দুতে অনূদিত হইয়া থাকে। ইহাতেও ভাষাটা নীরস ও কদর্য্য হইয়া উঠে।

উর্দ্দু এবং হিন্দী পাঠক উভয়েই সহজে বুঝিতে পারিবে এই ভাবিয়া অনেক লেখক উর্দ্দুভাষা প্রয়োগ করেন, অথচ সেই ভাষাকেই হিন্দী বা হিন্দুস্থানী বলিয়া মনে করা হয়। এই ভাষার মধ্যে পার্শী ও আরবিক শব্দের মিশ্রণ খুব বেশী হইয়া থাকে, ইহার ফল বড়ই শোচনীয়। সাধারণের ভাষা করিতে গিয়া হিন্দী ভাষাতত্ত্বে অনভিজ্ঞ লেখকেরা অযথা এমন সব বিদেশী শব্দ চালাইয়া যান যাহা শিক্ষিত মুসলমান এবং আদালতে সংশ্লিষ্ট হিন্দু ভিন্ন দেশের আর কেহই বুঝিতে পারে না। এই সব লেখকদিগের কৃত ভাষা কাজে কাজেই দেশবাসীর এবং আধুনিক ও পুরাতন হিন্দী লেখকদিগের ভাষা হইতে নিতান্তই স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে।

এমন সমস্ত হিন্দী ও উর্দ্দু পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য, যাহা এই সব ভাষার প্রসিদ্ধ লেখকদিগের দ্বারা প্রণীত।

আধুনিক পাঠ্য পুস্তকের ভাষার জন্য শিক্ষার বড়ই ব্যাঘাত হইতেছে। শিক্ষিত পিতামাতা এই সব পুস্তক নিতান্তই মূল্যহীন বলিয়া মনে করেন, এবং পুত্রকন্যাদের শিক্ষা দিতে যাইয়া তাঁহারা অনেক সময় এই সব পুস্তকের পরিবর্ত্তে প্রসিদ্ধ লেখকদিগের পুস্তক পাঠ করান। গ্রামের অথবা সহরের ছেলেরা দুই তিন বৎসর পাঠসমাপনান্তে হিন্দী রামায়ণ ভাল করিয়া পড়িতে ও বুঝিতে পারে। ইহাই গ্রাম বা সহরের অধিকাংশ হিন্দু অভিভাবকদিগের অভিপ্রায়। কারণ রামায়ণ হিন্দুদিগের কাছে অতিশয় আদরণীয় এবং ছেলেদের হাতে দিবার নিতান্ত উপযুক্ত। আজকাল কিন্তু ছয় বৎসর উপরিউক্ত পাঠ্য পুস্তক পড়িয়াও ছেলেরা রামায়ণের ভাষা বুঝিতে সমর্থ হয় না! অতএব যাহাতে ছাত্রেরা হিন্দী পড়িতে ও লিখিতে শিখিলেই রামায়ণ শিক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

স্যার থিওডোর মরিসন বলিয়াছেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই উচ্চ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষাকার্য্য মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই যাহাতে হয়, তাহাই এখন দেশবাসী প্রার্থনা করিতেছে। আজ হৌক কাল হৌক বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

সুতরাং বিশুদ্ধ হিন্দী অথবা বিশুদ্ধ উর্দ্দুতে পাঠ্যপুস্তকগুলি লিখিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং কৃত্রিম ভাষায় পাঠ্যপুস্তক লিখন-প্রণালী একেবারে বর্জ্জনীয়।

* * *

৫। কংগ্রেসের আবশ্যকতা

পূর্ব্বে কংগ্রেস সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমরা বলিয়াছিলাম, কংগ্রেসকে রক্ষা করা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। এত বড় একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসমুখে প্রেরণ করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহার সহিত যোগদান করিয়া ইহার মধ্যে নূতন জীবন সঞ্চার করা নূতন নূতন কর্ম্মিগণের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এবার "প্রবাসী"ও করাচীর কংগ্রেস প্রসঙ্গে আমাদের অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন—

"দেশীয় সমালোচকেরা বলেন যে একটি বার্ষিক তিন দিনের তামাসা করিয়া কি লাভ? প্রথম উত্তর এই যে, কংগ্রেস ত বলে না যে তোমরা কেবল তিন দিনই রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা করিবে। সমস্ত বৎসর ধরিয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আন্দোলন করিতে কংগ্রেস নিষেধ করে না, বরং করিতেই বলে। সম্বৎসর যে কাজ হয় না, সে দোষ দেশের লোকের; কংগ্রেসের নহে। দ্বিতীয় উত্তর এই যে বৎসরান্তে কেবলমাত্র একবারও সমস্ত দেশের লোকদের কি অভাব ও দাবী তাহা এক প্রাণে অনুভব করা এবং বলার মূল্য আছে ও আবশ্যক আছে। তদ্ভিন্ন, এই যে সমগ্র ভারতের নানাভাষাভাষী, বিচিত্রপরিচ্ছদধারী, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বহু জাতীয় মনুষ্যের তিন দিনের জন্যও একত্র সমাবেশ, একত্র বাস, একত্র কর্ম্মানুষ্ঠান, পরস্পর কথোপকথন ও বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হওয়া, ইহা কি একজাতিত্ববোধ বৃদ্ধি করে না? নিশ্চয়ই করে। কংগ্রেস আর কিছু না করিয়া থাকিলেও যে দূরের মানুষকে নিকট এবং পরকে আপন করিবার সাহায্য করিয়াছে, ইহাতেই তাহার জন্ম ও অস্তিত্ব সার্থক হইয়াছে।

দেশীয় সমালোচকদিগের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে কংগ্রেস কেবল আবেদন প্রার্থনাই করেন, স্বাবলম্বন করেন না। ইহার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, কংগ্রেস এমন অনেক বিষয়ে আবেদন করেন, যাহাতে আবেদন ভিন্ন আর কিছু করা যাইতে পারে না। আমরা খুব স্বাবলম্বী হইলেও নিজেই জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারি না, সিবিল সার্বিসের পরীক্ষা ভারতে ও বিলাতে যুগপৎ চালাইতে পারি না, কাপড়ের শুল্ক উঠাইয়া দিতে পারি না, বিচার ও শাসন-বিভাগ স্বতন্ত্র করিতে পারি না। সত্য বটে, দেশমধ্যে শিক্ষা-বিস্তার আমরা নিজেই অনেকদূর করিতে পারি, নানা শিল্পেরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কিয়ৎ পরিমাণে করিতে পারি, দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টাও অল্পস্বল্প করিতে পারি। এরূপ চেষ্টা দেশে যে একেবারে হইতেছে না, তাহা নয়; কংগ্রেস যে এরূপ চেষ্টার বিরোধী, তাহাও নয়।"

৬। দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বদেশী বিদ্যালয়

ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ভারতবাসী সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনাদের জগৎ গড়িয়া তুলিতে-ছেন। সেই চেষ্টায় তাঁহারা কত নির্য্যাতন সহ্য করিতেছেন, সে সংবাদ কাহারও অবিদিত নাই। আমরা বলিয়াছি, সেই নির্য্যাতিত ব্যক্তিগণ শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণীর লোক নহেন। তাঁহাদের মধ্যে "প্রায় সকলেই মুদী, দোকানদার, ফেরিওয়ালা; সোজা কথায় 'চাষা' অর্থাৎ mass পদবাচ্য।"

এই অশিক্ষিত জনসাধারণ প্রবাসে অসাধারণ চরিত্রবত্তার পরিচয় দিতেছেন। তাঁহাদের এই চরিত্রবত্তা কেমন করিয়া জাগ্রত হইল, সে কথা বুঝিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, কর্ম্মবীর গান্ধীর অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ সেবাই ইহার একমাত্র কারণ। শুধু কতগুলা ফাঁপা বক্তৃতায় তিনি জনসাধারণকে মুগ্ধ করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি নানা উপায়ে তাহাদের আপনার হইতেও আপন হইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার বহু কর্ম্মের মধ্যে আজ একটি মাত্র কর্ম্মের উল্লেখ করিব।

সুদূর প্রবাসে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি একটি স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিকট হইতে কোন বেতন লওয়া হয় না। গ্রন্থপাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষিশিল্প প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় বিষয়ই ছাত্রদিগকে শিখান হইয়া থাকে। কিন্তু সকলের উপরে ছাত্রদিগের চরিত্র যাহাতে সংগঠিত হয়, তাহারা যাহাতে আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করে, তাহার দিকেই অধ্যাপকগণের বিশেষ দৃষ্টি। প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার নিজের নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধেও কিছু কিছু উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে—এতদর্থে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠও নির্দ্দিষ্ট করা হয়। সমগ্র শিক্ষাপ্রণালীর মূল উদ্দেশ্যই এই যে—ছাত্রগণের মনে এই ভাবটা দৃঢ় অঙ্কিত করিয়া দিতে হয় যে, তাহারা ভারতবর্ষের সন্তান এবং সেই হিসাবে তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস পৃথক হইলেও তাহারা পরস্পরের অত্যন্ত আপন। বিদ্যালয়ে ছাত্র এবং অধ্যাপকদিগের জীবন-যাত্রাও বড় সাদাসিধা।

এই সকল নৈতিক কারণেই দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসিগণ আজ অন্যায় আইনের সঙ্গে দৃঢ়চিত্তে সংগ্রাম করিতে বদ্ধপরিকর হইতে পারিয়াছে।

৭। সিংহলে বৌদ্ধ শিক্ষাপরিষৎ

কলিকাতার শিক্ষাবিষয়ক পাক্ষিকপত্র 'কলেজিয়ানে' কলম্বো নগরের একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তথাকার বহু গণ্যমান্য বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ একটি বৌদ্ধশিক্ষাপরিষৎ সংগঠন করিয়াছেন। সিংহলবাসী বৌদ্ধদিগের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য তিন উপায়ে সাধিত হইবে। প্রথম—স্কুল, কলেজ, ট্রেণিং ইনষ্টিটিউসন, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এবং টেকনিক্যাল স্কুল অথবা এবম্বিধ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা, দ্বিতীয়—সিংহল অথবা সিংহলের বাহিরে বৃত্ত্যাদি প্রদান করিয়া। তৃতীয়—পুস্তক প্রকাশ করিয়া।

উক্ত পরিষদে তিন শ্রেণীর সভ্য গ্রহণ করা হইবে। যাঁহারা বৎসরে ১০,০০০৲ টাকা দান করিবেন, তাঁহারা যাবজ্জীবন সভ্য, এবং যাঁহারা বৎসরে ১২০৲ টাকা দান করিবেন, তাঁহারা সাধারণ সভ্য এবং যাঁহারা বৎসরে অন্যূন ২০৲ টাকা দিবেন, তাঁহারা বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

আমরা এই জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল কামনা করি।

৮। ভারত সম্বন্ধে "টাইম্‌স্‌" ও "ইংলিশম্যান"

"টাইম্‌স্‌" পত্রিকায় "ভারতাতঙ্ক" নামে কতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংলিশম্যান তৎসম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"টাইম্‌স্‌" ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহেন—তিনি বাস্তবকে বড় ফাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। সত্যসত্যই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা তত ভীতিপ্রদ নহে। অবশ্য রাজবিদ্রোহকর ঘটনাগুলি ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং বহু জেলায় সম্পাদিত ভীষণ ভীষণ অপরাধে কর্ত্তৃপক্ষ কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, গবর্ণমেণ্ট অবিচলিতভাবেই চলিয়াছেন। জনসাধারণ শান্ত এবং সুখী। কোথায়ও বাণিজ্যের কোন বাধাবিপত্তি ঘটে নাই। এখনও ইউরোপীয়গণ নির্ব্বিঘ্নে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমনাগমন করিতে পারেন। পর্য্যটকগণ পুস্তক পড়িয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণা করেন, তাহাই তাঁহারা আজও বিশাল লোকারণ্য কিম্বা পরিত্যক্ত প্রাচীন নগরের মধ্যে দেখিতে পান! ইউরোপীয়গণ কোথায়ও সশস্ত্র হইয়া গমন করেন না। পল্লী এবং নগরবাসী ব্রিটিশ শাসনে পূর্ব্বের মত নিরুপদ্রবেই কাল কাটাইতেছে।"

* *
*

৯। পঞ্চনদে হিন্দী-"সংরক্ষণ"

হিন্দী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বিশেষতঃ পঞ্চনদে বিপুল আয়োজন চলিতেছে। শ্রীযুক্ত সত্যদেব হিন্দী সাহিত্য প্রচারকেই জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আমেরিকার একজন গ্র্যাজুয়েট। স্বদেশে আসিয়া তিনি অতি সামান্যভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ নিতান্তই সামান্য রকমের—স্বয়ং রন্ধন করিয়া আহার করেন। সাহিত্যের হিতকল্পে তাঁহার এই স্বার্থত্যাগ বঙ্গদেশে অনেকেরই অনুকরণীয়। "আর্য্যসমাজ"ও নানাস্থলে গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দীসাহিত্যকে উন্নত করিয়া তুলিতেছেন। বস্তুত অচিরেই হিন্দীসাহিত্য বিশেষ উন্নত হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি পঞ্জাবের "হিন্দুসভা" উচ্চশিক্ষিতের মধ্যে হিন্দী-অনুরাগবর্দ্ধনার্থ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার একটি ত্রৈবাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন গ্র্যাজুয়েট হিন্দুসভার অনুমোদিত বিষয়ে হিন্দীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবেন, তিনিই উক্ত পুরস্কার লাভ করিবেন।

* *
*

১০। মহারাষ্ট্রে সংস্কৃত-চর্চ্চার ভবিষ্যৎ

মহারাষ্ট্রে সংস্কৃত-চর্চ্চা লইয়া বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। স্যার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইচ্ছা করেন যে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হউক। অধ্যাপক পরাঞ্জপ্যে প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাহাতে আপত্তি করেন। তাঁহাদের মতে পণ্ডিতদিগের শিক্ষাপ্রণালী উদার নহে। প্রাচ্য পণ্ডিতেরা চিরন্তন প্রথায় বিদ্যাভ্যাস করিয়া বড়ই সঙ্কীর্ণ

হইয়া উঠেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের মুখস্থ করিবার অভ্যাসটা বড়ই নিন্দনীয়।

অবশ্য ভাণ্ডারকরের দল এ সব কথা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা নানারূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বহু সংখ্যক পণ্ডিত ও শাস্ত্রী উদারতার দৃষ্টান্তস্থল। দাক্ষিণাত্যে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন সর্ব্ব প্রথমে একজন শাস্ত্রীর দ্বারাই উপস্থাপিত হয়। অতএব এই ইংরাজী শিক্ষার দিনে সংস্কৃতের চর্চ্চা "সংরক্ষিত" হইলে বহু বিষয়ে দেশের মঙ্গল হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটগণের নিকট হইতে সংস্কৃতাধ্যায়ীরা নূতন প্রণালীতে তুলনামূলক সমালোচনা শিক্ষা লাভ করিবেন, এবং গ্র্যাজুয়েটগণও পণ্ডিতদের নিকট হইতে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়া তাহা নানা কাজে লাগাইতে পারিবেন। পণ্ডিতগণ "মুখস্থ" করিবার পক্ষপাতী বটে, কিন্তু না বুঝিয়া মুখস্থ করা তাঁহারা কেহই অনুমোদন করেন না।

* *
*

১০। বঙ্গের লোক-গণনা

বঙ্গদেশের বিগত ১৯০১ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরের লোক-সংখ্যা সম্প্রতি সরকারের পক্ষ হইতে গণনা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে সরকারী কাগজ-পত্র মধ্যে মধ্যে বাহির হইতেছে। সেই সকল কাগজ-পত্র হইতে সংকলন পূর্ব্বক বঙ্গদেশবাসিগণ সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয় নিম্নে দেওয়া গেল। বহরম-পুরের সাহিত্যসেবী উকীল শ্রীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায় বি, এল্, মহাশয় আমাদিগকে এসম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

(১)

এখনকার বঙ্গ প্রদেশের লোক-সংখ্যা ৪,৬৩,০৫,৬৪২ জন, বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে গেলেই প্রথমে হিন্দু-মুসলমানগণের সম্বন্ধেই লিখিতে হয়।

(২)

এক্ষণে যে জেলাগুলি লইয়া নূতন বঙ্গ-প্রদেশ সৃষ্ট হইয়াছে তথায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ৩২৷৷ লক্ষ বেশী, শতকরা ৫২ জন মুসলমান ও ৪৫ জন হিন্দু।

পূর্ব্বে যে সকল জেলা বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল তন্মধ্যে পূর্ণিয়া, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, ধলভূম, হাজারীবাগ, ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর এবং আসাম প্রভৃতি জেলাগুলিতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুই বেশী। এক্ষণে ঐ সকল স্থান বাঙ্গালাদেশের বহির্ভূত।

(৩)

পশ্চিম বঙ্গে শতকরা ১৩ জন মুসলমান
মধ্য " " ৪৮ " "
উত্তর " " ৫৯ " "
পূর্ব্ব " " ৬২ " "
বগুড়া জেলায় " ৮২ " "

এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম প্রদেশে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অধিক।

ইহা হইতে যেন বোধ হয় এমন কি বাঙ্গালীদের মধ্যেও মুসলমান-সংখ্যা হিন্দু-দিগের অপেক্ষা অধিক।

(৪)

পশ্চিম বঙ্গে শতকরা ৮২ জন হিন্দু
মধ্য " " ৫১ " "
উত্তর " " ৩৭ " "
পূর্ব্ব " " ৩১ " "

(৫)

নিম্নলিখিত জেলাগুলিতে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক —

বৰ্দ্ধমান	মেদিনীপুর	২৪ পরগণা
বীরভূম	হুগলী	দার্জ্জিলিং
বাঁকুড়া	হাবড়া	জলপাইগুড়ী

চট্টগ্রাম পাহাড়

কুচবিহার পার্ব্বত্যত্রিপুরা

কলিকাতায় হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের অপেক্ষা অনেক অধিক। কলিকাতার দশ আনা লোক হিন্দু।

(৬)

সমস্ত হিন্দুর সংখ্যা যত তাহার
তিনভাগের একভাগ পশ্চিম বঙ্গে
সিকিরও বেশীভাগ পূর্ব্ব „
পাঁচ ভাগের এক ভাগ মধ্য ও উত্তর „

১১। বঙ্গে লোক-বৃদ্ধির হার

	হিন্দু	মুসলমান
সমগ্র বঙ্গে—শতকরা	৩·৯	শতকরা ১০·৪
পশ্চিম „ „	১·৭	„ ৪·৯
উত্তর „ „	২·৯	„ ৮·২
পূর্ব্ব „ „	৬·৬	„ ১৪·৬
মধ্য „ „	৫·২	„ ৩·২

বিগত ৩০ বৎসর হইতে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান বরাবর বেশী বাড়িয়া আসিতেছে। নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বেশ বুঝা যাইবে—

সাল	হিন্দু	মুসলমান
১৮৭২	১৭,১১২,৯৪৫	১৬,৬৮০,৬৪৩
১৮৮১	১৭,২৫৪,১২০	১৭,৮৬৩,৪১১
১৯০১	১৮,০৬৮,৬৫৫	১৯,৫৮২,৩৪৯

এ সময়ে হিন্দুরা শতকরা ১৬ জন বাড়িয়াছে
মুসলমানেরা „ ২৯ „ „

পূর্ব্ব বঙ্গে ঐ সময়ের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫০ জনেরও অধিক এবং হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ২৬ জনেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৮৯১ সালের পূর্ব্বে যাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ভূতপ্রেত-পূজক অনেককেই এখানে ভিন্নশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে উহাদের সহিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের পার্থক্য নির্ণয় করা অতীব কঠিন, এ কথা কর্ত্তৃপক্ষীয় অনেকেই স্বীকার করেন। উহাদের মধ্যে বংশ-বৃদ্ধির হার অধিক।

হিন্দুদের বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে বৃদ্ধির হার নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্রাহ্মণ শতকরা ৭·৫ জন
বৈদ্য „ ৯ „
কায়স্থ „ ১৩ „

খৃষ্টানদের মধ্যে বৃদ্ধির হার শতকরা ২২ জন।

সহরেই পল্লীগ্রাম অপেক্ষা অনেক অধিক হারে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অথচ পল্লীগ্রামে হাজার করা ৯৩৬ জন
সহরে „ „ ৭৪ জন
বাস করে

* *
*

১২। বঙ্গের সামাজিক অবস্থা

১৫—৪৫ বৎসরের সধবা স্ত্রীলোক সংখ্যা
হিন্দু শতকরা ৭৬ জন
মুসলমান „ ৮৭ „

ঐ বয়সের বিধবা স্ত্রীলোকের সংখ্যা
হিন্দু শতকরা ২২ জন
মুসলমান „ ১১ „

এই পার্থক্য মুসলমান-সংখ্যাবৃদ্ধি এবং হিন্দু-সংখ্যা-হ্রাসের একটি প্রধান কারণ বলিয়াই সরকারী কাগজ-পত্রে প্রকাশ।

১০—১৫ বৎসর বয়সের বিবাহিতা বালিকাগণের সংখ্যা

হিন্দু শতকরা ৬৭ জন
মুসলমান „ ৫৬ জন

১৫—১০ বৎসরের বিবাহিতা বালিকার সংখ্যা

হিন্দু শতকরা ১২·৫ জন
মুসলমান „ ৯ „

বাল্য-বিবাহ হিন্দুজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে নাই, বরং উহা হিন্দুদের সংখ্যা-হ্রাসের অন্যতম কারণ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

স্ত্রী-পুরুষ-সংখ্যা

১ হাজার পুরুষ মধ্যে ৯৪৫ জন স্ত্রীলোক তন্মধ্যে অনেকে একাই এদেশে উপার্জ্জন করিতে আছে। তাহাদের সংখ্যা বাদ দিলে ১ হাজার পুরুষ মধ্যে ৯৭০ জন স্ত্রীলোক।

পুরুষদের শতকরা ৩॥ জন বিপত্নীক
স্ত্রীলোকদের „ ২০ „ বিধবা

৫ বৎসরের কম বয়সের
৪৭১১ বালক বিবাহিত
১৫ ৬২২ বালিকা „

ঐ বয়সের
১৩১ বালক বিপত্নীক
১৮৪৭ বালিকা বিধবা

* *
*

১৩। শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী

লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা

১৯০১ সালে হিন্দু শতকরা ১০·৩ জন
„ মুসলমান „ ৩·৫ „
১৯১১ সালে হিন্দু „ ১১·৮ „
„ মুসলমান „ ৪·১ „

লিখিতে পড়িতে পারে এরূপ মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদিগের ⅓ অংশ। অথচ মুসলমান সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা ৩৩ লক্ষ বেশী।

লিখনপঠনক্ষম স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা

	পুরুষ	স্ত্রী
মুসলমান ...	২৯ ...	৩১
হিন্দু ...	১৬ ...	৬৪

সুতরাং হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই শিক্ষা-বিস্তার স্ত্রীদিগের মধ্যে পুরুষদিগের অপেক্ষা বেশী। হিন্দুদের স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার পুরুষ-শিক্ষার ৪ গুণ। আবার মুসলমানদিগের মধ্যে পুরুষদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার হিন্দুদের পুরুষদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণ।

লেখা-পড়া-জানা লোকের সংখ্যা

বঙ্গে	শতকরা	৭·৭ জন
মান্দ্রাজে	„	৭·৫ „
বোম্বাই	„	৬·৯ „
উত্তর বঙ্গে	„	৫ „
পূর্ব্ববঙ্গে	„	৭ „
পশ্চিম বঙ্গে	„	১০ „
মধ্য বঙ্গে	„	১১ „

নিম্নলিখিত জেলায় শত করা ৫ জনেরও কম

মৈমনসিংহ রংপুর
রাজসাহী মালদহ

পুরুষ ৭ জনের ১ জন
স্ত্রী ৯১ „ „ „

মোট স্ত্রী অর্থাৎ পুরুষের ১৬ অংশ বৃদ্ধির হার ১০ বৎসরে

শতকরা পুরুষ ১৯·৫
„ স্ত্রী ৫·৬

শতকরা ১ জন ইংরাজী জানে
তন্মধ্যে উহার সিকি কলিকাতায়।

* *
*

১৪। বাঙ্গালীর অন্নসংস্থান

৫,৫৩০০০ বাঙ্গালী বাঙ্গালার বাহিরে
১৮,৩৯০০০ অন্য প্রদেশীয় বাঙ্গালার ভিতরে বাস করিতেছে।

তন্মধ্যে বিহার উড়িষ্যা হইতে ১২॥ লক্ষ
আগ্রা-অযোধ্যা হইতে ৪ লক্ষ ৬ হাজার।

লোকের ধারণা এই যে বাঙ্গালীরা অন্য দেশে অধিক সংখ্যায় গমন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখা

যাইতেছে অন্য প্রদেশ হইতেই অধিকসংখ্যক ব্যক্তি আসিয়া এ দেশ হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

৩,৫৫ লক্ষ লোকের কৃষি ও পশুচারণ
৩ কোটী " কৃষি (অর্থাৎ সমগ্র লোক-সংখ্যার প্রায় ⅚ অংশ)
১২ লক্ষ চাষীর আয়ে
৩০ লক্ষ ৪০ হাজার (অর্থাৎ শতকরা ৭॥ খামাদের চাকর বা ক্ষেতের মুনীষ
৩৪ লক্ষ ৪১ হাজার শ্রমজীবী
উহার সিকি কাপড় ইত্যাদি বুনা বা সূতা প্রস্তুত। ৩ লক্ষ ২৮ হাজার পাট ইত্যাদি কলে কায, ২৩ লক্ষের উপর ক্রয়-বিক্রয়াদি বাণিজ্য
৫ লক্ষের সরকারী চাকরী
১০ হাজার আইনব্যবসায়ী
কৃষি ব্যতীত অন্য উপায়োপজীবীদের মধ্যে
শতকরা ৫২ জন মুসলমান
" ৪৫ " হিন্দু

* *
*

১৫। বৈদিক যুগের জীবজন্তু

আমরা বহুবার বলিয়াছি, হিন্দুরা বাস্তব জগতের উন্নতিকল্পে বহু বিষয়ের নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশের হিতকল্পে যাহা কিছু করণীয় কিছুই বাদ দেন নাই। তাঁহাদের এই বাস্তব জগতের উপরে কি বিপুল-বিস্তৃত অধিকার ছিল, তাহা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় তাঁহার "The Positive Background of Hindu Sociology" গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই গ্রন্থ প্রয়াগের "হিন্দু-সাহিত্য-প্রচার-পরিষৎ" (পাণিনি কার্য্যালয়) হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় আরও প্রকাশিত হইয়াছে। ভাবুকশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, অধ্যাপক রাধাকুমুদ এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক। সম্প্রতি "প্রতিভা" পত্রিকায় বৈদিকযুগের জীবজন্তু সম্বন্ধে কিছু আলোচনা বাহির হইয়াছে। আমরা তাহা হইতে সিংহ, হস্তী, অশ্ব, মৃগ প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান জন্তু সম্বন্ধে ঋষিরা কিরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় পাঠকগণকে শুনাইতেছি—

"মহিষাসো মায়িনশ্চিত্র ভানবো
গিরয়োন স্বতবসে রঘুষ্যদঃ।
মৃগা ইব হস্তিনঃ খা দথা বনা যদারুণীষু
তবিষীয় যুগ্ধবম্।
সিংহা ইব নানদতি প্রচেতসঃ পিশা ইব
সুনিশো বিশ্ববেদসঃ।
ক্ষপো জিন্বন্ত পৃষিতিভিঋর্ষিভিঃ সমিৎ
সবাধঃ সবসাহি মন্যবঃ।"
ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল—৬৪ সূক্ত।

অর্থাৎ হে মরুৎগণ, তোমরা মহৎ, প্রাজ্ঞ, সুন্দর, দীপ্তিমান, পর্ব্বতের ন্যায় বলবান এবং শীঘ্রগতি; তোমরা করযুক্ত গজের ন্যায় বন ভক্ষণ কর, যেহেতু তোমরা অরুণবর্ণ বড়বাকে বল প্রদান করিয়াছ। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ সিংহের ন্যায় নিনাদ করেন। সর্ব্বজ্ঞ মরুৎগণ হরিণের ন্যায় সুন্দর; তাহারা (শত্রুর) বিনাশকারী, (স্তোতার) প্রীতিকারী, এবং ক্রুদ্ধ হইলে বিনাশক্ষম বলযুক্ত, এতাদৃশ মরুৎগণ তাহাদের বাহন মৃগের সহিত এবং আয়ুধের সহিত শত্রুপীড়িত যজমানদিগকে (রক্ষা করিতে) যুগপৎ আসিতেছেন।"

* * *

"বেদের পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋকে যে হস্তী, মৃগ শব্দের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে, তাহাতে মৃগ ও হস্তীর মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের প্রচ্ছন্ন ইতিহাসেরই যেন আভাস পাওয়া যাইতেছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগের দ্বারা উত্তর আশিয়া বা সাইবেরিয়াতে যে অতিকায় জন্তু কঙ্কালের বিশালক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই অতিকায় জন্তু প্রাচীন ম্যামথ (mammoth) বা হস্তীজাতীয় জন্তু বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে।"

* * *

"মৃগশব্দ হস্তীশব্দের সহিত এইরূপে সংযুক্ত

হইয়া যে সাধারণ সংজ্ঞাশব্দে পরিণত হইতেছে, তাহার স্পষ্ট প্রক্রিয়াই বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে আমরা অন্য দুইটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই আমাদের উক্তির সত্যতা প্রতিপাদিত হইবে।

'দিনা মৃগো ন বারণঃ পুরুত্রা চরথং দধে।'

ঋগ্বেদ ৮ম মণ্ডল, ৮ম সূক্ত।

অর্থাৎ (শত্রুগণের) অন্বেষণকারী হস্তী যেরূপ মদজল ধারণ করে, সেইরূপ ইন্দ্র যজ্ঞে মত্ততা ধারণ করে।

'যুবাং মৃগেব বারণা মৃগণ্যবো
দোষাবস্তোর্হবিধা নিহ্বয়ামহে।'

ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল, ৪০ সূক্ত।

অর্থাৎ যেরূপ ব্যাধেরা বৃহৎ বৃহৎ মৃগকে (হস্তীদিগকে) বাঞ্ছা করে, তদ্রূপ তোমাদিগকে আমি দিবারাত্রি যজ্ঞের দ্রব্য লইয়া আহ্বান করিতেছি।"

* *
*

১৬। আমাদের অনাদৃত বিদ্যা

বাঙ্গালা-দেশে আজকাল কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যবিষয়ক অনেকগুলি পত্রিকা চলিতেছে। "ব্যবসা ও বাণিজ্য"ও সেই গোষ্ঠীভুক্ত। সম্প্রতি তাহাতে আমাদের কতগুলি প্রাচীন সদনুষ্ঠান পুনরুদ্যাপন করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। আমরা আমাদের স্বদেশ-ভ্রাতাদিগের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করিতেছি—

"শারীরিক শক্তি ও কৌশলের পরিচায়ক মল্লযুদ্ধ ভারতের নিজস্ব বিদ্যা। মহাভারতের যুগেও ভীমসেন প্রভৃতির এই বিদ্যার পারদর্শিতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্যবিদ্যার প্রতি আত্মসম্মান-বিসর্জ্জনকারিণী শ্রদ্ধার ফলে এই ভারতীয়-বিদ্যা তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর অশ্রদ্ধায় নিম্ন-শ্রেণীতে নির্ব্বাসিত হইয়া তাহাদেরই আদরে এতদিন কোনক্রমে জীবনধারণ করিয়াছিল। সুখের বিষয় আমরা স্যাণ্ডো নামের মোহ অনেকটা কাটাইয়া এখন পুনরায় ভারতের মলিন-বসন "অর্দ্ধ-অসভ্য" ভীষণ রাম ও দেদার বক্সের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইতে পারিয়াছি। সন্ন্যাসীর দেশের লোকের সামান্য বেশ-ভূষার প্রতি তাচ্ছিল্য এখনও আমাদের তিরোহিত হয় নাই, তাই একটু ভদ্র-সমাজোচিত পোষাক-পরিচ্ছদে ও পাশ্চাত্য-রুচি দেখিয়া একটু বিলাতীধরণে "রামমূর্ত্তি" ও "ভীম ভবানী" প্রভৃতি যে দেশের অর্থ দেশে রাখিতে পারিতেছেন ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। বঙ্গের লাঠিয়াল সম্প্রদায়েও একটা বিদ্যা অনাদৃতভাবে মর মর অবস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। পূজা প্রভৃতির উপলক্ষে যদি আমাদের দেশের ধনবান ও জমীদার-সম্প্রদায় তাহাদের ক্রীড়া দর্শন করেন তাহা হইলে এ বিদ্যাও আবার সঞ্জীবিত হইতে পারে। যাদুবিদ্যাও ভারতের এক বিশিষ্ট সামগ্রী। ভানুমতীর ভোজবাজীতে অন্তরীক্ষে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ এখন কিম্বদন্তীতে পরিণত। তরবারি-গলাধঃকরণ অনেক সাহেবও প্রত্যক্ষ করিয়া বিদ্যালয়ের অনেক পাঠ্য পুস্তকেও তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উৎসাহের অভাবে এ সমুদয় মৃতপ্রায়। বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে সেকালের লোকে আতোষ বাজীর অনুষ্ঠান করিতেন। এখন বিলাতী "পাই-রোটেক্‌নিক্স"এর মায়াপ্রভাবে দেশের গরীব-উল্লা আতোষ বাজী ছাড়িয়া হাল ধরিতে বাধ্য হইয়াছে। সকলেই যদি হাল ধরে তাহা হইলে চাষার অবস্থা কতদূর শোচনীয় হইয়া উঠে, তাহা অনায়াসেই অনুমেয়। আমরা বিলাতী ম্যাজিক ও পাইরোটেক্‌নিক্স প্রভৃতিতে যত অর্থব্যয় করি, দেশীয় আমোদে তাহার অর্দ্ধেকেরও প্রয়োজন হয় না; অথচ দেশের কত লুপ্তপ্রায় বিদ্যা পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে, ভগবান্ আমাদের সুমতি ও সূক্ষ্মদৃষ্টি দান করুন।"

* *
*

১৭। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দুর্দ্দিন

ময়মনসিংহের বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে জলের মত টাকা খরচ হইয়াছিল। তখন

হইতে জনসাধারণের মনে একটা প্রশ্ন উঠিল—"সাহিত্য-সম্মিলনের আবশ্যকতা কি?" "সাহিত্য-সম্মিলন কি করিতে চাহিতেছেন?" তাহার পর চুঁচুড়ায় ও চট্টগ্রামে, গৌহাটী ও দিনাজপুরে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গেল। এই সাড়ে তিন বৎসরের ভিতর সাহিত্যের কোন ধুরন্ধরই সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য দেশ-বাসীকে জানাইবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। গতানুগতিকভাবে বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেছেন!

আমরা আমাদের গত বৎসরের সাহিত্য-সম্মিলন-সংখ্যায় (চৈত্র, ১৩১৯) এই প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম—এবং সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এবারওসেই প্রশ্ন তুলিতেছি। সাহিত্যসেবি-গণ ও জন-নায়কগণ, আপনারা জনসাধারণকে, পল্লীবাসীকে, মফঃস্বলবাসীকে, বাঙ্গালার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ও মধ্যপ্রদেশকে বুঝাইতে চেষ্টা করুন—সাহিত্য-সম্মিলনগুলির সার্থকতা কি।

আমরা বুঝিয়াছি—ভবিষ্যতে যাহাই হউক, বর্ত্তমানকালে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষাপ্রচার, লোক-শিক্ষাবিস্তার, জনগণের মতগঠন, সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে অশিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ নরনারীর ঔৎসুক্য ও উৎসাহবর্দ্ধন। বোধ হয় ভাগলপুরের সাহিত্য-সম্মিলনে স্বদেশ-সেবক রামেন্দ্রসুন্দরও আমাদের সমাজের ও সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিয়া এই কথাই বলিয়াছিলেন।

তবে "বিশেষজ্ঞ"-সমিতি, "পণ্ডিত-সভা," "ঐতিহাসিক-সভা," "বৈজ্ঞানিকসভা"—এ সব অনুষ্ঠান কলিকাতার সম্মিলনে এত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইতেছে কেন? মুষ্টিমেয় "বিশেষজ্ঞ" বা ওস্তাদগণের মুখামুখি বসিবার জন্যই কি এবার কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে? এই ওস্তাদ মহাশয়গণ ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ "কোটে" বসিয়াই ত তাঁহাদের মৌলিকতা ও স্বাধীন গবেষণা বাজারে যাচাই করিয়া লইতে পারেন! তাঁহারা পরস্পর অপরিচিত নন।

প্রয়োজন হইলে চিঠিপত্রের সাহায্যে তাঁহাদের সন্দেহস্থলগুলি মীমাংসিত হইয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞান-মহলে প্রফুল্লচন্দ্র, মণীন্দ্রনাথ, পঞ্চানন, দ্বিজদাস কি এইরূপে তাঁহাদের কার্য্য চালাইয়া লইতেছেন না? ইতিহাস-মহলে যদুনাথ, রাধাকুমুদ, অক্ষয়-কুমার, রাখালদাস কি এই উপায়ে তাঁহাদের কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিতেছেন না? দর্শন-মহলে ব্রজেন্দ্রনাথ সর্ব্বদা গুরুরূপে সকলকেই ত উপদেশ দিয়া আসিতেছেন। কোন্ সাহিত্য-সেবীর কাজকর্ম্ম বিশেষজ্ঞ-সম্মিলনের অভাবে বন্ধ থাকিতেছে?

অধিকন্তু, যদি বঙ্গসাহিত্যের নানাবিভাগে বহুসংখ্যক "বিশেষজ্ঞে"র প্রাদুর্ভাব হইয়াই থাকে তবে এখন হইতে স্বতন্ত্র "ঐতিহাসিক-সম্মিলন," স্বতন্ত্র "বৈজ্ঞানিক-সম্মিলন," স্বতন্ত্র "দার্শনিক-সম্মিলন," স্বতন্ত্র "শিক্ষক-সম্মিলন," স্বতন্ত্র "সমালোচক-সম্মিলন," স্বতন্ত্র "চিত্রকর-সম্মিলন" ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিলেই ত চলে। সাধারণ বঙ্গীয়সাহিত্য-সম্মিলনের ঘাড়ে এই সকল "পরগাছা" চাপান হইতেছে কেন? বর্ত্তমান অবস্থায় এইগুলি পরগাছাই বটে—স্বাভাবিক বিকাশের সুফল নয়।

সাহিত্য-সম্মিলনের ধুরন্ধরগণ, আপনাদের নিকট এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা শুনিতে চাই। যদি বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করাই সাধারণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্যরূপে পরি-গণিত হইয়া থাকে, তাহা দেশবাসীকে সহজ কথায় জানাইয়া দিন। নীরব জনসাধারণকে অগ্রাহ্য করিবেন না—মফঃস্বলের বাণী যথোচিত প্রচারিত হইতেছে না বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করিবেন না। সর্ব্বদা যেন মনে থাকে—ইহা "জনসাধারণের যুগ" চলিতেছে। গত তিন বৎসরের ভিতর জন-সাধারণ সাহিত্য-সম্মিলনের মূল্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এজন্যই এই সকল আন্দোলন সুফল দান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জন-

সাধারণের ক্ষমতা লাভ করিয়াই, দেশের মাটির সঙ্গে সংশ্রবে আসিয়াই বঙ্গ সাহিত্য প্রতাপশালী হইয়া উঠিতেছে। এই মূক জনসাধারণকে, এই নীরব মফঃস্বলকে, এই অর্দ্ধশিক্ষিত নরনারীকে, এই অপ্রগল্ভ গণ-শক্তিকে আজ আপনারা ভুলিয়া যাইতে প্রস্তুত!

আমরা যেন বেশ বুঝিয়া রাখি যে,—যে সময়ে আমরা এক ডজন বিশেষজ্ঞ-সঙ্গমে "গভীর গবেষণা"য় ব্যাপৃত থাকিয়া বাঙ্গালী জাতিকে ধন্য করিতে বসিব, সেই সময়েই প্রয়োজন হইলে বাঙ্গালার বিরাট গণ-শক্তি নূতন নূতন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিতে পারে। বঙ্গীয়সাহিত্য-সংসারের সেই অপূর্ব্ব অবস্থা দেখিয়া ওস্তাদ মহাশয়গণ কিছু বিব্রত হইতে পারেন! কিন্তু তাহার ফলে বাঙ্গালাদেশ, বাঙ্গালী সমাজ, এবং বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি স্বকীয় উন্নতি, বিস্তৃতি ও ক্রম-বিকাশের পথ খুঁজিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। জনসাধারণের সেই ক্ষমতা-প্রবাহে তথাকথিত জন-নায়কগণ ও সাহিত্য-ধুরন্ধরগণ তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবেন।

১৮। সাহিত্যে পল্লীজীবন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্তর্গত ছাত্র-শাখার ছাত্র সভ্যগণের সাহিত্য-চেষ্টা পল্লী-মুখী হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহাদের নাম ও লিখিত প্রবন্ধের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

১। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত

প্রবন্ধ— (ক) পল্লীপ্রবাদ (খ) মাছ ঘরে নওয়া।

২। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক

প্রবন্ধ— (ক) লক্ষ্মীর পাঁচালী (খ) গোরক্ষনাথের পাঁচালী।

৩। শ্রীকালীদয়াল ভট্টাচার্য্য

প্রবন্ধ—(ক) চৌপূজা (খ) স্থলবসন্তপুরের ইতিহাস (গ) সিরাজগঞ্জের গ্রাম্য মসজিদ (ঘ) কান্দাপাড়া মসজিদ (ঙ) হরিপুরের ৺মঙ্গলচণ্ডী (চ) পাবনা জেলার ক্রীড়া-কৌতুক।

৪। শ্রীরসিকলাল সেন

প্রবন্ধ—(ক) খুলনার ধাঁধাঁ (খ) পিল্লিকে (গ) জামাই আনার কথা (ঘ) একটি চৌতিশা (ঙ) চটিকথা প্রবন্ধ।

(৫) শ্রীশশিভূষণ পাল

প্রবন্ধ— (ক) সারিগান (খ) বারমাসী গান।

৬। শ্রীশিবেশচন্দ্র পাকড়াশী

প্রবন্ধ – (ক) পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত প্রবচন (খ) গ্রাম্য কবিতা।

৭। শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ— (ক) মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন বেলডাঙ্গার গাম্য ও সাধুভাষা।

৮। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

প্রবন্ধ— (ক) চাঁদরায়।

৯। শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ— (ক) পতঙ্গদের অনুকরণ-ক্ষমতা (খ) হাফ আখড়াই।

১০। শ্রীমোহিনীমোহন রায়

প্রবন্ধ—(ক) বিষ্ণুপুরের প্রাচীন দর্শনীয় বিষয়।

১৯। অস্বাস্থ্য, না দুর্ভিক্ষ ?

আমরা অনেকবার বলিয়াছি অন্নাভাবই স্বাস্থ্যহীনতা আনয়ন করে। অন্নাভাব ঘুচিলে আর ম্যালেরিয়ার জন্য পচা খানা-ডোবায় কেরোসিন ঢালিতে হয় না! দেখিতেছি, ইটালীর ম্যালেরিয়া-কমিশনেও এই প্রকারের কথা সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। "ব্যবসা ও বাণিজ্য" সেই কথার মর্ম্ম আমা-দিগকে শুনাইয়াছেন—

"ইটালীতেও এদেশের ন্যায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক ছিল; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় তাহা বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। প্রতি সন ইটালীর গবর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়ার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। ম্যালেরিয়া-কমিশনের রিপোর্টেই তাহা জানিতে পারা যায়। ইটালীর

ম্যালেরিয়া-কমিশনে এবার একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। কুইনাইন ম্যালেরিয়ার অতি উত্তম প্রতিষেধক ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অত্রত্য সিবিল সার্জ্জনগণ ম্যালেরিয়া প্রতিষেধের জন্য দৈনিক একমাত্রা অন্ততঃ পক্ষে ৬।৭ গ্রেণ কুইনাইন ব্যবহার করার ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন, এমন কি তাহাদের এমন হুকুমও ছিল যে সেই হুকুমের বলে স্থানবিশেষের সরকারী কর্ম্মচারিগণ উক্ত মাত্রায় কুইনাইন প্রতি-নিয়ত সেবন করিতে বাধ্য হইতেন। অধুনা ইটালীর ম্যালেরিয়া-কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ যে ক্রমাগত দীর্ঘকাল ৫।৬ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন সেবন করিলে মূত্রযন্ত্রের অসুস্থতা জন্মিবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। ফলতঃ কুইনাইন যদি অল্পমাত্রায় কাজ না করে, তবে দীর্ঘকাল অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলেও কোনও উপকার হয় না। অপর পক্ষে দেখা গিয়াছে—উহা দ্বারায় রোগীর আরও অনেক প্রকার অসুখজনক উপসর্গ ঘটিয়া থাকে। ইটালিয় কমিশনে উল্লেখিত হইয়াছে, ইটালীর ভিন্ন ভিন্ন ম্যালেরিয়া-প্রধান প্রদেশে ৩০ জন চিকিৎসক ম্যালেরিয়ার গতিবিধির পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তাঁহাদের কেহই প্রতিষেধার্থে কুইনাইন ব্যবহার করেন নাই, যে স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ স্থলে কুইনাইনের সাফল্য লাভ হয় নাই। অপরন্তু ইটালীর ম্যালেরিয়া-কমিশন অতি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে, অন্নক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ ব্যক্তিরাই ম্যালেরিয়ায় অধিকতর আক্রান্ত হইয়া থাকে; সুতরাং লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন না করিলে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। ইটালীর ম্যালেরিয়া-কমিশনের এই সদ্যুক্তি আমাদের নিকট অতি সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে।"

* *
*

২০। 'গৃহস্থ'-সম্মিলন

বিগত ১২ই মাঘ 'গৃহস্থে'র নবগৃহ-প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রবীণ সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, বিশ্ব-কোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং কলিকাতার অন্যান্য বহু গণ্য মান্য কবি ও লেখক মহাশয়গণ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অমৃতবাজার পত্রিকা, সাহিত্য, ভারতবর্ষ, বঙ্গদর্শন, যমুনা, অর্চ্চনা, আর্য্যাবর্ত্ত, বঙ্গবাসী, বসুমতী, হিতবাদী, আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি দৈনিক, মাসিক ও সপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক মহাশয়গণও উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আপ্যায়নের জন্য কথকতা ও কীর্ত্তন সঙ্গীতাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনাথ কথকচূড়ামণি কথকতা করিয়াছিলেন এবং শচীনন্দন বাবাজী ও শ্রীযুক্ত তিনকড়ী চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তন গাহিয়া ছিলেন। ইহাঁদের গুণপনায় সকলেই মুগ্ধ হন।

এইরূপে 'গৃহস্থে'র নবগৃহ সেদিন মহাজন-গণের চরণ-ধূলায় পবিত্র হইয়াছে। তাঁহা-দের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

দুর্গা পূজার শাস্ত্রীয় প্রমাণ

(৩৬৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

"দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিন্তে করোম্যহম্॥"

(৬।১১)

দেবীর এই বাক্য শ্রবণ মাত্র অসুর-সেনাপতি ধূম্রলোচন তাহাকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলে জগন্মাতা হুঙ্কার দ্বারা তাহাকে ভস্মীভূত করিলেন। এখন অসুর-সৈন্য দেবীকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে দেবীর বাহন সিংহ ক্ষণকালের মধ্যে দৈত্যবল সকল বিনষ্ট করিল।

অনন্তর সসৈন্য ধূম্রলোচনের ধ্বংস সংবাদে অসুররাজ ক্রোধান্ধ হইয়া দেবীকে আনয়ন করিতে চণ্ডমুণ্ডকে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা মাত্র সে চতুরঙ্গিণী সমভিব্যাহারে গমন করিয়া দেবীকে ধৃত করিতে উদ্যত হইল। দেবী তাহাতে অতীব ক্রোধান্বিত হইলে তাঁহার ভ্রূকুটি-কুটিল ললাট হইতে অসিখড়্গধারিণী করালবদনী ভয়ঙ্করী কালীদেবী আবির্ভূতা হইলেন।

"বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্ম পরীধানা শুষ্কমাংসাতি ভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥"

(৭।৭—৮)

বিচিত্র খট্বাঙ্গধারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানা, মাংসশুষ্কতা হেতু মহা ভয়ঙ্করী, বিস্তারবদনা, লোলরসনা, কোটর-গত রক্তনয়না, ভীষণদর্শনা, বিকট শব্দ দ্বারা দিগ্‌দিগন্তর পূর্ণকারিণী আবির্ভূতা হইয়া সবেগে অসুর-সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাসুরদিগকে, পার্শ্বরক্ষক, অগ্ররক্ষক যোদ্ধা এবং ঘণ্টাদি বিভূষিত কুঞ্জরগণকে, অশ্ব-সহিত অশ্বারোহীদিগকে, রথ সহিত সারথিগণকে হস্তে ধারণ পূর্ব্বক মুখমধ্যে নিক্ষেপ করতঃ ভক্ষণ করিতে লগিলেন, এবং কাহাকে কাহাকে কেশদ্বারা, কাহাকে কাহাকে বা গ্রীবাদ্বারা, কাহাকে কাহাকে বা পাদদ্বারা, কাহাকে কাহাকেও বা বক্ষদ্বারা আক্রমণ করতঃ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

"পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহি যোধঘণ্টা সমন্বিতান্।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্॥
তথৈব যোধস্তুরগৈঃ রথং সারথিনা সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্ব্বয়ন্ত্যতিভৈরবম্।
একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরম্।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ৎ॥"

(৭।১০—১২)

অন্যান্য অসুর সৈন্যগণ দেবীর প্রতি নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তিনি ও মুখ ব্যাদান করিয়া সেই অস্ত্র সকল গ্রহণপূর্ব্বক রাগ ভরে দন্তদ্বারা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এবং কোন কোন অসুরকে অসির আঘাতে, কতকগুলিকে বা খট্বাঙ্গ প্রহারে নিহত করিলেন। চণ্ড ও মুণ্ড তখন অসুর সৈন্যগণের নিধন দর্শন করিয়া মহা-ভয়ানক সহস্র বাণ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। দেবীও মহা অসি উত্তোলনপূর্ব্বক বিকট শব্দ করিয়া চণ্ডের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং তাহার কেশাকর্ষণ করতঃ অসির প্রহারে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। চণ্ডাসুরের নিধন দর্শনে মুণ্ডাসুর দেবীর

প্রতি ধাবমান হইলে, দেবী রোষভরে অসি প্রহারে তাহাকেও সংহার করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন। এবং চণ্ডমুণ্ডের মুণ্ড দুইটি গ্রহণপূর্ব্বক ঘোর উচ্চরবে হাস্য করিতে করিতে চণ্ডিকা দেবীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়া বলিলেন—"দেবী! স্বয়ং শুম্ভ নিশুম্ভকে নিহত করুন,"

শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্॥
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি॥

(৭'২৩-২৪)

তখন তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। প্রবল প্রতাপ অসুরেশ্বর শুম্ভ রোষভরে সকল সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে উদায়ুধ নামক ষড়শীতি-সংখ্যক, কম্বু অসুর-কুলসম্ভূত চতুরশীতি, কোটিবীর্য্য অসুরকুলোৎপন্ন পঞ্চাশৎ, ধূম্র-বংশাবতংশ একশত, কালক, দৌহৃত মৌর্য্য এবং কালকেয় অসুর-সেনাগণ আপনাপন অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে রণাভিমুখে প্রস্থান করিল। এবং অসুরেশ্বর শুম্ভ স্বয়ং সহস্র সহস্র সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

এদিকে চতুরানন, পঞ্চানন, ষড়ানন, বিষ্ণু এবং ইন্দ্রের শরীর হইতে তাঁহাদিগের শক্তি সকল নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই সেইরূপ ভূষণ ও বাহন বিশিষ্ট হইয়া এবং নিজ নিজ বিশেষ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অসুরগণসহ সংগ্রামার্থে দেবীর সমীপে উপস্থিত হইলেন।

"ব্রহ্মেশ গুহবিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ॥
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথাভূষণ বাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমায়যৌ॥"

(৮।১৩-১৪)

আবার দেবী চণ্ডিকাও স্বীয় শরীর হইতে অতি ভয়ানক বিষম ক্রোধযুক্তা তদীয়া শক্তি বিনির্গত করিলেন। উহার সঙ্গে সঙ্গে শত শত শিবাগণ সমুৎপন্ন হইল, ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিল।

"ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী॥"

(৮।২৩)

তখন দেবী ঈশানকে শুম্ভনিশুম্ভের ও অন্যান্য অসুরের নিকটে দূত স্বরূপে প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে "ইন্দ্র ত্রৈলোক্য-রক্ষাকার্য্যে অদ্য হইতে নিযুক্ত হইলেন, দেবগণ আপনাপন যজ্ঞভাগ হবিঃ গ্রহণ করিবেন। আর তোমরা যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে পাতালতলে প্রবেশ কর। আর যদি বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া যুদ্ধ বাসনা কর, তবে শীঘ্র আইস, তোমাদের মাংসে আমার শিবাগণের তৃপ্তিসাধন হইবে।

ত্রৈলোক্য ইন্দ্রোলভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ।
যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ॥"
বলাবলেপাদথ চেদ্ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ॥"

এতদ্বাক্যে মহাসুর শুম্ভনিশুম্ভ কোপাকুলিত চিত্তে দেবীকে আক্রমণ করিল এবং তাঁহার প্রতি অনবরত শর, শক্তি, ও ঋষ্টি অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল। উভয় পক্ষে তুমুল রণ চলিতে লাগিল। অসুর নিক্ষিপ্ত বাণ, শূল, চক্র ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র দেবী ধনুষ্টঙ্কার পূর্ব্বক আপন উৎকৃষ্ট বাণদ্বারা অবলীলা ক্রমে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং শত্রু-গণের মধ্যে কাহাকে কাহাকে শূল প্রহারে চূর্ণীকৃত, কাহাকে বা খট্টাঙ্গ দ্বারা বিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবীর সহচারিণী ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, বারাহী

নারসিংহী, প্রভৃতি দেবীগণ স্বীয় স্বীয় শক্তি প্রয়োগে অসুর-সৈন্য ধ্বংস করিলেন। এইরূপ অবস্থায় দৈত্য সৈন্যাধ্যক্ষগণ রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন মহাসুর রক্তবীজ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে আগমন করিল। অস্ত্রাঘাতে উহার শরীর হইতে ভূমিতে পতিত প্রতিবিন্দু রক্ত হইতে এক একটি তত্তুল্য বলবীর্য্য ও পরাক্রমবিশিষ্ট মহাসুর সমুৎপন্ন হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

"যাবন্তপতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্ত বিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা জাতা স্তদ্বীর্য্যবলবিক্রমাঃ॥
তে বাপি যুযুধু স্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্রশস্ত্র পাতাতিতিভীষণম্॥"
(৯।৪৪-৪৫)

বিভিন্ন শক্তিগণ বিভিন্ন প্রকারে রক্তবীজকে আঘাত করিয়া কেবল মাত্র অসুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এবং তদ্দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ হইল। ইহা দেখিয়া দেবতাগণ সাতিশয় ভীত হইলেন।

তখন দেবী চণ্ডিকা কালিকা দেবীকে বলিলেন "হে দেবি! তুমি আপন সুবিশাল আসন বিস্তার কর এবং আমার অস্ত্র দ্বারা নিপাতিত রক্তবিন্দু-সম্ভূত মহাসুরকে ভক্ষণ এবং উহার রক্তবিন্দু ভূমিতে পতিত হইবার পূর্ব্বেই অতি সত্বরে তাহা পানকরতঃ রণস্থলে বিচরণ কর।" তৎপরে দেবী শূলদ্বারা রক্তবীজাসুরকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং উহার দেহ হইতে যত শোণিত পতিত হইতে লাগিল কালিকা দেবী তৎসমুদয় পান করিতে লাগিলেন। এবং সেই রক্তকণিকা দেবীর মুখবিবরে পতিত হইবার সময় তাঁহা হইতে যে সকল অসুর উদ্ভব হইয়াছিল দেবী সে সমস্ত অসুরকেও ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় চণ্ডিকাদেবী সেই মহাসুর রক্তবীজকে সংহার করিলেন।

রক্তবীজ ও অন্যান্য অগণ্য মহাসুরগণকে নিহত দেখিয়া ক্রোধাকুলচিত্তে শুম্ভ ও নিশুম্ভ অন্যান্য মহাসুরপরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। দেবীর সহিত উহাদের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। দেবী অসুর-প্রক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল একে একে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে দৈত্যপুঙ্গব নিশুম্ভ কুঠার ধারণ করতঃ দেবীকে প্রহার করিতে আসিলে দেবী বাণাঘাতে তাহাকে ভূতলশায়ী করিলেন। তখন শুম্ভ স্বীয় সুদীর্ঘ অতুলনীয় অষ্টভুজে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করতঃ রথারোহণপূর্ব্বক দেবীকে আক্রমণ করিতে আসিলেন। সে প্রথমে ভীষণ জ্বালাময় অগ্নিময় শক্তিবাণ দেবীর প্রতি সন্ধান করিল। দেবী ও মহোল্কা শক্তিশরে উহা নির্ব্বাণ করিয়া দিলেন। তৎপরে উভয়ে উভয়ের প্রক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র অস্ত্র উচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন দেবী শুম্ভকে শূলপ্রহারে ভূপাতিত করিলেন। সে সময় আবার নিশুম্ভ চেতনালাভ করিয়া অযুতি হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক চণ্ডিকাদেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং তাঁহার প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন দেবী ক্রমে ক্রমে উহার প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলি বিদীর্ণ করিয়া পরিশেষে ত্রিশূলদ্বারা উহার হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন, এবং উহার বিদ্ধ হৃদয় হইতে মহাবলবীর্য্য বান অপর এক পুরুষ বহির্গত হইয়া দেবীকে "তিষ্ঠ" বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিলে দেবী তৎক্ষণাৎ উহার মস্তক ছেদন করিলেন, অতঃপর সিংহ ও দেবীর অনুযায়িনী অপরাপর দেবী শক্তি অসুর সকল নিহত করিতে লাগিলেন। অবশিষ্টগুলি রণস্থল করিতে পলায়ন করিল। তখন শুম্ভ দেবীকে

ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন :—"দুর্গে! বলদর্পে দর্পিতা তুমি আর গর্ব্ব করিও না, কেন না তুমি দেবশক্তিগণের সহায়তায় অভিমানিনী হইয়াছ।" তখন দেবী বলিলেন :—"তুমি যে সমস্ত বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতেছ উহারা আমারই বিভূতি—এই দেখ আমাতেই প্রবেশ করিতেছে।"

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্তো মদ্বিভূতয়ঃ॥

(১০।৫)

অমনি দেবশক্তি মূর্ত্তি সকল তাঁহাতেই লীন হইলেন এবং তিনিই একাকিনীমাত্র বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এখন দেবী একাকীই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। দেবী ও শুম্ভে সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের প্রতি সুশাণিত শরবর্ষণ ও দারুণ অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই উভয়ের অস্ত্রশস্ত্র ছেদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অসুর শতবাণ বর্ষণদ্বারা দেবীকে আচ্ছন্ন করিল। তখন দেবী কুপিতা হইয়া তাহার ধনু ছিন্ন করিলেন। দনুজেশ্বর তখন অস্ত্র হইতে অস্ত্রান্তর গ্রহণপূর্ব্বক দেবীকে আক্রমণ করিল। দেবী ও ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয়ই ছেদন করিলেন। দৈত্যাধিপ অতিবেগে দেবীর প্রতি ধাবিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে মুষ্টিপ্রহার করিল, দেবীও তাহার বক্ষে পদাঘাত করিলেন। তাহাতে সে হতচেতন হইয়া ভূতলে পড়িল। কিন্তু ক্ষণবিলম্বে জ্ঞান পাইয়া উত্থিত হইল এবং দেবীকে গ্রহণপূর্ব্বক গগনমার্গে আরোহণ করিল। তখন দেবী অবলম্বন রহিত হইয়া তাহার সহিত বহুকালব্যাপী বাহুযুদ্ধ করিয়া পরে তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক ঘূর্ণায়মান করতঃ ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। ভূপতিত হইয়া অসুর আবার মুষ্টি উদ্যত করিয়া অতিবেগে চণ্ডিকানিধনার্থ গমন করিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া দেবী শূলদ্বারা তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিলে সে পৃথিবীতলে নিপতিত হইল এবং প্রাণত্যাগ করিল।

তখন দেবগণ নির্ভয়ে আপনাপন নষ্ট আধিপত্য পূর্ব্ববৎ অধিকার করিয়া লইলেন এবং স্ব স্ব প্রাপ্য যজ্ঞীয় হবিঃ ভোগ করিতে লাগিলেন। আর অবশিষ্ট দৈত্য সকল পাতালে পলায়ন করিল।

"তেঽপি দেবানিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা।
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্ব্বে চক্রুর্বিনিহিতারয়ঃ॥
দৈত্যাশ্চ ... ...
... ... শেষাঃ পাতালমাযযুঃ॥"

(১২।৩৩,৩৫)

তৎপরে সুরথ নামে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর যবন-রাজগণ কর্ত্তৃক রাজ্য-সম্পত্তি-পরিভ্রষ্ট হইয়া মৃগয়াচ্ছলে একাকী অশ্বারোহণে গহন বনে গমন করেন।

"ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্॥"

(১।৯)

এবং পরে হিংসাবর্জ্জিত বনপশু ও শিষ্য-পরিশোভিত বিপ্রশ্রেষ্ঠ মেধস্ মুনির আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার মনে সুখ-শান্তি কিছুই ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই পুত্র-কলত্র, বন্ধুবান্ধবদিগের বিষয় ভাবিতেন। এবং ভ্রষ্টরাজ্য-উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতন। পরিশেষে তিনি মেধস্ মুনির নিকট স্বীয় অবস্থা নিবেদন করিলে মুনিবর তাঁহাকে এই মহাশক্তি মহামায়ার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া শুনাইলেন। এবং পরিশেষে

উপদেশ দিলেন যে "তুমি সেই পরমেশ্বরীরই শরণাগত হও, তিনি আরাধিতা হইয়া প্রসন্না হইলে মনুষ্যগণ ভোগ, ঐশ্বর্য্য, স্বর্গ, অপবর্গ লাভ করিতে পারে।"

"তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥"

(১৩।৫)

এই উপদেশানুসারে সুরথ রাজা দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

"ইতি তস্য বচঃশ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ

* * *

নির্ব্বিণ্নোঽতিমমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ
জগাম সদ্যস্তপসে * * (১৩।৭)

তিনি নদী-পুলিনে অবস্থান করতঃ তথায় দেবীর মৃন্ময়মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক পুষ্প, ধূপ ও হোমাদি এবং স্বীয় গাত্র-রক্তদ্বারা তাঁহার পূজা এবং দেবী সূক্ত জপদ্বারা সেই দেবীর প্রতিই মনোনিবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এইরূপে তপস্যায় কাটিয়া গেল। অবশেষে তিন বৎসরের পর দেবী পরিতুষ্ট হইলেন। তখন তিনি রাজাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া তাঁহার কাঙ্ক্ষিত বর প্রদান করিলেন।

"* * * নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্।
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি॥"

(১৩।১৯)

[এইখানে মার্কণ্ডেয় উক্ত দেবী মাহাত্ম্য শেষ। কিন্তু দেবী-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখিতে গেলে শ্রীরামচন্দ্রের দেবীপূজার বিবরণ না লিখিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকে। সেইজন্য সেই বিষয়ও এখানে দেওয়া হইল]

আবার যখন লঙ্কায় মহাপরাক্রমশালী অসুররাজ দশানন রাবণের বিরুদ্ধে মহাসংরে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অনুজ লক্ষণকে শক্তিশেলে ভূপতিত দেখিয়া শোকে মুহ্যমান রামচন্দ্র সীতার উদ্ধারের আশা নষ্টপ্রায় দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া

"ধূলায় লোটায় ছিন্ন নীলোৎপল প্রায়"

তখন সুরাধিপতি

"ইন্দ্ররাজ বিধাতারে সবিনয়ে কয়।
শ্রীরামের দুঃখ আর প্রাণে নাহি সয়॥
ইন্দ্রের শুনিয়া বাণী, কন কমণ্ডলুপাণি,
উপায় কেবলি দেবী-পূজা।
তুমি পূজি সে চরণ, জিনিলে অসুরগণ
বোধিয়া শরতে দশভুজা॥
পূজা রাম কৈলে তাঁর, হবে রাবণ সংহার,
শুন সার সহস্রলোচন"

তখন দেবরাজ ব্রহ্মার উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকেই রাবণ-বধের বিহিত উপায় বলিবার জন্য রামচন্দ্রের নিকট পাঠাইলেন। ব্রহ্মা যাইয়া বলিলেন—

"বিধাতা কহেন প্রভু, এক কর্ম্ম কর বিভু,
তবে হবে রাবণ সংহার।
অকালে বোধন করি, পূজ দেবী মহেশ্বরী
তাঁরে যে হে দুঃখ পাথার॥"

তখন অকাল। শরৎকাল আগত। রামচন্দ্র বিধাতার পরামর্শে অকালে দেবীর বোধন পূর্ব্বক ষষ্ঠ্যাদি কল্পে দেবীর পূজা আরম্ভ করিলেন। দেবীর তিন দিন পূজা। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূজা বিধিমত করিলেন।

"বিধি মতে পূজা সাঙ্গ করিলা শ্রীহরি।
কিন্তু হৈল সন্দেহ না দেখি মহেশ্বরী॥
বিভীষণে কন রাম কি হইবে আর।
আমা প্রতি দয়া বুঝি না হ'ল দুর্গার॥"

মহেশ্বরী সাক্ষাৎ দিলেন না দেখিয়া রামচন্দ্র ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন

বিভীষণের পরামর্শে অষ্টোত্তরশত নীলোৎপলে পূজা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। বীর হনুমান কর্ত্তৃক তৎসংখ্যক পদ্ম আনীত হইলে রামচন্দ্র ক্রমে উহা একে একে দেবীর চরণে দিতে লাগিলেন। এদিকে

"করিলেন ছল, বুঝিতে সকল
দেবী হর-মনোহরা।
হরিলেন আর, এক পদ্ম তাঁর
মহেশ্বরী পরাৎপরা।"

শেষে এক পদ্ম কম পড়িল। রামচন্দ্র তখন বিস্মিত ও ব্রত-ভঙ্গভয়ে ভীত হইলেন। নীলপদ্ম "দেবীদহ" ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না এবং তথায়ও আর পদ্ম নাই—এ কথা হনুমানের নিকট শুনিলেন। তখন

"আঁখি ছল ছল, বহে অশ্রু জল
কান্দেন ত্রিলোক ধাম॥"

এবং পুনর্ব্বার কালিকার স্তুতি করিলেন

'হের মা পার্ব্বতী. আমি দীন অতি
আপদে পড়েছি বড়।

* *

মম প্রতি দয়া, কর গো অভয়া
ভবার্ণবে কর পার॥"

* *

"ত্রিভুবনে দুঃখ তাপে স্থাপিছ আমায়।
আর দুঃখ দিও না মা নিবারি তোমায়॥"

* *

"এইরূপে রামচন্দ্র করেন বিনয়।
তথাপি তারার তাহে সাক্ষাৎ না হয়॥
তখন রামচন্দ্র মনে মনে স্থির করিলেন
"কমলালোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে॥
এক চক্ষু দিব আমি সঙ্কল্প পূরণে॥
এত বলি তুণ হইতে লইলেন বাণ।
উপাড়িয়া যান চক্ষু করিতে প্রদান॥"
চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিলা, সাক্ষাতে।
হেন কালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে॥

তখন দেবী তুষ্টা হইয়া সাক্ষাৎ দিলেন। এবং রাবণবধের আদেশ দিলেন।

"অকাল বোধন পূজা. কৈলে তুমি দশভুজা
বিধিমত বরিলা বিন্যাস।
লোকে জানাবার জন্য, আমারে করিতে ধন্য,
অবনীতে করিলে প্রকাশ॥
রাবণে ছাড়িনু আমি, বিনাশ করহ তুমি
এত বলি হইল অন্তর্দ্ধান।"

তখন রামচন্দ্র নবমী পূজা সমাধা করিলেন। এবং

"দশমীতে পূজা করি, বিসর্জ্জিয়া মহেশ্বরী
সংগ্রামে চলিল রঘুপতি।
আদেশ পাইয়া রাম, সিদ্ধ হইল মনস্কাম
চণ্ডীলীলা মধুর ভারতী।"

(রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ৭৪৫-৪৫২)

এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-সংহার জন্য অকালে বোধন করিয়া দশভুজার পূজা করিয়াছিলেন। এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সংস্কার এই যে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র দুর্গাদেবীর আরাধনা করিয়া রাবণ-বধে কৃতকার্য্য হন। কৃত্তিবাসে উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতেও বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়েও জনসাধারণের ঐরূপ সংস্কার ছিল। কিন্তু যাহা অবলম্বন করিয়া রামের চরিত্র নির্ণীত হয় এবং যাহা রামের জীবদ্দশায় রচিত, সেই বাল্মীকির রামায়ণে এই দুর্গোৎসবের কোনও উল্লেখ পাওয়া যাওয়া যায় না। রাবণ-বধের পূর্ব্বে বাল্মীকির রামচন্দ্র ব্রহ্মের স্তব বা ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালিকা-পুরাণে রাবণ-বধের পূর্ব্বে রামের দুর্গামূর্ত্তির পূজার উল্লেখ আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন

যে যাহা রামায়ণ-রচনার অনেক পশ্চাতে পৌরাণিক কবির কল্পনা করিয়া যান, হিন্দুদের মধ্যে তাহাই দুর্গোৎসব বলিয়া প্রসিদ্ধ। কালিকাপুরাণ রামায়ণের বহু পরে রচিত এই কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে দুর্গোৎসব পৌরাণিক কবির কল্পনা তাহা বলা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুর নিকট দুর্গাপূজা ব্রহ্মোপাসনা হইতে স্বতন্ত্র নহে। আদিত্য-হৃদয় ব্রহ্ম স্তোত্র—যাহা বাল্মীকির রাম রাবণ বধের পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়াছিলেন—ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিলেও উহা দুর্গাদেবীর প্রতিও প্রযুজ্য। কারণ তিনি আমাদের নিকট

"নারায়ণী বিষ্ণুমায়া পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপিণী"

আর যদি বাস্তবিক পক্ষে উহা কবিকল্পনাই হয় তাহা হইলেও আক্ষেপের কোন কারণ নাই। যে কবি এইরূপ জাতীয় উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি ধন্য। তাঁহার কল্পনা দেবদুর্লভ। দুর্গোৎসব আমাদের এখন জাতীয় উৎসব। সুতরাং উহার যেরূপেই উৎপত্তি হউক না কেন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। এ বিষয়ে এক্ষণে তর্ক তোলাই বৃথা মনে হয়। দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে প্রকাণ্ড হিন্দু সম্প্রদায় আছে তাহাদের মধ্যে এই দুর্গোৎসব প্রচলিত নাই। তবে "নব রাত্রি" নামে এই সময়ে একটা জাতীয় উৎসব হইয়া থাকে। স্থলবিশেষে উক্ত উৎসব "রামলীলা" লইয়াই হয়। কিন্তু সে সকল স্থানেই উহা দেবী পূজার অঙ্গস্বরূপ। যে যে স্থানে প্রাচীন কাল হইতে দেবীর স্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই স্থানের লোকেরা আর স্বতন্ত্র মূর্ত্তি গড়িয়া নিজ নিজ গৃহে পূজা করার আবশ্যকতা মনে করেন না। সকলে সেই দেবী স্থানেই গিয়া দেবীর পূজা করিয়া থাকে। পশ্চিমোত্তর দেশাদির হিন্দু-অধিবাসিগণ এরূপ প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত স্থান বিশেষে বা মন্দিরবিশেষে গিয়া মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন, তবে বঙ্গবাসিগণ স্বীয় গৃহে প্রতিমা গঠন পূর্ব্বক মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন—উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ।

শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায় বি, এল্।

পরগণাতি সন

পরগণাতিসনের উৎপত্তি রহস্যে পরিপূর্ণ। ১৩১৮ সনের প্রতিভা পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় আমার সেনরাজবংশ নামক প্রবন্ধে পরগণাতি সন লইয়া কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় এবার পরগণাতি সন সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য মিলিয়াছে। সাধারণ্যে তাহা জানাইবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বিগত শারদীয়া পূজার অবকাশে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর ঢাকার ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন রায় মহাশয় তাঁহার ঢাকার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে বিক্রমপুর অঞ্চলে যাইয়া এই প্রবন্ধের অকৃতী লেখকের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়া আসিয়াছেন। যতীন বাবুকে আমাদের গ্রামের আশে-পাশের দ্রষ্টব্য ঐতিহাসিক জিনিসগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইবার সময় মনে পড়িল যে এক বাড়ীতে অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি আছে। পুঁথিগুলির অস্তিত্ব আমি পূর্ব্ব

হইতেই অবগত ছিলাম, কিন্তু দুই তিনবার দেখিতে চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়া, এবং পুঁথিগুলির মূল্য বিশেষ কিছু হইবে না অনুমান করিয়া আমি পুঁথিগুলি দেখিতে আর বিশেষ চেষ্টা করি নাই। পুঁথিগুলির কথা যতীন বাবুকে বলায় তিনি তাহা দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। যতীন বাবুর ভাগ্য ভাল, পুঁথিগুলির অধিকারী মহাশয়কে সেগুলি দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলে বেশী ওজর আপত্তি না করিয়া সহজেই তিনি সে পুঁথিগুলি দেখাইতে স্বীকৃত হইলেন। আমরা দুইজনে বেলা নয়টা হইতে প্রায় ২টা পর্য্যন্ত সেই পুঁথির স্তূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, তাহার প্রায় সমস্তই বৈষ্ণব গ্রন্থ। দুইখানা ক্ষুদ্র পুঁথি কেবল বাছিয়া আমরা লইয়া আসিলাম—তাহাদের একখানার নাম স্বপ্নাধ্যায়, আর একখানা হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান দর্শন ও যোগতত্ত্বের অপূর্ব্ব মিশ্রণজাত এক অদ্ভূত গ্রন্থ। গ্রন্থখানার আরম্ভ ঠিক শূন্য পুরাণের মত—ভাষাও পদ্য ও গদ্যের এক খিচুড়ী—যথা

যখন না ছিল আসমান না ছিল জমিন
তখনে ছিল এক ফুল।

এই পুস্তকের বিস্তৃত বিবরণ শীঘ্রই সাধারণ্যে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা আছে।

দ্বিতীয় যে ক্ষুদ্র পুঁথিখানা আজ আমাদের আলোচনার বিষয়, তাহা নিতান্তই ক্ষুদ্র—মাত্র তিনটি পাতা—তাহারও প্রথম পাতাখানা কিছুতেই খুঁজিয়া পাইলাম না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাতাখানা আছে, তাহা অবিকল নকল করিয়া দিলাম, আশা করি পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না। পুস্তকের নাম স্বপ্নাধ্যায়, স্বপ্নের ফলাফল পুস্তকে বর্ণিত আছে, আমাদের প্রপিতামহগণ স্বপ্ন দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে কি রকম ফলাফলের আশা ও আশঙ্কা করিতেন ইহা হইতে তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইবে। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মন খারাপ হইয়া যাওয়া এবং সুস্বপ্ন দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠা আজকালও বিরল নহে, কাজেই আধুনিক রুচির পাঠক ও ইহাতে উপভোগের জিনিস পাইবেন, এমন আশা করা যায়। অসহ্য বর্ণাশুদ্ধিগুলি সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল।

(প্রথমপাতা লুপ্ত)

(২য় পাতা) * * * *

(১ম পৃষ্ঠা) পীড়া হয় তার॥
কাঞ্চন পাইলে হয় বংশলাভ হয়।
লোহা পাইলে দুঃখ পায় জানিয় নিশ্চয়॥
নদী দেখিলে স্বপ্নে দুঃখ তরাস।
পীড়িত দেখিলে পীড়া হয়ত বিশেষ॥
অগ্নি নিবাইলে স্বপ্নে দুঃখ যায় দূর।
নিবাইতে না পারে অগ্নি দুঃখ প্রচুর॥
স্ত্রী গর্ভবতী পাইলে বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়।
পদ্ম পত্রে অন্ন খাইলে রাজসম্পদ হয়॥
এহি মতি রাজসম্পদ পায় শুন মহাশয়।
সামান্যে খাইলে তার আশা পূর্ণ হয়॥
অন্ন খাইলে আয়ু বাড়ে ঘৃত খাইলে কান্তি।
কণ্টকি খাইলে জ্ঞান ধন হয় অত্যান্তি॥
উদরে জন্ময় রোগ হস্তীর মাংস খাইলে।
শরীরেতে দুঃখ পায় হাঙ্গরে কামড়াইলে॥
স্বপ্নে জোকে কামড়াইলে পায় দিব্য নারী।
সর্পে ক্ষত করিলে পুত্র হয় শুন অধিকারী॥
স্বপ্নে বিবস্ত্র হইলে অলঙ্কার পায়।
রোগী দেখিলে তবে দুঃখ জন্মে গায়॥
আপনে কান্দয়ে আর জোকারের ধ্বনি।
মারণ খাইয়া যদি হয় অভিমানী॥

উপার্জ্জনই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা করেন। আজকাল দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে "জীবিকা-উপার্জ্জনই" যে শিক্ষার সকল উদ্দেশ্য আত্মসাৎ করিয়া স্বপ্রধান হইবে ইহা স্বাভাবিক। পিতামাতা ও অভিভাবকগণ বাধ্য হইয়া সেই উদ্দেশ্য-সাধনেই চালিত হইয়া থাকেন। ইহার ফলে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, আধুনিক শিক্ষায় মানুষকে প্রকৃত মানুষ করুক বা না করুক, তাহাকে "অর্থকরী বিদ্যা" দান করিয়া থাকে। সুতরাং "শিক্ষা" বলিলে এখন আমরা "অর্থকরী বিদ্যা" ব্যতীত আর কিছুই বুঝি না কিম্বা বুঝিতে চেষ্টাও করি না। তাই বলিয়া "জীবিকা উপার্জ্জন" শিক্ষার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত এরূপ বলিতেছি না—কারণ ইহা জীবনের একটী প্রধান কাজ, এতদ্ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব। তবে উহাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে আমরা দিন দিন যে মনুষ্যত্ব-বিহীন হইয়া অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইব তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই "জীবিকা-উপার্জ্জনকেই" চরম উদ্দেশ্য না ধরিয়া শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্যের অংশবিশেষ মনে করাই যুক্তিযুক্ত। প্রকৃতভাবে শিক্ষিত হইলে কখনও কাহারও উপার্জ্জনের অভাব হয় না, কিন্তু দেশের বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রভাবে আমরা এতই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি যে, প্রকৃত শিক্ষার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আমরা কেবল বাহ্যিক আবরণেই (বি, এ ; এম, এ প্রভৃতি) ডুবিয়া আছি। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, যদি শিক্ষাকে আমরা প্রকৃতপথে চালিত করিতে পারি তবে আমাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব তো দূর হইবেই, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিত্য শান্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। শিক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষসাধনই তাহার একমাত্র উপায়।

এখন দেখিতে হইবে এই সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন কাহাকে বলে? আমরা জানি যে মানুষের অন্তরিন্দ্রিয় জ্ঞান, অনুভূতি ও কর্ম্মের সমষ্টিমাত্র।* জ্ঞানলাভের ইচ্ছা মানুষের যেমন স্বাভাবিক, তেমনি তাহা হইতে আনন্দ বা দুঃখ-অনুভূতি এবং সেই জ্ঞানের প্রকাশ-স্বরূপ কর্ম্মের নিয়োগও মানুষের স্বাভাবিক। এই তিনের সমষ্টি লইয়াই মানুষ এবং তাহাদের সমবায় অনুশীলন হইলেই সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধিত হইল। শুধু জ্ঞানের পরিপুষ্টি হইলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; কারণ শুধু জ্ঞানী হইলেই জীবনে সুখী হইতে পারা যায় না অথবা তাহার দ্বারা জগতেরও বিশেষ কোন উপকার হয় না। তেমনি জ্ঞানবিহীন কর্ম্মজীবনও অনুপযুক্ত এবং অনুভূতিবিহীন জ্ঞান বা কর্ম্মজীবন ভারবহ বই আর কিছুই না। ভক্তিপ্রবণ কর্ম্মময় জীবনই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়—তেমনি চিত্তাকর্ষণকারী (interesting) বিষয়ের ব্যবহার হইতেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। সুতরাং জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বিষয়টী চিত্তাকর্ষণ-কারী হওয়া চাই এবং সেই লব্ধ জ্ঞান যাহাতে কার্য্যে পরিণত করা যায় তদ্বিষয়ে চেষ্টা চাই; নতুবা সেই জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয় না এবং তাহা প্রকৃত জ্ঞান বা শিক্ষা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলেন "It (Education) is the preparation for complete living." অর্থাৎ শিক্ষা মানুষের শারীরিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি

* Mind is the sum-total of "knowing, willing and feeling."

সর্ব্ববিধ উন্নতির উপায়স্বরূপ। প্রফেসর জেম্‌স্ (Professor James) তাঁহার "Talks to teachers" নামক গ্রন্থে বলেন "Education is the organisation of acquired habits of conduct and tendencies to behaviour." অর্থাৎ শিক্ষা আমাদিগের লব্ধস্বভাব ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির শৃঙ্খলা আনয়ন করে; অর্থাৎ ইহাই আমাদিগের "চরিত্রগঠনের" একমাত্র উপায়। এখন দেখা যাউক এই "চরিত্র" কাহাকে বলে? বাহ্যিক আচার, ব্যবহার, হাব, ভাব হইতেই আমরা "চরিত্র" সম্বন্ধে ধারণা করিয়া থাকি; কারণ অনুভূতির বিকাশই চরিত্রের প্রকাশ—"character is nothing but the outward manifestation of the inward feeling. For, there is no reception without re-action; no impression without correlative expression." (Professer James). প্রাণে যখন আকাঙ্ক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয় তখন কোন না কোন উপায়ে তাহার অভিব্যক্তি হইবেই হইবে। কাজেই অনুভূতির (feeling) উৎকর্ষসাধনই চরিত্র-গঠনে প্রধান উপায়-স্থল। অনুভূতির বিকাশ হইলেই তাহাতে কর্ম্মের অধিকার আসিল। আবার অনুভূতির উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা প্রমাণ করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন। যেমন,—আমি মদ খাইতে আনন্দ পাই, ইহা একটা অনুভূতি। কিন্তু ইহার ঔচিত্যবিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে জ্ঞানের আবশ্যক। সুতরাং দেখা যাইতেছে চরিত্র-গঠনে জ্ঞান, অনুভূতি ও কর্ম্ম এই তিন বৃত্তিরই উৎকর্ষ প্রয়োজন। ফলতঃ চরিত্র-গঠন ও মনের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ-সাধন উভয়ই শিক্ষার একই উদ্দেশ্যে পরিণত হইল।

সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষসাধনই যখন শিক্ষার উদ্দেশ্য, তখন দেখিতে হইবে যে কিসে এবং কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা যায় এবং শিক্ষণীয় বিষয় নির্ব্বাচন, শিক্ষার স্থান এবং শিক্ষকের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়েও আমাদিগের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। বারান্তরে এই সব বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ।

গোমূত্র

মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও উদ্ভিদ্‌গণের শরীর-রক্ষার্থ গোমূত্রের উপযোগিতা বড় অল্প নহে। মনুষ্যের প্লীহা, পাণ্ডু, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে, পশু-পক্ষীর চর্ম্মরোগে, উদ্ভিদগণের নানারূপ কৃমি-নাশার্থ গোমূত্রের ব্যবহার সচরাচর হইয়া থাকে। সকল দ্রব্যেরই একটা এমন ধর্ম্ম আছে যাহা শরীরের পক্ষে উপযোগী নহে। ইহা কখনও মাত্রার কম বেশীতে হয় এবং কখনও অজ্ঞানতা বশতঃ অপপ্রয়োগের ফলেও ঘটিয়া থাকে। এইরূপ গোমূত্রে বহুগুণ নিহিত থাকিলেও ইহা নির্দ্দোষ নহে। এজন্য চরক বলিয়াছেন,—

বিজ্ঞাতঞ্চাপি দুর্যুক্তং মনর্থায়োপপদ্যতে॥

সূত্র ১অঃ

ঔষধের নাম, রূপ ও গুণ জানা থাকিলেও যদি উহা সম্যক্ প্রযুক্ত না হয় তাহা হইলে

তাহা হইতে অনর্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তিনি আরও বলেন,

মাত্রা কালাশ্রয়া যুক্তিঃ সিদ্ধির্যুক্তৌ প্রতিষ্ঠিতা।
তিষ্ঠত্যুপরি যুক্তিজ্ঞা দ্রব্যজ্ঞানবতাং সদা ॥

ভেষজ যুক্তি অর্থাৎ প্রয়োগ কেবল দ্রব্য-গুণ জানা থাকিলেই করা যায় না, মাত্রা ও কাল অনুসারে করিতে হয়। এই যুক্তির ফলেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। এজন্য যুক্তিজ্ঞ চিকিৎসক দ্রব্যজ্ঞানী অপেক্ষা সম্মান-ভাজন।

মূত্রের গুণ ও ক্রিয়া ভগবান্‌পুনর্ব্বসু সাধারণ ভাবে বলিতেছেন,

উষ্ণং তীক্ষ্মমথ রুক্ষং কটুকং লবণান্বিতং।
মূত্রমুৎসাদনে যুক্তং যুক্তমালেপনেষু চ ॥
যুক্তমাস্থাপনে মূত্রং যুক্তঞ্চাপি বিরেচনে।
স্বেদেষপি চ তদ্‌যুক্তমানাহেষগদষু চ ॥
উদরেষথ চার্শঃসু গুল্মকুষ্ঠকিলাশিষু।
তদ্‌যুক্তমুপনাহেষু পরিষেকে তথৈব চ ॥
দীপনীয়ং বিষঘ্নঞ্চ ক্রিমিঘ্নঞ্চোনদিশ্যতে।
পাণ্ডুরোগোপসৃষ্টানামুত্তমং শর্ম্ম চোচ্যতে ॥
শ্লেষ্মাণং শময়েৎ পীতং মারুতঞ্চানুলোময়েৎ।
কর্ষেৎ পিত্তমধোভাগ মিত্যস্মিন্ গুণসংগ্রহঃ ॥

মূত্র কটু ও ঈষৎ লবণ রস; (১) উষ্ণ-বীর্য্য (২) এবং তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট। ইহা তীক্ষ্ণ ও উষ্ণগুণ হইলেও রুক্ষ নহে, বরং স্নিগ্ধ। মূত্র অগ্নির দীপ্তিকর এবং বিষ ও ক্রিমিনাশক। মূত্র, শ্লেষ্মপ্রশমক, বায়ুর অনুলোমতা-সম্পাদক এবং পিত্তকে অধো-মার্গে আকর্ষণ করিয়া বিরোচন করাইয়া থাকে। ইহা পাণ্ডুরোগীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মূত্র আনাহ উদর, অর্শঃ, গুল্ম, কুষ্ঠ ও কিলাশ রোগে, অন্তঃ-পরিমার্জ্জন ও বহিঃ পরি-মার্জ্জনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মূত্র, উৎসাদন (উদ্বর্ত্তন), প্রলেপ, আস্থাপন (নিরূহবস্তি), উপনাহ (স্থূলকম্বদ্বারা সেদ—Pultice), পরিষেক (গায়ে সেচন), বিরোচন, স্বেদ ও পানার্থ ব্যবহৃত হয়। আগদ অর্থাৎ বিষঘ্ন ঔষধে মূত্র একটী বিশেষ উপাদান।

গোমূত্রের সাধারণ নাম "চনা" বা "চোনা"। ঔষধার্থ গোমূত্র-গ্রহণ করিতে হইলে, যে সকল জন্তু বিচরণ করিয়া ঘাস খায় তাহাদের মূত্রই গ্রহণ করা উচিত। যে সকল জন্তু সর্ব্বদা বাঁধা থাকে, তাহাদের শারীর শ্রমের অভাবে, শারীর ধাতু ও মলের সম্যক্ পরিণতি হয় না। এজন্য ইহাদের মাংস ও দুগ্ধ যেমন গুরুপাক হয়, সেইরূপ মূত্র লঘু হইতে পারে না। এবং সময়ে সময়ে অজীর্ণতা হেতু, মূত্রের সহিত নানা অবান্তর পদার্থ নির্গত হয়।

রুগ্না, গর্ভিণী, বৃদ্ধা গাভীর মূত্রও গ্রহণ করিবে না।

প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন—স্ত্রীলোক পিত্তপ্রধান এবং মূত্রেও পিত্তগুণাধিক্য থাকা উচিত। এজন্য গাভীর মূত্রই প্রশস্ত। (১)

যে সকল বৎসতরীর ২ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মূত্রই গ্রহণ করিবে। প্রসূতার মূত্র গ্রহণ করিতে হইলে প্রসবের অন্ততঃ ২ মাস পরে গ্রহণ করিবে।

মহর্ষি হারীত বলেন, প্রসূতার মূত্র তরল এবং অপ্রসূতার মূত্র ঘন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ গুণে কোনও পার্থক্য নাই।

বৎসের মূত্র ঘন। বৃষণহীনের মূত্র ঈষৎ লঘু।

(১) স্ত্রীণাং মূত্রং গবাং তীক্ষ্ণং ন তু পুংসাং বিধীয়তে।
পিত্তাত্মিকাঃ স্ত্রিয়ো যস্মাৎ সৌম্যাশ্চ পুরুষা মতাঃ ॥ পরিভাষা।

বৃষের মূত্র শোথ ও ক্রিমিঘ্ন। অগ্নিদীপক এবং কামলা গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগনাশক। পানার্থ গবীমূত্র প্রশস্ত। (১)

গোমূত্রের গুণ ও ক্রিয়া

চরক—

গব্যং সমধুরং কিঞ্চিৎ দোষঘ্নং ক্রিমিকুষ্ঠনুৎ।
কণ্ডূঘ্নং শময়েৎ পীতং সম্যগ্‌দোষোদরে হিতং॥
(সূত্র ১ম)

সুশ্রুত—

গোমূত্রং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং সক্ষারত্বান্নবাতলং।
লঘ্বগ্নিদীপনং মেধ্যং পিত্তলং কফবাতজিৎ॥
শূলগুল্মোদরানাহবিরেকাস্থাপনাদিষু।
মূত্রপ্রয়োগসাধ্যেষু গব্যং মূত্রং প্রয়োজয়েৎ॥
(সূত্র ৪৫ অঃ)

ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু—

গোমূত্রং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং সক্ষারং লেখনং সরং।
লঘ্বগ্নিদীপনং মেধ্যং পিত্তলং কফবাতজিৎ॥
মূত্রপ্রয়োগসাধ্যেষু গব্যং মূত্রং প্রয়োজয়েৎ॥ (২)
(৬ষ্ঠ বর্গ)

রাজনিঘণ্টু—

গোমূত্রং কটুতিক্তোষ্ণং কফবাতহরং লঘু।
পিত্তকৃদ্দীপনং মেধ্যং ত্বগ্‌দোষঘ্নং মতিপ্রদং॥
(১৫শ বর্গ)

হারীত—

মূত্রলং (১ম ৬ম অঃ)

গোমূত্র ঈষৎ মধুর ও কটু রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ। ইহা ত্রিদোষপ্রশমক অর্থাৎ মধুরতার জন্য—পিত্তপ্রশমক; কটুরস সুতরাং শ্লেষ্মপ্রশমক এবং উষ্ণবীর্য্য সুতরাং শীতগুণ বায়ুর প্রশমক। কটুরস দ্রব্য বায়ুবর্দ্ধক হইয়া থাকে, কিন্তু গোমূত্র ক্ষারবহুলতার জন্য বাতবর্দ্ধক হইতে পারে না। গোমূত্র অগ্নিদীপক ও ঈষৎ বিরেচক। হারীতের মতে ইহা মূত্রকর। গোমূত্র, নাসারোগে পানার্থ প্রয়োগ করা যায়। যথা—

উদররোগে—জলোদর—মল কাদার মত শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ। সর্ব্বাঙ্গগত শোথ। সঙ্গে অল্প অল্প জ্বর। দিনে দুই বার জল নিষ্কাষিত করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। পথ্য দুধ ও ভাত।

প্লীহা— (ক) প্লীহা বড় ও কঠিন। শরীরের বর্ণ সাদা ফ্যাকেশে। মল কঠিন। সঙ্গে অল্প অল্প জ্বর। দিনে ২ বার প্রয়োগ। পথ্য দুধ ও ভাত। (খ) দিনে দুই বার প্লীহার উপর স্বেদ।

(১) সৌর ভেয়কমূত্রস্থ ঘনং সান্দ্রং প্রশস্যতে।
তচ্চ বৃষণহীনানাং কিঞ্চিল্লঘুতরং মতং॥
বৃষমূত্রঞ্চ শোথঘ্নং ক্রিমিদোষবিনাশনং।
কামলাগ্রহণীপাণ্ডুনাশং চাগ্নিদীপনং॥
অজাগবী ভবং মূত্রং পানে শস্তং ভিষগ্বদেৎ॥
হারীত প্রথমাংশ নবমাধ্যায়।

(২) এস্থলে ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুর মত সুশ্রুতের অনুরূপ। না তুলিলেও হইত। পাঠক মহাশয়দিগকে একটী বিষয় দেখাইবার জন্য তুলিলাম। সুশ্রুতের দ্বিতীয় চরণের পাঠ “সক্ষারত্বান্নবাতলং।” গোমূত্র, কটু ও তীক্ষ্ণ। এরূপ দ্রব্য সচরাচর বাতবর্দ্ধক হয়। এজন্য সুশ্রুত উহা কেন বাতবর্দ্ধক নহে তাহার হেতু দেখাইয়াছেন। যে কারণেই হউক ধন্বন্তরি নিঘণ্টুতে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া “সক্ষারং লেখনং সরং” হইয়াছে। পাঠক দেখিবেন—সুশ্রুতের “শূলগুল্ম ইত্যাদি” চরণ দুইটী ধন্বন্তরি নিঘণ্টুতে নাই। ফলে ধন্বন্তরির মতে “মূত্রপ্রয়োগ” ব্যবস্থা হইলে সর্ব্বত্র গোমূত্র গ্রহণ করা উচিত বুঝা যাইতেছে। বস্তুতঃ সুশ্রুতের মত তাহা নহে। সুতরাং ধন্বন্তরি নিঘণ্টুর পাঠ পরিত্যাজ্য।

ক্রিমি—(ক) ক্ষুদ্র ও বড় ক্রিমি। মল অত্যন্ত কঠিন হইলে কমলা গুড়ি প্রক্ষেপ। দিনে এক বার সেব্য। মলের কঠিনতা না থাকিলে বিড়ঙ্গ তণ্ডুল চূর্ণ প্রক্ষেপ। দিনে দুই বার সেব্য। (খ) মস্তকের উকুন (ক্রিমি-বিশেষ) এবং গায়ে যে এক প্রকার উকুন দেখা যায় তাহা প্রশমনের জন্য গোমূত্র দ্বারা মাথা ও গা ধুইয়া দিবে।

জীর্ণজ্বর—বৈকালে অল্প অল্প জ্বর। যকৃৎ, ও প্লীহায় বেদনা। চক্ষুর কোণ সাদা। মল কঠিন ও বিবর্ণ। দিনে দুই বার। প্রক্ষেপ চিরতা চূর্ণ।

শূল—প্রবল বেদনা উপস্থিত হইলে সেই সময় সেবন করিতে হয়। মাত্রা ২—৪ তোলা। মল কঠিন ও বিবর্ণ।

যকৃৎ বড়, কঠিন ও বেদনা যুক্ত। সঙ্গে অল্প অল্প জ্বর। শরীর রক্তহীন। (ক) দিনে দুইবার সেব্য। (খ) দিনে দুইবার স্বেদ।

আনাহ—পেট্‌ফাঁপা, পেটে গড় গড় শব্দ ও মন্দ মন্দ বেদনা। মল কঠিন ও বিবর্ণ। গরম থাকিতে থাকিতে সেবন। অথবা গরম জলে রাখিয়া গরম করিয়া সেবন। দিনে দুইবার।

শোথ—শোথ রোগে গোমূত্র উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা অবসেবন করাইবে।

অজীর্ণ—ক্ষুধা ভাল হয় না। প্রাতে মুখ ও চক্ষু ভার ভার বোধ হয়। শরীর অলস। কোষ্ঠ অপরিষ্কার। দিনে দুইবার।

গোমূত্রের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া—গোমূত্র শ্লেষ্মসংঘাত নষ্ট করে, এজন্য শ্লেষ্মপ্রকোপ বশতঃ যে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হয়, তাহা দূর করে এবং ঊর্দ্ধগ বায়ুকে অনুলোম করিয়া পিত্তকোষের পিত্ত অধোগামী করে এবং বায়ুর অনুলোমতা বশতঃ স্থানান্তরগত পিত্ত যথা-স্থানে আগমন করে। ক্ষার দ্রব্য সারক ও সংঘাতনাশক। এই জন্য গোমূত্র মল ভেদ করিয়া মলের কাঠিন্য দূর করে।

মাত্রা ও সেবন-বিধি

জন্মের পর ৩ মাস	পর্য্যন্ত	৫ ফোঁটা
৪ মাস হইতে ৮ „	„	৭ ফোঁটা
৮ „ „ ১২ „	„	১০ ফোঁটা
তদূর্দ্ধে ২ বৎসর	পর্য্যন্ত	১৫ ফোঁটা
„ ৫ বৎসর	পর্য্যন্ত	৩০ „
১০		৬০
১৫	„	২॥ কাঁচ্চা
৪০	„	৫ হইতে ১০ কাঁচ্চা

☞ (১) রোগীর স্বাস্থ্য, জীবনীশক্তি, এবং শারীর গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে এই মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে।

(২) গোমূত্র ধারোষ্ণ সেবন করিবে। ইহাতে গুণাধিক্য হয় এবং দুর্গন্ধ তত থাকে না।

(৩) ধারোষ্ণের অভাবে অন্ততঃ দুই ঘণ্টার মধ্যে সেবন করা কর্ত্তব্য। সেবন কালে গরম জলের উপরে রাখিয়া গরম করিবে। ইহা সেবনের পর শীতল জল পান।

বাহ্যিক প্রয়োগ

—অর্থাৎ ধবল রোগে গোমূত্র দ্বারা পীড়িত স্থল প্রত্যহ ধুইবে এবং উহার সহিত সোঁদাল গাছের ছাল বা পত্র ভালরূপ পেষণ করিয়া পীড়িত স্থলে প্রলেপ দিবে।

কুষ্ঠ—গলিত কুষ্ঠ, মণ্ডল ও উদুম্বর কুষ্ঠে পীড়িত স্থল দিনে দুইবার গোমূত্র দ্বারা ভালরূপে ধুইবে। একপোয়া শর্ষপ তৈল আগুণে চাপাইয়া তাহাতে গোমূত্র এক

সের খাওয়াইবে। গোমূত্র শেষ হইলে উহা পীড়িত স্থলে মালিশ করিবে। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা গোমূত্রে চণক (বুট-ছোলা) ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে ছোলা চিবাইয়া লইয়া গোমূত্রটুকু পান করিবে।

দুষ্টব্রণ—ব্রণ বহুদিনের পুরাতন হইলে নিমপাতাসিদ্ধ গোমূত্র দ্বারা ক্ষত স্থান ধুইয়া ব্রণটীতে গব্য ঘৃত গরম করিয়া লাগাইয়া নূতন কদলী পাতা বা বাসকপাতা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে।

কর্ণশূল—কাণের কামড় উপস্থিত হইলে গোমূত্র উষ্ণ করিয়া উহা দ্বারা কর্ণ পূরণ করিবে। অল্প সময়ের মধ্যেই বেদনা তিরোহিত হইবে।

স্বেদ

গোমূত্র উষ্ণ করিয়া গোমূত্রের হাড়ীটী একটী সচ্ছিদ্র আসনের নীচে রাখিয়া উপরে রোগীকে বসাইয়া রোগীর শরীর (মস্তক বাদে) এবং হাঁড়ী সহ আসন একটা কম্বল বা অন্য মোটা কাপড় বা কাঁথা দ্বারা বেষ্টিত করিবে। গোমূত্রের বাষ্প রোগীর শরীরে লাগিবে এবং ঘর্ম্ম হইবে। এই স্বেদের ফলে

১। আমবাতের বেদনা
২। বাত কফজ জ্বর

সত্বঃ তিরোহিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদে গোমূত্র যোগে নানা রোগে নানা প্রকার ঔষধের কল্পনা আছে। বারান্তরে তাহার উল্লেখ করিব।

উদ্ভিদের রোগে গোমূত্র

১। এক প্রকার ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া ধানের পাতার রস শোষণ করিতে থাকে। ইহার ফলে ৭।৮ দিনের মধ্যে পাতাগুলি শুকাইয়া যায়। এই অবস্থায় পিচকারী করিয়া গোমূত্র সেচন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

২। শাক বা চারা গাছের পাতা নানারূপ ক্রিমিতে ভক্ষণ করে। এরূপ স্থলেও পূর্ব্বোক্ত গোমূত্র সেচনে উপকার পাওয়া যায়।

পশু-পক্ষীর রোগে গোমূত্র

গৃহপালিত পশু-পক্ষীর এক প্রকার ক্রিমি রোগ হয়। তাহার ফলে গায়ের লোম ও পক্ষগুলি ক্রমে ঝরিতে থাকে এবং চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া ফাটিতে থাকে। এই পীড়ায় গোমূত্র দ্বারা গা ধুইলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

গোমূত্র ও সোড়া

যেখানে সর্ব্বদা গোমূত্র শোধিত হয় এরূপ স্থানে সোড়ার বীজ পাইলে সেই মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে সোড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এজন্য সোড়ার কারখানার নিকটে গোয়াল রাখা হইয়া থাকে।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।

জন-নায়ক গান্ধি

মহাত্মা গান্ধির সুপবিত্র নাম আজ ভারতবাসীর,—নব-উদ্বোধিত যুবকমণ্ডলীর—জপমন্ত্র—প্রাতঃস্মরণীয়! আজ সভ্যজগৎ যাঁহার ত্যাগে স্তম্ভিত, সেই মহানুভব সাধক-শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি এই "সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা" রত্নপ্রসবিনী ভারতমাতার প্রিয়সন্তান। হিন্দুধর্ম্ম চিরদিনই ত্যাগের ধর্ম্ম। ত্যাগ করিতে না শিখিলে

বা ত্যাগী হইতে না পারিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব লাভ করা যায় না! এ বাণী যুগে যুগে নানারূপে ভারতের আদর্শ বীরগণ নিজেদের কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন!

আজকাল অনেকের লেখায় পড়ি বা অনেকের মুখে শুনিতে পাই ভারত এমন অধঃপতিত হইয়াছে যে এদেশের উন্নতি সুদূর-পরাহত,—সুখের বিষয় ইদানীং শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় এ কথা সমীচিন মনে করিতে প্রস্তুত নন! যেই দেশের সন্তান এখনও সুদূর আফ্রিকাপ্রান্তে নির্জ্জন কারাবাসে নিতান্ত নিঃস্ব ভাবে স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর হিতার্থে এমন কৃচ্ছ্রব্রত সাধন করিতেছেন, সেই দেশের নর-নারী কি এখনও এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইবেন? নিরাশার রাত্রি এখন প্রভাতপ্রায়, চারিদিকে পাখীর কাকলী শুনিয়া সকলেরই প্রাণে আবার নবীন আশা জাগুক্—সকলেই জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করুক্——কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিক্—— ইহাই বাঞ্ছনীয়!

ভ্রাতৃগণ! বিংশ শতাব্দীর মহাত্যাগী শ্রীযুক্ত গান্ধি তোমাদেরই দেশের সন্তান,—তোমারই মায়ের অঞ্চলের নিধি,—তোমারই ভাই! আজ তোমার ভ্রাতার ত্যাগ দেখ এবং তাঁহাকে আদর্শ করিয়া জীবনকে ধন্য কর। আজ ভারতবর্ষ বিশেষ ভাগ্যবান্ যে মাতৃভূমিকে সেবা করিবার জন্য গান্ধির মত মহাবীরের আবির্ভাব হইয়াছে! যেই দিন মানুষ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইবে,—যেই দিন জগৎ জাতীয়-সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ছাড়াইয়া আরও উর্দ্ধে উঠিবে—সেই দিন সমগ্র জগৎ জুড়িয়া গান্ধির পূজা চলিবে—সেই দিন মহানুভব গান্ধি সমগ্র বিশ্বের হৃদয়ের দেবতারূপে প্রেমাঞ্জলি পাইবেন।

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার "ভারতীয়-দলন" ব্যাপার উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধি ভারতের আবাল-বৃদ্ধের সহিত সুপরিচিত হইয়াছেন। যাঁহারা দেশের ও দশের খবর রাখেন—তাঁহাদের অনেকে গান্ধির মহা যজ্ঞ সম্বন্ধে অজ্ঞ নন;—অনেকেই গান্ধিকে দেবতা জ্ঞানে মনে মনে পূজা করেন, হৃদয়ের ভক্তি উপহার দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদেরই অনেকে বিশেষতঃ অধিকাংশ বাঙ্গালী এই মহানুভব ত্যাগীর আদর্শ জীবনের কিছু জানেন না। তাঁহাদেরই কাছে গান্ধি সম্বন্ধে আমার যৎসামান্য জ্ঞান ও ধারণা ভয়ে ভয়ে উপস্থাপিত করিলাম; আশা করি, এই অকৃতী লেখকের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস সুধীজন-মণ্ডলী কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইবে না।

খৃষ্টীয় ১৮৬৯ অব্দে (২রা অক্টোবর) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাথিয়াবাড়ে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পোর্ব্বন্দর ও রাজকোট রাজ্যে অনেক বৎসর ধরিয়া মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধির শিক্ষা কিয়দংশ কাথিয়াবাড় ও অধিকাংশ লণ্ডন নগরে হয়। তাঁহার মাতা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু-পরিবারের কন্যা ও গৃহিণী। ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। গান্ধি যখন সর্ব্ব প্রথম সাগর বক্ষে "সাত সমুদ্র তেরনদী" পারে শ্বেতদ্বীপে যাত্রা করেন, তখন 'মা'র কাছে তাঁহাকে ত্রিবিধ প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছিল: প্রথম, মাংস-অভক্ষণ; দ্বিতীয় মাদক দ্রব্য অসেবন, তৃতীয় বা সর্ব্বশেষ, নারী জাতির প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন। ইহা হইতেই গান্ধি-জননীর চরিত্র পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ অনেক পরিমাণে বুঝিয়া লইতে পারেন। তিনি "লণ্ডন" বাসকালেও মাতৃ-উপদেশ ও স্বকীয় প্রতিজ্ঞা সর্ব্বৈব পালন করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে 'ব্যারিষ্টার' হইয়া তিনি বিলাত হইতে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং বম্বে হাইকোর্টে Advocate (এড্‌ভোকেট্) হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন। যখন দেখিলেন সেই দেশে তিনি ভারতসন্তান হইয়া চণ্ডালের মত (as a Pariah) সম্মানিত ও অসভ্য বর্ব্বর আদিম অধিবাসীদের মত আদৃত হইতেছেন, তখনই গান্ধি মর্ম্মে মর্ম্মে স্বীয় জন্মভূমির দৈন্য ও হীনতা বিশেষরূপে অনুভব করিলেন,—তখনই মহাত্মা গান্ধি সেই স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। সেই দেশে ভারতবাসী বর্ণ-পার্থক্যের অপরাধে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সুখে থাকিতে পায় না, পথে হাঁটিতে পারে না, এক স্থানে বাস করিতে পারে না। ভগবানের বিশ্বমাঝে মানুষের মধ্যে এপ্রকার পার্থক্য, এইই নূতন! আফ্রিকার শ্বেত-দেহধারী খৃষ্টানগণ হিন্দুকে পদে পদে লাঞ্ছনা ও অপমান করেন! মহাত্মা গান্ধি স্বচক্ষে এই সব প্রত্যক্ষ করিয়াই তাহার প্রতীকারার্থে আত্ম-ত্যাগে কৃত-সংকল্প হইলেন!

ভারত-বাসীদের প্রতি তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে একটা ঘটনা এখানে তুলিয়া দিলাম; পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। মানুষের উপর মানুষ এমন নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক অত্যাচার করিতে পারে না; মানুষের লেখনীতে উহার যথাযথ বর্ণনা অসম্ভব!

"শ্রীযুক্ত গান্ধি সেই দিন মহারাষ্ট্র-জননায়ক গোখলে মহাশয়ের কাছে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছেন যে, '১৮৯৬ সালে ও তৎ পূর্ব্বেও দুটী জাহাজে করিয়া ভারত-বাসীরা ডার্ব্বান-বন্দরে আসিয়া পৌঁছায়; তাহারা যাহাতে জাহাজ হইতে নামিতে না পারে তজ্জন্য তিনি (কর্ণেল ওয়াইলি) অনেক লোক সংগ্রহ করিয়া লইয়া বন্দরে উপস্থিত হন। প্রকাশ্য সভায় ভারতবাসী যাত্রীসহ ঐ দুইটা জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করেন! আর একজন বক্তা বলে যে কেহ যদি একবারও ভারত-বাসীর উপর গুলি চালায় তাহা হইলে সে নিজের এক মাসের মাহিনা দিবে। কর্ণেল ওয়াইলি এই বক্তার প্রস্তাবের প্রশংসা করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে আর কে কে ভারতবাসীর উপর এক একগুলি ছোড়ার জন্য এক এক মাসের বেতন দিতে রাজি আছে?" *

এই সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা কর্ণেল ওয়াইলিকেই তথাকার গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর উপর অত্যাচার সম্বন্ধে অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত কমিশনের একজন সভ্য করিয়াছেন!! এতৎ-সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

এই সময়ে মন্ত্রীপুত্র, সৌভাগ্যক্রোড়ে শায়িত বারিষ্টারপ্রবর ত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত স্বদেশীয়-ভ্রাতৃগণের উপকারার্থে স্বেচ্ছায় আত্মসুখ বিসর্জ্জন দেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের বুয়র-সমরে মহাত্মা গান্ধি ইংরাজদের পক্ষে অনেক সহযোগী লইয়া সাহায্য করেন। এমন কি ইহার পুরস্কার স্বরূপ সমর-পদকও (war-medal) তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল। তিনি যখন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ বশতঃ ভারতে যাত্রা করেন তাহারই কিছু পূর্ব্বে সেই দেশের (নেটালের) প্রধান মন্ত্রী স্যারজন রবিন্‌সন্ একদিন চিঠিতে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "মিষ্টার গান্ধির ন্যায় সুবিখ্যাত ও সক্ষম নাগরিকের কার্য্যকালে যদি আমি উপস্থিত

* প্রবাসী, মাঘ ১৩২০

করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই কারণে আমরা কঠোপনিষৎ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর পদ্যে গ্রথিত দেখিতে পাই। ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ইত্যাদি গদ্যে লিখিত দেখিতে পাই। তৈত্তিরীয় ব্যতিরেকে গদ্যে লিখিত অন্য সকল অপেক্ষা বৃহদারণ্যকই প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ ইহার মৌলিকতা দৃষ্ট হয়, অন্যগুলিতে ইহারই ভাবের ছায়া পড়িয়াছে, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। অথবা এইগুলির গদ্যে রচনায় নাগার্জ্জুনের হস্তক্ষেপ আছে কি না সে সম্বন্ধেও মনে খট্‌কা উপস্থিত হয়, কারণ যাহাতে যজ্ঞের অশ্রেয়তা প্রখ্যাপিত ও সাংখ্যমত সমর্থিত হইতেছে, তাহা তিনি স্পর্শ করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন নাই; যেহেতু উহাতে তাঁহার বিধর্ম্মীভাবের অনুমোদনই রহিয়াছে, কিন্তু যাহাতে যজ্ঞদানতপের কর্ত্তব্যতা প্রখ্যাপিত হইয়াছে তাহার গদ্যে রচনার আজ্ঞা প্রচারিত করেন—গদ্যে লিখিত হইলে সাধারণের চিত্ত সত্বর আকর্ষিত হইবে না, সুতরাং তাহা না হইলে তাঁহার নিজধর্ম্ম-প্রচারেও অন্তরায় উপস্থিত হইবে না।

এইরূপে প্রদর্শন করিতে পারা যায় যে ছান্দোগ্যের রচনা উপরোক্ত অন্য উপনিষৎ অপেক্ষা অর্ব্বাচীন। ইহা কোন কাশ্মীর-বাসীর রচনা। ইহার রচনা-কালে বৌদ্ধ-প্রভাব সনাতন সমাজকেও স্পর্শ করিয়াছিল। বঙ্গদেশের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ যেমন নিরবচ্ছিন্ন সামবেদের কৌথুমশাখী বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেন, কাশ্মীরে সেইরূপ কৌথুমের সহিত সামবেদের অন্য শাখাও প্রচলিত শ্রুত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ সাম-বেদীয় বিভিন্ন বিভিন্ন শাখাধ্যায়ী হইবেন। বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ যেমন কর্ম্মকাণ্ডের মোহে বিভোর, কাশ্মীরদেশীয় ব্রাহ্মণগণও তদ্রূপই বিহ্বল, সুতরাং তাঁহাদের রচিত উপনিষৎ ছান্দোগ্যেও তাহারই ছায়া বাহুল্যভাবে পতিত হইয়াছে।

এক্ষণে ব্রহ্মসূত্র ও ছান্দোগ্যের রচনা-কাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

উপরে লিখিয়া আসিয়াছি যে ইহা নাগার্জ্জুনের রাজত্বকালে রচিত হয়। নাগার্জ্জুন বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির ১৫০ বৎসর পরে জগতে অবতীর্ণ হন, বৌদ্ধ সমাজে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধগণের গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ভগবান বুদ্ধদেব খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ৫৪৩ বৎসরে নির্ব্বাণ লাভ করেন সুতরাং নাগার্জ্জুনের সময় খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ৩৯০ বৎসরের নিকটবর্ত্তী কোন সময় হইতেছে। অতএব এই সময়ের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কালে ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণও প্রাদুর্ভূত হন। কেহ কেহ আবার এমতেও সংশয়ান্বিত। তাঁহারা বলেন নাগার্জ্জুন অশ্বঘোষের সময় বুদ্ধ নির্ব্বাণের ৪৫০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন, সুতরাং পূর্ব্বলিখিত সময় হইতে ইহা ৩০০ বৎসর অর্ব্বাচীন হইয়া পড়িতেছে।

বাদরায়ণ নামে জনৈক জ্যোতিষী ও ব্যাস নামে যোগদর্শনের জনৈক ভাষ্যকারের নাম শ্রুত হওয়া যায়। জ্যোতিষীর বচনাবলী ভট্টোৎপল তাঁহার বৃহজ্জাতক টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ব্যাসের বচন বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার তত্ত্ববৈশারদী নাম্নী পাতঞ্জল যোগ-দর্শনের টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তথায় তিনি এই ব্যাসকে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন এবং তাঁহার পাঠকগণকে সন্দেহদোলায় স্থাপিত করিয়া

গিয়াছেন। যাহা হউক, বাদরায়ণ নানারূপে নিজ অভিব্যক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। মহাভারতের তীর্থ-পর্ব্বাধ্যায়ে পারিযাত্র পর্ব্বতের নিকট সরস্বতীর তীরে একটি বদরী-আশ্রমের কথা লিখিত আছে। ইহা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হিমালয়স্থ বদরিকাশ্রম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থান। আমার বোধ হয় এই বাদরায়ণ ব্যাস এই সরস্বতীতীরস্থ বদরী-আশ্রমের লোক হইবেন। এই বাদরায়ণ সম্বন্ধে ইহার অধিক আর জানিতে পারি নাই, আর বোধ হয় তাহার উপায়ও নাই।

ছান্দোগ্য হইতে ঋতুবিষয়ক যে বচন উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সহিত আর একটী বচনের সামঞ্জস্য রাখিয়া অর্থ করিলে অনুমান করি উহার রচনা-কালের কিঞ্চিৎ সহায়তা হইতে পারে। সে বচনটী এই—

অজাহিঙ্কার অবয়ব প্রস্তাব গাব উদ্গীথঃ অশ্বঃ প্রতিহার পুরুষ নিধনং এতা রেবত্যা পশুষু-প্রোতং।

ইহার ভাবে বোধ হইতেছে যে, যজ্ঞে ছাগের বধসাধন হইত, গোর নিধন হইত না এবং অশ্বমেধও রহিত হইয়াছিল। * আর রেবতী শব্দের বহুবচন থাকায় তাহা যেমন সকল স্থলে সামান্যতঃ প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্রূপ নিধনে তাহা বিশেষভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায়। তাহা হইলে ইহার অর্থ দাঁড়াইতেছে— পুরুষ অর্থাৎ অজার আত্মার নিধন রেবতীতে হইতেছে।

এখন ইহার সহিত পূর্ব্ব বচনের সামঞ্জস্য স্থাপিত করিলে জানা যাইতেছে যে, হেমন্তের অন্তে রেবতী নক্ষত্রের শেষ ভোগ-কালে ছাগটী প্রাণ বিসর্জ্জন করিত। এ বচনের হেমন্তশিশির-অর্থবোধক অর্থাৎ শিশির অন্তে ও রেবতীর শেষে বসন্ত আরম্ভ হইত ও সেই সময় ছাগবলির যে কোন প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা বেশ বোধ হইতেছে। যদি এইরূপ অর্থ যথার্থ হয়, তাহা হইলে তাৎকালিক ঋতুর একটী নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পরাশর তাঁহার সময়ের ঋতুর নির্দ্দেশস্থলে লিখিয়াছেন যে, শিশির ঋতু ধনিষ্ঠার আদি হইতে রেবতীর অর্দ্ধ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিত। † এস্থলে রেবতীর শেষ পর্য্যন্ত তাহার অব-

* ছান্দোগ্য উপনিষদের আর একস্থলে যজ্ঞেষু প্রোতং বলিয়া পশুর অঙ্গগুলির উল্লেখ আছে, তাহাতে অস্থিকে প্রতিহার বলা হইয়াছে এবং মজ্জাকে নিধন করা হইয়াছে অর্থাৎ ইহা অস্থি ফেলিয়া মজ্জা ভোজনের ভাব প্রকাশ করিতেছে। এই পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য দ্বারা বলিতে হয় যে তখন অশ্ববধ ও অশ্বমেধ যাগ রহিত হইয়া আসিয়াছিল। ছান্দোগ্যের সময় নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিতে হইলে এই বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন বচন হইতে সহায়তা গ্রহণ করিলেই অভীপ্সিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদান্ত-দর্শনকার যেমন কৌশল করিয়া নিজ গ্রন্থের নাম অন্য কবির রচনায় প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন, ছান্দোগ্যকারও তদ্রূপ অন্য উপনিষদের ভাব লইয়া এবং অন্য ঐতিহাসিকের নিরূপিত সময় লইয়া তাঁহার অদ্ভুত ধারণা বিশ্বাস ও মতের সহিত জড়িত করিয়া এই উপনিষৎখানি দাঁড় করাইয়াছেন। এই অবস্থাগত সৌসাদৃশ্য হইতে বোধ হয় এই উপনিষৎখানি ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণের নিজ রচিত। এই কারণেই ব্রহ্মসূত্রে এই উপনিষদের সকল মন্ত্রেরই সমর্থন দৃষ্ট হয়। সুধীগণ এই কথায় বিচলিত হইবেন না। সত্য সিদ্ধান্তে যদি উপস্থিত হইতে হয়, তাহা হইলে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে হয়, এবং আভ্যন্তরিক, পারিপার্শ্বিক ও বাহ্য সাক্ষ্যের প্রতিও ধ্যান দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, নতুবা অভীষ্ট ফল প্রাপ্তির আশা বিসর্জ্জন দিতে হয়। এ সকল বিষয়ে গোঁড়ামীর বশীভূত হইয়া কোন কথা বলা উচিত নহে—ধর্ম্মসঙ্কটে তাহা করা পাপের নামান্তর বলিয়াই জানিবেন। আপনার পূজ্য ঋষি প্রণীত ভগবদ্গীতার বচন শেষ অধ্যায়ত্রয় খণ্ডন করিতেছে, সুতরাং আপনার ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত, এই বিবেচনা করিয়া নিরপেক্ষ বিচারে অগ্রসর হইবেন। হৃদয়, বল, রুচি না থাকে অগ্রসর হইবেন না, তাহাতে দোষ নাই; কিন্তু বিচারে প্রবৃত্ত হইলে পক্ষপাত ও গোঁড়ামী দ্বারা আসন অপবিত্র ও কলুষিত করিবেন না। সুধীসমাজকে আমার বিনীত নিবেদন জানাইয়া এই প্রবন্ধের দোষগুণ বিচারভার সমর্পণ করিলাম।

† শ্রবিষ্ঠাদ্যাৎ পৌষ্ণার্দ্ধান্তং চরতঃ শিশিরঃ—ভট্টোৎপল বৃহৎ-সংহিতা টীকা।

স্থিতি দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং পরাশরের সময় হইতে ছান্দোগ্য-কারের সময় পর্য্যন্ত ঋতুর অর্দ্ধনক্ষত্র স্থান অগ্রসরণ ঘটিয়াছে। এক একটী নক্ষত্রের ব্যাপ্তিস্থান রাশিচক্রের ১৩ অংশ ২০ কলা, সুতরাং অর্দ্ধনক্ষত্রের ভুক্তি স্থান ৬ অংশ ৪০ কলা হইল।

কোন দৈব-প্রভাবে ক্রান্তিপাত-বিন্দু প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে অর্থাৎ সূর্য্যদেব এক বৎসর মেষের যে স্থানে উপস্থিত হইলে দিন রাত্রি সমান হয়, পর বৎসর তাহার পূর্ব্বে উপস্থিত হইলেই দিন রাত্রি সমান হয়, এইরূপ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে অর্থাৎ নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রতিবৎসর ঋতুর ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। ইহা এত সামান্য যে দুই দশ বৎসরে ত যন্ত্রবিহীন চক্ষে ইহা ধরিতেই পারা যায় না। দুই তিন শত বৎসরে ৩।৪ অংশ হইয়াছিল ব্রহ্মগুপ্ত তাহারও উল্লেখ করেন নাই, এইরূপ কথা ভাস্কর সিদ্ধান্তশিরোমণিতে লিখিয়া গিয়াছেন। বহুকাল সঞ্চিত হইলে ঋতুর স্পষ্ট ব্যতিক্রম প্রকাশিত হয়। বরাহ-মিহির তাঁহার বৃহৎ-সংহিতাতে পূর্ব্বশাস্ত্রের লিখিত ঋতুর সহিত তাঁহার নিজ সময়ের ঋতুর অন্তরের কথা নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সূর্য্য-সিদ্ধান্তে তাহার প্রতিবৎসর ব্যতিক্রমের পরিমাণও লিখিয়াছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ইহা প্রতিবৎসর ৫৪ বিকলা অর্থাৎ ৬৬ বৎসর ৮ মাসে রাশিচক্রের ১ অংশ। ইংরাজিমতে ইহা প্রতি বৎসর ৫০।১ বিকলা অথবা ৭১।৮৫ বৎসরে ১ অংশ। সুতরাং ইংরাজিগণনায় ঋতুর ৬ অংশ ৪০ কলা পূর্ব্বে অগ্রসর হইতে ৪৮০ বৎসর অতিবাহিত হইতেছে। অতএব মোটামুটি জানা যাইতেছে যে, ছান্দোগ্যকার পরাশরের ৫০০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হয়েন। পুরাতন Asiatic Researchএর অনেক জ্যোতিবিদ্ লেখক Davisএর গণনায় জানা যায় যে, পরাশর খৃষ্টপূর্ব্ব ১৩৯১ বৎসরে তাঁহার সংহিতায় ঋতুর নির্দ্দেশ করেন, সুতরাং ছান্দোগ্যকার ৮৯০-৯০০ বৎসরের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন। মহাভারতস্থ অনুগীতা-ধ্যায়াপর্ব্বের একটী ঋতু নির্দ্দেশ দ্বারাও এই সময় প্রাপ্ত হওয়া যায়। * ইহা হইতেই সম্ভবতঃ ছান্দোগ্যকার স্বীয় ঋতু নির্দ্দেশটী গ্রহণ করিয়া প্রভেদ রাখিবার জন্য তাহার শিশির মূলক গণনাটী পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং তাঁহার রচনা অশ্বমেধ-পর্ব্ব রচনার পরভবিক ব্যতিরেকে পূর্ব্বভবিক নহে। তাহাতে স্পষ্টভাবে ইহাতে বক্রভাবে একই ঋতুর উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহাও ছান্দোগ্যের অর্ব্বাচীনতা সপ্রমাণ করিতেছে।

ইহার সহিত ভগবান ব্যাসদেব, যাজ্ঞবল্ক্য, ভগবান শঙ্কর, মেধাতিথির সময় নিরূপণ করিয়া লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া তাহাতে নিরস্ত হইলাম। তবে ভগবান ব্যাসদেব সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে জ্যোতিষী আর্য্যভট্ট ও সাধারণ বিশ্বাস মতে তিনি যে বর্ত্তমান কলির প্রারম্ভে অথবা দ্বাপরের শেষে বর্ত্তমান ছিলেন এ বিশ্বাস অমূলক নহে, ইহার প্রমাণ মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর যাজ্ঞবল্ক্য যে কলির ৭০০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন তাহা তাঁহার শতপথ-ব্রাহ্মণের একটী ঋতুজ্ঞাপক বচন প্রকাশিত করিয়া দিতেছে। তাহার অর্থ এই যে তাঁহার সময়ে বাস্তবিক বিষুবান্ কৃত্তিকা-নক্ষত্রে আরম্ভ হইত।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

† অহঃ পূর্ব্বং ততো রাত্রি মাসা শুক্লাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
শ্রবণাদীনি ঋক্ষাণি ঋতবঃ শিশিরাদয়ঃ ॥ অশ্বমেধ ৪৪ অঃ

ওলকচুর চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্যয়ের হিসাব

১।	ভূমির খাজনা—	২৲
২।	ভূমি প্রস্তুত ও মূল রোপণের ব্যয়	২০৲
৩।	বীজমূল খরিদের ব্যয়—৬৫৬১টী মূলকাণ্ড শতকরা ৷৹ দরে—	৬৷৷০
৪।	মূল সংগ্রহ ও মজুত করার ব্যয়	৭৲
৫।	জঙ্গল নিড়ান ও গাছের গোড়ায় মৃত্তিকা উস্কাইয়া দিবার ব্যয়—	
৬।	সার দেওয়ার ব্যয়—	
		১০৪৷০

দ্বিতীয় বৎসরে ইহার অন্য কোন পাইট নাই। বর্ষান্তে গাছের গোড়ার মৃত্তিকা খুরপী বা পাসন দ্বারা আলগা করিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছু করিতে হয় না। গাছ অঙ্কুরিত হইবার পরে এই কার্য্য করিতে হয়। এই বৎসরে অবশিষ্ট ৩২৮০টী মূল গড়ে ৵০ আনা দরে বিক্রয় হইতে পারে। তাহা হইলে এই বৎসরেও ৪১০৲ টাকা উৎপন্ন হইতে পারে। যাহা হউক, উহার মূলও গড়ে ⁄০ এক আনা হিসাবে ধরিলে এ বৎসরেও ২০৫৲ টাকাই উৎপন্ন হইবে। ইহার চাষে এ বৎসর অতি অল্প ব্যয়ই হইবে। ওলের গাছ পশ্বাদিতে খায় না। সুতরাং ওলক্ষেত্রে বেড়া দিবারও প্রয়োজন হয় না। এ বৎসরে নিম্নের হিসাব মত মাত্র ২৪৲ টাকা ব্যয় হইবে। এ বৎসরের উৎপন্ন ২০৫৲ হইতে উহা বাদ দিলে ১৮১৲ খাটী লাভ হইবে। তদ্ভিন্ন ইহার মূল হইতে বহু পরিমাণ চঙ্কু পাওয়া যাইবে। উহা বিক্রয় করিলেও কম লাভ হইবে না। উহারা ভাবী বীজের কার্য্য করিবে। উহাও খাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বৎসরের ব্যয়ের হিসাব

১।	ভূমির খাজনা	২৲
২।	জঙ্গল নিড়ান ও গাছের গোড়ার মৃত্তিকা আলগা করিয়া দিবার ব্যয়	১৫৲
৩।	মূল সংগ্রহ ও মজুত করার ব্যয়	৭৲
		২৪৲

উল্লেখিত হিসাবমত দ্বিতীয় বৎসরে ১৮১৲ লাভ হয়। উহা হইতে আগন্তুক ক্ষতি ৪১৲ টাকা বাদ দিলেও দ্বিতীয় বৎসরে এক বিঘায় ন্যূনাধিক ১৫০৲ টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় বৎসর গাছের গোড়ার মৃত্তিকা কুড়িয়া হাল্কা করিয়া দেওয়ার ব্যয় প্রথম বৎসর অপেক্ষা অধিক লাগিবে। কেন না বর্ষান্তে মৃত্তিকা কঠিন হইয়া যাওয়ায় উহাকে কুড়িয়া ধূলিবৎ করিতে অধিক শ্রমের প্রয়োজন হয়।

অন্য এক প্রণালীতে ওলের চাষ করিলে আরও অধিক লাভ হইতে পারে। যে সকল মূল রোপণ করা হয়, প্রথম বর্ষে উহাদের প্রত্যেক দুইটী গাছের মধ্য হইতে একটী গাছ উঠাইয়া লইবে। তাহা হইলে ৩২০টী মূল উঠাইয়া লওয়া হইবে। তৎপর বৈশাখ মাসে যে স্থান হইতে মূল উঠাইয়া লইবে ঐ স্থানে একটী করিয়া মূল রোপণ করিবে। তাহা হইলে একই ক্ষেত্রে একাদিক্রমে ৩।৪ বৎসর ইহার চাষ করিতে

পারিবে। ভূমি অবসন্ন, একেবারে সারহীন ও অকর্ম্মণ্য না হওয়া পর্য্যন্ত একই ক্ষেত্রে বহুদিন ইহার চাষ চলিতে পারে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বর্ষে অবশিষ্ট ৩২৮০টী মূলের প্রত্যেক দুইটীর মধ্যবর্ত্তী একটী মূল উঠাইয়া লইলে ১৬৪০টী মূল উঠাইয়া লওয়া যাইবে। উহার প্রত্যেকটী মূল গড়ে ৵৹ আনা দরে বিক্রয় করিলে ২০৫৲ টাকাই উৎপন্ন হইবে। তৃতীয় বৎসরে অবশিষ্ট ১৬৪০টী মূল বৃহদাকার হইবে। উহার প্রত্যেকটী ৵৹ আনা হইতে ।৹ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতে পারিবে। গড়ে প্রত্যেকটীর মূল্য ৵৹ ধরিলে ন্যূনাধিক ৩০৭৲ টাকা উৎপন্ন হইবে। উহা হইতে চাষের ব্যয় ২৪৲ টাকা বাদ দিলেও ২৮৪৲ টাকা লাভ দাঁড়ায়। উহা হইতে আগন্তুক ক্ষতি ৮৩৲ টাকা বাদ দিলেও অন্যূন ২০০৲ টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা। এরূপ লাভের সহজ উপায় বিদ্যমান থাকিতেও ভারতবাসী অন্নের জন্য ভিখারী, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন জেলায় বাস্তুভূমির পতিত জায়গায় কেহ কেহ ওলের মূল রোপণ করিয়া থাকে। উহা দ্বারা পারিবারিক ব্যবহারের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াও সামান্য পরিমাণে লাভ হইয়া থাকে। কলা-বাগানে ও বারুইর বরজেও কেহ কেহ উপ-ফসলরূপে ওলের চাষ করিয়া থাকে। ইহাতেও লাভ হইয়া থাকে। সখের হিসাবে ইহার চাষ করিতে হইলে ছায়াযুক্ত স্থানে বা সবুজ গৃহে ইহার চাষ করিতে হয়। ঐরূপ স্থানে ইহার পাতার বর্ণের গাঢ়ত্ব ও চাকচিক্য বৃদ্ধি হয়। অর্দ্ধছায়াবিশিষ্ট স্থানেও ইহার চাষ হইতে পারে। সেইজন্য কলা-বাগানে ও বারুইর বরজে ইহার চাষ হয়। খোলা জায়গায়ও ইহার চাষ হইতে পারে। বিস্তৃত পরিমাণে ইহার চাষ করিতে হইলে খোলা জায়গায়ই করিতে হয়। ইহাদের মূল অর্দ্ধছায়াযুক্ত স্থানে সত্বর বর্দ্ধিত হয়। মূলের বৃদ্ধির জন্য যে ছায়ার প্রয়োজন তাহা ইহাদের পাতা দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। ইহাদের পাতাই একরূপ ছাতির কার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের মূলের উপরে আর অন্যরূপ ছায়া করিবার প্রয়োজন হয় না। তথাপি মূলের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিতে হয়। এই জন্য খড়, সরিষার খোসা, ধানের খোসা (তুষ husk) বা তদ্রূপ অন্য কোন বস্তুর দ্বারা গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে ওলের মূল সত্বরই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উপরোক্ত পদার্থ সকল গাছের গোড়ায় পচিলে উহা দ্বারা ভূমির সান্দ্রতা রক্ষা হয়। অধিকন্তু ইহারা পরোক্ষ ভাবে সারের কার্য্যও সম্পাদন করিয়া থাকে। অধিক ছায়াযুক্ত স্থান ওলের চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। মৃদু সূর্য্য-কিরণ ও আলোকসম্পন্ন স্থানই ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অধিক ছায়াতে উৎপন্ন ওল ব্যবহারের অনুপযোগী হয়। উহা খাইলে গলা ধরিয়া থাকে অর্থাৎ কণ্ঠনালীতে চিন্ চিন্ করিয়া দাহ ও জ্বালা উপস্থিত হয়। কখন কখন কণ্ঠনালী স্ফীত হয়। ঐরূপ স্বভাবের ওলের মূলের বাকল উঠাইয়া উহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কর্ত্তন করিবে। তৎপর ঐ সকল টুকরাকে চুণের জলে ½ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া তৎপর সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করিবে। তৎপর উহাদিগকে জলে ধৌত করিয়া সর্ব্বশেষে হাঁড়িতে জল রাখিয়া উহাতে রাখিবে এবং অগ্নিসংযোগে সিদ্ধ করিয়া লইবে। তাহা হইলে উহা

ব্যঞ্জনে ব্যবহারের উপযোগী হইবে। তখন উহাতে গলা ধরিবে না, বরং সুস্বাদু হইবে। খোলা জায়গায় ইহার চাষ করিলে ইহার মূলে গলা ধরে না। ইহার কারণ এই যে, সূর্য্যোত্তাপ দ্বারা উহার দুষ্ট রস শোধিত হইয়া থাকে। নূতন সংগৃহীত মূল কর্ত্তন করিলে উহাতে একরূপ জলীয় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহা শরীরে লাগিলেও স্পৃষ্ট স্থানে জ্বালা উপস্থিত হয়। এই জন্য ইহার মূল সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন ওল নানা জাতি। কোন কোন জাতির গলা ধরা দোষ আছে ও কোন কোন জাতির এই দোষ নাই। বাস্তবিক তাহা নহে। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, খোলা জায়গায় ইহার চাষ হইলে ইহা কদাচিৎ গলা ধরিয়া থাকে। কিন্তু ছায়ায় উৎপন্ন মূলে অধিকাংশ সময়েই গলা ধরিয়া থাকে।

ইহার মুখীও (আসল মূলের গাত্রজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল বা চক্ষু) খাইতে মন্দ নহে। ইহার পাকপ্রণালীও পরিপক্ক মূলের পাকপ্রণালীর ন্যায়। ওলের মূল সংগ্রহের পরে উহার গাত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল বা চোখ সকলকে ভাঙ্গিয়া মজুত করিতে হয়। উহারাই ভাবী বীজের কার্য্য করে। উহা সংগ্রহের পরে ২।৩ দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ঘরের মেজেতে বালি বিছাইয়া উহার উপরে উহাদিগকে রাখিতে হয়। তাহা হইলে উহারা তাজা থাকে। ওলের মূল পরিপক্ক হইলে উহার ডাঁটা ও পাতা পচিয়া যায়। তখন উহার মূল সংগ্রহ করিতে হয়। সাধারণতঃ কার্ত্তিক মাস হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত ইহার মূল সংগৃহীত হইয়া থাকে। কখন কখন মাঘ ফাল্গুন মাসেও উহা সংগৃহীত হইয়া থাকে।

২। এমরফোফেলাস্-বাল্‌বিফিরাম্— (AMORPHOPHALLUS BULBI FERUM.) বাকরাজ

ইহা বাকরাজ ও বুনো বা বন্য ওলকচু নামে পরিচিত। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ইহা বাকরাজ বা বাতরাজ নামে অভিহিত হয়। ইহার সংস্কৃত নাম স্থূল-কন্দ বা অগ্রাম্যকন্দ।

"স্থূলোকন্দোঽগ্রাম্যকন্দঃ।

অগ্রাম্য শব্দে যাহা গ্রাম্য নহে তাহাকেই বুঝায়। সুতরাং বন্য ওলকচু নামটাই ইহার ঠিক নাম বলিয়া বোধ হয়। ইহার জন্মস্থান বঙ্গদেশ। বঙ্গদেশের জঙ্গলে ইহা স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে। ইহার মূল ক্ষুদ্র ও ইহাতে গলা ধরিয়া থাকে। কোন উপায়েই ইহার গলা-ধরা দোষ বারণ করা যায় না। সেই জন্য ইহার চাষ হয় না। ইহার মূল একটী মধ্যমাকার শালগমের অপেক্ষা বৃহৎ হয় না। গ্রীষ্মারম্ভের সময় ইহার মূল হইতে প্রথম ফুল বহির্গত হয়। উহা মরিয়া গেলে ডাঁটা ও পাতা বহির্গত হয়, উহারা বর্ষাকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে, তৎপর মরিয়া যায়। ইহার ডাঁটার বহির্দ্দেশ সূত্রবৎ আঁশপূর্ণ। ইহার গাছ ও পাতা অতিবৃহৎ। পাতা কখন কখন ৪.৫ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট হয়। গাছ ৪।৫ ফুট উচ্চ হয়। পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণ। নানা খণ্ডে বিভক্ত। পাতার কিনারা রেখান্বিত। ডাঁটা কৃষ্ণাভ সবুজ বর্ণ। মাঝে মাঝে শ্বেত বর্ণের পোঁছ থাকে। ইহার পাতার মেরুদণ্ড ও অস্থির উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার মূল উৎপন্ন হয়। ইহারাই ইহার ভাবী বীজ। ইহার ফুল পাটল বর্ণের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ফুল বন্ধ্যা। পাতার উপরে ইহার বীজ হয়।

ইহার ডাঁটা ও পাতা খাওয়া যায়। ইহার কচি পাতা ভাজা অতিশয় সুস্বাদু। ইহার কচি ডাঁটা সিদ্ধ করিয়া ব্যঞ্জনে ব্যবহার করা যায়। ইহার ডাঁটার শাকও মানকচুর ডাঁটার শাকের ন্যায় খাওয়া যায়। ইহার মূল অতিশয় দুষ্ট ও তীব্ররসপূর্ণ। ইহা খাইলে গলা ধরে, কণ্ঠনালীতে জ্বালা উপস্থিত হয়, জিহ্বা ও মুখ চিন্‌ চিন্‌ করিয়া জ্বলিতে থাকে। ইহার মূল অখাদ্য। মূলের মাংস পাটল বর্ণের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ ও আশযুক্ত। ইহার মূলও ঔষধে ব্যবহৃত হয়। এই জাতির মূলই বিশেষ উপকারী।

৩। এমরফোফেলাস টিটেনাম্‌—(Amorphophallus Titanum)

ইহা বিশ্বনিয়ন্তার অনন্ত শক্তির পরিচায়ক। ইহার ন্যায় আশ্চর্য্য উদ্ভিদ জগতে আর আছে কি না সন্দেহ। ইহার জন্মস্থান সুমাত্রাদ্বীপ। ইহার গাছ, পাতা ও ফুল সুন্দর। সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা ইহার আকৃতিই বিস্ময়জনক। ইহার পুষ্পাভ্যন্তরস্থ শীস (Spadix) ৫ ফুট উচ্চ হয়। ইহা কৃষ্ণাভ বেগুনে বর্ণ। দেখিতে একখানি চালির ন্যায়। পুষ্পাবরক পত্র গোলাকার। ইহার ব্যাস প্রায় তিন ফুট হয়। ইহার কিনারা বা পার্শ্বদেশ দণ্ডিত অর্থাৎ দাঁত কাটা, পুষ্পাভ্যন্তর-ভাগ সবুজবর্ণ, গাত্র উজ্জ্বল বেগুনে বর্ণ, পুষ্পবৃন্ত ৭৷৮ ফুট দীর্ঘ হয়। ইহাতে শ্বেতবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র থাকে। ইহার মূল অখাদ্য।

৪। রিভারি A.—Riverii

ইহাও অতিশয় সুন্দর জাতি। ইহার পাতা ও ডাঁটা নানা বর্ণে চিত্রিত। দেখিতে ছবির ন্যায়।

৫। এমরফো-ফেলাস কিঙ্গি—A. Kingii.

৬। ঐ গ্রেণ্ডিস—A. Grandis.

৭। ঐ লেকর্ণি—A. Lacronii.

৮। ঐ এস্‌, পি, ডাহু—A. S. P. Dahoo.

এই কয়েক জাতির নামও উল্লেখযোগ্য। ইহাদের ফুল ও গাছ দেখিতে সুন্দর। এতদ্ভিন্ন ইহার আরও বহুজাতি আছে। উহারা মনুষ্য বা মনুষ্যেতর কোন প্রাণীর ব্যবহারে আইসে না, তজ্জন্য উহাদের নাম এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ

হুইট্‌ম্যান্‌ *

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান্‌ (Walt Whitman) ১৮১৯ সালের ৩১শে মে ওয়েষ্ট হিল্‌সে (West hills, Long Island) জন্মগ্রহণ করেন। নয়টি ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। জীবনের তের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষা। তৎপরেই তাঁহার চাকরী করিতে হয়। কিন্তু চাকরী ত্যাগ করিয়া পত্রিকার সম্পাদকরূপে বহু দিন ধরিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে কাজ করিতে হইয়াছিল।

১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "লীভ্‌স্‌ অব্‌ গ্র্যাস্‌" (Leaves of Grass)

* লেখকের "সাহিত্যে আত্ম-প্রকাশ" নামক সমালোচনা-গ্রন্থের এক অধ্যায়

প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানার ছাপাইবার পারিপাট্য বড় বেশী কিছু ছিল না, কেবল গোড়াতেই কবির একটি ছবি দেওয়া হইয়াছিল।

কতগুলি পুস্তক মাসিকপত্রিকাদির সম্পাদকের নিকটে সমালোচনার জন্য পাঠান হইল, এবং কতগুলি উপহার দেওয়া হইল প্রধান প্রধান লেখকদিগকে। বাকী গুলা নিউ-ইয়র্ক ও ব্রুকলিনের দোকানে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইল।

কিন্তু পুস্তকখানার ভাগ্য বড়ই নৈরাশ্যজনক। একখানিও বিক্রীত হইল না! কোন কোন পত্রিকার সম্পাদক ইহার প্রাপ্তি-স্বীকার পর্য্যন্ত করিলেন না। কেহ বা বিদ্রূপ করিলেন এবং কেহ বা ভয়ানক গালি দিলেন। উপহার-প্রাপ্ত কতগুলি লেখক আবার অপমানসূচক মন্তব্য লিখিয়া বইগুলি ফেরত দিয়া পাঠাইলেন।

তবে এমন একখানা পুস্তক সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞাত হইতে পারে না। কয়েক মাস পরে এমার্সন সাহেব খুব প্রশংসা করিয়া হুইটম্যান্‌কে এক চিঠি লেখেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "লীভ্‌স্ অব্ গ্রাসের আশ্চর্য্য গুণ সম্বন্ধে আমি অন্ধ নহি। জ্ঞান ও বুদ্ধির এমন অপূর্ব্ব জিনিস আমেরিকায় এই নূতন প্রকাশিত হইল। * * * আপনার মহৎ জীবনের প্রারম্ভেই আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। এইরূপ প্রারম্ভ যাঁহার, তাঁহার বহির্জ্জীবনের যশোভাতি বহুদিনব্যাপী হইবেই হইবে।"

নিউইয়র্ক ট্রাইবিউনের ম্যানেজার মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে হুইটম্যান এই পত্রখানি প্রকাশ করিতে অনুমতি দেন এবং ১৮৬৬ সালে তাঁহার পুস্তকের নূতন সংস্করণে ইহা সংলগ্ন হয়। তাহার পরেই আন্দোলনের প্রকৃত আরম্ভ। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার ক্ষুদ্র লেখক পর্য্যন্ত এই পুস্তকখানির পৌরুষত্বে, পবিত্রতায় এবং গণতন্ত্র-মূলক ভাবে নিজকে অপমানিত বিবেচনা করেন! এমনি একটা হৈ চৈ উপস্থিত হইয়াছিল যে, প্রকাশক আর ইহাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু প্রথম হইতেই ইউরোপ ও আমেরিকার কতগুলি দূরদর্শী মহাত্মা ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যাহা হৌক এইরূপ বিবাদ, বিসম্বাদ ও বিদ্রূপের মধ্যেও অটল ও নীরব রহিয়া তিনি সেসেসন যুদ্ধের (Secession war) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রুকলিনে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে কয়েকটি আহত সৈন্যের শুশ্রূষার ভার লইয়া তিনি ওয়াসিংটনে গমন করেন। সেই খানে তিন বৎসর থাকিয়া প্রতিদিন যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষের আহত সৈন্যদিগকে যত্ন লইবার সময় সৈনিক হাঁসপাতালের বীভৎস দৃশ্য তাঁহাকে মর্ম্মাহত করে।

১৮৬৫ সালে একটি হাস্যকর ঘটনা ঘটে। সরকারী একটি কেরাণীগিরি তাঁহার ভাগ্যে জুটে—কিন্তু সেক্রেটারী সাহেব অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে বরখাস্ত করেন, অপরাধ; তিনি না কি একখানা অশ্লীল পুস্তকের রচয়িতা।

১৮৭৩ সালে তিনি পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত হন। সেই বৎসরেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার বুকে দারুণ আঘাত লাগে।

তার পর মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তিনি ক্যামডেনে (Camden) যাইয়া অবস্থিতি করেন। এই খানে তাঁহার উপর দিয়া স্বাস্থ্য ও অদৃষ্টের নানা বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়। কিন্তু তাঁহার যশ

ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময় কতিপয় বন্ধু তাঁহাকে অর্থসাহায্য করেন। তারপর ১৮৯২ খৃীঃ অব্দের ২৬শে মার্চ্চ হুইট্‌ম্যান ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া যান।

জে, এ, সাইমণ্ডস্‌ (J. A. Symonds) সাহেব বলিয়াছেন, "হুইট্‌ম্যানের জীবনের শেষ বিশবৎসর বৃথায় নষ্ট হয় নাই। তাঁহার সমস্ত রচনায় তিনি যে একজন মৌলিক কবি, ইহা অক্ষয়রূপে প্রচারিত হইয়াছে।"

(২)

হুইট্‌ম্যানের জীবনী সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এখন তাঁহার গ্রন্থসম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

পুস্তকলেখাই হুইট্‌ম্যানের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—মানুষের জীবন্ত প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা।—

"Comerado, this is no book,
Who touches this, touches a man."
(বন্ধুবর, পুঁথি মোর নহে এ'ত নহে,
মানুষ পরশ করে, পরশে যে এ'রে।)

তাঁহার লীভস্‌ অব্‌ গ্র্যাসে (Leaves of Grass) বিজ্ঞতার পরিচয় যথেষ্ট আছে। ইহার বর্ণনাসৌন্দর্য্য, বাস্তবিকতা, কোমল সহানুভূতি, আধ্যাত্মিক-দৃষ্টি ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী সাহিত্যে অতুলনীয়। লোকে বলে, হুইট্‌ম্যান মানুষের কবি, আমেরিকার কবি, স্বাধীনতার কবি এবং প্রজাতন্ত্রের কবি—ভবিষ্যদ্বক্তা। এক কথায় তিনি স্বাস্থ্যের—শারীরিক, নৈতিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের—কবি।

এ কথা সত্য, অনেক সময় তিনি পৃথিবীর দুঃস্থ, রুগ্ন, ঘৃণ্য এবং বহিষ্কৃতদিগের সম্বন্ধে করুণা ও বিপুল সহানুভূতির কথা বলিয়াছেন, কেন না তাঁহার ধারণা ছিল—কোন কারণে এই সকল ব্যক্তির উন্নতি-পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু হয়ত এক সময়ে আবার তাহারা বিজ্ঞ ও সুস্থ হইয়া উঠিতে পারিবে। স্বাস্থ্যের লক্ষণ দিয়াই তিনি পৃথিবীর সমস্ত বস্তু বিচার করিতেন। বিশ্বের মূলীভূত নিয়মই হইতেছে—স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যই মহামূল্য দান, এবং মানবের সম্মুখে তাহাই তিনি আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। "আমি বলি, পাঠকের চিত্তরঞ্জন, তাহাকে পবিত্র ও মনোরম কিছু প্রদান করা, অথবা কোন বৃত্তি, মনুষ্য বা কোন ঘটনার অঙ্কনই কবিতা বা অন্যান্য রচনার প্রধান কার্য্য নহে। কিন্তু তাহাদের প্রধান কার্য্যই পাঠকের অন্তঃকরণকে সবল ও নির্ম্মল মনুষ্যত্ব এবং ধর্ম্মে পরিপূর্ণ করিয়া তুলা এবং তাহার হৃদয়কে সুন্দর করা।"

অনেক বিজ্ঞানবিদ্‌ ও নীতিবিদ্‌ নিয়মপালনের যে সব বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছেন, হুইট্‌ম্যান স্বাস্থ্যের অর্থে সে সব বুঝিতেন না। গ্রীকেরা যেমন সংযত ও সবল জীবনের সমন্বয় (harmony) ধারণা করিয়াছিল, তাঁহার ধারণাও ছিল অনেকটা সেইরূপ।

স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার বিশেষ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ তাহার নিন্দাবাদও করিয়াছেন। কিন্তু হুইটম্যান নিজের উদারতা, সারল্য এবং সহিষ্ণুতার ভাব কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। পৃথিবীতে কিছুই সাধারণ নহে, কিছুই অশুচি নহে, এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করিয়াই তিনি চলিতেন। আজকালকার সমাজ যেমন সব বিষয়েই জুয়াচোর—পাপকে সর্ব্বসাধারণের কাছে বক্তৃতায় নিন্দা করে, কিন্তু গোপনে তাহাকেই প্রশ্রয় দেয়, অন্তরে পচা দুর্গন্ধ, বাহিরে চাক্‌চিক্য—হুইট্‌ম্যানের

কাছে এ সব জুয়াচুরি ছিল না। যাহা বলিবার তাহা তিনি সরল ভাবেই বলিতেন। সেই জন্য তিনি যখন কৃত্রিমতার মলিন অবগুণ্ঠন তুলিয়া মানব-শরীরের পবিত্রতার গান করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে আমরা কিছুতেই নিন্দা করিতে পারি না বরং প্রশংসাই করি।

তাঁহার প্রেমবাদের সঙ্গে সাহচর্য্যবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই মতবাদ লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার কারণ সমস্ত মতের মধ্যে এইটাই প্রচলিত রীতির বিশেষ বিরুদ্ধ। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকে বন্ধুত্বকে যে চোখে দেখে, সেই পারস্পরিক সুবিধার ক্ষেত্র বলিয়া হুইট্‌ম্যান বন্ধুত্বের জয় ঘোষণা করেন নাই—পরন্তু পুরুষের সঙ্গে পুরুষের, স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্ত্রীলোকের যে প্রবল জীবনান্তস্থায়ী, সর্ব্বগ্রাসী ভালবাসা জন্মিতে পারে, তাহাই তাঁহার ঘোষণার বিষয়। তিনি সম্পূর্ণ পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়াছিলেন যে, বন্ধুত্ব অন্যান্য সমস্ত প্রকার স্নেহের মত লৈঙ্গিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ-ক্ষেত্রে যাহা ঘটে, বন্ধুত্বের সময়েও যে তাহাই ঘটিতে পারে, তিনি সরলভাবে তাহাই আমাদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, স্নেহের ভিত্তি যখন লৈঙ্গিক, ইহার প্রকাশও তদ্রূপই হইবে!

প্রজাতন্ত্র-শাসন সম্বন্ধে তাঁহার যত কিছু ভাব ছিল, নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁহার বন্ধুত্বের এই মতবাদই সে সকলের ভিত্তি। "For you O Democracy" নামে যে কবিতাটি আছে, নিম্নে তাহার আংশিক অনুবাদ দেওয়া গেল। পাঠক দেখিবেন, হুইট্‌ম্যান বন্ধুত্বকে কি চোখে দেখিতেন।—

"গঠিব এমন দেশ অদ্রব কঠিন,
গঠিব এমন জাতি উজ্জ্বল শোভন—
দিন-দেবতার চোখে নিতান্ত নবীন,
এমন চুম্বকসম স্বর্গীয় ভুবন,
সে কেবল বন্ধুদের প্রণয়ের বলে,
যে প্রণয় জীবনের প্রান্ত চুমি চলে।
মার্কিণের মাঠে ঘাটে করিব রোপণ
বন্ধুত্বেরে তরুসম সুনিবিড় করি।
গঠিব নগরী হেন—বিভাগ-সাধন
অসম্ভব হবে যার, গলাগলি ধরি
চলিবে যা বন্ধুত্বের বলে চিরদিন,
যে বন্ধুত্ব নহে কম—পুরুষকঠিন!"

ডেমোক্রেসি (প্রজাতন্ত্র) সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত কবিতাই এইরূপ আবেগময় বন্ধুত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহা হইলেও ডেমোক্রেসি—এই কথাটায় তিনি কি বুঝিতেন, তাহা বড় স্পষ্ট নহে। কারণ তিনি যে সংগ্রামশীল ব্যক্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি যে প্রবলভাবে বুঝাইয়াছেন—প্রত্যেক ব্যক্তির স্বত্ব তাহার নিজের দ্বারাই শাসিত, অন্যের দ্বারা নহে, সেই সকলের সঙ্গে তাঁহার ডেমোক্রেসির মিল কোথায়?

কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে যে বিরোধ আপাতদৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয়, তাহা বাস্তবিক সত্য নহে। হুইট্‌ম্যান দেখিয়াছিলেন যে জাতি-সংগঠনের আবশ্যকতা আছে, এবং সেখানে জাতীয় উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতেই হয়। বর্ত্তমান সমাজের প্রকৃতি যে যান্ত্রিক, ইহা কিন্তু তিনি রাজনৈতিক স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বরূপে বিবেচনা করিতেন। তাই ডেমোক্রেসি তাঁহার মতে ছিল সামাজিক। কিন্তু

ব্যক্তিত্বকে তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিতেন। তিনি বলিয়াছেন—"বিশ্বের সমস্ত সিদ্ধান্তই একটি ব্যক্তির দিকে চালিত, এবং সেই ব্যক্তিই তুমি!"

এই কথাটায় কবির ধর্ম্ম-ভাব অনেকটা বুঝা যায়। হুইট্‌ম্যানের বিজ্ঞত্ব ও গভীরত্ব ধর্ম্মের মধ্যেই। সর্ব্বাপেক্ষা এই কথাই তাঁহার পক্ষে বেশী খাটে যে, তিনি "অদৃশ্যকে আনন্দের সহিত অভিবাদন করিয়া থাকেন।"

যে আশাবাদ (optimism) জ্ঞানগভ গূঢ় তত্ত্বের উপর স্থাপিত, সেই আশাবাদই তাঁহার ধর্ম্ম, এবং তাহাই তাঁহার সমস্ত লেখা ও জীবন চালিত করিয়াছে।

হুইট্‌ম্যান যে সবল, সবদিকে পরিপূর্ণ, তিনি যে আশাবাদী, তিনি যে জগৎকে রহস্যময় দৃষ্টিতে দেখিতেন, এ কথা কোন নিরপেক্ষ পাঠকই সন্দেহ করেন না। পৃথিবীর ঘটনা যেরূপ ভাবে ঘটে, তাহা তিনি রীতিমত বুঝিতেন। পৃথিবীর মধ্যে যে নৈরাশ্য আছে, তাহাও তিনি পরিষ্কার জানিতেন, তথাপি তাঁহার বিশ্বাস ছিল—প্রত্যেকে চিরকাল ধরিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। অচিন্ত্যের সম্বন্ধে কোন অস্পষ্ট বিশ্বাস নহে, রহস্যময় সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত কোন নাটকীয় আনন্দ নহে—কিন্তু সামান্য একটা জিনিসেও রহস্য আছে, এই বিজ্ঞ ধারণাই তাঁহার বিশেষত্ব। এই জটিল জগৎ যে জড়বাদের কোন বাঁধা নিয়মের দ্বারা বুঝা যায় না, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু জড়বাদ বলিয়া তিনি যে কোন জড়বাদীকে হীন করিয়াছেন, তাহা নহে। আমাদের মন যে জড় হইয়া যাইতেছে—প্রথাজনিত ধর্ম্মের ব্যবসা-মূলে যে নাস্তিকতা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহারই বিরুদ্ধে তাঁহার যত সংগ্রাম। অর্থগৃধ্নু লোভাতুর পৃথিবী যাহাদিগকে "কর্ম্মী" বলিয়া আখ্যা দেয়, যে সমস্ত কর্ম্মী কোন রূপ অনাবশ্যক বাক্য সহ্য করিতে পারেন না, হুইট্‌ম্যান তাঁহাদিগকে বড় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এ কথা সত্য, তিনি জড়ভাবাপন্ন পুরোহিত-কুলকেও অন্য চক্ষে দেখেন নাই, কিন্তু সে কৃপা-কটাক্ষ দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ আত্মার প্রতি—সমাজ ও ধর্ম্মের কুসংস্কারে খর্ব্বিত ব্যক্তিত্বের প্রতি। তবে নীচতা, মিথ্যাচার, বাস্তবের জন্য কপট ভীতি কিম্বা অজ্ঞাতের জন্য সানুনয় কাকুতি এ সমস্তকে তিনি কৃপার চক্ষে দেখেন নাই, বরং ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হুইট্‌ম্যান আশাবাদী ছিলেন। তাহা হইতে ইহা যেন কেহ মনে না করেন, তিনি অলস ব্যক্তির মত ভাবিতেন "পরিণামে সব জিনিষই ভাল হইয়া আসিবে।" তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়তর ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত। ডারুইন সাহেবের প্রসিদ্ধ পুস্তকগুলি প্রকাশিত হওয়াতে অনেকেরই ক্রমোন্নতিবাদ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু সেই পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই হুইট্‌ম্যান একজন প্রগাঢ় ক্রমোন্নতি-বাদী ছিলেন। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর মধ্যেই একটা যান্ত্রিক সম্বন্ধ আছে এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে প্রতিনিয়ত একটা পরিণতি ও পরিবর্ত্তন চলিতেছে, এ কথা তিনি খুব দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করিতেন। কেহ কোন পূর্ব্ব সূচিত আদর্শ অনুসারে গঠিত হইতেছে, ইহা তিনি মনে করিতেন না, কিন্তু প্রত্যেকেই অপরিবর্ত্তনীয় অসীম পরিণতির দিকে চলিতেছে, ইহাই তিনি মনে করিতেন। সেই পরিণতি সম্বন্ধে উত্তম, অধম, উচ্চ, নীচ প্রভৃতি বিভেদ-চিহ্ন খাটে না, কেবল উন্নতি

সম্বন্ধে ডিগ্রির একটা তারতম্য থাটে। "আমার গান" নামক কবিতাটায় তাঁহার এই বিশ্বাসের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়।

এখন আমরা হুইট্‌ম্যানের Mystic * teaching বা গূঢ় রহস্যবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। তাঁহার এই মত নূতন নহে। পৃথিবীর বড় বড় দার্শনিক বহুদিন হইতেই আমাদিগকে এই রহস্য শুনাইয়া আসিতেছেন। পার্থক্য এই যে, হুইট্‌ম্যান সেই মতবাদকেই বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া এবং ভাষার অসামান্য তেজের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন।

আমরা জানি, প্রত্যেক জাতির পণ্ডিতগণ দেখাইতে চেষ্টা করেন—তাঁহাদের জাতি দেবকুলোদ্ভূত। বহু পূর্ব্বে হিব্রু ধর্ম্মশাস্ত্রের অখ্যাতনামা শিক্ষকটি বলিয়াছিলেন, "তোমরা সকলেই ভগবান"। ন্যাজারেথের বিনম্র সাধুটিও "আমি এবং আমার পিতা (পরমেশ্বর) এক" এই কথা বলিয়া সমসাময়িক লোকদিগকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আর হুইটম্যানও অভ্রান্তভাবে, তেজের সহিত বর্ত্তমানযুগে ঘোষণা করিয়াছেন, "প্রত্যেক প্রাণী আপাতদৃষ্টিতে নীচ অথবা অনুন্নত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—কিন্তু কালে তাহার অন্তর্নিহিত সুপ্ত দেবত্ব জাগ্রত হইয়া তাহাকে পরমৈশ্বর্য্যে বিভূষিত করিবেই।"

"I have said that the soul is not
more than the body,
And I have said that the body is
not more than the soul,
And nothing, not God, is greater
to one than one's self is"
etc.

অর্থাৎ—"আমি বলিয়াছি—আত্মা শরীরছাড়া আর কিছুই নহে, এবং শরীরও আত্মাছাড়া আর কিছু নয়। অধিকন্তু মানুষের আত্মা ছাড়া মানুষের কাছে আর কিছুই—এমন কি ঈশ্বরও—শ্রেষ্ঠ নহে।"

হুইটম্যানের সেই অদ্ভুদ কবিতাটি—"Chanting the Square Deific," তাহাতে এই একই ভাব পুনঃ পুনঃ প্রকটিত। সেই কবিতাটির স্থানে স্থানে এইরূপ কতগুলি পদ আমরা দেখিতে পাই, যথা—"আমিই জিহোবা, আমিই ব্রহ্ম, এবং আমিই স্যাটুর্নিয়াস্‌। আমিই স্নেহ—আমিই আনন্দময় ঈশ্বর, এবং আমিই সকলমঙ্গলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান সয়তান।"

ইহাই হুইটম্যানের রহস্য-বাদ। অবশ্য ইহারই জন্য অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া গালি দিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—যাঁহারা গালি দেন, তাঁহারা প্রচলিত রীতি-নীতি, বিকাশবিমুখ ভাব-বন্ধন প্রভৃতি হইতে বিমুক্ত হইতে অসমর্থ। তাঁহাদের দূরদৃষ্টি নাই—উপরে উঠিবার শক্তি নাই। অতএব তাঁহাদের মন্তব্যকে আমরা মূল্যবান বলিয়া মনে না করিলেও পারি!

যাহাহোক, পূর্ব্বোদ্ধৃত রহস্যবাদ হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে হুইটম্যানের আধ্যাত্মিকভাবের মূল কথাই এই যে—"বিশ্বের এবং বিশ্বের প্রত্যেক বিভিন্ন অংশের প্রকৃতিই স্বর্গীয়।"

সুতরাং এইরূপ একটি নির্ভিক মতবাদকে "পাগলামী" বলিয়া উড়াইয়া দিতে আমরা নিতান্তই সঙ্কোচ বোধ করি।

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

* লেখক যাহাকে "গূঢ় রহস্যবাদ" বলিতেছেন আমরা পৌষ সংখ্যায় তাহার সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য "মিষ্টিসিজম" (ভাবুকতা বা অতীন্দ্রিয়তা বা অনন্তবোধ) এর পার্থক্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় দেখাইয়াছি—সম্পাদক।

লালা ও তাহার কার্য্যকারিতা

আমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছি যে, চর্ব্বণের সময় খাদ্যের সহিত একটা আঠাল-দ্রব্য লাগিতে থাকে, ইহাকেই আমরা "লালা" বা চলিত কথায় "থুথু" বলিয়া থাকি। এই লালার উপকারিতা সম্বন্ধে আজ দুই একটি কথা বলিব।

লালার উৎপত্তি :—কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই আমরাও আজ ইহার উৎপত্তির সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। মুখ-গহ্বরের কতকগুলি গ্রন্থি (glands) নিঃসৃত রসকে লালা বলা হয়। মনুষ্যের মুখগহ্বরের এক এক পার্শ্বে তিনটি করিয়া সর্ব্বসমেত ছয়টি গ্রন্থি আছে। গ্রন্থিগুলির অবস্থান অনুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে যথা :—কর্ণগ্রন্থি (Parotid), হনুগ্রন্থি (Submaxillary), জিহ্বাগ্রন্থি (Sublingual)। সকল গ্রন্থিগুলিকে এক কথায় লালাগ্রন্থি (Salivary glands) বলা হয়। প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত রস মুখগহ্বরে আসিবার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী বা নালা আছে।

কর্ণগ্রন্থি-প্রণালী দ্বিতীয় "কষদাঁতে"র (molar) পার্শ্বে, হনুগ্রন্থি ও জিহ্বাগ্রন্থি-প্রণালী জিহ্বার নিম্নদেশে অবস্থিত। প্রত্যেক গ্রন্থিরই ভিন্ন ভিন্ন রসনিঃসারক স্নায়ু আছে। কোন প্রকারে এই স্নায়ু উত্তেজিত হইলে লালা নিঃসৃত হইতে থাকে।

লালার স্বধর্ম্ম ও উপাদান :—লালার কোনও বিশিষ্ট বর্ণ নাই, তবে ইহা একেবারে স্বচ্ছ নহে; ডিম্বের শ্বেতভাগের বর্ণ যেরূপ লালার বর্ণও অনেকটা সেইরূপ, তবে সচরাচর যাহাকে আমরা থুথু বলি, তাহাতে বায়ু-কণিকা (air-bubbles) থাকার জন্য অনেক সময় "সাদা" দেখায়। দাঁতের গোড়ায় লবণ বা পিপারমেণ্ট দিয়া অথবা Glacial acetic acid এর বাষ্প মুখগহ্বরে টানিয়া লইলে অতি সহজেই প্রচুর পরিমাণে লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। এইরূপে নিঃসৃত লালা কোনরূপ কাচের পাত্রে একত্রিত করিয়া ইহার বর্ণ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। Litmus কাগজের সাহায্যে লালা হইতে আমরা ক্ষার-প্রতিক্রিয়া (alkaline re-action) পাইয়া থাকি, কিন্তু Phenolpthaleine ইহার অম্ল-প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করিয়া থাকে। জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০০ ধরিলে লালার আপেক্ষিক ১০০৩। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে লালাতে কতকগুলি ডিম্বাকৃতি কোষ ভাসিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলিকে কেহ কেহ লালা-কণিকা (salivary corpuscles) বলিয়া থাকেন, আবার কাহারও কাহারও মত যে এইগুলি বিশিষ্ট আকার প্রাপ্ত শ্বেতরক্ত-কণিকা মাত্র। ইহা ছাড়া কতকগুলি মুখ-গহ্বরের ঝিল্লীর কোষও দেখিতে পাওয়া যায়। লালার প্রধান উপাদানের মধ্যে (১) আঠাল পদার্থ mucin, (২) ptylin নামক শ্বেতসারঘ্ন (amylolylic) (৩) দ্রাক্ষাশর্করা কিণ (maltase) (৪) অম্লসার জাতীয় albumin এবং (৫) কতকগুলি লবণই প্রধান। লবণের মধ্যে ক্ষার ধাতুর লবণেরই আধিক্য দেখা যায়

(Sodium Chlorido, Potassium Sulphate, Sodium Carbonate, Calcium Carbonate ও Phosphate) ইহা ব্যতীত Sulphocyaniteও দেখা যায়। যাঁহারা ধূমপান করেন, তাঁহাদের লালায় এই Sulphocyanie যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এই লালায় দুই এক ফোঁটা Hcl. দিয়া অল্প Ferric Chloride দিলেই লাল রং হয়। বালকধূমপায়িগণ সাবধান! ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই আপনাদিগকে বিজ্ঞানের কবলে আনা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া লালাতে যথেষ্ট অঙ্গারাম্ল বাষ্পও থাকে। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষকের একটি বিশ্লেষণ তালিকা দেওয়া গেল।

বিশ্লেষক · মনুষ্যের মিশ্রিত লালার উপাদান প্রতি হাজার ভাগে

	জল	মোট কঠিন পদার্থ	অদ্রবনীয় পদার্থ	দ্রবীয় জৈবিক পদার্থ	Pot Sulpho-cyanite	অম্ল লবণ
১। Berzelius	৯৯২.৯	৭.১	১.৪	৩.৮	—	১.৯
২। Jacubowitsch	৯৯৫.১	৪.৪৮	১.৬২	১.৩৪	০.০৬	১.৪২
৩। Frerishs	৯৯৪.১	৫.৯	২.১৩	১.৪২	০.১০	২.১৯
৪। Tiedmann ও Gmelin	৯৮৮.৩	১১.৭	—	—	—	—
Herber	৯৯৪.৭	৫.৩	—	৩.২৭	—	১.০৩
Hammer teacher	৯৯৪.২	৫.৮	২.২	১.৪	০.০৪	২.২

Jacubowitsch মনুষ্যলালার ভস্মের উপাদান (প্রতি ১০০০) নির্ণয় করিয়াছেন :—

মোট কঠিন পদার্থ	১.৮২
ফস্ফরিক এসিড	০.৫১
সোরা	০.৪৩
চুণ	০.০৬
ম্যাগনেসিয়া	০.০১
ক্ষারযুক্ত ক্লোরাইড	০.৮৪

উপাদানের কথা ত শেষ হইল। এখন এই উপাদানগুলির স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে mucin-এর অবস্থিতিই লালার "আঠাল" হইবার কারণ। লালার প্রধান উপাদান শ্বেত-সারম্ন কিণ ptylin. অধিকাংশ জন্তুর লালাতেই ptylinএর অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তবে শস্যভোজী জন্তুর লালাতেই ইহা অধিকমাত্রায় পাওয়া যায়। মনুষ্যের কর্ণ ও হনু উভয় গ্রন্থি নিঃসৃত লালায় এই শ্বেতসারঘ্ন পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। জন্মের পর কেবল কর্ণ-গ্রন্থিতেই ইহা পাওয়া যায়, তবে দুই মাস পরে ইহা হনু-গ্রন্থি হইতেও নিঃসৃত হইতে থাকে। Ptylinএর কার্য্য-কারিতা এই যে, শ্বেতসারের অদ্রবণীয় শালি-জাতীয় (storch) দ্রব্যকে দ্রবণীয় শর্করায় পরিণত করা। ইহার সহিত মিশিয়া শালি-জাতীয় দ্রব্যের বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকে এবং নানা প্রকার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পর শ্বেত শর্করা (maltose) এ পরিণত হয়। পরীক্ষা-গারে কখনও কখনও Dextrose বা দ্রাক্ষা শর্করার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইহার কারণ

যে লালায় দ্রাক্ষা শর্করা কিণ (maltose) নামক অন্য একটি শ্বেতসারময় পদার্থ আছে; ইহা শ্বেতসারকে দ্রাক্ষা-শর্করায় পরিণত করে। তাহা হইলে মোটের উপর দাঁড়াইতেছে এই—লালার দ্বারা শ্বেতসারের কিয়দংশ শ্বেতসার-শর্করা ও অতি অল্পাংশ Dextrin নামক অপর একটি দ্রব্যে পরিণত হয়। এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, এইরূপ পরিবর্ত্তন কিরূপে ঘটে? অবশ্যই অনেকগুলি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পর ইহাই ইহার শেষ পরিণতি। পরীক্ষাগারে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বেশ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। আমরা সকলেই জানি যে শালিজাতীয় দ্রব্যের সহিত আইডিন দিলে ব্লু রং হয়। এক্ষণে আমরা যদি একটি Test-tubeএর ভিতর কিছু শালিজাতীয় দ্রব্যের উপর প্রচুর পরিমাণে লালা দিই এবং ইহাকে ৪০° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে রাখিয়া দিয়া মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে ইহার যথেষ্ট বিকার হইতেছে। অল্পক্ষণ পরে আইডিনের সহিত ব্লু রং না হইয়া লাল রং হয়। ইহাকে এক্ষণে crytho-dextrine বলা হয়। আরও কিয়ৎক্ষণ পরে ইহা maltose ও achro-dextrine নামক পদার্থে পরিণত হয়। তখন ইহার সহিত আইডিনের সংযোগে কোনও প্রকার বর্ণ-বিকার ঘটে না।

কিন্তু শর্করা শ্বেতশর্করারূপে রক্তমধ্যে শোষিত হয় না। রক্তের মধ্যে না পৌঁছাইলে এই শোষণ-কার্য্য আরম্ভ হয় না। অন্ত্রের মধ্যে maltose বা দ্রাক্ষাশর্করা কিণের দ্বারা ইহা প্রথমে দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হয় এবং কেবল তখনই রক্তের মধ্যে শোষিত হইতে থাকে।

উত্তাপের তারতম্যে Ptylinএর কার্য্যকারিতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ৪০°Cতে ইহার কার্য্যকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু উত্তাপ যত মৃদু হইতে থাকে ইহার কার্য্যকারিতারও হ্রাস হইতে থাকে। 0°C ইহা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে তবে নষ্ট হয় না। কিন্তু ৪০°C বেশী উত্তাপে ইহার শুধু যে কার্য্যকারিতা হ্রাস হইতে থাকে তাহা নহে, ৬৫°-৭০° ডিগ্রির মধ্যে ইহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

এই ত গেল উত্তাপের কথা। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে লালা ক্ষার-প্রতিক্রিয়া-সম্পন্ন, এজন্য অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের মত যে ইহা ক্ষার-প্রতিক্রিয়া-সংযুক্ত ক্ষেত্রে অধিক কার্য্যকারী। সম্প্রতি আমেরিকার বিখ্যাত অধ্যাপক Chittendon সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে ক্ষার বিবর্জ্জিতক্ষেত্রে ইহা অধিকতর কার্য্যকারী। ক্ষারের আধিক্য হইলে ইহার স্বধর্ম্ম লোপ হইয়া থাকে। তবে অতি অল্পমাত্র অম্লের সংযোগে ইহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। Chittendon বলেন এমন কি ·০০৩ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অস্তিত্বে ইহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

এক্ষণে কথা হইতেছে তাহা হইলে পরিপাক হিসাবে লালার মূল্য কোথায়? আমরা জানি যে পাকস্থলীতে যথেষ্ট হাইড্রোক্লোরিক এসিড আছে কাজেই সেখানে লালামিশ্রিত খাদ্য পৌঁছিবামাত্র ptylinএর কার্য্যকারিতা লোপ পাওয়া সম্ভব। তাহা ছাড়া চর্ব্বণকালে অতি অল্পই পরিপাক হইয়া থাকে। পরীক্ষাগারে দেখা যায় যে, লালাদ্বারা শালিজাতীয় খাদ্যের পরিপাক হইতে ১½—২½ ঘণ্টা সময় লাগে।

পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, পাকস্থলীতে খাদ্য পৌঁছিবামাত্র ptylin একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। Grutzner

Cannon প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি প্রমাণ করিয়াছেন ইহা যে পাকস্থালীর বাম অংশে অনেকক্ষণ পাচকরসের সহিত মিশ্রিত না হইয়া অবস্থান করে। কাজেই লালার কার্য্যকারিতা এ অংশে প্রায় এক বা দেড় ঘণ্টা চলিয়া থাকে।

সিদ্ধ শালিজাতীয় খাদ্যের উপর Ptylin এর প্রভাব অত্যন্ত অধিক। কিন্তু "কাঁচা" বা অসিদ্ধ দ্রব্যের উপর কোষাত্মক (cellulose) থাকায় ইহা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবার সুবিধা পায় না।

পরিপাক হিসাবের মূল্য ছাড়িয়া দিলে লালা খাদ্যের সহিত মিশিয়া ইহাকে অতি সহজে "গিলিবার" উপযোগী করিয়া দেয়। অনেক সময় কঠিন পদার্থকে অপেক্ষাকৃত নরম করিতে সাহায্য করে। লালা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। ভবিষ্যতে অন্যান্য পাচক রসের কথা বলিবার বাসনা রহিল।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাম্যস্বাস্থ্যে কীটাণুপাল

পল্লীগ্রামের অধিকাংশ অঞ্চলে জনমণ্ডলীকে আজীবন আমরা প্রধানতঃ দুইটী ব্যারামের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করিতে দেখি। ইহাদের একটী ওলা, অপরটী ম্যালেরিয়া। আর একটী ব্যারামের কথা শোনা যায়; ইহার চিহ্ন আমাদের দেশের কোন কোন স্থানে আছে; বিশেষতঃ কাশ্মীরে। কিন্তু ইহার তত্ত্বানুসন্ধান সম্বন্ধে বেশী খোঁজ খবর লওয়া হয় বলিয়া মনে হয় না। আমেরিকা ও ইউরোপে এটী নামজাদা। ইহার নাম আন্ত্রিকজ্বর বা Typhoid fever; আমেরিকায় সময় সময় এই জ্বরের প্রকোপ থাকিলেও ইহাতে মৃত্যুর সংখ্যা কম। বপ্পুতত্ত্বের একনিষ্ঠ জ্ঞানিগণ সতর্কতা ও ধৈর্য্য সহকারে বিবিধ গবেষণার ফলে ইহার উচ্ছেদ সাধনের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন; আর রাশীকৃত পুস্তক লিখিয়া জনসাধারণের সমক্ষে হাজির করিয়া আসিতেছেন। জনসাধারণও তাঁহাদের উপদেশ বেদবাণীস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ও তদনুসারে কার্য্য করিয়া আশাতীত ফললাভ করিয়া থাকে। কাজেই এখানে এ জ্বরের ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। আর আমাদের দেশকে এ সকল দেশের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে হতাশ্বাস হইতে হয়; কিন্তু হতাশ্বাস হইলে কি আর চলে! আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে আর স্বাস্থ্যের মহাভারত রচনা করিয়া গৃহে গৃহে বিতরণ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া আজ একটী কাণ্ডের একটী অধ্যায় লিখিতে বসিয়াছি।

এই তিন ব্যারামই কীটাণুপাল কর্ত্তৃক স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকে—ম্যালেরিয়া কোন কোন মশক কর্ত্তৃক আর ওলা ও আন্ত্রিকজ্বর সাধারণ গৃহমাছি, কিম্বা অন্যান্য মাছি কর্ত্তৃক।

নগর ও পল্লী

এটী সত্য যে ম্যালেরিয়া ও ওলা উভয়ই বড় বড় নগরে উপস্থিত হইয়া থাকে; সেই জন্য তাহারা প্রায়ই পল্লী বা গ্রাম্য ব্যারাম বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যালেরিয়াকে ভৈষজ্যবিশারদ ব্যক্তিবর্গ পল্লী ব্যারাম বলিয়া সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কেননা, সাধারণতঃ পল্লীতেই স্রোতবিহীন, বদ্ধ, উন্মুক্ত নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্রায়তন স্থির জলে কম বা বেশী স্থায়ীভাবে ম্যালেরিয়া-বাহী মশক উত্তরোত্তর প্রসব করিতে থাকে; ইহা পল্লীগ্রামের প্রায় সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু নাগরিক অবস্থা তদনুরূপ না হওয়ায় মশকদল জলাভাবে বসতি বিস্তার করিতে পারে না। অতীব শুষ্কস্থান এবং কোন কোন মালভূমি ইহাদের উপনিবেশ স্থাপন পক্ষে অসুবিধাজনক। যেখানে নির্দ্দিষ্ট বর্ষাঋতু আছে কিম্বা খাল কাটিয়া জমি সিক্ত করা যায়, সে অঞ্চল শুষ্ক হইলেও মধ্যে মধ্যে ইহাদের বৃদ্ধি দেখা যায়। জল-সেচনার্থ খাত মশকের সুন্দর সূতিকাগার। যাহারা পল্লী কিম্বা উপনগর হইতে ম্যালেরিয়ার বীজ লইয়া নগরে আগমন করে, সাধারণতঃ সেই সকল লোকের নিকট ম্যালেরিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি কোন কোন নগরের আশে পাশে জলাভূমি থাকে, সেখানেও ইহার অস্তিত্ব সম্ভবপর। আবার কোন কোন নগর ম্যালেরিয়া অঞ্চল হইতে প্রবাহিত নৈশ সমীরণ দ্বারা আক্রান্ত হয়। যশোহর ম্যালেরিয়া রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিতে না করিতে কলিকাতা নগরীর কতিপয় স্থানে ইহার প্রকোপ হয়; কেন না রাত্রিকালে স্থলভাগ সমুদ্রের জলরাশি অপেক্ষা অধিক শীতল হয় বলিয়া, স্থল হইতে সাগরাভিমুখে অর্থাৎ দক্ষিণাভিমুখে বায়ু প্রবাহিত হয়।

ওলাউঠার স্থান

যে সকল নগরে টবের জল সরবরাহ হইয়া থাকে, যদি সেই জলে আবর্জ্জনারাশির গন্ধ (Trace) থাকে এবং মলমূত্রাদির লেশ থাকে, তাহা হইলে সেই সকল নগর বক্ষ্যমান আধার হইতে ওলায় আক্রান্ত হইয়া থাকে: (ক) দূষিত পল্লীদুগ্ধ; (খ) অপেক্ষাকৃত কম স্বাস্থ্যকর পল্লী হইতে পূজা ও গ্রীষ্মাবকাশান্তে জনসমাজের প্রত্যাবর্ত্তন; (গ) এবং যে সকল লোক এই আধারদ্বয়ের যে কোনটী হইতে ওলার বীজ সংগ্রহ করিয়াছে, সেই সকল লোকের দেহবিনিঃসৃত পদার্থ নিচয়ের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিবার যন্ত্রের অভাব।

কিন্তু পল্লীগ্রামের অবস্থা ভিন্ন ধরণের। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক ঘরেই কূপের বন্দোবস্ত থাকে; এই কূপোদকই যাবতীয় কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। লোকেরা নদীর জলে শৌচ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে; কোথাও মলমূত্র খোলা মাঠে, কোথাও গর্ত্তে, কোথাও পাত্রবিশেষে সঞ্চিত হইতে থাকে; ওলা-রোগের বীজ মলমূত্রের সঙ্গে বহির্গত হয়। এই মলমূত্র দুর্দ্ধর্ষ বীজ ধারণ করতঃ কত প্রকারে নদী, নালা, খাল, বিলের জলের সংস্পর্শে আসিয়া সেই সব জল দূষিত করিতে পারে। অনেক সময় রোগীর মলমূত্র-বমনাদি নদীর জলে বরাবর নিক্ষেপ করা হয়। এই জল বাহিত বীজ মনুষ্যের পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিম্বা এই জল দোহন-চোঙ্গার সংস্পর্শে আসিয়া দুগ্ধকে দূষিত করিতে পারে, ভূনিম্নস্থ নর্দ্দমার সাহায্যে

বরাবর কূপে বাহিত হইতে পারে; কিম্বা সেই সকল সঞ্চিত মলমূত্রের উপর মাছি অবতরণ করিয়া পরে অবাধে গৃহের খাদ্য-সামগ্রীর মধ্যে গাত্রসংলগ্ন বীজ ঢালিয়া দিতে পারে কিম্বা রোগোৎপাদনকারী পূতিবাষ্পো-দ্গম লইয়া সমীপবর্ত্তী গৃহের রান্নাঘরে ও থালে বসিতে পারে। পরে এই প্রকারে বীজ মনুষ্যের উদরে প্রবেশ করিয়া অগণিত ভাবে বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে আর রক্তকে জল করিয়া মানুষের সভ্যতা হরণ করিয়া লয়।

ওলা হইতে রক্ষার উপায়

ওলার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে আমাদিগকে দুইটী বিষয়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে। প্রথমটী গৃহের সুবন্দোবস্ত ও দ্বিতীয়টী সাধারণের যথোচিত পরিদর্শন। রোগীর মলমূত্রাদি সম্পূর্ণরূপে বিশোধিত করিতে হইবে কিম্বা পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, কিম্বা সুগভীর গর্ত্ত করিয়া প্রচুর চূণ দিয়া ঢাকিয়া ফেলিতে হইবে। দরজা, জানালা ও পায়খানায় তারের জাল দিতে হইবে যাহাতে ঘরে মাছি প্রবেশ করিতে না পারে। রোগীর বিছানা, বালিশ, পরণের ধুতি ইত্যাদি যত দ্রব্য সংস্রবে আসিয়াছে সবই সম্পূর্ণভাবে বিশোধিত করিতে হইবে। গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জল ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে খুব ভাল করিয়া অন্ততঃ ১০ মিনিট কাল ফুটাইয়া লইতে হইবে। দুগ্ধপান করিবার পূর্ব্বেও তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে রোগের বীজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার বীজ কেবলমাত্র মলমূত্র ও বমনের সঙ্গে বাহির হয় বলিয়া ইহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে বিশোধিত করিতে হইবে; তাহা না হইলে হয়ত ইহার বীজ বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া অন্যকে আক্রমণ করিতে পারে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টিকর দ্রব্য আহার, বিশুদ্ধবায়ু সেবন, সুস্থশরীরে থাকা আক্রমণের আশঙ্কা দূরে রাখা, এই কয়েকটী বিষয় আসিয়া পড়ে। রোগীর মৃত্যু হইলে শবদাহের সঙ্গে সঙ্গে বিছানাদি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, কিম্বা প্রভূত চূণ দিয়া খুব গভীর করিয়া পুঁতিয়া ফেলিবে। রোগীর ঘরে চূণকাম ও অন্যান্য বিশোধনকারী দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিতে হইবে। এই ত গেল গৃহের বন্দোবস্ত।

যাহাতে রোগের প্রসারণ না হয় তজ্জন্য সাধারণকে সর্ব্বদা পরিদর্শন করিতে হইবে। নিঃসৃত পদার্থগুলি যাহাতে বিশোধিত হয়, আবর্জ্জনারাশির যাহাতে সুবন্দোবস্ত হয় সেই জন্য উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। গৃহের ও বাহিরের, (দোকান, ময়রার) আহার্য্য দ্রব্যাদির বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে, কোথা হইতে রোগ আসিল তাহার ইতিহাসের অনুসন্ধান করিতে হইবে; আর রুগ্নব্যক্তিদের আরোগ্য ও মৃত্যু-সংখ্যার খতিয়ান করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে হইবে। এই কয়েক প্রকারের উপায় যদি যথাবিধি অনুসরণ করা হয়, তাহা হইলে ওলার আধিপত্যের কিছু হ্রাস হইবে, বোধ হয় জন্মের মত বিদায় লইলেও লইতে পারে। নগর ও পল্লী উভয় স্থানেই উল্লেখিত পন্থাবলী অনায়াসে অবলম্বন করা যাইতে পারে। বিসূচিকা ও ওলা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

ম্যালেরিয়া

পূর্ব্বে এক সময় ছিল, যখন জলাভূমির

পূতিগন্ধময় বাষ্প নিশ্বাসের সাহায্যে দেহে প্রবিষ্ট হইলেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ বলিয়া জানিতাম। কিন্তু আজকাল সে ধারণাটী প্রক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অন্নফলি (Anopheles) শ্রেণীর মশক-দংশনই ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান কারণ। লোহিত শোণিত কোষের মধ্যে অতীব সূক্ষ্ম পরভোজী বপুণুর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতিই মানবীয় ম্যালেরিয়ার প্রধান ও একমাত্র হেতু। এই বপুণু জান্তবসমাজের ক্ষুদ্রতম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সম্প্রদায়টী প্রোতোজী (Protozoa), কিম্বা এক—কৌষিক জন্তাবলী। যে সকল ক্ষুদ্রপ্রাণী আমীবস্ (Amoebas) বলিয়া পরিচিত এবং যাহারা জলে, সেঁতসেঁতে সৈকত-পুলিনে, পালায়, কিম্বা পরভোজীর মত অন্যান্য জন্তুর দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, তাহারা প্রোতোজীয় শ্রেণীভুক্ত। দেহের মধ্যে এই পরভোজী বিভক্ত হইয়া লোহিত শোণিতকোষ বিচ্ছিন্ন ও শোণিতসারে প্রবেশ করিয়া পুনরুৎপাদন করিতে থাকে। বিশদভাবে বলিতে গেলে, যখন মানবের রক্ত অন্নফলিশ্রেণী মশকের পাকস্থলীতে শোষিত হয়, তখন ম্যালেরিয়া-পরভোজী মধ্যে অন্তঃসত্বার লক্ষণ ও বৃদ্ধি সংঘটিত হয় এবং ব্লস্তনামে (Blasto) কথিত সূক্ষ্মসূত্রাকার কোষসমূহের জন্ম প্রদান করে। কীটাণুর Salivary glandsএর মধ্যে এই ব্লস্ত প্রবেশ করে এবং মশক কর্তৃক দংশিত লোকের অবয়বে বিষ লইয়া প্রবিষ্ট হয়। যদি এই লোকটী ম্যালেরিয়া মুক্ত হয়, ম্যালেরিয়া এই প্রকারে তাহার অবয়বে প্রবেশ করিয়া নিজের স্বভাবগত প্রভাব বিস্তার করে।

লোকে যে এই প্রকারে ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহা আমরা বর্ত্তমান জ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারি। এই বিষময় অধীনতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে ম্যালেরিয়াবাহী মশকের দংশন এড়াইতে হইবে। এই হেতু যে যে অবস্থায় ম্যালেরিয়াবাহী মশকজাতি বংশ বৃদ্ধি করে সেই সেই অবস্থা ও ম্যালেরিয়াবাহী এবং অন্যান্য নিরীহ মশকসমূহের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

ম্যালেরিয়াবাহক মশক

এমন অনেক মশা আছে যাহারা কোন রোগ বহন করে বলিয়া অদ্যাপি প্রমাণিত হয় নাই। বস্তুতঃ, তাহাদের হুলবিদ্ধ তীব্র-যন্ত্রণা ব্যতীত অধিকাংশ মশকই নিরীহ বলিয়া আমাদের নিকট অনুমিত। সমস্ত প্রকারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ কুরেক্ষ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সকল মশা সাধারণতঃ ক্ষণস্থায়ী ডোবা পরিপূর্ণ বৃষ্টির জলে বংশ বৃদ্ধি করে। কুরেক্ষ (culex) শ্রেণীর মশক নিরীহ; আর অন্নফলি শ্রেণীর মশক ম্যালেরিয়াবাহক, কাজেই মারাত্মক। অতএব এই দুইয়ের বিভিন্নতা ও সাদৃশ্য সম্বন্ধে যথা-সংক্ষেপে আলোচনা করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

কুরেক্ষের পাখা পরিষ্কার, কিন্তু অন্নফলির পাখা কম বা বেশী দাগ সম্বলিত। আরও দেখা যায় যে কুরেক্ষের পল্পী (Palpi) (যাহা চক্ষুর উভয় পার্শ্বে প্রলম্বমান) অতি ছোট; অন্নফলির পল্পী লম্বা—এমন কি প্রায় চক্ষুর সমান। অধিকন্তু, ইহাও লক্ষিত হয় যে যখন কুরেক্ষ দেওয়ালের গায়ে অবস্থিতি করে, তখন ইহাকে কম বা বেশী কুব্জপৃষ্ঠ দেখা যায়, অর্থাৎ মস্তক ও চঞ্চু ঠিক দেহ ও পাখার সঙ্গে একতলে অবস্থান করে না, কিন্তু

দেওয়ালের গায়ে একটী কোণ করিয়া প্রলম্বিত হইতে থাকে; দেহ ও পাখা দেওয়ালের সঙ্গে সমান্তরাল হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অন্নফলির মস্তক ও চঞ্চু প্রায় দেহের সঙ্গে একতলে থাকে এবং দেহটী সাধারণতঃ দেওয়ালের সঙ্গে একটী কোণ করে; বিশেষতঃ যখন অট্টালিকার ভিতরকার ছাদের উপর অবস্থান করে তখন অন্নফলির দেহ সমতলের সঙ্গে একটী খুব বড় কোণ উৎপন্ন করে। আমরা পল্লীগ্রামে ত্রিজাতীয় ম্যালেরিয়া-শ্রেণীর অন্নফলি দেখিতে পাই, যথা—অন্নফলি মণ্ডলিঙ্গ, অন্নফলি পংক্তিলিঙ্গ, অন্নফলি ক্রুশেঙ্গ।

আদিম অবস্থায় অন্নফলির ডিম্বগুলি কুরেক্সের ডিম্বগুলি হইতে অনায়াসে পৃথক্ করিতে পারা যায়; কুরেক্সের ডিম্বগুলি এক জায়গায় জড়িত হইয়া নিরেট্ আকারে থাকে, কিন্তু অন্নফলির ডিম্বগুলি জলের উপর পৃথক্ পৃথক্ থাকায় সর্ব্বদা পার্শ্বের উপর ভর দিয়া থাকে। কুরেক্সের larvae সাধারণতঃ পশ্বাদির পিপায় এবং বৃষ্টিজল পরিপূর্ণ খালে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল larvae জলের মধ্যে ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে থাকে; নিঃশ্বাস লইবার জন্য প্রায় ঘন ঘন জলের উপর আসে; যখন উপরে আসে তখন তাহারা লেজের অগ্রভাগ বাহির করিয়া ঝুলিতে থাকে, আর তখন দেহের অবশিষ্টাংশ একটী বড় কোণ করিয়া নিয়ে থাকে। যাহাকে এক্ষেত্রে "লেজ" বলা হইল, সেটী কিছুই নয়, কেবলমাত্র নিঃশ্বাসের নল, তাহারা এই লেজ দিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে। সাধারণ কুরেক্সের wigglers লম্বা আর শুঁড়ের মত। কিন্তু ম্যালেরিয়া-মশকের wigglers কতকপরিমাণে ভিন্ন ধরণের। ইহা প্রায় অধিকাংশ সময়ই উপরে থাকে; জল-তলের সঙ্গে সমান্তরাল হইয়া থাকা ইহার স্বভাব; কুরেক্স wigglersএর মত নিয়ে দোদুল্যমান হইয়া থাকে না।

ম্যালেরিয়া নিবারণার্থ উপায়

ইহার আক্রমণে বাধা প্রদান করিতে হইলে মশকের সর্ব্বনাশ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। মশক যাহাতে প্রসব করিতে না পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কিম্বা প্রসব করিলেই ইহার larvae চোখে পড়িবামাত্র অমনিই ধ্বংস করিতে হইবে। কিন্তু আমরা জানি, কোন কোন জাতীয় মশা নিরীহ; এ অবস্থায় ম্যালেরিয়া-মশকের বিশেষত্ব জানা সকলের কর্ত্তব্য। অন্নফলির মশা বেশীদূর উড়িয়া বেড়ায় না; এক মাইল ব্যাসার্দ্ধই ইহার দূরত্ব। কাজেই প্রসবস্থানের একমাইল ব্যাসার্দ্ধ লইয়া অনুসন্ধান করিলেই বেশ আশাজনক ফল পাওয়া যাইতে পারে। প্রসবস্থান আবিষ্কৃত হইলেই তাহাকে অনেক মাটী দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে, কিম্বা কেরোসিন তেল পাত্লা করিয়া জলের উপর ঢালিয়া দিতে হইবে—তাহা হইলে অন্নফলির larvae অচিরে বিনষ্ট হইয়া যাইবে; কিম্বা যে সকল মৎস্য larvae খাইয়া জীবন ধারণ করে, সেই সকল মৎস্য সেখানে ছাড়িয়া দিলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে।

যতদিন পর্য্যন্ত ইহাদের সর্ব্বনাশ না হয়, ততদিন সে সব অঞ্চলে মশকের প্রবেশে বাধা দিবার জন্য খুব ভাল করিয়া প্রত্যেক ঘরে তার-জালের পর্দ্দা দিতে হইবে। যদি ঘরে ইতিমধ্যে মশক প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে মারিয়া ফেলিতে হইবে। কিম্বা টীনের ঢাক্নীর উপর Pyrethrumএর চূর্ণ পুড়াইলে মশা

অজ্ঞান হইয়া জীবন হারায়। মশকের দংশন এড়ান সকলের উচিত; এজন্য বাহিরে, বিশেষতঃ রাত্রে, বসিয়া থাকা উচিত নয়। যে সকল লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, তাহাদিগকে সদাসর্ব্বদা মশারির মধ্যে রাখিতে হইবে; মশারিই মশার অরি। ম্যালেরিয়ার শত্রু যে কুইনাইন তাহা ত কাহারও অজ্ঞাত নয়। কিন্তু ইহার ব্যবহারে অনেকেই অনভিজ্ঞ। শরীর ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ হইলেই দাগ বা dose প্রদান করিতে হইবে এবং আরও মনে রাখিতে হইবে যে দাগের বার (time) অতীব আবশ্যক। দূরদর্শী চিকিৎসকগণের ইহাই অনুকূল মত।

যদি আমরা এই সকল প্রণালী লক্ষ্য করিয়া সতর্কতাসহকারে অগ্রসর হই, তাহা হইলে ম্যালেরিয়ার নিকট নিজেদের জীবন বলি দিতে হইবে না।

কীটাণুকর্ত্তৃক বাহিত অন্যান্য রোগ

ম্যালেরিয়া, ওলা, আন্ত্রিক জ্বর ভিন্ন ঈজিপ্ত ও ফিজিদ্বীপপুঞ্জে একপ্রকার মারাত্মক মানবীয় চক্ষু-রোগ আছে, এই রোগ সাধারণ গৃহমাছিকর্ত্তৃক নীত হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে একপ্রকার চক্ষুরোগ আছে যাহা হিপ্পলত্ত (Hippelates) শ্রেণীর অতীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছি কর্ত্তৃক বাহিত হয়। কোন কোন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে Leprosy'র মত দেখিতে Filariasis নামে একপ্রকার ব্যারাম আছে, যাহা কতিপয় মশা দ্বারা মানবদেহে প্রবিষ্ট হয়। গরুর তথাকথিত Texas জ্বর সাধারণ গরুর মাছি (fick) কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হয়। অন্নথুক্ষ (Anthrax) নামীয় গো-রোগ কোন কোন মাছি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায়। শয্যাকীট যে ছারপোকা, সেও রোগ-বীজবাহক বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। হরিদ্রা-জ্বরের কারণ আমরা এখনও নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই; তবে ইহার উৎপত্তি যে পরভোজী বপুণু হইতে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন মশক এই হরিদ্রাজ্বরের যান বলিয়া সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
ওহায়ো বিশ্ববিদ্যালয়,
আমেরিকা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ আন্দোলন চলিয়াছে তাহাতে স্বতঃই প্রাণে একটা আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হয়। মহামহিম গোখ্‌লে মহোদয়ের শিক্ষাবিলের (Primary Education Bill) পাণ্ডু-লিপির বিষয় চিন্তা করিলে তাঁহার গভীর গবেষণা এবং দেশের উন্নতি কামনার বলবতী স্পৃহা দেখিয়া প্রাণে যুগপৎ আনন্দ ও উৎসাহের উদ্রেক হয়। শিক্ষার বিষয় লইয়া অধুনা যে কেবল রাজনীতিবিদ্‌গণ আন্দোলন করিতেছেন এরূপ নয়, যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন সর্ব্বত্রই শিক্ষার আলোচনা দেখিতে পাই। পিতামাতা, অভিভাবকগণ, শিক্ষা-পরিষদের সভ্যমণ্ডলী এবং শিক্ষক

মহোদয়গণ সকলেই শিক্ষার বিষয় লইয়া আপনাপন মতামত প্রকাশ করিতেছেন। কেহ হয়তো আধুনিক শিক্ষার অনুপযুক্ততায় হতাশ হইতেছেন, আবার কেহ হয়তো আশার আলোকে আশান্বিত প্রাণে ভবিষ্যতে সুখের আস্থা স্থাপন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন। কিন্তু কাহার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত এবং সঠিক তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। তবে সে বিষয়ের সম্যক আলোচনা আবশ্যক—তাই এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছি।

শিক্ষার সফলতা আশা করিতে হইলে তাহার উপযুক্ত সুব্যবস্থার প্রয়োজন এবং ঐ ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিতে হইলে প্রথমেই "শিক্ষার উদ্দেশ্য কি" তাহাই মনে মনে ধারণা করিতে হইবে। উদ্দেশ্যবিহীন কোন কার্য্যই সুফল প্রসব করিতে পারে না। এ অবস্থায় শিক্ষা সম্বন্ধেও তাহাই প্রযুজ্য। সুতরাং দেখা যাউক এই শিক্ষার উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত! একটু বিশেষভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে ইহার উদ্দেশ্য জাতির প্রকৃতি-ভেদে ভিন্নরূপ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলেও প্রকৃতভাবে তাহা ভিন্ন কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। মনুষ্য-জন্মের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার উদ্দেশ্য যে একই ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে কথিত হয়,—তাহাও স্বাভাবিক। কারণ সে সমস্তই মানবিক উৎকর্ষতার উপর নির্ভর করে। কোন জাতি হয় তো এই ঐহিক জীবনকেই একমাত্র চিন্তার বিষয় মনে করিয়া দেহের সুখস্বচ্ছন্দতার উপরেই জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্যের আরোপ করেন, আবার কোন জাতি হয়তো এই দৈহিক বা সাংসারিক সুখকে উপেক্ষা করিয়া পারলৌকিক নিত্যসুখের অন্বেষণের চেষ্টাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। জীবনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্যেরও ঐরূপ বাহ্যিক মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রথমমত-সমর্থনকারী মহাত্মারা "অর্থ-উপার্জ্জন এবং দৈহিক সুখবর্দ্ধনেচ্ছার অনুকূল উপায়-উদ্ভাবন-চেষ্টাকেই" শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করেন; পক্ষান্তরে অপর পক্ষীয়েরা "পরমার্থলাভ এবং পারলৌকিক সুখের চেষ্টাকেই" শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতেছেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উভয়ই মূলে এক—"নিত্যসুখলাভের চেষ্টা।"

জগতে জীবমাত্রেই সুখের আশায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। "সুখ সুখ" করিয়া সকলে উন্মত্ত। ক্ষণিক সুখের আস্বাদনে নিত্য তৃপ্তি নাই—তাই জগতের এই অবিরাম স্পন্দন। "আনন্দময়ের" রাজ্যে সবাই যে পরমানন্দে ডুবিয়া থাকিতে চাহিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই সুখ-লাভেচ্ছা যখন স্বাভাবিক—তখন দেখিতে হইবে "কি উপায়ে ইহা নিত্যভাবে ধারণ করিয়া চির শান্তি লাভ করা যায়।" এই সুখ লাভের চেষ্টার প্রণালীই স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন প্রকার এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লক্ষিত হইতেছে। পৃথিবীর আদিম অবস্থা কল্পনা করিলে বুঝা যায় যে, প্রথম অবস্থায় মনুষ্যগণ অসভ্য ছিল। সেই অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও শিক্ষার প্রয়োজন হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানের তুলনায় তাহার উদ্দেশ্য এতই সঙ্কীর্ণ ছিল যে, আমরা অধুনা তাহা উপেক্ষা করিয়া থাকি। আদিম অবস্থায় অসভ্যগণের মধ্যে যে অভাব তাহারা ধারণা করিতে

পারিত, তাহার পূরণই যে তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কাজেই সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত শিকার প্রভৃতি দ্বারা সংসার প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য লাভ করাই তৎকালীন শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং সে শিক্ষায় যে মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টার অভাব অবশ্যম্ভাবী ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ, প্রথম অবস্থায় বাহ্যিক ও ব্যবহারিক (যাহা নিত্য প্রয়োজনীয়) জ্ঞানই চরমজ্ঞান ও শিক্ষার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক। সে অবস্থায় আহার-সংস্থান, সন্তান-উৎপাদন ও পরিবার-প্রতিপালনই জীবনের চরম উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই শিক্ষার বিষয়ও তদনুযায়ী হইয়া তৎকালীন সুখলাভেচ্ছাকে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু মানবের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, সামাজিক ব্যবস্থা ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে করিতেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রণালী ভিন্ন আকার ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইরূপে সময় ও সামাজিক অবস্থার বিপর্য্যয়ানুসারে শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য ও প্রণালীর বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী।

এখন আলোচ্য বিষয় এই যে, যদি স্থান, কাল ও পাত্রভেদে শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য ও তাহার প্রণালী বিভিন্ন হয়, তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির শিক্ষা-প্রণালী একরূপ হইলে একইরূপ ফল প্রসব করিবে কি? এই সমস্যার মীমাংসা তত সহজ নয়। প্রাচ্য বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য জাতির প্রকৃতি ও অবস্থা উভয়ই আজ পর্য্যন্ত কিছু না কিছু পৃথক বলিয়াই উপলব্ধি হয়। প্রাচ্য অন্তর্মুখী, পাশ্চাত্য বহির্মুখী। পাশ্চাত্যজাতি অধুনা বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান এবং ভাবরাজ্যের বিনিময়ে তাঁহারা কর্ম্ম-রাজ্যের রাজা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; আর প্রাচ্যজাতি বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই ধর্ম্মভীরু ও ভক্তিপ্রবণ—সুতরাং ভাবরাজ্যের রাজা। তাঁহারা প্রত্যক্ষের বহির্ভূত হইলেও ঐশীশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাহার আলোচনায় মানসিক উৎকর্ষ-সাধনকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন। ইহা হইতে কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে পাশ্চাত্যজাতি ঐশীশক্তিতে অবিশ্বাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। কারণ তাঁহাদের কবিও গাহিতেছেন:—

"Act, act in the living present
Heart within and God over head."

তবে আমার ঐরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে প্রাচ্যজগৎ অনেকটা ধর্ম্মপ্রবণ এবং পাশ্চাত্যজগৎ অধুনা বিজ্ঞানের উৎকর্ষেই অধিক উন্নত। এ অবস্থায় উভয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রণালী এক হইবে কি?

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে উপলব্ধি করা যায় যে, শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যে কোথাও কোন পার্থক্য নাই, এবং থাকিতেও পারে না। তবে অধিকার-ভেদে তাহার প্রণালী পৃথক হওয়া স্বাভাবিক। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য—"সেই নিত্যসুখ" লাভ করিবার জন্য পাশ্চাত্যজাতি আজ প্রকৃতিকে তাহাদিগের দাসীরূপে নিয়োজিত করিয়াছেন। আজ তাঁহাদিগের সুখের আশাতৃপ্তির জন্য বাষ্পীয় শকট দুই দিনের পথ দুই ঘণ্টায় ছুটিতেছে; তাঁহাদিগের শ্রান্তি দূর করিবার জন্যই

বৈদ্যুতিক ব্যজনী অশ্রান্তভাবে প্রভুর সেবায় নিযুক্ত। তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য শত মাইল দূর প্রবাসী বন্ধুর কুশল-সংবাদ মুহূর্ত্তে আসিয়া পৌঁছিতেছে; ক্ষুব্ধ প্রাণের অবসাদ দূর করিবার জন্য ঐ যে মধুরস্বরে "কলের গান" বাজিয়া উঠিতেছে—আরও কত বলিব! প্রকৃতি আজ পাশ্চাত্যের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাদের সুখের সরবরাহ করিতেছে। কিন্তু হায়! শান্তি কই? এখনও ঐ যে সেই ছুটাছুটী! ঐ যে সেই অবিরাম স্পন্দন! নিরবচ্ছিন্ন আলোড়ন! সেই স্থির, ধীর, প্রশান্ত, গম্ভীর শান্তির ছায়া কই?—আবার প্রাচ্যের দিকে চাহিয়া দেখুন। ঐ যে শাকান্নভোজী, অবলম্বনহীন, যোগীবর উর্দ্ধনেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া জীবনের শ্রান্তি দূর করিতেছেন। সংসারের ভোগসুখেচ্ছায় নিবৃত্তি আনিয়া অফলপ্রেপ্সুভাবে কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন—উহাও কি সেই চিরসুখ, পূর্ণশান্তিলাভের অভিলাষ নয়? তবেই দেখিতেছি উভয়ই সেই মুখ্য-উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ। তবে একটী দ্বারা মানুষ, দুরারোহ-পর্ব্বতশৃঙ্গআরোহণেচ্ছু হইয়াও, স্বভাব-সৌন্দর্য্যের সারস্বরূপ প্রকৃতির বাহ্যিক চাকচিক্যে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া পর্ব্বতগাত্রের আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করিতে করিতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা করে; আর অপরটী দ্বারা মানুষ সকল প্রলোভনের হাত হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া সোজাসুজি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে প্রাণপণ সচেষ্ট। ভারতবর্ষ ধর্ম্মপ্রবণ বলিয়া এরূপ মনে করা উচিত নয় যে সেখানে কর্ম্মের আদর নাই। এদেশ জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমষ্টিভূত আধারভূমি। এদেশ জ্ঞানরূপী শঙ্করাচার্য্য, কর্ম্মরূপী বুদ্ধদেব এবং ভক্তিরূপী চৈতন্যের জন্ম ও লীলাভূমি। সুতরাং এখানে কর্ম্মের আদর নাই—এ কথা বলিতে পারি না। বিশেষতঃ গীতা গাহিতেছে:—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

* * *

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥"

* * *

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

অর্থাৎ "কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। (চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত) কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই জ্ঞানলাভ হয় না॥

তুমি সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম কর। যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল, সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলে তোমার দেহযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।

অতএব তুমি ফলাসক্তিশূন্য হইয়া সর্ব্বদা অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষপ্রাপ্ত হন॥"

কাজেই দেখা যাইতেছে—সামান্য পার্থক্য থাকিলেও পাশ্চাত্যের ন্যায় আমরা কর্ম্মী এবং তাঁহারা অধিকাংশই বিজ্ঞানের মোহিনী-শক্তিতে অভিভূত থাকিলেও তাঁহাদিগের মধ্যেও ধর্ম্মবীরের অভাব নাই। সুতরাং প্রণালীতে পার্থক্য থাকিলেও সকল সভ্যদেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য যে মুখ্যভাবে একই থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুইভাবে আলোচিত হয়। প্রথমতঃ পিতামাতা ও অভিভাবকগণ জীবিকা-

উপার্জ্জনই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা করেন। আজকাল দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে "জীবিকা-উপার্জ্জনই" যে শিক্ষার সকল উদ্দেশ্য আত্মসাৎ করিয়া স্বপ্রধান হইবে ইহা স্বাভাবিক। পিতামাতা ও অভিভাবকগণ বাধ্য হইয়া সেই উদ্দেশ্য-সাধনেই চালিত হইয়া থাকেন। ইহার ফলে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, আধুনিক শিক্ষায় মানুষকে প্রকৃত মানুষ করুক বা না করুক, তাহাকে "অর্থকরী বিদ্যা" দান করিয়া থাকে। সুতরাং "শিক্ষা" বলিলে এখন আমরা "অর্থকরী বিদ্যা" ব্যতীত আর কিছুই বুঝি না কিম্বা বুঝিতে চেষ্টাও করি না। তাই বলিয়া "জীবিকা উপার্জ্জন" শিক্ষার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত এরূপ বলিতেছি না—কারণ ইহা জীবনের একটী প্রধান কাজ, এতদ্ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব। তবে উহাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে আমরা দিন দিন যে মনুষ্যত্ব-বিহীন হইয়া অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইব তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই "জীবিকা-উপার্জ্জনকেই" চরম উদ্দেশ্য না ধরিয়া শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্যের অংশবিশেষ মনে করাই যুক্তিযুক্ত। প্রকৃতভাবে শিক্ষিত হইলে কখনও কাহারও উপার্জ্জনের অভাব হয় না, কিন্তু দেশের বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রভাবে আমরা এতই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি যে, প্রকৃত শিক্ষার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আমরা কেবল বাহ্যিক আবরণেই (বি, এ ; এম, এ প্রভৃতি) ডুবিয়া আছি। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, যদি শিক্ষাকে আমরা প্রকৃতপথে চালিত করিতে পারি তবে আমাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব তো দূর হইবেই, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিত্য শান্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। শিক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষসাধনই তাহার একমাত্র উপায়।

এখন দেখিতে হইবে এই সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন কাহাকে বলে? আমরা জানি যে মানুষের অন্তরিন্দ্রিয় জ্ঞান, অনুভূতি ও কর্ম্মের সমষ্টিমাত্র।* জ্ঞানলাভের ইচ্ছা মানুষের যেমন স্বাভাবিক, তেমনি তাহা হইতে আনন্দ বা দুঃখ-অনুভূতি এবং সেই জ্ঞানের প্রকাশ-স্বরূপ কর্ম্মের নিয়োগও মানুষের স্বাভাবিক। এই তিনের সমষ্টি লইয়াই মানুষ এবং তাহাদের সমবায় অনুশীলন হইলেই সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধিত হইল। শুধু জ্ঞানের পরিপুষ্টি হইলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; কারণ শুধু জ্ঞানী হইলেই জীবনে সুখী হইতে পারা যায় না অথবা তাহার দ্বারা জগতেরও বিশেষ কোন উপকার হয় না। তেমনি জ্ঞানবিহীন কর্ম্মজীবনও অনুপযুক্ত এবং অনুভূতিবিহীন জ্ঞান বা কর্ম্মজীবন ভারবহ বই আর কিছুই না। ভক্তিপ্রবণ কর্ম্মময় জীবনই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়—তেমনি চিত্তাকর্ষণকারী (interesting) বিষয়ের ব্যবহার হইতেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। সুতরাং জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বিষয়টী চিত্তাকর্ষণ-কারী হওয়া চাই এবং সেই লব্ধ জ্ঞান যাহাতে কার্য্যে পরিণত করা যায় তদ্বিষয়ে চেষ্টা চাই; নতুবা সেই জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয় না এবং তাহা প্রকৃত জ্ঞান বা শিক্ষা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলেন "It (Education) is the preparation for complete living." অর্থাৎ শিক্ষা মানুষের শারীরিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি

* Mind is the sum-total of "knowing, willing and feeling."

সর্ব্ববিধ উন্নতির উপায়স্বরূপ। প্রফেসর জেম্‌স্ (Professor James) তাঁহার "Talks to teachers" নামক গ্রন্থে বলেন "Education is the organisation of acquired habits of conduct and tendencies to behaviour." অর্থাৎ শিক্ষা আমাদিগের লব্ধস্বভাব ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির শৃঙ্খলা আনয়ন করে; অর্থাৎ ইহাই আমাদিগের "চরিত্রগঠনের" একমাত্র উপায়। এখন দেখা যাউক এই "চরিত্র" কাহাকে বলে? বাহ্যিক আচার, ব্যবহার, হাব, ভাব হইতেই আমরা "চরিত্র" সম্বন্ধে ধারণা করিয়া থাকি; কারণ অনুভূতির বিকাশই চরিত্রের প্রকাশ—"character is nothing but the outward manifestation of the inward feeling. For, there is no reception without re-action; no impression without correlative expression." (Professer James). প্রাণে যখন আকাঙ্ক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয় তখন কোন না কোন উপায়ে তাহার অভিব্যক্তি হইবেই হইবে। কাজেই অনুভূতির (feeling) উৎকর্ষসাধনই চরিত্র-গঠনে প্রধান উপায়-স্থল। অনুভূতির বিকাশ হইলেই তাহাতে কর্ম্মের অধিকার আসিল। আবার অনুভূতির উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা প্রমাণ করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন। যেমন,—আমি মদ খাইতে আনন্দ পাই, ইহা একটা অনুভূতি। কিন্তু ইহার ঔচিত্যবিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে জ্ঞানের আবশ্যক। সুতরাং দেখা যাইতেছে চরিত্র-গঠনে জ্ঞান, অনুভূতি ও কর্ম্ম এই তিন বৃত্তিরই উৎকর্ষ প্রয়োজন। ফলতঃ চরিত্র-গঠন ও মনের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষসাধন উভয়ই শিক্ষার একই উদ্দেশ্যে পরিণত হইল।

সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষসাধনই যখন শিক্ষার উদ্দেশ্য, তখন দেখিতে হইবে যে কিসে এবং কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা যায় এবং শিক্ষণীয় বিষয় নির্ব্বাচন, শিক্ষার স্থান এবং শিক্ষকের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়েও আমাদিগের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। বারান্তরে এই সব বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ।

গোমূত্র

মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও উদ্ভিদগণের শরীর-রক্ষার্থ গোমূত্রের উপযোগিতা বড় অল্প নহে। মনুষ্যের প্লীহা, পাণ্ডু, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে, পশুপক্ষীর চর্ম্মরোগে, উদ্ভিদগণের নানারূপ কৃমিনাশার্থ গোমূত্রের ব্যবহার সচরাচর হইয়া থাকে। সকল দ্রব্যেরই একটা এমন ধর্ম্ম আছে যাহা শরীরের পক্ষে উপযোগী নহে। ইহা কখনও মাত্রার কম বেশীতে হয় এবং কখনও অজ্ঞানতা বশতঃ অপপ্রয়োগের ফলেও ঘটিয়া থাকে। এইরূপ গোমূত্রে বহুগুণ নিহিত থাকিলেও ইহা নির্দ্দোষ নহে। এজন্য চরক বলিয়াছেন,—

বিজ্ঞাতঞ্চাপি দুর্য্যুক্ত মনর্থায়োপপদ্যতে॥

সূত্র ১অঃ

ঔষধের নাম, রূপ ও গুণ জানা থাকিলেও যদি উহা সম্যক্ প্রযুক্ত না হয় তাহা হইলে

তাহা হইতে অনর্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তিনি আরও বলেন,

মাত্রা কালাশ্রয়া যুক্তিঃ সিদ্ধির্যুক্তৌ প্রতিষ্ঠিতা।
তিষ্ঠত্যুপরি যুক্তিজ্ঞা দ্রব্যজ্ঞানবতাং সদা॥

ভেষজ যুক্তি অর্থাৎ প্রয়োগ কেবল দ্রব্য-গুণ জানা থাকিলেই করা যায় না, মাত্রা ও কাল অনুসারে করিতে হয়। এই যুক্তির ফলেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। এজন্য যুক্তিজ্ঞ চিকিৎসক দ্রব্যজ্ঞানী অপেক্ষা সম্মান-ভাজন।

মূত্রের গুণ ও ক্রিয়া ভগবান্‌পুনর্ব্বসু সাধারণ ভাবে বলিতেছেন,

উষ্ণং তীক্ষ্ণমথ রুক্ষং কটুকং লবণান্বিতং।
মূত্রমুৎসাদনে যুক্তং যুক্তমালেপনেষু চ॥
যুক্তমাস্থাপনে মূত্রং যুক্তঞ্চাপি বিরেচনে।
স্বেদেষ্বপি চ তদ্যুক্তমানাহেষ্বগদষু চ॥
উদরেষ্বথ চার্শঃসু গুল্মকুষ্ঠকিলাশিষু।
তদ্যুক্তমুপনাহেষু পরিষেকে তথৈব চ॥
দীপনীয়ং বিষঘ্নঞ্চ ক্রিমিঘ্নঞ্চোপদিশ্যতে।
পাণ্ডুরোগোপসৃষ্টানামুত্তমং শর্ম্ম চোচ্যতে॥
শ্লেষ্মাণং শময়েৎ পীতং মারুতঞ্চানুলোময়েৎ।
কর্ষেৎ পিত্তমধোভাগ মিত্যস্মিন্ গুণসংগ্রহঃ॥

মূত্র কটু ও ঈষৎ লবণ রস; (১) উষ্ণ-বীর্য্য (২) এবং তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট। ইহা তীক্ষ্ণ ও উষ্ণগুণ হইলেও রুক্ষ নহে, বরং স্নিগ্ধ। মূত্র অগ্নির দীপ্তিকর এবং বিষ ও ক্রিমিনাশক। মূত্র, শ্লেষ্মপ্রশমক, বায়ুর অনুলোমতা-সম্পাদক এবং পিত্তকে অধো-মার্গে আকর্ষণ করিয়া বিরোচন করাইয়া থাকে। ইহা পাণ্ডুরোগীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মূত্র আনাহ উদর, অর্শঃ, গুল্ম, কুষ্ঠ ও কিলাশ রোগে, অন্তঃ-পরিমার্জ্জন ও বহিঃ পরি-মার্জ্জনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মূত্র, উৎসাদন (উদ্বর্ত্তন), প্রলেপ, আস্থাপন (নিরূহবস্তি), উপনাহ (স্থূলকম্বদ্বারা স্বেদ—Pultice), পরিষেক (গায়ে সেচন), বিরেচন, স্বেদ ও পানার্থ ব্যবহৃত হয়। আগদ অর্থাৎ বিষঘ্ন ঔষধে মূত্র একটী বিশেষ উপাদান।

গোমূত্রের সাধারণ নাম "চনা" বা "চোনা"। ঔষধার্থ গোমূত্র-গ্রহণ করিতে হইলে, যে সকল জন্তু বিচরণ করিয়া ঘাস খায় তাহাদের মূত্রই গ্রহণ করা উচিত। যে সকল জন্তু সর্ব্বদা বাঁধা থাকে, তাহাদের শারীর শ্রমের অভাবে, শারীর ধাতু ও মলের সম্যক্ পরিণতি হয় না। এজন্য ইহাদের মাংস ও দুগ্ধ যেমন গুরুপাক হয়, সেইরূপ মূত্র লঘু হইতে পারে না। এবং সময়ে সময়ে অজীর্ণতা হেতু, মূত্রের সহিত নানা অবান্তর পদার্থ নির্গত হয়।

রুগ্না, গর্ভিণী, বৃদ্ধা গাভীর মূত্রও গ্রহণ করিবে না।

প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন—স্ত্রীলোক পিত্তপ্রধান এবং মূত্রেও পিত্তগুণাধিক্য থাকা উচিত। এজন্য গাভীর মূত্রই প্রশস্ত। (১)

যে সকল বৎসতরীর ২ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মূত্রই গ্রহণ করিবে। প্রসূতার মূত্র গ্রহণ করিতে হইলে প্রসবের অন্ততঃ ২ মাস পরে গ্রহণ করিবে।

মহর্ষি হারীত বলেন, প্রসূতার মূত্র তরল এবং অপ্রসূতার মূত্র ঘন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ গুণে কোনও পার্থক্য নাই।

বৎসের মূত্র ঘন। বৃষণহীনের মূত্র ঈষৎ লঘু।

(১) স্ত্রীণাং মূত্রং গবাং তীক্ষং ন তু পুংসাং বিধীয়তে।
পিত্তাধিকাঃ স্ত্রিয়ো যস্মাৎ সৌম্যাশ্চ পুরুষা মতাঃ॥ পরিভাষা।

বৃষের মূত্র শোথ ও ক্রিমিঘ্ন। অগ্নিদীপক এবং কামলা গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগনাশক। পানার্থ গবীমূত্র প্রশস্ত। (১)

গোমূত্রের গুণ ও ক্রিয়া

চরক—

গব্যং সমধুরং কিঞ্চিৎ দোষঘ্নং ক্রিমিকুষ্ঠনুৎ।
কণ্ডূঘ্নং শময়েৎ পীতং সম্যগ্‌দোষোদরে হিতং॥
(সূত্র ১ম)

সুশ্রুত—

গোমূত্রং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং সক্ষারত্বান্নবাতলং।
লঘ্বগ্নিদীপনং মেধ্যং পিত্তলং কফবাতজিৎ॥
শূলগুল্মোদরানাহবিরেকাস্থাপনাদিষু।
মূত্রপ্রয়োগসাধ্যেষু গব্যং মূত্রং প্রয়োজয়েৎ॥
(সূত্র ৪৫ অঃ)

ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু—

গোমূত্রং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং সক্ষারং লেখনং সরং।
লঘ্বগ্নিদীপনং মেধ্যং পিত্তলং কফবাতজিৎ॥
মূত্রপ্রয়োগসাধ্যেষু গব্যং মূত্রং প্রয়োজয়েৎ॥ (২)
(৬ষ্ঠ বর্গ)

রাজনিঘণ্টু—

গোমূত্রং কটুতিক্তোষ্ণং কফবাতহরং লঘু।
পিত্তকৃদ্দীপনং মেধ্যং ত্বগ্দোষঘ্নং মতিপ্রদং॥
(১৫শ বর্গ)

মূতলং (১ম ৬ম অঃ)

গোমূত্র ঈষৎ মধুর ও কটু রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ। ইহা ত্রিদোষপ্রশমক অর্থাৎ মধুরতার জন্য—পিত্তপ্রশমক; কটুরস সুতরাং শ্লেষ্মপ্রশমক এবং উষ্ণবীর্য্য সুতরাং শীতগুণ বায়ুর প্রশমক। কটুরস দ্রব্য বায়ুবর্দ্ধক হইয়া থাকে, কিন্তু গোমূত্র ক্ষারবহুলতার জন্য বাতবর্দ্ধক হইতে পারে না। গোমূত্র অগ্নিদীপক ও ঈষৎ বিরেচক। হারীতের মতে ইহা মূত্রকর। গোমূত্র, নাসারোগে পানার্থ প্রয়োগ করা যায়। যথা—

উদররোগে—জলোদর—মল কাদার মত শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ। সর্ব্বাঙ্গগত শোথ। সঙ্গে অল্প অল্প জ্বর। দিনে দুই বার জল নিষ্কাষিত করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। পথ্য দুধ ও ভাত।

প্লীহা— (ক) প্লীহা বড় ও কঠিন। শরীরের বর্ণ সাদা ফ্যাকেশে। মল কঠিন। সঙ্গে অল্প অল্প জ্বর। দিনে ২ বার প্রয়োগ। পথ্য দুধ ও ভাত। (খ) দিনে দুই বার প্লীহার উপর স্বেদ।

(১) সৌর ভেয়কমূত্রঞ্চ ঘনং সান্দ্রং প্রশস্যতে।
তচ্চ বৃষণহীনানাং কিঞ্চিল্লঘুতরং মতং॥
বৃষমূত্রঞ্চ শোথঘ্নং ক্রিমিদোষবিনাশনং।
কামলাগ্রহণীপাণ্ডুনাশং চাগ্নিদীপনং॥
অজাগবী ভবং মূত্রং পানে শস্তং ভিষগ্বদেৎ॥
হারীত প্রথমাংস নবমাধ্যায়।

(২) এস্থলে ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুর মত সুশ্রুতের অনুরূপ। না তুলিলেও হইত। পাঠক মহাশয়দিগকে একটী বিষয় দেখাইবার জন্য তুলিলাম। সুশ্রুতের দ্বিতীয় চরণের পাঠ "সক্ষারত্বান্নবাতলং।" গোমূত্র, কটু ও তীক্ষ্ণ। এরূপ দ্রব্য সচরাচর বাতবর্দ্ধক হয়। এজন্য সুশ্রুত উহা কেন বাতবর্দ্ধক নহে তাহার হেতু দেখাইয়াছেন। যে কারণেই হউক ধন্বন্তরি নিঘণ্টুতে ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া "সক্ষারং লেখনং সরং" হইয়াছে। পাঠক দেখিবেন—সুশ্রুতের "শূলগুল্ম ইত্যাদি" চরণ দুইটী ধন্বন্তরি নিঘণ্টুতে নাই। ফলে ধন্বন্তরির মতে "মূত্রপ্রয়োগ" ব্যবস্থা হইলে সর্ব্বত্র গোমূত্র গ্রহণ করা উচিত বুঝা যাইতেছে। বস্তুতঃ সুশ্রুতের মত তাহা নহে। সুতরাং ধন্বন্তরি নিঘণ্টুর পাঠ পরিত্যাজ্য।

ক্রিমি—(ক) ক্ষুদ্র ও বড় ক্রিমি। মল অত্যন্ত কঠিন হইলে কমলা গুড়ি প্রক্ষেপ। দিনে এক বার সেব্য। মলের কঠিনতা না থাকিলে বিড়ঙ্গ তণ্ডুল চূর্ণ প্রক্ষেপ। দিনে দুই বার সেব্য। (খ) মস্তকের উকুন (ক্রিমি-বিশেষ) এবং গায়ে যে এক প্রকার উকুন দেখা যায় তাহা প্রশমনের জন্য গোমূত্র দ্বারা মাথা ও গা ধুইয়া দিবে।

জীর্ণজ্বর—বৈকালে অল্প অল্প জ্বর। যকৃৎ, ও প্লীহায় বেদনা। চক্ষুর কোণ সাদা। মল কঠিন ও বিবর্ণ। দিনে দুই বার। প্রক্ষেপ চিরতা চূর্ণ।

শূল—প্রবল বেদনা উপস্থিত হইলে সেই সময় সেবন করিতে হয়। মাত্রা ২—৪ তোলা। মল কঠিন ও বিবর্ণ।

· যকৃৎ বড়, কঠিন ও বেদনা যুক্ত। সঙ্গে অল্প অল্প জ্বর। শরীর রক্তহীন। (ক) দিনে দুইবার সেব্য। (খ) দিনে দুইবার স্বেদ।

আনাহ—পেট্‌ফাঁপা, পেটে গড় গড় শব্দ ও মন্দ মন্দ বেদনা। মল কঠিন ও বিবর্ণ। গরম থাকিতে থাকিতে সেবন। অথবা গরম জলে রাখিয়া গরম করিয়া সেবন। দিনে দুইবার।

শোথ—শোথ রোগে গোমূত্র উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা অবসেবন করাইবে।

অজীর্ণ—ক্ষুধা ভাল হয় না। প্রাতে মুখ ও চক্ষু ভার ভার বোধ হয়। শরীর অলস কোষ্ঠ অপরিষ্কার। দিনে দুইবার।

গোমূত্রের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া—গোমূত্র শ্লেষ্মসংঘাত নষ্ট করে, এজন্য শ্লেষ্মপ্রকোপ বশতঃ যে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হয়, তাহা দূর করে এবং ঊর্দ্ধগ বায়ুকে অনুলোম করিয়া পিত্তকোষের পিত্ত অধোগামী করে এবং বায়ুর অনুলোমতা বশতঃ স্থানান্তরগত পিত্ত যথা-স্থানে আগমন করে। ক্ষার দ্রব্য সারক ও সংঘাতনাশক। এই জন্য গোমূত্র মল ভেদ করিয়া মলের কাঠিন্য দূর করে।

মাত্রা ও সেবন-বিধি

জন্মের পর ৩ মাস পর্য্যন্ত		৫ ফোঁটা
৪ মাস হইতে ৮ ,,	,,	৭ ফোঁটা
৮ ,, ,, ১২ ,,	,,	১০ ফোঁটা
তদূর্দ্ধে	২ বৎসর পর্য্যন্ত	১৫ ফোঁটা
,,	৫ বৎসর পর্য্যন্ত	৩০ ,,
,,	১০ ,, ,,	৬০ ,,
,,	১৫ ,, ,,	২॥ কাঁচ্চা
,,	৪০ ,, ,,	৫ হইতে ১০ কাঁচ্চা

☞ (১) রোগীর স্বাস্থ্য, জীবনীশক্তি, এবং শারীর গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে এই মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে।

(২) গোমূত্র ধারোষ্ণ সেবন করিবে। ইহাতে গুণাধিক্য হয় এবং দুর্গন্ধ তত থাকে না।

(৩) ধারোষ্ণের অভাবে অন্ততঃ দুই ঘণ্টার মধ্যে সেবন করা কর্ত্তব্য। সেবন কালে গরম জলের উপরে রাখিয়া গরম করিবে। ইহা সেবনের পর শীতল জল পান।

বাহ্যিক প্রয়োগ

—অর্থাৎ ধবল রোগে গোমূত্র দ্বারা পীড়িত স্থল প্রত্যহ ধুইবে এবং উহার সহিত সোঁদাল গাছের ছাল বা পত্র ভালরূপ পেষণ করিয়া পীড়িত স্থলে প্রলেপ দিবে।

কুষ্ঠ—গলিত কুষ্ঠ, মণ্ডল ও উদুম্বর কুষ্ঠে পীড়িত স্থল দিনে দুইবার গোমূত্র দ্বারা ভালরূপে ধুইবে। একপোয়া শর্ষপ তৈল আগুণে চাপাইয়া তাহাতে গোমূত্র এক

সের খাওয়াইবে। গোমূত্র শেষ হইলে উহা পীড়িত স্থলে মালিশ করিবে। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা গোমূত্রে চণক (বুট-ছোলা) ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে ছোলা চিবাইয়া লইয়া গোমূত্রটুকু পান করিবে।

দুষ্টব্রণ—ব্রণ বহুদিনের পুরাতন হইলে নিমপাতাসিদ্ধ গোমূত্র দ্বারা ক্ষত স্থান ধুইয়া ব্রণটীতে গব্য ঘৃত গরম করিয়া লাগাইয়া নূতন কদলী পাতা বা বাসকপাতা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে।

কর্ণশূল—কাণের কামড় উপস্থিত হইলে গোমূত্র উষ্ণ করিয়া উহা দ্বারা কর্ণ পূরণ করিবে। অল্প সময়ের মধ্যেই বেদনা তিরোহিত হইবে।

স্বেদ

গোমূত্র উষ্ণ করিয়া গোমূত্রের হাড়ীটী একটী সচ্ছিদ্র আসনের নীচে রাখিয়া উপরে রোগীকে বসাইয়া রোগীর শরীর (মস্তক বাদে) এবং হাঁড়ী সহ আসন একটা কম্বল বা অন্য মোটা কাপড় বা কাঁথা দ্বারা বেষ্টিত করিবে। গোমূত্রের বাষ্প রোগীর শরীরে লাগিবে এবং ঘর্ম্ম হইবে। এই স্বেদের ফলে

১। আমবাতের বেদনা
২। বাত কফজ জ্বর

সদ্যঃ তিরোহিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদে গোমূত্র যোগে নানা রোগে নানা প্রকার ঔষধের কল্পনা আছে। বারান্তরে তাহার উল্লেখ করিব।

উদ্ভিদের রোগে গোমূত্র

১। এক প্রকার ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া ধানের পাতার রস শোষণ করিতে থাকে। ইহার ফলে ৭।৮ দিনের মধ্যে পাতাগুলি শুকাইয়া যায়। এই অবস্থায় পিচকারী করিয়া গোমূত্র সেচন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

২। শাক বা চারা গাছের পাতা নানারূপ ক্রিমিতে ভক্ষণ করে। এরূপ স্থলেও পূর্ব্বোক্ত গোমূত্র সেচনে উপকার পাওয়া যায়।

পশু-পক্ষীর রোগে গোমূত্র

গৃহপালিত পশু-পক্ষীর এক প্রকার ক্রিমি রোগ হয়। তাহার ফলে গায়ের লোম ও পক্ষগুলি ক্রমে ঝরিতে থাকে এবং চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া ফাটিতে থাকে। এই পীড়ায় গোমূত্র দ্বারা গা ধুইলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

গোমূত্র ও সোড়া

যেখানে সর্ব্বদা গোমূত্র শোধিত হয় এরূপ স্থানে সোড়ার বীজ পাইলে সেই মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে সোড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এজন্য সোড়ার কারখানার নিকটে গোয়াল রাখা হইয়া থাকে।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।

জন-নায়ক গান্ধি

মহাত্মা গান্ধির সুপবিত্র নাম আজ ভারতবাসীর,—নব-উদ্বোধিত যুবকমণ্ডলীর—জপমন্ত্র—প্রাতঃস্মরণীয়! আজ সভ্যজগৎ যাঁহার ত্যাগে স্তম্ভিত, সেই মহানুভব সাধক-শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি এই "সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা" রত্নপ্রসবিনী ভারতমাতার প্রিয়সন্তান। হিন্দুধর্ম্ম চিরদিনই ত্যাগের ধর্ম্ম। ত্যাগ করিতে না শিখিলে

বা ত্যাগী হইতে না পারিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব লাভ করা যায় না! এ বাণী যুগে যুগে নানারূপে ভারতের আদর্শ বীরগণ নিজেদের কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন!

আজকাল অনেকের লেখায় পড়ি বা অনেকের মুখে শুনিতে পাই ভারত এমন অধঃপতিত হইয়াছে যে এদেশের উন্নতি সুদূর-পরাহত,—সুখের বিষয় ইদানীং শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় এ কথা সমীচিন মনে করিতে প্রস্তুত নন! যেই দেশের সন্তান এখনও সুদূর আফ্রিকাপ্রান্তে নির্জ্জন কারাবাসে নিতান্ত নিঃস্ব ভাবে স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর হিতার্থে এমন কৃচ্ছ্রব্রত সাধন করিতেছেন, সেই দেশের নর-নারী কি এখনও এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইবেন? নিরাশার রাত্রি এখন প্রভাতপ্রায়, চারিদিকে পাখীর কাকলী শুনিয়া সকলেরই প্রাণে আবার নবীন আশা জাগুক্—সকলেই জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করুক্——কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিক্——ইহাই বাঞ্ছনীয়!

ভ্রাতৃগণ! বিংশ শতাব্দীর মহাত্যাগী শ্রীযুক্ত গান্ধি তোমাদেরই দেশের সন্তান,—তোমারই মায়ের অঞ্চলের নিধি,—তোমারই ভাই! আজ তোমার ভ্রাতার ত্যাগ দেখ এবং তাঁহাকে আদর্শ করিয়া জীবনকে ধন্য কর। আজ ভারতবর্ষ বিশেষ ভাগ্যবান্ যে মাতৃভূমিকে সেবা করিবার জন্য গান্ধির মত মহাবীরের আবির্ভাব হইয়াছে! যেই দিন মানুষ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইবে,—যেই দিন জগৎ জাতীয়-সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ছাড়াইয়া আরও উর্দ্ধে উঠিবে—সেই দিন সমগ্র জগৎ জুড়িয়া গান্ধির পূজা চলিবে—সেই দিন মহানুভব গান্ধি সমগ্র বিশ্বের হৃদয়ের দেবতারূপে প্রেমাঞ্জলি পাইবেন।

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার "ভারতীয়-দলন" ব্যাপার উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধি ভারতের আবাল-বৃদ্ধের সহিত সুপরিচিত হইয়াছেন। যাঁহারা দেশের ও দশের খবর রাখেন—তাঁহাদের অনেকে গান্ধির মহা যজ্ঞ সম্বন্ধে অজ্ঞ নন;—অনেকেই গান্ধিকে দেবতা জ্ঞানে মনে মনে পূজা করেন, হৃদয়ের ভক্তি উপহার দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদেরই অনেকে বিশেষতঃ অধিকাংশ বাঙ্গালী এই মহানুভব ত্যাগীর আদর্শ জীবনের কিছু জানেন না। তাঁহাদেরই কাছে গান্ধি সম্বন্ধে আমার যৎসামান্য জ্ঞান ও ধারণা ভয়ে ভয়ে উপস্থাপিত করিলাম; আশা করি, এই অকৃতী লেখকের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস সুধীজন-মণ্ডলী কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইবে না।

খৃষ্টীয় ১৮৬৯ অব্দে (২রা অক্টোবর) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাথিয়াবাড়ে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পোর্ব্বন্দর ও রাজকোট রাজ্যে অনেক বৎসর ধরিয়া মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধির শিক্ষা কিয়দংশ কাথিয়াবাড় ও অধিকাংশ লণ্ডন নগরে হয়। তাঁহার মাতা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু-পরিবারের কন্যা ও গৃহিণী। ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। গান্ধি যখন সর্ব্ব প্রথম সাগর বক্ষে "সাত সমুদ্র তেরনদী" পারে শ্বেতদ্বীপে যাত্রা করেন, তখন মা'র কাছে তাঁহাকে ত্রিবিধ প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছিল; প্রথম, মাংস-অভক্ষণ; দ্বিতীয় মাদক দ্রব্য অসেবন, তৃতীয় বা সর্ব্বশেষ, নারী জাতির প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন। ইহা হইতেই গান্ধি-জননীর চরিত্র পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ অনেক পরিমাণে বুঝিয়া লইতে পারেন। তিনি "লণ্ডন" বাসকালেও মাতৃ-উপদেশ ও স্বকীয় প্রতিজ্ঞা সর্ব্বৈব পালন করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে 'ব্যারিষ্টার' হইয়া তিনি বিলাত হইতে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং বম্বে হাইকোর্টে Advocate (এড্‌ভোকেট্) হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন। যখন দেখিলেন সেই দেশে তিনি ভারতসন্তান হইয়া চণ্ডালের মত (as a Pariah) সম্মানিত ও অসভ্য বর্ব্বর আদিম অধিবাসীদের মত আদৃত হইতেছেন, তখনই গান্ধি মর্ম্মে মর্ম্মে স্বীয় জন্মভূমির দৈন্য ও হীনতা বিশেষরূপে অনুভব করিলেন,—তখনই মহাত্মা গান্ধি সেই স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। সেই দেশে ভারতবাসী বর্ণ-পার্থক্যের অপরাধে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সুখে থাকিতে পায় না, পথে হাঁটিতে পারে না, এক স্থানে বাস করিতে পারে না। ভগবানের বিশ্বমাঝে মানুষের মধ্যে এপ্রকার পার্থক্য, এইই নূতন! আফ্রিকার শ্বেত-দেহধারী খৃষ্টানগণ হিন্দুকে পদে পদে লাঞ্ছনা ও অপমান করেন! মহাত্মা গান্ধি স্বচক্ষে এই সব প্রত্যক্ষ করিয়াই তাহার প্রতীকারার্থে আত্ম-ত্যাগে কৃত-সংকল্প হইলেন!

ভারত-বাসীদের প্রতি তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে একটা ঘটনা এখানে তুলিয়া দিলাম; পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। মানুষের উপর মানুষ এমন নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক অত্যাচার করিতে পারে না; মানুষের লেখনীতে উহার যথাযথ বর্ণনা অসম্ভব!

"শ্রীযুক্ত গান্ধি সেই দিন মহারাষ্ট্র-জননায়ক গোখলে মহাশয়ের কাছে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছেন যে, '১৮৯৬ সালে ও তৎ পূর্ব্বেও দুটী জাহাজে করিয়া ভারত-বাসীরা ডার্ব্বান-বন্দরে আসিয়া পৌছায়; তাহারা যাহাতে জাহাজ হইতে নামিতে না পারে তজ্জন্য তিনি (কর্ণেল ওয়াইলি) অনেক লোক সংগ্রহ করিয়া লইয়া বন্দরে উপস্থিত হন। প্রকাশ্য সভায় ভারতবাসী যাত্রীসহ ঐ দুইটা জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করেন! আর একজন বক্তা বলে যে কেহ যদি একবারও ভারত-বাসীর উপর গুলি চালায় তাহা হইলে সে নিজের এক মাসের মাহিনা দিবে। কর্ণেল ওয়াইলি এই বক্তার প্রস্তাবের প্রশংসা করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে আর কে কে ভারতবাসীর উপর এক একগুলি ছোড়ার জন্য এক এক মাসের বেতন দিতে রাজি আছে?" *

এই সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা কর্ণেল ওয়াইলিকেই তথাকার গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর উপর অত্যাচার সম্বন্ধে অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত কমি-শনের একজন সভ্য করিয়াছেন!! এতৎ-সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

এই সময়ে মন্ত্রীপুত্র, সৌভাগ্যক্রোড়ে শায়িত বারিষ্টারপ্রবর ত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত স্বদেশীয়-ভ্রাতৃগণের উপকারার্থে স্বেচ্ছায় আত্মসুখ বিসর্জ্জন দেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের বুয়র-সমরে মহাত্মা গান্ধি ইংরাজদের পক্ষে অনেক সহযোগী লইয়া সাহায্য করেন। এমন কি ইহার পুরস্কার স্বরূপ সমর-পদকও (war-medal) তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল। তিনি যখন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ বশতঃ ভারতে যাত্রা করেন তাহারই কিছু পূর্ব্বে সেই দেশের (নেটালের) প্রধান মন্ত্রী স্যারজন রবিন্‌সন্ একদিন চিঠিতে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "মিষ্টার গান্ধির ন্যায় সুবিখ্যাত ও সক্ষম নাগরিকের কার্য্যকালে যদি আমি উপস্থিত

* প্রবাসী, মাঘ ১৩২০

থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে কতই সুখের বিষয় হইত। তাঁহার স্বদেশীয় জনসাধারণের হিতার্থ তিনি যে মহা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, আমি অন্তরের সহিত তাহার সাফল্য কামনা করি।" সেই দেবতাকেই আজ অনাহারে অনিদ্রায় কারা-ক্লেশে দিন যাপন করিতে হইতেছে।

তাঁহার সহযোগী ভ্রাতৃগণের দুঃখকাহিনী গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্বের সকাশে জানাইবার উদ্দেশ্যে একখানা সংবাদ-পত্রের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে (Indian Opinion) "ভারতীয় মতামত" নামে এক খানা সংবাদ-পত্র বাহির করেন। এইরূপে আফ্রিকাবাসী ভারত-সন্তানদের সেবায় গান্ধি কতবার কারাক্লেশ ভুগিয়াছেন তাহা ভাবিতে গেলে বাস্তবিক বিস্ময়-রসে পরিপ্লুত হইতে হয়।

ভারত-দলনার্থ সে দেশে কতবার কত আইনকানুন জারি হয় এবং তাহার প্রতি-রোধার্থ অনেকরূপে অনেকবার তিনি বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

একবার ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কয়েক জন ভারত-বাসী ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। যখন এই সংবাদ মহাপ্রাণ গান্ধি শুনিতে পাইলেন তখনই তিনি নিজেকে বন্ধুবর্গের অপরাধের নেতা ও উৎসাহদাতা বলিয়া স্বীকার করতঃ তাঁহারও যাহাতে তাঁহার বন্ধুবর্গের মত সমান কারাদণ্ডের আদেশ হয় এইজন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি মাত্র দুই মাস বিনা শ্রমে কারাবাসেরই আদেশ হইয়াছিল!

মহাত্মা গান্ধির কার্য্য সকলই অলৌকিক! সপরিবারে তিনি এত দুঃখ ভুগিয়াই দেশের সেবা করিতেছেন। একবার "ফিনিক্স" নগরে তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তানের রোগ-সংবাদ পাইলেন। যদি পুত্ররত্নকে বাঁচাইবার সাধ থাকে তবে গান্ধি যেন অগৌণে সেখানে যাইয়া তাহাকে দেখেন এই মর্ম্মে সংবাদ আসে। কিন্তু কর্ত্তব্যপ্রাণ আদর্শকর্ম্মযোগী উত্তরে লিখিলেন; My greater duty lay in Johanesburg, where the community had need of me, and my child's life or death must be left in God's hands." অর্থাৎ জোহানেসবার্গে আমার বিশেষ কাজ আছে; এখানেই আমার মহত্তর কর্ত্তব্য বিরাজমান। আমার প্রিয় সন্তানের জীবন বা মৃত্যু বিভুর হস্তেই ন্যস্ত হইবে, তিনিই সমুচিত বিধান করিবেন।

গান্ধির জ্যেষ্ঠ পুত্র অনেক বার অত্যাচারের প্রতিরোধার্থে কারাবাস ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তানকেও কারাক্লেশ প্রভৃতি শারীরিক কষ্টে (Hardships) অভ্যস্ত করি-বার উদ্দেশ্যে তিনি অন্য একবার ট্রান্সভালের কারাগারে তাহাকে সঙ্গী করিয়া লইয়া যান। তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে বোধ করি পাঠকগণ অবগত আছেন। স্বল্প দিন হইল গান্ধি-জায়া জেল হইতে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালময় শরীর লইয়া ফিরিয়াছেন। তাঁহার জন্য কারাগারে বিশেষ খাদ্য (Special diet) ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সহযোগী কারাবাসী ভাই-ভগিনী-গণকে ফেলিয়া উহা খাইতে সম্মত হন নাই। ইহাই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের এক মাত্র কারণ।

তিনি সেখানে হিন্দু-মুসলমানের "একতা" সাধনের নিমিত্ত অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। তাহারই ফলে আজ তথায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে খুব কচিৎই বিরোধের সংবাদ শোনা যায়। তাঁহার চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমান একযোগে তথায় কাজ, ধর্ম্মঘট, অথবা

দুঃখকষ্ট ভোগ করে। তিনি মনে করেন হিন্দু ও মুসলমান একই জননীর সন্তান।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় বিংশতি বৎসরাধিক ধরিয়া ঋত্বিকরূপে মহানুভব গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকায় যে "ভারত-দলন-প্রতীকার"-যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন আজও তাহা সমাপ্ত হয় নাই। জানি না এই মহাযজ্ঞ কত দিনে শেষ হইবে।

মহাযোগী মোহনদাস গান্ধি এখনও ৪৫ বৎসরের পূর্ণ যুবক।

এখন ভারতবাসিগণ, দেখুন আপনাদের পরম আদর্শ—ভারতমাতার আদর্শ সন্তান—ভারতের অমানিশাকাশের উজ্জ্বলতম আশাতারা ঐ সুদূরে যোগমগ্ন। একবার মানসনেত্রে তাঁহার মোহনরূপ ধ্যান করিয়া নিজেকে সার্থক করুন্।

গান্ধির পূজার সমাপ্তি এখনও বহুদূরে! ভ্রাতৃগণ! আপনারাও এই মহা মাতৃযজ্ঞে তাঁহার সহায় হউন!

শ্রীরমণীরঞ্জন চৌধুরী।

পশুখাদ্যের অভাব*

যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের স্বার্থে আঘাত করে, তাহাই নিবারণ করিতে আমরা সতত তৎপর থাকি; পরোক্ষভাবে যাহা দ্বারা আমাদের স্বার্থ বিদলিত হয়, দিন থাকিতে আমরা তন্নিবারণে যত্নবান না হইয়া অনেক সময় বিষম বিপদে পড়ি। কিরূপে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইয়া অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদন হইতে পারে, মানুষের খাদ্য-শস্যাদির দর কোথায় কিরূপ, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে কোন উপায়ে কোথা হইতে খাদ্য-শস্য আমদানি করিয়া দুর্ভিক্ষের কবল হইতে মানবকুলকে রক্ষা করিতে পারা যায়, ধান্যাদি আদৌ উৎপন্ন না হইলে তদন্তকল্পে কোন দ্রব্য দ্বারা মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারা যায়, এই সব চিন্তাতেই মানুষ সর্ব্বদা আকুল। যে পশু-কুলের পরিশ্রমের অমৃতফল স্বরূপ খাদ্য-শস্য আমরা মৃত্তিকা হইতে প্রাপ্ত হই, যে পশু-কুলের বৎসগণের খাদ্য-শস্য অপহরণ করিয়া আমরা আমাদের পুষ্টিবর্দ্ধন ও বিলাসবাসনা তৃপ্ত করি, যে পশুকুল আমাদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়, স্থান হইতে স্থানান্তরে আমাদের খাদ্যাদি বহন করিয়া থাকে, সেই পশুকুলের খাদ্যাভাব আশঙ্কিত হইলে আমরা কি বিচলিত হই? সেই পশুকুলের ধ্বংসে আমাদেরও ধ্বংসের আশঙ্কা আছে, এ কথা আমরা কয়বার ভাবি? আমরা ভাবি না, কেননা আমরা স্বার্থপর;—আমরা ভাবি না, কেননা আমরা নির্ব্বোধ।

ধান্য যেমন আমাদের প্রধান খাদ্য, ঘাস ও খড় তেমনি গবাদির প্রধান খাদ্য। আমরা ধান্য হইতে আমাদের খাদ্যোপযোগী তণ্ডুল লইয়া আমাদের অখাদ্য সামান্য পরিমাণ কুঁড়ামাত্র গবাদির খাদ্যের জন্য দিয়া থাকি; কিন্তু এই সামান্য দানের আমরা বিপুল প্রতিদান লইতে ছাড়ি না,—পশু-খাদ্যের অধিকাংশ আমরা আমাদের বিবিধ প্রয়োজনে

* "ব্যবসা ও বাণিজ্য" হইতে উদ্ধৃত।

গ্রহণ করিয়া থাকি। চাল নির্ম্মাণ করিতে খড়ের আবশ্যক হয়, দড়ি করিতে উলু খড় লাগিয়া থাকে, ঝাঁংলা তৈয়ারী করিতে খড়ের দরকার, গৃহস্থের ঘরের জন্য যে অসংখ্য বিঁড়ার দরকার, খড় হইতে তাহা প্রস্তত হয়, সামান্য গৃহস্থগণ বসিবার জন্য খড় দিয়া নিরেট বিঁড়া তৈয়ারী করিয়া থাকে, পুষ্করিণীর পানা তুলিয়া ফেলিতে অতি দীর্ঘ ও স্থূল খড়ের কাছি তৈয়ারী হইয়া থাকে, প্রতিমার আদ্‌বা প্রস্তত করিতে খড় আবশ্যক। অবস্থাবিশেষে হিন্দু গৃহস্থ খড় বিছাইয়া শয্যা প্রস্তত করিয়া থাকে, কৃষক অনেক বীজতলা খড় দিয়া ঢাকিয়া থাকে, অনেক কৃষিজীবী গৃহস্থ সারা বৎসর খড়ের জ্বালে রন্ধন-কার্য্যাদি সমাধা করিয়া থাকে। এইরূপে আমরা গোজাতির মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আপনাপন স্বার্থ সিদ্ধি করি। কৃষিকার্য্যে গোজাতি আমাদের অংশীদার, কিন্তু কৃষিলব্ধ ধন-ভোগে তাহাদিগকে আমরা আমাদের অংশীদার হইতে দেই না। যে বৎসর সুবৃষ্টি হয়, খড়-ধান্যে মাঠ পরিপূর্ণ হইয়া যায়, সে বৎসরও আমরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে খড়ের ব্যবহারে গোজাতির পক্ষে খড়ের দুর্ভিক্ষ সঞ্জাত করিয়া থাকি। পূর্ব্বে খড়ের অভাব পূরণ জন্য গোজাতির পক্ষে গোচারণ-ক্ষেত্র উন্মুক্ত ছিল, পুরাতন গোচারণক্ষেত্র এক্ষণে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, এখন আমাদের জ্বালায় গোজাতিকে অর্দ্ধাশনে থাকিয়া কৃশ ও দুর্ব্বল হইতে হইয়াছে। ইহার কুফল আমরা অলক্ষিত ভাবে ভোগ করিতেছি বলিয়া আমরা আমাদের ভয়াবহ পরিণাম—আমাদের ভাল—বুঝিতেছি না। পূর্ব্বে যে ক্ষেত্রে ১২।১৪ মণ ধান্য ও তদনুপাতে খড় উৎপন্ন হইত, এখন সে ক্ষেত্রে ৫ মণ ধান্য ও তদনুপাতিক খড় উৎপন্ন হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই জটিল ব্যাপারের ভিতর না তলাইয়া বলিয়া থাকি যে উপর্য্যুপরি চাষে জমি অনুর্ব্বরা হওয়ায় এইরূপ ফসল-হানি হইতেছে। কিন্তু বিশেষরূপে তথ্যানুসন্ধান করিয়া বলিতে গেলে বলিতেই হইবে যে এই ফসল-হানির একমাত্র কারণ জমির অনুর্ব্বরতা নহে; কৃশ ও দুর্ব্বল গরু দ্বারা চাষ ভালরূপ না হওয়াও এই ফসল-হানির অন্যতর কারণ।

পাশ্চাত্য দেশে কৃষিজাত খড়ের উপর লোকে গবাদির জন্য নির্ভর করিয়া ক্ষান্ত থাকে না। শস্যের যেমন চাষ হইয়া থাকে, তেমনই গবাদির আহার্য্য তৃণ-মূলাদির স্বতন্ত্র চাষ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে মেঠোকপি (field cabbage) মেঠো শালগাম (field turnip) পশু খাদ্য বিবিধ শাক (clover, Lucerne &c.,) বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন করিবার জন্য কৃষকগণ সতত ব্যস্ত থাকে। পশু-খাদ্যের পৃথক্ চাষ করা দূরে থাকুক, যে সকল গোচর জমি পতিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে তাহাতে সাধারণ ঘাস জন্মিয়া গোজাতির ক্ষুন্নিবৃত্তি করতঃ গোকুল রক্ষা করিতে পারিত, সেই সকল গোচর জমি পর্য্যন্ত আমরা আবাদ করিয়া আমাদের উদরপূর্ত্তি করিতেছি। খাদ্যাভাবে গোবংশ নির্ম্মূল হইলে আমাদিগকে যে অকর্ষিত ভূমি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে, উদরের জ্বালায় আমরা এ কথা ভাবিবার অবসর পাই না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর খড়ের বাজার খুব গরম হইলেও ফাল্গুন মাসে টাকায় প্রায় ছয় সাত পণ বিচালী খড় ও দেড় পণ নোট খড় পাওয়া যাইত, মফঃস্বলে নোট খড় টাকায় চারি পণ হিসাবে বিক্রয় হইত। গত বৎসর ফাল্গুন

মাসে খড়ের দর হইয়াছে। কাঁথি সহরে টাকায় বিচালী তিন পণ সাড়ে তিন পণ, নোট খড় বার গণ্ডা হইতে ষোল গণ্ডা, মফঃস্বলে নোট খড় টাকায় দেড় পণ হইতে দুই পণ। এখন ঘর ছাওয়ার কাজ আরম্ভ হয় নাই, এখনই খড়ের এই অগ্নিমূল্য, দুই এক মাস পরে লোকের ঘর ছাওয়া কাজ আরম্ভ হইলে খড়ের যে কি চড়া দর হইবে,—চড়া-দর দায়ে পড়িয়া দিলেও লোকে খড় পাইবে কিনা এ তর্ক মনে উদয় হইলে আশঙ্কার অবধি থাকে না। দেশে যে খড় বর্ত্তমান আছে তাহাতে ঘর ছাওয়ার পর খড় উদ্বৃত্ত হইয়া গবাদির খাদ্যের সঙ্কুলান হওয়া দূরের কথা, সেই খড় লোকের ঘর ছাওয়ার জন্য পর্য্যন্ত হওয়াই ভার। দুই মাস পরে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইলে মাঠে গরু চরা বন্ধ হইবে। তখন গরু খাইবে কি, না খাইয়াই বা গরু চাষের কার্য্য করিবে কেমন করিয়া? চাষের গরু ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে বা অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিলে আগামী বর্ষে সুফল প্রাপ্তির আশা বা কেমন করিয়া করা যাইবে?

বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা মন্দের ভাল একটী উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারি। উপায় একবৎসর অবলম্বিত হইলে গোরক্ষা-কার্য্য কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উড়িষ্যা কোষ্ট কেনেল ও হিজলী টাইডেল কেনেলের উভয় পার্শ্বে যে বাঁধ আছে এবং বঙ্গোপসাগর কূলে যে বৃহৎ সি-ডাইক রহিয়াছে, তাহাতে যে ঘাস জন্মায় তাহা এত দীর্ঘ নহে যে লোকে তাহা কাটিয়া আনিয়া গরুকে খাওয়াইতে পারে। গরু সে বাঁধের উপর অবাধে চরিতে পাইলে অনেক গরু বাঁচিয়া যাইতে পারে। পূর্ত্ত-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ এখন সে সব বাঁধে গরু চরিতে দেন না।

স্ত্রী-পুরুষ ভেদ

কোন কোন এককোষাত্মক জন্তু ও উদ্ভিদে যৌনসম্মিলন দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা প্রকৃত যৌন সম্মিলন নয়, তবে যৌনসম্মিলনের সামান্য সংযোগ মাত্র। দুইটী কোষ পরস্পর সংলগ্ন হইলে উহাদের প্রত্যেকটী হইতেই একটী শুণ্ডবৎ অংশ নির্গত হইয়া অপরটীর দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। ফলতঃ উভয়েরই প্রাণাঙ্ক মিশ্রিত হইয়া যায়। সুতরাং দুইটী কোষকেন্দ্রের মিলনে একটী কোষকেন্দ্র প্রস্তুত হয়। এই মিলিত কোষের নাম জাইগ-স্পোর্। কিয়ৎকাল যাবৎ জাইগস্পোর্ নিষ্ক্রিয়াবস্থায় অবস্থান করে; তৎপরে সামান্য কোষবিভাগ দ্বারা তাহা হইতে কতিপয় সংখ্যক বীজকোষ জন্মে। ইহারাই ভবিষ্য-জন্তু বা উদ্ভিদ। এই জাতীয় কোষসম্মিলনকে সামান্য সংযোগ বলা হইয়া থাকে; যেহেতু সম্মিলিত কোষদ্বয় একই প্রকারের। প্রকৃত যৌন সম্মিলন সর্ব্বদাই উচ্চস্তরস্থ প্রাণিজগতে বিদ্যমান। এরূপ ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। যে যে জন্তুর মধ্যে এতদ্রূপায়ে সন্তানোৎপত্তি হয় কেবল মাত্র তজ্জাতীয় স্ত্রীরই গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে। স্ত্রীর গর্ভাশয়ে শুক্রকোষ ও গর্ভকোষের সম্মিলনকে গর্ভাধান কহে। এই সম্মিলনের ফলে যে পদার্থের উৎপত্তি হয় তাহার নাম ভ্রূণ। কোষ-সম্মিলন ও ভ্রূণোৎপত্তির

ব্যবধান কালে নানাবিধ জটিল পরিবর্ত্তন ঘটে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অসংখ্য কোষবিশিষ্ট যে জীবদেহ তাহা এই এক কোষাত্মক ভ্রূণেরই পরিবর্দ্ধিত অবস্থা। প্রত্যেক ভ্রূণেই কোষসংবিভাগ সম্বন্ধীয় বহু প্রকারের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এইরূপে উহা উত্তরোত্তর স্বীয় জাতীয়তা বিকাশে অগ্রসর হয়।

এই পরিবর্দ্ধনশীল ভ্রূণ যে প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষত্ব অথবা স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয় তাহাদের প্রকৃতি নির্ণয় করাই আমাদের আলোচ্যবিষয়। এই সমস্যাটী প্রাণ-বিজ্ঞানে নূতন বিষয় নহে। প্রশ্নটীর সমীচীন মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই। এ পর্য্যন্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীর দ্বারা যতগুলি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে কোনটীই একেবারে নিশ্চিন্তভাবে বলিতে পারে না "এইটীই সর্ব্বতোভাবে সত্যমূলক অদ্বিতীয় তথ্য।" যৌক্তিকতা ও তন্নিবন্ধন তাহাদিগের আপেক্ষিক গুরুত্বানুযায়ী এই তথ্যরাশিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) পর্য্যবেক্ষণ ও কল্পনামূলক ও (২) পর্য্যালোচনা ও যুক্তিমূলক।

(১) পর্য্যবেক্ষণ ও কল্পনামূলক তথ্য নির্ণয়—অধিকাংশ বিষয়েই বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার বহুপূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে ঈশ্বরবাদিগণের শাস্ত্র ও পরাবিদ্যার আলোচনা-যুগ লক্ষিত হয়। এস্থলে ঈশ্বরবাদ অর্থে গভীর গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক ব্যাপার নহে। এই ঈশ্বরবাদ Theologyর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, চেয়ার-টেবিলে আসীন ঈশ্বরের সেবক! আর এই পরাবিদ্যায় হিন্দু-দর্শন ও বেদান্তবাদ বা পাশ্চাত্য-খণ্ডের কান্ত, হেগেল, ও বোর্গসোন্ প্রমুখ মনীষীর দর্শন-শাস্ত্র বুঝিলে তাঁহাদিগকে নিতান্তই অবমাননা-ভাজন করা হয়। ইহা খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর Metaphysics. এইকালে গ্রীক্ পণ্ডিত এম্‌পেডোক্লিস্ জীবাভিব্যক্তিতে স্কন্ধবিহীন হস্ত, পশুর মস্তকবিশিষ্ট মনুষ্য ও মনুষ্যের মস্তকসংযুক্ত পশুরাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেন। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুমোদিত পরীক্ষা ও তজ্জাত ফল হইতে যুক্তিসঙ্গতভাবে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে এমনই এক যুগ অতীত হইয়াছে। তখন কেবল পণ্ডিতেরা স্থানীয় অল্পসংখ্যক ঘটনার তালিকা সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর ভাসাভাসা চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। এইরূপে যাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই মতরূপে প্রকাশ করিয়া বসিতেন। স্থিরীকৃত হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত ইত্যাকার মূল্যহীন মতের সংখ্যা পাঁচশতে দাঁড়ায়! ইহাদের প্রত্যেকটীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করা একরূপ অসম্ভব; অধিকন্তু, তাহাতে কোন লাভও নাই। ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্ববাদী, পরাবিদ্যার্থী, ও পর্য্যবেক্ষক,—এই তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথমোক্তদিগের উত্তরটী অতীব সহজ। "পরমেশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী সৃজন করিয়াছেন,"—ইহা বলা অপেক্ষা আর কি অধিকতর সহজ হইতে পারে? দ্বিতীয় দল জীবের "অন্তর্নিহিত বিশেষ শক্তির" আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের মতে—এই শক্তিই জীবের পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব বিধাত্রী। ইহার প্রকৃতি বোধাতীত। তৃতীয় পর্য্যায়ভুক্ত বৈজ্ঞানিকগণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। ইঁহাদের প্রচারিত দুই প্রকার ডিম্বকোষের কথায় এখনও কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তার পর যাঁহারা না কি বলেন যে ডিম্বকোষে একাধিক সংখ্যক শুক্র-প্রবেশ স্বাভাবিক ও ইহাই

বর্ত্তমান সমস্যার কারণ, তাঁহারা সম্পূর্ণই কল্পনাবিহারী।

থূরীর বিবেচনায় গর্ভাধানকালে ডিম্ব-কোষের বয়ঃক্রম লিঙ্গভেদের কারণ। ইহা অদ্বিতীয় বা অতি প্রধান কারণ না হইলেও চিন্তনীয় বিষয় বটে। হেন্‌সেন্‌ও এই মতের পৃষ্ঠপোষক। তা ছাড়া তিনি বলেন শুক্র-কোষের বয়সও এ ব্যাপারে ভাগ্যনিয়ামক। হোফেকের্ ও সেড্‌লার্ যে হেতু নির্ণয় করেন, তাহা প্রমাণাভাবে নগণ্য। তাঁহাদিগের প্রচারিত মতবাদে পিতামাতার বয়স ধর্ত্তব্য। পণ্ডিতবর ওয়েষ্টারমার্ক তাঁহার সুবিখ্যাত "মানব বিবাহের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে পুত্র বা কন্যা জন্মিবার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি কারণের আলোচনা করিয়াও কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তিনি এই একটী কারণের উল্লেখ করিয়াছেন যে, পিতামাতার মধ্যে যদি পিতার বয়স মাতার অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে সন্তানের মধ্যে ছেলের সংখ্যা বেশি হইবে এবং যদি মাতার বয়স পিতার অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে মেয়ের সংখ্যা বেশি হইবে।" * হোফেকের স্যাড্‌লারের এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। অবশ্য গেলার,বনেঙ্গার, লেগইট, ব্রেস্‌ল, নইরট্ ও কতিপয় পশুপক্ষি-পালকগণ এই সিদ্ধান্তে সহানুভূতি প্রকাশ করেন; কিন্তু ফলিত-প্রাণবিজ্ঞানে অধিকতর প্রভাববিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী। ষ্টিডা কর্ত্তৃক সংগৃহীত অ্যাল্‌সাস্‌লোরেইন্ প্রদেশের ও বের্‌নার্ সংগৃহীত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার, জন্মতালিকানুসারে উক্ত মতের সমীচীনতা প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

তারপর আমরা দেখিতে পাই গিব্ক ও ষ্টার্ক্‌ওয়েদার প্রচারিত মতদ্বয়ও আধুনিক প্রাণবিজ্ঞান হইতে নির্ব্বাসিত। বর্ত্তমান্ প্রশ্নের সমাধান মহাত্মা চার্ল্‌স্ ডারুউইনের নিকটও বড় বেশী ঋণী নয়। অভিব্যক্তির স্তরে সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীপুরুষভেদে বিভিন্ন জনন-কোষের উৎপত্তি, অথবা ভ্রূণোদ্বর্ত্তনে, অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের ভ্রূণপুষ্টিকালে ইহার যৌনবিধানসংক্রান্ত বিষয়াবলীর আলোচনায় তিনি কিছুই নূতনত্ব প্রতিপাদন করেন নাই। শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে বয়ঃক্রম, গর্ভকাল, ইত্যাদি তৎকাল প্রচলিত কারণেরই সাধারণভাবে পুনরাবৃত্তি করিয়া গিয়াছেন।

(২) পর্য্যালোচনা ও যুক্তিমূলক তত্ত্বনির্ণয়,—জীবজগতের পরাবর্ত্তনের মূলে খাদ্যাখাদ্যের প্রভাব অতিশয় প্রবলাবস্থায় বর্ত্তমান্ রহিয়াছে। অভিব্যক্তি-মার্গে যোনিপ্রকরণের প্রধান সহায় খাদ্যাভাব,—ইহাই বর্ত্তমান্ সময়ের ডারুউইন্, এবং প্রাণবিজ্ঞানে যুগান্তর-আনয়নকারী অধ্যাপক ভাইজ্‌মানের বিশিষ্টমত। সুতরাং ক্লড্ বার্ণার্ড্ যে ভ্রূণোদ্বর্ত্তনে খাদ্যকেই পুত্রকন্যা-জন্মের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা বিন্দুমাত্র অসমীচীন নহে।

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মতের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য বহুসংখ্যক কর্ম্মী পরীক্ষা ও যৌক্তিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই ভেক, মধুমক্ষিকা, বোল্‌তা, অ্যাফাইড্‌স্ পতঙ্গ, প্রজাপতি, বহুসংখ্যক স্তন্যপায়ী ও উদ্ভিদ লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন। যত্নসহকারে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করিয়া ইউং ভেককন্যার সংখ্যা শতকরা ৫২ হইতে ৯২ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। এ, ফোন্ প্লাণ্টা,

* প্রবাসী ১৩২০; জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত 'পুত্রকন্যা-জন্মের কারণ ও অনুপাত'।

আইমার্, রোল্ফ্ ইত্যাদি কতিপয় বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষা হইতেও একই মত সমর্থিত হয়। ফোন্ সিবোল্ড্ বোলতার সহিত শ্রীমতী টি্টস্পত্নী কয়েক জাতীয় পতঙ্গ লইয়া, এবং রোল্ফ্ ক্রাসটেসিয়া বা চিংড়ি শ্রেণীস্থ জন্তু সহকারে পরীক্ষা করেন। এই সমস্ত পরীক্ষার ফলে ঐ একই মত উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ করিতে থাকে।

এ সম্বন্ধে উচ্চস্তরের জন্তু লইয়া কার্য্য করা বড়ই দুঃসাধ্য। তথাপি বিজ্ঞানভিক্ষুগণ পশ্চাৎপদ হন নাই। সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গিরু দক্ষতার সহিত একটী প্রামাণিক পরীক্ষা সমাপন করেন। তিনি তিনশত মেষীকে সমান দুই দলে বিভক্ত করিয়া প্রথমদলের জন্য রাজভোগের ব্যবস্থা, এবং দ্বিতীয় দলের জন্য আতপ চা'ল ও কাঁচা কলার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তারপর প্রথম দলের মধ্যে পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত দুইটী মেষ, এবং অপরদলে দুইটী প্রৌঢ় মেষ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দুই দল যথাক্রমে গড়ে শতকরা ৬০ ও ৪০ সংখ্যক কন্যা প্রসব করিয়াছিল। খাদ্যসম্বন্ধীয় কারণের সমর্থন করণান্তর ডুসিং আরও বলেন, যে সকল মেষী না কি স্থূলকায় তাহারাই কন্যা প্রসব করে।

মানুষ সম্বন্ধে এই সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করা যদিও যৎপরোনাস্তি কষ্টকর, তবুও যাহা হইয়াছে তাহা খাদ্য বা পুষ্টিমতেরই পোষক। হোমিনিডি পরিবারের জাতিসমূহে এই প্রণালী প্রয়োগকারীদিগের মধ্যে প্লস্ হইতেছেন সর্ব্বাগ্রগণ্য। ফলিত তথ্যের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, কোন সংক্রামক পীড়ার বাড়াবাড়ি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের পর কন্যা অপেক্ষা পুত্র অধিক সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করে। তা ছাড়া ডুসিং বলেন, যে সকল স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং যাহাদের ঋতুস্রাব খুব কম, তাহারা অধিক সংখ্যায় পুত্রসন্তান প্রসব করে। ক্ষুদ্র গর্ভাশয় ও ঋতুস্রাবের অল্পতার কারণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।

শস্যসাফল্য ও বাজার দরের তারতম্যের সহিত পুত্রকন্যার সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হয়। সহরে ও ভদ্রধনিগৃহে কন্যাধিক্য এবং দরিদ্র-গৃহে পুত্রাধিক্য লক্ষিত হয়।

উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে প্রাপ্ত প্রমাণ সর্ব্বৈব প্রামাণিক না হইলেও পুষ্টিমতেরই অনুমোদক। পুত্রকন্যার জন্মবিষয়ে খাদ্যের ন্যায় তাপেরও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। স্বপক্ব তাপসেবনে কন্যারই সম্ভাবনা বেশী।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, (ক) পিতা-মাতার খাদ্য, বয়ঃক্রম, স্বাস্থ্য ইত্যাদি; (খ) মাতার গর্ভের আভ্যন্তরিক অবস্থা; ও (গ) মাতৃগর্ভে ভ্রূণপুষ্টির অবস্থানাকল্য, এই প্রভাবত্রয়ের সমবেত শক্তি যোনি-প্রকরণের কর্ণধারিণী স্বরূপ।

জননকোষে কি কি পরিবর্ত্তনের সহিত উল্লিখিত প্রভাবরাজির কার্য্যকারিতা সংশ্লিষ্ট, প্রবন্ধের শেষাংশে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইবে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে পঙ্গপালের শুক্রপুষ্টি পর্য্যালোচনা করিয়া ম্যাক্‌ক্লাং উহাদের শুক্রকোষে দুই প্রকার রঞ্জন-সূত্র আবিষ্কার করেন। অবশ্য এ বিষয়ে প্রথমে চেষ্টা করেন হেংকিং। তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে খদ্যোতকুলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। ম্যাক্‌ক্লাঙের আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই ষ্টিভেন্স্ ও উইল্সন্ নানা জাতীয় পতঙ্গ লইয়া এবং বোভেরি সমুদ্রার্চ্চিন্ লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন। ইহারা সকলেই দুই

প্রকার শুক্রকোষ দেখিতে পাইলেন। বাহ্যাকৃতিতে ইহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। পার্থক্য ইহাদের রঞ্জন-সূত্রের সংখ্যায়; অর্থাৎ কতকগুলির রঞ্জন-সূত্র অবশিষ্ট কোষের সূত্রাপেক্ষা এক অধিক। এই সূত্রটীর আকার ও গঠনের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। ইহার নাম 'অযুগ্ম রঞ্জন-সূত্র'। উক্ত একই জাতীয় স্ত্রীগণের প্রত্যেক গর্ভকোষই অযুগ্ম রঞ্জন-সূত্র-বিশিষ্ট। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে গর্ভকোষে সমচরিত্র রঞ্জন-সূত্র ও শুক্র-কোষে বিষম-চরিত্র রঞ্জন-সূত্র। এই সাম্য ও বৈষম্য ভ্রূণের লিঙ্গনির্ণায়ক।

এখন দেখা যা'ক কি রূপ কৌশল সহযোগে অযুগ্ম রঞ্জন-সূত্র কার্য্যকারক। যখন একটী অযুগ্ম রঞ্জন-সূত্রযুক্ত শুক্রকোষ একটী গর্ভ-কোষের (যাহার সকলগুলিই অযুগ্মসূত্র-সংযুক্ত) সহিত মিলিত হইয়া গর্ভসঞ্চার বা ভ্রূণোৎপাদন করে, তাহা হইলে এই ভ্রূণে দুইটী অযুগ্ম রঞ্জন-সূত্রের সমাবেশ হইল। ভ্রূণ পুনঃ পুনঃ সংবিভাগ দ্বারা অসংখ্য কোষে বিভক্ত হয়। ইহার কতকগুলি দ্বারা দেহ-গঠন-ক্রিয়া চলিতে থাকে; এই জন্য ইহাদের নাম দৈহিক কোষ। অপরগুলি জনন-কোষ রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। কালে এই আদি জনন-কোষই শুক্রকোষে কিম্বা গর্ভকোষে পরিণত হয়। আমরা দেখিতেছি যে আমাদের ভ্রূণের আদি জনন-কোষে দুইটী অযুগ্ম রঞ্জন-সূত্রের সমাবেশ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কতিপয় সংখ্যক সাধারণ রঞ্জন-সূত্রও বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুং-কোষ বা শুক্রকোষ ও স্ত্রীকোষ বা গর্ভকোষে ইহাদের সংখ্যা, আদি জনন-কোষস্থ সংখ্যার অর্দ্ধেক। ধরা যা'ক এস্থলে ভ্রূণের সাধারণ রঞ্জন-সূত্রের সংখ্যা ২২; কতিপয় সংখ্যক শুক্রকোষে অযুগ্ম রঞ্জন-সূত্র এক। সুতরাং কতকগুলি শুক্র-কোষে ২২টী রঞ্জন-সূত্র; অপরগুলিতে ২৩টী। গর্ভকোষের সকল গুলিতেই ২২ + ১ = ২৩টী রঞ্জন-সূত্র। তাহা হইলে, যে ভ্রূণের আদি জনন-কোষ ২টী অযুগ্ম সূত্রের সমাবেশ তাহার মোট রঞ্জন-সূত্র ২৪। কাজেই তদুৎপন্ন গ্যামেটে এই সংখ্যার অর্দ্ধেক ১২টী রঞ্জন-সূত্র দেখিতে পাইব। তাহার অর্থ প্রত্যেক গ্যামেট সমচরিত্র রঞ্জন-সূত্রযুক্ত, যেহেতু প্রত্যেক স্থলেই এক একটী অযুগ্ম রঞ্জন-সূত্র অবস্থান করিতেছে। অতএব এইরূপ সম্মিলনে কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল।

যখন অযুগ্ম রঞ্জন-সূত্রবিহীন একটী শুক্র-কোষ একটী গর্ভকোষের সহিত মিলিত হয় তখন পুত্রসন্তানের জন্ম অনিবার্য্য। কারণ গর্ভকোষীয় রঞ্জনসূত্র ১২ + শুক্রকোষীয় রঞ্জন-সূত্র ১১। অতএব আদি জনন-কোষে ২৩। সুতরাং উৎপন্ন গ্যামেটের অর্দ্ধেক ১১ ও অবশিষ্ট ১২টী রঞ্জন-সূত্র পাওয়া যাইবে। এরূপ চরিত্রের বিশেষণ কি? বিষম। তার মানেই পুত্র। বিবৃত প্রণালী বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক দ্বারা নানা জাতীয় জন্তুতে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইয়াছে। এখানে ইহা প্রাণ-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সত্য। এ সম্বন্ধে কোন বাক্‌বিতণ্ডা নাই। সম্প্রতি ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের অন্যতম অধ্যায়।

পারিভাষিক শব্দ

এই প্রবন্ধের যে যে শব্দ 'সঙ্করজাতি ও তাহার বন্ধ্যাতা' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহাদের পুনরুল্লেখ করা হইল না।

অযুগ্ম রঞ্জন-সূত্র	'X' chromosome, sex chromosome or accessory chromosome.
আদি জনন-কোষ	Primordial germ cell.
এককোষাত্মক জন্তু	Unicellular animal.
গ্যামেট্	Gamete—শুক্রকোষ ও গর্ভকোষ উভয়ই।
জাইগস্পোর্	Zygospore.
বীজকোষ	Oospore.
ভ্রূণোৎবর্দ্ধন	Ontogeny.

শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র,
উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা

সেবাশ্রমের আবশ্যকতা *

স্বামী বিবেকানন্দের "দরিদ্র-সেবা, নারায়ণ-সেবা" এই বাণী দেশের মধ্যে কি না মহা উপকার সাধন করিতেছে! দেখিতে দেখিতে দেশের মধ্যে আতুরাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছে—ধনী নির্ধনীর জন্য, উচ্চ নীচের জন্য, সুস্থ আতুরের জন্য আজকাল ভাবিতে শিখিতেছেন—আজকাল কেহ নিজের লইয়া থাকিতেই আনন্দ বোধ করেন না—নিজের যাহা কিছু আছে, পরের জন্য বিলাইয়া দিতে পারিলে যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করেন—এখন কেহ ভোগে সন্তুষ্ট নন্, ত্যাগেই মহা সুখ মহা আনন্দ লাভ করিতেছেন, আজকাল দেশের মধ্যে এক প্রেমের অব্যক্ত অন্তঃসলিল আকর্ষণের ভাব বেশ দেখা যাইতেছে—ইহাই দেশের পক্ষে মহা লাভ। এখন যে গরীব অসহায় আতুর সকলেই আমার আপন, আমারই কেহ বলিয়া ধারণা হইতেছে ইহাই দেশের পক্ষে সুবাতাস। এতদিন দেশের লোক দেশের জন্য হৃদয় দিয়া প্রাণ দিয়া অসহায়দিগকে ডাকে নাই, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হয় নাই, অভাবে অভাব অনুভব করে নাই, সুখে সুখী হয় নাই, আনন্দে আনন্দিত হয় নাই—তাহারা যেন পরিত্যক্ত, অস্পৃশ্য এইরূপ ধারণাই ছিল—লোকের হৃদয়ও শূন্য ছিল, যেন কিছুরই মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না—সবই উপরের চাক্‌চিক্য বা উপরের কার্য্য-কলাপেই সন্তুষ্ট হইতেন—যে দিন হইতে দেশের এই ভাব দূর হইয়াছে, সেই দিন হইতে দেশের প্রকৃত মঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে—দেশের লোক দেশকে ভালরূপে চিনিতেছেন—দেশের কাজ আজকাল বিশ্রাম-সুখ নয়, দেশের কাজ আজকাল করতালির আকাঙ্ক্ষা করে না, দেশের কাজ আজকাল সভা-সমিতিতে পর্য্যবসিত নয়। দেশের কাজে আজকাল একনিষ্ঠ, একপ্রাণ হৃদয়বান লোকের আবশ্যকতা বেশ অনুভব হইতেছে। এখন দেশের অভাব নানা প্রকারে সকলের সম্মুখে প্রতিমূর্ত্তির আকার ধারণ করিয়াছে। অভাবের তুলনায় প্রকৃত কর্ম্মী ও দানবীরের

* দরিদ্র-নারায়ণের পূজা-প্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি (১২ই মাঘ) উপলক্ষে লিখিত।

অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। যদিও দু' দশ জন হৃদয়বান একপ্রাণ একনিষ্ঠ লোকের অভাব-মোচন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা এত বিক্ষিপ্ত যে একযোগে কার্য্য করিবার সুযোগ পাইতেছেন না—সুতরাং দেশের অভাব অভাবেই থাকিয়া যাইতেছে। এই কলিকাতা সহরে যদিও কতক জেলা-সমিতি আছে, যদিও ছাত্রাবাসের মধ্যে এক-প্রাণতা আছে, যদিও সাধারণের নিজের গ্রামের নিজের জেলার নিজের আপন জনের বিপদ-আপদে, দুঃখে কষ্টে সাহায্য করিতে হৃদয় আছে, তথাপি অনেকে সংবাদ-অভাবে নিজের ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে সুযোগ পাইতেছেন না—এই কলিকাতায় নিঃসহায় অবস্থায় অপরের পরিত্যক্ত হইয়া যে কত প্রাণী অকালে অশুশ্রূষায়, অচিকিৎসায়, অযত্নে জীবলীলা সংবরণ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

আমাদের শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, ইচ্ছা আছে, কার্য্য করিবার প্রবৃত্তিও আছে, নাই কেবল শৃঙ্খলের সহিত কেন্দ্র-শক্তি-গঠনের ক্ষমতা। যদিও এই সকলের অভাব দূর হয় তথাপি নিষ্ফলতাকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া দূরভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করিবার উৎসাহ বা ধৈর্য্য আমাদের নাই। ইহাই আমাদের বর্ত্তমানের অভাব। এই ভিত্তি-হীন অভাবের যত শীঘ্র মোচন হইবে, আমাদের কার্য্য তত শীঘ্র ফলপ্রসূ হইবে, ইহা আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না। এই নিরাশাকে সর্ব্বদা মনে রাখিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, হয়ত এই সেবাশ্রমে অনেক বাধা-বিঘ্ন পড়িবে—হয়তঃ এই সেবা-শ্রমে পীড়িতের শুশ্রূষায়, আতুরের দুঃখ-মোচনে অনেকের অনেক সময়, অর্থ ও শক্তি ব্যয় হইবে, তজ্জন্য হয়ত অনেকের কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হইবেন, অনেকের হয়ত তজ্জন্য ইহার সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইবে, অনেকে হয়ত ইহার সম্বন্ধে নানা ভাবে নানা কথা বলিবেন, তজ্জন্য দুঃখিত বা হতাশ হইলে চলিবে না। এই সকল নৈরাশ্য, ও নানালোকের গ্লানি সহ্য করিয়াই মহৎ কার্য্য জগতের সমক্ষে আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছে, জগতের ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দিতেছে। সাধারণের উপকার, আতুরের সেবা, পরহিতে প্রাণ-দানই হিন্দুর ধর্ম্ম—হিন্দুর প্রধান বাণী—"পরার্থে প্রাণান্ উৎসৃজেৎ।" আজকাল দেশের এইরূপ যে কত অভাব আছে তাহা সামান্য চিন্তায়ই সহজে অনুমেয়। একজনে দশের কাজ কখনই সম্ভব নয়—দশে দশজনের কাজ করিলেই কার্য্যের সফলতা আশা করা যায়। বিশেষতঃ সেবা-শুশ্রূষায়, রোগীর সেবায়, দশ জনের সাহায্য একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ একজনে সকল কাজ করিতে গেলে তিনি হয়ত নিজেই পীড়িত হইতে পারেন এবং এইরূপ হইয়াই থাকেন—তাঁহারও জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে—ইত্যাদি কারণে যদি দশজনে সামঞ্জস্য করিয়া সময় করিয়া মনের আনন্দে হৃদয়ের উৎসাহে পরহিতে নিজকে নিয়োজিত করিতে পারেন, তবে দিন দিন তাঁহার নিজের হৃদয়ে যে অসীম বল সঞ্চয় হইবে, মনে যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন, তাহার তুলনায় তাঁহার সময় যে অনর্থক ব্যয়িত হয় নাই, এইরূপই ধারণা হইবে। আমাদের এই বিশ্বাস, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম পরস্পর পরস্পরের অধীন—ধর্ম্মের ভাবই কর্ম্মে পরিব্যক্ত—আবার কর্ম্ম-ধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত মানবের জীবনকাল একটী বৃহৎ

কর্ম্ম-ক্ষেত্র—এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যত বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য সম্পন্ন হইবে মানবের মনুষ্যত্ব ততই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিক দিয়া প্রকাশ পাইবে। ধর্ম্মভাব বাল্যকাল হইতেই শিক্ষার সহিত কার্য্যে সম্পন্ন করিতে না শিক্ষা করিলে ইহার পরিচালনা হয় না, কতকগুলি নীতি শিক্ষা হয় মাত্র—এই নীতি শিক্ষা ও কার্য্য পরিচালনায় অনেক প্রভেদ—এই কার্য্য পরিচালনই মানবের ধর্ম্ম-ভাব-গঠনের সহিত মানব-চরিত্র গঠন করিয়া থাকে। সেই জন্য আমাদের প্রত্যেক দিনের সন্ধ্যা-আহ্নিক প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্মের একটী স্থির সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক দিনকে আজকাল সাধারণের কার্য্যে কোন না কোন প্রকারে নিয়োজিত করাই আমাদের দেশ-ধর্ম্ম। দেশের অভাব যাঁহারা দেখিতেছেন তাঁহাদের নিকট কার্য্যের বা সময়ের অভাব হইবে না—যদি অভাব কিছু থাকে তবে তাহা প্রবৃত্তির। পরের সেবা অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই। আতুরের যত্নে, রোগীর শুশ্রূষায় মনকে উন্নত করিবে ভিন্ন অবনত করিবে না। ইহাতে সকলের সময়ও অনর্থক ব্যয় হইবে না এবং ইহার সার্থকতা প্রত্যেকে দৈনন্দিন উপলব্ধি করিবেন। বর্ত্তমানে কলিকাতা সকল কার্য্যের পরিচালক—এই কলিকাতায় লোকেরও অভাব নাই—আশা করি, সাধারণের প্রবৃত্তিরও অভাব হইবে না। যাহাতে কলিকাতায় এইরূপ একটী সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়, আমরা তদ্বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—ইহাতে বালক যুবা বৃদ্ধ সকলেরই যোগ দান করিতে বাধা নাই। ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের সকল মতাবলম্বী লোকেরই সমান অধিকার। ইহাতে দ্বেষ-হিংসা মনোমালিন্যের কোনও কারণ নাই—ইহাতে আর্থিক বা সম্মানের কোনরূপ তারতম্য নাই—ইহাতে আপন পর প্রভেদ নাই—ইহাতে রাজা প্রজা ভেদ নাই—অথচ ইহাতে কি রাজা কি প্রজা কি উচ্চ কি নীচ কি ধনী কি নির্ধন সকলেরই আবশ্যকতা আছে। দেশের এই অভাব দেশের অনেকেই বোধ করিতেছেন; বিশেষতঃ বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতায় এখন হইতেই কলেরা, বসন্ত প্রভৃতির যেরূপ প্রকোপ দেখা যাইতেছে তাহাতে এরূপ একটী সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা যে একান্ত বাঞ্ছনীয় তদ্বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈধ নাই।

বিনা চিকিৎসায়, বিনা শুশ্রূষায়, এমন কি আত্মীয় স্বজনকে পর্য্যন্ত বিনা সংবাদ দানে যাহাতে কেহ অকালে কাল-কবলে পতিত না হয় বা জীবলীলার সাঙ্গের সহিত যাহাতে মৃতের যথার্থ মৃতাচারে পতিত না হয়, তদ্বিষয়ে আমরা সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। আমরা এরূপও দেখিয়াছি যে লোকাভাবে বা অন্য কোন কারণে কোন মৃতব্যক্তি ২।৩ দিন সংকারাভাবে বাড়ীতে পচিয়াছে—তাহাতে সাধারণের স্বাস্থ্যের হানিত হইতেই পারে অধিকন্তু গৃহবাসীর হৃদয়ে দেশের লোকের প্রতি যে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেয় তাহা কিছুতেই লুপ্ত হইবার নহে। যে অসহায়ের সহায়, যে গরিবের দুঃখে দুঃখিত, সে-ই প্রকৃত বন্ধু। হিন্দুশাস্ত্র লেখকগণ বলিয়াছেন,

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষ রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

আরও বলিয়াছেন যে হিন্দুর মৃতের সংকারে মহাপুণ্য। যদি কাহাকেও প্রকৃত বন্ধু করিতে বাসনা থাকে, দেশের কার্য্য করিবার কাহারও হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা থাকে, যদি পরের জন্য কাহারও প্রাণে যাতনা

অনুভব হয়, যদি পরকে আপন করিতে অভিলাষী হও, তবে পরের কষ্টে কষ্ট অনুভব করিয়া, পরের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার প্রতীকারে জীবন-প্রাণ উৎসর্গ কর—দেখিবে হৃদয়ে অসীম সাহস, মনে অসীম বল আপনা হইতেই আসিবে। যে হিন্দুত্বের তুমি গৌরব কর, সে হিন্দুর মৃতসৎকার যদি মেথর মুর্দ্দাফরাস দ্বারা সাধিত হয়, তবে তোমার সে গৌরবের স্থান কোথায়? তোমার জাতির মৃত-সৎকার যদি পরের করিতে হয়, তবে তোমার জাতীয়তাতেও ধিক।

আমাদের এই কাতর প্রার্থনায় যদি নগরে নগরে, সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে এইরূপ সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে। দেশবাসীর ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলী ইহার সাফল্য প্রদান করিবে।

শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায়।

আবাসের পত্র

প্রায় বড় বড় লেখকদের একটা নিয়ম আছে তাঁহারা নিতান্ত আগ্রহের সহিত প্রবাসের পত্র লিখিয়া থাকেন। "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" আমার মনে যে কেন অকস্মাৎ সেই আকাঙ্ক্ষা হইল তাহার কোন কূল-কিনারা করিতে পারিতেছি না, গোষ্পদে যে কেন সমুদ্রের ঢেউ খেলিতে চাহে, বস্তুতঃ তাহার কোন জবাব নাই। প্রবাসের পত্র লিখিতে হইলে যে অন্ততঃ তিনটা জিনিসের দরকার। প্রথম বিশিষ্ট গ্রন্থকার হওয়া চাই, দ্বিতীয় প্রবাসে থাকা চাই, আর শেষে সঙ্গে বা অন্দরে একজন শিক্ষিতা অন্তরঙ্গ গৃহলক্ষ্মী চাই। আমার প্রথম ঘরে নেহাৎ হংসডিম্ব না হইলেও ঘোড়ার ডিমের মত একটা কিছু আছে। দ্বিতীয় ঘরেও একবারেই শূন্য,—খালি শূন্য ব'লে কি শূন্য, পূর্ণ হওয়ার আদৌ কোন লক্ষণই যে নাই, আমার আস্তকুঁড়ে হৃদয়টা "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।" আর তৃতীয় ঘরে একজন আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রতি মাতা বীণাপানির এমন সুনজর যে হরফ এলোপেথিক ডোজের হইলে, গার্হস্থ্যজ্বরের অবসানে, রামায়ণ-মহাভারতের দু'এক ঢোক্ কোন মতে গিলিতে পারেন। আমার অবস্থা ত এ রকম, তবুও গোঁয়ার-গোবিন্দ মনটা কোন মতেই বুঝে না, সে আমার অভাব-অভিযোগ কিছুই শোনে না, খালি আব্দার—পত্র লিখিতে হইবে। এখন করি কি? বিদ্রোহী মন যে প্রগল্ভা গৃহিণী হইতেও ভয়ঙ্কর, তাহার শাসন না মানিয়া ত এক পলও তিষ্ঠিবার উপায় নাই। চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাইতেছি, হঠাৎ কে কাণে কাণে ব'লে গেল "তোমার অনেক বন্ধু প্রবাসে আছেন, তাঁদের কারু নিকট পত্র লিখ। তুমি ত আর সাহিত্য সৃষ্টি করিতে বস নাই, তোমার ঘরের কথা তুমি বলিবে, আর তোমার বন্ধু শুনিবেন, আর কারো তোয়াক্কা রাখিও না। তদুপরি তোমার জিনিসটা নূতন হইল—সকলে প্রবাসের পত্র লিখে, তুমি না হয় আবাসের পত্রই লিখিলে। এখন লেখনী চালাও, হরি ব'লে লাগাও।"

প্রবাসী বন্ধুবরেষু,

তোমার নিকট পত্র লিখিব ঠিক করিতেই আমাকে একটা ছোট খাট যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। লিখিতে বসিয়া দেখি আরও সঙ্কট। প্রথম, তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব? তুমি ত পাড়াগাঁয়ের কোন খবর লওয়া উচিত মনে কর না. গতিকে তোমার নামটা যে এখন কি হয়েছে তাহা আমার জানিবার কোন কারণ নাই। তবে গাঁয়ের লোকের মাঝে কেহ কেহ, দয়াময় দত্তের কেহ আছে কি না জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে, আর কেহ তাঁহার বংশের বাতি এক নাতি আছে জানিয়াই দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে। আমরা সেন ভায়ার নাম জানি বলিয়াই তাঁহাকে 'ছি, ছি সেয়ানা' বলিয়া লিখিয়া থাকি। তোমাকে প্রবাসী বন্ধুবর লিখিলাম, আর গত্যন্তর নাই। দ্বিতীয়, তোমরা মা'র কাছে পত্র লিখিতেও My Dear Mother হইতে সুরু ক'রে প্রণামটা পর্য্যন্ত ইংরাজিতে কর। আমার বিদ্যাবুদ্ধির খবর ত রাখ, তাহাও আমার সাধ্যাতীত, তবে তোমরা যখন মার খাও "মা মা" বলে কাঁদ, আর স্বপ্নটাও বাঙ্গালাতে দেখে থাক বলিয়া জানি, সেই সাহসেই স্বপ্নরাজ্যের কথাগুলো বাঙ্গালাতেই লিখিতেছি। সুরুতেই দু'টো বেয়াদবী করিয়া বসিলাম, মাপ করিও।

ভাই, তুমি আজ ইন্দ্রপুরীতে, আর আমি আছি তোমাদের মতে অন্ততঃ যমপুরী না হইলেও তার কাছাকাছি একটা কিছুতে। হংসধবল সৌধশ্রেণী তালার উপর তালা চড়াইয়া তোমাদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া প্রায় স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত। দেবতারা তোমাদের ভয়ে ভীত। বরুণদেব নলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া করযোড়ে তোমাদের গৃহকোণে অবস্থিত, অগ্নিদেব গৃহিণীর অঞ্চলে আবদ্ধ, সৌদামিনীর প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া পবনদেব কারারুদ্ধ। কলে কান্‌টা টান্‌লে বরুণ বেচারী গাঁপের জলে তোমাদের বুক ঠাণ্ডা ক'রে দিতেছে. মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের মত পবনদেব ফোঁস ফোঁস করিতেছে, আর অগ্নিদেবের ত কথাই নাই—একটু চোট পড়িতে না পড়িতেই তোমাদের গৃহিণীদের মত চো্‌খ একেবারে লাল। কান টান্‌লে যে এত কাজ হয় ভাই আগে আর ঠাওর পাই নাই।

এখন তোমার ঠাকুরদাদার কথা একবার চিন্তা কর দেখি। একটু জলের জন্য তাঁহাকে কত যড়যন্ত্র না গড়িতে হয়েছে। প্রথমতঃ ধরণীদেবীর উপাসনা ক'রে তাঁর নিকট কিছু মাংস ভিক্ষা ক'রে নিতেন, তারপর বিশ্বকর্ম্মা-কুম্ভকারের দ্বারা কলসী অস্ত্র গড়াইয়া অগ্নি-দেবের দ্বারা পোড়াইয়া শেষে দুর্গতিনাশিনী গৃহিণীর শ্রীচরণে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ইতি উদ্যোগপর্ব্ব। তার পর ঠান্‌দি সেই অস্ত্রকক্ষে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাঁকন বাজাইতে বাজাইতে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ছুটিলেন। একেবারে বরুণরাজার পুরীর দ্বারে আসিয়া সগর্ব্বে উপস্থিত হইলেন। বরুণদেবের ত তাঁহাকে দেখিয়াই চক্ষুস্থির, ভয়ে জড়সড়, পা থর থর কাঁপিয়া উঠিল। চণ্ডিকা ছাড়ে কৈ? দু'এক চড় মেরে তাঁহাকে সেই অমোঘ অস্ত্রের দ্বারা একবারে চাপিয়া ধরিলেন। বরুণদেব করুণকণ্ঠে দু'এক ডাক্ ছাড়িয়া শেষে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইতি বরুণ-বন্ধন পর্ব্ব। ঠান্‌দি বরুণদেবকে লইয়া বিজয়গর্ব্বে ছুটিলেন, তিনি দু'এক ফোঁটা অশ্রুত্যাগ করিয়া প্রথম প্রথম

বিজয়িনীর চরণসিক্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন কাঁকনের রুণু রুণু বাদ্য শুনিতে পাইলেন, ঘোম্‌টা ঢাকা নন্দনবনে হাসির পারিজাত ফুটিতে দেখিলেন, তখন সেই বন্ধন অবস্থাতেও আনন্দে আটখানা হইয়া ধীরে ধীরে হাততালি দিয়া বলিতে লাগিলেন—"ওগো বেঁধে ফেল বেঁধে ফেল, অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং ইন্দ্রই বা কোন্ এমন বন্ধন না চাহেন!" বিজয়িনী তাঁহাকে রুদ্ধ কক্ষে নিয়া বন্দী করিলেন, বরুণদেব কি জানি কি মনে করিয়া করুণনয়নে ঠান্‌দির মুখখানার দিকে একবার চাহিলেন। অভাগা বুঝিল না যে বিজিতকে দেখে দেখে নয়ন সার্থক করিবার জন্য কেহ তাহাকে আবদ্ধ করে না। তাহাকে আত্মীয়-পরিজন লইয়া বাঁটিয়া খাইতে না পারিলে প্রায় কাহারও তৃপ্তি হয় না। বরুণদেবের কতক সাদা শোণিত তিনি তোমার ঠাকুরদাদাকে দিলেন, তাঁহার তৃষ্ণার শান্তি হইল। ইতি বরুণ-বণ্টন পর্ব্ব। দেখিলে ত কি কাণ্ডটাই না হয়ে গেল। ইহাকে কি বৃত্রাসুর-বধ বলিবে? না শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ বলিবে? তার পর অগ্নিদেব ও পবনদেবকে লইয়া যে তাঁহাদিগকে কত বিব্রত হইতে হয়েছিল তা' ত জান। ও সব লিখিতে গেলে যে অষ্টাদশ পর্ব্বের অনেক অধিক হইবে, আর অনর্থক পুঁথি বাড়াইয়া লাভ কি? এত লড়ালড়ি করে কি ভাই আর দেশে থাকা যায়। বিশেষতঃ এত ঝঞ্ঝাট করিতে, এমনভাবে শান্তিভঙ্গ করিতে তোমাদের মত শিক্ষিত লোকে যাবে কেন?

তার পর ঘরকন্নার দিক্‌টা দেখ দেখি। গিন্নী তোমার কত উপন্যাস পড়িতেছেন, কত রসের কথা শিখিতেছেন, হাতে কয়লা বা বসনে ময়লা লাগিবার সাধ্য নাই। আয়া ছেলেকে দুধ দিতেছে, রাঁধুনী বামন অন্ন পাকাইতেছে, গোয়ালা দুধ যোগাইতেছে, ডাক্তার পানি ঢালিতেছে; ঝি তোমাদের ঝাঁট দিতেছে। গৃহিণী হিষ্টিরিয়ার দাবীটা বুঝ ক'রে দিয়ে একটু ফরসুদ পাইলেন ত দ্বিতলে বসে ত্রিতলের বীম চৌকাটের জন্য কয়টা ধান গাছের দরকার, তার আঁক ক'ষে ক'ষে একদম হয়রাণ হইতেছেন। আর তোমার ঠান্‌দির যে হাতে ডালা সেই হাতে মালা, যেই হাতে কোদালী সেই হাতে গরিবের জন্য ভিক্ষার ডালি ও গো-বাছুরের খোল-বিচালী, যেই হাতে সম্মার্জ্জনী সেই হাতে থালাখানি। আর একটু সুবিধা পাইলেন ত কথক ঠাকুরের মুখে মহাভারত শুনিতে লাগিলেন, আর নয় ধান গাছগুলি মাড়ায়ে একেবারে ঘাস ক'রে দিলেন, কি সর্ব্বনাশীই না ছিল রে!

"যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য"—তেমন তোমার ঠাকুরদাদাও কি সর্ব্বনাশাই ছিলেন দেখ ত। পাড়াগাঁয়ে থেকে না হয় দেশ-বিদেশ ঘু'রে দু পয়সা রোজগার করিতেন, আর কতজনকেই তাহা ভাগ ক'রে দিতেন। গুরু-পুরোহিত, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, কুলী-মজুর, কামার-কুমার, অতিথি-ভিখারী, গরীবের ছেলে, ইষ্ট-মিত্র-কুটুম্ব, পাড়া-প্রতিবেশী কত জনের নাম করিব? শুধু কি মানুষ? পশু-পক্ষীও বাদ যায় নাই। গরু-বাছুর, মোষ-ছাগল, শুক-শালিক কত নাম করিব? যত অসভ্য বর্ব্বরের সহিত তাঁর মিলা ছিল। মনে আছে ত? কালুসেখকে দেখিবা মাত্রই জিজ্ঞাসা করিতেন 'নাতি কেমন আছিস্?' বুড়া নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিতেন 'দাদা তোর ছেলেটার জ্বর সেরেছে ত?' রামধন ধুপীকে দেখিলেন আর জেনে

নিলেন তার কমলীর ছেলে-মেয়ে কয়টী। বুড়ো পূজা-পার্ব্বণে বাড়ী আসিলেন ত দলে দলে লোক জুটিতে লাগিল। কেহ বলে আমার হালের বলদ নাই (তখন তোমরা জন্মনি) দশটী টাকা দিন, কেহ বলে আমাকে দু'মণ ধান দিন, কেহ বলে আমার মামলাটী মিটায়ে দিন। খালি দিন, খালি দিন, রাতটা যেন ঠাকুরদাদার কাছে বিদায় লয়ে একেবারে প্রবাসেই আছেন। শেষ কালটায় লোকগুলো বুড়োকে এমন আক্কেল দিল যে একটু শান্তিতে মরিতেও দিল না। মরিবার একমাস পূর্ব্ব হইতে বাড়ীতে একটা হাট ব'সে গেল। কত জন এ'সে শিয়রে ব'সে চোখের পাণি ঢালিতেছেন, কত জন ফোঁস্ ফোঁস্ করিতেছেন। কেহ হাত টিপিতেছে, কেহ পা টিপিতেছে, কেহ কবিরাজ ডাকিতেছে, কেহ ঔষধ পিষিতেছে। বুড়ো বয়সে আর কত সহ্য হয়! সকলে ধরাধরি করে তাঁর মহাপ্রস্থানের পথটা পরিষ্কার করে দিয়েই ছাড়িল। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! মরণের পর দেশশুদ্ধ লোক পাছে পাছে শ্মশান-ঘাটে চলিল। যেন বিয়ের বরযাত্রী আর কি?

তোমরা বেশ শান্তিতে আছ। ষোড়শোপচারে আত্মপূজা করিয়া জগৎ তুষ্ট করিতেছ। তোমাদের দরজায় পর্দ্দা আঁটা। ঐ সব ধূলি-কাদা-মাখা অর্দ্ধউলঙ্গ মূর্ত্তি তোমাদের সিঁড়ীর ধাপ মাড়াবে সাধ্য কি? কোন সুযোগে কেহ আঙ্গিনায় গেলেও তোমরা প্রবাসী ব'লে এক কথায় তার মুখ বন্ধ করে দিতে পার। নেহাৎ না যায় ত দোবে বা পাঁড়েজীর দ্বারা এক একটী অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে উচিত মত বিদায় দিলে। কোন ইস্ত্রিকরা কাপড়-পরা পরিচিত অপরিচিত বন্ধু আসে ত সস্ত্রীক তোমাকে কায়দা মত অভিবাদন ক'রে চেয়ারে বসে পড়িল। কেহ বুয়র-যুদ্ধের, কেহ জাপান-যুদ্ধের কথা ব'লে হৃৎপিণ্ড শুষ্ক ক'রে দিল, কেহ বল-নাচের বাহবা দিয়ে তাহাকে আবার সরস ক'রে নিল। দেশী নচ্ছার গুলোর কোন কথা বিল-কুল কাণেই গেল না। ঈশ্বর না করুন তোমাদের কেউ মরিতে বসেন ত একেবারে কপাট বাঁধাই মরিলেন. কেহ আনাগোনা ক'রে বিরক্ত করিতে পারিল না। প্রাতে মুর্দ্দফরাস এসে নিয়ে গেল, সব ফর্সা হ'ল। গৃহিণী রাতারাতি কুটুম্ব-বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন। শ্রাদ্ধ শেষ। তোমরা ভাই মাচার কুমড়া, চূণ সুরকীর মানুষ। আর তাঁরা ছিলেন একবারে পাকের তৈরী, যে ধরেছে, তার গায়েই জড়িয়ে গেছেন। এতদিনে বুঝিলাম তোমাদের মত বুদ্ধিমানেরা কেন পৈতৃক বাড়ী ভিটা ত্যাগ করিয়া প্রবাসে থাকে। তোমাদের মত উচ্চশিক্ষিত ও পর-হিতব্রত না হইলে কি এমন ভাগ্য হয়! থাক সে কথা। এখন বাড়ীর খবর শুন।

তোমার বাড়ীতে এখন আর সেই কোলাহল নাই, সেই মুখরা শান্তি নাই। রক্তবসনা সন্ধ্যার বন্দনা করিতে এখন আর দেব-মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টার কর্কশ ধ্বনি প্রতিবেশীর শ্রবণ-জ্বালা উৎপাদন করে না, পূজা-পার্ব্বণের নিমন্ত্রণে দরিদ্রের উদরাময় জন্মিবার আশঙ্কা নাই। তোমার পৈতৃক ভদ্রাসন কেউটে গোক্ষুরে শঙ্খচূড় প্রভৃতি কদ্রু-নন্দনগণের নাগত্র হইয়াছে। জোনাকি সান্ধ্য দীপ জ্বালাইতেছে। তোমার অপূর্ব্ব নিয়োগে চণ্ডীমণ্ডপে ভক্ত শিবা ছাগশিশুর তপ্ত শোণিত শিবানীর খর্পরে অর্পণ করিতেছে। তোমার ঠাকুরদাদার জাঙ্গালটীকে

মানুষ ও পশুর নির্ম্মম পদাঘাত হইতে রক্ষা করিয়া জলের মধ্যে আরাম করিতে দিয়াছ, এবং তোমার ঠান্‌দিদি মহামায়ার পুকুরটীকে একখানা পানার কম্বল পুরস্কার দিয়া জরা-জরের দারুণ শীত হইতে রক্ষা করিয়াছ। দয়াময়ের উপযুক্ত পৌত্র বলিয়া তোমাকে দু'হাত তুলিয়া সকলেই আশীর্ব্বাদ করিতেছে। ঐ যে পুকুরের কোণে অসভ্য আমলের যে সব আমগাছ ছিল, ঐ সব এখনো আছে। গ্রীষ্মে, বসন্তে তোমার জন্য অনেক ফল সংগ্রহ করিয়া অনেক দিন লুকাইয়া লুকাইয়া বুকের মধ্যে রাখিয়া দেয়, শেষে হতাশ হইয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দূরে নিঃক্ষেপ করে। কাক ও শৃগাল তাহা আনন্দের সহিত খায়, আর "বাবু কি দয়ালু, বাবুর কি উচ্চ নজর! এমন মিষ্ট ফল গুলি আমাদের দিয়ে তিনি টাকায় একটী করিয়া আম কিনে খান" বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করে। ঘাটের দরজার বৃদ্ধ তালগাছটী মাথায় জটা পাকাইয়া তিন পুরুষ ধরিয়া ডায়েরী লিখিয়া আসিতেছেন, এবং ভবিষ্যতের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া আছেন। ঐ ডায়েরীর এক কোণে কচি তালের শাঁস হইতে বরফ ও লেমোনেড উৎকৃষ্ট বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

আজ এ পর্য্যন্ত। দেখ ভাই! আমার পত্রে বিলাত, আমেরিকা বা ফ্রান্সের কোন খবরই তুমি আশা করিও না—ঐ সব কথা তোমরা নিয়তই শুনিয়া থাক। আমি আমার কুঁড়েঘরে বসিয়া কুঁড়েঘরের কয়েকটী কথাই তোমার নিকট লিখিলাম। তুমি খোস্‌-মেজাজে বাহাল তবিয়তে তাহা পাঠ করিও।

তুমি বন্ধু, তোমাকে আমার দুঃখ-দৈন্য বলিতে লজ্জা নাই। এখন কথা আমার ত ভাই "দিন মজুরী নিত্য করি পঞ্চভূতে খায়-গো বেঁটে," তোমার নিকট যে পয়সা খরচ করিয়া পত্র লিখিব তাহা ত আমার পোষাইয়া উঠিবে না। কাজেই আমাকে কোন সম্বাদ-পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে, বাকী কেবল সপিণ্ডীকরণিক, বোধ হয় কথাটা অবৈয়াকরণিক হইল। হউক ক্ষতি কি, আমরা পাড়াগেঁয়ে। জানত ভাই আমার "দিন ভিক্ষা তনুরক্ষা" কাজেই দৈনিকের খোরাক যোগান আমার সাধ্য নাই। সাপ্তাহিক, পৃষ্ঠে হরিহর-ছত্রের মেলা, বক্ষে উপহারের ডালা, মাঝে মাঝে কবিওয়ালার পালা লইয়াই পাঠকের চক্ষু-কর্ণ ঝালা-পালা করিতেছে। তোমরা ত সৌখিন লোক, তোমাদের মেলা বেড়াইতে, ডালা বিচারিতে পালা শুনিতে সপ্তাহ কাটিয়া যায়। তথায় যে আমার এই ক্ষুদ্র পত্র তোমার নেত্র-গোচর হইবে বড় একটা আশা করিতে পারি না। "স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ"। তাতে আবার পাট্টার মিয়াদও ফুরাইয়া আসিতেছে, এই অবস্থায় ত্রৈমাসিকের দ্বারস্থ হওয়া কোন মতে বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আর মাসিক মাত্রই বাকী। তা'বলে, বুঝো না যে আর সব ফাঁকি। এখন মাসিক সম্বন্ধেও নানা জনে নানা কথা বলিতে সুরু করেছে—"ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"। সে দিন সন্ধ্যার বৈঠকে এক বন্ধু বলিলেন 'আজ কালকার সম্পাদকেরা এক বিচিত্র ফাঁদ পেতেছেন; এ যে তস্‌বীরওয়ালা হ'য়ে উঠিল দেখছি। তাঁদের ঝোলায় ত হরেক রকমের চীজ আছে দেখা যায়। দেখে 'শাপিনী তাপিনী-তাপে বিবরে লুকায়' আর এটাকে দেখে 'মেদিনী কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া'।

কত নীরব ভারতচন্দ্রই জন্ম গ্রহণ করেছেন দেখ ত। মেদিনী কাঁপুক্ আর নাই কাঁপুক অনেক রসজ্ঞ পাঠকের হৃদয়ক্ষেত্রে একটা ভূমিকম্প না উঠে এমন নহে"। আমার আর এক বন্ধু রাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "বেশ করেছে। সম্পাদক ভায়ারা এতদিন মন-প্রাণের খোরাক যোগায়ে হয়রাণ হ'য়ে পড়েছেন, আর না হয় দিন কতেক খালি চোখের খোরাক যোগাইতেছেন—ক্ষতি কি?" আর এক বন্ধু কোণ হ'তে বলিয়া উঠিলেন "তোমরা ত ভারি বেয়াড়া দেখি, বাহির নিয়ে এত টানা-টানি আরম্ভ করিলে কেন? ভেতরে দেখ, ওত *ঠিক তসবীরওয়ালা নহে। প্রায়* মাসিক এক একটা ছোট খাট ধোপার বাড়ী বলিতে পার। তাহাতে কোট, সার্ট, মোজা, কাঁথা, লেপের খোল, বালিশের ওয়াড়, খিড়কীর পর্দা, মশারির ঝালর, ছেঁড়া গেঞ্জি, ফুটা তোয়ালে, পরিষ্কারের জন্য পাঠান হয়। ছোটখাটই বলি কেন? এখন ত অনেকেই গাঁটুরী খুববড় ক'রে সমজদার ব্যবসায়ী সেজে বাহির হইতেছেন, কিন্তু খুলে দেখিলে সেই ছেঁড়া গেঞ্জি ও ফুটা তোয়ালেই বেশীর ভাগ, কচিৎ শাল আলোয়ান চোখে পড়ে। মনে করো না আমি তার নিন্দে করি। সাফ হ'য়ে এলে পর ভদ্রসমাজের উপযোগী হ'ল কি না বেশ পরীক্ষা ক'রে দেখা যায়, সুবিধাটা মন্দ নহে দু'টি পয়সাই খরচ।" বন্ধুদের কথা শুনে আমি একবারে হতভম্ব হইলাম, এখন আমি ত সরব নীরব কোন প্রকারের ভারতচন্দ্রই নই। আবার পাড়াগাঁয়ের গরীব লোক, সবেধন নীলমণি কাপড় ত আমার এক প্রস্থ, কখন কখন আধ প্রস্থেও নেমে আসে।

এই সব কথা ত আমার মনে কোন দিন উঠেনি, আমার মনে যে একটা গুরুতর প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা কেহই তাহার উল্লেখ করিলেন না। সম্পাদক ভায়ারা এখন আর কিছু পারেন না পারেন, দল পাকাইতে খুব মজবুত দেখা যায়। কাজেই পাঠকদেরও যে একটা দলাদলি থাকিবে, আশ্চর্য্য কি? আশ্চর্য্য কিছুই নহে, যেখানে বাঙ্গালী সেখানে ত "দলাদলি" আছেই, তবে দায়ে ঠেক্‌লে যে দিগ্বিদিক্ ভুলিয়া "কোলাকুলি"ও হয় না এমন নহে। দলাদলি শব্দটা কোথা হ'তে আসিল তার কোন খবর রাখ কি? জান ত ভাই আমার অত ভাষাজ্ঞান নাই। তবে *শব্দটা যোগরূঢ় বলিয়াই আমার বিশ্বাস।* আমাদের দেশে 'দলঘাস',—সাধারণতঃ 'দল' নামে পরিচিত—একটা জিনিস আছে। তোমরা ত শব্দ একটা পে'লে তার নাড়ী-ভুঁড়ি বাহির না ক'রে ছাড় না, দোহাই ভাই তাহা দেলখোসের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করিও না, তবে ইহাও ঠিক যে তাহাতে কাহারো কাহারো দেল খুব খোস হইয়া থাকে। আমি তাহার পুরাবৃত্ত দিতেছি। দলঘাসের জন্মভূমি আঁধা-পুকুর, জেলা বঙ্গদেশ, আঁধাপুকুর ভিন্ন অন্য কোথাও তার বংশবৃদ্ধি হয় না। তাহার রং ঠিক সাদাও নহে আবার ঠিক কালোও নহে, সে গাছও নহে, ঠিক ঘাসও নহে, তাহাকে একবারে জলজও বলা যায় না, আবার নেহাৎ স্থলজও নহে, সে আকণ্ঠ জলে ডুবিয়া থাকে। তাহার ফুল হয়, কিন্তু ফল হয় না, বাতাস বহিতে না বহিতে হেলিয়া দুলিয়া তরঙ্গ তুলিয়া মাথা কাঁপাইয়া পুকুরটাতে একটা নন্দনকাননসৃষ্টি করিয়া বসে; সে নর্ত্তন কিন্তু গলা ছাড়িয়া আর নীচে নামে না, আর যেই বাতাস থেমে গেল, অমনি মাথাটা নত

ক'রে একদম জলের তলে ডুব দিল, এই হইল তার ধর্ম্ম। ইহাকে কোন্ পর্য্যায়ে ভুক্ত করিবে তাহা তুমিই জান, তুমি অনেক দেশ ঘুরিয়াছ, অনেক কিছু দেখিয়াছ, অনেক কিছু শিখিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে যতদূর সম্ভব আমার পক্ষে তত নহে। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে গরু বাছুর মোষ 'দল' পাইলে একবারে আত্মহারা হইয়া ছু'টে যায়, হাজার চেষ্টা করিলেও তারা আর কিছুতেই মুখ দেবে না—দলতাদের এতই প্রিয় জিনিস। এক 'দল' শব্দ বুঝাইতে পত্রটা কিছু দীর্ঘ হয়ে গেল, করিব কি ভাই, তোমরা ত অনেক দিন দেশ ছেড়ে আছ, দেশের কিছু যে মনে আছে বড় বিশ্বাস হয় না। তাই এত কথা লিখিতে হইল। এখন তুমি কোন্ দলের বল দেখি ভাই? ইতি

শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী।

পল্লীভাষা ও সাহিত্য *

সাহিত্যের সৃষ্টি ও উহার ক্রমোন্নতির সঙ্গে ভাষা নিয়ন্ত্রিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। এবম্বিধ ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ভাষা কোন সমাজ অথবা সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব নহে, উহা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি সুতরাং এক হিসাবে জাতীয়ত্বের পরিচায়ক।

সাহিত্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে দেশে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী কোন নির্দ্দিষ্ট ভাষা বিদ্যমান থাকিতে পারে না, কথন-প্রণালীর বৈষম্য-হেতু এই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও সমাজে এক-ই ভাষার প্রকার-ভেদ লক্ষিত হয়। এইরূপ পরস্পর বিভিন্ন অথচ একমূলীভূত কথিত ভাষাগুলিকে পল্লীভাষা (dialects or Provincialism) নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই পল্লীভাষার মধ্য দিয়াই সাহিত্য ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করে। সুতরাং পল্লীভাষাকে সাহিত্য-ভাষার জন্মদাত্রী রূপে গ্রহণ করা যায়। সকল ভাষার মূলেই পল্লীভাষা নিহিত আছে। ঋগ্বেদের স্তোত্রাবলী তৎকালীন কোন একটি পল্লীভাষাতে রচিত হইয়াছিল। পালি সাহিত্যের মূলে পল্লীভাষা রহিয়াছে। বঙ্গের প্রাচীন কবিগণ পল্লী-ভাষাতেই গান গাহিয়াছিলেন। ল্যাটিন ভাষা রোম নগরীস্থ কতিপয় অভিজাত পরিবারের কথিত পল্লী ভাষা হইতে উদ্ভূত। এইরূপে, সকল দেশের সাহিত্যই পল্লীভাষার ভিতর দিয়া ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। সুতরাং, সাহিত্যভাষা পল্লীভাষার অভিনব সংস্করণ মাত্র।

পল্লীভাষা দেশের কথিত ভাষা, উহা সর্ব্বত্র একরূপ নহে। দেশের বিভিন্ন স্থানে উহা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। মূলতঃ এক হইলেও কখন কখন দুই স্থানের পল্লী-ভাষা এত স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় যে প্রথমতঃ উহাদিগকে এক ভাষা বলিয়া চিনিয়া উঠিতে পারা যায় না, সাহিত্যের সৃষ্টিরপূর্ব্বে দেশের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীভাষাগুলি স্ব স্ব বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য লইয়া পাশাপাশি ভাবে অবাধ ও উশৃঙ্খল গতিতে চলিতে থাকে। পরে প্রতিভা সম্পন্ন কবি এবং লেখকদ্বারা চালিত

* কলিগ্রামের মালদহ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

হইয়া ঐ সকল ভাষার কোন একটি ক্রমশঃ সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয়। এইরূপে যখন সাহিত্য-ভাষার সৃষ্টি হয়, তখন পারিপার্শ্বিক পল্লীভাষাগুলি উক্ত সাহিত্য-ভাষার পোষক ও জীবন-রক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। সাহিত্যের ভাষা যখন পল্লীভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তখন হইতে পূর্ব্বোক্ত ভাষার পতন আরম্ভ হয়।

সংস্কৃত ভাষা যখন সম্পূর্ণরূপে ব্যাকরণ দ্বারা বিজড়িত হইয়া পড়িল, উহার সহিত যখন পল্লীভাষার কোন প্রকার সংস্রব রহিল না, তখন হইতেই উহার জীবনীশক্তি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল। এই অবসরে এক পল্লীভাষা (পালি) নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে সংস্কৃতভাষার স্থান অধিকার করিয়া বসিল, গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষাদ্বয়ও পূর্ব্বোক্ত কারণেই স্ব স্ব অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সুতরাং পল্লীভাষা হইতে বিচ্যুত হইয়া সাহিত্যভাষা বেশী দিন আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। পল্লীভাষা প্রাণের ভাষা, উহার ভিতরে জীবন প্রবাহ বর্ত্তমান থাকে, মানুষ কৃত্রিম উপায়ে সাহিত্য-ভাষাকে গড়িয়া তুলে, উহা প্রাণের ভাষা নহে। কেহ সাহিত্য-ভাষায় কথা কহে না, কেবলমাত্র লিখন-পঠন ব্যাপারেই উহা ব্যবহৃত হয়। মানুষ কথা কহিয়া প্রাণের ভাব ও আবেগ পল্লীভাষাতে ব্যক্ত করে সুতরাং ভাষার প্রাণ কথিত পল্লীভাষাতেই নিহিত। সাহিত্য-ভাষাকে পরিপুষ্ট অবস্থায় বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে উহাকে পল্লীভাষার সহিত সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া পল্লীভাষার প্রাণের স্পন্দন দ্বারা উহার প্রাণে স্পন্দন আনিতে হইবে।

বঙ্গের সাহিত্যভাষা কয়েক শতাব্দী যাবত পল্লীভাষা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। রামাই পণ্ডিত মাণিক-চাঁদ, রাজা গোবিন্দ প্রভৃতি বঙ্গের প্রাচীন কবি হইতে আরম্ভ করিয়া কৃত্তিবাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ দাসরথী রায় প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের কাব্য সঙ্গীত ও পদাবলীতে বিভিন্ন যুগের পল্লীভাষার নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। আধুনিক বঙ্গভাষা ঐ সকল পল্লীভাষার বিচিত্র সমবায়ে গঠিত হইয়াছে। অতীতের ন্যায়, বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎও পারিপার্শ্বিক পল্লীভাষাগুলির সাহচর্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

ভাষা চিরদিন এক অবস্থায় থাকে না। উহা পরিবর্ত্তিত হইবেই। আধুনিক বঙ্গভাষাও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ভবিষ্যতে একদিন পরিবর্ত্তিত হইবে। তবে, এই পরিবর্ত্তনের সময়কে সম্মুখে টানিয়া আনা, অথবা পশ্চাতে সরাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। আমরা যদি শীঘ্র ভাষার পরিবর্ত্তন চাই, ভাষা প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে পারি, যদি না চাই, তবে তাহারও প্রতীকার করিতে পারি। মানুষ ভাষাকে বাঁচাইয়া রাখে সুতরাং সে উহার গতিকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

এখন কথা হইতেছে, সভ্য-সমাজে শীঘ্র শীঘ্র ভাষার পরিবর্ত্তন সুফল-প্রদ কিনা। আমাদের মনে হয় তাহা নয়। প্রধান কারণ এই, মৃত ভাষায় লিখিত সাহিত্যের উপর নূতন ভাষার কোন দাবী নাই। পালি-সাহিত্যের উপর বঙ্গভাষার দাবী নাই, সংস্কৃত

সাহিত্যকে পালিভাষা আপন সম্পত্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই, বঙ্গভাষা ও পারে না, নূতন ভাষায় নূতন করিয়া সাহিত্য গঠন করিতে হয়। জাতীয় উন্নতির পক্ষে সাহিত্য প্রধান সহায়; সুতরাং ঘন ঘন ভাষা বিপ্লব উপস্থিত হইলে নূতন নূতন সাহিত্য গঠনের নিমিত্ত দেশ-বাসীর শক্তির অযথা অপচয় হইয়া থাকে। প্রত্যেক বারে ভাষাকে গড়িয়া তুলিতে বিপুল যত্ন ও চেষ্টার আবশ্যক হয়। এই যত্ন ও চেষ্টা অন্য কোন সদুদ্দেশ্যে পরিচালিত করিলে দেশের অধিকতর মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। যদি সংস্কৃত ভাষার ধারা অপরিবর্ত্তিতাবস্থায় বর্ত্তমানে আসিয়া পৌছিত, তাহা হইলে বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য-গঠনের নিমিত্ত বঙ্গের সাহিত্যিকদিগকে নূতন করিয়া এত আয়োজন করিতে হইত না। ভাষা বিপ্লব দ্বারা সংস্কৃত ভাষার পতন ও পালিভাষার উত্থান হইল। পালি-ভাষাকে সুসংযত এবং পালি-সাহিত্যকে সুগঠিত করিবার নিমিত্ত অনেক শক্তি ব্যয়িত হইল। আবার, পালিভাষা বিলীন হইল, বঙ্গভাষা জাগিয়া উঠিল। হাজার বৎসরের চেষ্টার ফলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য অভিনব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া ভাষা ও সাহিত্য জগতে স্থান লাভ করিল। যদি একটি মাত্র ভাষার ভিতরে সংস্কৃত, পালি এবং বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডার আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে আজ আমরা কি না অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইতাম! ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পালিভাষা ও বঙ্গভাষাকে গড়িয়া তুলিতে যত শক্তি আবশ্যক হইয়াছে তদ্দ্বারা জাতীয় সাহিত্যের অথবা সমাজের অপরিমিত মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত। অতএব দেখা যাইতেছে, ভাষা-বিপ্লব দ্বারা প্রকৃত পক্ষে দেশের মঙ্গল সাধিত হয় না।

যদি ভাষার পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় না হয়, তাহা হইলে ভাষা যাহাতে শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইতে না পারে, যাহাতে ভাষার জীবন সুদীর্ঘ হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিৎ। রাষ্ট্র-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনাবলী দ্বারা ভাষার গতি হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। আকস্মিক ঘটনার উপর মানুষের বড় বেশী হাত নাই; বিশেষতঃ পরাধীন জাতির পক্ষে ঐ সব চিন্তা দোষাবহও বটে। বর্ত্তমানে ইংরেজ-রাজের সুশাসনে দেশের সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। এই অবসরে, বঙ্গের সাহিত্যিকগণ ভাষার পুষ্টি ও স্থায়িত্বের অনুকূল অন্যান্য উপায়গুলির প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সাহিত্যের ভাষাকে দীর্ঘায়ু ও পরিপুষ্ট করিতে হইলে পল্লীভাষার সহিত উহার সংযোগ একান্ত আবশ্যক। কারণ পল্লী-ভাষা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই নিয়মের অন্যথাচরণে বঙ্গ-ভাষার আশু পতন অনিবার্য্য। বঙ্গভাষাকে নানা প্রকার নিয়ম দ্বারা জড়ীভূত করিয়া উহার স্বাধীনতাকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলে চলিবে না। ভাষার স্বাভাবিক গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেইদিকে উহাকে কতকটা স্বাধীনতা দিতে হইবে। সাহিত্য-ভাষার গতি পল্লীভাষার দিকে, সুতরাং পল্লী-ভাষার সহিত বঙ্গভাষার সংযোগ রাখিতে হইবে।

সাহিত্য-ভাষার গতি পল্লীভাষার দিকে,—কথাটা একটুকু স্পষ্টীকৃত হওয়া আবশ্যক। মানুষ লিখিতে শিখিয়াছে সুতরাং সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং লিখিত ভাষা কথিত ভাষা হইতে কিছু স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন একদিন ছিল যখন লিখন-পদ্ধতি

মানুষের নিকট স্বপ্নের অগোচর ছিল। মানুষ চিরকাল কথাই কহিবে, বেশীরভাগে সে লিখিয়া সাহিত্যের সৃষ্টি করিবে; যাহা সৃষ্টি করিবে তাহা আবার কথা কহিয়া প্রকাশ করিবে। মানুষের না লিখিলে চলিতে পারে, কথা না বলিলে চলে না, সুতরাং লিখন ও কথন ব্যাপারে কথন অধিকতর প্রয়োজনীয়। মানুষ কথা কহিয়া ভাষাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, লিখিয়া নহে। আজ যদি বঙ্গের সকল লোক কথিত ভাষা ভুলিয়া গিয়া লিখিত বঙ্গভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করে, কিছুকাল পরে উক্ত লিখিত ভাষা হইতেই নূতন কথিত ভাষার সৃষ্টি হইবে। ইহাদ্বারা বুঝা যায়, সাহিত্য ভাষা পল্লী-ভাষার দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। পল্লীভাষার সহিত সাহিত্য-ভাষার সংযোগ রক্ষা দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। প্রথম, সাহিত্য-ভাষার বিকাশ সাধন; দ্বিতীয়, পল্লীভাষার উশৃঙ্খলতার অপনোদন।

কোন জীবিত পদার্থকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া দিলে স্ফুর্ত্তি ও বিকাশের অভাবে উহার জীবনী শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। ভাষাও এই নিয়মের বাহিরে নয়। প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূলাচরণ করিয়া ভাষাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলে, জীবিতাবস্থায় উহার কবর খননের আয়োজন করা হয়। অবশ্য মানিতে হইবে, কতকগুলি নিয়মের অধীন না হইয়া সাহিত্য-ভাষা স্ব-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে না, তাই বলিয়া, পদে পদে আইন কানুনের প্রচার করিলে বিপ্লব ও বিদ্রোহকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বঙ্গ-ভাষার উশৃঙ্খল-গতির অবসান হইয়াছে, ব্যাকরণ সু-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন কেহ 'যা'ইচ্ছা তা' নমুনার ভাষায় একটা কিছু লিখিয়া সাহিত্যিক সমাজে আসন লাভ করিতে পারে না। বঙ্গভাষা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে; বঙ্গের সাহিত্যিকগণ এই পথকে আরও পরিষ্কার করিয়া দিতে পারেন। তাঁহারা যদি পারিপার্শ্বিক পল্লী-ভাষাগুলিকে অবহেলা না করিয়া উহাদের ভিতর হইতে সারল্য-সূচক অথচ নবভাববোধক শব্দ, শব্দ-সমষ্টি (phrase), কঠিন ভাব প্রকাশোপযোগী সহজ বাক্যভঙ্গী প্রভৃতি উপাদানগুলি বাছিয়া লইয়া সাহিত্য-ভাষায় স্থান দান করেন তাহা হইলে বঙ্গভাষার প্রাণ নূতন স্পন্দনে নাচিয়া উঠিবে।

পল্লী-ভাষার শব্দাবলী সাহিত্য-ভাষার শব্দাবলীর বিকৃতি মাত্র, এই ধারণা ভ্রমাত্মক। শ্রমজীবিগণ স্ব স্ব ব্যবসা ও কার্য্যের উপযোগী এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করে যে সকল শব্দের সহিত অভিধানের মোটেই সম্বন্ধ নাই। বঙ্গভাষা শব্দ-সম্পদে এখনও দীনা। এই ভাষায় উন্নত বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি প্রচারের নিমিত্ত চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু ঘরের কথা প্রকাশের জন্য কোন প্রকার যত্ন লওয়া হইতেছে না। সাহিত্যিকগণ এখনও বঙ্গভাষাকে পল্লী-সমাজের সকল প্রকার ভাব প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। বঙ্গভাষা প্রকৃত পক্ষে বঙ্গের সকল সম্প্রদায়ের ভাষা হইবে। উন্নত সাহিত্য প্রচারের আবশ্যকতা অপেক্ষা পল্লী-চিত্র অঙ্কনের আবশ্যকতা কম নহে।

ইংরাজী ভাষা পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া আজ ভাষা জগতে অদ্বিতীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজী অভিধান

প্রতি বৎসর শব্দ-সম্পদে পুষ্ট হইতেছে। ভারতের এমন প্রাদেশিক ভাষা নাই যাহা হইতে ইংরাজী ভাষা মোটেই শব্দ গ্রহণ করে নাই। এই দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বঙ্গ-ভাষার শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি করা উচিৎ। বর্ত্তমানে ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির প্রতি দৃষ্টি না করিলেও চলিতে পারে কিন্তু পারিপার্শ্বিক পল্লী-ভাষা দ্বারা বঙ্গভাষার বিকাশ সাধন না করিলে নয়। অনেকে মনে করেন, সাহিত্য-ভাষায় পল্লী-শব্দ ব্যবহার করিলে তাহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে দুরধিগম্য হইবে। ইহা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। প্রয়োগ দ্বারা শব্দ ক্রমশঃ সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত হয়। অপ্রচলিত আভি-ধানিক শব্দও প্রথম বারের প্রয়োগে দুরধিগম্য হইয়া উঠে, বৈজ্ঞানিক শব্দের ত কথাই নাই। অনেক বিজাতীয় ও বৈদেশিক শব্দ বঙ্গভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে ও করিতেছে, এমতা-বস্থায় বঙ্গীয় পল্লী-ভাষার শব্দ গ্রহণে আপত্তি উত্থাপন করার কোন ন্যায্য কারণ দেখা যায় না।

ভাষাকে শত বন্ধনে আবদ্ধ এবং অসংখ্য নিয়মের বশবর্ত্তিনী করিয়া রাখিলেও উহার স্বেচ্ছাচারিতা একেবারে বিদূরিত করিতে পারা যায় না। একটু ফাঁক পাইলে সে পল্লী-ভাষার সংশ্রবে আসিবেই। সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণ পাশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকিয়াও পল্লীভাষার সংশ্রবে আসিয়াছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ল্যাটিন ভাষাও বর্ব্বর জাতির ভাষার সংশ্রব হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত রাখিতে পারে নাই। কোন ভাষা তাহা পারে না। পল্লীভাষার সহিত সাহিত্য-ভাষার চিরদিনই একটা গুপ্ত সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। এই সম্বন্ধ সংরক্ষণদ্বারা সাহিত্যের ভাষা বিকাশ ও পুষ্টিলাভ করে অন্যথায় উহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। পারিপার্শ্বিক পল্লীভাষা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া কোন ভাষা আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। পুরাকালে প্রাচীন হিন্দুগণ যে যে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সে সকল স্থানের কোথায়ও আজ ভারতীয় ভাষার প্রচলন নাই। পাঠান ও মোগলগণ যে ভাষা লইয়া ভারতে আসিয়াছিল, সে ভাষা আর নাই; তাহাদের বংশধরগণ ভারতীয় ভাষাতে কথা কহিয়া থাকে। প্রায় আট শত বৎসর পূর্ব্বে 'নরওয়ে' বাসী পলাতকগণ যে ভাষা লইয়া 'আইস্ল্যাণ্ড' দ্বীপে গমন করিয়াছিল সে ভাষার সহিত নরওয়ের আধুনিক ভাষার সাদৃশ্য নাই বলিলেই হয়, 'কেনেডা' বাসী ফরাসীদের ভাষা 'ইউরোপ' বাসী ফরাসীদের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পারিপার্শ্বিক পল্লীভাষার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া কোন ভাষাই আপন বিশেষত্ব বজায় রাখিতে পারে না।

পল্লী-ভাষার সংশ্রবে আসিয়া সাহিত্যের ভাষা যেরূপ সঞ্জীবিত হয়, সাহিত্যের-ভাষার সংস্পর্শ দ্বারা পল্লীভাষাও সেরূপ সুসংযত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত পল্লীভাষার উপর সাহিত্যভাষার প্রভাব বিস্তৃত না হয় ততদিন পল্লীভাষার উশৃঙ্খল গতির অবসান হয় না, অসভ্য দেশে পল্লীভাষা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, শব্দের পরিবর্ত্তন এত দ্রুত সাধিত হয় যে কয়েক বৎসরের মধ্যে ভাষার প্রায় অধিকাংশ শব্দই বিকৃত হইয়া পড়ে। খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারক মিশনারীদিগের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় কোন কোন অসভ্য জাতির ভাষা অল্পদিনের মধ্যে এতই পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে যে উহাকে পূর্ব্বের

ভাষা বলিয়া চিনিতেপারা যায় না। একবার কয়েকজন মিশনারী অত্যন্ত যত্নসহকারে মধ্য-আমেরিকাবাসী অসভ্য জাতির ভাষার অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দশ বৎসর পরে তাঁহারা পুনরায় সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, পূর্ব্বপ্রণীত অভিধানের শব্দাবলীর সহিত সে ভাষার আর সাদৃশ্য নাই, পুরাতন শব্দের পরিবর্ত্তে নূতন শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং বাস্তবতঃ সে স্থানের ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক মিশনারীগণ অনেক ক্ষেত্রে অসভ্য জাতির ভাষা শিক্ষা পূর্ব্বক সেই ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা করেন। এই অনুবাদ দ্বারা অসভ্য দেশে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় এবং অসভ্যদিগের কথিত ভাষা ক্রমশঃ অনুদিত বাইবেলের ভাষার সাদৃশ্য ধারণ করিতে থাকে। সাহিত্য-ভাষার সংস্পর্শ দ্বারা পল্লীভাষার অবাধ গতি অবরুদ্ধ ও নিয়মিত হয় এবং সাহিত্য ভাষা এবং পল্লীভাষার মধ্যস্থিত ব্যবধান ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে।

বর্ত্তমান যুগের পূর্ব্বে, বঙ্গের বিভিন্ন জেলার পল্লীভাষাগুলির মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল, আধুনিক পল্লীভাষাগুলির মধ্যে তদ্রূপ পার্থক্য বিদ্যমান নাই, বঙ্গের সাহিত্য-ভাষা উক্ত পল্লীভাষাগুলির গতি মন্দীভূত করতঃ উহাদিগকে নিজের দিকে টানিয়া আনিয়াছে। এখনও বঙ্গের বিভিন্ন পল্লী-ভাষাগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে এবং উহা থাকিবে; কিন্তু তাই বলিয়া এক জেলার লোক অন্য জেলার লোককে ভিন্ন ভাষা-ভাষী বলিয়া মনে করে না, একশত বৎসর পূর্ব্বেও সেরূপ মনে করিত, বৃদ্ধদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, দেশে রেল, ষ্টীমার প্রচলনের পূর্ব্বে তাঁহারা যখন পদব্রজে কাশী গয়া প্রভৃতি তীর্থে গমনাগমন করিতেন, তখন দূরবর্ত্তী জেলা নিবাসী বাঙ্গালীর কথা তাঁহারা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিতেন না। এখন চট্টগ্রামবাসী বাঙ্গালী অনায়াসে মানভূমবাসী বাঙ্গালীর সহিত আপন পল্লী-ভাষায় ভাবের আদান প্রদান করিতে পারে। পল্লীভাষাগুলির বৈষম্য হ্রাসের পক্ষে কতিপয় কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও বঙ্গ সাহিত্যের সৃষ্টিকেই প্রধান বলিতে হইবে।

সাহিত্য-ভাষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সুবিধা না পাইলে, পল্লীভাষা সাহিত্য-ভাষা হইতে ক্রমশঃ পৃথক হইয়া পড়ে। যখন এই পার্থক্য খুব বেশী হইয়া দাঁড়ায় তখন চেষ্টা করিয়াও পল্লীভাষার গতি ফিরাইতে পারা যায় না। তখন ভাষা বিপ্লবের সূত্রপাত হয়; সাহিত্য-ভাষার প্রভাব মন্দীভূত হইয়া পড়ে, এবং পল্লীভাষা সাহিত্য-ভাষার স্থান অধিকার করে। আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজের সহিত অশিক্ষিত পল্লীসমাজের বিশেষ কোন সংশ্রব না থাকায়, পল্লী-ভাষা সাহিত্য-ভাষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সুবিধা পাইতেছে না, দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি অশিক্ষিত পল্লীবাসিদের সহিত মিশিয়া উহাদিগকে বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপদেশ দান করেন তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে। পক্ষান্তরে, এই সম্মিলন দ্বারা সমাজেরও যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পল্লী-ভাষার সংশ্রবে আসিয়া বঙ্গ সাহিত্যও উপকৃত হইবে। দেশে ইতিহাস নাই; পল্লী-ভাষায় ইতিহাসের যথেষ্ট উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে, বঙ্গের প্রাচীন ভট্টকবিদিগের রচিত বিবিধ বিষয়ক গান আজিও বঙ্গের পল্লীতে

পল্লীতে গীত হইয়া থাকে, ঐ সকল গানে বিভিন্ন যুগের সামাজিক, রাজনীতিক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা পরিস্ফুট রহিয়াছে। পল্লীবাসী মুখে মুখে দেশের প্রাচীন ইতিহাসকে অনেকাংশে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহা ব্যতীত পল্লীভাষায় ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতিরও অন্ত নাই, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় কথা পল্লীভাষায় গুপ্ত রহিয়াছে, পল্লীবাসী কথায় কথায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ সে সকল প্রয়োগ করিয়া থাকে, আজ ডাক ও খনার বচন দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; ঐরূপ অনেক বচন এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। দেশের বৃদ্ধগণ সরস ও সুন্দর শ্লোক আবৃত্তি পূর্ব্বক এখনও অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। ক্রমশঃ ঐ সকল লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, শীঘ্র অনুসন্ধান না হইলে অনেক রত্ন হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। দেশে শিলা-লিপি কিম্বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইলে, অথবা কোন ভগ্ন প্রস্তর স্তূপ বাহির হইয়া পড়িলে সাহিত্যিকদিগের মধ্যে মহা হুলস্থূল বাধিয়া যায়, কিন্তু পল্লীভাষায় যে শিলালিপি, তাম্র-শাসন প্রভৃতি অপেক্ষাও কত মহার্ঘ জিনিষ গুপ্ত রহিয়াছে তাহা কয়জনে অনুসন্ধান করিয়া দেখেন? এই সাহিত্য-যুগে পল্লী-ভাষাকে অবহেলা করিলে চলিবে না, উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। পল্লী-ভাষাকে যথাবিধি বিশ্লিষ্ট করিয়া উহা হইতে বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে হইবে।

ভারতের প্রাদেশিক ভাষা সমূহের মধ্যে বঙ্গভাষা শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছে, বঙ্গভাষার সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিদ্যমান। একদিন ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলি বঙ্গ-ভাষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। উক্ত ভাষা-গুলির অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত। বঙ্গভাষা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের অধিকতর নিকটবর্ত্তী, সুতরাং, প্রাদেশিক ভাষাগুলির একীকরণ পক্ষে বঙ্গ-ভাষার উপযুক্ততা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই একীকরণের ভার বঙ্গবাসীর উপর রহিয়াছে। কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গভাষার উপর ভারতবাসীর দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। বঙ্গ সাহিত্য ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হইতেছে। বঙ্গের বাহিরে অনেকে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতেছেন। বঙ্গবাসী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিতেছেন। প্রয়োজন হিসাবে কার্য্য অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। এখন বঙ্গবাসীর সকল দিকে কাজ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরি।

মফঃস্বলের বাণী

১। মেলা

জনসংঘের মিলনের নাম মেলা। তীর্থ, পরব, পার্ব্বণ, মহাপুরুষের জন্মস্থান প্রভৃতিতে যে জন-সমাগম হয়, তাহাকেই মেলা বলা যায়। আমাদের দেশে মেলার অভাব নাই। বাঙ্গালায় এমন গণ্ডগ্রাম নাই—এমন অর্দ্ধ-সহর নাই, যেখানে কোন না কোন আকারে মেলার অস্তিত্ব দেখিতে পাইবে না। এই

এই সকল মেলার যে উদ্দেশ্য ছিল, এখন তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে, অথবা থাকিলেও তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন।

শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের জন্যই মেলার সৃষ্টি। পূর্ব্বে মেলায় নানা স্থান হইতে শিল্পজাত সামগ্রী ও বাণিজ্যদ্রব্য প্রদর্শিত ও বিক্রীত হইত। এখন সে আসল উদ্দেশ্যটার দিকে লোকের আর লক্ষ্য নাই। লক্ষ্য হট্টগোলের মাঝখানে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

মেলায় স্বদেশী শিল্পসম্ভার আর দেখিতে পাও কি? কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচি, খাগড়ার বাসন, বহরমপুর-মুর্শিদাবাদের রেশমী কাপড়, ফরাসডাঙ্গা-শান্তিপুরের সূক্ষ্ম বস্ত্র, কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্প, পাটুলি-দাঁইহাটের শাঁখা—এ সকল কোন মেলায় দেখিতে পাও কি? দেখিবে কেবল, এনামেলের কলাই করা ষ্টীলের বাসন, কাচের পুতুল, বিলাতি আয়না, চিরুণী, ফিতে, আর চটকদার নানাবিধ মনোহারীর জিনিষ। এই সকল দোকানে লোকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে—কষ্টার্জ্জিত কাঞ্চন-বিনিময়ে আপাত-নয়নমুগ্ধকর কাচখণ্ড ক্রয় করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। দেশী শিল্পের আমদানিও নাই—খরিদ্দারও নাই। সুতরাং দেশী শিল্পীরাও বৈদেশিক শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া ব্যবসা করিতে বসিয়াছে। এ দুঃখ বলিব কাহাকে? এ আপশোষ জানাইব কাহাকে?

দেশী শিল্পের যদি অধঃপতন দেখিতে চাও, তবে যে কোন মেলায় গিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিও। তখন মনে হইবে, এমন মেলা উঠিয়া যাওয়াই ভাল। এক একটি যেমন তেমন মেলায় গরিবেরই সর্ব্বনাশ! পল্লিগ্রামের কৃষক-কামিনীরা দলে দলে মেলা দেখিতে ছুটিয়াছে—সঙ্গের যাহারা অভিভাবক তাহারা স্ত্রীজাতির অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। তাহারা মেলায় গিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া আসিতেছে। কে তাহাদের সুবুদ্ধি দিবে!

এর উপর মেলার আর একটা দিক্ আছে। কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া অশ্লীল নৃত্য-গীতের আয়োজন মেলার একটা প্রধান অঙ্গ। ইহা নিশ্চিতই আপত্তিজনক। লিখিতে লজ্জা করে, অনেক মেলাতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর বারবনিতার আমদানি পর্য্যন্ত করা হইয়া থাকে। এই বীভৎস ব্যাপারটা এখন মেলার যেন একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সকল মেলায় লোকসংঘের আধিক্যে স্থানীয় স্বাস্থ্য যে ভঙ্গ হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। 'কলেরা'-প্রচারের প্রধান কারণই এই সকল মেলা। যেখানে দেখিবে মেলা, যেখানে হট্টগোল, খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, সেই খানেই দেখিবে 'কলেরা' তাহার জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছে।

রাণাঘাটে যে কলেরার এত বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রধান কারণ শান্তিপুরের রাসমেলা এই রাসমেলার জন্যই দেশ বিদেশ হইতে রাণাঘাটে যাত্রীসমাগম হইয়া থাকে। সেই সকল যাত্রী যাতায়াতের পথে রাণাঘাটে অবস্থান করে। স্থানীয় দোকানদারগণ সুবিধা পাইয়া অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশায় নিতান্ত নিকৃষ্ট উপকরণে প্রস্তুত মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া যাত্রী-দিগকে বিক্রয় করে। সেই সকল খাদ্যদ্রব্য অবাধে বিক্রীত হয়।

এখানে 'কলেরা' একটি মেলার অঙ্গ। যেখানে মেলা, যেখানে লোকজন বা যাত্রীর

ভিড়, সেই খানেই 'কলেরা'—ইহা স্বতঃসিদ্ধ —ইহা অবশ্যম্ভাবী।

তাই বলিতেছি, দেশে মেলার অভাব নাই; কিন্তু সেই সকল মেলা দেশের হিত অপেক্ষা অহিত সাধনই অধিক করিতেছে না কি? দেশের রুচি মতি প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে না কি? কিন্তু মেলার সংস্কার সম্বন্ধে ত কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখি না! অথচ মেলার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

নূতন মেলা যাহা সৃষ্টি হইতেছে, তাহার অভিনবত্ব কিছুই নাই। মেলা-স্থানের অধিকারীর দুই পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। ইহাতে মেলাগুলি এক একটি ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোথায়ও দেবতার নামে কোথায়ও মহাপুরুষের নামে মেলার সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু দেবতা বা মহাপুরুষের সঙ্গে যে মেলার কোন সম্বন্ধই নাই, তাহা এখানে বলাই বাহুল্য।

এই মেলাগুলির সংস্কার করিতে হইলে দেশের লোকের চেষ্টা চাই। হুজুগপ্রিয় বারইয়ারীর পাণ্ডাদিগের দ্বারা সংস্কারের আশা করা বৃথা। আমোদ-প্রমোদের প্রতিই যাহাদের লক্ষ্য, তাহারা কাজের লোক হইতে পারে না, তাহাদের দ্বারা কাজও হয় না। তাই বলিতেছি, শিক্ষিত সুরুচিপ্রিয়, দেশের আশা-ভরসা-স্থল উদ্যোগী যুবকেরা সংস্কারে মনোযোগী হউন। মেলাগুলিকে শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করুন, তাহা হইলে মেলাগুলি দিয়া কংগ্রেসের অধিক কার্য্য হইবে—এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

মেলায় এখন হিত অপেক্ষা অহিতই অধিক সাধিত হইতেছে এবং তাহার প্রতীকার আবশ্যক—এ কথা বোধ হয় আর বুঝাইতে হইবে না।

চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ।

২। আধুনিক শিক্ষা

রংপুর জেলায় নিম্নপ্রাইমারি বিদ্যালয় ১০৫৭, উচ্চপ্রাইমারি বিদ্যালয় ১২৮, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ৪৪ এবং উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় ১০টি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অর্থাৎ সর্ব্ব সমেত ১২৩৯টি বিদ্যালয়ে রংপুর জেলার অধিবাসিগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; তৎসহ বিদ্যার্থীর সংখ্যা তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজসাহী-বিভাগের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা রংপুর জেলাতেই বিদ্যালয়ের সংখ্যা অধিক, ইহাতে রংপুর-জেলাবাসী সকলেই গৌরবান্বিত সন্দেহ নাই। কিন্তু ভুক্তভোগী সম্প্রদায়ের সকলেই এক্ষণে ভাবিতেছেন, "এই সকল বিদ্যালয় হইতে যাহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ কিরূপ?" তাহাদের ভবিষ্যৎ দুঃখ-ভরা, উদ্দেশ্যবিহীন। শিক্ষিত সম্প্রদায় আপনাদিগকে আদর্শ ধরিয়াই যে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহাদের শিক্ষা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—চাকুরী; কিন্তু শিক্ষিত হইয়া সে লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারেন নাই। আজ তাই দৈন্য-পীড়িত হইয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাদের শিক্ষা-জীবনটা সম্পূর্ণ লক্ষ্যবিহীন ভাবেই অতিবাহিত হইয়াছে। সেই জন্য তাঁহারা স্বদেশ-বাসী লক্ষ লক্ষ ভ্রাতাকে একই উদ্দেশ্যবিহীন পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ম্রিয়মান্।

আমরাও একই কারণে গত সপ্তাহে কেবল মাত্র পুঁথি-পড়ান বিদ্যালয়ের কুফল-সমূহ বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং পুঁথি-পড়ান বিদ্যালয়-সমূহে যাহাতে শিল্প এবং তদনুরূপ অন্নসংস্থানের অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়াছিলাম।

অনেকে প্রস্তাব করেন যে অধুনা আর পুঁথি-পড়ান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই এবং যাহাতে পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়-সমূহও উঠিয়া যায় তাহারই ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু এ প্রস্তাবে আমরা সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিতে অক্ষম। কালের গতি কেহই ফিরাইতে পারে না। বাইবেলের মতে মানব যতদিন আপনার মানুষ-বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত না হইয়াছিল, যতদিন সে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আস্বাদ করিতে না পারিয়াছিল, যতদিন সে বিশ্বাসে, আদিষ্ট এবং নির্দ্দিষ্ট পথে কার্য্য করিয়া যাইত, তত দিন সে দেবতার ন্যায় সদানন্দহৃদয়ে স্বর্গের নন্দন-কাননেই বসতি করিত। কিন্তু হৃদয়ের অদম্য পিপাসা সৃষ্টি-কর্ত্তাও ফিরাইতে পারেন নাই, তাই মানব লুকাইয়া জ্ঞানফল আস্বাদ করিয়া স্বর্গচ্যুত হইয়াছিল। সেই পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া দেশবাসিগণ আজ ছুটিয়াছে—মানবের কি সাধ্য তাহাদিগকে ফিরাইয়া রাখে। তাহা-দিগকে ফিরাইতে চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম হইবে—তাহারা কখনই ফিরিবে না। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আস্বাদ করিয়া মানব পতিত হইয়াছিল বটে—আবার সেই জ্ঞানযোগ দ্বারাই মানবের উদ্ধারের পথ ভগবানই দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং কালের গতিরোধ করিতে চেষ্টা না করিয়া, বিদ্যালয়-সমূহ উঠাইয়া দেওয়ার প্রয়াস না পাইয়া যাহাতে এই শিক্ষা-পথেই দেশবাসিগণ উদ্ধার পাইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা আমাদের করা আবশ্যক।

কৃষকেরা পুঁথি-পাঠ করিতে শিক্ষা করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে লজ্জা বোধ করিবে, এ কথা সত্য এবং ইহার জন্য প্রকৃত পক্ষে আমরাই দায়ী। আমরাই তাহাদিগকে শিখাইতেছি—লেখাপড়া শিখিলে ভদ্র হয় এবং ভদ্রের পক্ষে শারীরিক শ্রম লজ্জার কথা। ইহা অধঃপতিত জাতির চূড়ান্ত নিদর্শন। এতদিন আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যায়াম-অভ্যাস গর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতাম। স্বাস্থ্য অবহেলা করিয়া ছাত্রদিগকে দিবারাত্র পুঁথি লইয়া বসিয়া থাকিতে আদেশ দিতাম। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার কুফল আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। এখন আমরাই উদ্যোগী হইয়া বালকদিগকে পাঠাভ্যাসের সহি, ব্যায়াম-অভ্যাসের উপদেশ দিয়া থাকি। প্রত্যেক বিদ্যালয়েও পাঠের সহিত ব্যায়াম-অভ্যাসের সুব্যবস্থা করা হইতেছে, আমাদের মন হইতেও পূর্ব্ব-কুসংস্কার দূরীভূত হইতেছে। সেইরূপ আমরাই যদি বাল্যকাল হইতে ছাত্র-দিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করি যে শারীরিক পরিশ্রম মানবের পক্ষে গৌরববর্দ্ধক, পিতৃ-পিতামহের অনুসৃত পথ অনুসরণে লজ্জা নাই, তাহা হইলে আমাদিগের ভবিষ্যৎবংশধর-গণের এবং কৃষকদিগের ভবিষ্যৎ কালিমাচ্ছন্ন হইবার কোনই কারণ নাই।

অনেকে বলিতে পারেন যে, শারীরিক পরিশ্রম করা অথবা পিতৃপিতামহের অনুসৃত পথ অনুসরণ করায় লজ্জা বোধ না করিলেও যে সকল কৃষক যৌবনকালাবধি পাঠাভ্যাসে অতিবাহিত করে, তাহারা বিদ্যা-লয় ত্যাগ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলে উদরান্নের সংস্থান করিবে কি প্রকারে? এ কথা সত্য। সেই জন্য আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহে যাহাতে শিল্পাদি বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কৃষিপ্রধান স্থানসমূহে চাষ-আবাদের সময় কৃষকছাত্র-দিগকে দিবসে ক্ষেত্রে অভিভাবকদিগকে সাহায্য করিতে দিয়া রাত্রে এবং প্রত্যূষে তাহাদিগকে পাঠ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং যে সময় কৃষকদিগকে সারাদিন ক্ষেত্রে থাকিতে

হয় সেই সময় বিদ্যালয়ে 'আবাদি বন্ধ' দেওয়া উচিত।

আজকাল শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়-গৃহ মাত্রকেই রাজপ্রাসাদের ন্যায় বৃহৎ ও সুসজ্জিত করিতে চান। কুটীরে প্রতিপালিত কৃষক-পুত্রদিগের এবম্বিধ সৌধে পাঠাভ্যাস করিতে পাঠাইলে দিল্লীর ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধবুদ্ধি শিবাজিপুত্র শম্ভুজির ন্যায় তাহাদের মস্তিষ্কও বিকৃত হওয়ার আশ্চর্য্য কি? তরুচ্ছায়ায়, মুক্ত প্রান্তরে কি বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতে পারে না?

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

৩। কাঁথির প্লাবনে স্বেচ্ছাসেবকদল

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রণা-সভার সদস্য মাননীয় মিঃ লায়ন বাহাদুর বিগত ১৯এ নবেম্বর হইতে ২১এ নবেম্বর পর্য্যন্ত আমাদের কাঁথি মহকুমার ভগবানপুর, উদ্বাদাল, কালী-নগর প্রভৃতি-প্লাবন পীড়িত কতকগুলি স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক জলে কাদায় কষ্ট স্বীকার করিয়া প্লাবন পীড়িত ব্যক্তিদের দুর্দ্দশাদি প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সলিল-তরঙ্গায়িত বিস্তৃত ক্ষেত্র, প্লাবন-ক্লিষ্ট নরনারীর অস্থিকঙ্কালসার দেহ, সাহায্যদাতৃ স্বেচ্ছা-সেবকবৃন্দের কার্য্য-প্রণালী আদি সচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়া দেখিয়াছেন যে, অনশন-জীর্ণ ব্যক্তিদের গৃহে কিছুই নাই; কাহারও কাহারও গৃহে "ভেঁট" চাল দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই পরিদর্শনের বিবরণ এবং পরিদর্শন কালে সমবেত ভদ্রলোকগণের সহিত প্লাবন-বিপন্ন স্থানের চৌকিদারী টেক্স ও খাজনা মাপ, জরীপ বন্ধ, জল-নিকাশের সুবিধা এবং সাহায্য-দান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করিয়াছি।

মিঃ লায়ন বাহাদুরের প্রত্যাবর্ত্তনের পর কাঁথি মহকুমার প্লাবন-পীড়িত অঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণের অবগতির জন্য "কলিকাতা-গেজেটে" বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের একটী বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। তাহাতে প্লাবন-পীড়িত অধিবাসীদের রক্ষাকল্পে কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদান করিলাম:—

মাননীয় মিঃ লায়ন বাহাদুর প্লাবন-পীড়িত স্থানসমূহের সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, দরিদ্র কৃষিজীবিগণের মধ্যে ঋণ প্রদান পূর্ব্বক বন্যা-প্রপীড়িত অনেক লোককে সাহায্য করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যাহারা কার্য্য করিতে অক্ষম বিগত আগষ্ট মাস হইতে প্রধানতঃ দেশের সেবকদল এবং আংশিক ভাবে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

বন্যা-প্রপীড়িত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ৪'৫ দল সেচ্ছাসেবক কার্য্য করিতেছেন; তন্মধ্যে তিনি কলিকাতা কেন্দ্র-সাহায্য-সমিতি (সেণ্ট্রেল অর্গানিজেশন) ও রামকৃষ্ণ-মিশনের সেবকদলের কার্য্য পরিদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইঁহাদের কার্য্যস্থলে এবং গ্রাম-সমূহে তিনি বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, স্বেচ্ছাসেবকদল খুব সুন্দরভাবে কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। স্থানে স্থানে সাহায্যের পরিমাণ কিছু অধিক হইলেও সেবকদল সকল স্থলেই খুব সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে এই-রূপ মনে হইয়াছে সকল স্থানেই বেশ শৃঙ্খলা ও নিয়মের সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল সেবকদলের হস্তে অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহাদের অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যয় হইয়াছে।

নীহার।

৪। আদর্শ-জননী

অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমাদের কথা এই—রমণী আমাদের দেশে মাতৃ-স্বরূপিণী। আমরা স্ত্রীজাতিকে সম্মান করি, মায়ের ন্যায় তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব দিই। হিন্দুঋষি এই মহান্ শিক্ষা আমাদের জন্য জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা রমণীমূর্ত্তিতে মাতৃমহিমার অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া রমণী মাত্রকেই মাতার

ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়াছেন, অন্যকেও করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। হিন্দুসাধকও "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি" এই বলিয়া স্বীয় অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খল চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। আমরা স্ত্রীজাতিকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিতেছি। স্ত্রীজাতি—মাতৃকা-জাতি; মায়ের স্নেহ, মায়ের কৃপা, মায়ের প্রাণ, মায়ের হৃদয় লইয়া নারীজাতি আমাদিগকে বিশ্বপিতার সংসারে কত কষ্টে কত যত্নে লালন-পালন করিতেছেন। তাই মায়ের সিংহাসন সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বরের সিংহাসন হইতেও শত গুণে শ্রেষ্ঠ। তাই মা হওয়ার চেয়ে নারীজাতির গৌরবের বিষয় আর কি আছে? আমাদের আদর্শ সতী রমণীরা পতিকেও তাঁহার মাতৃস্থানীয়া হইয়া স্নেহ করেন। ইহা সতী নারীর পরম ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। তাই মায়ের গৌরব সর্ব্বত্র, মাতৃভক্তিতে সন্তানের হৃদয় ভরপুর, মাতৃপূজায় সন্তান উন্মত্ত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মায়ের মঙ্গলময়ী মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া শান্ত, সুস্থ ও আশ্বস্ত হয়। মা ভিন্ন আর আমাদের গতি মুক্তি নাই।

একদিন ভারতের প্রতি গৃহে আদর্শ মাতা, আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ পতিপত্নী ছিলেন। তাই ভারতের গৃহস্থালী একদিন পরম সুখের ছিল; কিন্তু সেই দিন একেবারে না গেলেও এখন আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব লাভের প্রাচীন আদর্শকে ভাঙ্গিতে শিখিয়াছি, গড়িতে শিখি নাই; কাজেই আমরা ক্রমে শান্তি, প্রীতি, দয়ামায়া, আতিথ্য, দেবভক্তি এবং গুরুজনে ভক্তিহীন হইয়া গৃহস্থালীর নির্ম্মল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হারাইয়া দীন ক্ষীণ হইতেছি।

হৃদয়ের যে বল মনুষ্যকে অতুলনীয় সুখ-সম্পদ্ প্রদান করে, হৃদয়ের যে নির্ম্মলতায় মানুষ মহাশক্তির অধিকারী হয়, হৃদয়ের সেই বল ও সেই নির্ম্মলতা আমরা আর কোথাও অর্জ্জন করিতে পাই না, পাই কেবল মাতৃ-স্থানে। সকল মাতাই যে সন্তানকে হৃদয়ের সেই শিক্ষা সামর্থ্য দিতে পারেন এমন কথা বলিতেছি না। কারণ আমরা যেমন প্রাচীন উচ্চ আদর্শকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছি, আমাদের কুলমহিলারাও আমাদের দেখা-দেখি প্রাচীন আদর্শ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া-ছেন। কাজেই আমরা আদর্শ-মাতা অতি অল্পই দেখিতে পাইতেছি।

আদর্শ পুত্র-কন্যার দ্বারা গৃহস্থালী এবং দেশ ও সমাজ উন্নত ও উজ্জ্বল করিবার জন্যই আদর্শ জননী অতি আবশ্যক। কৌশল্যা ছিলেন বলিয়াই ভারতে রামচন্দ্র জন্মিয়া-ছিলেন। আমরা রামচন্দ্রকে পাইয়াছি—পাইয়া ধন্য হইয়াছি; সুমিত্রা ছিলেন বলিয়াই—লক্ষ্মণকে পাইয়াছি, পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। সুনীতির ন্যায় জননী প্রসূতি না হইলে ভারতমাতা ধ্রুব-সম্পদের অধিকারিণী হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কয়াধুর ন্যায় ভাগ্যবতী মহীয়সী জননীকে যদি মহাপুণ্যের ফলে বক্ষে ধারণ না করিতেন, তাহা হইলে ভারতমাতা প্রহ্লাদের ন্যায় মহারত্নের অধিকারিণী হইতে পারিতেন কি? কত বলিব! পুরাণ ইতিহাসে কত কত আদর্শ জননীর কথা আছে; তাঁহাদের মাতৃমহিমা পাঠ করিলে যুগপৎ বিস্মিত, স্তম্ভিত ও আনন্দিত হইতে হয়; চক্ষের জল রুদ্ধ করিয়া রাখা সুকঠিন হয়। আদর্শ মাতা আমাদিগকে যে মহা মঙ্গলের অধিকারী করিয়া দিতে পারেন, কি দিয়া থাকেন, কি দিয়া আসিতে-ছেন, তাহার তুলনা কোথায়!

আমাদের গৃহ-গৃহস্থালী মহামঙ্গলের নিকেতন। আমরা যে মহামঙ্গলের জন্য মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া জগতে আসিয়াছি, মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছি, পত্নী-পুত্রের প্রীতিপ্রফুল্ল মুখ পানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছি, বন্ধু-বান্ধব ও পরিবার-পরিজনকে স্নেহ শ্রদ্ধার সহিত আমরণ অপরিশ্রান্ত হৃদয়ে প্রীতি-পরিচর্য্যা করিতেছি, সেই মহামঙ্গলের মধুমাখা বীজ আদর্শ-জননী আমাদের শিশুর সুকোমল হৃদয়ে রোপণ করিতে পারেন। কেন পারেন, এখন তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

জগতে দুই রূপ—মাতৃরূপ ও পিতৃরূপ।

অথবা দুই শক্তি, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি। মায়ের মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি দেখিলেই শিশুর প্রাণ, সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের মত ফুটিয়া উঠে; মায়ের মধুমাখা কথা শুনিলেই শিশুর কুসুমকোমল হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। ধূলা মাখিয়া, ধূলায় পড়িয়া শিশু রোদন করিতেছে, ছিন্নশির পতঙ্গের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, মা তাঁহার অভয়া মূর্ত্তি লইয়া সুকোমল হস্তে শিশুর গায়ে হাত বুলাইলেন আর অমনি শিশু উঠিয়া বসিল, কোলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ জুড়াইল; মা স্নেহের অঞ্চলে শিশুর গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া বক্ষে লইলেন। শিশু কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া দিল। মায়ের এমনই মহিমা, এমনই অসাধারণ মধুমাখা স্নেহশক্তি! এই যে ধূলায় মলিন শিশু দেবতার হস্তে নির্ম্মল হইল, যেন বাসিফুলের ঝরা কলিকাটী সদ্যঃ হইল, বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল, দৈব-শক্তিতে আবার বৃন্ত-সংলগ্ন হইয়া হাসিতে লাগিল। ইহা হইল মায়ের নারীশক্তি। মায়ের দেবী শক্তি আরও অপূর্ব্ব। মা সেই দেবীশক্তিতে সন্তানকে দেবতার আসন, দেবতার বসন, দেবতার সাজসজ্জা দিয়া দেবতা করেন, দেবতার নির্ম্মাল্য মাথায় দিয়া প্রাণের আশীর্ব্বাদ দিয়া আশ্বস্ত ও অভয়-দান করেন। এই হইল মায়ের দেবীশক্তির পুণ্যদান। সন্তান এই মহৎ দানেরই আকাঙ্ক্ষী। এই মহৎ দানের প্রত্যাশায়ই সন্তান মা মা বলিয়া কাঁদে! মা মা বলিয়া হাসে! আবার মা'র কোলে উঠিয়া আকাশের চাঁদ ধরিতে চায়। মা দেবীশক্তির প্রভাবেই আকাশের সুদূরবর্ত্তী দুষ্প্রাপ্য চন্দ্রকে ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রাণ হন; তবু আনন্দে গদগদ হইয়া ডাকেন—আয় চাঁদ আয়, আমার মণির কপালে একটি টিপ্ দিয়া যা।" সন্তানের জন্য মায়ের এমনই মঙ্গলময়ী ইচ্ছা। মা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাকে বক্ষে লইয়া সন্তানের জন্য আকাশের চাঁদ ধরিতে যান। তাই বলিতেছিলাম, মা বই আর সন্তানের জন্য কে আকাশের চাঁদের উপাসনা করিবে; মা ভিন্ন আর কে মণির কপালে আকাশের চাঁদের টিপের কামনা করিবে? মা বই আর এমন করিয়া কে সন্তানের জন্য আকাশের চাঁদ ধরিতে হাত বাড়াইবেন?

মা দেখেন আকাশের চাঁদে, আর তাহার কোলের চাঁদে কোন পার্থক্য নাই। আকাশের চাঁদেও জগৎ আলো করিতেছে, তাঁহার কোলের চাঁদও জগৎ আলো করিবে। তাই চাঁদকে ডাকিয়া মণির কপালে একটী টিপ দিয়া যাইতে বলিয়া থাকেন। মায়ের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার কথা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত, আনন্দে পরিপ্লুত হইতে হয়। জননীই যে আমাদের মহামঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিয়া থাকেন বোধ হয় আর তাহা কষ্ট করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

জননী পুত্রকে কন্যাকে আন্তরিক যত্নে এরূপভাবে শিক্ষা দিবেন, যাহাতে পুত্রকন্যা-গুলি গৃহে বাস করিয়া, স্বর্গের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে স্বর্গের সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে মানবজন্মের মধুরতা, সরসতা, দুর্ল্লভতা, অপরিমিততা ও অসীমতা প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইতে পারে। সেকালে রামচন্দ্র কৃতার্থ হইয়াছিলেন, লক্ষ্মণ কৃতার্থ হইয়াছিলেন, ধ্রুব-প্রহ্লাদ কৃতার্থ হইয়াছিলেন, আর একালে, ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন, কেশবচন্দ্র কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সে কালের কথা বলিতে হইলে কত কত মহাপুরুষের কথাই বলা যায়। সকল বলিবার আবশ্যকতা নাই। তবে ভীমের কথা বলিতে হয়। ভীম মাতৃআজ্ঞায় বক-রাক্ষসের ভক্ষ্য হইয়া গেলেন। রোরুদ্যমানা ব্রাহ্মণপরিবারকে রাক্ষসের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেবী কুন্তী স্বীয় পুত্র ভীমকে পাঠাইলেন। ভীম মাতৃনির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া রাক্ষসের সম্মুখীন হইলেন। রাক্ষসকে প্রাণে বধ করিয়া দেশশুদ্ধ লোকের জীবন রক্ষা করিলেন। নতুবা একচক্রা নগরের কি দুর্দ্দশাই না হইত! গৃহে গৃহে পরিবারে পরিবারে, পল্লীতে পল্লীতে পুত্রশোকে, ভ্রাতৃশোকে, পতিশোকে, পত্নীশোকে, বন্ধুশোকে মাতৃপিতৃশোকে সকলেরই হৃদয়

ছিন্নবিচ্ছিন্ন, নয়ন অশ্রুসমাচ্ছন্ন; প্রাণভয়ে ব্যাধবিতাড়িত কুরঙ্গ-শাবকের ন্যায় সকলকেই উদ্ভ্রান্ত হইতে হইয়াছিল। জননী পুত্রের জীবন ধন্য করিলেন। আদর্শজননীগণ এইরূপেই পুত্রকে কৃতার্থ করেন।

দস্যু রত্নাকর চিন্তাকুলচিত্তে জননীর চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, মা, আমার পাপের ভাগিনী কি তুমি নও? তখন মা মায়ের মত উত্তর দিলেন, কহিলেন, —না বাছা, আমি তোমার গর্ভধারিণী মাতা; দশমাস দশদিন তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া কত কষ্ট কত যন্ত্রণা পাইয়াছি; এখন আমি বৃদ্ধ, আমার ভরণপোষণ করা তোমার কর্ত্তব্য—তোমার পাপের ভাগী আমি কেন হইব। তোমার পাপের ফল তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে। এই ত মায়ের কাজ। মা নিজের সুখের জন্যও সন্তানের মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিলেন না। তখন রত্নাকর স্তম্ভিত হইলেন; দেখিলেন, জননীও তাঁহার পাপের ফল স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিতেছেন। দস্যু ধর্ম্মের শাস্তোজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া আপনার জন্মগৌরব ও জীবন-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন। দস্যুর দস্যুতা ঋষির ঋষিত্বে, দস্যুর কর্কশ কণ্ঠ কবির ক্ষীরকণ্ঠে পরিণত হইল। মায়ের আশীর্ব্বাদের এইরূপই প্রত্যক্ষ ফল। মাতৃস্তন্য-ধারার এইরূপই মহীয়সী শক্তি!

আমাদের গৃহকে স্বর্গের শোভায় সুশোভিত, পুত্রকন্যাগুলিকে দেবতার দেবত্বে অলঙ্কৃত, এবং আমাদের সমাজকে, দেশকে শীতলচ্ছায়াসমন্বিত করিবার জন্য ঘরে ঘরে আদর্শ জননীর প্রয়োজন। আবার দেশে কৌশল্যা, সুমিত্রা, গান্ধারী, সুনীতি, কয়াধু, কুন্তী, পদ্মাবতী প্রভৃতি মহীয়সী জননীর আবশ্যক। তাহা হইলে দেশে আবার সেই শান্তি আসিবে, গৃহস্থালীতে সেই শান্তি, প্রীতি, দেবভক্তি, গুরুজনে ভক্তি, দীনে দয়া, অনুগতে বাৎসল্য আসিবে। আমরা মরণের গ্রাস হইতে, সর্ব্বনাশের বাহুবেষ্টন হইতে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইতে পারিব। নচেৎ পরপ্রত্যাশা আমাদিগকে মঙ্গল দানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে কি?

এই সেই দিন চট্টগ্রামে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বার্দ্ধক্যের অভ্রান্ত অভিজ্ঞতার চক্ষে দেখিয়া, দৃঢ়তার সহিত কহিয়াছেন যে, "আমাদের দুর্দ্দশাই এই, আমরা দূরে পশ্চিমদিকে নিয়তই নয়ন নিক্ষেপ করিয়া আছি, কখন আপনার দিকে, আপনাদের ঘরের দিকে, আপনাদের গৃহস্থালীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না।"

আমাদেরও ঐ কথা। আমরা আপনাকে ভুলিয়াছি, আপনার মঙ্গলামঙ্গল বিস্মৃত হইয়াছি। আমাদের জননীরা এখন পুত্রের পায়ে বুট, গায়ে কোট, মাথায় হেট পরাইয়া দিয়া আহ্লাদে আটখানা হইতেছেন, কিন্তু সেই প্রাচীনা আদর্শমাতা সুনীতির ন্যায় গলায় মালা পরাইয়া ভক্তির পথে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন না; মহিমময়ী জননী সুমিত্রার ন্যায় "বৎস, স্বচ্ছন্দ চিত্তে জ্যেষ্ঠের অনুগমন কর। বনবাসে সুখই হউক আর দুঃখই হউক, সর্ব্বদা ভ্রাতার পরিচর্য্যা করিও, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে আমার মত জ্ঞান করিয়া তাহাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইও—যাও বৎস, সত্বর বনে গমন কর" এইরূপ মহাবাণী কহিয়া সন্তানকে নিয়ন্ত্রিত ও উৎসাহিত করিতে এখনকার জননীরা যেন নিতান্তই অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। "বৎস দুর্য্যোধন, যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়" এইরূপ পুণ্যকথা কহিয়া প্রণত পুত্রের মস্তকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতে এখনকার জননীরা স্বপ্নাবস্থায়ও যেন রাজি নহেন। আর পদ্মাবতীর কথা কি বলিব! তিনি ত জগতে ধন্য হইয়া রহিয়াছেন। কই, আমাদের মায়েরা সেই মত হৃদয়ের দেবীদুর্ল্লভ মহিমার ধার ধারেন কই? মায়ের সেই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি, মায়ের সেই অমৃতনিস্যন্দিনী চরিতকথা, মায়ের সেই ত্রিলোকবিস্ময়কর প্রাণের অপরূপ রূপ এখনকার জননীরা স্মরণ, মনন, ধ্যান, ধারণা করেন কি? তাঁহাদের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া, দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারেন কি?

আমাদের জননীগণের নিকট আমরা কি ধনের প্রত্যাশা করিয়া থাকি? মা বিদুষী

হইয়া বিলাসিনী হইবেন, আমরা তাহা চাই না। আমরা চাই, তপস্বিনী মা,—আমরা চাই তপঃকৃশা হৃদয়ময়ী জননীর পদারবিন্দ, আমরা চাই ভগবদ্ভক্তিলোলুপা ব্রহ্মচারিণী জননীর আশীর্ব্বাদ, আমরা চাই ভোগবিলাস-বিদ্বেষিণী পুত্রযজ্ঞ-ব্রতধারিণী জননীর স্নেহের ইঙ্গিত। আমরা চাই, মায়ের মধুরবাণী শুনিতে শুনিতে, শান্তোজ্জ্বল পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, পুণ্যপবনসঞ্চালিত স্নেহের অঞ্চল ধরিতে ধরিতে, সংসারপথে, জীবনের পথে প্রাণ লইয়া অগ্রসর হইতে পারি এমন মা। নহিলে "মা ম'লে কি তাঁর ছেলে বাঁচে না ?"

এখনকার মায়েরা আবার কন্যাকে সেমিজ, বডিস্ পরাইয়া দুইটা সংগীত গাইতে শিক্ষা দিয়াই আনন্দে আত্মহারা হন; আমাদের কর্ম্মফলে ঘোর দুর্দ্দিন আসিয়াছে; এই দুর্দ্দিনে আদর্শজননী না পাইলে আর মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারিব না। তাই বলিতেছি, ঘরে ঘরে আদর্শ জননী চাই।

আমাদের কুলাঙ্গনারা এই কথা বুঝুন যে, নারীহৃদয় মায়ের উন্নত মহিমায় মণ্ডিত না হইলে, নারীপ্রাণ স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে মানব-শিশুকে অশেষ মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে, মানবজীবনের অভ্যন্তরে যে এক চির-আনন্দময় চির-পুণ্যপবিত্রতাময়, চির-সুখস্বাচ্ছন্দ্যময়, অতুল অপূর্ব্ব ও অসাধারণ মধুর জীবন আছে তাহা দেখাইয়া দিতে না পারিলে মাতৃনামের স্বার্থকতা কিছুই নাই। একদিন বঙ্গের মাতৃভক্তসাধক রামপ্রসাদ অশ্রুস্নাতনয়নে, বিশ্বজননীর মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে আবেগ-পূর্ণ প্রাণে গাহিয়াছিলেন :—

"মা হওয়া কি মুখের কথা
কেবল প্রসব করলে হয় না মাতা !"

আমরাও ভক্ত সাধকের চরণোদ্দেশে হইয়া সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিতে মা চাই, ঘরে ঘরে মা চাই—মায়ের মত চাই। মা না হইলে আর বাঁচি না, বাঁ পারিব না। আপাতসৌন্দর্য্যে নয়ন মুগ্ধ হইয়াছে, আপাতমাধুর্য্যে মন মোহিত হইয়াছে—হৃদয় বিভ্রান্ত হইয়াছে—এখন মায়ের মত মা চাই। কেবল প্রসব করিয়াই মা হইলেন, এমন মা দিয়া আমরা ভারতের শিশু এখন আর সুস্থ, বলিষ্ঠ, প্রাণবিশিষ্ট হইতে পারিব না, হৃদয়বান্ হইতে সমর্থ হইব না। যে হৃদয় প্রাণের প্রকৃত নিদর্শন, সেই মহনীয় হৃদয় হইতে বঞ্চিত রহিয়া উৎসন্নের পথে যাইতেছি, আরও যাইব। তাই মা চাই—আদর্শ জননী চাই। ঘরে ঘরে আদর্শ জননীর জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতে হইবে; প্রাণের সাধনা করিতে হইবে। নারীজাতিকে আমাদের সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রযত্নে সেই শিক্ষাই দিতে হইবে।

এই মহাসাধনার জন্য, আমাদের মাতৃকা-জাতির সমক্ষে মাতৃস্নেহের কথাকেই নীতির নির্ম্মল ভাষায় অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে হইবে। ভারতের কাব্য-ইতিহাসে আদর্শ-জননী চিত্রের অভাব নাই। সেই সমুদয় আদর্শজননী-চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমাদের কুলমহিলাদিগকে শিখাইতে হইবে, সেই প্রাচীনকালের আদর্শজননীরা কিরূপে পুত্র-কন্যাগণকে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিরূপ ভাবে কিরূপ প্রাণে সন্তানের নৈতিক মঙ্গল কামনা করিয়া সন্তানকে জগতের মধ্যে উজ্জ্বলরত্ন করিয়া-ছিলেন, হিন্দুমহিলাগণ যাহাতে সেই পথের সন্ধান পাইতে পারেন সর্ব্বাগ্রে সকলেরই সেই চেষ্টা করা সঙ্গত।

বিশ্ববার্ত্তা।

পরিশিষ্ট

শুক্রে চ। ৮১।

শুক্রে চেতি। শুক্র (২৫=১) শব্দোঽত্র লগ্নার্থকঃ। অতঃ উচ্চবৎ, উচ্চ ইত্যাদি সূত্রেভ্যঃ, কারকাংশাদ্ ব্যয় স্থানে রব্যাদি গ্রহ স্থিত্যা যথৈব ফল বিচার ক্রিয়তে শুক্রে চ কারকাংশেঽপি তাদৃশ ফল যোগঃ জ্ঞাতব্যঃ ॥ ৮১ ॥

শুক্র শব্দ বর্ণ সঙ্কেতানুসারে এস্থলে লগ্ন অর্থাৎ কারকাংশ বাচী। কারকাংশ রাশির দ্বাদশ স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ সম্বন্ধে যেরূপ ভক্তিযোগ লিখিত হইয়াছে, কারকাংশ রাশি হইতেও তৎ তৎ গ্রহের স্থিতি বশতঃ তদ্রূপই ভক্তি বিচার কার্য্য। টীকাকারগণ এস্থলে পূর্ব্বোক্ত অশীতি সংখ্যক সূত্রের সহিত সমন্বয় রাখিয়া, শুক্রগ্রহ কারকাংশ রাশির ব্যয় স্থানে পাপক্ষেত্র গত থাকিলে মনুষ্য ক্ষুদ্রদেবতার উপাসক হইয়া থাকে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্তরূপে অর্থ হইলে পাপর্ক্ষে মন্দ শুক্রাভ্যাং অথবা শুক্রে মন্দে বা লিখিলেই যথেষ্ট হইত; সূত্রান্তরের প্রয়োজন ছিল না। বিশেষতঃ শুভগ্রহ শুক্র হইতে ভূত পিশাচাদি ক্ষুদ্র দেবতার চিন্তা করা সুসঙ্গত নহে ॥ ৮১ ॥

অমাত্য দাসে চৈবং। ৮২ ॥

অমাত্যো বর্ত্ততে যত্র তদ্রিপৌ দ্বিজসত্তম।
সূর্য্যাদি গ্রহসংযুক্তে তৎ ফলং পূর্ব্ববদ্ দ্বিজ ॥

আত্মকারকান্যূনাংশকো গ্রহোঽমাত্যঃ। কারকাশ্রিত নবাংশ রাশে র্ব্যয়স্থানে কারকাংশে বা যথৈব ভক্তিবিচারঃ ক্রিয়তে, অমাত্য দাসে চৈবং অমাত্য কারকাৃরাশ্রিত রাশ্যাপেক্ষয়া দাসে (৭৮=৬) ষষ্ঠ রাশাবপি সূর্য্যাদি গ্রহ স্থিত্যা তথৈব দেবতা ভক্তি শ্চিন্তনীয়াঃ ॥ ৮২ ॥

কারকাংশের দ্বাদশে রব্যাদি গ্রহগণের স্থিতি বশতঃ যে প্রকার ভক্তিযোগ বিচার করা হইয়াছে অমাত্য কারকাশ্রিত রাশির ষষ্ঠ স্থান হইতেও তদ্বৎ গ্রহের অবস্থিতি দৃষ্টে তদ্রূপ ফল বিচার কার্য্য। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, এই ভক্তিযোগ বিচারে অনেক টীকাকার ৬৯ সংখ্যক সূত্রে কেতু শব্দে এক অর্থ করিয়া সন্দেহ ক্রমে কারকাংশ এবং দ্বাদশ উভয় স্থানকেই লক্ষ্য করতঃ নৌকাদ্বয়ে পদার্পণ করিয়াছেন। অনেকে আবার বর্ত্তমান্ সূত্রে অমাত্য দাস অর্থে অমাত্য কারক গ্রহ হইতে বামাদি গণনায় ষষ্ঠ গ্রহকে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নগ্রহাঃ সূত্র সত্ত্বে দাসশব্দ হইতে বর্ণ সঙ্কেতানুসারে গ্রহজ্ঞান অনুচিত। কেহ বা আবার অমাত্য দাস শব্দে অমাত্য কারকের অনুচর অর্থাৎ ভ্রাতৃ কারক গ্রহ ব্যাখ্যা করিয়া অগ্রোক্ত চতুর্থ পাদস্থ ৪৩ সংখ্যক সূত্রের নিরর্থক অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু কোন অর্থই এস্থলে যুক্তি সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য নহে। ৮২ ॥

ত্রিকোণে পাপদ্বয়ে মান্ত্রিকঃ। ৮৩ ॥

ত্রিকোণে কারকাংশাৎ পঞ্চম নবময়োঃ ক্রমেণ পাপদ্বয়ে প্রাপ্তে পুরুষো মান্ত্রিকো মন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা ভবতি ॥ ৮৩ ॥

এক্ষণে কারকাংশ রাশির ত্রিকোণ রাশি গত ফল লিখিত হইতেছে। কারক নবাংশ রাশির ত্রিকোণ অর্থাৎ পঞ্চম ও নবম স্থানে যথাক্রমে দুইটি পাপগ্রহ থাকিলে মনুষ্য মান্ত্রিক অর্থাৎ ষট্‌কর্ম্মান্বিত হইয়া থাকে। পারাশরী হোরায় লিখিত আছে যে উক্ত স্থানদ্বয়ে গ্রহ থাকিলেই মনুষ্য তান্ত্রিক হয়, তন্মধ্যে শুভগ্রহ হইতে সুদেবতার এবং পাপগ্রহ হইতে ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা চিন্তনীয়। যথা—"কারকাংশাৎ ত্রিকোণস্থে খেটে চ তান্ত্রিকো ভবেৎ। পাপেন ক্ষুদ্র দেবস্য শুভেন শুভ সেবকঃ ॥" ইতি। ৮৩

পাপদৃষ্টে নিগ্রাহকঃ। ৮৪ ॥

কারকাংশাৎ ত্রিকোণ দ্বয়ে সপাপে পাপদৃষ্টে সতি সর্ব্বেষাং ভূতাদীনামপি নিগ্রাহকঃ নিগ্রহ কর্ত্তা স্যাৎ ॥ ৮৪ ॥

উক্ত কারকাংশ রাশির সপাপ ত্রিকোণ দ্বয়ে পুনঃ পাপ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে মনুষ্য ভূতাদি পর্য্যন্ত সকলের নিগ্রহকারী অর্থাৎ পিশাচ বাধাদি নিবারণে সক্ষম হয়। ৮৪ ॥

শুভদৃষ্টেঽনুগ্রাহকঃ। ৮৫ ॥

কারকাংশাৎ ত্রিকোণদ্বয়ে সপাপে শুভদৃষ্টে সতি পুরুষো লোকেষু অনুগ্রাহকঃ অনুগ্রহকর্ত্তা ভবতি ॥ ৮৫ ॥

উক্ত সপাপ ত্রিকোণ রাশিদ্বয়ে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে মনুষ্য অনুগ্রহকারী হয়। এই নিগ্রহানুগ্রহ শক্তি তাহার মন্ত্র বিচার উপরে নির্ভর করে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ৮৫ ॥

শুক্রেন্দৌ শুক্রদৃষ্টে রসবাদী। ৮৬ ॥

শুক্রে (২৫ = ১) কারকাংশ রাশৌ ইন্দৌ চন্দ্রে শুক্রদৃষ্টে সতি রসবাদী রসায়ন শাস্ত্রবেত্তা স্যাৎ ॥ ৮৬ ॥

শুক্র দৃষ্ট চন্দ্র, কারক নবাংশ রাশিগত থাকিলে, মনুষ্য রসায়ন শাস্ত্রবেত্তা এবং ধাতুর জারণ মারণে সুদক্ষ হয়। ৮৬।

বুধ দৃষ্টে ভিষক্। ৮৭।

কারক নবাংশ রাশি গতে চন্দ্রে বুধদৃষ্টে সতি মনুষ্যো ভিষক্ বৈদ্যো ভবতি ॥ ৮৭ ॥

কারক নবাংশ গত চন্দ্রের প্রতি বুধের দৃষ্টি থাকিলে মনুষ্য বৈদ্যক শাস্ত্রাভিজ্ঞ সুচিকিৎসক হইয়া থাকে। ৮৭।

চাপে চন্দ্রে শুক্রদৃষ্টে পাণ্ডু শ্বিত্রী। ৮৮।

কারকাংশাৎ চাপে (১৬=৪) চতুর্থ স্থানে চন্দ্রে শুক্র দৃষ্টে সতি জাতকঃ পাণ্ডু শ্বিত্রী শ্বেতকুষ্ঠ রোগাক্রান্তো ভবতি॥ ৮৮॥

কারকাংশ রাশির চতুর্থ স্থানে শুক্র সংদৃষ্ট চন্দ্র থাকিলে মনুষ্য শ্বেত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। চতুর্থ স্থানগত চন্দ্রই কুষ্ঠরোগের কারক। দ্রষ্টা গ্রহ হইতে তদ্‌রোগের প্রকার ভেদ মাত্র জ্ঞাতব্য॥ ৮৮॥

কুজ দৃষ্টে মহারোগঃ॥ ৮৯॥

কারকাংশাচ্চতুর্থ স্থানস্থে চন্দ্রে কুজদৃষ্টে সতি মহারোগঃ রাজরোগো ভবতি॥ ৮৯॥

উক্ত চতুর্থ স্থানগত চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টি, মহারোগ অর্থাৎ গলিত কুষ্ঠাদির উৎপত্তি কারক। অন্ততঃ সে ব্যক্তি রক্তপিত্ত রোগে বিশেষ কষ্ট পায়॥ ৮৯॥

কেতু দৃষ্টে নীল কুষ্ঠং॥ ৯০॥

কেতুদৃষ্টে চন্দ্রে কারকাংশাচ্চতুর্থ স্থান গতে সতি নীলকুষ্ঠং কুষ্ঠ-রোগ বিশেষো ভবতি॥ ৯০॥

উক্ত চতুর্থ স্থান গত চন্দ্রের প্রতি কেতুর দৃষ্টি থাকিলে মনুষ্যের শরীরে নীল কুষ্ঠের উৎপত্তি হয়॥ ৯০॥

তত্র মৃতৌ বা কুজ রাহুভ্যাং ক্ষয়ঃ। ৯১।

তত্র কারকাংশাৎ চতুর্থে মৃতৌ (৬৫=৫) পঞ্চমে বা কুজরাহুভ্যাং মিলিতাভ্যাং স্থিতাভ্যাং ক্ষয়ঃ ক্ষয়রোগো ভবতি॥ ৯১॥

কারকাংশ রাশির চতুর্থে কিম্বা পঞ্চম স্থানে মঙ্গল এবং রাহু একত্রে থাকিলে ক্ষয়রোগের উৎপত্তি হয়। কুজ এবং রাহু হৃদরোগের কারক, সুতরাং গ্রহদ্বয় উক্ত স্থানে একাম্বিক থাকিলেও তদ্রোগের আশঙ্কা করা যাইতে পারে। অগ্রে ১১৬ সংখক সূত্রে ভাগ্যে চৈবং বলিয়া কারকাংশ রাশির দ্বিতীয় স্থান গত ফল ব্যস্তভাবে উল্লেখিত থাকায় এস্থলে তত্র শব্দে পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ স্থান ভিন্ন, বর্ণ সঙ্কেতানুসারে দ্বিতীয় স্থান অর্থ করা অযৌক্তিক। কোন কোন পণ্ডিতপ্রবর উভয়কুল বজায় রাখিয়া তত্র শব্দে দ্বিতীয় ও চতুর্থ এবং মৃতি শব্দে পঞ্চম ও অষ্টম অর্থ করতঃ যে বিশেষ ভ্রম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র॥ ৯১॥

চন্দ্র দৃষ্টৌ নিশ্চয়েন॥ ৯২॥

তয়োঃ কারকাংশাৎ চতুর্থে পঞ্চমে বা স্থিতয়োঃ কুজ রাহ্বোরুপরি

চন্দ্র দৃষ্টৌ সত্যাং মনুষ্যো নিশ্চয়েন ক্ষয়রোগাক্রান্তো ভবতি চন্দ্রদৃষ্ট্যভাবে স্বল্পক্ষয়ো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ৯২ ॥

উক্ত চতুর্থ বা পঞ্চম স্থান গত কুজ রাহুর প্রতি চন্দ্রের দৃষ্টি থাকিলে নিশ্চয়ই ক্ষয়রোগের উৎপত্তি হয় তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না দৃষ্টি না থাকিলে রোগের স্বল্পতা মাত্রই বিবেচ্য ॥ ৯২ ॥

কুজেন পিটকাদিঃ ॥ ৯৩ ॥

তত্র কারকাংশা চ্চতুর্থে পঞ্চমে বা স্থিতেন কুজেন শরীরে পিটকাদিঃ বিস্ফোটকাদয়ো ভবন্তি ॥ ৯৩ ॥

উক্ত কারকাংশ রাশির চতুর্থে কিম্বা পঞ্চমে মঙ্গল থাকিলে শরীরে বিস্ফোটকাদি নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয় ॥ ৯৩ ॥

কেতুনা গ্রহণী জলরোগো বা ॥ ৯৪ ॥

কারকাংশাৎ চতুর্থে পঞ্চমে বা স্থানে কেতুনা কেতৌ স্থিতে সতি গ্রহণী সংগ্রহণী জলরোগো বা জলোদরাদ্যা রোগা বা ভবন্তি ॥ ৯৪ ॥

উক্ত চতুর্থ বা পঞ্চম স্থানে কেতু থাকিলে মনুষ্যের গ্রহণী কিম্বা জলোদরাদি রোগ হইয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥

রাহু গুলিকাভ্যাং ক্ষুদ্রবিষাণি ॥ ৯৫ ॥

কারকাংশাৎ চতুর্থে পঞ্চমে বা স্থানে রাহুগুলিকাভ্যাং স্থিতাভ্যাং ক্ষুদ্র বিষাণি ভবন্তি ॥ ৯৫ ॥

কারকাংশ রাশির চতুর্থ বা পঞ্চম স্থানে রাহু ও মান্দি থাকিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষাক্ত প্রাণী হইতে মনুষ্য কষ্ট প্রাপ্ত হয়। পারাশরী মতে অষ্টম স্থানে উক্ত গ্রহদ্বয়ের যোগ থাকিলে মনুষ্য বিষবৈদ্য হয়। যথা—স্বর্ভানুগুলিকৌ রন্ধ্রে বিষবৈদ্যঃ প্রজায়তে ॥ ৯৫ ॥

তত্র শনৌ ধাতুষ্কঃ ॥ ৯৬ ॥

কেতুনা ঘটিকা যন্ত্রী ৯৭ ॥

বুধেন পরমহংসো লগুড়ী বা ॥ ৯৮ ॥

রাহুণা লৌহ যন্ত্রী ॥ ৯৯ ॥

রবিণা খড়্গী ॥ ১০০ ॥

কুজেন কুন্তী ॥ ১০১ ॥

তত্র শব্দান্ মৃতাবিতি পদমত্র নিবৃত্তং। তত্র কারকাংশাৎ চতুর্থ স্থানে শনৌ সতি নরো ধানুষ্কঃ ধনুর্ব্বিদ্যানিপুণো ভবতীত্যেবমগ্রে স্পষ্টং ॥ ৯৬-১০১ ॥

এস্থলে পুনর্ব্বার তত্র শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে ৯১ সূত্রোক্ত মৃতি (৫ম) পদ অত্র নিবৃত্ত হইয়াছে। কারকাংশ রাশির চতুর্থে শনি থাকিলে পুরুষ ধনুর্ব্বিদ্যা নিপুণ, কেতু থাকিলে ঘটিকাযন্ত্রী, বুধ শুভ থাকিলে পরম হংস বা দণ্ডী, পাপাবস্থায় লগুড়ী অর্থাৎ লাঠিয়াল, রাহু থাকিলে লৌহ যন্ত্রী, রবি থাকিলে খড়্গধারী অর্থাৎ অসি যোদ্ধা (ঘাতক বা বলিচ্ছেদক) এবং মঙ্গল থাকিলে কুন্তাস্ত্র নিপুণ অর্থাৎ ভল্ল বা সড়কিওয়ালা হইয়া থাকে। রণাদি ক্রূর কার্য্য সাম্বন্ধিক বলিয়া বর্ত্তমান সূত্রষট্‌কে কেবলমাত্র পাপ গ্রহের ফল লিখিত হইয়াছে চন্দ্র শুক্র এবং বৃহস্পতির কোন উল্লেখ নাই ॥ ৯৬—১০১,

মাতাপিত্রো শ্চন্দ্র গুরুভ্যাং গ্রন্থকৃৎ ॥ ১০২ ॥

কারকাংশাৎ মাতা (৬৫-৫) পঞ্চমে পিত্রোঃ (৬১-১) কারকাংশে বা চন্দ্রগুরুভ্যাং স্থিতাভ্যাং পুরুষো গ্রন্থকৃৎ গ্রন্থকর্ত্তা ভবতি॥ পঞ্চমাৎ পঞ্চমত্বা ন্নবম স্থান মপ্যত্রোপ-লক্ষণে বিদ্যাদি বিচারে গ্রাহ্যং ॥ ১০২ ॥

কারকাংশে কিম্বা তাহার পঞ্চম স্থানে চন্দ্র এবং বৃহস্পতি থাকিলে মনুষ্য গ্রন্থকর্ত্তা হয়। নবম স্থান পঞ্চমের পঞ্চম সুতরাং বিদ্যা স্থান মধ্যে গণ্য। পারাশরী হোরাতেও বর্ত্তমান যোগে লিখিত আছে যে—

চন্দ্রেজ্যৌ কারকাংশে চ লগ্নে বা নব পঞ্চমে।
গ্রন্থকর্ত্তা ভবেন্নূনং সর্ব্ববিদ্যা বিশারদঃ ॥

সুতরাং লগ্ন পঞ্চম এবং নবম এই স্থান ত্রয় হইতেও গ্রন্থ কর্তৃত্বাদি বিচার কর্ত্তব্য। চন্দ্র এবং বৃহস্পতি উক্ত স্থানে ত্রয়ের কোন এক বা দুই স্থানে থাকিলেই জাতক গ্রন্থকর্ত্তা হইবে ইহাই প্রকৃত সূত্রার্থ। উপরোক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কারকাংশের ন্যায় লগ্নাদি স্থানত্রয় হইতেও উক্তরূপ বিদ্যাদি বিচার অযৌক্তিক নহে ॥ ১০২ ॥

শুক্রেণ কিঞ্চিদূনং ॥ ১০৩ ॥
বুধেন ততোহপি ॥ ১০৪ ॥

উক্ত স্থান গতে শুক্রে স্বল্প গ্রন্থকরো দ্বিজ।
উক্ত স্থান গতে সৌম্যে কিঞ্চিদ্ গ্রন্থ করোহসৌ ॥

কারকাংশ রাশৌ তৎপঞ্চমে (নবমে) বা শুক্রেণ চন্দ্র শুক্রাভ্যাং স্থিতাভ্যাং গুর্ব্বপেক্ষয়া কিঞ্চিদূনং গ্রন্থকর্ত্তৃত্বং স্যাৎ। বুধেন চন্দ্র বুধাভ্যাং ততোহপি শুক্রাদপি কিঞ্চিদূনং গ্রন্থ কর্ত্তৃত্বং ভবতি। চন্দ্র ইতি পূর্ব্বসূত্রেণান্বয়ঃ ॥ ১০৪ ॥

চন্দ্র এবং শুক্র এই গ্রহদ্বয় একত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কারকাংশাদি ত্রিকোণ গত হইলে মনুষ্য চন্দ্রগুরুর অপেক্ষা ন্যূন গ্রন্থকর্ত্তা এবং চন্দ্র বুধ তদবস্থাগত থাকিলে চন্দ্র শুক্রাপেক্ষা ন্যূন গ্রন্থকর্ত্তা হইয়া থাকে। এই সূত্রত্রয়ে গ্রন্থকর্তৃত্ব যোগ শেষ হইল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—মূলে না থাকিলেও শুক্র এবং বুধের সহ টীকায় উল্লেখিত চন্দ্রের সাহচর্য্য কোথা হইতে আসিল। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে,—অগ্রোক্ত বিদ্যাযোগে গুরু শুক্র বা বুধ কোন গ্রহেরই গ্রন্থকারকতা শক্তির উল্লেখ নাই। তাঁহাদের একান্তিক সে শক্তি থাকিলে তৎতৎ সূত্রেই লিখিত থাকিত। তন্মধ্যে উপরে চন্দ্র গুরুর যোগে মনুষ্য গ্রন্থকার হয় লিখিত থাকায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে চন্দ্রের যোগ ব্যতীত শুক্র বা বুধ গ্রহও গ্রন্থ কর্তৃত্ব শক্তি প্রদানে অসমর্থ। তবে উক্ত লগ্নাদি রাশিত্রয়ে গুরু চন্দ্রাদির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি অপেক্ষা সহস্থিতি সম্বন্ধ যে বিশেষ প্রবল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর বিদ্যাযোগ আরম্ভ হইল॥ ১০৪ ॥

শুক্রেণ কবির্বাগ্মী কাব্যজ্ঞশ্চ॥ ১০৫॥

কারকাংশ তৎ ত্রিকোণে বা শুক্রেণ শুক্রে সতি জাতকঃ কবির্বাগ্মী কাব্যজ্ঞশ্চ ভবতি॥ ১০৫

কারকাংশে কিম্বা তৎ ত্রিকোণ ঘরে শুক্র থাকিলে মনুষ্য কবি বাগ্মী এবং কাব্যজ্ঞ হইয়া থাকে॥ ১০৫॥

গুরুণা সর্ব্ববিদ্‌ গ্রন্থিকশ্চ॥ ১০৬॥

নবাগ্মী॥ ১০৭॥

বিশিষ্য বৈয়াকরণো বেদবেদাঙ্গবিচ্চ॥ ১০৮॥

পূর্ব্বোক্ত কারকাংশাদি স্থানত্রয়ে যত্রকুত্র চিৎ গুরুণা গুরৌ স্থিতে সতি সর্ব্ববিদ্‌ সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞো গ্রন্থিকশ্চ দৈবজ্ঞশ্চ পুরুষো ভবেৎ। তথা বিশিষ্য বৈয়াকরণো বিশিষ্ট ব্যাকরণবেত্তা বেদ বেদাঙ্গ বিচ্চ ভবেৎ কিন্তু বাগ্মী সভামধ্যে বক্তৃতা শক্তি সম্পন্নো ন ভবেদিতিশেষঃ॥ ১০৮॥

উক্ত কারকাংশাদি রাশিত্রয়ের কোন স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে মনুষ্য সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা বিশিষ্ট বৈয়াকরণ এবং বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে সুনিপুণ হইয়া থাকে, কিন্তু সভামধ্যে তাহার বক্তৃতা করিবার শক্তি থাকে না॥ ১০৮॥

সভাজড়ঃ শনিনা॥ ১০৯॥
বুধেন মীমাংসকঃ॥ ১১০॥
কুজেন নৈয়ায়িকঃ॥ ১১১॥
চন্দ্রেণ সাংখ্যযোগজ্ঞঃ সাহিত্যজ্ঞো গায়কশ্চ॥ ১১২॥
রবিণা বেদান্তজ্ঞো গীতজ্ঞশ্চ॥ ১১৩॥
কেতুনা গণিতজ্ঞঃ॥ ১১৪॥

পূর্ব্বোক্ত স্থান এয়ে শনিনা শনৌ স্থিতে মতি সভাজড়ঃ নরঃ সভায়াং কিঞ্চিদপি বক্তু মসমর্থো ভবতি এবমগ্রেঽপি স্পষ্টং॥ ১০৯—১১৪॥

পূর্ব্বোক্ত স্থানত্রয়ে শনি থাকিলে মনুষ্য সভাজড় অর্থাৎ মুখচোরা, বুধ থাকিলে মীমাংসা শাস্ত্রজ্ঞ, মঙ্গল থাকিলে নৈয়ায়িক, চন্দ্র থাকিলে সাংখ্য যোগজ্ঞ সাহিত্যসেবী ও সঙ্গীত বেত্তা, রবি থাকিলে বেদ বেদান্ত পারগ এবং সঙ্গীত কুশল তথা কেতু থাকিলে গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত হয়॥ ১০৯—১১৪॥

গুরু সম্বন্ধেন সম্প্রদায় সিদ্ধিঃ॥ ১১৫॥

পূর্ব্বোক্তে সর্ব্বত্রৈব যোগে গুরুসম্বন্ধেন বৃহস্পতের্যোগ দৃষ্টি ষড়্‌-বর্গাদি সম্বন্ধে সতি সম্প্রদায় সিদ্ধিঃ গ্রন্থ কর্ত্তৃত্বাদিকং তত্তৎ শাস্ত্র সম্প্রদায়জ্ঞো ভবতি॥ ১১৫॥

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ কর্ত্তৃত্বাদি যোগে তৎতৎ কারকঘটিত গ্রহ, বৃহস্পতির যোগ দৃষ্টি বা তদ্ বর্গাদি কোনরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলে জাতক তৎতৎ শাস্ত্রসম্প্রদায়ে সবিশেষ পারদর্শী হয়। যথা মঙ্গল, বৃহস্পতির ক্ষেত্র নবাংশাদিগত কিম্বা তৎ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত লগ্নাদি স্থানত্রয়ে কোথাও অবস্থান করিলে জাতক যেন স্বয়ং ন্যায় শাস্ত্র হইবে॥ ১১৫॥

ভাগ্যে চৈবং॥ ১১৬॥

ভাগ্যে (১৪-২) কারকাংশাৎ দ্বিতীয় স্থানেঽপি চৈবং কারকাংশে তৎ ত্রিকোণে বা চন্দ্র গুর্ব্বাদি যোগেন যথা গ্রন্থ কর্ত্তৃত্বাদি বিদ্যা বিচারঃ ক্রিয়তে, তদ্বৎ বিচারঃ কার্য্যঃ॥ ১১৬॥

পূর্ব্বে কারকাংশে এবং তৎত্রিকোণ রাশি হইতে চন্দ্র গুর্ব্বাদি যোগে যেরূপ বিদ্যা বিচার করা হইয়াছে কারকাংশ রাশির দ্বিতীয় স্থান হইতেও তদ্রূপ বিচার কার্য্য। এই দ্বিতীয় স্থান লইয়া চারিটি রাশি বিদ্যা স্থান মধ্যে গণনীয় হইল॥ ১১৬॥

সদা চৈব মিত্যেকে॥ ১১৭॥

সদা (৮৭-৩) কারকাংশাৎ তৃতীয় স্থানেঽপি চৈবং তদ্বৎ বিদ্যা-বিচারঃ কার্য্যঃ ইত্যেকে ইতি একে বদন্তি ॥ ১১৭ ॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে কারকাংশের তৃতীয় স্থান হইতেও চন্দ্র গুর্ব্বাদি গ্রহযোগে পূর্ব্ববৎ বিদ্যাবিচার কর্ত্তব্য। কিন্তু এই ইত্যেকে শব্দ হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে তৎস্থান হইতে বিদ্যাবিচার সূত্রকারের অনুমোদিত নহে॥ ১১৭॥

ভাগ্যে কেতৌ পাপদৃষ্টে স্তব্ধবাক্ ॥ ১১৮॥

কারকাংশাৎ ভাগ্যে (১৪-২) দ্বিতীয় স্থানে কেতৌ পাপদৃষ্টে সতি জাতকঃ স্তব্ধবাক্ শীঘ্রোত্তর দানাসমর্থো ভবতি ॥

কারকাংশ রাশির দ্বিতীয় স্থানে কেতু পাপদৃষ্ট হইয়া অবস্থান করিলে মনুষ্য স্তব্ধবাক্ অর্থাৎ তোৎলা হইয়া থাকে। পারাশরী হোরায় লিখিত আছে যে কারকাংশে কিম্বা তাহার দ্বিতীয় ও নবম স্থানে উক্ত যোগ থাকিলে জাতক বাচাল হয়।

যথা—কারকাংশাদ ধনে কেতৌ তথা ভাগ্যালয়ে গতে।
পাপ গ্রহেণ সংদৃষ্টে বাচালশ্চ ভবেন্নরঃ॥

স্ব পিতৃপদাৎ ভাগ্য রোগয়োঃ
পাপসাম্যে কেমদ্রুমঃ॥ ১১৯॥

স্ব আত্মকারকাৎ পিতৃ (৬১-১) জন্মলগ্নাৎ পদাৎ লগ্নারূঢ়াৎ বা ভাগ্য (১৪-২) রোগয়োঃ (৩২-৮) দ্বিতীয়ে নিধন স্থানে চ পাপসাম্যে সমসংখ্যক পাপগ্রহে সতি কেমদ্রুমঃ কেমদ্রুমনাম যোগো ভবতি ॥ ১১৯ ॥

আত্মকারক হইতে, জন্ম লগ্ন হইতে কিম্বা লগ্নারূঢ় পদ হইতে দ্বিতীয় ও অষ্টম এই দুই স্থানে সমসংখ্যক পাপগ্রহ থাকিলে কেমদ্রুম নামক যোগ হয়। বৃদ্ধ কারিকায় লিখিত আছে।—

আরূঢ়াৎ জন্মলগ্নাদ্বা পাপাঃ শ্রীহানিগৌ যদি।
কেবলে সগ্রহত্বেঽপি সমসংখ্যৌ শুভাশুভৌ॥
চন্দ্রদৃষ্ট্যা বিশেষেণ যোগো কেমদ্রুমো মতঃ।
উক্তস্থানে গ্রহো নাস্তি কেমদ্রুম স্তদাপ্যসৌ॥

আরূঢ় কিম্বা জন্ম লগ্ন হইতে শ্রী—দ্বিতীয় এবং হানি—অষ্টম স্থান যদি গ্রহশূন্য হয় কিম্বা উভয়ত্রই এক একটি পাপগ্রহ থাকে তাহা হইলে কেমদ্রুম নামক যোগ সংঘটিত হয়। উক্ত

প্রাপ্য ব্রহ্মবনং শীতং নীরজস্কমকণ্টকম্ ।
প্রাপ্নুবন্তি পরাং প্রাজ্ঞা নির্বৃতিং বৃত্তিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৩ ॥
ভূতেন্দ্রিয়ময়ং স্থূলং ন ত্বং রাজন্ ন চাপ্যহম্ ।
ন তন্মাত্রং ময়া বাচ্যং নৈবান্তঃকরণাত্মকৌ ॥ ১৪ ॥
কং বা পশ্যামি রাজেন্দ্র প্রধানময়মাবয়োঃ ।
যতঃ পরো হি ক্ষেত্রজ্ঞঃ সঙ্ঘাতো হি গুণাত্মকঃ ॥ ১৫ ॥
মশকোডুম্বরেষীকা-মুঞ্জ-মৎস্যাম্ভসাং যথা ।
একত্বেঽপি পৃথগ্‌ভাবস্তথা ক্ষেত্রাত্মনো নৃপ ॥ ১৬ ॥

অলর্ক উবাচ ।

ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন মমাবির্ভূতমুত্তমম্ ।
জ্ঞানং প্রধানচিচ্ছক্তি-বিবেককরমীদৃশম্ ॥ ১৭ ॥
কিন্ত্বত্র বিষয়াক্রান্তে স্থৈর্য্যবত্ত্বং ন চেতসি ।
ন চাপি বেদ্মি মুচ্যেয়ং কথং প্রকৃতিবন্ধনাৎ ॥ ১৮ ॥

[শীত]ল, নীরজঃ, অকণ্টক ব্রহ্মবন,
[বৃ]ত্তির সঙ্গে তথা করে বিচরণ । ১৩ ।
[ভূ]তেন্দ্রিয়ময় স্থূল দেহ আমি নয়
তুমিও রাজন্ তাই, জানিও নিশ্চয় ।
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সমবায়ে হয়,
যে অন্তঃকরণ কিম্বা তন্মাত্র *—তা' নয় । ১৪ ।
আমাদের মাঝে কি বা প্রধান রাজন ?
ক্ষেত্রজ্ঞ নিশ্চয় সেই—নহে অন্য জন ।
গুণের সংঘাত এই—গুণাতীত সেই,
তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ অন্য—ভবমাঝে নেই । ১৫ ।

মৎস্য-মশকাদি জলে থাকিয়া যেমন
পৃথকে একত্ব,—ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ তেমন । ১৬ ।
বলিলা অলর্ক— "প্রসাদে তোমার
উদয় হইল মোর
প্রধান চিচ্ছক্তি- বিবেক-কারক
জ্ঞান ;—ঘুচে গেল ঘোর । ১৭ ।
কিন্তু বিষয়েতে আক্রান্ত অন্তর
স্থৈর্য্য তাহে নাহি পায়,
কিসে মুক্ত হয় দারুণ নিগড়ে
বল মোরে সে উপায় । ১৮ ।

* তন্মাত্র, বিশ্বের মূল উপাদান। ইহাদের সংখ্যা পাঁচটি। শব্দ তন্মাত্র বা ব্যোমতত্ত্ব, স্পর্শতন্মাত্র বা বায়ুতত্ত্ব, রূপতন্মাত্র বা তেজস্তত্ত্ব, রসতন্মাত্র বা অপ্‌ তত্ত্ব এবং গন্ধতন্মাত্র বা ক্ষিতিতত্ত্ব। তৎ+মাত্র, অর্থাৎ যে উপাদান পদার্থে থাকাতে তাহাতে গন্ধ রস রূপাদি হইয়াছে তাহাই তত্তৎ তন্মাত্র। এই তন্মাত্র-তত্ত্ব-পঞ্চকের পঞ্চীকরণ ফলে মহাভূত-পঞ্চের উৎপত্তি। স্বরূপ-উপলব্ধি সাধন সাপেক্ষ।

কথং ন ভূয়াং ভূয়শ্চ কথং নির্গুণতামিয়াম্।
কথঞ্চ ব্রহ্মণৈকত্বং ব্রজেয়ং শাশ্বতেন বৈ ॥ ১৯ ॥
তন্মে যোগং তথা ব্রহ্মন্ প্রণতায়াভিযাচতে।
সম্যগ্ ব্রূহি মহাপ্রাজ্ঞ সৎসঙ্গো হ্যুপকৃন্নৃণাম্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে অলর্কচরিতে দত্তাত্রেয়ালর্কসম্বাদে
যোগপ্রশ্নো নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

জনম মরণ ঘুচে যায়, যা'য়
গুণাতীত হ'তে পারি,
ব্রহ্মৈকত্ব ভাব হ'বে, যাহে লাভ
বলহ উপায় তা'রি। ১৯।
সাধু-সঙ্গে হয় মহা-উপকার
জানি আমি সুনিশ্চয় ;
তব সঙ্গ সম সাধু-সঙ্গ আর
ভাগ্যে কা'র কবে হয় ?
যোগ-পথ মোরে কর প্রদর্শন
যাহে প্রবর্ত্তিত হ'লে,
সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হইবে আমার
জানি আমি, অবহেলে।" ২০।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে অলর্কচরিতান্তর্গত দত্তাত্রেয়ালর্কসম্বাদে
যোগ-প্রশ্ন নামক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দত্তাত্রেয় উবাচ।

জ্ঞানপূর্ব্বো বিয়োগো যোঽজ্ঞানেন সহ যোগিনঃ।
সা মুক্তির্ব্রহ্মণা চৈক্যমনৈক্যং প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ॥ ১
যোগে চ শক্তির্বিদুষাং যেন শ্রেয়ঃ পরং ভবেৎ।
মুক্তির্যোগাৎ তথা যোগঃ সম্যগ্‌জ্ঞানান্মহীপতে॥ ২।
সঙ্গদোষোদ্ভবং দুঃখং মমত্বাসক্তচেতসাম্।
তস্মাৎ সঙ্গং প্রযত্নেন মুমুক্ষুঃ সন্ত্যজেন্নরঃ।
সঙ্গাভাবে মমেত্যস্যাং খ্যাতের্হানিঃ প্রজায়তে॥ ৩॥
নির্ম্মমত্বং সুখায়ৈব বৈরাগ্যাদ্দোষদর্শনম্।
জ্ঞানাদেব চ বৈরাগ্যং জ্ঞানং বৈরাগ্যপূর্ব্বকম্॥ ৪॥
তদ্‌গৃহং যত্র বসতিস্তদ্ভোজ্যং যেন জীবতি।
যন্মুক্তয়ে তদেবোক্তং জ্ঞানমজ্ঞানমন্যথা॥ ৫॥

বলিলেন দত্তাত্রেয়—"শুনহ, রাজন,
সাধন-সম্পদে যোগী সম্পন্ন যেমন
জ্ঞানপূর্ব্ব বিয়োগ যে অজ্ঞানের সনে,
মুক্তি বলি' তাহারে বলেন জ্ঞানিগণে।
ব্রহ্ম সহ ঐক্য তাহে হয় সংঘটন
অনৈক্য প্রাকৃতগুণে জানে সাধুজন। ১।
যোগবলে প্রাজ্ঞগণ শক্তি লাভ করে,
শ্রেষ্ঠ শ্রেয়োলাভ তাহে জানিহ অন্তরে।
শুন, রাজা, যোগবলে মুক্তিলাভ হয়
সম্যক্ জ্ঞানেতে যোগ জান সুনিশ্চয়।
সঙ্গ-দোষে হয় ভবে দুঃখের উদয়
মমতা আসক্তি হ'তে ঘটে সুনিশ্চয়। ২।
সেই হেতু সঙ্গ ত্যাগ করিবে যতনে
মুক্তির বাসনা যেবা রাখে নিজ মনে। ৩।
সঙ্গাভাব হ'লে হয় মমতার নাশ;
নির্মমত্ব সুখের কারণ মহেম্বাস।
বৈরাগ্য জন্মিলে হয় দোষের দর্শন,
সদসৎ বিজ্ঞানের তাহাই কারণ।
জ্ঞান-লাভ হ'লে হয় বৈরাগ্য-উদয়,
বৈরাগ্যের পূর্ব্বে জ্ঞান নাহিক সংশয়। ৪।
সেই গৃহ যথা বাস হইবে যখন;
তাই ভোজ্য যাহে হ'বে জীবন-রক্ষণ;
মুক্তির কারণ যাহা জ্ঞান বলি তা'রে,
আর সব অজ্ঞান জানিহ এ সংসারে। ৫।

উপভোগেন পুণ্যানামপুণ্যানাঞ্চ পার্থিব।
কর্ত্তব্যানাঞ্চ নিত্যানামকামকরণাৎ তথা ॥ ৬ ॥
অসঞ্চয়াদপূর্ব্বস্য ক্ষয়াৎ পূর্ব্বার্জ্জিতস্য চ।
কর্ম্মণো বন্ধমাপ্নোতি শারীরং ন পুনঃপুনঃ ॥ ৭ ॥
কর্ম্মণা মোক্ষমাপ্নোতি বৈপরীত্যেন তস্য তু।
এতৎ তে কথিতং রাজন্ যোগঞ্চৈবং নিবোধ মে।
যং প্রাপ্য ব্রহ্মণো যোগী শাশ্বতান্নান্যতাং ব্রজেৎ ॥ ৮ ॥
প্রাগেবাত্মাত্মনা জেয়ো যোগিনাং স হি দুর্জ্জয়ঃ।
কুর্ব্বীত তজ্জয়ে যত্নং তস্যোপায়ং শৃণুষ্ব মে ॥ ৯ ॥
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ বিষয়ান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥ ১০ ॥
যথা পর্ব্বতধাতূনাং দোষা দহ্যন্তি ধাম্যতাম্।
তথেন্দ্রিয়কৃতা দোষা দহ্যন্তে প্রাণনিগ্রহাৎ ॥ ১১ ॥
প্রথমং সাধনং কুর্য্যাৎ প্রাণায়ামস্য যোগবিৎ।
প্রাণাপাননিরোধস্তু প্রাণায়াম উদাহৃতঃ ॥ ১২ ॥
লঘুমধ্যোত্তরীয়াখ্যঃ প্রাণায়ামস্ত্রিধোদিতঃ।
তস্য প্রমাণং বক্ষ্যামি তদলর্ক শৃণুষ্ব মে ॥ ১৩ ॥

অকাম হইয়া কার্য্য করিবে সাধন
ভোগে পুণ্যাপুণ্য নাশ হইবে তখন।
পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যাপুণ্য উপভোগে ক্ষয়,
অকাম-করণে তা'র না হয় সঞ্চয়।
যত দিন থাকিবেক কর্ম্মের বন্ধন
তত দিন পুনঃ পুনঃ শরীর-ধারণ। ৬-৭।
তা'র বিপরীত কর্ম্ম মোক্ষের সাধন,
এই ত বলিনু রাজা জ্ঞানের লক্ষণ।
এবে যোগ-তত্ত্ব আমি বলিব তোমায়,
যা'র ফলে ব্রহ্মের সাযুজ্য যোগী পায়। ৮।
আত্মার সহায়ে আত্মা করিবেক জয়,
অতীব দুর্জ্জয় সেই নাহিক সংশয়।
তা'রে জয় করিবারে করিবে যতন
তাহার উপায় বলি শুনহ রাজন। ৯।
প্রাণায়ামে দোষ দগ্ধ করিবে যতনে;
ধারণায় পাপ নাশ করে যোগীজনে;
প্রত্যাহারে বিষয় বাসনা দূর হয়;
অনীশ্বর-গুণ ধ্যানে যাইবে নিশ্চয়। ১০।
ধ্মাপনে ধাতুর মল যথা নষ্ট হয়;
প্রাণায়ামে তেমতি দোষের হয় লয়। ১১।
প্রথমেতে প্রাণায়াম করিবে সাধন,
প্রাণাপান নিরোধ সে তাহার লক্ষণ। ১২।
লঘু, মধ্য, গুরু, প্রাণায়াম তিন হয়,
পরিমাণ তা'র যেবা বলিব তোমায়। ১৩।

লঘুর্দ্বাদশমাত্রস্তু দ্বিগুণঃ স তু মধ্যমঃ।
ত্রিগুণাভিস্তু মাত্রাভিরুত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৪॥
নিমেষোন্মেষণে মাত্রা কালো লঘ্বক্ষরস্তথা।
প্রাণায়ামস্য সংখ্যার্থং স্মৃতো দ্বাদশমাত্রিকঃ॥ ১৫॥
প্রথমেন জয়েৎ স্বেদং মধ্যমেন চ বেপথুম্।
বিষাদং হি তৃতীয়েন জয়েদ্দোষাননুক্রমাৎ॥ ১৬॥
মৃদুত্বং সেব্যমানাস্তু সিংহ-শার্দ্দূল-কুঞ্জরাঃ।
যথা যান্তি তথা প্রাণো বশ্যো ভবতি যোগিনঃ॥ ১৭॥
বশ্যং মত্তঃ যথেচ্ছাতো নাগং নয়তি হস্তিপঃ।
তথৈব যোগী ছন্দেন প্রাণং নয়তি সাধিতম্॥ ১৮॥
যথা হি সাধিতঃ সিংহো মৃগান্ হন্তি ন মানবান্।
তদ্বন্নিষিদ্ধপবনঃ কিল্বিষং ন নৃণাং তনুম্॥ ১৯॥
তস্মাদ্‌যুক্তঃ সদা যোগী প্রাণায়ামপরো ভবেৎ।
শ্রূয়তাং মুক্তিফলদং তস্যাবস্থাচতুষ্টয়ম্॥ ২০॥

লঘু সে দ্বাদশ মাত্রা, মধ্যম দ্বিগুণ,
ত্রিগুণ উত্তম তাহে হয় সুনিপুণ। ১৪।
নিমেষ উন্মেষে যেবা কাল গত হয়,
লঘু-বর্ণ উচ্চারিতে যায় সে সময়,
তাহাই জানিবে সে মাত্রার পরিমাণ,
প্রাণায়াম সংখ্যা তরে তাহাই প্রমাণ।
সেরূপ দ্বাদশ মাত্রা করিয়া গ্রহণ—
প্রাণায়াম পরিমাণ করিবে, রাজন। ১৫।
প্রথমেতে স্বেদ জয় হইবে নিশ্চয়;
মধ্যমেতে নিশ্চয় বেপথু নাশ হয়।
তৃতীয়ে নিশ্চয় হ'বে বিষাদের জয়;
এই ক্রমে দোষ জয় শাস্ত্রেতে নিশ্চয়। ১৬।
সযতনে সেবা ফলে সিংহ হস্তি আর
শার্দ্দূল নরের বশ হয় জানি সার,
সেইরূপ সযতনে প্রাণের সাধন
করি, প্রাণে করে বশ সদা যোগিগণ। ১৭।
মত্ত হস্তি বশ করি হস্তিপক যথা,
যথেচ্ছ চালিত করে, যোগিও সর্ব্বথা,
সেই মত প্রাণে বশ করিয়া নিশ্চয়
সচ্ছন্দে চালিত করে যথা ইচ্ছা হয়। ১৮।
সাধিত হইলে সিংহ জানিও নিশ্চয়
শুধু মৃগ বধ করে, নরে কভু নয়;
তেমতি সাধিত প্রাণ নাশে পাপপাশ,
কভু সাধকের তনু নাহি করে নাশ। ১৯।
এই সে কারণে যোগী সদা যুক্ত হ'য়ে
প্রাণায়াম-পরায়ণ হ'বে, শুদ্ধ র'য়ে।
ইহার অবস্থা চারি করিব বর্ণন,
অনায়াসে মুক্তি যাহে হয় সংঘটন। ২০।

ধ্বস্তিঃ প্রাপ্তিস্তথা সংবিৎ প্রসাদশ্চ মহীপতে।
স্বরূপং শৃণু চৈতেষাং কথ্যমানমনুক্রমাৎ ॥ ২১ ॥
কর্ম্মণামিষ্টদুষ্টানাং জায়তে ফলসঙ্ক্ষয়ঃ।
চেতসোঽপকষায়ত্বং যত্র সা ধ্বস্তিরুচ্যতে ॥ ২২ ॥
ঐহিকামুষ্মিকান্ কামান্ লোভমোহাত্মকান্ স্বয়ম্।
নিরুধ্যাস্তে সদা যোগী প্রাপ্তিঃ সা সার্ব্বকালিকী ॥ ২৩ ॥
অতীতানাগতানর্থান্ বিপ্রকৃষ্টতিরোহিতান্।
বিজানাতীন্দু-সূর্য্যর্ক্ষ-গ্রহাণাং জ্ঞানসম্পদা ॥ ২৪ ॥
তুল্যপ্রভাবস্তু যদা যোগী প্রাপ্নোতি সম্পদম্।
তদা সংবিদিতি খ্যাতা প্রাণায়ামস্য সংস্থিতিঃ ॥ ২৫ ॥
যান্তি প্রসাদং যেনাস্য মনঃ পঞ্চ চ বায়বঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ স প্রসাদ ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৬ ॥
শৃণুষ্ব চ মহীপাল প্রাণায়ামস্য লক্ষণম্।
যুঞ্জতশ্চ সদা যোগং যাদৃগ্বিহিতমাসনম্ ॥ ২৭ ॥

ধ্বস্তি, প্রাপ্তি, সংবিৎ, প্রসাদ, এই চারি,
হে রাজন, শুন বলি স্বরূপ বিস্তারি। ২১।
ইষ্ট দুষ্ট যতবিধ কর্ম্মফল হয়
যেই অবস্থায় হয় সেই সব ক্ষয়,
অপ-কষায়ত্ব যাহে চিত্তের নিশ্চয়,
সেই ত অবস্থা ধ্বস্তি নাহিক সংশয়। ২২।
লোভ আর মোহাত্মক, কামনানিচয়
ঐহিকামুষ্মিক, সে নিরুদ্ধ যাহে হয়
সকল সময়ে—সেই অবস্থা নিশ্চয়
প্রাপ্তি নামে খ্যাত তাহে নাহিক সংশয়। ২৩।
অতীতানাগত যত অনর্থের নাশ
হ'য়ে যাহে হয় স্পষ্ট জ্ঞানের বিকাস,
চন্দ্র সূর্য্য আদি গ্রহ-নক্ষত্রনিচয়—
নখদর্পনের মত জ্ঞানগম্য হয়;
অতুল প্রভাব লাভ করে যোগী যা'য়
পরম সম্পদ তাহা কি সন্দেহ তা'য়।
প্রাণায়ামে, স্থিতি-পদ সেই ত নিশ্চয়
সংবিৎ অবস্থা সেই নাহিক সংশয়। ২৪-২৫
যে অবস্থা লাভ হ'লে পঞ্চ-প্রাণ, মন
প্রসন্নতা লভি' স্বস্থ রহে অনুক্ষণ,
ইন্দ্রিয়নিচয় আর ইন্দ্রিয়-বিষয়—
প্রশান্ত ভাবেতে নিজ কার্য্যে রত রয়,
প্রসাদ অবস্থা সেই শুনহ রাজন,
ইথে যোগী শান্তি-সুখে রহে অনুক্ষণ। ২৬।
প্রাণায়াম লক্ষণ বলিব হে রাজন,
মন দিয়ে সেই তত্ত্ব করহ শ্রবণ।
যোগের সাধনে যে আসন যোগ্য হয়
বিস্তারি বলিব এবে নাশিতে সংশয়। ২৭।

পদ্মমর্দ্ধাসনঞ্চাপি তথা স্বস্তিকমাসনম্।
আস্থায় যোগং যুঞ্জীত কৃত্বা চ প্রণবং হৃদি॥ ২৮॥
সমঃ সমাসনো ভূত্বা সংহৃত্য চরণাবুভৌ।
সংবৃতাস্যস্তথৈবোরূ সম্যগ্বিষ্টভ্য চাগ্রতঃ * ॥ ২৯॥
পার্ষ্ণিভ্যাং লিঙ্গবৃষণাবস্পৃশন্ প্রযতঃ স্থিতঃ।
কিঞ্চিদুন্নামিতশিরা দন্তৈর্দন্তান্ন সংস্পৃশেৎ॥ ৩০॥
সম্পশ্যন্ নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।
রজসা তমসো বৃত্তিং সত্ত্বেন রজসস্তথা।
সঞ্ছাদ্য নির্ম্মলে তত্ত্বে স্থিতো যুঞ্জীত যোগবিৎ॥ ৩১

পদ্মাসন, অর্দ্ধাসন, স্বস্তিক আসন,
এ তিনের অন্যতম করিয়া গ্রহণ,
হৃদয়ে প্রণব ধরি' যোগী যুক্ত হ'য়ে
প্রাণায়ামে হ'বে রত সতত নির্ভয়ে। ২৮।
সমভাবে সমাসনে করিয়া আসন,
গুটাইয়া রাখি সদা উভয় চরণ,
পার্ষ্ণিযুগ্মে বৃষণাদি করিয়া পীড়ন,
সংবৃতাস্য হ'বে, উরু করি' আবরণ,
ঋজুদৃষ্টি হ'বে—শির ঈষৎ নমিত
প্রযত হইয়ে হ'বে আসনেতে স্থিত।
দন্তে দন্তে সেই কালে না করি পীড়ন,
নাসাগ্রে ভ্রূসন্ধি-স্থলে করিবে দর্শন
অন্য কোন দিকে দৃষ্টি যাহে নাহি যায়
মন স্থির করি' তা'র করিবে উপায়। *
রজোগুণে তমোবৃত্তি করি' আবরণ,
পরে সত্ত্বগুণে রাজ্য করি আবরণ,
পরে তত্ত্বাতীত সে নির্ম্মল তত্ত্বে র'য়ে
সতত থাকিবে যোগী যোগযুক্ত হয়ে। ২৯-৩১।

* শ্রীশ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় লিখিত আছে—

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থির।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারী ব্রতেস্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্তো আসীত মৎপরঃ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥

ইত্যাদি (ষষ্ঠ অধ্যায়)

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রাণাদীন্ মন এব চ।
নিগৃহ্য সমবায়েন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ ॥ ৩২ ॥
যস্তু প্রত্যাহরেৎ কামান্ সর্ব্বাঙ্গাণীব কচ্ছপঃ।
সদাত্মরতিরেকস্থঃ পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥ ৩৩ ॥
স বাহ্যাভ্যন্তরং শৌচং নিষ্পাদ্যাকণ্ঠনাভিতঃ।
পূরয়িত্বা বুধো দেহং প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ ॥ ৩৪ ॥
প্রাণায়াম দশ দ্বৌ চ ধারণা সাভিধীয়তে ॥ ৩৫ ॥
দ্বে ধারণে স্মৃতে যোগে যোগিভিস্তত্ত্বদৃষ্টিভিঃ।
তথা বৈ যোগযুক্তস্য যোগিনো নিয়তাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥
সর্ব্বে দোষাঃ প্রণশ্যন্তি স্বস্থশ্চৈবোপজায়তে।
বীক্ষতে চ পরং ব্রহ্ম প্রাকৃতাংশ্চ গুণান্ পৃথক্।
ব্যোমাদিপরমাণূংশ্চ তথাত্মানমকল্মষম্ ॥ ৩৭ ॥
ইত্থং যোগী যতাহারঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ।
জিতাং জিতাং শনৈর্ভূমিমারোহেত যথা গৃহম্ ॥ ৩৮ ॥

ইন্দ্রিয়-বিষয় হ'তে ইন্দ্রিয়নিচয়
সংযত করিবে, আর মনোবৃত্তিচয়;
প্রাণ মন সংযত করিয়া এক করি'
প্রত্যাহার সাধন করিবে যত্ন করি'। ৩২

কূর্ম্ম যথা নিজ অঙ্গ করে আবরণ,
সেইরূপ সর্ব্ববৃত্তি করি' আচ্ছাদন,
সকল কামনা করিবেন প্রত্যাহার
সদা আত্মরতি হ'বে এই তত্ত্ব সার।
আত্ম মধ্যে আত্মারে করিলে দরশন,
অনা'সে ঘুচিয়ে যা'বে সকল বন্ধন। ৩৩।

যেই জন এইরূপ, করেন সাধন,
বাহ্য অভ্যন্তর তা'র শুদ্ধ অনুক্ষণ।
এরূপে হইয়া শুচি, সদা প্রাজ্ঞজন,
নাভি হ'তে কণ্ঠাবধি বায়ুর পূরণ

করিয়া সাধিবে পরে সুখে প্রত্যাহার
সাধনের এই বিধি কহিলাম সার। ৩৪।

প্রাণায়াম দ্বাদশ—ধারণা নাম হয়,
তাহার সাধনে প্রাণ স্থির সুনিশ্চয়। ৩৫।

তত্ত্বদর্শী নিয়তাত্মা যুক্ত যোগীগণ
দ্বিবিধ ধারণা বলি করেন বর্ণন। ৩৬।

ধারণা হইলে হয় সর্ব্ব দোষ ক্ষয়;
স্থির স্বাস্থ্য লাভ হয় নাহিক সংশয়;
স্বতন্ত্র প্রাকৃত গুণ সমুদায় হ'তে
পরব্রহ্মে প্রত্যক্ষ করয়ে অন্তরেতে।
ব্যোমাদি সকল তত্ত্ব পরমাণু আর
অকল্মষ আত্মা নিজ প্রত্যক্ষ তাঁহার। ৩৭।

যোগী, যতাহারী হ'য়ে প্রাণায়ামপর
হইলে এ সব জ্ঞান লভয়ে সত্বর।
ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে সোপানে উঠিয়া
যেই মত সুখী নর গৃহে প্রবেশিয়া;
সেই রূপ, যোগী ধীরে ভূমি জয় করি
ক্রমেতে উন্নত হন যোগপথ ধরি। ৩৮।

"মনে পড়ে সে বালকে? বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্য্যের যেন এক দান—
বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে?
চৌদিকে প্রকৃতি তার হাস্য প্রসারিছে
আনন্দ ভ্রুকুটিমুক্ত, উদার, নবীন।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
গরু রাখি তরু ছায়ে, তরুমূলে শুয়ে,—
সমুদ্রে নয়ন, মাথা হস্ত পরে থুয়ে,
রৌদ্র করে অনুভব, সিন্ধু অনুভব,
সুখস্পৃষ্ট প্রাণে প্রতিবিন্দু অনুভব।

* * * * *

* * * * * কত ফিরিলাম,—
কোথা লোক? প্রাণ যার মুক্ত? পৃথিবীর
সর্ব্বছাপ পড়ে যেথা? লঘু কি গভীর—
প্রতিকণ জড়জীবে রন্ধ্র এক করি'
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি?
দৃঢ়বাহু—ওই জেলে-ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্র মাঝে করিয়া ক্ষেপণ
নিজেরে সহসা, বহু ফুলিয়া ডুবিয়া
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া—
হাস্যমুখে ফলাখণ্ড ফেলে কর্ম্মজাল—
"নিশ্চয় উঠিবে মৎস্য"—ধৈর্য্যদৃঢ় ভাল।
সে লোক নিশ্চয় অতি ঘোর ভালবাসে
—তা ন'লে কি জলে পড়ি ওইরূপ হাসে?
—জীবন, জীবন, ভাই, আনন্দ জীবন।"

৺সতীশচন্দ্র রায়।

৫ম খণ্ড
৫ম বর্ষ
চৈত্র, ১৩২০
৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনা

১। বঙ্গে গীতাপ্রচার

আজ কাল প্রায় সকলেই গীতার আলোচনা করেন। প্রায় প্রত্যেক গৃহেই গীতা পঠিত ও শ্রুত হয়। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। হিন্দুশাস্ত্রানুরাগী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যেই ইহা আবদ্ধ ছিল। ইংরেজী শিক্ষিত নূতন তন্ত্রের লোক সমাজে ইহা আদৃত হইত না। কিন্তু শেষে কিরূপে "শিক্ষিত"দিগের মধ্যে গীতার আদর বাড়িয়া গেল, তাহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় তাঁহার নব-প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত গীতানুবাদে দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইল, আমরা এই গীতানুবাদে প্রবৃত্ত হই। তখন এ দেশে 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের মধ্যে গীতার সেরূপ প্রচলন ছিল না। তখন গীতার ভাল সংস্করণও পাওয়া যাইত না। তখন কেবল পণ্ডিত হিতলাল মিশ্রের অনুবাদসহ গীতা আদিব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।...বটতলার ছাপা গীতা মাত্র অবলম্বন করিয়া, এবং পণ্ডিত ত্র্যম্বক তেলাং প্রণীত পদ্যানুবাদ উপলক্ষ্য করিয়া এই অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তখন আমাদের দেশে 'শিক্ষিত' যুবকগণ গীতার নামও জানিতেন কি না সন্দেহ। তাহার পর 'হিন্দুধর্ম্মে'র 'পুনরুত্থান' হয়, অর্থাৎ 'শিক্ষিত' সম্প্রদায় মধ্যে সনাতনধর্ম্ম-চর্চ্চা আরব্ধ হয়, এবং তাহার সহিত গীতার আলোচনাও আরব্ধ হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সহিত এই ধর্ম্মগ্লানির যুগে ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য প্রবৃত্ত হন। 'বঙ্গবাসী' তাঁহার চেষ্টার সহায় হন,—এবং বঙ্কিম বাবু, চন্দ্রনাথ বাবু, অক্ষয় বাবু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লোক তাঁহার অনুবর্ত্তী হন। 'নবজীবন' ও 'প্রচার' এই উদ্দেশে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহার ফলে অধিকাংশ শিক্ষিত সম্প্রদায়, সনাতন ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সময় হইতেই বাঙ্গালায় গীতা-যুগের আরম্ভ। অনেকগুলি গীতার সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাহাদের মধ্যে কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের শাঙ্করভাষ্য স্বামী কৃত ও গিরিকৃত টীকা এবং অনুবাদসহ গীতা প্রথম ও প্রধান। সেই সময়ে বঙ্কিম বাবু 'প্রচারে' গীতা-ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। আমরাও তখন 'দৈনিক' পত্রে বঙ্কিম বাবুর এই ব্যাখ্যার ধারাবাহিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যাহা হৌক, এই সময়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অনুবাদ-সহ গীতাও বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। এই সময়েই পণ্ডিত নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয় কথোপকথনচ্ছলে গীতার উপদেশ প্রকাশ করেন। এইরূপে বাঙ্গালায় গীতাচর্চ্চার আরম্ভ হয়।"

*
* *

২। গীতার 'বিজয়া' ব্যাখ্যা

নাস্তিক্য বুদ্ধিতে গীতায় হাত দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ইহা যখন সর্ব্বোপনিষদের সার, তখন ইহার পরমার্থতত্ত্ব আস্তিক্য বুদ্ধি ভিন্ন কিছুতেই চিত্তে প্রতিভাত হয় না। যাঁহারা গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, এই কথাটা সব সময় তাঁহাদের মনে রাখা উচিত।

গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় পরোক্ষানুভূতির দ্বারা যতটুকু আয়ত্ত করা যাইতে পারে, তত-টুকু চেষ্টাই ইহার ভাষ্যকারগণ করিয়াছেন। ব্যবহারিক জগতের প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ যতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত এতৎসম্বন্ধে তর্ক, আলোচনা প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। সেইজন্য পরোক্ষানুভূতি মনুষ্য-ভেদে পৃথক হইয়া দাঁড়ায়। একই ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া এক একজন এক এক উপায় অবলম্বন করেন। কিন্তু উপায়গুলি পৃথক হইলেও তাহাদের সমন্বয় করা যায় না, এরূপ নহে।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় তাঁহার গীতা ব্যাখ্যায় এই সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার নাম—বিজয়া ব্যাখ্যা। ইহার ভূমিকায় তিনি তাঁহার অবলম্বিত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেশ বুঝা যায়, আস্তিক্য বুদ্ধি

প্রণোদিত না হইলে দেবেন্দ্র বাবু এই ব্যাখ্যায় হাত দিতেন না। কিন্তু তবুও তাঁহার ব্যাখ্যায় গোঁড়ামীর নাম গন্ধ নাই। আধুনিক যুগে যে সমস্ত যুক্তি প্রমাণ চাহে, সে সকলই তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন। হেগেল তত্ত্ব, প্লেটোনীতি, ইভলিউশনবাদ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের মতগুলির সহিত তুলনায় সমালোচনা করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান মন্থন করিয়া যে 'অনুশীলন' তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই তত্ত্ব বিজয়া ব্যাখ্যায়ও পরিলক্ষিত হয়। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ভগবত্তত্ত্বহীন অনুশীলন ধর্ম্ম মাথায় রাখিয়া গীতাব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই জন্য পরমার্থ-প্রাপ্তি বা নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির কথা তাঁহার ব্যাখ্যায় বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু দেবেন্দ্র বিজয়ের অনুশীলন তত্ত্ব ঈশ্বরবাদহীন নহে। তিনি দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথের ন্যায় আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন। আজকাল সাহিত্য-সংসারে অবিদিত নহে যে হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার "গীতার ঈশ্বরবাদে" প্রমাণ করিয়াছেন, পরমার্থ তত্ত্বই গীতার মূলীভূত উপাদান।

সুতরাং বিজয়াব্যাখ্যায় আমরা বঙ্কিমচন্দ্র ও হীরেন্দ্রনাথের সম্মিলন দেখিতে পাই। এই হিসাবে নবযুগের প্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্মতত্ত্ব ও দেবেন্দ্রবিজয়ের দার্শনিক মতবাদ এক শ্রেণীরই অন্তর্গত। যাঁহারা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারিত আদর্শে জীবন ও চরিত্র গঠন করিতেছেন, তাঁহারা 'বিজয়া'-ব্যাখ্যায় তাঁহাদের অনুকূল যুক্তি পাইবেন—এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

*
* *

৩। জার্ম্মাণিতে ভারতবাসীর সুযোগ

ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক গুণে জার্ম্মাণী হইতে পি, এইচ, ডি, প্রাপ্ত হইয়াছেন। জার্ম্মাণি সম্বন্ধে তাঁহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। সেখানে ভারতীয় ছাত্রদের কিরূপ সুবিধা হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার মত "ফার্গুসন কলেজ ম্যাগজিন" হইতে সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার শিক্ষাবিষয়ক পাক্ষিক 'কলেজিয়ান' পত্রিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা তাহার মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত করিলাম—

(১) জার্ম্মাণীতে বিজ্ঞান শিক্ষার বেশ বন্দোবস্ত আছে।

(২) অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অতি অল্প খরচেই এখানে শিক্ষালাভ হইতে পারে।

(৩) এখানে কারখানা গৃহের জ্ঞান লাভ করিবার সম্ভাবনা খুব বেশী। বিদেশী সম্বন্ধে এখানে কোন বিকৃত ধারণা দেখা যায় না। ভারতীয় ছাত্র এখানে খুব অল্পই আসিয়াছেন, কিন্তু যাহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাই এখানকার শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানবিদগণকে মুগ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

(৪) জাতিবিদ্বেষ বা অন্য কোন কারণ এখানে নাই। সেই জন্য ভারতীয় ছাত্রগণ অবাধে ফ্যাক্টরীতে কার্য্য করিতে পারেন।

(৫) ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অপেক্ষা খাদ্যাদিও এখানে সস্তায় পাওয়া যায়।

(৬) ভাষা শিক্ষা করাও খুব কঠিন নহে। দেশবাসীর মধ্যে থাকিয়া তাহাদের সহিত প্রতিদিনের আলাপ ও পরিচয়ে ভাষাশিক্ষা খুব সহজেই হইয়া থাকে। তারপর আজ কাল ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় সহরে জার্ম্মাণ শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে।

সেই সব স্থানে দুই তিন মাস খুব মনোযোগের সহিত শিক্ষা করিলেই এদেশে আসিয়া কাজ চালাইতে পারা যায়।

*
* *

৪। কাশ্মীরে অন্তর্বাণিজ্য

কাশ্মীরে লোকের চালচলন এখন অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। তাই পূর্ব্বে সেখানে যেরূপ অভাব ছিল, তাহার চতুর্গুণ অভাব এখন দেখা দিয়াছে। কিন্তু সে অভাব পরিপূরণের উপযোগী জিনিষ পত্র বাড়ে নাই। সেইজন্ম সেখানে অনেকগুলি ব্যবসায় অবনত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু বিগত দশ বৎসরে কাশ্মীরে চলাচলের সুবিধা খুব বাড়িয়া যাওয়ায় সেখানে অন্তর্বাণিজ্য প্রসার লাভ করিতে পারিয়াছে। এই বাণিজ্য জামু এবং কাশ্মীর রাজ্য, দক্ষিণে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ এবং উত্তরে মধ্য এসিয় প্রদেশগুলি ব্যাপিয়া বর্ত্তমান।

আমরা কাশ্মীর রাষ্ট্রের ত্রৈবার্ষিক রিপোর্ট পাঠে অবগত হই, সেখানে এই কয় বৎসরে আমদানী হইতে রপ্তানি খুব বাড়িয়া গিয়াছে। জামু অপেক্ষা কাশ্মীরের বাণিজ্যে মূলধন খরচ হইয়াছে বেশী। শেষোক্তের মূলধন পূর্ব্বোক্তের দেড়গুণ ছিল।

৫। ভুপাল রাষ্ট্রে পুরাতত্ত্বানুসন্ধান

ভারতের করদ-রাষ্ট্রে আজকাল জীবন-বত্তার নানাবিধ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ভুপালের সদাশয়া বেগম নিজরাজ্যের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার যত্ন ও সাহায্যে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ নানা অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। তাহারই ফলে সাঁচিতে বহুবিধ বৌদ্ধ স্তূপ, মঠ, বিহার প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে মৌর্য্যযুগের একটি বিশাল মঠও দৃষ্ট হয়।

এই আবিষ্কৃত মঠগুলির যথাযোগ্য সংস্কারও ভুপালের রাজ সরকার হইতে সাধিত হইতেছে।

বড়োদা রাজ্যেও বহুদিন হইতেই এবম্বিধ অনুসন্ধান কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। গাই কোয়াড় বাহাদুর নিজরাজ্যের সর্ব্ববিধ মঙ্গল অনুষ্ঠানে তৎপর। তাঁহারই সাহায্য ও চেষ্টায় বড়োদার বহু পুরাতত্ত্ব আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি।

*
* *

৬। মহীশূরে প্রাথমিক শিক্ষা

মহীশূর রাজ্যে 'প্রাথমিক শিক্ষা বিল' পাশ হইয়া গিয়াছে। বড়োদা রাজ্যে যে প্রণালী সফল হইয়াছে, সেই প্রণালীতেই মহীশূর গবর্ণমেণ্ট কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, মহীশূর হইতে মূর্খতাকে একেবারে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। আপামর জনসাধারণ অজ্ঞতায়—কুসংস্কারে আবদ্ধ। তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষার আলোক না আনিলেই চলিবে না।

অবশ্য গোড়ায় তাঁহারা বড় বেশী বাঁধাবাঁধির মধ্যে যান নাই। শিক্ষার নিয়মগুলি অনেকস্থলেই অসম্পূর্ণ। কিন্তু তা হোক—কার্য্য আরম্ভ করিলেই সেগুলির সংশোধন হইতে বেশী বিলম্ব হইবে না।

* *

৭। বড়োদারাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্র

প্রজা সাধারণ মামলা মোকদ্দমায় চরিত্র-হীন হইরা পড়ে, তাহাদের ধন সম্পত্তি উৎসন্ন যায়। এই দুরবস্থা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা

করিবার জন্য মহানুভব গাইকোয়াড় বাহাদুর বিগত দশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

প্রথম প্রথম এসেসরের সাহায্যে অল্পসংখ্যক কঠিন মামলাগুলির বিচার হইত, এখন সেসন কোর্টের যাবতীয় মামলাই এসেসর বা জুরীর সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

গ্রামের ছোট খাটো দেওয়ানী মামলাগুলি গ্রাম্য মুন্সেফ একাকী অথবা পাঁচজন সভ্যের সাহায্যে বিচার করেন। এই মুন্সেফ ও সভ্য গ্রামবাসী দিগের মধ্য হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এসব বিচারালয়ে নালিশ রুজু করিতে কোনরূপ কোর্টফি দিতে হয় না।

এতদ্ব্যতীত গ্রামে অনেক রকম বিচারালয় আছে। তাহাকে গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ অথবা লোক্যাল বোর্ড বলা যাইতে পারে। যে গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা হাজারের উপর, সেই গ্রামেই এইরূপ পঞ্চায়ৎ আছে। পঞ্চায়তের অর্দ্ধেক সভ্য প্রজা সাধারণ কর্ত্তৃক এবং অপরার্দ্ধ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। প্রথম প্রথম গ্রামের অভাব অভিযোগ পর্য্যবেক্ষণ এবং গ্রাম্য মুন্সেফকে বিচারে সাহায্য করাই এই পঞ্চায়তের কার্য্য ছিল। কিন্তু শেষে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রসার করা হইয়াছে। তাঁহারা এখন সামান্য রকমের দেওয়ানী ফৌজদারী উভয় বিধ মামলাই বিচার করিয়া থাকেন।

*
* *

৮। বৌদ্ধ ও খৃষ্টান মতে উপাসনাতত্ত্ব

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জগন্নাথ মন্দিরগাত্রের বীভৎস চিত্রগুলির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম্মের অনেক কথা এবং পরস্পরের মধ্যে বর্ত্তমান বহু মূলসাদৃশ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা 'মানসী' হইতে তাঁহার মতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"...এই ব্যাখ্যার মূল কথা এই কয়টি; প্রথমতঃ—উপাসনামন্দির কেবল মন্দির মাত্র; উহা সমুদয় সঙ্ঘের বা Community র প্রতিকৃতি; উহা আবার মানবের জড়দেহেরও প্রতিকৃতি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ উহার ভিতর ও বাহির দুইটা দিক আছে। ভিতরটা শুদ্ধ,—সেটা স্বর্গরাজ্য; বাহিরটা অশুদ্ধ ও সেটা সয়তানের রাজ্য। Community সম্বন্ধে এ কথা খাটে; মানবদেহ সম্বন্ধেও খাটে। Communityর শরণ লইলে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইলে পরিত্রাণ, নতুবা নহে। খৃষ্টানের পক্ষেও সেই কথা। কাজেই মন্দিরের ভিতর একরূপ, বাহির অন্যরূপ। ভিতরে ভগবান ও তাঁহার ভক্তগণ; বাহিরে সয়তান ও তাহার অনুচরগণ। খৃষ্টান ও বৌদ্ধ, ইহাঁরা কেহ কাহারও অনুকরণ করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা বলিতে চাহি না। গোড়ায় যখন উভয়ের মিল আছে, তখন স্বাধীনভাবে গঠিত হইলেও সেই সাদৃশ্য শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইবে। উভয় স্থানেই মন্দিরের ভিতরের ও বাহিরের দৃশ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। জগন্নাথ মন্দিরের বাহিরের চিত্রগুলির সহিত প্রকৃতি সাধনা ও লিঙ্গপূজার কোনও সম্পর্ক থাকিলে মন্দিরের ভিতরেও ঐরূপ চিত্র থাকিতে পারিত। চিত্রগুলি এতটা জঘন্য, এতটা বীভৎস করিবারও প্রয়োজন থাকিত না। পূর্ব্বে বলিয়াছি বেদান্ত বলেন—'ততো ন জুগুপ্সতে', সংসার হইতে ভয়ও নাই, লজ্জাও নাই, জুগুপ্সার কোনও কারণ নাই।

বৌদ্ধ বলেন,—সংসার হেয়, জুগুপ্সার হেতু আছে। সয়তান বা মার ভয় দেখাইয়া থাকেন, আবার বিষয়াপত্তি দ্বারা প্রলোভিত করেন। তাঁহার অনুচরেরা বুদ্ধকে ও খৃষ্টকে ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইয়া লড়াই করিতে আসিয়াছিল, আবার ভোগের সামগ্রী দেখাইয়া প্রলোভিত করিয়াছিল। খৃষ্টীয় গির্জ্জায় সেই ভয়ের দিকটা খুব ভয়ানকরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধ ভাবান্বিত হিন্দুর মন্দিরে বিষয়াসক্তির যে মূর্ত্তি অতি জঘন্য, অতি হেয়, তাহাই দেখান হইয়াছে। এক মূল হইতে, অন্য কাণ্ড হইতে, দুইদিকে দুই শাখা বাহির হইয়াছে মাত্র, ইহাই আমার বক্তব্য।"

*
* *

৯। গৈলা গ্রামের কার্য্যতৎপরতা

বরিশালে গৈলা একটি প্রকাণ্ড গ্রাম। জেলার মধ্যে এই স্থানটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ শিক্ষারই কেন্দ্রস্থল। এখানে উপাধিধারী পণ্ডিতের সংখ্যা পঞ্চাশ জনেরও অধিক। গ্র্যাজুয়েট সংখ্যাও সেইরূপ। এই শিক্ষিত গ্রামবাসীদের যত্ন ও উদ্যোগে এখানে অনেকগুলি বিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সংস্কৃত "কবীন্দ্র কলেজ" একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এই কলেজে একশতেরও অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করে। গণিতশাস্ত্র ব্যতীত প্রায় সব বিষয়ই এই কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত এখনে বহু সংখ্যক টোল, পাঠশালা এবং দুইটি বালিকা বিদ্যালয় বর্ত্তমান।

গ্রামবাসীদের আন্তরিক চেষ্টা এইরূপ মঙ্গল কর্ম্মের দিকে ধাবিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, অন্যান্য গ্রামেও এইরূপ কর্ম্মতৎপরতা অনুসৃত হইবে। শিক্ষাদান কার্য্য শুধু ভদ্রলোকদিগের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে না। গ্রামের "জনসাধারণ" সকলকেই বিবিধ উপায়ে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

*
* *

১০। মহারাষ্ট্রে শিক্ষা-সম্মিলন

বিগত ডিসেম্বর মাসে নাসিকে মহারাষ্ট্রীয় শিক্ষা সমিতির বৈঠক হইয়াছিল। সভায় এগারটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রীমতী জনাবাই রোকাডে, শ্রীমতী কাকাডে এবং শ্রীমতী শির্খে সর্ব্ব প্রথম স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁহাদের বক্তৃতা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

বড়োদার শ্রীযুত খাসীরাও যাধব শেষে অর্থ সাহায্য ভিক্ষা করেন। তাঁহার সুমধুর বক্তৃতার গুণে সভাস্থলেই ৩০০০৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হয়।

এই শিক্ষাসমিতির উন্নতিকল্পে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিই অর্থ সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ধরের মহারাজ বাহাদুর তাঁহার আত্মীয় এবং কর্ম্মচারীবর্গ এই শিক্ষা আন্দোলনে সবিশেষ যোগ দিয়াছেন।

*
* *

১১। কলিকাতার চৈতন্য লাইব্রেরী

সাহিত্য বিস্তার কল্পে কলিকাতায় খুব কম প্রতিষ্ঠানই বর্ত্তমান আছে। আমরা উচ্চ বিষয়ের কোন পুস্তক খুঁজিতে গেলে সাধারণ কোন লাইব্রেরীতে তাহা পাই না। কোন বিষয়ে গভীর গবেষণায় প্রয়োজন হইলে একমাত্র ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীই আমাদের ভরসা। বলিতে কি, এখনও আমাদের নিজকৃত লাইব্রেরীগুলির শৈশব অবস্থা।

কিন্তু তা হোক—নৈরাশ্যের প্রয়োজন নাই। রামমোহন লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, কলিকাতার বাহিরে মাজু লাইব্রেরী প্রভৃতি আমাদের গৌরবস্থল। ইহাদের সাহায্যে সাধারণের মধ্যে সাহিত্য-পিপাসা জাগ্রত হইতেছে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষত চৈতন্য লাইব্রেরীর কার্য্য-ক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত। শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় ইহার উন্নতিকল্পে যেরূপ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বড় প্রশংসনীয় এবং অনুকরণ-যোগ্য।

প্রায় ছাব্বিশ বৎসর হইল এই লাইব্রেরীটি স্থাপিত হইয়াছে। শুধু মাত্র একশত খানি পুস্তক এবং পাঁচটি সভ্য লইয়া ইহার সৃষ্টি হয়। কিন্তু অধুনা তাহাদের সংখ্যা প্রায় শতগুণ বর্দ্ধিত। পাঁচ টাকার ফাণ্ড এখন ১৪,৭৫০৲ টাকার ফাণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

১৮৯০ সাল হইতে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গের বহু শ্রেষ্ঠ লেখকগণ এই লাইব্রেরীর উদ্যোগে নানা স্থানে নানা বিষয়ে সাধারণ্যে বক্তৃতা দিয়াছেন, বহু সম্ভ্রান্ত ইংরাজও নানা সন্দর্ভ শুনাইয়াছেন। সে সমস্ত বক্তৃতা নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত লাইব্রেরী আর একটি মহৎ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রতি বৎসর দুই তিনটা বিষয় কোনটা বাঙ্গালা, কোনটা ইংরাজী ইঁহাদের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, এবং সেই বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ ইঁহাদের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়া থাকে। এইরূপে ১৮৯০ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহারা সাধারণের মধ্যে সাহিত্য প্রচারে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় প্রতি বৎসর একশত টাকা লাইব্রেরীর হস্তে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদাদি কল্পে ঐ টাকা পারিতোষিকরূপে লেখককে দেওয়া হইবে। অবশ্য অনুবাদ, সঙ্কলন বা সমালোচনা লাইব্রেরী কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পুস্তক লইয়াই করিতে হইবে—লেখকের ইচ্ছা অনুসারে যে কোন পুস্তক লইয়া করিলেই চলিবে না।

আমরা এই লাইব্রেরীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

১২। জাপানের ধর্ম্ম

জাপানে এখন চারিটি ধর্ম্ম দেখা যায়। সিণ্টো, বৌদ্ধ, কনফুসিয় এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম। কিন্তু প্রত্যেকটা ধর্ম্মকেই জাপানবাসীরা বীরপূজার ভাবে গ্রহণ করে। সিণ্টো ধর্ম্মই জাপানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। রাণী টেংশোকোডাইজিনের রাজত্বকালে ইহ'র প্রবর্ত্তন হয়। বীরপূজাই ইহার মূল প্রকৃতি। যে সমস্ত লোক জীবিত কালে কোন শ্রেষ্ঠ কাজ করিয়া প্রসিদ্ধ লাভ করেন, মৃত্যুর পরে তাঁহাদিগকে সম্রাটের আদেশ ক্রমে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করা হয়। এবং তাঁহাদের স্মরণার্থে মন্দির উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে। ভক্তগণ বৎসরের মধ্যে কোন বিশিষ্ট দিনে মৃতের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য সেই মন্দিরে সমাগত হন।

জাপানীদের মধ্যে এখন প্রায় আশী হাজার দেবতা আছেন, এবং গুণানুসারে তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাণী টেন্সোকোডাইজিন, সম্রাট জিম্মু টেন্নো, রাজকুমার ইটো এবং সম্প্রতি পরলোকগত মিকাডো প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

স্মরণোৎসবের দিনে এই সকল মৃত মহাত্মাদিগের মন্দিরে ভয়ানক জনতা হয়। সেদিন ভক্তগণ নবান্ন শাক সবজী প্রভৃতি সেই সব মহাত্মাদিগকে উদ্দেশে উৎসর্গ করে—এবং সম্রাটও সেই উৎসবে যোগ দেন।

প্রায় ২৮৪ খৃঃ অব্দে চৈনিক বর্ণমালা, বিদ্যা এবং সভ্যতা জাপানে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই সঙ্গে কনফুষিয় ধর্ম্মও তথায় আগমন করে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রায় ৫৫২ খৃঃ অব্দে জাপানে নীত হয়। সম্রাট কেইকো টেন্নোর রাজত্বকালে কোরিয়া হইতে এই ধর্ম্ম জাপানে বিস্তৃতি লাভ করে।

কনফুসিয় এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া উঠে। সমাজে তাঁহাদের বড় নিকৃষ্ট স্থান ধার্য্য করা হয়। বিদ্যা শিক্ষায় রমণীসুলভ মাধুর্য্য বিনষ্ট হয় বলিয়া, তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া বন্ধ হয়, শুধু গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম, সংসারের আদব কায়দা, কতকগুলি কায়িক পরিশ্রমেই তাঁহারা অভ্যস্ত হইতে থাকেন। তবে বিগত সপ্তদশ শতাব্দী হইতে তাঁহাদের এই শোচনীয় অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আরব্ধ হয়।

জন্মিবামাত্রেই জাপানী সন্তান সিণ্টো বলিয়া গৃহীত হয়, তাহার পিতা মাতার যে ধর্ম্মই হৌক না কেন। সদ্যজাত শিশুকে নিকটস্থ কোন মন্দিরে লইয়া গিয়া সেই মন্দিরের দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হয়। ষষ্ঠ বা অষ্টম দিবসে জাতকের নামকরণ এবং অষ্টম মাসে অন্নপ্রাশন হইয়া থাকে।

কোন লোক মারা গেলে, এবং মরিবার পূর্ব্বে বলিয়া গেলে, পুরোহিতগণ তাঁহার গৃহে আগমন করিয়া বুদ্ধের নিকট তাঁহার মুক্ত কামনা করেন। তারপর কোন বৌদ্ধ মন্দিরে মৃত দেহটা নীত হয়, এবং প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানের পরে মৃতের সৎকার করা হয়। তারপর তিন রাত্রি ধরিয়া পরিজন বর্গ মৃতের সৎকর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ৪৯ দিন ধরিয়া মৃতের আত্মা গৃহাভ্যন্তরেই বাস করে এইরূপ লোকের বিশ্বাস। প্রতি সপ্তাহে একদিন পুরোহিত গৃহে আসিয়া প্রার্থনা করেন, এবং শেষ দিন শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমাপনান্তে আত্মার প্রীত্যর্থে চাউলের পিষ্টক প্রদান করা হয়। সে দিন কেহ মৎস্য মাংস গ্রহণ করে না।

সিণ্টো ধর্ম্মমতে দুষ্টকর্ম্মের শাস্তি, দস্যু হইয়া সাতবার জন্মগ্রহণ করা। প্রত্যেক জাপানীর মধ্যে সিণ্টো মতই প্রবল।

যদিও অল্প দিন হইতে খৃষ্ট ধর্ম্ম জাপানে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তথাপি খৃষ্ট দেবকে কেহ ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া মনে করে না—সিণ্টো বিশ্বাসই এ স্থানে প্রবল। সকলেই খৃষ্ট দেবকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করে, এবং তাঁহার গুণানুকীর্ত্তনই তাঁহার পূজা স্বরূপে গৃহীত হয়।

জাপানের বিবাহ ব্যাপার একেবারে ধর্ম্ম-সম্পর্কশূন্য। বিবাহ উৎসবও বড় সাদা সিধা আর একটা আশ্চর্য্যের কথা এই, অনেক সময়ে দেখা যায় জাপানী পরিবারে স্বামী সিণ্টো ধর্ম্ম, স্ত্রী খৃষ্ট ধর্ম্ম এবং পুত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী।

১৩। রাঢ় অনুসন্ধানসমিতি

পূর্ব্বে আমরা সাহিত্যালোচনার জন্য কেন্দ্র-বিভাগের আবশ্যকতা বুঝাইতে গিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলাম, বঙ্গের প্রায় সব দিকেই সাহিত্য-জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু মধ্য বঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। সেই জন্য কলিকাতার বঙ্গীয়

সাহিত্য-পরিষৎকে এই দুই বিভাগের জন্য বিশেষ যত্নবান হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমরা সুখী হইলাম, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায় রাঢ় প্রদেশে সাহিত্যালোচনার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা" হইতে আমরা সেই সংবাদটি পাঠকগণকে প্রদান করিতেছি—

"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অনুমোদন ক্রমে একটি অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইয়াছে ও এই সংবাদ গত কার্য্যবিবরণীতে প্রদত্ত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতি বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার কোন স্থানে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য গমন করিয়াছিলেন। এই অভিযানে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন বসু, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ যোগদান করিয়াছিলেন। এই অনুসন্ধানের ফল যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। অনুসন্ধানসমিতি অন্যান্য দর্শনযোগ্য বিষয়ের মধ্যে ছাতনার বাসুলী মন্দির, শুশুনিয়ার পর্ব্বতগাত্রাঙ্কিত চন্দ্রবর্ম্মার উৎকীর্ণ লিপি পরিদর্শন করেন। বেঙ্গল ষ্টোন কোম্পানীর হস্ত হইতে এই লিপি রক্ষার কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি না, পরিষৎ তাহা অবগত নহেন এবং যদি ইতিপূর্ব্বে কোন ব্যবস্থা করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাতে এরূপ কোন ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট এক অনুরোধ-পত্র পাঠান হইয়াছে।"

* *
*

১৪। বিলাতে ভারতীয় ছাত্রের দুর্যোগ

ভারতীয় ছাত্রগণ যাহাতে ইংলণ্ড এবং আয়র্লণ্ডে ভর্ত্তি হইতে না পারে, তাহার জন্য বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। শ্বেতাঙ্গ ছাত্রেরা আর কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রদের সঙ্গে বসিতে চাহে না—পড়িতে চাহে না। সম্প্রতি লণ্ডন হাঁসপাতালের ছাত্রেরা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এই মর্ম্মে এক আবেদনপত্র পাঠাইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ দিলাম—

(১) ভারতীয় ছাত্রগণ কিছুতেই শ্বেতাঙ্গ-ছাত্রদিগের সমকক্ষ নহে। সুতরাং ইংলণ্ডে তাহাদিগকে সমান আসন দেওয়া ভারতের পক্ষে কিছুতেই মঙ্গলজনক হইবে না। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনা যায়, এই সব ছাত্রেরা বিলাত হইতে ফিরিয়া গিয়া দেশে রাজবিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়।

(২) পরাধীন এবং নীচ জাতি বলিয়া ভারতীয় ছাত্রগণ ইংরাজের মত স্বত্ব স্বাধীনতা পাইতে পারে না।

(৩) ডাক্তারী শিখিবার জন্য বিলাত আসিয়া ইংরাজদিগের দেহপরীক্ষা এবং রোগনির্ণয় শিক্ষা করা ভারতীয় ছাত্রগণের প্রয়োজন নাই, কেন না দেশেত তাহাদিগকে কৃষ্ণাঙ্গকেই চিকিৎসা করিতে হইবে।

(৪) ভারতীয় ছাত্রগণ বিলাত আসিয়া একেবারেই অলস ভাবে দিন যাপন করে, এবং অনেক সময় কোন নিঃসহায় ইংরাজ বালিকাকে বিব্রত করায় কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করে।

(৫) এমন কি অনেক সময় এই সব ছাত্রদের মধ্যে যাহারা ভাল, তাহাদিগকেও হাঁসপাতালের রোগীরা দেখিতে পারে না। এবং ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ত দৈনন্দিন ঘটনা!

(৬) হাঁসপাতালের ধাত্রীগুলা ইহাদের বিরুদ্ধে একমত। তাহারা ইহাদিগকে একেবারেই দেখিতে পারে না, যদিও ভারতীয় ছাত্রগণ ধাত্রীদিগের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়া থাকে।

(৭) শিক্ষকগণের ধারণা, ভারতীয় ছাত্রগণ সর্ব্ববিষয়েই, বিশেষত নিদান তত্ত্বে বড়ই ধীর এবং অধ্যয়নে তাহাদের ফল নিতান্তই অসন্তোষজনক।

* *

১৫। যুবক বাঙ্গালার বাণী

বেঙ্গলী একদল যুবককে সামান্য রকমের একটা ব্যবসা খুলিবার জন্য আহ্বান করিয়া

ছেন। তদুত্তরে "যুবক বঙ্গ" নাম দিয়া জনৈক পত্রদাতা যাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদান করিলাম।—

বঙ্গদেশে বৈষয়িক উন্নতির জন্য এরূপ দুই একজনে কার্য্য করিলে কিছু হইবে না। নেতারা শুধু কয়েকজন যুবককে দিয়া এতবড় একটা কার্য্য সমাধা করিয়া লইতে পারিবেন না। এরূপ করিয়া বৈষয়িক মুক্তিলাভ কখনই সম্ভবপর নহে। দেশে এতদিন জীবিকা নির্ব্বাহের যতগুলি ছাপমারা পন্থা ছিল, সবগুলিইত রুদ্ধ প্রায়! জীবনযাত্রা এখন আর আগেকার মত সাদাসিধা নহে। আগে দশজনের ভরণ পোষনের জন্য যে অর্থব্যয় হইত, এখন একজনের জন্যই তাহা আবশ্যক হয়। অধিকন্তু দুর্ভিক্ষ, কলেরা, ম্যালেরিয়া মহামারি ত লাগিয়াই আছে। অতএব এখন কাউন্সিলে বসিবার জন্য যতই কেন চেষ্টা হউক না, আইন ব্যবসায়ের জন্য যত লোকই অগ্রসর হৌক না, এমন কি স্বরাজ পর্য্যন্ত আমাদের ভাগ্যে জুটুক না কেন, কিন্তু কৃষি ও ব্যবসায় জগতে যতদিন আমাদের শক্তিবৃদ্ধি না হইবে, ততদিন এ সমস্তই আমাদের কাছে ভুয়া।

বিগত কয়েক বৎসরে অনেকগুলি ব্যবসায় আরম্ভ হয়। কিন্তু তাহার অধিকাংশই উঠিয়া গিয়াছে, এবং যাহা আছে, তাহাও সঙ্কটাপন্ন। ইহাতে আমরা আমাদের আত্ম-শক্তির উপরেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছি, এবং সেই জন্য মূলধনও দুষ্প্রাপ্য হইয়া যাইতেছে। অতএব দেশের নেতা এবং স্বদেশপ্রেমিকদিগের নিকটে আমাদের নিবেদন, আমাদিগকে এখন বিপুল শক্তি-সম্পন্ন পাশ্চাত্য জাতিদিগের সহিত বৈষয়িক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব তাহার জন্য বহু বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞ, অগণিত মূলধন, এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত মঙ্গল ইচ্ছার প্রয়োজন। আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য মার্কুইস ইটোর মত একজন হৃদয়বান এবং বিসমার্কের মত বুদ্ধিমান লোকের প্রয়োজন হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, এই বৈষয়িক সমস্যা মিমাংসিত না হইলে, আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠান গুলি অচিরেই বিলীন হইয়া যাইবে। অতএব নেতারা এই দিকে তাঁহাদের সমস্ত মনোযোগ প্রয়োগ করুন—সভ্যতার খাতিরে নহে—জাতির অস্তিত্বের জন্য আর তাঁহাদের বিলম্ব করা সাজে না।

* *
*

১৬। প্রত্নতত্ত্ব শিক্ষা

আজকাল প্রত্নতত্ত্ব শিক্ষার দিকে অনেকেরই ঝোঁক পড়িয়াছে। অনেক ছাত্রই প্রত্নতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে ভাল বাসেন। কিন্তু তাঁহারা অনেক সময়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে প্রকৃত পন্থায় চলিতে সক্ষম হন না—অনেক সময় তাঁহাদের বৃথায় ব্যয়িত হইয়া থাকে।

মূর্ত্তিতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, স্তূপজ্ঞান, লিপিশিক্ষা প্রভৃতি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ না হইলে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।

আমরা আশা করি, যে সকল ছাত্র এই বিষয়ের কিছু জ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তাঁহারা মথুরার আর্কিওলজিক্যাল মিউ-জিয়মের ক্যাটালগ খানা পাঠ্য পুস্তক রূপে পাঠ করিবেন। ঐ পুস্তক খানিতে ভারতবর্ষীয় মূর্ত্তি, মুদ্রা প্রভৃতির বহু লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই লক্ষণ গুলি মনে রাখিলে, অনুসন্ধান কার্য্যে বিশেষ সফলতা লাভ করা যাইবে, এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

শেলী ও ব্রাউনিঙ্গের কাব্য-শিল্পে অধ্যাত্মবাদ

আধ্যাত্মিক ভাববাদ বা রহস্তবাদ ইংরাজ-দার্শনিকগণ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেন নাই। প্রাচীনকালে প্লেটো বা নব প্লেটো-সম্প্রদায় এবং আধুনিককালে জর্ম্মান্ দেশীয় দার্শনিকগণ যে অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং যাহার প্রতিষ্ঠা-কল্পে কাণ্ট, হেগেল, হিকেল, প্রভৃতি মনীষি-গণ যুগের পর যুগ অতিবাহিত করিয়া সাহিত্য জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতিধ্বনি একমাত্র আয়র্লণ্ডদেশীয় বর্কলির (Berkley) ভাববাদমূলক পুস্তকে শুনিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন লক, হিউম্, বেকন, মিল, হার্ব্বার্ট স্পেনসার, হাক্সলি প্রমুখ মনীষিগণ ঐহিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সত্তা ভিন্ন অপর কোন জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

বিচিত্রকলাময়ী—এই দৃশ্যময়ী প্রকৃতির রহস্য সমুদায় উদ্ঘাটন করিবার বিপুল আয়োজনে শেষোক্ত দার্শনিকদিগের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। মানব প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—প্রকৃতির গণ্ডীর মধ্যে জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের সুযোগ ও সুবিধা-আহরণের চেষ্টাই তাহার প্রকৃষ্ট-জীবন, ইহাই এই বৈজ্ঞানিক-দিগের উপদেশ।

মানব প্রকৃতির অঙ্গবিশেষ। প্রকৃতি স্বৈরগতিতে মানব-দেহ সৃষ্টি করিয়াছে। এই দেহ-গঠন ও ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমাবেশ কলাকৌশলময়ী প্রকৃতির অপূর্ব্ববিকাশ। অতএব মানব এই অবস্থার অধীন; তাহার অধীনতাই মানবের গৌরব, তাহার দাসত্বই মানবের কর্ত্তব্য, ইহা বৈজ্ঞানিকদিগের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত।

তাঁহারা সত্যের যে আংশিক চিত্র যুক্তি-ফলকের উপর চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা সত্য। অংশের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিবরণ ও তাহার সমর্থনকল্পে যে সকল বিচিত্র যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা মনোজ্ঞ ও চিন্তাশক্তির পরিচায়ক। কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রহেলিকা! অংশ হইতে সম্পূর্ণের জ্ঞান, আংশিক সত্যের জন্য সম্পূর্ণ সত্যের প্রকট মূর্ত্তিকে দাঁড় করান অত্যন্ত অসঙ্গত। সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভিন্ন আমরা ভেদ-বিবাদ-বৈষম্যের নিরন্তর ঝঞ্ঝাবাতে আকুল হই। শারীর বিজ্ঞান হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলেই কি আমাদের দেহ সম্বন্ধে জ্ঞান হইল? দেহ কি কেবল কতকগুলি স্নায়ু, মাংসপেশী ও অস্থির সমা-বেশ? তাহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা কিরূপে অস্বীকার করিতে পারি? সেইজন্য বৈজ্ঞানিকগণ সত্যের সম্পূর্ণ ছবি অঙ্কিত হওয়ার পূর্ব্বেই মানব-চিন্তার যবনিকাপাত করিয়া অজ্ঞেয় বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। মানব-চিন্তার সীমারেখা এই স্থানে পাতিত করিলে কি সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান হইল? মানবের অসীম ও বিশালরাজ্য এখনও যে অনধিকৃত, অনাবিষ্কৃত। ইহাতে বিজ্ঞান নিশ্চিন্ত হইতে পারে কিরূপে? বিশেষ জ্ঞান—ইহাই ত বিজ্ঞান। কিন্তু বিশেষ

জ্ঞান কোথায়? ইহা যে অবিশেষ জ্ঞান, অপরিপক্ক জ্ঞান, আরও সহজ ভাষায় অজ্ঞান।

মানব ও প্রকৃতি যে কতকগুলি আকার ও বিচিত্র পদার্থের সমাবেশ নহে এবং এই সমাবেশ যে আপন স্বৈর-গতিতে কর্ম্ম করে না, কতকগুলি ক্রিয়মান চলনই যে জগতের একমাত্র উপায় ও উদ্দেশ্য নহে, এই চিন্তা ভাববাদী দার্শনিকদিগকে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে আকুল করিয়াছে। তাঁহাদের চিন্তা তৎ-তৎ কালে সমাজকে আলোকিত করিয়াছে।

প্রকৃতির অন্তরালে, ওতঃপ্রোতভাবে এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বকারণ-কারণ অচিন্তনীয় চৈতন্য বিদ্যমান, যাঁহার ইঙ্গিতে এই জগৎ ক্রিয়াশীল, যাঁহার ইচ্ছায় এই জীব ও জগতের অপূর্ব্ব সমাবেশ, এই জগৎ এত সুন্দর, যাঁহার প্রত্যেক পদবিন্যাস সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টির উপর নির্ভর করে, আকাশের বজ্রনির্ঘোষে গ্রহ-তারকার উজ্জ্বলদীপ্তিতে, পবনের আলোড়নে, জলের সর্ব্বজীবন পোষণে, পৃথিবীর সর্ব্বসহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যে, চরাচরব্যাপী জীবনের বিকাশে এবং জীবনের মাধুরী উপভোগের জন্য মরণের মঙ্গল হস্ত প্রসারণে, যাঁহার অমোঘবাণী হৃদয়ের অন্তরতম কক্ষে প্রচারিত হইতেছে, তাঁহার সত্বা স্বীকার না করিলে চিন্তার অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। সে চিন্তাও কত দুর্ব্বিবহ! এই জগতের সমস্ত সঙ্গীত স্তব্ধ হইয়া যায়, রসে ও গন্ধে নীরসতা আসে, মুহূর্ত্তে সমস্ত নীরব হইয়া যায়, মহাপ্রলয়ের অসীম নিস্তব্ধতা-সাগরে সমস্ত নীরব হইয়া যায়!

এই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যকে কেহ বলিয়াছেন "সচ্চিদানন্দ," কেহ বলিয়াছেন 'নির্ব্বাণ,' কেহ বলিয়াছেন 'শূন্য,' কেহ বলিয়াছেন "মঙ্গল" (good), কেহ বলিয়াছেন "Eternal Substance," কেহ বলিয়াছেন "Universal process"—কেহ বলেন "অজ্ঞেয়"।

সর্ব্বদেশেই চিন্তাবীরগণ এই অসীম ও অনন্ত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গুণগান, তাঁহার বিচিত্র কৌশলপূর্ণ চরিত্র যুগে যুগে দেশে দেশে কীর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে। সকল দেশের সাহিত্যের মধ্যেই ইহা হৃদয়ের বিমল মন্দাকিনীধারাপূত ও জীবনে ইহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হইয়াছে। ব্যাস, বুদ্ধ, শঙ্কর, কন্‌ফিউসিয়াস (Confucius) জোরোয়াষ্টার (Zoroaster), মহম্মদ্‌, খৃষ্ট, চৈতন্য, প্লেটো, সক্রেটিস্‌, মার্টিন্‌, লুথার, কার্লাইল্‌, এমার্সন্‌, যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে আবির্ভূত হইয়া দেশবাসীদিগকে এই অদৃশ্য পরম পদার্থ আস্বাদ করাইবার জন্য অমৃত-পাত্র লইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। পিপাসু জনগণ এই অমৃত পান করিয়া সংসার-ঘোর-দাবানল-দহন হইতে বিমুক্ত হইয়া অমর হইয়াছেন।

এই সর্ব্বব্যাপী সত্বার অস্তিত্ব, ইহার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বজ্রনির্ঘোষে প্রচারিত হইলেও মানব এই ঐহিক, দৃশ্যমান জগৎ ও রূপরসগন্ধ দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে, ভবের হাটের কোলাহলে এত বিমূঢ় হইয়া থাকে যে, এই অমৃত-ভারবাহীদিগের আকুল-কণ্ঠ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। সেইজন্য কোন এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে দেশে দেশে যুগে যুগে এই বাণীর প্রচারক—গায়ক, কবি, সন্ন্যাসী, সংস্কারক, ধ্যাননিষ্ঠ যোগী, দার্শনিক, কথক, শিক্ষক ইত্যাদি নানারূপে আসিয়া আবির্ভূত হন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥

ভগবান গীতা-উপদেশকালে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি মানব-দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই।

তাঁহাদের বাক্য, ভাষা, ভাব আমাদের রস-সঞ্চারের নাড়ীবিশেষ। তাঁহাদের ওজস্বিনী ভাষা, বাক্য, অক্ষুণ্ন প্রতাপ, অপ্রতিহত গতি, তাঁহাদের চক্ষুর ঐন্দ্রজালিক মোহিনী শক্তি আমাদের জীবনে নব ভাবের আবির্ভাব করে। দেহে ও মনে এক তাড়িৎপ্রবাহের সঞ্চার করিয়া দেয়। তাঁহাদের বৈরাগ্য ও প্রেম, ত্যাগ ও সংযম, অসীমের পিপাসা ও তজ্জন্য উদ্‌গ্রীব ব্যাকুলতা আমাদের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া মর্ম্মের মধ্যে অব্যক্ত সুরে ও ছন্দে নূতন সঙ্গীতের অবতারণা করিয়া দেয়, নূতন স্রোতে জীবন চালিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে জর্ম্মান্‌দেশীয় দার্শনিকগণ এই অমৃত-ভাণ্ড-পরিবেশনের প্রধান পুরোহিত। তাঁহারা যে পবিত্র হোমানল-শিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার সমিধ-আহরণের ভার পাশ্চাত্যজাতি গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাদের জীবনে, সাহিত্যে, নাটকে, বিদ্যালয়ে ভাববাদের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। ইহা অনুসন্ধিৎসু মাত্রেরই বোধগম্য হয়।

বর্ত্তমান যুগে ডেকার্টস্ (Descartes), স্পিনোজা (Spinoza), লিবনিজ (Leibniz), কাণ্ট (Kant), হেগেল (Hegel) প্রভৃতি মনীষিগণ জর্ম্মান্ দর্শন-সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব, তাহার প্রয়োজন, নীতি ও রাষ্ট্রনীতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, শিক্ষা, দীক্ষা, আচার-ব্যবহারে সর্ব্বত্র ইহার পবিত্র সম্বন্ধ-স্থাপন দ্বারা ইহাদের গৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিতেছে।

ইংরাজ-লেখকদিগের মধ্যে কার্লাইল, এমার্সন ও ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায় এই ভাবের ভাবুক, এই মন্ত্রের উপাসক। ইহাদের সমগ্র মানব-জাতির প্রতি সহানুভূতি, সমগ্র মানব-জাতিকে বর্ণনির্ব্বিশেষে সেবা করিবার ব্যাকুলভাব, মানব-জাতির আদরের জিনিস, কার্লাইলের 'Hero,' এমার্সনের Representative menএর পাঠক ইহা সহজেই অনুভব করিবেন।

ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যে যে সকল কবি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব-কালকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়। তাঁহার মাতৃহৃদয়ের অমৃত সিঞ্চনে ইংরাজী সাহিত্যে যে সুললিত সঙ্গীতের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা জগতে অতুলনীয়। মহারাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে যেমন নাটক, সাহিত্য, সুললিত কলা, শিল্প ইত্যাদি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তেমনি ভিক্টোরিয়াযুগেও গীতিকাব্য বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জীবনের মধ্যে যে করুণ সুরের কাতর বিলাপধ্বনি অবিরত হইতেছে, তাহার প্রতিধ্বনি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ কবিগণ লিপিবদ্ধ করিয়া মানব-জাতির অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের অন্তরতম কণ্ঠের নীরব সঙ্গীত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌স, ব্রাউনিংএর কবিতায় দৃষ্ট হয়।

ইংরাজী সাহিত্যে এই করুণ সুর-সম্বল সঙ্গীতের সর্ব্বপ্রথম গায়ক কোলেরিজ। তাঁহার মধ্যে যাহা বীজরূপে জন্মলাভ করে, তাহাই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) শেলি (Shelly), কীট্‌স্ (Keats), ব্রাউনিং (Browning)এ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। আহা সেই বৃক্ষের

কি মনোহর দৃশ্য! কি মধুর তাহার ছায়া! সেই বৃক্ষবাসী বিহঙ্গমের কি মধুর কাকলী-তান! এস আমরা ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যে ভাববাদের স্বরূপ তত্ত্ব ও বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগুলি দেখিয়া জ্ঞান ও ভাবের ভাণ্ডারের উপচয় করিয়া লই।

(১) ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির মধ্যে আনন্দময় চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পুষ্পের মধ্যে, নির্জ্জন পর্ব্বত-কন্দরেও উপত্যকার নির্ঝরিণীর কল কল নিনাদ অনুসন্ধান করিয়া জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জীবন এই অনুসন্ধিৎসার বিরাট প্রয়াস। অবশেষে লিখিয়াছেন—"Our birth is but a sleep and a forgetting"—আমাদের জীবন এক স্বপ্ন ও ভ্রান্তি।

আমরা যে চৈতন্যময় সত্ত্বার অংশ, যাহার ক্রোড় আমাদের পরম আশ্রয়, (জাগ্রত) জীবনে তাহাকে ভুলিয়া মোহ-নিদ্রায় বিজড়িত হইয়া থাকি। ইহাই তাঁহার শেষ ও অমোঘ বাণী।

(২) তারপর শেলি ও কীট্‌স্—ইহারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা কাব্য-সাহিত্যে ভাববাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। উভয়েই সমসাময়িক, একই ভাবের ভাবুক, একই সুরে একই ছন্দে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে নিরাশার তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া গেলেন, কীট্‌স্ ও শেলি আপনাদের হৃদয়ের অনুভবের দ্বারা তাহার মীমাংসা করিয়া মানব-জাতিকে ভাবজগতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, অসীমের পিপাসা, জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ইহা নির্ব্বাপণের উপায় সাহিত্যে ও জীবনে প্রদর্শন করিয়া সমাজকে ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

কীট্‌স্ সৌন্দর্য্যের কবি। প্রকৃতির কোমল স্পর্শ হইতে ভাবরাশি উন্মথিত করিয়া মনোহর শব্দ-বিন্যাসে সুরের ছাঁচে ঢালিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেগুলিকে সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিবার অবসর পান নাই। বিধাতার অমোঘ হস্ত তাঁহাকে অসময়ে সরাইয়া লইয়া গেল।

শেলি শুধু কবি নহেন। তিনি প্রেমিক ও সংস্কারক। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিত, কিন্তু মানবের হৃদয়ের অন্তর-সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়কে (সব সময়ের জন্য) এক রসে সিক্ত করিয়া রাখিত। তিনি পূত ও পবিত্র মানব-হৃদয়কে নৈতিক আদর্শ ও ধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতিঃ দ্বারা উন্মথিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কীটস্‌এর সঙ্গে শেলির পার্থক্য এইখানে। কীটস্ প্রকৃতিকে ভাল বাসিতেন, তাঁহার সুকোমল ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেন তাহাতেই তাঁহার সম্পূর্ণতা ও আত্মতৃপ্তি জন্মিত। কিন্তু শেলি কেবল প্রকৃতি-সুন্দরীর সুকোমল শষ্প-শয়নে আনন্দ উপভোগ করিয়াই তৃপ্ত হন নাই। তিনি সেই সৌন্দর্য্য-উৎস হইতে মানব-হৃদয়ে ছুটিয়া আসিয়া সেখানে তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ ও পরাকাষ্ঠা দেখিয়া মানবকে সত্যের পথ, মুক্তির পথ, আনন্দের পথ দেখাইবার জন্য সংস্কারকের ভাবে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। শেলি শুধু সুন্দর শব্দ-বিন্যাসে ভাবের ছবি আঁকিয়া মানবকে সুখী করিতে চাহিতেন না; তিনি প্রেমিক ছিলেন, তাই তিনি উন্মাদনা বক্ষে লইয়া আত্ম-হৃদয়ের দারুণ বেদনা লিপিবদ্ধ করিবার ছলে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে সমাজ-সংস্কারকের অনেক উপাদান সংগৃহীত হয়। তিনি সাহিত্য ও জীবনে এক

আধ্যাত্মিক জগতের সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে শেলি (Shelly) যে আধ্যাত্মিক রাজ্য স্থাপনের (Theocracy) জন্য হৃদয়ের রক্তদান করিয়া গিয়াছেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানব সমাজকে ভাবের আদর্শ দ্বারা মুগ্ধ ও পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহা শেলির কবিতায় ও জীবনে সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই।

শেলি মানব-মহাপ্রেম-যজ্ঞের পুরোহিত। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের বিমল মন্দাকিনী-ধারা বিফলে শূন্য আকাশকে প্লাবিত করিয়াছে। মানব-হৃদয় তাঁহাকে আদর করিতে পারে নাই, এইরূপ তীব্র সমালোচনা আরনল্ড প্রমুখ সমালোচকদিগের মুখে শুনিতে পাই। তাঁহার ভাবের তীব্র প্রখর সূর্য্যকিরণ, তাঁহার ভালবাসার পবিত্র হোমানল-শিখা, তাঁহার অসীমের বিরহ দাবানল রাষ্ট্রনীতির চক্রে ঘূর্ণ্যমান্ মানব কিরূপে বুঝিবে?

আকাশ-বাতাস-জোড়া গীতি-গন্ধভরা জগৎ-ব্যাপী সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার কর; তাঁহার দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া জাগতিক কর্ত্তব্য পালন কর; সর্ব্বজীবে সমদর্শী হও; হৃদয়কে যুক্তির অগ্রে স্থান দাও; হৃদয়ে অসীমের পিপাসা ভরিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর; পরিশেষে অসীম ও অনন্ত প্রেমসিন্ধুতে হৃদয়ের পবিত্র রক্তবিন্দুকে নিমজ্জিত কর। ইহাই শেলির মর্ম্মচ্ছেদী হৃদয়ের উদ্ভিন্ন তন্ত্রীরাজি। ঐ দেখ, ঐ অনন্ত আসন, ঐ পবিত্র হোমানল-শিখা বিশ্ব গ্রাস করিতে চাহিতেছে। উহা তোমার হৃদয়ে অব্যক্ত স্বরে কত কথা বলিতেছে। কত গানের উৎস ছুটাইতেছে। ব্রাউনিংএর 'পলিন' যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি ইহা অনুভব করিবেন। ব্রাউনিং বলিতেছেন—

"Sun-treader
Live then for ever
And be to all what thou hast been
to me.
A Key to music's mystery, when
mind fails
A reason, a solution and a clue."
Pauline—R. Browning.

ইহা হইতেই বুঝিতেছি যে, কোন্ উপাদানে তাঁহাকে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এখন কালিদাসের সঙ্গে সমস্বরে বলি—

"তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা।
তথা হি সর্ব্বে তস্যাসন্ পরার্থৈকফলা গুণাঃ।"
রঘু-১ম সর্গ।

আহা তবে বলিতে দোষ কি? ঐ দৃষ্টি প্রখর হইলেও বড় শীতল! তীব্র হইলেও শান্ত! দারুণ হইলেও কোমল! ভীষণ হইলেও মোহন!

ইংরাজের আবালবৃদ্ধনরনারী প্রবাদ বাক্যে—'no rose without a thorn,' 'revolution is never set with rose water" ব্যবহার করেন। রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষার পিপাসা বক্ষে লইয়া যে জাতি মনুষ্যত্ব-মহারত্ন উত্তোলনের জন্য জগৎ-বিখ্যাত হইয়াছে এবং যাহার অতুল কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে অঙ্কিত হইয়াছে, সেই জাতি "Bloodless revolution"এর কবিকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আপনাদিগকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। "মানব-হৃদয়ের রক্ত বড় পবিত্র, তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমাজ সংস্কার কর" এই বাণীর প্রচারক কি না দেশবাসীর নিকট হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া হৃদয়ের দারুণ অনন্ত প্রেম-বাড়বানল

অনন্ত বীচিবিক্ষুব্ধ অতল সাগরের ক্রোড়ে স্থান পাইল! বিধাতার বিচার ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছে। সামান্য মানবের ন্যায় গ্রহণ না করিয়া অনন্ত হস্তের কোমল বীচিমালা স্পর্শে তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া গেলেন। শেলি মানবের পরিত্যক্ত কিন্তু ভগবানের গ্রাহ্য। ক্ষুদ্র সমাজের যাঁরা লাঞ্ছিত কিন্তু মহত্তের আদৃত। সীমার বন্ধন তাঁহাকে উপেক্ষা করিল, কিন্তু অসীমের চির অনুগ্রহ তিনি লাভ করিলেন। জীবন-রহস্য উন্মোচন করিবার জন্য যাঁহার জন্ম, জীবনের সমস্ত কর্ম্মে, ভাবে ও আয়োজনে যাঁহার বিকাশ, অবসানে তাহাই মহিমান্বিত হইল! ইহা অপেক্ষা গৌরবের আর কি হইতে পারে?

ব্রাউনিং শেলির পরিণতি ও পরাকাষ্ঠা। শেলিতে যাহা বীজ ও অঙ্কুর, ব্রাউনিংএ তাহা ফল-ফুল-সুশোভিত মনোহর বৃক্ষ। শেলি যাহা আজীবন সেবা করিয়া গেলেন, ব্রাউনিং তাহাই সূত্ররূপে ধরিয়া অনুসরণ করিয়া চলিলেন। শেলির অঙ্কুরিত বৃক্ষে ব্রাউনিং-এর প্রফুল্ল-কুসুমসৌরভ সমাজকে আমোদিত ও আকুল করিয়াছে। শেলিকে যে সমাজ রক্তচক্ষে বক্রদৃষ্টিতে ভ্রুভঙ্গী করিয়া বিতাড়িত করিল, সেই সমাজ অশ্রুসিক্ত নয়নে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ব্রাউনিংকে স্থান দিল। শেলির "Love is loveliest when embalmed in tears" সমাজ গ্রহণ করিল কিন্তু অন্য মূর্ত্তিতে, ইহাই শেলির গৌরব ও কীর্ত্তি।

ব্রাউনিং শেলির শিক্ষায় শিক্ষিত, শেলির ভাবে বিভোর, শেলির আদরে গরীয়ান্, শেলির প্রেমে মুগ্ধ, শেলির গর্ব্বে গর্ব্বিত। শেলির অসীম রাজ্যের বার্ত্তা মানবসমাজে প্রচারের সর্ব্ব প্রথম দূত।

ব্রাউনিং শেলিকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন শেলির সহিত তাঁহার যে পবিত্র সম্বন্ধ ছিল এবং সেই পবিত্র বন্ধন তাঁহার হৃদয়-সরোবরে যে মুখর কল্লোল-তরঙ্গ তুলিয়াছিল, তাহা "পলিন"-পাঠকের অবিদিত নাই। শেলি ব্রাউনিংএর চক্ষে সামান্য রক্তমাংসবিশিষ্ট মানব নহে, নিবিড় ভাবের ঘনীভূত মূর্ত্তি, দূষিত বায়ুবিশিষ্ট পৃথিবীর জীব নহে, সুনীল গগনবিহারী বন্য বিহঙ্গের কাকলীতান।

"The blue doep then wingest
And singing still dost soor and
sooring ever singest."
P. B. Shelly.

তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিয়াছেন যে, শেলি প্রদীপ্ত উজ্জ্বল ভাস্কর, নির্ম্মল প্রদীপ্ত জ্ঞানানল। ব্রাউনিংএর আত্ম-নিবেদন ও আত্মোৎসর্গ মানব-সমাজকে প্লাবিত করিয়া মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের পথ উদ্ঘাটন করুক। ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এরূপ ভাব কবিতায় খুব কম দেখা যায়। ব্রাউনিং শেলির নিকটে আত্মনিবেদন-কল্পে যে ভাবে মানব-হৃদয়-তন্ত্রীর আলোড়ন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই দুর্ল্লভ। ব্রাউনিংএর মহত্ত্বই এই যে, আপনাকে বিশ্বের প্রতি-বিম্বের ন্যায় দেখিয়াছেন। ক্ষুদ্র মানব-মনে ভাবের যে প্রতিবিম্ব অবিরত পতিত হইতেছে তাহার প্রকট ছবিই ব্রাউনিং। তাঁহার কবিতা সেই ছবির অসম্পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি।

জগতের প্রতি রেণুকণায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব, প্রেম ও প্রেমের চিরস্থায়িত্ব, ভগবানের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, তাঁহার প্রতি মানবের কর্ত্তব্য, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও তাহার উপায়, এই বিষয়গুলি ব্রাউনিং নাটকেও গীতিকাব্যে নানা ছন্দে নানা সুরে গান করিয়া আপনাকে মনুষ্য-সমাজে অমর করিয়া

গিয়াছেন। সমগ্র মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি, জগতে ভালবাসাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতি ও শাসন, ভালবাসাই জীবের কর্ত্তব্য ও গতি ইহাতেই পরাকাষ্ঠা, ইহা ব্রাউনিংএর কবিতা ও জীবনে প্রতিপদে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ব্রাউনিং শেলি অপেক্ষা মানব-সমাজের আদরের জিনিষ। ব্রাউনিংএ শেলির উন্মাদনা নাই অথচ শান্তি আছে; ভাবের প্রাখর্য্য নাই, শীতলতা আছে, তাঁহাতে শেলির উদ্দাম নাই, তবে ভাবের নিবিড়তা আছে; শেলির ন্যায় মানব-সমাজকে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যগ্র পিপাসা নাই; ভালবাসার মধুর ও বিমল হাস্য বিকীরণ করিয়া সৎপথে পরিচালনের ইঙ্গিত আছে; শেলির ঐশ্বর্য্যের দুর্দ্দমণীয়তা নাই, কিন্তু মাধুর্য্যের তীব্র সংযম আছে; ভাষার প্রগল্‌ভতা নাই, বাক্যের সংযম আছে; ভাষা নাই, ব্যঞ্জনা আছে। ইহারই জন্য ব্রাউনিং সুপাঠ্য নহে।

ব্রাউনিং বেশী লেখেন না। অল্প লিখিয়া একটী চিত্র তুলিয়া দেন—তার পরে পাঠককে সব বুঝিয়া লইতে বলেন। তিনি ভাবমুগ্ধ নীরব বীণা-যন্ত্রের কোমল তন্ত্রী-আলোড়নে সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস তুলেন—তুলিয়াই নিজে আপন তানে আপনি মুগ্ধ হইয়া থাকেন—শ্রোতাকে তানের শেষ ঝঙ্কার হইতে ব্যঞ্জনায় বুঝিয়া লইতে বলেন।

অসম্পূর্ণ চিত্র হইতে সম্পূর্ণ মূর্ত্তি অঙ্কিত করা, সুরের ঝঙ্কার হইতে তান-মান-লয় সমন্বিত সঙ্গীত যোজনা করা, কতিপয় শব্দ হইতে ভাবরাশির উদ্বোধন করা—বাস্তবিকই সহজ ব্যাপার নহে। সেইজন্য ব্রাউনিংএর পাঠক ও বুঝিবার লোক বিরল। যাঁহারা ধীর ও সংযমী—যাঁহারা ভাবের ভাবুক—তাঁহারাই ব্রাউনিং এর অদৃশ্য শৃঙ্খলগুলি জুড়িয়া লইবার প্রয়াস পাইবেন; সমাকচিত্তই সমানচিত্তকে আস্বাদন করিতে পারেন। ব্রাউনিং প্রেমিক, প্রেমিক না হইলে ব্রাউনিংএর পাঠক তাঁহার লেখনী সঞ্চালনের কৌশলের সুখ্যাতি করিবেন না। প্রেমিক না হইলে ব্রাউনিংএর প্রেম, পিপাসা, আকাঙ্ক্ষা, উপদেশ,—মানব সমাজের প্রতি সহানুভূতি, মানব সমাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা—অস্পষ্ট অস্ফুট এমন কি অলীক বোধ হইবে। ব্রাউনিং ভাবের কবি—নীরস কবি। উচ্ছ্বাস উন্মাদনা,—শব্দবিন্যাস—অলঙ্কার সমস্তই তাঁহাতে নীরব। বীণা সুন্দর, তার বিন্যস্ত; কিন্তু নীরব। কখন সুর উঠে কিন্তু পরক্ষণেই থামিয়া যায়। কোন সঙ্গীতই সম্পূর্ণভাবে সকল তারের আলোড়নে ব্যক্ত করা হয় না। কখন শব্দ ফুটে, বাক্য ছুটে—তার পরেই নীরব সঙ্গীতের আলাপনে মুগ্ধ হইয়া যান। এইখানেই ব্রাউনিংএর সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা এই সংযত উচ্ছ্বাসে। যেন অসীম স্তব্ধ সমুদ্র; তাহার মুখর কল্লোল চপলতা পরিহার করিয়া মুগ্ধ গানের তানে বিভোর। তরঙ্গ উঠে সত্য,—কিন্তু উঠিয়াই আবার অসীম শীতল সৌম্য জলরাশির তলদেশে ফিরিয়া যায়। ভাব ফুটে—ভাষা ছুটে—পর মুহূর্ত্তেই ভাবের অসীম আধার ঐ হৃদয়ের অন্তরতম কক্ষে ফিরিয়া গিয়া আত্মানুভূতিতে পর্য্যবসিত হয়।

এখানে ক্রীড়া নাই—উপভোগ আছে; উল্লাস নাই নিবড়িতা আছে। বাহিরের সৌন্দর্য্যে বিলাস নাই, অন্তরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ভাব আছে। প্রবৃত্তি নাই—নিবৃত্তি আছে। ইন্দ্রিয়াতীত যে রাজ্য তাহার বাণী প্রচারের জন্য এই উপায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কবি অসীম অস্তিত্বের কথা বলিবার যে প্রয়াস পাইয়াছেন

তাহা সফল হইয়াছে। আমরা তাঁহার নীরব শান্ত ধ্যানস্তিমিত আনন দেখিয়া মুগ্ধ। মুখের বাক্য ও আড়ম্বর ধৃষ্টতা মাত্র।

অবশেষে একটী মাত্র কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় শেষ করিতে চাই।

যাঁহারা মানব জাতির হৃদয় আসনে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারা জগতে নীরবে আসেন নীরবে চলিয়া যান। কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া আপন কার্য্য সাধন ছলে কাহার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া যান, কে বলিবে?

শান্তি তাঁহাদের আবাস, ভাব তাঁহাদের সম্পদ্, ত্যাগ তাঁহাদের ভূষণ, বিশ্বাস তাঁহাদের সুহৃদ, প্রেম তাঁহাদের দান, ইঙ্গিত তাঁহাদের কৌশল, জীবন তাঁহাদের পরীক্ষা। জগৎ ও সমাজ তাঁহাদের চক্ষে অসীম ও অনন্তের অসম্পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া। জগৎকে তাঁহারা নীরবে ভালবাসেন—ইঙ্গিতে তাঁহাদের হিতের চেষ্টা করেন। ভাষা তাঁহাদের উপায়—ভাবের ব্যঞ্জনাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ভাবের অতুল সমুদ্রের মধ্যে প্রেমমণিলাভ ও আপামর সাধারণ লইয়া সেই মণির বিমল কিরণে জীবনের ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত্তগুলিকে আলোকিত করাই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহাদের প্রেম মহাব্রত চিতাভস্মে উদ্‌যাপিত হয়। মানব সমাজ সেই চিতাভস্মের উপর মঠ-স্থাপনে গৌরব অনুভব করে। অতীতের স্মৃতির চিতাভস্ম হইয়া; মানব তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। মহত্ত্বের অবশেষ ইহাই। ইহাই মহত্ত্বের পরিচয়, পরীক্ষা ও গৌরব!

এস আমরা মানব জাতির সেবক, ভগবানের প্রেরিত সেবা ও প্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তিকে হৃদয় আসনে বসাইয়া কবির সঙ্গে বলি :—

> Peace Peace! he is not dead,
> he doth not sleep.
> He hath awakened from the
> dream of life.
> He lives, wakes—'tis death is
> dead not he.
> (P. B. Shelly)

এস ব্রাউনিং, এস, মানবহৃদয় আসনে পবিত্র ভাবের উৎস হইয়া বস। মানবজীবনে মঙ্গল ও মধুরের মিলন দেখিয়া আমরা ধন্য হই। ইহাতে তোমার নামের প্রতিষ্ঠা হউক। সর্ব্বোপরি বিশ্বজনব্যাপী যে মহামনের তুমি অবতার এবং যাহার স্বেচ্ছাকৃত অলক্ষ্য শাসন ও নিয়মে যুগে যুগে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেম ও কর্ত্তব্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাঁহার অটল আসন সর্ব্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক, তিনি ধন্য হউন।

শ্রীআদিত্যনাথ মৈত্র।

পল্লীর বিচারালয়

সে দিন আমরা মালদহের একটী অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত গণ্ডগ্রামে উপস্থিত ছিলাম। শুনিতে পাইলাম, ঐ গ্রামে ঠিক ঐ দিবসেই 'বাইশী' নামক একটী মজলিস বসিবে। কথাটা যখন ঢোলের সাহায্যে পাড়াময় প্রচারিত হইতেছিল, তখনও তত আগ্রহ করিয়া উহার আভ্যন্তরিক ঘটনা অনুসন্ধান করি নাই। কথাটা কানে একটু নূতন নূতন ঠেকিয়াছিল মাত্র। ক্রমে আমরাও যখন অনুরুদ্ধ হইয়া মজলিসে যোগদান করিতে বাধ্য হইলাম, তখন আর কথাটা না জানিলেই বা কিরূপে চলিতে পারে! মজলিস ক্ষেত্রে

উপস্থিত হইয়া ক্রমে দেখিতে লাগিলাম—বিভিন্ন গ্রাম, পাড়া বা বস্তি হইতে বিভিন্ন রকমের লোক-সমাগম। প্রায় সকলের হস্তেই দেশীয় চতুষ্কোণ লণ্ঠনে কোপি-সংশ্লিষ্ট এক একটী আলো। যাহার অবস্থা এখনও ততদূর উন্নত হয় নাই, সে হয়ত শুকনা তুতের ডাঁটা মুঠা করিয়া তাহাই জালিয়া সত্বর-গমনে মজ্‌লিস স্থানে আসিয়া বিচিত্র সতরঞ্চ এবং কম্বলের উপর উপবেশন করিতে আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য যে, মজলিসে সকলের জন্য উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সমান আসন প্রস্তুত ছিল। ক্রমে মজলিস বেশ জমিয়া উঠিল। রাত্রি এক ঘণ্টা হইতে না হইতেই মজলিস-স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। লোকও নেহাত কম হয় নাই। গ্রাম্য "পাইট" (মজুর) নামক দৈনিক উপার্জ্জনজীবীও তথায় আসিতে বাদ পড়ে নাই।

উল্লেখিত দৃশ্য দেখা আমাদের এক কাজ থাকিলেও এত সময়ের মধ্যে "বাইশী" ও "ছত্রিশী" নামক দুইটী মজলিসের বিষয় সভারই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মোড়লের নিকট বিস্তৃতরূপে জ্ঞাত হইলাম। পরে বর্ত্তমান মজলিসের উদ্দেশ্যও আমাদের জানিতে বাকী রহিল না। ক্রমে আরও জানিলাম যে আজ না কি 'ছত্রিশী' মজলিসই বসিবে। 'বাইশী"র পরিবর্ত্তে 'ছত্রিশী' হইবে শুনিয়া আমরা ভাবিলাম—কি এক অভিনব কাণ্ড কারখানাই না জানি ঘটিবে, আমাদের আগ্রহও একটু বৃদ্ধি পাইল। মজলিসের বিস্তারিত বর্ণনার পূর্ব্বে সহৃদয় পাঠকবর্গকে 'বাইশী' এবং 'ছত্রিশী' কথা দুইটার তাৎপর্য্য বলা আবশ্যক।

'বাইশী ও ছত্রিশী মজলিস'

পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ মজলিসের মধ্যে 'ছত্রিশী'ই প্রধান। 'বাইশী' মজলিসকে পাড়াগাঁয়ের নির্দ্দিষ্ট জাতির নির্দ্দিষ্ট অপরাধীর জন্য সর্ব্ববাদী-সম্মত বিচারালয় বলা যাইতে পারে। হিন্দু মুসলমান এবং নমঃশূদ্র ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারিবারিক, সামাজিক কিংবা অন্য কোন রকমের অপরাধীর বিচার এই বাইশীর সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমরা এ কথাও শুনিলাম যে, কিছু দিন হইল একজন হিন্দু জনৈক মুসলমানের একটী গরুর খুর কাটিয়া দিয়াছে, এইরূপ গুরুতর বিষয়ও না কি পরবর্ত্তী 'ছত্রিশী' বৈঠকে মীমাংসিত হইবে। যেরূপ জানিলাম ও দেখিলাম, মালদহবাসীকে বোধ হয় খুব কমই গবর্ণমেণ্টের 'কোর্টফি' (court-fee) খরিদ করিতে হয়। এই মজলিসের সাহায্যে ছোট খাট এমন কি কখন খুব বড় রকমের বিবাদ ইত্যাদিও মিটিয়া থাকে। কাহাকেও ইংরেজবাজার বড় দৌড়াইতে হয় না।

'বিচারক'

'বাইশী' মজলিসের মধ্যে কয়েক জন বিভিন্ন গ্রামের মোড়ল (গ্রাম বা পাড়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) এবং প্রতি গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া বিচারকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। ইহাও সত্য যে হিন্দুর 'বাইশী'তে শুধু হিন্দুই উপস্থিত থাকেন এবং মুসলমান মুসলমানের 'বাইশী'তে উপস্থিত থাকিয়া নিজেদের বিচার কার্য্য সম্পন্ন করেন। হিন্দুকৃত 'বাইশী' মজলিসের কোন নিয়ম কিংবা আদেশ মুসলমানসমাজের উপর বর্ত্তে না। আবার মুসলমান-অনুষ্ঠিত মজলিসের দ্বারাও হিন্দুদের বিচার-কার্য্য চলিতে পারে না।

এক আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিলাম—এখানকার হিন্দু মুসলমানের আলোচ্য বিষয়ে সহানুভূতি। জাতিগত বিদ্বেষ কোন সম্প্রদায়কেই স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমরা যে স্থানের বিষয় বলিতেছি, তথায় মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যাই খুব বেশী, কিন্তু তাই বলিয়া অল্প-সংখ্যক মুসলমানকে সম অধিকার হইতে কোন ক্রমেও বঞ্চিত হইতে হয় না। প্রত্যেক মজলিস বসিবার পূর্ব্বে গ্রামের জনৈক ভারপ্রাপ্ত মোড়ল ঢোল দ্বারা সাধারণে ঐ কথা এবং নির্দ্দিষ্ট তারিখ প্রচার করিয়া দেয়। যদি কেহ স্বেচ্ছাক্রমে মজলিসে উপস্থিত না হয়, তবে তাহাকে নিজ অপরাধের জন্য মজলিস্ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট জরিমানা বা শাস্তি ভোগ করিতে হয়। এ ব্যাপারে সময়ে সময়ে কাহারও বা সমাজ বন্ধ করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক লৌকিক নালিশে বাদী সর্ব্বসমক্ষে যোড়হস্তে গলবস্ত্র হইয়া নিজ আবেদন জ্ঞাপন করে। প্রত্যেক আবেদনই অপক্ষপাতিত্ব ক্রমে মজলিস কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। আবেদন উত্থাপন মাত্র মজলিসের নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বাদীর আরজি এবং বাদী-বিবাদিগণের নাম-ধাম এবং সাক্ষী ইত্যাদির কথা কাগজ-পত্রে লিখিয়া লন। মজলিসস্থ নির্দ্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট লোকের নির্দ্দিষ্ট উপাধি আছে। যে কোন ব্যক্তিকে মজলিস কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপাধি বংশানুক্রমে ভোগ করিতে দেখা যায়। মোকদ্দমা বিচারে উঠিলে, প্রধান মোড়ল অথবা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বিচারক, বাদী, বিবাদী এবং সাক্ষী হাজির আছে কি না, মজলিসস্থ নির্দ্দিষ্ট ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিতে আদেশ করেন। সকলে হাজির থাকিলেই সেই দিন বিচার কার্য্য আরম্ভ করেন, পরন্তু এক পক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে সেই দিনকার জন্য বিচার-কার্য্য বন্ধ রাখিয়া অনুপস্থিত পক্ষের প্রতি এতদর্থে সংবাদ পাঠান যে, আগামী মজলিসে যেন সকল পক্ষ উপস্থিত থাকে। সময়ে সময়ে বাদী-বিবাদীকে অবকাশও দেওয়া হয়।

‘বিচার-কার্য্য’

বিচারের পূর্ব্বে সাক্ষী এবং বাদী বিবাদীকে ‘হলপে’র ন্যায় প্রতিজ্ঞা পাঠ করান হয়, মজলিসস্থ অন্যান্য মোড়ল এবং গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণ উকিলের কার্য্য করিয়া থাকেন, এ ওকালতিতে পসার নাই, বাদী ও বিবাদীপক্ষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উকিল নির্দ্দিষ্ট হয় না। ঘাট্‌মত সকলেই সকলের মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, বাদী কিংবা বিবাদী কাহাকেও এজন্য উকিল-গণের হস্তে পশ্চাদ্দিক হইতে রজতখণ্ড স্থাপন করিতে হয় না। বাদী ও বিবাদী উভয়কেই মোকদ্দমা দায়ের করিবার জন্য এক এক টাকা নজর দিতে হয়। কোন কারণে তাহাদের বিচার ঐ দিবস সমাধা না হইলে তাহাদিগকে দ্বিতীয় বারের জন্য নজরের টাকা দিতে হয় না। মজলিসের সর্ব্ব-সম্মতি-ক্রমে অপরাধীর বিচার-কার্য্য শেষ হইলে ইঙ্গিতক্রমে প্রধান মোড়লকর্ত্তৃক রায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এ কার্য্যে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির অধিকার নাই।

‘অপরাধীর দণ্ড’

অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অপরাধের দণ্ড-স্বরূপ টাকা জরিমানা দিতে হয়। কাহাকেও বা ভূখণ্ড ইত্যাদি দ্বারাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু যাহারা দৈনিকশ্রমজীবী (day-labourer) তাহাদিগকে অগত্যা টাকার

পরিবর্ত্তে অপরাধের গুরুতানুযায়ী পাঁচ, সাত বা ততোধিক দিবসের জন্য পাইট (মজুর) খাটা বন্ধ রাখিতে হয়। বাস্তবিকই এ কার্য্য বেচারা শ্রমজীবিগণের পক্ষে গুরুতর। কাহাকেও দৈহিক শাস্তি (corporal punishment) দেওয়া হয় না।

'জরিমানার টাকার সদ্ব্যয়'

হিন্দু 'বাইশী' মজলিস কর্ত্তৃক আদায় জরিমানার টাকা দ্বারা হিন্দুদিগের এবং মুসলমান কর্ত্তৃক আদায়ী জরিমানার টাকা দ্বারা মুসলমানদের সৎকার্য্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমাধা হইয়া থাকে। বিচারের পূর্ব্বে বাদী ও বিবাদীকে "এই মজ্‌লিসকে তুমি কি বলিয়া জান?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহারা সকলে সত্য এবং ভগবানের আদালত বলিয়া উহাকে স্বীকার করে। শুনিলাম, এই মজ্‌লিসের বিচার না কি সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত দণ্ডবিধিদ্বারাও অবহেলিত হয় না। যদি কোন বিশেষ কারণবশতঃ ইহাদের কোন মোকদ্দমা বিচারার্থ আদালতে পৌঁছে, তথাপি বিচারক কর্ত্তৃকও পূর্ব্ব রায়ের অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্ত্তন হয় না। মজ্‌লিসকর্ত্তৃক বিচারিত কোন মোকদ্দমা গবর্ণমেণ্টের আদালতে পৌঁছিলে, মোকদ্দমা-উত্থাপনকারীর পক্ষে সাক্ষী ইত্যাদি সংগ্রহ করা বড়ই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কেন না তাহাদের নিজ নিজ মজ্‌লিসের অবমাননার ভয়ে সকলেই সাক্ষী হইতে নারাজ। কাজেই এরূপ কোন মোকদ্দমাই বড় একটা সহরে পৌঁছে না। 'বাইশী' মজ্‌লিসে না কি বাইশ-পল্লীর বাইশ জন মোড়লের উপস্থিতি আবশ্যক। এ কথার সত্যতা সর্ব্বাংশে খাঁটি না হইলেও অনেক মোড়লের উপস্থিতি যে সম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। মজলিসকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত নূতন ব্যবস্থা ঢোলদ্বারা গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত মজ্‌লিসের নিকট উক্ত ব্যবসায়ীর কিছু প্রাপ্যও আছে।

এক্ষণে আমরা 'ছত্রিশী' মজলিসের বিবরণ বলিব। 'ছত্রিশী' মজলিসের বিচারক এবং বিচার-কার্য্য ঠিক বাইশীরই অনুরূপ, কোন পার্থক্য নাই। এতদুভয়ের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহা এই যে, ছত্রিশীতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান ইত্যাদি ছত্রিশ জাতীয় লোক উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে একই সামিয়ানার নীচে একই ফরাসে উপবেশন করিয়া যে কোন জাতির অন্তর্গত অপরাধীর বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এখানেও সকলে একত্র হইয়া বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করে এবং প্রধান মোড়লকর্ত্তৃক রায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিচারে অবধারিত জরিমানার টাকা দ্বারা হিন্দুমুসলমান সর্ব্বসাধারণের সৎকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। কেহ ঐ সম্মতিক্রমে বিচারকৃত দণ্ডাজ্ঞার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারে না, করিলে তাহারও স্বতন্ত্র দণ্ড আছে। হিন্দু-মুসলমান, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ সকলেরই এ ক্ষেত্রে সমান আসন, সমান সম্মান এবং সমান অধিকার। হিন্দু বলিয়া কেহ ভাল বিচার করিল, আর মুসলমান বলিয়া কেহ খারাপ বিচার করিল, এরূপ গোলমাল হইবার আশঙ্কা মাত্রও নাই।

আমরা যে সমবেত ছত্রিশ জাতির সম্মিলন অর্থাৎ 'ছত্রিশী মজ্‌লিস' দেখিলাম, তাহাতে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে কোন মনোমালিন্য লক্ষিত হইল না। আমরা আগ্রহের সহিত তাহাদের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়

তাহারা বলিল যে,—"আপনারা সভ্য এবং শিক্ষিত বলিয়া রাশি রাশি কথা বলিতে পারেন, আপনাদের ন্যায় আমরা বক্তৃতা করিতে জানি না, আমাদের এ একতা এবং সম্মিলন স্বদেশী আন্দোলনের ফল নহে,—ইহা আমাদের বহুদিনকার নিজ হাতের গড়া জিনিস।" পাড়াগাঁয়ের একজন অশিক্ষিত লোকের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া বোধ হয় অনেকেই আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখুন,—ইহা কি সরল কথা, কি সুন্দর এবং মূল্যবান উপদেশ। বাস্তবিক ইহা কি আমাদের নিজ হাতের গড়া,—আমাদেরই আর্য্য-সভ্যতার একটা সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ নয়?

'ছত্রিশী বৈঠকে' সেদিন আমরা যে সকল বিচার-কার্য্য দেখিলাম তাহাদের মধ্যে তিনটাই কৌতূহলোদ্দীপক এবং সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'কয়েকটী মোকদ্দমার বিচার-কার্য্য'

প্রথম নম্বরের মোকদ্দমায় একজন বিদেশীয় পাইট (মজুর) বাদী, জাতিতে নমঃশূদ্র। বাদী যখন একাকী এক তুত্‌ক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তখন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রে অন্যান্য দশজন পাইট (মজুর) একই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। ইহারা বিবাদী, জাতিতে মুসলমান। বিবাদিগণ প্রথমতঃ তামাকের অছিলায় বাদীর নিকট উপস্থিত হইয়া জোর করিয়া তামাক আদায় করিয়া লয়। ফলে বাদী তামাক দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় বাদী ও বিবাদীতে বচসা হয়, পরে বিবাদিগণ বাদীর দুই হস্ত বদ্ধ করিয়া গুরুতর প্রহার করে। প্রহারে বাদীর দেহ জখম হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ঘটনাস্থলে কতিপয় সাক্ষী জুটিয়াছিল। বিচারে বিবাদিগণের মোটের উপর পঁচিশ টাকা জরিমানা হয়। এ স্থলে মুসলমানের বিচারক মুসলমানই ছিল। তবুও বিচার-কার্য্যে পক্ষপাতিত্ব-দোষ ঘটে নাই অথবা বিচারে কেহ মনঃক্ষুণ্ণ হয় নাই। জরিমানার টাকাও ঐ মজলিসেই আদায় হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মোকদ্দমায় কোন গোয়ালা ভ্রাতৃদ্বয় বিবাদী এবং তাহাদের পিতৃমাতৃহীন ভাগিনেয় বাদী। বিবাদিগণ বাদীকে আশৈশব প্রতিপালন করিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত দিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে তাহারা বিনা দোষে উহাকে জীবিকা-নির্ব্বাহোচিত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে। বিচারে বাদী বিবাদিগণের নিকট হইতে উর্ব্বরা দেড় বিঘা তুতের ভূমি দান-স্বরূপ পাইয়াছে। আইনানুযায়ী কিন্তু এরূপ দাবী চলিত না। কিন্তু আইন এবং সর্ব্বসাধারণের মত এক নহে। এখানে আমরা দেখিতেছি আইন অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণের বিচারই বাঞ্ছনীয়। এ প্রকার গণশক্তির প্রাধান্য আজ কয়টী জায়গায় আছে? কয়জন শিক্ষিত ব্যক্তি এরূপ হাকিম মান্য করিতে পারেন? হায়! এ দেশকে না কি লোকে আবার অনুন্নত বলে! উন্নত দেশ এখন অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু উন্মীলন করিয়া একবার অনুন্নত মালদহের এই গ্রাম্য বিচারের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

তৃতীয় মোকদ্দমায় সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার। স্থানীয় পাইটগণ (মজুর) নিয়মিত সময়ে কার্য্যে যাইত না এবং সময় না হইতেই ক্ষেত্র হইতে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইত। সর্ব্বসাধারণ দেখিলেন এই নিমিত্ত কৃষিজীবীর অনেক অসুবিধা এবং অনর্থক অর্থক্ষয়। সুতরাং

ইহাদের বিচারে এই স্থির হইল যে, পাইট-গণ (মজুর) সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রে যাইবে এবং বার ঘটিকার সময় কার্য্য বন্ধ করিয়া অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় পুণরায় কাজ আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিবে। যদি কোন পাইট (মজুর) ইহার ব্যতিক্রম করে, সে সেদিন-কার মজুরী পাইবে না। আর যদি কোন লোক নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তে পাইট (মজুর) দ্বারা কাজ করান, সে এক শত টাকার মুচলেখা দিবে। মজলিসের পর দিবস চির-প্রথানুযায়ী গ্রামে গ্রামে ঢোল দ্বারা এই আদেশ প্রচার করা হইল। শ্রমজীবী সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর বিশেষতঃ বরিশালের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে স্থাপন করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা বরিশালবাসীকে এই প্রথার প্রতিষ্ঠা করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি। এ জেলার কোন কোন স্থানে বেলা নয় ঘটিকার সময় মজুরগণ ক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকে। মালদহে এই প্রথা যে কোন বিশেষ বিশেষ পল্লীতেই আবদ্ধ আছে এমন নহে। এ স্থানে সর্ব্বত্রই এরূপ বিচারালয়ের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। আগেকার দিনে সামাজিক শাসনেরই প্রাধান্য ছিল। ইহার সুফলে কাজিদেরও অনেকটা আয়াসের লাঘব হইত।

'ছত্রিশী' মজলিসে হিন্দু-মুসলমানের এক আশ্চর্য্য সম্মিলন দেখিলাম। সে দিন সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বিচার-কার্য্য চলিয়াছিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও কাহাকে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে দেখি নাই।

যে বিচারে ছত্রিশ জাতির সমান অধিকার তাহা ছত্রিশী মজলিসে সমাধা হয়। 'বাইশী' দ্বারা যদি কোন মোকদ্দমার সুবিচার না হয় তবে তাহাও ঐ 'ছত্রিশী'র সাহায্যে সমাধা হইয়া থাকে। সাধারণ ভাবে বিচারের পর দুই একটী মোকদ্দমা ক্রমে তাহাদেরই অনুষ্ঠিত উচ্চ আদালত (High Court) এবং আপিলেও পৌছিতে দেখিলাম। একই বিচারক নিম্ন আদালত (Small Cause Court), উচ্চ আদালত (High Court) এবং আপিলের বিচার কার্য্য করিয়া থাকেন। গুরুতর বিচার্য্য বিষয়ের রায় ইত্যাদি কাগজ-পত্রে লিখিয়া রাখা হয়। এ ব্যাপারে এমন নিরাবিলভাবে, হিন্দু মুসলমানের এমন পবিত্র সম্মিলন, শিক্ষিতাভিমানী দেশে খুব কমই লক্ষিত হইয়া থাকে।

আশ্বিন মাসের 'গৃহস্থে'র আলোচনাংশে "জনসাধারণের মনুষ্যত্ব" সম্বন্ধে সত্য সত্যই লিখিত হইয়াছে,—"সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা শিক্ষার সুযোগ পাইয়াও স্ব স্ব সমাজে যে কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেছেন না, দেখা যায়, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সম্পূর্ণ নিরক্ষর থাকিয়াও তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে। শিক্ষিতগণ বিদ্যুদ্ব্যজন ও বৈদ্যুতদীপ-পরিশোভিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সভাসমিতি স্থাপন করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ সঙ্কল্প ও প্রস্তাব করিয়া এবং সংবাদ-পত্র-সমূহের লেখনিপ্রভাবে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া, বহুদিবসেও সমাজের যে সংস্কার করিতে সমর্থ না হন, নিরক্ষরগণ মলিন পর্ণশালায় একটী মাত্র বৈঠক বসাইয়া নিমেষ মধ্যে তাহা অপেক্ষা অধিকতর কার্য্য করিতে পারে। ইহারা যাহা হিত বা অহিত বলিয়া ধারণা করে, তাহা গ্রহণ বা বর্জ্জন করিবেই, সে শক্তি তাহাদের আছে। ব্যক্তিগত ক্ষতি হইলেও সমগ্র সমাজের

মঙ্গলের জন্য তাহা তাহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, অথবা অনিচ্ছা থাকিলেও সমগ্র সমাজের প্রভাবে তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। দশের নিকট তাহারা অবনত। দশের কথা শুনিতে তাহারা বাধ্য। গণশক্তিকে না মানিয়া তাহাদের উপায় নাই। গণের নিকটে ব্যক্তিকে অবনত থাকিতে হইবে। ইহা তাহাদের যুক্তিমূলক প্রাচীন সংস্কার।” আমাদেরও এ সম্বন্ধে ঐ একই কথা। কার্য্য-ক্ষেত্রেও চাক্ষুষ তাহাই দেখিতেছি।

আমরা যে কেবল 'দেশের উন্নতি করিব' 'দেশের উন্নতি করিব' বলিয়া ডাক হাঁক তুলিয়া অযথা বাক-চাতুর্য্যে অনেকটা সময় ক্ষেপণ করিয়া থাকি, ঐ সময়টা যদি প্রতি জেলায় প্রতি পল্লীতে উপস্থিত হইয়া, পল্লী-বাসীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কথার আদান প্রদান করিয়া অশিক্ষিতদের জীর্ণ নিয়ম ও অনুষ্ঠানগুলিকে জোড়া গাঁথা করিয়া ষোল আনা জিনিসে পৌঁছাই, তবেই আমাদের বলিবার মত কতকগুলি প্রাচীন সামাজিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ বজায় থাকিয়া যায়। কিন্তু হায়! আমরা ঘোড়া কিনিবার বেলাই অর্থের বাহুল্য দেখাইতে পারি, কিন্তু লাগাম কিনিবার সময়ে একেবারে নিঃস্ব হইয়া যাই। ডাক্ হাঁকের বেলা যথেষ্ট, কাজের বেলা,—“আমি নামিয়াছি, তুমিও আইস” “আমি চলিতেছি তুমি ও চল” এ কথা বলিতে পারেন এমন লোক, এমন জননায়ক আমাদের মধ্যে খুব অল্পই আছেন। সুখের বিষয় দেখিতেছি, আজ কাল পতিত দেশের উন্নতিকল্পে যত রকমের অনুষ্ঠান এবং তৎসাধন কল্পে যত রকমের কর্ম্মীর আবশ্যক, আধুনিক অনুষ্ঠান, কর্ম্মী এবং কর্ম্ম-পদ্ধতির মধ্যে তাহার অনেকটা আভাস দেখা যায়। কিন্তু এখন এমন কতকগুলি লোকেরও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে,—যাহারা শুধু নিঃস্বার্থ নয়, স্বার্থহীনতার সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাক, অথচ অক্লান্তকর্ম্মা,—অযথা বাক্‌চাতুর্য্যে আদৌ অক্ষম,—খবরের কাগজে কলম চালাইতে অনিচ্ছুক,—চালকের অধীনেই কার্য্য করিতে সক্ষম, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই চালক হইতে নারাজ। আমাদের এ দাবী সমাজের বৃদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট আশা করা যায় না। অপরিপক্কবুদ্ধি, চলচ্চিত্ত বালক-সম্প্রদায় দিয়াও এ কাজ সম্পন্ন হইবে না। কেবল যুবক-সম্প্রদায়ই এ কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যুবক কর্ম্মিগণকে প্রতি জেলার 'সেকেলে' শিক্ষিত পাড়াগাঁয়ে উপস্থিত হইয়া, যাহাতে “সেকেলে” ভাবগুলি বজায় রাখিতে পারে,—যাহাতে জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, আমাদের আলোচ্য বিচার-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা, হিন্দুমুসল-মানের সমশিক্ষা-মন্দির স্থাপন এবং সমান-অধিকার-প্রদান,—কৃষকগণকে কৃষি-বিদ্যা সম্বন্ধে দুই চারিটী নূতন পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া, কৃষকদিগের স্ব-স্ব পরিশ্রমোপার্জ্জিত শস্যের “সমবায় বিক্রয়” এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যের “সমবায় ক্রয়”-পদ্ধতি-স্থাপনের জন্য উপদেশ দান করা যায়, সে নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। 'পাড়াগেঁয়ে' সাধারণ সম্প্রদায় এবং কৃষকগণই দেশের লোক। আর সকল ভুলিয়া গিয়া ইহাদের শিক্ষা, ইহাদের নিয়ম-কানুন, আচার-ব্যবহার এবং মনের ভাব-গুলিকে পোষণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য। সহরের সভ্যতায় পোকা ধরিয়াছে। উহা শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে হইবে। সহরে দ্বিতল, ত্রিতল বাসা-বাড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া পল্লীতে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পল্লীস্থ ভাইগুলির তন্দ্রামাখা নেত্রে বারি

শিক্ষন দ্বারা জাগাইতে হইবে। আমরা দেশ দেশ করিয়া চেঁচাইয়া মরি, আমাদের দেশ কোন্ জায়গায়? দেশ ত—পল্লী।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার সরকার।

বৃহদ্‌মস্তিষ্কত্বকই (cerebral cortex) যে জ্ঞান, সংজ্ঞা, ইচ্ছা, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা ও স্মৃতির আকার সে কথা বহুকাল হইতেই জানা আছে। মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় নানা প্রকার রোগ হইতে ও অপুষ্ট মস্তিষ্ক হইতে এ সম্বন্ধে নানা প্রকার সত্য নির্ণীত হইয়াছে ও হইতেছে। যাহার মস্তিষ্ক যতটুকু অপুষ্ট তাহার সেই পরিমাণেই জড়মতিত্ব (idiocy), কোন বিশিষ্ট অংশ অপুষ্ট থাকিলে এই জড়মতিত্ব আংশিক ভাবেই লক্ষিত হয়। রোগে বা দৈবক্রমে মস্তিষ্ক-ত্বক্ কোনও প্রকারে নষ্ট হইলে স্মৃতিলোপ, অল্লাধিক পরিমাণে সংজ্ঞা-লোপ ঘটিতে দেখা যায়। এ সকল ক্ষেত্রে বিবেকশক্তি তিরোহিত হয়, এমন কি অনেক সময় ইচ্ছা করিলেও কার্য্য করা যায় না। এগুলি কি কারণে ঘটিয়া থাকে সে সম্বন্ধে আমরা একটু আলোচনা করিব।

বৃহদ্‌মস্তিষ্কের উচ্ছেদ

বিজ্ঞান কোনও কথাই মানিয়া লইতে চাহে না। অমুক এইরূপ পরীক্ষা করিয়া এই ফল পাইয়াছিলেন কাজেই আমাকে আর দেখিতে হইবে না—এ শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত বিজ্ঞানে নাই। তিনি কি দেখিয়াছিলেন, আমাকেও দেখিতে হইবে—বিজ্ঞানের মূলে এই মহামন্ত্র নিহিত আছে। কাজেই মস্তিষ্কের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরীক্ষা করিতে হইবে। সমস্তই হাতে কলমে করিতে হইবে। আমাদের অনুরোধ যে পাঠকগণও যেন কিছু কিছু পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

পরীক্ষা করিতে হইবে বলিয়া কেহ নর-কুলের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন না। মনুষ্যের মস্তিষ্কের উচ্ছেদ করিলে কি ঘটিবে পরীক্ষা করিবার জন্য যদি কেহ নরহত্যা করেন তাহা হইলে তাঁহার মস্তিষ্কের না হইলেও মস্তকের উচ্ছেদ হইবে বটে। কাজেই পরীক্ষাটা নিরীহ জীবকুলে আবদ্ধ থাকাই শ্রেয়ঃ। বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে যে সমস্ত নিরীহ জীব পাওয়া যায়, তাহাদের উপর পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। তবে মনুষ্যের রোগ হইলে এবং রোগীর মৃত্যুর পর নানা প্রকার পরীক্ষা করা হয়। দৈববশে মস্তিষ্কের কোনও ক্ষতি ঘটিলেও পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।

এক্ষণে সর্ব্বপ্রথমেই পরীক্ষাটা ভেকের উপর দিয়া হউক। পৃথিবীর সর্ব্বত্রব্যাপী এই নিরীহ জীব তত্ত্ববিদের পরীক্ষার জন্য যে অকাতরে প্রাণ দিয়াছে ও দিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যখনই কোন জীবের উপর পরীক্ষা করা আবশ্যক বোধ হয়, তখনই এই নিরীহ হতভাগ্য জীবকে মনোনীত করা হয়।

ভেকের মস্তিষ্ক পৃষ্ঠদেশ হইতে

O.L – olfactory lobe. = Ch. – cerebral hemispheres. P. – Pineal Body. Op.L.—optic thalami. Cb. –

redimentary cerebellum. M.O.= Medulla oblongata.

Goltz, Flourens, Ferrier, এই সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। Corpora striata ও optic thalamiএর সহিত বৃহদ্মস্তিষ্কের উচ্ছেদ করিলে ভেকের সাম্যাবস্থার equillibrium) কোনও প্রকার ব্যাঘাত হয় না। নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া এই সাম্যাবস্থার ব্যাঘাত ঘটান কিছু দুরূহ। এইরূপ অবস্থায় ভেককে পিঠের উপর শুয়াইয়া দিলে নিজে উল্টাইয়া পায়ের উপর ভর দিয়া সাধারণ জীবের মত বসিয়া থাকে। একটি তক্তা বা পেষ্ট বোর্ডের উপর রাখিয়া আস্তে আস্তে উল্টাইবার চেষ্টা করিলে নিজের অবস্থা ঠিক রাখিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে দেখা যায়। পায়ে চিমটি কাটিলে বা আঘাত করিলে লাফাইয়া পলাইয়া যায়। জলে ফেলিলে অক্লেশে সাঁতার দিয়া জল পার হইয়া নিরাপদ স্থানে পৌছিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। পৃষ্ঠদেশে আস্তে আস্তে টোকর দিলে টোকরের তালে তালে স্বাভাবিক ডাক ডাকিতে থাকিবে। এ সমস্ত বিষয়ে সাধারণ ভেক হইতে পার্থক্য কি বলা বড় কঠিন। জলে ফেলিয়া আস্তে আস্তে জলের উত্তাপ বাড়াইয়া সিদ্ধ করিয়া মারা দুষ্কর; অসহ্য হইলেই ইহা লাফাইয়া পলাইবে। কিন্তু যে ভেকে Spinal cord ও Medulla ব্যতীত আর সব অংশের উচ্ছেদ করা হইয়াছে, তাহাকে এইরূপে সিদ্ধ করা অতি সহজ। করুণহৃদয় পাঠক এ সমস্ত অত্যাচার-কাহিনী পাঠ করিয়া বোধ হয় বৈজ্ঞানিকদের গাল পাড়িতেছেন। কিন্তু তাঁহারা বৃথা আমোদ বলিয়া মনে করিয়া এ সব কার্য্য করেন না। জ্ঞানের জন্য, নরকুলের হিতের জন্যই এই সব করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা ক্ষমার পাত্র।

এক টব জলের নিম্নে ডুবাইয়া ধরিলে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে, এমন কি Pneumatic trough জলপূর্ণ বসান cylinder হইতে বেশ বুদ্ধিমত্তার সহিত নামিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিতে পারে। সর্ব্বকার্য্যেই ইহাদের একটা বেশ শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়। ইহারা বেশ বুদ্ধিমানের ন্যায় প্রতিবন্ধক এড়াইয়া লাফাইয়া পলায়। এ সব বিষয়ে মস্তিষ্কহীন ভেকের কোনও বিশেষত্ব দেখা যায় না। একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে, বাহ্যিক কোন কিছুর দ্বারা উত্তেজিত না হইলে এক স্থানে বসিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। আর একটি বিশেষত্ব এই যে, স্বেচ্ছাপ্রসূত সর্ব্ব কার্য্যের বিলোপ ঘটিয়া থাকে; পূর্ব্বের স্মৃতিরও বিলোপ ঘটে। পূর্ব্বে যে কারণে ভয় পাইয়া লুকাইয়া পড়িত বা পলাইত এখন আর তাহা গ্রাহ্য করে না। যদি অতি সন্তর্পণে গায়ে হাত দেওয়া যায় তাহা হইলে বেশ শান্তভাবে বসিয়া থাকে, তবে হঠাৎ ক্ষিপ্তভাবে গায়ে হাত বা অন্য কিছু লাগাইলে বা চক্ষের সম্মুখে কিছু নাড়িলে লাফাইয়া পলায়। খাদ্যের মধ্যে থাকিয়াও ইহারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করে; তবে ইহাদের মানসিক কোন কষ্ট ও ইচ্ছা কিছুই থাকে না।

কিন্তু যদি বৃহদ্মস্তিষ্কের সহিত Optic-thalamiএর উচ্ছেদ করা না হয় তাহা হইলে আরও বিস্ময়জনক ফল পাওয়া যায়। ইহাদের স্বেচ্ছাবৃত্তির কোনরূপ বিলোপ ঘটে না, তখন ইহারা স্বেচ্ছামত লাফালাফি করিতে পারে। সাধারণভাবে পোকা-মাকড় ধরিয়া

ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। শীতের সময় গর্ত খুঁড়িয়া শীতের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করে। আবার বসন্তের প্রারম্ভে গর্ত হইতে বাহির হইয়া জীবন যাপন করে এবং যথাকালে ডিম্বাদি প্রসব করিয়া বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু বৃহদ্‌মস্তিষ্কের সহিত optic thalami-এর উচ্ছেদ সাধনে সবগুলির বিলোপ না হইয়া অনেক সময়ে কার্য্যকারিতার হ্রাস পাইয়া থাকে। ভেকের বৃহদ্‌মস্তিষ্কের পুষ্টি অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার ত্বকের উপর কেবল 'এক থাক' মাত্র স্নায়ুকোষ বা nerve-cll আছে, কিন্তু thalami এই জীবের সমস্ত চলন-শক্তির উৎপত্তি-স্থান বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের (tactile sensation) ইহার যোগ আছে, আর এই জন্ত এই দুই প্রধান ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করে।

এতক্ষণ আমরা ভেকের কথা বলিলাম, এইবার মৎস্তের কথা বলা হইতেছে। এক কথায় মৎস্তেরও ভেকের ন্যায় ঘটিয়া থাকে। উচ্ছেদের পর মৎস্তের জলে স্বীয় সাম্যাবস্থা রক্ষণ বিষয়ে কোনরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। ইহারা লেজ নাড়িয়া ও ডানার সাহায্যে পূর্ব্বের ন্যায় স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে পার্থক্য এই যে মস্তিষ্কহীন মৎস্ত অনবরতই ঘুরিয়া বেড়ায়; ইহাতেও একটা শৃঙ্খলা আছে। ইহাদের পথে কোন প্রতিবন্ধক দিলে বেশ সহজে এড়াইয়া চলিয়া যায়। কোন প্রকার নাড়াচাড়া না দিলে একদিক হইতে সোজা অন্যদিকে চলিয়া আসিবে এবং যতক্ষণ না অবসাদ আসে ততক্ষণ ক্রমাগত এইরূপ কিনারা হইতে কিনারা ঘুরিয়া বেড়ায়। দেখিলে মনে হয়, কোন এক অচ্ছেদ্য বন্ধনের দ্বারা নীত হইতেছে। কিন্তু সাধারণতঃ মৎস্ত এরূপ করে না, এপাশ ওপাশ ভাসিয়া বেড়ায়, কোন কিছু খাদ্য ঠুকরাইতে থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে ভেকের স্থির হইয়া বসিয়া থাকা, আর মৎস্যের অনবরত চলা ফেরা করায় একটা বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়; কিন্তু ইহার কারণ এই যে, ভেককে সর্ব্বক্ষণ উত্তেজিত করিবার বাহ্যিক কোন কিছুই নাই; কিন্তু মৎস্তের মস্তিষ্ক জলের স্রোতে উত্তেজিত হয় বলিয়াই অবসাদ না আসা পর্য্যন্ত ইহারা ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়ায়।

অস্থিময় মৎস্তের (osseous fishes) এবং যাহাদের বৃহদ্‌মস্তিষ্কের সহিত optic thalami and corpora striata নষ্ট করা হয়, কেবল সেই সমস্ত মৎস্তের উপরোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু কেবল বৃহদ্‌মস্তিষ্ক ও corpora striata নষ্ট করিলে সাধারণ মৎস্ত হইতে ইহাদের বিশেষ কোন বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না; তখন ইহারা খাদ্যের অন্বেষণে বেশ ঘুরিয়া বেড়ায় এবং খাদ্যের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারে। সাধারণ মৎস্তের ন্যায় কিছু পাইলে ঠুকরাইতে থাকে।

উপাস্থিময় (cartilagencons fishes, Elasmobranch) মৎস্তের কিন্তু ঠিক বিপরীত ঘটিয়া থাকে। হাঙ্গরের কেবল বৃহদ্‌মস্তিষ্ক ও corpora striata উচ্ছেদ করিলে জন্তুটি একেবারে জড়ের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইহার কারণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই এই সমস্ত জন্তুর একমাত্র জীবন-যাপনের অবলম্বন। বৃহদ্‌মস্তিষ্কের উচ্ছেদের সঙ্গে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে।

Rolando, Vulpain, Floureus, প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ কপোতের

মস্তিষ্কের উচ্ছেদের ফলাফল বিবৃত করিয়াছেন। মস্তিষ্কহীন কপোত বেশ সাম্যাবস্থায় থাকে এবং কোন প্রকারে এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হইলে ডানা নাড়িয়া বেশ পুনরুদ্ধার করিয়া লয়। পৃষ্ঠের উপর শুয়াইয়া দিলে পায়ের উপর ভর দিয়া বসে। ধাক্কা দিলে বা ফুটাইলে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু কোন প্রকার বিরক্ত না না করিলে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকে। উড়াইয়া দিলে সাধারণ কপোতের স্থায় উড়িতে থাকে। অতি সামান্ত আঘাতে নিদ্রা নষ্ট করা যাইতে পারে এবং চক্ষু উন্মোচন করান যাইতে পারে। কখনও কখনও বাহ্যিক উত্তেজনা না থাকা সত্বেও চক্ষু চাহিয়া থাকে; কখনও দুই এক পা চলে, কখনও বা একপায়ের উপর ভর দিয়া বসিয়া থাকে। মাথায় মাছি বসিলে মাথা নাড়িয়া উড়াইয়া দেয়; নাকের সম্মুখে এমোনিয়া ধরিলে পিছাইয়া যায়। চোখে আঙ্গুল দিবার ভাণ করিলে চক্ষু বুজিতে থাকে ও পিছাইয়া যায়, মাথার কাছে পিস্তলের আওয়াজ করিলে হঠাৎ চমকিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া থাকে।

কিন্তু প্রত্যেকবার বাহ্যিক উত্তেজনা সরাইয়া লইলে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয় স্বেচ্ছায় ইহারা বড় কোন কাজ করে না। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইহাদের স্মৃতির বিলোপ ঘটিয়া থাকে। উত্তেজিত করিলে ঠোঁট ও ডানার সাহায্যে বাধা দেয়, কিন্তু পলাইবার চেষ্টা করে না; খাদ্যাদি দিবার সময় সহজে ঠোঁট ফাঁক করিতে দেয় না, কিন্তু একবার ফাঁক করিলে বেশ সহজে খাইয়া থাকে। এইরূপে খাওয়াইলে কয়েক মাস বাঁচাইয়া রাখা যায়, তাহা না হইলে মৎস্য ও ভেকের স্থায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাকবি ভাস-বিরচিত অবিমারক নাটক

আমরা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি—"ভাসো হাসঃ।" * অর্থাৎ মহাকবি ভাস এবং কবিতা-কামিনীর মৃদু-মধুর হাস্য পরস্পর বিভিন্ন নহে। তাঁহার শুভ্রতা এবং মাধুর্য্য এতই বেশী। কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরাও তাঁহাকে প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া সম্মান করিতেন। সেই মহাকবি ভাস-প্রণীত একখানি নাটকের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই মহাকবির প্রণীত কোনও কাব্য বা মহাকাব্য আছে কি না তাহা জানিতে পারা যায় নাই। ভাস কবি নাটকের জন্যই চির-প্রসিদ্ধ; সপ্তম শতাব্দীর মহাকবি বাণভট্টও

"সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশোলেভে ভাসো দেবকুলৈরিব॥"

এই শ্লোকটী দ্বারা ভাস কবিকে প্রসিদ্ধ নাটক-প্রণেতা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। সর্ব্বত্র সূত্রধার কর্ত্তৃক নাটকের আরম্ভ

* যস্যা শ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপুরোময়ূরো, ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তুবাণঃ কেষাং নৈষা কথয় কবিতা-কামিনী কৌতুকায়॥
(প্রসন্নরাঘব নাটক)

প্রদর্শন এই কবির বিশেষত্ব, প্রচলিত সংস্কৃতনাটকসমূহ অপেক্ষা আরও অনেক বৈলক্ষণ্য ভাস প্রণীত নাটকসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত বিষয় অবসর মত প্রদর্শিত হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভাস প্রণীত "অবিমারক" নাটকের পরিচয় প্রদত্ত হইবে। সম্প্রতি দাক্ষিণাত্য হইতে ভাস প্রণীত কয়েকখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে, ইতঃপূর্ব্বে এতদ্দেশে, কেবল এতদ্দেশে কেন, প্রায় সর্ব্বত্র এই নাটকগুলির বিরল প্রচার হইয়াছিল, তজ্জন্য এই ভাস-প্রণীত নাটকের কথাবস্তু পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেও অপরিচিত।

কথা-বস্তু

কোনও সময়ে সৌবীররাজ ব্রহ্মর্ষি প্রচণ্ড-ভার্গব কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। তাহাতে সৌবীর-রাজ স্ত্রীপুত্রের সহিত বর্ষভোগ্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে কুন্তিভোজনগরে বাস করেন। সৌবীররাজ-কুমার বিষ্ণুসেন "অবি"নামক কোনও রাক্ষসকে নিহত করায় অবিমারক আখ্যা প্রাপ্ত হন। কুমার বিষ্ণুসেন চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া পিতার সহিত কুন্তিভোজনগরেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদা কুন্তিভোজনন্দিনী কুরঙ্গী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইয়া একটী সুবৃহৎ মত্ত হস্তী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে রক্ষিবর্গ তাঁহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। এই বিপৎসময়ে সৌবীররাজকুমার অমানুষিক বিক্রম প্রকাশ করিয়া রাজকুমারীকে রক্ষা করেন। সেই হইতে অবিমারককে দর্শন করিয়া রাজনন্দিনী কুরঙ্গী তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হয়েন। রাজকুমারও কুরঙ্গীর প্রতি সাভিলাষ হইয়া কুরঙ্গীর ধাত্রীর সাহায্যে গোপনে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করেন; কিছুদিন এই ভাবে অতিবাহিত হইলে অন্তঃপুররক্ষিবর্গ সন্দিহান হইয়া কুমারের অন্তঃপুর-প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করে। কুমার অবিমারক কুরঙ্গীদর্শন-লাভে হতাশ হইয়া প্রাণ-পরিত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হয়েন ও অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেন; কিন্তু ভগবান্ হুতাশনের বর-প্রভাবে অগ্নিতে তাঁহার স্বার্থ সিদ্ধি হইল না। তিনি শেষে পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া প্রাণ পরি-ত্যাগ করিবার আশায় এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করেন। এই সময় এক বিদ্যাধর-মিথুন যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হয় ও রাজকুমারের অভিলাষ জানিতে পারিয়া দয়ার্দ্র হইয়া রাজকুমারকে একটী প্রভাব-সম্পন্ন অঙ্গুরীয়ক প্রদান করে। এই অঙ্গুরীয়ক যে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে সে তৎক্ষণাৎ লোক-লোচনের বহির্ভূত হইবে এবং তৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিও মনুষ্য-চক্ষুর অগোচর হইবে। রাজকুমার প্রিয়ালাভের এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া কুন্তিভোজনগরে আগমন করেন ও সন্তুষ্ট নামক স্বীয় বয়স্যের সহিত মিলিত হইয়া অলক্ষিতভাবে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রিয়তমা কুরঙ্গীর সহিত মিলিত হন। এদিকে সৌবীররাজের অভিশাপের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত-প্রায়, কিন্তু রাজা পুত্রের অদর্শনে অতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

শাপাবসানে কুন্তিভোজের সহিত তাঁহার ভগিনী সৌবীর-রাজমহিষী সুচেতনা ও ভগিনীপতি সৌবীররাজের পরিচয় ও মিলন ঘটিল; কিন্তু সকলেই সৌবীরতনয় অবিমারকের অদর্শনে ব্যথিত রহিলেন। কুন্তিভোজ রাজকুমারী কুরঙ্গীর জীবন-রক্ষাকারী যুবকের অসমান্য গুণাবলী শ্রবণ করিয়া সেই যুবকের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ প্রদান করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন,

কিন্তু যুবক অন্ত্যজজাতীয় বলিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। রাজা কুন্তীভোজ অগত্যা স্বীয় অপর ভাগিনেয় কাশীরাজ-কুমার জয়বর্ম্মার সহিত স্বীয় দুহিতা কুরঙ্গীর বিবাহ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। এই সময় দেবর্ষি নারদ কুন্তিভোজনগরে আগমন করিয়া রাজা কুন্তিভোজকে বলিলেন "যিনি কুরঙ্গীকে হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই সৌবীররাজতনয় অবিমারক, কুন্তিভোজের ভাগিনেয়।" অবিমারক কুরঙ্গীলাভে হতাশ্বাস হইয়া যেরূপে স্বীয় প্রাণবিনাশে উদ্যত হইয়াছিলেন ও যেরূপে বিদ্যাধর-মিথুন হইতে অঙ্গুরীয়ক লাভ করিয়াছিলেন, সমস্তই দেবর্ষি রাজা কুন্তিভোজের নিকট প্রকাশিত করিলেন। রাজতনয়ার সহিত অবিমারকের পুনর্ম্মিলন হইয়াছে, সে সংবাদও রাজসন্নিধানে প্রকাশিত হইল।

কুন্তিভোজ পূর্ব্বেই কুরঙ্গীর বিবাহ স্বীয় ভগিনীপুত্র কাশীরাজকুমার জয়বর্ম্মার সহিত স্থির করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি দেবর্ষির মুখে এই নূতন সংবাদ অবগত হইয়া বিস্মিত হইলেন, কিন্তু দেবর্ষি নারদ সব দিক্ রক্ষা করিয়াছিলেন। নারদ কুন্তিভোজকে বলিলেন, "তোমার ভগিনী কাশীরাজ-পত্নী সুদর্শনার গর্ভে অবিমারকের জন্ম হয়, কিন্তু সুদর্শনা স্বীয় অনপত্যা ভগিনী সুচেতনাকে এই পুত্র প্রদান করেন। তজ্জন্য অবিমারকের সহিত কুরঙ্গীর বিবাহ হইলে সুদর্শনার বা কাশীরাজের কোনও দুঃখের বা লজ্জার কারণ হইবে না। বিশেষতঃ কুরঙ্গী জয়বর্ম্মা অপেক্ষা বয়সে বড়। তজ্জন্য জয়বর্ম্মার সহিত কুরঙ্গীর বিবাহ হইতে পারে না। তবে সুদর্শনার মনস্তুষ্টির জন্য কুরঙ্গীর কনিষ্ঠ সহোদরা সুমিত্রাকে জয়বর্ম্মার সহিত বিবাহ দাও।" দেবর্ষির আজ্ঞানুসারে সমস্ত অনুষ্ঠিত হইল। শাপবিমুক্ত সৌবীররাজ সুহৃজ্জন পরিবৃত হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

অবিমারক নাটকের ঘটনাপরম্পরা যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, স্থলবিশেষের রচনাও তেমনি মধুর। যদিও সূত্রধারকৃতারম্ভ ভাস-প্রণীত নাটকসমূহে সর্ব্বত্র "নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ" এইরূপে সূত্রধারের প্রবেশ ও প্রথম প্রবিষ্ট সূত্রধার-পঠিত শ্লোকটী সর্ব্বতোভাবে নান্দীলক্ষণলক্ষিত, তথাপি কবি ঐ শ্লোকটী নান্দীরূপে কেন ব্যবহার করেন নাই ইহা চিন্তনীয়।

নান্দী শ্লোকে অভিধেয় বস্তুর বীজ-বিন্যাস কবির নিপুণতার পরিচায়ক। রত্নাবলীর নান্দীশ্লোকগুলি পাঠ করিলে কবির অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্র-কারগণ নান্দীলক্ষণে "যস্যাং বীজস্য বিন্যাসো হ্যভিধেয়স্য বস্তুনঃ" বলিয়া এই রীতির সমর্থন করিয়াছেন।

আলোচ্য নাটকেও এই নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয় * "উৎক্ষিপ্তাং সানুকম্পং সলিলনিধি-জলাৎ" এই অংশ দ্বারা কুরঙ্গীর প্রতি মদমত্ত হস্তীর আক্রমণ ও দয়ালু নায়ক অবিমারক কর্ত্তৃক কুরঙ্গীর উদ্ধার সূচিত হইয়াছে, এবং "সম্ভুক্তাং প্রীতিপূর্ব্বং স্বভুজবশগতাং এক চক্রাভি গুপ্তাং" এই অংশদ্বারা কুরঙ্গীর

* উৎক্ষিপ্তাং সানুকম্পং সলিল নিধিজলা দেক দংষ্ট্রাগ্ররূঢ়া, মাক্রান্তামাজি মধ্যে নিহত দিতিসুত মেকপাদাবধৃতাং। সম্ভুক্তাং প্রীতিপূর্ব্বং স্বভুজবশগতামেক চক্রাভিগুপ্তাং শ্রীমান্ নারায়ণস্তে প্রদিশতু বসুধা মুক্তি ভেকান্ত পত্রাং।

প্রতি নায়কের অনুরাগ ও অবিমারকের কুরঙ্গী-প্রাপ্তির ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যদিও প্রচলিত নাটকসমূহের স্থায় ভাস-প্রণীত কোনও নাটকের প্রস্তাবনাতে কবির বংশ-পরিচয় অথবা নাম কীর্ত্তিত হয় নাই, তথাপি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের ও সুভাষিতসংগ্রহ-কর্ত্তৃগণের সাহায্যে এই নাটকসমূহের প্রণেতার নাম অবগত হইতে পারা যায়। এ স্থলে সেই সব প্রমাণের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইল।

ভাস-প্রণীত প্রত্যেক নাটকের প্রস্তাবনাতেই সূত্রধারমুখে শুনিতে পাই "অয়ে কিন্নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপন ব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে" সূত্রধারের এই বিজ্ঞাপনব্যগ্রভাব থাকা সত্ত্বেও শব্দ-বিঘ্নই চিরন্তন নাট্যরসিকগণের রীতি ভঙ্গ করিয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে সন্দেহনিমগ্ন করিতেছে। নাটক কয়েকখানি পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এই নাটকসমূহের প্রণেতা কোনও একজন মহাকবি, প্রস্তাবনা সর্ব্বত্র একরূপ, অন্ত্য শ্লোক সর্ব্বত্র এক, লেখন-ভঙ্গী এক, অনেক স্থলে বর্ণনাও এক, একই শ্লোক দুই বা ততোধিক নাটকে প্রযুক্ত হইয়াছে। নাটক সমূহের অন্তে—

ইমাং সাগরপর্য্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যকুন্তলাং।
মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ॥

এই শ্লোকটী কোনও নাটকে বা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পরিলক্ষিত হয়।

মহাকবি রাজশেখরকৃত সূক্তিমুক্তাবলীতে—

ভাসনাটকচক্রেপিচ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুং।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোভূন্ন পাবকঃ।

এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়। অভিনব গুপ্তাচার্য্য প্রভৃতি চিরন্তন আলঙ্কারিকগণ স্বপ্ননাটকের নামও এই নাটকের স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বপ্ন-নাটকের সহিত আলোচ্য নাটকের লেখন-প্রণালী, প্রস্তাবনা, অন্ত্য শ্লোক সম্পূর্ণ একরূপ। এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা সুনিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে অবিমারক নাটকপ্রণেতা মহাকবি ভাস। আরও বহু প্রমাণ দেখান যাইতে পারে, বাহুল্য ভয়ে উপেক্ষিত হইল।

সুপ্রাচীন মহাকবি ভাস-প্রদর্শিত প্রস্তাবনার অনুকরণে মহাকবি কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশীর প্রস্তাবনা লিখিয়াছেন। ভাসপ্রণীত প্রায় সমস্ত নাটকের প্রস্তাবনাতেই পাত্রপ্রবেশ-কৌশল একরূপ, সর্ব্বত্র সূত্রধার "অয়ে কিন্নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে আং জ্ঞাতম্" এইরূপ বলিয়া প্রবিশ্য-মান পাত্রের অবস্থাজ্ঞাপক একটী শ্লোক পাঠ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে, বিক্রমোর্ব্বশীতেও সূত্রধার ঠিক এই কথাটীই বলিতেছে। "অয়ে কিন্নু খলু মদ্বিজ্ঞাপনানন্তরং আর্ত্তানাং কুররীণামিবাকাশে শব্দঃ শ্রূয়তে……আং জ্ঞাতম্" এইরূপ বলিয়া প্রবিশ্যমান পাত্রের অবস্থাজ্ঞাপক একটী শ্লোক পাঠ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে।

প্রস্তাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। সম্প্রতি পাত্রগণের পরিচয়ের সহিত নাট্যবস্তুর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

প্রদীপ্তপাবকসদৃশ তেজস্বী তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন প্রচণ্ডভার্গব নামক কোনও ব্রহ্মর্ষি এক সময়ে সৌবীর রাজ্যে আগমন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার শিষ্য কাশ্যপ ঐ রাজ্যের অন্তর্গত কোনও অরণ্যে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হন। ভার্গব শিষ্যের এইরূপ মৃত্যুতে শাসন-শিথিল সৌবীররাজের প্রতি বিরক্ত হইয়া-ছিলেন। মৃগয়া-প্রসঙ্গে রাজার সহিত ঋষির সাক্ষাৎ হইল। ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত

হইয়া উঠিল, ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত ব্যসনাসক্ত নৃপতিকে ব্রহ্মর্ষি তিরস্কার করিলেন। যে গর্ব্বিতভাব রাজার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ছিল, ব্রহ্মর্ষির তিরস্কারে তাহা স্বীয় মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইল। ত্রিলোকপূজ্য ব্রহ্মর্ষিকে রাজা "ব্রহ্মর্ষিরূপেণ ভবান্ শ্বপাকঃ" বলিয়া আপনার ব্যসনিতার সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। অনুগ্রহ-নিগ্রহ-সমর্থ ঋষি প্রমাদী নৃপতিকে অভিসম্পাত করিলেন—"সপুত্রদারস্ত্বং শ্বপাকত্বমবাপ্স্যসি।"

এই অভিসম্পাত সৌবীররাজের প্রতি নহে—তাঁহার ব্যসনাসক্ত হৃদয়ের প্রতি। এটা তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থার নামান্তর।—ঋষির ইহা সাধারণ ক্রোধ-প্রকাশমাত্র নহে। অজ্ঞাতভাবে সৌবীর-রাজের যে অধঃপতন হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে ব্রহ্মর্ষিকেও শ্বপাক বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হয়েন নাই, ঋষির অভিসম্পাতে সেই পতিত অবস্থার দৃশ্যই রাজার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল! সৌবীররাজ স্বীয় অপরাধ বুঝিতে পারিলেন। "ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনং" জানিয়া পুনরায় ব্রহ্মর্ষিরই শরণাপন্ন হইলেন। ঋষিরোষ বিলীন হইয়া গেল, রাজার প্রতি করুণাসঞ্চার হইল। "অশনেরমৃতস্য চোভয়োর্বশিনশ্চাম্বুধরাশ্চ যোনয়ঃ" সত্যবাক্ ঋষি, "সম্বৎসর মাত্র চণ্ডাল ভাব ভোগ করিলেই শাপের অবসান হইবে" বলিয়া রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং স্বীয় প্রভাব দেখাইবার জন্য ব্যাঘ্রনিহত শিষ্য কাশ্যপকে আহ্বান করিলেন। কাশ্যপ অক্ষতশরীরে গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তাই বুঝি কবি বলিয়াছেন—

ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি।

পুত্র-কলত্রের সহিত সৌবীররাজ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে কুন্তিভোজরাজধানী বৈরন্ত্য নগরে বাস করিতে লাগিলেন। পুত্র-কলত্রের প্রতি এ অভিসম্পাত কেন প্রযুক্ত হইল, এ প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়।—তাঁহাদের চণ্ডালত্ব-প্রাপ্তি ঋষিশাপের এক অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য। যে অপরাধে সৌবীররাজ অপরাধী, অলক্ষিত ভাবে সেই অপরাধ রাজকুমারকেও স্পর্শ করিত এবং স্বামীর দুঃখ হইতে পত্নীকে বঞ্চিত করিয়া রাখিলে পত্নীর উপর অবিচার করা হয়; তাই বুঝি ব্রহ্মর্ষি এক অভিসম্পাতে "সৎসঙ্গজানি নিধনান্যপি তারয়ন্তি" সব দিক রক্ষা করিলেন।

এখন আমরা নাটকের মধ্যে প্রবেশ করি। ক্রীড়াপরবশা রাজনন্দিনী কুরঙ্গী উদ্যানে গিয়াছেন, কিন্তু আজ উদ্যান নিরাপদ নয়, মহারাজের অঞ্জনগিরি নামক বারণযূথপতি মদভাবস্থ হইয়াছে, মহারাজ কুন্তিভোজ-তনয়া কুরঙ্গীর জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া মন্ত্রীভূতিককে উদ্যানে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু মহারাজের আশঙ্কার নিবৃত্তি হইতেছে না, বিশেষতঃ কুরঙ্গীর বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে; বিভিন্ন দেশীয় রাজন্যবর্গ রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণাভি-লাষী হইয়া কুন্তিভোজের নিকট দূত পাঠাইতেছেন। এই সময় সম্ভ্রমহানিকর যে কোন ঘটনাই রাজার পক্ষে বিশেষ লজ্জাজনক তাই কুন্তিভোজ "* * * নমেন্তি মনঃ প্রহর্ষঃ, কন্যাপিতুর্হি সততং বহুচিন্তনীয়ং" বলিয়া স্বীয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন। আরও বহুবিধ চিন্তা কুন্তিভোজের চিত্তকে নিবিড় হইতে নিবিড়তর করিয়া তুলিতেছে; নানাদিগ্দেশীয় নৃপতিবৃন্দ কুরঙ্গীর পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়াছে। কাহার সহিত তনয়ার শুভপরিণয় সম্পন্ন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না "কস্মৈ দদামীতি মহান্ বিতর্কঃ"

এই বিরুদ্ধ তর্কের মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না।

এই স্থানে আমরা মহারাজ কুন্তিভোজের বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় পাই। মহারাজ বলিতেছেন—

"জামাতৃসম্পত্তিমচিন্তয়িত্বা, পিত্রাতু দত্তা স্বমনোভিলাষাৎ।
কুলদ্বয়ং হন্তি মদেন নারী; কূলদ্বয়ং ক্ষুব্ধজলা নদীব॥"

আজকাল এইরূপ জামাতায় সম্পূর্ণতা চিন্তা কয়জন করিয়া থাকেন বা করিতে অবসর পান। যাহা হউক, যখন এইরূপে রাজার চিত্ত সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইতেছিল এমন সময় অদূরবর্ত্তী একটা কোলাহল শুনিতে পাইয়া রাজার পূর্ব্ব আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল "সৎস্থ হেতু-সহস্রেষু কুরঙ্গ্যাং শঙ্কতে মতিঃ" বহু হেতুতেই এই কোলাহল হইতে পারে; কিন্তু এই কোলাহলে রাজার কুরঙ্গীর অনিষ্টশঙ্কাই প্রবল হইয়া উঠিল। রাজকুমারীর সংবাদ লইয়া অমাত্য কৌঞ্জায়ন রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, উৎকণ্ঠিত নৃপতি ব্যগ্রভাবে তনয়ার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সংক্ষেপে রাজ-নন্দিনীর কুশল খ্যাপন করিয়া অমাত্য বিস্তৃত-ভাবে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। রাজার মত্তহস্তীউদ্যানগত কুরঙ্গীর যানের দিকে ধাবিত হইলে, রাজনন্দিনীকে রক্ষা করিতে যাইয়া অনেক বীরপুরুষ হত হইল, ভীরুব্যক্তি নিজের জীবন লইয়া ব্যস্ত হইল, নারীগণ ক্রন্দন-ধ্বনিতে স্বীয় প্রয়াসের বিনিয়োগ করিল, এমন সময় "কশ্চিৎ দর্শনীয়োপ্যাবিস্মিতঃ তরুণোপ্যনহঙ্কারঃ শূরোপি দাক্ষিণ্যবান্ সুকুমারোপি বলবান্ তৎকালদুর্লভং অভয়ং প্রদায় সমাসাদিতবান্ তং দ্বিপবরং।" মহারাজ কুন্তিভোজ মন্ত্রিবাক্যে অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া "অনৃণঃ স কারুণ্যস্য" এই কয়টী অক্ষরে যুবকের প্রশংসা করিলেন। বহু বাগাড়ম্বরেও যাহা প্রকাশিত হইতে পারে না, তাহা অতি মধুর ভাবে এই কয়টী অক্ষর দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। কবি আরও অনেক স্থানে এই ভঙ্গীতে বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, অবিমারক কুরঙ্গীকে লাভ করিয়া বলিতেছেন "অনৃণোহং যৌবনস্য"। পরার্থ-নিরপেক্ষশরীর শৌর্য্যরাশি বিনয়মধুর শ্রীমান্ যুবকের প্রবৃত্তি ও অন্বয় জানিবার জন্য অমাত্য ভূতিক যুবকের অনুসরণ করিলেন, সুস্পষ্ট পরিচয় না পাইলেও যুবক যে মহাকুল-সম্ভূত বিবিধ-সদ্গুণ-সম্পন্ন তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না। কুন্তিভোজরাজ শ্রোত্রপরম্পরা যুবককে অন্ত্যজ জানিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছিলেন। অমাত্য ভূতিক তাঁহার সে চিন্তা দূর করিয়া দিলেন। যদিও আমরা কোনও কারণ-বশতঃ যুবকের স্পষ্ট পরিচয় পাইতেছি না, তথাপি তাঁহার রূপ, বাক্য, তেজঃ, সৌকুমার্য্য ও বল দেখিয়া সাহসের সহিত বলিতে পারি এই যুবক অন্ত্যজ নহেন, এরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি অন্ত্যজ হয় তবে "ব্যর্থাহস্মাকং শাস্ত্রমার্গেষু খেদঃ" আমরা বৃথা শাস্ত্রানুশীলন করিয়াছিলাম। অমাত্যের বাক্যে রাজার সন্দেহ দূর হইল না। এমন সদ্গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই কুরঙ্গীর উপযুক্ত পাত্র এই আশাই রাজাকে সন্দেহব্যাকুল করিয়া তুলিল। মহারাজ যুবকের পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতেও মন্ত্রীর একই উত্তর "মেঘান্তর্গতরবিবৎ প্রভানুমেয়ঃ।" স্পষ্ট উত্তর না পাইয়া মন্ত্রীকে আবার পরীক্ষা করিতে বলিলেন। এদিকে বিভিন্নদেশীয় নৃপতিগণ

"মন্ত্রাঃ পতাকামিব" রাজকুমারী কুরঙ্গীকে লাভ করিবার নিমিত্ত দূত পাঠাইয়াছেন। দূতগণের নিকট রাজা কি উত্তর করিবেন তাহা মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। স্থির হইল, সৌবীররাজ-কুমারের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন। সৌবীররাজ কুন্তিভোজরাজের ভগিনীপতি এবং শ্যালক। এই ধরণের বিবাহ সম্বন্ধে ভট্ট কুমারিল লিখিয়াছেন "মাতুলস্য সুতাং প্রাপ্য দাক্ষিণাত্যাস্তু তুষ্যতি" মহারাজ কুন্তিভোজকে ভাগিনেয়ের সহিত স্বীয় তনয়ার বিবাহ প্রদানে সমুৎসুক দেখিয়া ভট্টলিখিত 'তুষ্যতি' ব্যাক্যের সার্থকতা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায়।

কিন্তু মহারাজ চরমুখে জানিতে পারিলেন, "সৌবীররাজ রাজধানীতে নাই, তাঁহার অমাত্যগণ রাজকার্য্য পরিচালন করিতেছে।" রাজার রাজধানীতে অনুপস্থিত থাকিবার কারণ জানিবার জন্য মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন। তৎপরে তিনি মন্ত্রিগণের সহিত "আদৌ তাতো বরং পশ্চেৎ" ইত্যাদি নীতি-শাস্ত্রের সার্থক্য সম্পাদনে ব্যগ্র, এমন সময় মৌহূর্ত্তিকগণ "দশনাড়িকাঃ পূর্ণাঃ" দশ দণ্ড বেলা হইয়াছে এই সংবাদ প্রদান করিল।

মহারাজ স্নান-বেলা অতিক্রান্ত হইতেছে জানিয়া রাজ্যের প্রতি রাজার কর্ত্তব্যতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমরা মহারাজ কুন্তিভোজের মুখে রাজ-কর্ত্তব্যের যাদৃশ গুরুত্ব শুনিতে পাইলাম তাহা পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। মহারাজ বলিতে-ছেন:—

"আহা মহদ্ভারো রাজ্যং নাম। কুতঃ ধর্ম্মঃ প্রাগেব চিন্ত্যঃ সচিবমতিগতিঃ প্রেক্ষিতব্যা স্ববুদ্ধ্যা, প্রচ্ছাদ্যৌ রাগরোষৌ মৃদুপরুষগুণৌ কালযোগেন কার্য্যৌ। জ্ঞেয়ং লোকানুবৃত্তং পরচরনয়নৈ র্মণ্ডলং প্রেক্ষিতব্যং, রক্ষ্যো যত্নাদিহাত্মা রণশিরসি পুনঃ সোঽপি না-বেক্ষিতব্যঃ।"

অন্ধ যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, মণ্ডলাবলোকনে চারচক্ষু নৃপতিবৃন্দও তদ্রূপ, কবি "চরনয়নৈঃ" বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই "পরচরনয়নৈঃ" বলিয়াছেন। এই শ্লোকটির অনুরূপ শ্লোক আমরা সুভাষিত-শার্ঙ্গধরে দেখিতে পাই। শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ধর্ম্মঃ প্রাগে চিন্ত্যঃ সচিবগতিমতী সর্ব্বদা লোকনীয়ে,
প্রচ্ছাদ্যৌ রাগরোষৌ মৃদুকঠিনতরৌ যোজনীয়ৌ চ কালে।
জ্ঞেয়ং লোকানুবৃত্তং বরচরনয়নৈ র্মণ্ডলং বীক্ষণীয়
মাত্মা যত্নেন রক্ষ্যো রণশিরসি পুনঃ সোপিনাপেক্ষণীয়ঃ।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে প্রবেশক। এই প্রবেশকের পত্রে সন্তুষ্ট-নামধেয় বিদূষক (অবিমারক-বয়স্য) ও সৌবীররাজকুলের চেটীচন্দ্রিকা এ উভয়ের আলাপ-প্রসঙ্গে কবি বিলক্ষণ হাস্যরসের অবতারণা করিয়া-ছেন। বিদূষক বড় চিন্তামগ্ন। ঋষিশাপে অবিমারক চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে কুন্তিভোজ-নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। চিরসুখলালিত রাজপুত্র কতই না দুঃখভোগ করিতেছেন। রাজকুমারের এই দুরবস্থায় এ আবার কি মোহ উপস্থিত হইল। হস্তিসম্ভ্রমে কুন্তি-ভোজনন্দিনী কুরঙ্গীকে দেখিয়া অবধি রাজ-কুমারের এ কি ভাবান্তর উপস্থিত হইল!

কুরঙ্গীর প্রতি কুমারের এত আসক্তি কেন হইল। কুরঙ্গী রাজনন্দিনী। অবিমারক আজ চণ্ডাল। উভয়ের মিলন অত্যন্ত অসম্ভব। "সজ্জচারিণোঽনর্থাঃ" ভাবিতে ভাবিতে বিদূষক রাজকুমারের গৃহের দিকে চলিয়াছেন। পথে চন্দ্রিকার সহিত দেখা হইল। চন্দ্রিকা বড় পরিহাসরসিকা। আমরা উভয়ের আলাপের কিয়দংশ (সংস্কৃত) উদ্ধৃত করিতেছি—

বিদূষকঃ। চন্দ্রিকে! কিমেতৎ?
চন্দ্রিকা। আর্য্যঃ কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণমন্বেষে।
বিদূষকঃ। ব্রাহ্মণেন কিং কার্য্যং?
চন্দ্রিকা। কিমন্যৎ ভোজনার্থং নিমন্ত্রয়িতুং।
বিদূষক। ভবতি! অহং কঃ শ্রমণকঃ।
চন্দ্রিকা। ত্বং কিলাবৈদিকঃ।
বিদূষকঃ। কস্মাদহমবৈদিকঃ শৃণু তাবৎ অস্তি রামায়ণং নাম নাট্যশাস্ত্রং তস্মিন্ পঞ্চশ্লোকা অসম্পূর্ণে সম্বৎসরে ময়া পঠিতাঃ।
চন্দ্রিকা। জানামি জানামি আর্য্যস্য কুলোচিত ঈদৃশমেধাবিভাবঃ
বিদূষকঃ। ন কেবলং শ্লোকা এব, তেষামর্থোঽপি জ্ঞাতঃ। অন্যচ্চ অপরো বিশেষঃ ব্রাহ্মণো দুর্লভো অক্ষরজ্ঞোঽর্থজ্ঞশ্চ।

বিদূষকের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া চন্দ্রিকা হাসিল। পাঠকবর্গেরও বোধ হয় হাসি পাইবে। দুঃখের বিষয় কেহ কেহ এই পরিহাস বুঝিতে না পারিয়া বড় গোলে পড়িয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেছেন, মহাকবি ভাসের সময় রামায়ণ নাট্যশাস্ত্র বলিয়া খ্যাত ছিল। সে নাট্য-রামায়ণ এই প্রচলিত রামায়ণ নহে। ভাসের সময় দেশে ব্রাহ্মণ বড় অল্প ছিল ইত্যাদি। যাহা হউক আজ কবি জীবিত নাই, তিনি জীবিত থাকিলে বলিতেন, "অরসিকেষু রস-নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ"। চন্দ্রিকা বিদূষকের পাণ্ডিত্য পরীক্ষার ভাণ করিয়া বিদূষকের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক লইয়া প্রস্থান করিল। বিদূষক চন্দ্রিকার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, কিন্তু বিদূষক কিয়দ্দূর ধাবিত হইয়াই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। এখানে ধারণাসমর্থ বিদূষকের কথাটী বড় সুন্দর "মম পাদৌ হস্তিনা আসাদ্যমানস্যেব তত্র তত্রৈব পতঃ"। বিদূষক অগত্যা চন্দ্রিকাকে কুম্ভদাসী বলিয়া গালি দিতে দিতে বয়স্য অবিমারকের নিকট নালিশ রুজু করিতে ছুটিলেন।

প্রবেশকে আমরা অবিমারকের উৎকণ্ঠার সংবাদ পাইয়াছি। সম্প্রতি অবিমারককে দেখিতে আমাদের আগ্রহ হইতেছে। আজ অবিমারক বড় চিন্তামগ্ন।

"অদ্যাপি হস্তিকরশীকরশীতলাঙ্গীং
বালাং ভয়াকুলবিলোলবিষাদনেত্রাং।
স্বপ্নেষু নিত্যমুপলভ্য পুনর্ব্বিরোধে
জাতিস্মরঃ প্রথমজাতিমিব স্মরামি।"

হস্তিকরশীকরশীতলাঙ্গী কুরঙ্গীর স্মৃতি পুনঃ পুনঃ চিত্তপটে উদিত হইতেছে। স্বপ্নেও সেই কুরঙ্গীর চিন্তা। কুরঙ্গী রাজকুমারী, তাহাকে ত সব সময় দেখিবার উপায় নাই। ভাগ্যক্রমে জাগ্রদবস্থায় একবার দেখিয়াছিলেন মাত্র। এখন স্বপ্নে কুরঙ্গী-সমাগম ভিন্ন আর উপায় কি? জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট কুরঙ্গীর মধুরস্মৃতির আস্বাদন করিয়া নায়ক বাহ্যজ্ঞানশূন্য, যেন এ জীবনে কুরঙ্গীকে দেখেন নাই, জন্মান্তরে দৃষ্ট কুরঙ্গীর সেই মধুর স্মৃতিটুকু এ জীবনে প্রকাশিত হইয়া যেন তাহাকে উৎকণ্ঠিত করিতেছে। মালতী-মাধবেও আমরা এই ভাব দেখিতে পাই। মকরন্দ শার্দ্দূল-কবল হইতে মদয়ন্তিকাকে উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু পুষ্পধন্বার প্রভাবে

মদয়ন্তিকার চিন্তায় নিমগ্ন মকরন্দ বলিতেছেন—

তন্মে মনঃ ক্ষিপতি যৎ সরসপ্রহার-
মালোক্য মামগণিতস্খলদুত্তরীয়া।
ত্রস্তৈকহায়ণকুরঙ্গবিলোলদৃষ্টি-
রাশ্লিষ্টবত্যমৃতসংবলিতৈরিবাঙ্গৈঃ॥

সমান অবস্থার দুইটী শ্লোক হইলেও "জাতিস্মরঃ প্রথম-জাতিমিব স্মরামি" এই কথাটী নায়কের চিন্তাবস্থা যেমন সুব্যক্ত করিয়াছে, মকরন্দের কথায় তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। যদিও নায়ক কুরঙ্গীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া "দৃষ্টি-সুদা প্রভৃতি নেচ্ছতি রূপমন্তৎ" বলিয়া কতই না আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তথাপি তাঁহার ধৈর্য্য তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। সংযমের কঠোর বন্ধনে চিত্তকে আবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইতেছেন, "অচিন্ত্যৈব মহৌষধং" ভাবিয়া বলিতেছেন "অযুক্তমধ্যুতিত্বং পুরুষাণাং। সঙ্কল্প-মানো হি বিজৃম্ভতে মদনঃ তস্মাদহমিদানীং ন সঙ্কল্পয়ামি"আসক্তিস্রোতে চিত্ত যখন ভাসিয়া যায়, বিবেকসম্পন্ন পুরুষ তখন সেই স্রোত অতিক্রম করিতে এইরূপ সচেষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু বিষয়ের আকর্ষণ এতই প্রবল কদাচিৎ কোনও পুরুষ ইহাতে বাধা প্রদান করিতে পারেন, বিবেক-বুদ্ধি নায়কের চিত্তে ক্ষণপ্রভার ন্যায় প্রকাশিত হইয়াই বিলীন হইয়া গেল, হৃদয়ের অন্ধকার আরও গভীরতর হইয়া উঠিল। দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলিল। "ন সঙ্কল্পয়ামি" প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া নায়ক বলিতে লাগিলেন "অহো তস্যাঃ রূপসম্পৎ, রূপানুরূপং যৌবনং, যৌবনসদৃশং সৌকুমার্য্যং প্রতিচ্ছন্দং ধাত্রা যুবতিবপুষাং কিন্নু রচিতং গতা বা স্ত্রীরূপং কথমপি তারাধিপরুচিঃ।

এইরূপে কুমার অবিমারকের চিত্ত সঙ্কল্প-দোলায় দোদুল্যমান হইতেছিল। এমন সময় কুরঙ্গীর ধাত্রী ও সখী নলিনিকা অবিমারকের গৃহে উপস্থিত হইলেন। নায়কানুরাগিণী কুরঙ্গীর হৃদয়ব্যথা বুঝিতে পারিয়া স্বভাব-কোমলা সুচতুরা ধাত্রী অবিমারকের অবস্থা অবগত হইবার জন্য আসিয়াছেন। অবি-মারকের সহিত ধাত্রীর আলাপ বড় রমণীয়, অবিমারক নায়িকার চিন্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ধাত্রী ও সখী তাঁহার গৃহে আসিয়াছে, নায়কের সেদিকে লক্ষ্য নাই; কখনও বা আবেগবশে দুইচারিটী কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন, কখনও বা নির্ব্বাক্ অবস্থায় চিন্তামগ্ন হইতে-ছেন। নায়ককে দেখিবা মাত্র ধাত্রীর বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না। নায়ক ধাত্রী-মুখে কুরঙ্গীর অবস্থা ও কন্যান্তঃপুরে প্রবেশের উপায় জানিতে পারিলেন। আনন্দে অধীর হইয়া "বাক্যামৃতেন পুনরদ্য কৃতঃ সসংজ্ঞঃ" বলিয়া ধাত্রীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। ধাত্রী চলিয়া গেলে বিদূষকের সহিত নায়কের সাক্ষাৎ হইল। রজনীযোগে অলক্ষিত ভাবে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিবার জল্পনা-কল্পনা হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সায়াহ্নকাল উপস্থিত হইল।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে কুরঙ্গী অবি-মারককে অন্ত্যজ জানিয়াও সহসা তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইলেন কেন?

নায়কের অসাধারণ শৌর্য্য, গাম্ভীর্য্য, দয়া ও রূপসম্পদ দর্শন করিয়া নায়িকা বুঝিয়াছিলেন নায়ক সামান্য বংশোদ্ভব নহেন "ন হি মহোদধিং বর্জ্জয়িত্বা কূপে মৌক্তিকানি জায়ন্তে।" এই জায়গায় আমাদের মহারাজ দুষ্মন্তের কথা মনে পড়ে। পুণ্য তপোবনে, ঋষি-দুহিতাদিগের মধ্যে শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। এরূপ কেন হইল, এই কথা ভাবিতেই তাঁহার মনে হইল—

"সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।"

অতএব কুরঙ্গীর এই অনুরাগই তাহার প্রেমাস্পদের যথোপযুক্ততা প্রতিপন্ন করিতেছে। তখনকার যুগে অন্তরের শুচিতা যেখানে সেখানে বিনষ্ট হইত না। তাহার উপর সকলেরই প্রবল আস্থা ছিল। কিন্তু এ যুগে তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সুতরাং অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই যে এ সব ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তাহা আমরা এখন বুঝিতে পারি না।

(ক্রমশ)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-
বেদান্ত-তীর্থ।

ত্যাগ-বল

বিনয়াদিত্য তাঁহার নামান্তর, তিনি বীর, নীতিজ্ঞ এবং পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অতিশয় পরাক্রমশালী ও অধ্যবসায়ী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যধিক সাহস নিবন্ধন কয়েকবার তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। দিগ্বিজয়-বাসনা প্রবল নরপতিগণকে কর্ত্তব্যের পথ হইতে বহু দূরে লইয়া যায়। একই প্রকার নীতি অবলম্বনে সুদীর্ঘকালব্যাপী কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে ক্রমে ক্রমে বিফলতার মরু মধ্যে পতিত হইতে হয়। পরিবর্ত্তনশীল অথচ স্থিরলক্ষ্য নীতি প্রভাবে যিনি বীর তিনি সর্ব্বাপদপরিশূন্য হইয়া সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হন।

একদা বিনয়াদিত্য সন্ন্যাসীবেশে সন্ন্যাসিগণের সহিত ভীমসেন নামক জনৈক নরপতির দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্যালক সিদ্ধের কৌশলে বন্দীদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা অত্যধিক সাহসের ফলমাত্র। বুদ্ধিবলে বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনশ্চ নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। বস্তুত সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে মৃত্যুভয়পরিশূন্য কর্ম্মিগণ পদে পদে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও মৃত্যু কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা দেহটীকে খেলনক ও ক্ষণভঙ্গুর বোধে কর্ম্মস্রোতে ভাসাইয়া দেন। কর্ম্মই তাঁহাদের লক্ষ্য! দেহটা ত্যাগের বস্তু, এই প্রকার ধারণা লইয়াই পৃথিবীর উপরে বিচরণ করেন। সেই জন্য তাঁহাদের "জয়"-ঘোষণা চতুর্দ্দিক হইতে সমুত্থিত হইয়া থাকে!

যে সময়ের কথা লইয়া ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছি, সেই সময়ে কাশ্মীরে জয়াপীড় এবং নেপালে অরমুড়ি রাজত্ব করিতেন। ভারতের কথা,—ভারতের বীর্য্য, নীতি, কৌশল ও ত্যাগের মহিমা—ভারতের প্রতিগ্রন্থে প্রাণময়ী ভাষায় সুবর্ণময় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—মানবকণ্ঠে বীণার ঝঙ্কারে, কখন বজ্রনির্ঘোষে, জড়েরও চৈতন্য বিধান করিতেছে। কর্ম্মিগণ কর্ম্মের সন্ধান লাভ করিতেছেন, ভীরুর হৃদয়ে সাহস প্রবেশ করিতেছে, ধূর্ত্ত ও শঠ সাধুত্ব লাভ করিতেছে, নীচ মহৎ হইতেছে। পুস্তকনিহিত নীরব অস্ফুট শক্তি মানব-প্রাণে মহাশক্তির বিকাশ করিয়া দিতেছে। প্রাচীন ঋষিগণ, তাঁহাদের তপঃসঞ্চিত বিপুল তেজোরাশি সংহতাকারে পুস্তকস্থ অক্ষর মধ্যে সাবধানে রক্ষা করিয়া ভাবী বংশধরগণের কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত ত্যাগ-বল

চির নূতন চির অম্লান অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া নিয়ত তেজ বিতরণ করিয়া আমাদিগকে প্রাণময় করিয়া তুলিতেছে। ভবিষ্যতেও সেই ঋষি-তেজ যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতকে সজীব রাখিবে। সেই প্রাচীন ঋষিগণ-সঞ্চিত সংহততেজ আন্দোলিত করিয়া যে সাড়া প্রাপ্ত হইয়াছি তাহারই 'লিপি' আমার মনোময় যন্ত্রে যে ভাবপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই কথঞ্চিৎ এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইলাম।

ভ্রাতার কূটনীতি বলে বহুদিন গত হইল, অপর একটী ভ্রাতা প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন। যাহাদিগকে অসভ্য, বর্ব্বর, মূর্খ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছি, প্রকৃত পক্ষে উহারা তাহাই কি না তাহা অবজ্ঞার নেত্রে দর্শন করিলে কদাচ প্রকৃত মূর্ত্তিবিষয়ক জ্ঞানলাভে সমর্থ হইব না। ভেদনীতিপরিশূন্য পক্ষপাতবিরহিত হৃদয়ে শুভদৃষ্টিপাত না করিলে কদাচ সত্য সুন্দর বিজ্ঞানময় মূর্ত্তির আবিষ্কার হয় না। কাশ্মীরপতি নেপালবাসিগণকে এবং তাঁহাদের প্রভু অরমুড়িকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিয়া প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই প্রকার প্রবঞ্চনাকে আমরা স্বোপার্জ্জিত বলিয়াই বিবেচনা করিব।

কাশ্মীরপতি লাঞ্ছিত, অবমানিত হইয়া অরমুড়ি-হস্তে বন্দী হইলেন। কাশ্মীর-বাহিনী নদী-প্রবাহে বিনষ্ট হইয়া গেল। বিনয়াদিত্য নেপাল-জনপদে বন্দীবেশে প্রবেশ করিলেন! লজ্জা ও ক্ষোভে তাঁহার মস্তক অবনত হইয়াছিল। কালগণ্ডিকা-নদীতীরস্থ অত্যুচ্চ পার্ব্বত্য ভীষণ দুর্গমধ্যে বিনয়াদিত্য বন্দীদশায় ও পরিচারকহীন অবস্থায় নির্জ্জনকারাবাস-ক্লেশ ভোগ করিতে অভ্যস্ত হইলেন। ভগবানের পরীক্ষা! ইহার নামই "অগ্নি-পরীক্ষা"। পথভ্রষ্ট কর্ম্মীর চৈতন্যোদয়ের জন্য ভগবানের পুণ্যময় বিধান জীবনের অভিব্যক্তি সূচিত করিয়া দেয়। যিনি তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া চিন্তার দ্বারা কর্ম্মস্রোতের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন তিনিই সহস্রধারায় বিক্ষিপ্ত উন্মাদনাপূর্ণ কর্ম্মস্রোতকে তাঁহার কর্ম্মের অনুকূলে প্রধাবিত করিয়া অনুর্ব্বর মরুপ্রান্তর, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলক্ষেত্রে পরিণত করিয়া থাকেন। ইহারই নামান্তর "জীবনের সফলতা"।

কর্ম্মযোগী বিনয়াদিত্য নেপালের দুর্গে নির্জ্জনে বাস করিয়াছিলেন, ইহা ভগবানের আশীর্ব্বাদ, অসীম দয়ার পরিচয়! মানব সে মহান্ আশীর্ব্বাদকেও তুচ্ছ বোধে মহাযোগফল লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। কারাগারস্থিত একমাত্র গবাক্ষপথে এক একবার বিনয়াদিত্যের চিন্তাক্লিষ্ট মুখমণ্ডল উদ্ধারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য পথাবিষ্কারের চেষ্টা করিত! বহির্গমনের দ্বারে লৌহ-কবাট বহির্ভাগ হইতে আবদ্ধ ছিল। কারাগারের গবাক্ষ অংশ-মাত্র উন্মুক্ত ছিল। ঐ একমাত্র গবাক্ষপথেই তিনি অনন্ত আকাশ এবং নিম্নে বহু দূরে কালগণ্ডিকা নদীর পাষাণ-বাঁধা দুকূলে আবদ্ধ উন্মাদনাপূর্ণ প্রবল গতি দর্শন করিয়া উদ্ধারের উপায় চিন্তনে ক্রমে ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িলেন। ঐ গবাক্ষ মধ্য দিয়া অক্লেশে নদীস্রোতে পতিত হইবার সুবিধা ছিল, কিন্তু সেই সু-উচ্চ স্থান হইতে নদীবক্ষে ঝম্পপ্রদানের সহিত জীবনেরও পরিসমাপ্তি সুনিশ্চয়, তাহা দুর্গনির্ম্মাতা বিশেষ ভাবে অবগত থাকিয়াই ঐ স্থানে গবাক্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিনয়াদিত্যের চিন্তাস্রোত ঐ গবাক্ষ-পথপার্শ্বে বাধা প্রাপ্ত

হইয়া পুনঃ কারাগার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। কখন স্বর্গীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য, কারাগার হইতে মুক্তির জন্য, গবাক্ষ-বক্ষে সদর্পে উপবিষ্ট থাকিয়া বিনয়াদিত্যের হৃদয় মথিত করিত, অতি নিম্নে শিলাখণ্ডের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রবাহিণীর আস্ফালন দৃষ্টে তাঁহার কঠিন বীর-হৃদয় শিশুর ন্যায়, রমণীর ন্যায় কোমল হইয়া পড়িত। আশা হৃদয়ে দাঁড়াইয়া, সুখের মলয় প্রবাহিত করিয়া, বসন্তের ফুলভরা প্রমোদ-উদ্যানের দৃশ্য দেখাইয়া গবাক্ষ হইতে পুনরায় অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগারে লইয়া যাইত। জয়াপীড় স্বাধীনতা বা মুক্তির জন্য মৃত্যুর পথে দাঁড়াইতে পারেন নাই। আশার মোহিনী রূপ, আশার নীরব কটাক্ষপূর্ণ উপদেশ তাঁহাকে পরাধীনতার মধ্যে মরণের অশ্রুধারার মধ্যেও বল প্রদান করিত। ক্ষত্রীয় বীর্য্য, ক্ষত্রীয় তেজ যে স্থানে মুক্তির পথ দেখিতে পায় নাই, এক নির্লোভী ব্রাহ্মণ, একজন পরদুঃখকাতর ব্রাহ্মণ, ত্যাগবলে বলীয়ান ব্রাহ্মণ, সেই অদৃশ্য অনাবিষ্কৃত পথকে সুদৃশ্য সুগম করিয়া স্বদেশরক্ষক স্বদেশপ্রাণ রাজার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। যে মহাত্মা স্বীয় প্রাণদানে রাজার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, জননীর অপমান যে মহাত্মা দূরে অপসারিত করিয়াছিলেন, তিনি নেপালরাজের সহিত একটী মাত্র রাজনৈতিক পাকা চাল চালিয়াই বাজী জিতিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দ্বারা অরমুড়ির সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া কাশ্মীর-সিংহাসন তাঁহার অধিকারে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং দিগ্বিজয়লব্ধ জয়াপীড়ের অর্থরাশি-বিনিময়ে ব্রাহ্মণকে রাজ্যদানের প্রস্তাবও উপস্থিত হইয়াছিল। একাধারে প্রভূত অর্থ ও কাশ্মীর-রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় অরমুড়ির চিত্ত অস্থির হইতেছিল। মন্ত্রী দেবশর্ম্মা সৈন্যগণ সহ কালগণ্ডিকা-তীরে উপস্থিত হইয়া তথায় সৈন্যগণকে রক্ষা পূর্ব্বক সামান্যবেশে একাকী নদী উত্তীর্ণ হইলেন। নেপালরাজ পূর্ব্ব হইতেই সামন্তরাজগণকে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশেষ সম্মান সহকারে তাঁহাকে রাজসভায় লইয়া গেলেন। অরমুড়িও তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশ্রামার্থ উত্তম গৃহ প্রদান করিলেন।

ত্যাগী ধর্ম্মবীর ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহে ভারত ধর্ম্মবলের উৎসরূপে আজিও এই ঘোরতর দিনে ধর্ম্মজীবনের পিপাসা নিবারণ করিয়া আসিতেছে। ভারতীয় ধর্ম্ম-উৎসের শীতল পানীয় মানবের জ্ঞানোদয়কাল হইতে পৃথিবীর মহাদেশসমূহের জ্ঞান ও ধর্ম্মপিপাসার শান্তি করিয়া আসিতেছে। সেই অফুরন্ত ভারতীয় ধর্ম্ম-উৎসের নির্ম্মাতা ব্রাহ্মণ! আজ সেই ব্রাহ্মণরূপী দেবতা সুগভীর মন্ত্রণাবলে দেশের জন্য, দেশপ্রাণ রাজার উদ্ধারের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। অরমুড়ির সাধ্য কি নির্লোভী ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়!

ত্যাগী ব্রাহ্মণের নিকট অরমুড়িকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। পর দিবস কাশ্মীর-রাজমন্ত্রী দেবশর্ম্মা বলিলেন—"জয়াপীড় দিগ্বিজয়ব্যপদেশে পর্ব্বত-সমান অর্থরাশি উপার্জ্জন করিয়াছেন এ কথা সত্য, কিন্তু উহা কোথায় রক্ষিত আছে তাহা আমি অবগত নহি। তবে যে সকল প্রধান প্রধান সৈনিকগণ উহা অবগত আছেন তাঁহারা আমার সহিত আগমন করিয়াছেন। মহারাজ স্বয়ং এই বিষয় বিশেষভাবে অবগত

আছেন। 'জয়াপীড়কে মোহিত করিয়া, অর্থ কোথায় আছে, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি।' তৎপরে জয়াপীড়ের সৈনিকগণের মধ্যে যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে একে একে নদীপার করিয়া সভায় আনয়ন পূর্ব্বক বন্দী করিলে কোন প্রকার বিপ্লবেরও সম্ভাবনা থাকিবে না অথচ অর্থপ্রাপ্তির সুবিধা হইবে।"

অরমুড়ি দানের এবং মানের লোভে বিমোহিত হইলেন। রাজার আদেশ অনুসারে বুদ্ধিমান দেবশর্ম্মা জয়াপীড়ের বন্দীবাসে গমন করিলেন। ধীরপ্রকৃতি ব্রাহ্মণ জয়াপীড়ের অবস্থা দর্শনে কাতর হইয়া পড়িলেন। সমাগত প্রহরিগণকে তথা হইতে অপসারিত করিয়া বলিলেন—"রাজন্ বিপদ-মুক্তির মূল যে শক্তি তাহা আপনার আছে ত? যদি তাহা থাকে তাহা হইলে আমি যে অসীম সাহসের চিত্র কল্পনাপ্রভাবে চিত্রিত করিয়াছি, তাহা প্রাণময় হইয়া উঠিবে? ব্রাহ্মণের বুদ্ধি আর ক্ষত্রিয়ের বাহুবল একত্রিত হইলে নূতন বিশ্ব নির্ম্মিত হইতে পারে! আপনার যদি হৃদয়ে বল থাকে তাহা হইলে এই ক্ষণেই বিপদ্‌সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন জানিবেন।"

জয়াপীড় উদাসনেত্রে মন্ত্রীর বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বলিলেন "আমি শস্ত্রহীন বন্দী; কেবল শক্তিদ্বারা কি অদ্ভুত কার্য্য করিব?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "ঐ বাতায়ন হইতে নদীজলে পতিত হইয়া পরপারে গমন করিলেই আপনার মুক্তি। ঐ দেখুন কেমনে সাগরসমান সৈন্যগণ আপনার জন্যই অপেক্ষা করিতেছে, উহারা আপনার নিজের।" জয়াপীড়ের হৃদয়-শক্তি যেন হীনতা অবলম্বন করিয়াছিল, তাঁহার জীবনের মমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু জীবন-রক্ষার উপায় তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। তিনি উত্তর করিলেন "দৃতি ব্যতীত এই অত্যুচ্চ বাতায়ন হইতে নদীতে পতিত হইতে পারিব না, দৃতিও সম্ভবতঃ ছিন্ন হইয়া যাইবে।" দেবশর্ম্মা স্বীয় প্রভুর বাক্য শ্রবণে চিন্তিত হইলেন না—আমি যে সহজ সুসাধ্য উপায় স্থির করিয়াছিলাম তাহাই বিফল হইল, তাহাতে ক্ষতি নাই; জননী জন্মভূমির রক্ষার জন্য, প্রভুর শত্রুকৃত অসহ্য অবমাননার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য যে উপায় অবলম্বন নিতান্ত প্রয়োজন তাহাই করিব? অরাতিনাশ স্বচক্ষে দর্শণ অপেক্ষা রাজার মুক্তি সর্ব্ব প্রথম আবশ্যক। স্বার্থত্যাগী ব্রাহ্মণের বদনমণ্ডল স্বর্গীয় জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি পবিত্র উৎসাহের সহিত জয়াপীড়কে বলিলেন "রাজন! আপনি একদণ্ড কাল কোন উপায়ে বহির্ভাগে অবস্থান করুন, তৎপরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন আপনার পলায়নের সুন্দর সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।" মহারাজ পাযুক্ষালন গৃহে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ মস্তকের উষ্ণীষ উন্মোচন করিলেন। তদ্বারা পদদ্বয় বন্ধন করিলেন। এবং দণ্ডাঘাতে অঙ্গুলি বিদীর্ণ করিয়া রুধিরধারা প্রবাহিত করিয়া উষ্ণীষ-বস্ত্রের একান্তে লিখিলেন—"স্বদেশের মান-রক্ষা ও প্রজাপালক রাজার প্রাণ-রক্ষার জন্য এই ব্রাহ্মণের বায়ুপূর্ণ সদ্য মৃতদেহ আপনার সুদৃঢ় দৃতির কার্য্য করিবে। এই দেহ অবলম্বনে শীঘ্র বাতায়ন পথ হইতে নদীবক্ষে পতিত হইয়া পরপারে গমন করুন। স্বদেশের মান ও রাজার জীবন-রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের জীবনহীন দেহ এইস্থানে পতিত রহিল।" হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিতে রক্তবর্ণ অক্ষরে এই কয়েকটি বাক্য লিখিয়া

দীর্ঘশ্বাস গ্রহণপূর্ব্বক নিজ হস্তে আপন কণ্ঠে বস্ত্র বন্ধন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণের পবিত্র দেহ পাষাণময় হর্ম্ম্যতলে ঢলিয়া পড়িল। ত্যাগী পরোপকারী ব্রাহ্মণের শব-দেহ অবলম্বনে জয়াপীড় নদীবক্ষে পতিত হইয়া আপন সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নেপাল অধিকারে বিলম্ব হইল না। নেপালের সেই কারাগার তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। ত্যাগের মহিমা ব্যোম-তরঙ্গে আজিও তরঙ্গায়িত হইতেছে, প্রান্তরে গমন করিলে আজিও শুনিতে পাই "স্বদেশ! ব্রাহ্মণের ত্যাগবল!" হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বায়ু-তরঙ্গে ধ্বনি বিস্তার করিয়া ছুটিতেছে। সেই পবিত্র তরঙ্গ কখন ঝটিকাবর্ত্তে কখন মলয়ানীলের সহিত প্রবাহিত হইয়া ভারত-ময় ঘোষণা করিতেছে "ত্যাগবলম্ পরম্ বলম্"।

শ্রীবনওয়ারিলাল দত্ত।

তিন

গণিত-শাস্ত্রে এমন একটী রহস্যমূলক শব্দ বা অঙ্ক আছে, যাহা সংখ্যায় হীন হইলেও, গুণ-গৌরবে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শীর্ষস্থানীয় ও বরণীয়। সেই অদ্ভুত সংখ্যার অচিন্তনীয় প্রভাবে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিরাট-বিশ্ব আর তদন্তর্গত তাবৎ পদার্থই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। সমগ্র মানবজাতিই সেই সংখ্যাবিশেষে বিস্ময়কর রূপে বিমোহিত এবং ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় অহোরহঃই তাহার অনুবর্ত্তনে, গুণ-কীর্ত্তনে অগ্রসর বা তৎপর। অনেকে সেই সংখ্যাটীকে পাচ, কেহ নয়, ও কেহ বা বার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং তাহার অনুকূলে নানারূপ যুক্তি প্রমাণাদিরও অবতারণা করিয়া থাকেন। এক সময়ে একজন প্রবন্ধ-লেখক "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" নামক এক লুপ্তস্মৃতি মাসিকপত্রে 'চৌরাশি' সংখ্যা লইয়া এইরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং রাশি রাশি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহার বিশেষত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সংপ্রতি আবার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে, এম্, এ, মহোদয় "বসুধা" মাসিকপত্রের গত ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় 'আঠারো' নামক প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া, আঠার সংখ্যাটীকেই প্রকারান্তরে সেই বিশেষ সংখ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে তৎসম্পর্কে আরও অনেক কথা বলিবেন বলিয়াও পাঠকগণকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের মনে হয় যে, যে বিশেষ সংখ্যার সহিত সংসারের ঈদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যাহার মোহিনী মায়ায় জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্য-সম্প্রদায়ই বিশেষভাবে মুগ্ধ, তাহা পাঁচ, নয় বা বার নহে, চৌরাশি কি আঠারও নহে। সে সংখ্যা তিন—সর্ব্ববিধ সংখ্যা-বাচক শব্দের আদি বা মূল যে এক, সেই এক সংখ্যা হইতে সমুৎপন্ন তিনই সেই বিশেষ সংখ্যা, সেই পরম রহস্যময়, বিস্ময়কর অঙ্ক। আমরা নানা শাস্ত্র হইতে যুক্তি-প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া ইহার সমীচিনতা সপ্রমাণ করিতেছি।

ঈশ্বর নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্য ও চৈতন্যস্বরূপ। তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার,

নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ এবং আদ্যন্ত-মধ্যরহিত সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহ। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি এইরূপেই বিরাজমান ছিলেন। তারপর যখন তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে বাসনা জন্মিল, তখন তিনি ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিলেন, নির্গুণত্ব ত্যাগ করিয়া সগুণ হইলেন। গুণ বা শক্তি না হইলে সৃষ্টি হয় না। তাই তাঁহাকে সৃষ্টির জন্য গুণময়, শক্তিসমন্বিত হইতে হইল, কিন্তু গুণমাত্রে, একবিধ গুণ বা শক্তির সাহায্যে সৃষ্টিকার্য্য অসম্ভব। কারণ সৃষ্টির পরে সৃষ্টের, সৃষ্টজীবাদির পালন বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, আবার সময়ে তাহাদিগের লয় বা বিনাশসাধনেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব কেবল সৃষ্টি করিলেই সৃষ্টিকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, হইতেও পারে না। কাজেই সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান, সৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকার্য্য ব্যবস্থিত রাখিবার নিমিত্ত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই ত্রিকার্য্য-সংসাধিনী ত্রিশক্তি বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি, করিয়া, ত্রিশক্তিসমন্বিত বা ত্রিগুণাত্মক হইলেন এবং সেই ত্রিশক্তি বা ত্রিগুণের সাহায্যে ত্রিমূর্ত্তির—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন আদি দেবের গঠন সমাধা করিলেন অথবা সংক্ষেপতঃ সৃষ্টিকার্য্য বিধানের নিমিত্ত ভগবান ত্রিবিধমূর্ত্তিতে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া গেলেন—"একমূর্ত্তি স্ত্রয়োভাগা ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ" আর সেই ত্রিমূর্ত্তির দ্বারা, সত্ত্ব-রজস্তমোময় ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবের সাহায্যে সৃষ্টি-কার্য্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

হইল সৃষ্টি-রহস্য। এই রহস্য পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীতি জন্মে যে, এই সৃষ্টি বা সংসারের মূল তিন—যে গুণ ব শক্তি বিশ্বসৃষ্টির মূল, স্থিতির নিদান ও লয়ের হেতুভূত তাহা তিন ভিন্ন অন্য নহে। ভগবা "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" হইয়াও সৃষ্টির জন্য ত্রিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, চারি বা ততোঽধিক কোনও মূর্ত্তি ধারণ করেন নাই। সুতরাং ত্রিসংখ্যাই যে তাঁহার একমাত্র অভিপ্রেত, নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক আর তজ্জন্য সর্ব্বজন-পূজ্য, পরমপবিত্র ও মৌলিক সংখ্যা, তিনেতর সমস্ত সংখ্যার প্রধান, তাহাতে সংশয়ের বিষয় কি আছে?

তার পর ওঙ্কার। ওঙ্কর সত্ত্ব, রজঃ, তম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বা সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এই তিনেরই নির্দ্দেশক বা নামান্তর মাত্র। ইহা সর্ব্বমন্ত্রময়, উপনিষৎ তুল্য ও শাশ্বত। ইহার অপর নাম প্রণব। এই প্রণব আখ্যাধারী ওঙ্কার হিন্দুজাতির সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্মের মূলীভূত, সকল মন্ত্রের প্রথমোচ্চার্য্য বর্ণ বা সনাতন বীজ স্বরূপ। বীজরূপী ওঙ্কারের আবৃত্তি বা উচ্চারণ ব্যতীত মুক্তিলাভের, ভববন্ধন-ছেদনের উপায়ান্তর নাই। এই পরম পবিত্র ওঙ্কার ও ত্রিবর্ণ-মূলক 'অ' 'উ' 'ম' এই তিন বর্ণ বা অক্ষর যোগে নিষ্পন্ন, ত্রিবর্ণাত্মক ওঙ্কারের অ, উ ও ম এই আদি বর্ণত্রয় বা ত্র্যক্ষর একদিকে যেমন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই মূল গুণ ত্রয়ের বোধক, অন্যদিকে আবার তেমনই তাবৎ ত্রিসংখ্যামূলক পদার্থের উদ্ভাবক—ত্রিসংখ্যাত্মক বিরাট বিশ্বের, এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল জগতের উৎপাদক। সুতরাং এই ত্রিসংখ্যা যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত সংখ্যার মূল বা আদি, তেমনই পরম হিতকর পবিত্র ও গুণগৌরবে অদ্বিতীয়, ইহা নিখিল ভয়হর, বিশ্ববীজস্বরূপ, সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রয়োজক এবং সমগ্র মানবসমাজের ইহ, পর উভয় লোকেরই এক মাত্র আশ্রয় বা অবলম্বন স্থানীয়। তিনের এই প্রাধান্য কেবল যে হিন্দুজাতিরই স্বীকৃত, এমন নহে।

জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পৃথিবীর তাবৎ মানব-সম্প্রদায়, পৃথিবীর চারি মহাদেশের সভ্য অসভ্য সমস্ত লোকই ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচ্য জন্মান্তরবাদের প্রতীচ্য উপাসক মহানুভব পিথাগোরস (Pythagoras) আবার ত্রি-সংখ্যার এক প্রধান স্তাবক বলিয়া পরিগণিত। তিনি ইহাকে পূর্ণ (Perfect), সংসারের আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই ত্রি-অবস্থা-জ্ঞাপক এবং সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের বোধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এরূপভাবে অপর কোনও প্রতীচ্য মনীষী তিনের মহত্ব ঘোষণা করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা পরিজ্ঞাত নহি, তবে প্রাচ্য প্রতীচ্য সকল জাতির সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই যে ইহার বিশেষত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত, স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা প্রথমে কতকগুলি হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, শেষে সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করিব।

বেদ জগতের আদি গ্রন্থ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাকে খৃষ্টাব্দের সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষেরও অধিক পুরাতন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুরা বেদকে অনাদি ও অপৌরুষেয় বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। এই ঈশ্বর-নিরূপিত, পরমপূজ্য পবিত্র গ্রন্থ তিনভাগে বিভক্ত। যথা—ঋক্, যজুঃ ও সাম। অথর্ব্ব নামে অপর একখানি গ্রন্থ বেদের অঙ্গীভূত বটে, কিন্তু পৃথক বেদরূপে গণ্য নহে, বেদের 'ক্রোড়পত্র'স্বরূপেই পরিগৃহীত। তাই বেদের এক নাম 'ত্রয়ী'। সমগ্র হিন্দুজাতি প্রধানতঃ তিন অংশে পৃথকীকৃত। যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। ভারতের আদিম অধিবাসীদিগকে লইয়া পরিশেষে শূদ্র নামে অন্য এক সম্প্রদায়ের গঠন করা হইয়াছে। কিন্তু শূদ্রকে, ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের ন্যায়, দ্বিজপদবাচ্য করা হয় নাই। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ জাতির যে বৃত্তির নির্দ্দেশ আছে, তাহা ইহ ও পারলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ বৃত্তিও তিন তিন ভাগে বিভক্ত। ইহলৌকিক বা জীবিকানির্ব্বাহ-মূলক বৃত্তি, যথা—যাজন, প্রতিগ্রহ ও অধ্যাপন; আর পারলৌকিক বা ধর্ম্মমূলক বৃত্তি, যথা—যজন, দান ও বেদাধ্যয়ন। হিন্দুর দৈব ও পৈত্র কার্য্যে যে কুশরচিত পদার্থবিশেষের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহার নাম 'ত্রিপত্র'। ত্রিপত্র তিনটী কুশপত্রে রচিত। সর্ব্ববিধ দুঃখ বা ক্লেশের সাধারণ নাম 'তাপ'। তাপও ত্রিবিধ, যথা—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। হিন্দুজাতির ঈশ্বরোপাসনা, বন্দনা ও স্তোত্রাদি পাঠ করিবার উপযুক্ত বা প্রশস্ত সময় তিনটী। সেই সময় তিনটীকে ত্রিসন্ধ্যা কহে। ত্রিসন্ধ্যা—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন নামে অভিহিত। ত্রিসন্ধ্যার ন্যায় 'ত্র্যহস্পর্শ'ও হিন্দুজাতির নিকটে পবিত্র—কেবল যাত্রাদি দুই একটী কার্য্যে অশুভ হইলেও, দানধ্যানাদি ধর্ম্মকার্য্যে বিশেষ প্রশস্ত ও শুভ বলিয়া পরিগণিত। এই 'ত্র্যহস্পর্শ'ও তিন দিবসে এক তিথির বা একদিনে তিন তিথির স্পর্শ বা মিলনে সমুৎপন্ন। শিব হিন্দু-ত্রিত্বের অন্যতম নায়ক ও আদিদেবরূপে সমাদৃত, তাই তাঁহার অন্য নাম দেবাদিদেব, মহাদেব বা মহেশ্বর। এই দেবাদিদেবের সহিত ত্রি-সংখ্যার সংস্রব যেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়াই বোধ হয়। শিব ত্রিলোক-পতি ও ত্রিকালদর্শী, তাই তাঁহার চক্ষু-সংখ্যা তিনটী, আর তজ্জন্যই তিনি ত্র্যম্বক, ত্রিচক্ষুঃ, ত্রিলোচন প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। শিবের প্রধানতমা সহধর্ম্মিণী আদ্যাশক্তি ভগবতী।

স্বামীর ন্যায় তাঁহারও তিনটী চক্ষু, আর তাই তিনি ত্রিনয়না। ত্রিনয়নাও ত্রিধ বা তিন শক্তিতে পৃথকীভূতা। সেই তিন শক্তির নাম কালী, তারা ও ত্রিপুরা। দেবাদিদেবের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম গঙ্গা, আদ্যাশক্তির সপত্নী আর তজ্জন্য তাঁহার মতে, স্বামীর 'জীবন-স্বরূপা' ও 'শিরোমণি'তুল্যা। সেই পতিত-পাবনী জাহ্নবী দেবীও ত্রিস্রোতা, ত্রিপথগা এবং স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্ত্যে ভাগীরথী ও পাতালে ভোগবতী নামে ত্রিলোকবাসীর বরণীয়া। মহাদেবের প্রিয়তম বাসভূমির নাম কাশী। কাশী হিন্দুজাতির পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত। সেই কাশীও তিনটী—একটী হরিদ্বারের উত্তরে, দ্বিতীয়টী বারাণসী নামে, বরুণা, অসি ও গঙ্গা এই নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থলে এবং তৃতীয়টী বেন নামে দক্ষিণাপথে, মান্দ্রাজপ্রদেশে অবস্থিত। শিবের ধৃত অস্ত্রের নাম ত্রিশূল। ত্রিশূল ত্রিশীর্ষক বা তিনটী ফলক সমন্বিত। তাঁহার অনুচর বা ভক্তেরা ললাটে যে তিলক বিশেষের অঙ্কন করিয়া থাকেন তাহাও ত্রিরেখাত্মক, ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় তিন তির্য্যক রেখার দ্বারা রচিত। তাই তাহাকে ত্রিপুণ্ড্রক কহে। দানবশিল্পী ময়, অসুরকুলের রক্ষার্থে যে পুরী বিশেষের গঠন করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যাও তিন। সেই পুরীত্রয় আবার স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ এই প্রধান ধাতুত্রয়ের সাহায্যে রচিত। শেষে ত্রিনয়নাপতি, ত্রিশূলধারী ত্রিলোচন, ত্রিধাতুময় ত্রিপুরের ধ্বংস সাধন করিয়া ত্রিদিববাসী ত্রিদশকুলকে নিরাপদ করিয়াছিলেন। ভগবান বিষ্ণু যখন বরাহ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জলমগ্না পৃথ্বীর উদ্ধার সাধন করেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বে তিনটী ককুৎ বা ঝুটির উদ্ভব হইয়াছিল। তাই তাঁহার এক নাম ত্রিককুদ। তার পর আবার যখন তাঁহাকে বলি অসুরের নিগ্রহার্থে বামন রূপ ধারণ করিতে হয়, তখন তিনি ত্রিবিক্রম নামে অভিহিত হন এবং বলির নিকটে ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করিয়া, ত্রিপদ-ধারী হইয়া, এক পদে স্বর্গ, অন্য পদে মর্ত্ত্য অধিকার করেন, আর নাভি-সমুত্থিত তৃতীয় পদ তাহার মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক তাহাকে পাতালে পাঠাইয়া দেন। ভগবানের এই উভয়বিধ কার্য্যে ত্রিসংখ্যার প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতাও বর্দ্ধিত হইয়াছে। সেই পবিত্রতা আবার তিনি শ্রীকৃষ্ণাবতারে 'ত্রিভঙ্গমুরারি'-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশেষ ভাবেই বাড়াইয়া গিয়াছেন। দেবতাদিগের ধনরক্ষক বা ধনাধিপের নাম কুবের। কুবের দেবগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু তাঁহার তিনটী মস্তক। স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের যান বা রথের নাম 'ত্রিচক্র'। ত্রিচক্ররথ তিনখানি চক্রে পরি-চালিত। আয়ুর্ব্বেদে জ্বররোগের যে মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে, তাহা তিনেরই প্রাধান্য-পরিজ্ঞাপক, জ্বরাসুর ত্রিপদ ও ত্রিশির। তাঁহার হস্ত ও চক্ষুর সংখ্যাও যথাক্রমে তিনের দ্বি ও ত্রিগুণিত সংখ্যক। অশ্বিনীকুমার—যুগলের রথচক্রের ন্যায়, জ্বর-পুরুষের ত্রিপদ ও ত্রিশিরের সহিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত দোষত্রয়ের, বায়ু-পিত্ত-কফের—কোনও সংশ্রব আছে কি না তাহা সুধিগণেরই বিচার্য্য। হিন্দুজাতির অন্যতম প্রধান তীর্থের নাম ত্রিবেণী। ত্রিবেণী দুইটী—একটী যুক্ত-প্রদেশে প্রয়াগে যুক্ত-বেণী, আর অন্যটী বঙ্গদেশে হুগলী জেলায় মুক্তবেণী নামে পরিচিত; কিন্তু যুক্ত, মুক্ত উভয় ত্রিবেণীই তিন নদীর—গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর—সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। তিনের

এইরূপ প্রাধান্য বা বিশেষত্ব হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই, এমন কি, ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রেই দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, চেষ্টা করিলে তৎসম্বন্ধে রাশি রাশি প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং আমরা সে সম্বন্ধে আর অধিক অগ্রসর না হইয়া, অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অভিমতাদির বিষয়েই আলোচনা করিতেছি।

হিন্দুজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিপ্রকরণের মূল যেমন ত্রিগুণ, ওঙ্কার বা প্রণব, খৃষ্টান-দিগেরও তেমনই ট্রায়াড্ বা ট্রিনিটী (Triad or Trinity)। প্রণবের ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের ন্যায় ট্রিনিটীও, পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা (God, the father; God, the Son and Holy Ghost) এই তিনের সমবায়ে সংগঠিত। প্রতীচ্যজগতের আদি সভ্য যে গ্রীক ও রোমান জাতি, তাঁহারাও তিনের সমাদর করিয়াছেন এবং ত্রিত্বের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল বিষয়েও ইহার প্রাধান্য স্বীকার ও কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক-দিগের নিকটে জিয়াস্ (Zeus), আফ্রোডাইট (Aphrodite) ও আপোলো (Apollo) এই তিন দেবতাই ত্রিত্বরূপে সম্মানিত ও পূজিত। রোমান জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রমতে জুপিটার (Jupiter), নেপচুন্ (Neptune) ও প্লুটো (Pluto) এই ত্রিদেবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নিখিল জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর আর তজ্জন্য তাঁহাদিগের ত্রিত্বের অন্তর্নিবিষ্ট। এই দেব-ত্রয়ের মধ্যেও তিনের নিদর্শন প্রকাশমান। জুপিটার ত্রিধাভিন্ন তাড়িতোপরি সমাসীন, নেপচুন্ ত্রিফলক-দণ্ড বা ত্রিশূলধারী, আর প্লুটোপত্নী প্রোসার পাইন (Proserpine) সহ এক ত্রিশির সারমেয় পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের ত্রিত্ব অটকন (Othon), মেসিউ (Messou) এবং আটাহুয়াটা (Atahuata) নামক দেব-ত্রয়। তত্রত্য পেরু ও মেকসিকো দেশের আদীবাসীরা যথাক্রমে অপমটী (Apomti) চুরেমন্টী (Churemti) ও ইন্‌টেকুইয়েকুই (Intequmqui) এবং ভিট্‌পুট্‌লি (Vitzputzli), তেলক্ (Tlaloc) ও তেজ্‌কট্‌লিপোকা (Tezcatlipoca) নামক তিন তিনটী দেবতাকেই ত্রিত্ব বলিয়া উপাসনা করেন। নরওয়ে ও সুইডেনের লোকদিগের নিকটে ওডিন্ (Odin), হিনির (Hœnir) ও লোডার (Lodur) ত্রিত্বরূপে সম্মানিত থর (Thor), ফ্রিগা (Frigga) ও ওডেন (Woden) গথ জাতির; হিউ (Hu), ক্রেয়ী (Craiwy) ও সেরিডোয়েন্ (Ceridwen) কেল্টজাতির, হোরাস্ (Horus) আইসিস্ (Isis) ও অসিরিস্ (Osiris) মিসরীয়দিগের, আর এরিমেনেস্ (Arimanes) মিত্রাস্ (Mithras) ও ওরোমাস্‌দেশ (Oromasdes) আদিম পারসিক জাতির ত্রিত্ব। মুসলমান জাতিও তুল্যরূপে ত্রিত্বে আস্থাবান। তাঁহারা আল্লা, আদম ও মহম্মদ এই তিনকেই ত্রিত্ব বা তিনে এক একে তিন বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ত্রিত্ব ত্রিরত্ন নামে অভিহিত। ত্রিরত্ন বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই তিনের সমবায়ে সংরচিত। হলণ্ড দেশের ত্রিত্ব বেলস্ (Belus), ভেনস্ (Venus) ও টেমজ (Tamuz) নামক ত্রিদেব। ফিনিসীয়-গণ চেমথ্ (Chemoth), মিলেয়ম্ (Mileom) ও আস্টারোথ্ (Astaroth) নামা দেবত্রয়কেই সকলের প্রধান সুতরাং ত্রিত্ব বলিয়া পূজা করিতেন। এইরূপে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতিই আপন

আপন ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিত্বের মহত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন।

হিন্দু জাতির ত্রিমূর্ত্তির ন্যায় দেবদেবী ও অপরাপর বিষয়েও যেমন ত্রিসংখ্যার সংস্রব বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়, অন্যান্য জাতির মধ্যেও সেইরূপ দেখা গিয়া থাকে। গ্রীক ও রোমান জাতির ভাগ্য-দেবতা তিন জন। যথা— ক্লোথো (Clotho), ল্যাচেসিস্ (Lachesis) ও আট্রোপস্ (Atropos)। ক্লোথো জন্মের অধিষ্ঠাত্রী। নিজ হস্তস্থ পেষণদণ্ডের দ্বারা তিনি যে জীবন-কার্পাস পেষণ করেন, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী ল্যাচেসিস্ সেই পিষিত কার্পাসের দ্বারা জীবন-সূত্র রচনা করেন, আর মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী আট্রোপস্ সেই সূত্র ছিন্ন করিয়া থাকেন। ইঁহারা কার্য্যতঃ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই ত্রিকার্য্যেরই পরিচালিকা। সুতরাং ত্রিমূর্ত্তির, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবেরই অনুরূপ গুণসম্পন্না। গ্রীক জাতির ক্রোধ বা প্রতিহিংসার দেবতাও তিনজন। তাঁহারা টিসিফোন্ (Tisiphone), আলেক্টো (Alecto) এবং মেগিরা (Megæra) নামে কথিতা। করুণার অধিষ্ঠাত্রী বা কৃপাদেবীর সংখ্যাও তিন। কিন্তু তাঁহারা পরস্পর আলিঙ্গিতভাবে একত্র একাসনে উপবিষ্টা। সেই সম্মিলিতা দেবী-ত্রয়ের নাম আগ্‌লিয়া (Aglaca), থেলাইয়া (Thalia) এবং ইউফ্রোসিনী (Euphoro-syne)। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা ইঁহাদিগকে যথাক্রমে বিশ্বাস, আশা ও বদান্যতা নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। খৃষ্টধর্ম্মে যে প্রধানতম রহস্য (mystery) বিদ্যমান, তাহাও ত্রিধা বিভক্ত, যথা—ত্রিত্ব (Trinity), আদি পাপ (the Original Sin) এবং অবতার (the Incarnation)। খৃষ্টানদিগের একটী পর্ব্বাহের নাম "তিন রাজার দিন" (three Kings' Day or Epiphany)। খৃষ্টধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা যীশু যখন শিশু, তিনের চতুর্গুণ অর্থাৎ দ্বাদশ দিবস মাত্র যখন তাঁহার বয়ঃক্রম, তখন প্রাচ্যের তিন প্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞ নরপতি, কাস্‌পার, মেল্‌চিয়র ও বেল্‌থেজর, তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সেই তিন রাজার আগমন স্মরণার্থেই "তিন রাজার দিন" পর্ব্বাহের অনুষ্ঠান। মনুষ্য জাতির যে গতি, সুখ বা দুঃখ নির্দ্ধারিত হয়, মুসলমান জাতি তাহাকে 'তালেবল' নামে অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে সেই তালেবলও তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—তালেবল মক্কা, তালেবল দুনিয়া ও তালেবল ভেস্ত। এই তালেবল-ত্রয় হিন্দুর আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপেরই অনুরূপ বা নামান্তর মাত্র। হিন্দুজাতির 'ত্রিসত্য' শপথের সহিত, মুসলমানের 'তালাক' এবং নরওয়ে দেশের 'ত্রি-অঙ্গুলি' শপথের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুরা শপথকালে তিনবার 'সত্য করিয়া বলিতেছি' বাক্যের ব্যবহার করেন, কিন্তু মুসলমানেরা বিবাহবন্ধন ছেদন বা স্ত্রী পরিত্যাগ কালে, স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া, 'আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম' এই বাক্য বার-ত্রয় উচ্চারণ করেন, আর নরওয়েবাসীরা শপথগ্রহণকালে, অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই ত্রি-অঙ্গুলি প্রদর্শন বা ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া থাকেন। বৌদ্ধতান্ত্রিকদিগের অন্যতম দেবতার নাম 'সমাজগুহ্য'। ইঁহার তিন যোড়া হাত ও তিনটী মস্তক। জৈনদিগের একদেব ও দেবী যথাক্রমে 'ত্রিমুখ ও ত্রিমুখা' নামে অভিহিত। বলা বাহুল্য উভয়েরই মস্তকের সংখ্যা তিন। সুদূর নিউজিলাণ্ড দ্বীপের অসভ্য ও নরখাদক

মেয়রী (Maori) জাতি ও ত্রিত্বে বিশ্বাসী। তাহারা প্রধান বলিয়া যে দেবতার অর্চ্চনা করে তাহার নাম 'মাওই-রাঙ্গা-রাঙ্গুই (Maoui-Ranga-Rangui)। মেয়রী ভাষায় 'মাওই, রাঙ্গা ও রাঙ্গুই এই তিন শব্দের অর্থ যথাক্রমে পিতা, পুত্র ও পক্ষী। সুতরাং মেয়রী দেব পিতা পুত্র ও পক্ষী এই তিনের মিলনে সংগঠিত, আর তজ্জন্য ত্রিদেহধারী।

ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় স্বভাব-শাস্ত্রেও, এই পরিদৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগতেও তিনের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সংসারের সমস্ত পদার্থই কালের অধীন। কালেই জগতের উৎপত্তি, কালেই স্থিতি ও কালেই লয়। এই কালও তিন অংশে বিভক্ত, যথা—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। ত্রিধাভিন্ন কালের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম অহোরাত্র। অহোরাত্রও তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—দিবা, রাত্রি ও সন্ধ্যা। দিবা ভাগ আবার প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, ও সায়াহ্ন এই তিন অংশে এবং রাত্রিও যাম-ত্রয়ে পৃথকীকৃত। পৃথিবীতে যত বিধ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার প্রত্যেকটাই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন— প্রথম বা বাল্যাবস্থা, মধ্যম বা যৌবনাবস্থা এবং তৃতীয় বা বৃদ্ধাবস্থা। সকল পদার্থেরই আদি, মধ্যম ও অন্ত এই তিন অংশ বর্ত্তমান। শারীরিক হ্রাস, বৃদ্ধি প্রভৃতি অনুসারে সমগ্র জীব-সমাজও উক্ত অবস্থাদির বশতাপন্ন। ত্রিবিধ দশাগ্রস্ত জীব-সমাজ আবার গঠন, উপাদান, লিঙ্গ, বৃত্তি ও বাসস্থান প্রভৃতি ভেদে যথাক্রমে ত্বক, মাংস ও অস্থি; শরীর, প্রাণ ও আত্মা; পুং, স্ত্রী ও নপুংসক; জাগ্রৎ, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন এবং স্থলচর, জলচর ও উভচর প্রভৃতি তিন তিন ভাগে পৃথকীভূত। মানবজাতির মনে সময় ও কার্য্যবিশেষে যে মত্ততা বা গর্ব্বের আবির্ভাব হয়, তাহার মূল তিনটী, যথা—ধন, বিষয় ও আভিজাত্য। পৃথিবীতে যত প্রকার বর্ণ বা রং দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলও তিনটীর অধিক নহে। সেই তিনটী মূল বর্ণের নাম নীল, পীত ও লোহিত। এই বর্ণ-ত্রয়ের পরস্পর সংমিশ্রণে হরিতাদি সপ্তবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। রামধনু সপ্তবর্ণের একমাত্র আধার হইলেও, উহাতে ত্রিবর্ণের,—নীল, পীত ও লোহিতেরই—অধিক প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর গঠন ও তিন মূল পদার্থে নিষ্পন্ন। সেই পদার্থ তিনটীর নাম জান্তব, উদ্ভিজ্জ ও খনিজ অথবা বায়ু, জল ও মৃত্তিকা। সংসারে যত প্রকার কটু, কষায় ও মিষ্ট দ্রব্য বিদ্যমান, সমস্তই গুণ ও প্রয়োজন অনুসারে, তিন তিনটী প্রধান ভাগে বিভক্ত। কটু যথা—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; কষায় যথা—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এবং মিষ্ট যথা—ঘৃত, মধু ও শর্করা। মানবদেহে নাড়ীর সংখ্যা সার্দ্ধ ত্রিকোটি হইলেও প্রধান নাড়ী তিনটীর অধিক নহে। সেই নাড়ীত্রয় ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে পরিচিত। মানবজাতিকে সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে বংশ বা গোষ্ঠী বিশেষের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকিতে হয়। সেই বংশ বা গোষ্ঠীর সাধারণ নাম কুল। কুলও ত্রিবিধ; যথা—পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুর-কুল। এইরূপ সকল জাতির সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থে, সমগ্র মনুষ্য সম্প্রদায়ের-সর্ব্ববিধ আচার-ব্যবহারে এবং প্রাকৃতিক জগতের সর্ব্বত্রই তিনের প্রাধান্য পরিস্ফুটরূপেই প্রকাশমান। তিন ব্যতীত অপর কোন সংখ্যার ভাগ্যেই ঈদৃশ প্রাধান্য, এরূপ বিশ্বজনীন গৌরব বা সম্ভ্রম লাভ সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং

পাঁচ, নয়, বার, আঠার বা চৌরাশি কোনও সংখ্যাই সেই উদ্দিষ্ট বিশেষ সংখ্যা নহে। তিনই সেই সংখ্যা, আর তজ্জন্যই ইহার জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এরূপ সমাদর বা প্রসার-প্রতিষ্ঠা।

ত্রিসংখ্যার এই বিশেষত্ব ইহার দ্বি, ত্রি গুণিত অর্থাৎ ছয় ও নয় সংখ্যাতেও প্রায় তুল্যরূপেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। চতুঃ, পঞ্চ গুণিত অর্থাৎ বার, পনের প্রভৃতি সংখ্যাতেও যে লক্ষিত হয় না, এমন নহে। তবে তাহার পরিমাণ ছয় ও নয় হইতে বহু-অংশেই ন্যূন। এই জন্য এবং অন্য আরও অনেক কারণ বশতঃ, ছয় ও নয় ব্যতীত, বার ও পনের প্রভৃতি সংখ্যা ত্রিত্বের বহির্ভূত, আর তিন প্রকৃত ত্রিত্বসূচক এক বচন. ছয় দ্বিবৃত্ত বা দ্বিত্রিত্বসূচক দ্বিবচন এবং নয় ত্রিবৃত্ত বা ত্রিত্বের ত্রিত্ব অর্থাৎ বহু-বচন রূপে পরিগণিত। কিন্তু তিনের প্রাধান্য প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, ইহার দ্বি ও বহুবচন সম্বন্ধে আলোচনা করা আমরা তত প্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ করিলাম না। এজন্য, ছয় ও নয় সংখ্যার আলোচনা দ্বিতীয় প্রস্তাবের বিষয়ীভূত রাখিয়া, এই স্থলেই আমরা 'তিন' প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। অলমিতি।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

সুপুর

বীরভূম হেতমপুরের বিদ্যোৎসাহী কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর বহুদিন যাবৎ 'বীরভূম ইতিহাসে'র উপাদান-সংগ্রহকার্য্যে ব্রতী আছেন। উদ্যম মহৎ ও সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়। 'গৃহস্থে'র ভাদ্র সংখ্যায় সম্প্রতি তাঁহার এই মহতী উদ্যমের ফল-স্বরূপ 'সুপুর'-শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'সুপুর' বীরভূমের অন্তর্গত একখানি গ্রামের নাম। প্রবন্ধটী তাহারই প্রাচীনইতিবৃত্ত-সংগ্রহ। প্রবাদ-প্রসঙ্গই ইহার মূলভিত্তি। প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্য যদিও নাই, কিন্তু আলোচনার গতি ও প্রবাদ-সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা কহিতে গেলে তবুও অশোভন হইবে না বলিয়া মনে হয়, আশা করি কুমার বাহাদুর অবধান করিবেন।

কিম্বদন্তীসমূহের আলোচনায় যে সতর্ক-দৃষ্টি প্রয়োজনীয়, 'সুপুর প্রবন্ধে' তাহা যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, যে স্থানেই কোনো প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন (অবশ্য পল্লীগ্রামের মধ্যে) সেই স্থানেই পূর্ব্বে 'বেনা-বন' ছিল! এবং যে কোনো একজন গৃহস্থের 'কপিলা গাভী' প্রতিদিন সেই বেনা-বনে দুধ ঢালিত, গৃহস্বামী গাভীর দুগ্ধ-প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়া অনুসন্ধানে সেই বিষয় জানিতে পারেন, ও ক্রোধান্ধ হইয়া বা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বেনা-বন খনন করেন। মহাদেবের আবির্ভাব এইরূপেই সংঘটিত হয়। বেনা-বন-খননকারী কোথাও বা রক্ত বমন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, কোথাও বা শিব-সেবকত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতুল ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছে। কোথাও আর কিছু ইত্যাদি।

একেবারে অমূলক না-ও হইতে পারে,

'৺তারকেশ্বরে'র মত ক্ষেত্রে হয় তো ঐরূপ ঘটিয়া থাকিবে, আর বলাই বাহুল্য যে প্রধান স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়াই ঐরূপ প্রবাদের এত আদর ও সর্ব্বত্র প্রযোজিত হইবার এতই বহুলতা। এইরূপ যে কোনো স্থানে যে কোনো সময়েই হউক কোনো অত্যাচারী কর্ত্তৃক দেবমূর্ত্তি নিগৃহীত হইয়াছে, 'কালাপাহাড়'ই তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী। দৃষ্টান্ত অনেক।

সম্প্রতি বীরভূমে আবার এক উপসর্গ জুটিয়াছে যে, পূর্ব্বকালে দুইজন সাধকের পরস্পর বন্ধুত্ব ছিল, তাহার একজন প্রাচীর চালাইতেন, একজন ব্যাঘ্র চালাইতেন ইত্যাদি। মূল কথা এই মাত্র যে—

বীরভূম 'খুষ্টীকুড়ি গ্রামে সাহ আবদুল্লা নামে একজন বুজরুক ফকীর বাস করিতেন, এ প্রদেশে তিনি বহু বিখ্যাত। দেশবিদেশস্থ বহু মুসলমান শিষ্য ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের নিষ্কর জমিদারী-স্বত্ব তাঁহার বহুগুণান্বিত চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। খুষ্টীকুড়ির নিকটেই 'মঙ্গলডিহি' নামে আর একখানি গ্রাম। কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধত্রিশত বৎসর পূর্ব্বে মঙ্গলডিহিতে শ্রীপর্ণিগোপাল ঠাকুর নামে এক সাধক বৈষ্ণব বাস করিতেন। ইঁহার বিবরণ সম্প্রতি 'বীরভূমি'র আষাঢ় সংখ্যায় 'প্রাচীন মঙ্গলডিহি' শীর্ষক প্রবন্ধে সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছি। খুষ্টীকুড়ির বর্ত্তমান জমিদার 'হজরৎ মৌলান সৈয়দসাহ মহম্মদ হোসেন' সাহ আবদুল্লার বংশধর। তিনি ও মঙ্গলডিহির বর্ত্তমান ঠাকুরগণ এবং আরো আরো অনেকেই কহিয়া থাকেন যে, 'পর্নিগোপাল ঠাকুর' ও 'ফকীর সাহ আবদুল্লা' সমসাময়িক, পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। উভয়ে যে এক সময়ের তাহার প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত অনেক আছে। উক্ত পর্ণিগোপাল ঠাকুর ও ফকীর সাহ আবদুল্লা সম্বন্ধে প্রবাদ যে ঠাকুর একদিন ব্যাঘ্রে চড়িয়া খুষ্টীকুড়ি আসিতেছিলেন, ফকীর তখন একটা প্রাচীরে বসিয়া দন্ত ধাবন করিতেছিলেন। ঠাকুরকে আসিতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি প্রাচীরটী চালাইয়া একটী পুষ্করিণীর সন্নিহিত হন এবং দন্তধাবন কাষ্ঠিকাটি মাটীতে পুতিয়া হস্তমুখপ্রক্ষালন করেন। পরে আরো অগ্রগমন পূর্ব্বক ঠাকুরের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসেন। 'দাতন কাঠীর গাছ' বলিয়া একটী অদ্ভুত তেঁতুলবৃক্ষ আজিও খুষ্টীকুড়িতে বর্ত্তমান আছে। ফকীরের সযত্ন-রক্ষিত পুষ্করিণীর 'গাংগড়ো' 'গঙ্গা গড়ো' নাম আজিও ঠাকুরের সহ বন্ধুত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। মঙ্গলডিহি ঠাকুরবংশের শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর বিরচিত প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় নাটকে' গ্রন্থের নান্দী স্বরূপ এই সংস্কৃত শ্লোক দুইটী লিখিত আছে।

"মন্দিরে বর্ত্ততে যস্য শ্যামসুন্দরবিগ্রহ
পর্ণীবিক্রয়দ্রব্যেন পূজা যেন কৃতা পুরা,
'যবনাম্নং কৃতং পুষ্প ব্যাঘ্রে মন্ত্রপ্রদায়কং'
ত্বং নত্বা পর্ণিগোপালং ক্রিয়তে পুস্তকং ময়া"।

প্রবাদ সাহ আবদুল্লার প্রেরিত 'খানা' পর্ণিগোপাল বাহাদুর পুষ্পে পরিণত করিয়াছিলেন। ফকীর ও ঠাকুর একাসনে বসিলে আসন তৎক্ষণাৎ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যাইত ইত্যাদি।

খুষ্টীকুড়ির বর্ত্তমান জমিদার মহাশয় বলেন যে "হজরৎ সাহ আবদুল্লা খঞ্জ ছিলেন না, বা একশত সত্তর বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বংশে খঞ্জ কেহ বুজরুক ছিলেন না। এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধান না করিয়াই সাড়ে

তিন শত বৎসরের ঘটনা এক শত সতর বৎসরে টানিয়া আনা বা আনন্দ চাঁদ গোস্বামীর সঙ্গে ফকীরের প্রবাদ জড়িত করা বিশেষ সমীচিন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু কুমার বাহাদুর 'বীরভূমি'ও পাঠ করিয়া থাকেন।

স্বপুর সম্বন্ধে আরো একটী কথা সুপুরকে টানিয়া বুনিয়া দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীর "ততো স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ।" শ্লোকটী হইতে 'স্বপুরের' অপভ্রংশে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এটী অত্যন্ত ছেলেমি হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মহামহোপাধ্যায় নাগোজী ভট্টকৃত অতি প্রাচীন ও শ্রীমদ্ গোপাল চক্রবর্ত্তী কৃত 'তত্ত্বপ্রকাশিকা নাম্নী' অতি প্রসিদ্ধ টীকা বর্ত্তমান। বিশ্রুতনামা পণ্ডিতবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ও সম্প্রতি 'দেবীভাষ্য' নামে চণ্ডীর এক বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। 'বঙ্গবাসী'-প্রকাশিত সংস্করণে চণ্ডীর এই তিনটী টীকা ও ভাষ্য বর্ত্তমান আছে। বিশদ বঙ্গানুবাদও আছে। কিন্তু সমগ্র চণ্ডী অনুসন্ধান করিয়াও আমরা 'স্বপুর মানে যে রাজধানীর নাম' এরূপ অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না, প্রাচীন তীর্থ-সমূহের ভৌগোলিক সংস্থান পুরাণে যথাযথ রূপেই বর্ণিত আছে। 'স্বপুর' সুপুর হইলে নাগোজি ভট্ট বা গোপাল চক্রবর্ত্তী কি তর্করত্ন মহাশয়ও অবশ্যই তাহা অবগত হইতেন এবং উল্লেখ করিতেও ভুলিতেন না। 'সুরথেশ্বর' শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠার কথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে কি? লক্ষ-বলির বা বলি-পুরের কথাও চণ্ডীতে নাই। চণ্ডীতে আছে সমাধি ও সুরথ—

'নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ
দদতুস্তৌ বলিং চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্'

বলা অনাবশ্যক যে প্রবাদের সঙ্গে কল্পনা মিশাইয়া ঠাকুরমার কাহিনীর সৃষ্টি ইতিহাস নহে, কেবলমাত্র সুরথেশ্বর শিব ও বলিপুরের নৈকট্য দেখিয়া স্বপুরকে সুপুর অনুমানে উদ্ভাবনী শক্তির সার্থকতা হয় না। 'মেধসাশ্রম' ডুমরাবন হইবে কেন, পুরাণে তন্নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে

'কর্ণফুলী সমারভ্য দক্ষিণং সাগরং যযৌ"।

ইত্যাদি রূপ বচন লিখিত আছে। কথা এই যে প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে হইলে 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মত সমবেত উদ্যোগের প্রয়োজন। একনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা, অজস্র অর্থব্যয় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন। দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমারের মত মহানুভব পৃষ্ঠপোষক চাই, সুবিজ্ঞ সুধী অক্ষয়কুমারের মত গুরু ও ঐতিহাসিক রমা-প্রসাদের মত সাধক চাই, অন্যথায় বীরভূমের ইতিহাস আস্‌মান হইতে গজাইবে না। হেতমপুরের কুমার বাহাদুরের 'বীরভূম রাজবংশ' ও বারেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির 'গৌড়রাজমালা' পাঠ করিলেই এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। ইতিহাস লিখিবার ইচ্ছা হয় কুমার বাহাদুর বীরভূম 'বারেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি'র মত একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করুন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

সহজসাধ্য চিকিৎসা-প্রণালী

চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুবিজ্ঞ ডাক্তার-কবিরাজ-গণকে যে সকল দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য করিতে অনেক সময় বিশেষ বেগ পাইতে হয় এবং অনেক স্থলে তাঁহারাও অকৃতকার্য্য হ'ন এই সকল রোগের অত্যাশ্চর্য্য ঔষধসমূহ আমাদের বৃদ্ধ পিতামহ ও পিতামহীরা অবগত আছেন। এই সকল ঔষধের উপকরণ-সংগ্রহ, ও প্রস্তুত-প্রণালী একটু অসুবিধা-জনক এবং ইহাদের প্রয়োগ-প্রণালী একটু 'গাওয়া' ধরণের বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের আদর একেবারে কমিয়া গিয়াছে। এখন কেহ আর এই সকল ঔষধ ও মুষ্টি-যোগাদি শিখিয়া রাখে না; সুতরাং অনেক অমোঘ ঔষধ ও মুষ্টিযোগ একেবারে লোপ পাইয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি শীঘ্রই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইবে। অন্যান্য ঔষধ হইতে এই গ্রাম্য ঔষধ ও মুষ্টিযোগাদি অনেকটা সুবিধাজনক। প্রথমতঃ এইগুলি উগ্র, বিষাক্ত বা পারদমিশ্রিত নহে, তাই ইহাদের প্রয়োগে রোগোপশমের পরিবর্ত্তে রোগের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোন সম্ভাবনা নাই; দ্বিতীয়তঃ এইগুলি সহজপ্রাপ্য (অবশ্য সহরবাসীদের পক্ষে না-ও হইতে পারে), আর তৃতীয়তঃ এই সকল ঔষধের উপকরণ-সংগ্রহার্থে পয়সা-খরচ বড় করিতে হয় না। এই সকল সুবিধার কথা ভাবিয়াই আমি এই সকল ঔষধ ও মুষ্টিযোগ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার এরূপ চেষ্টা দেখিয়া এই সভ্য ও বৈজ্ঞানিক যুগের অনেকে উপহাসও করিতে পারেন; তাঁহারা বলিতে পারেন—চা'র পয়সা খরচ করিলেই যখন একদাগ ঔষধ পাওয়া যায়, তখন এই সকল 'গাওয়া' ঔষধের উপকরণ-সংগ্রহের বৃথা চেষ্টা কেন? আমার উত্তর এই যে, পল্লীগ্রামে সকল সময় পয়সা খরচ করিলেও কবিরাজী বা ডাক্তারী ঔষধ না পাওয়া যাইতেও পারে; আর কোন কোন পীড়ায় কবিরাজী-ডাক্তারী ঔষধ অপেক্ষা এই সকল মুষ্টিযোগই সত্বর ও সমধিক ফলোপ-দায়ক; তা' ছাড়া উগ্রবীর্য্য বা পারদমিশ্রিত ঔষধ সেবন করিয়া শরীর নষ্ট করা অপেক্ষা সহজপ্রাপ্য ও নির্দ্দোষ ঔষধ সেবনই শতগুণে ভাল। ভরণ (মস্তকের প্রলেপ) প্রভৃতির ব্যবহার শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে বড় নাই, তবে দরিদ্র গ্রামবাসীদিগকে এই সকল মুষ্টিযোগ শিখাইয়া দিলে তাহাদের অনেক উপকার হইতে পারে। স্ত্রীলোকদের সূতিকা ও সান্নিক সম্বন্ধীয় পীড়ায় এই সকল ভরণই সমধিক ফলদায়ক; সেই জন্যই পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে এই সকল রোগের যন্ত্রণা বড় ভোগ করিতে দেখা যায় না।

প্রত্যেক পল্লীগ্রামের লোকেরা এইরূপ অনেকানেক মুষ্টিযোগ ও ভরণাদির বিষয় অবগত আছে; ইহাদের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া কেহ সংগ্রহ ও প্রকাশ করিলে অনেক লোকের উপকার হইতে পারে। আমি কয়েকটি মাত্র মুষ্টিযোগ ও ভরণের কথা এইবার নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম; তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই আমার সম্মুখে পরীক্ষিত হইয়াছে; অবশিষ্টগুলির উপকারিতার বিষয় আমি বিশেষ বিশ্বস্ত লোকের নিকট অবগত হইয়াছি। এই সংগ্রহ-প্রবন্ধে আমাকে

কয়েকটা ভেষজের নাম ব্যবহার করিতে হইয়াছে; তবে যথাসাধ্য ভেষজগুলির পরিচয়ও দিয়াছি। তদ্ব্যতীত 'ভরণ' মস্তকের প্রলেপার্থে ও 'আধখানি মাথা বিষ' অর্দ্ধাবভেদার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হামের প্রতিকার

১। গায়ে হাম হইলে, তৃতীয় দিবসে, উষ্ণজলে শীতল জল মিশাইয়া রোগীর গা ধোওয়াইয়া দিতে হইবে। পরে মেথিসহ হলুদের রসে, সেইচার (একপ্রকার শাক) রসে জারিত তৈল ঠাণ্ডা করিয়া গায়ে মাখাইয়া দিতে হইবে। তৎপরে তুলসীর মঞ্জরী, বেলপাতার কুড়ি (নবজাত বিল্বপত্র), পিপ্পলী ১টা, জায়ফল ১টা এবং আদা একত্র করিয়া পিশিয়া একটু গরম করিয়া রোগীর মাথায় ভরণ দিতে হয়। সন্ধ্যাকালে আবার ইহা মাথা হইতে রাখিয়া দিতে হয়। তার পরদিবস আবার ঠিক সেই ভরণই একটু জল দিয়া পিষিয়া মাথায় দিতে হয়। তার পরদিনও ঠিক এইভাবে দিতে হয়। ইহাতে হাম (শ্রীহট্টে পেচরা, ফেরা) শীঘ্রই সারিয়া যায়। তবে সান্নিকের প্রভাব লক্ষিত হইলে শেষের দুইদিবস কেবল শীতল জলে রোগীর শরীর ধৌত করিতে হয়।

হাম খুব বেশী হইলে উপরিলিখিত মুষ্টি-যোগে একেবারে না সারিতেও পারে; এরূপ অবস্থায় আমের শাঁস, থৈকল (অম্লবেতস) ও সাতকরার (একপ্রকার জামির) শুঁটি, এবং আদা একত্র পিষিয়া ক্রমান্বয়ে দুই দিন মাথায় ভরণ দিতে হইবে। পরের দিন ঠিক সেই ভরণই একটু তৈল মিশাইয়া মাথায় দিতে হইবে। এবং তৎপর দিবস শর্ষপ বা জারিত তৈল রোগীর মাথায় মাখাইয়া দিয়া, পরে আবার সেই ভরণ মাথায় দিলে রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিবে; ইহাতে সন্দেহ নাই।

(পরীক্ষিত)

২। জ্বর একটু কমিয়া আসিলে যদি রোগীর মাথা ভার ভার বলিয়া মনে হয়, বেদনা করে, মুখে স্বাদ না থাকায় কিছু খাইতে না পারে অথবা যদি জ্বরে কুপথ্য করা হয়, তবে নিম্নলিখিত ভরণ নিয়মমত ব্যবহার করিলে এই সমস্ত দোষ সারিয়া যাইবে। জরিপাতা (ঝিন্টির পাতা), পিপ্পলীর পাতা, ও আদা পিষিয়া একটি ভরণ তৈয়ার করিতে হয়। সকালে মুখ ধোওয়ার পর অথবা স্নানান্তে উক্ত ভরণ ঈষদুষ্ণ করিয়া মাথায় দিতে হয়। সন্ধ্যাকালে আবার খুলিয়া রাখিয়া দিতে হয়। পরের দিন ঠিক সেই ভরণই একটু জল পুরাইয়া আবার পিষিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ও সময়ে ভরণটি মাথায় দিতে হয়। তৃতীয় দিন আপাঙ্গের পাতা, আফুলো আমগাছের ছাল, আফুলো আমড়া গাছের ছাল, বড়পেনা (পানা) আদা ও জায়ফল একটি একত্র পিশিয়া মুখ ধোওয়ার পর বা স্নানের পর ঈষদুষ্ণ করিয়া মাথায় দিতে হয়। সন্ধ্যাসময়ে আবার খুলিয়া রাখিবে। তৎপর দিন আবার পূর্ব্বোক্ত সময়ে ঠিক সেই প্রলেপই ঈষদুষ্ণ করিয়া মাথায় দিতে হয়। তার পরদিনও ঐরূপ ভাবে ভরণটি ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই রোগীর কুপথ্যের দোষ, মুখের স্বাদবিহীনতা কাটিয়া যাইবে।

(পরীক্ষিত)

৩। (ক) বায়ুর আধিক্যবশতঃ স্ত্রীলোকদের মাথা কামড়াইলে, মাথা কন্‌কন্‌ করিলে অথবা ঘাড়ে বেদনা করিলে, কদম ফুলের কচিকচি পাতা কয়েকটা, শামুকের ভিতরের নরম নাড়ীভুড়ি প্রভৃতি এবং কয়েকটা লবঙ্গ

একত্র করিয়া পিষিয়া মাথায় ভরণ দিলে, মাথাকামড়ান প্রভৃতি নিবারিত হয়।

(পরীক্ষিত)

(খ) স্পর্শবায়ুর পাতা (অশ্বথ-বটের পাতার মত পাতা) আদাসহ বাঁটিয়া মাথায় ভরণ দিলেও পূর্ব্বোক্ত মাথা কামড়ান প্রভৃতি নিবারিত হয়।

৪। কুচ্‌কি ফুলিলে বন-কাউকরার পাতা (ইহার গাছ ছোট ছোট লতার মত, ফলও খুব ছোট, পাকিলে কাল হইয়া যায়, ইহা হইতে তখন ব্লু-ব্ল্যাক কালী প্রস্তুত হইতে পারে) আদাসহ পিষিয়া খুব গরম করিয়া কুচ্‌কিতে লাগাইয়া দিলে, ফুলা যাইবে। ব্রণ স্থানে লাগাইলে, উহা মিলাইয়া যাইবে। বেদনাযুক্ত স্থানে লাগাইলে বেদনা দূরীভূত হইবে।

৫। (ক) শরীরের কোথাও গরল নামীয় চর্ম্মরোগ হইলে, খই পোড়ার পাতা (ইহার গাছ ছোট ছোট, ফল পাকিলে কাল হইয়া যায়, তখন খাইতে মিষ্ট লাগে) আদার সহিত একত্র বাঁটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া গরলাক্ত স্থানে লাগাইয়া দিলে গরল রোগ সারিয়া যায়।

(পরীক্ষিত)

(খ) গরল পাতা (পাষাণভেদী বা পাষাণ-চুণা) আদার সহিত বাঁটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া গরলাক্ত স্থানে লাগাইয়া দিলেও গরল-রোগ যায়। (আমি নিজে পরীক্ষা করিয়াছি।)

৫। গনোয়ারীর পাতা আদার সহিত পিষিয়া পাকা ব্রণে লাগাইলে, ৪ দণ্ডের মধ্যে ব্রণ নিশ্চয়ই ফাটিয়া যাইবে। (পরীক্ষিত)

৭। (ক) স্ত্রীলোকদের প্রদর রোগ হইলে, আপাঙের পাতা, ডালিমের কচিপাতা—এই সকল একত্র করিয়া নিরামিষ ঝোল রাঁধিয়া খাইলে উক্ত পীড়ার উপশম হয়। (পরীক্ষিত)

(খ) কেউন্দের (ইহার গাছ মূল্যবান্, ফল গোলাপের ফলের মত, কিন্তু একটু বড়, এই ফলের কষ দিয়া নৌকায় রঙ্গ করা হয়, ইহাতে নৌকা মসৃণ হয় ও নৌকায় ময়লা সহজে ধরে না) কাঁচা ফল কাটিয়া আওয়া-দুধে (যে দুধ জাল দেওয়া হয় নাই) ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ইহার কষে দুধ কাল হইয়া গেলে ঐ দুধ পান করিবে। ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত পীড়ার উপশম হয়।

(পরীক্ষিত)

(গ) ভূত পালঙের শিকড় সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া, সাপইবিরুণের খইসহ একত্র চূর্ণ করিয়া প্রত্যহ সকালে আধপোয়া পরিমাণ এই চূর্ণ খাইলে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবে। (পরীক্ষিত)

৮। জলজ ছুইতে-মরার পাতার রস আধ পোয়া, ঘলঘসিয়ার (দ্রোণপুষ্পের) পাতার রস এক ছটাক, কাঁচা দুধ আধ পোয়া একত্র মিশাইয়া পান করিতে হয়। তাহার পর ছুইতে-মরার পাতার রস গোলমরিচ লবণাদি-সহ ঝোল রাঁধিয়া ৩।৪ বার খাইলে শক্ত আমাশয় রোগও ২।৩ দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইয়া যায়। (পরীক্ষিত)

জলজ ছুইতে-মরার ছালের ভিতরের নরম অংশটুকুর রস আধ পোয়া, কাঁচা দুধ আধ পোয়া সহ প্রত্যহ সকালে আহারের পূর্ব্বে পান করিয়া তিন সপ্তাহের মধ্যে দুরারোগ্য প্রমেহ রোগী আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়াছি। (পরীক্ষিত)

১০। (ক) গোকুল ফুলের বীজের শাঁস উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বাংলা পানের ডাঁটা দ্বারা নস্য লইতে হয়। তার পর নাশারন্ধ্র দিয়া জল আসিলে, নস্য লওয়া বন্ধ করিতে হয়। তৎপর জলপড়া বন্ধ হইলে আবার নস্য

লইতে হয়। এইরূপ করিলে নাশারন্ধ্রদ্বয় দিয়া অবশেষে দূষিত রক্ত পর্য্যন্ত আসিবে। যখন রক্তপড়া বন্ধ হইবে তখন আধখানিমাথা বেদনাও দূরীভূত হইবে। আর কখনও এরূপ মাথা বেদনায় ধরিবে না। (পরীক্ষিত)

(খ) জায়ফল ১টা, কর্পূর ৫, লম্বা তেলা-কুচার পাতা ৫।৬টা একত্র পিষিয়া ভরণ তৈয়ার করিবেন। যাহার মাথা ব্যথা, তাহার তালু হইতে চুল ফেলিয়া দিবেন, তারপর স্নান করিবেন (পূর্ব্বে স্নান করা হইয়া গেলে তখন কেবল শীতল জলদ্বারা মাথা ধুইলেই হইবে) তৎপর কাকিয়ার (এক প্রকার মাছ) মুখের ধার (দন্তরূপী কণ্টকগুলা) দ্বারা মাথা ছুকাইয়া পূর্ব্বোক্ত ভরণ শীতলাবস্থায় ছোকান-স্থানে বসাইয়া দিবেন। যতদিন মাথা বেদনা থাকিবে ততদিন এই ভরণ তুলিবেন না। এমন কি স্নানকালেও তোলা উচিত নয়; যদিও কোন কারণে উঠিয়া যায় তবে আবার বসাইয়া দিতে হয়। মাথা বেদনা নিঃশেষ করিয়া তবে ভরণ উঠিবে।

১১। সান্নিকের প্রাবল্যবশতঃ বা এইরূপ অন্য কোন কারণে কাণে কম শুনিলে নিম্ন-লিখিত ভরণ দিতে হয়। জঙ্গী হরিতকী ১টা, মাসকলাই ৮।১০টা, পত্রযুক্ত কেশুর্ত্তে লতার অগ্রভাগ সহ একত্র শীতল জলদ্বারা পিষিয়া সকালে ঠাণ্ডা জলে মাথা ধোয়ার পর মাথায় দিতে হয়। সন্ধ্যাকালে আবার মাথা হইতে নামাইয়া রাখিতে হয়। এইরূপে পরের দিন সকালেও ঠিক সেই ভরণই আবার ঠাণ্ডা জলে পিষিয়া দিতে হয়। এইরূপ ভাবে ক্রমাগত ৩ দিন দিলেই কম-শুনার দোষ নিবারিত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ পাল।

সমুদ্রযাত্রা *

[এই প্রবন্ধে বর্ত্তমান কালের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয় যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র সর্ব্বাংশে গৃহীত না হইতেও পারে। আমরা হিন্দুর বিদেশ-গমন, বিদেশে হিন্দুটোলা-স্থাপন, জগতে হিন্দু-কীর্ত্তি-প্রচার সর্ব্বত্র হিন্দু-আদর্শের প্রবর্ত্তন ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ব্বে নানারূপ আলোচনা করিয়াছি। বিদেশ-গামী এবং বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য, জীবন-যাপন ইত্যাদি সম্বন্ধেও মত প্রকাশ করিয়াছি। আমরা যে কোন অবস্থায় যে কোন লোকের বিদেশ-গমন সম্বন্ধে উৎসাহী নহি—অথচ আধুনিক যুগে বিদেশ-গমন, সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদির বিরোধীও নহি।

সে যাহা হউক, তর্করত্ন মহাশয় হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া আনুষঙ্গিক ভাবে যে সকল প্রাচীন ইতিহাসের তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা গ্রহণীয়। অধিকন্তু, প্রাচীন ভারতে 'সমুদ্র-যাত্রা' যে প্রচলিত ছিল, সমুদ্র সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া হিন্দুগণ ব্যবসায়াদি নিয়ন্ত্রিত করিতেন, এই প্রবন্ধে অবান্তর ভাবে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তর্করত্ন মহাশয়ের আলোচনায় বুঝা যায় প্রাচীন হিন্দুসমাজে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, সমুদ্রযাত্রা যথেষ্ট প্রচলিতও ছিল। ইহা হইতে সমাজ-সংস্কারকেরা যে কর্ত্তব্যই নির্দ্ধারণ করুন—ঐতিহাসিকগণ দেখিতেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমুদ্র-যাত্রার সবিশেষ প্রসারই ছিল। এই ঐতিহাসিক-তথ্য-প্রচারের জন্যই অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের ভারতীয় সমুদ্র-বাণিজ্য ও নৌবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ। অধ্যাপক মহাশয় তর্করত্ন মহাশয়ের আলোচনা হইতে কিছু নূতন প্রমাণ পাইবেন বিশ্বাস করিতেছি।]

* 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' হইতে উদ্ধৃত

এই মাসের 'গৃহস্থে' শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সমুদ্রযাত্রা লিখিয়াছেন। তাহাতে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মতের কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ আছে। আমরা তর্করত্ন মহাশয়কে তাহা দেখাইয়াছিলাম।

* * *

আমি আপনার নিকট প্রশ্ন করিতেছি, সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে আপনার মত কি তাহা আমাকে বিস্তৃতরূপে উপদেশ দিন। আমি সেইমত 'ব্রাহ্মণসমাজে' প্রকাশ করিব।

তর্করত্ন মহাশয় হাস্য করিয়া বলিলেন, চতুরতা প্রকাশ করিয়াছ বটে;—তা হউক, তুমি সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যাহা জানিতে চাও, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন কর।

প্রশ্ন। বৃহন্নারদীয় পুরাণ বচনে যে সমুদ্রযাত্রা স্বীকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কি মরণার্থ সমুদ্র-প্রবেশ, না সাধারণ সমুদ্রযাত্রা? অথবা সমুদ্রে তীর্থযাত্রা?

উত্তর—ঐ বিষয়ে প্রথমোক্ত দুই মতই প্রসিদ্ধ। আর ঐস্থলে পাঠভেদও আছে;—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য "সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ" এই পাঠ ধরিয়াছেন, অন্যত্র "সমুদ্রযাতুঃ স্বীকারঃ" এই পাঠ আছে। দ্বিতীয় পাঠের অর্থ—যে ব্যক্তি সমুদ্রপথে যাত্রা করে—তাহাকে লইয়া ব্যবহার নিষিদ্ধ। প্রথমপাঠে "স্বীকার" শব্দ নিরর্থক। তবে যদি "স্বীকার" অর্থে সংসর্গ ধরা যায়, তাহা হইলে নিরর্থক হয় না, কেননা—"সমুদ্রযাত্রা" এই শব্দটী তৃতীয়ান্তও হইতে পারে, সমুদ্রযাতৃ শব্দের তৃতীয়ার একবচন—তৃতীয়া সহার্থে, তাহাতে দ্বিতীয় পাঠের সহিত এক অর্থই হয়। বলা বাহুল্য এ মতে সমুদ্রপথে যাত্রাই প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে।

প্রশ্ন। সমুদ্রযাত্রা স্বীকার শব্দে—মরণার্থ সমুদ্র যাত্রা;—ইহা কোন্ গ্রন্থকারের মত এবং সে পক্ষে যুক্তি কি? সমুদ্রে তীর্থযাত্রা এ কথা যাহারা বলেন, তাঁহাদেরই বা যুক্তি কি?

উত্তর—তত্ত্বটীকাকার কাশীরাম বাচস্পতির মতে—সমুদ্রযাত্রা স্বীকার অর্থে—মরণার্থ জলপ্রবেশ। এই পক্ষের প্রধানযুক্তি "ইমান্ ধর্ম্মান্" আছে। মরণার্থ সমুদ্রযাত্রা হইলে—তাহা ধর্ম্মরূপে গণ্য হইতে পারে, বাণিজ্যাদির জন্য সমুদ্রপথে যাত্রা হইলে তাহা ধর্ম্মরূপে গণ্য হইতে পারে না। সমুদ্রে তীর্থযাত্রা-নিষেধের পক্ষেও ইহাই যুক্তি।

প্রশ্ন। আপনার এ বিষয়ে মত কি?

উত্তর। আমি এই যুক্তি সমীচিন মনে করি না; কেননা—দ্বিজাতির শূদ্রকন্যা বিবাহ ধর্ম্ম নহে, বরং তাহা পূর্ব্বযুগেও অধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ।

এবং—

"শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং"
মনু—৩য় অঃ।

অধর্ম্ম হইলেও তখন বিবাহ অসিদ্ধ হইত না,—বৃহন্নারদীয়পুরাণ-বচনাদির প্রভাবে কলিকালে ঐরূপ বিবাহ অসিদ্ধ হইয়াছে। ঐরূপ বিবাহ যদি অধর্ম্ম হইয়াও "ইমান্ ধর্ম্মান্" এই বচনে ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে—তাহা হইলে বাণিজ্যাদির জন্য সমুদ্রপথে যাত্রাকে ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিতে অপরাধ কি? আরও দেখ, শ্রাদ্ধে মাংস আহার যে ধর্ম্মকার্য্য তাহা কোথাও নাই—অথচ ঐ বচনে "মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে"—বলিয়া "ইমান্ ধর্ম্মান্" বলা হইয়াছে,—অর্থাৎ তাহাকেও ধর্ম্মের অন্তর্গত করা হইয়াছে—

অতএব এখানে ধর্ম্ম শব্দ ছত্রিন্যায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে। ছত্রিন্যায় শারীরক ভাষ্যাদিতে গৃহীত হইয়াছে। দশজন লোক যাইতেছে, তাহার মধ্যে কয়েকজনের মস্তকে ছত্র থাকিলেই লোকে বলে, ঐ ছত্রধারীরা যাইতেছে; যাহার ছত্র নাই সে ব্যক্তিও এই 'রা'র মধ্যে পড়িয়া থাকে। এখানেও সেইরূপ ধর্ম্ম না হইয়াও কয়েকটি কর্ম্ম ধর্ম্মের দলে পড়িয়াছে। ছত্রিন্যায় না বুঝ ত,—এস্থলে ধর্ম্মশব্দে প্রচলিত আচার মাত্র গ্রহণ কর, সমুদ্রপথে যাত্রা সেই প্রচলিত আচারের অন্তর্গত ছিল, তাহাই নিষিদ্ধ হইয়াছে—ইহা বলিলে কিছু ক্ষতি আছে কি ?

যে আচার বা কর্ম্ম সমাজে প্রচলিত—সেই অর্থেও ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।

মেদিনী অভিধানে আছে—

"ধর্ম্মোঽস্ত্রী পুণ্য আচারে স্বভাবোপময়োঃ
ক্রতৌ। অহিংসোপনিষন্ন্যায়ে।"

ধর্ম্ম শব্দের নানা অর্থ, যথা (১) পুণ্য (২) আচার (৩) স্বভাব (৪) উপমা (৫) যজ্ঞ (৬) অহিংসা (৭) উপনিষৎ এবং (৮) ন্যায়।

কেবল পুণ্য বা পুণ্যজনক কর্ম্ম যে ধর্ম্ম-শব্দ বাচ্য, তাহা নহে; যে আচার নিন্দিত তাহা বুঝাইবার জন্যও ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ নানাস্থানে আছে, যথা—বামনপুরাণ—

পরদারাভিমর্শিত্বং পরার্থেঽপি চ লোলুপা।
স্বাধ্যায়স্ত্র্যম্বকে ভক্তির্ধর্ম্মোঽয়ং রাক্ষসঃ স্মৃতঃ।
অবিবেকতাথাজ্ঞানং শৌচহানিরসত্যতা।
পিশাচানাময়ং ধর্ম্মঃ সদা চামিষগৃধ্নুতা॥

অর্থাৎ—রাক্ষসের ধর্ম্ম পরদারহরণ, পর ধনে লোভ, বেদ পাঠ ও শিবভক্তি। অবিবেক, অজ্ঞান, অশুচিত্ব, সত্যহীনতা এবং সর্ব্বদা আমিষলোভ—পিশাচগণের ধর্ম্ম।

রাক্ষস-ধর্ম্মের মধ্যে প্রথম দুইটী নিন্দিত আচার হইলেও ধর্ম্ম নামে কথিত হইয়াছে। পিশাচ ধর্ম্মের সমস্তগুলিই ত অধর্ম্ম।

প্রকৃতপক্ষে পরদারহরণ যে রাক্ষসের পক্ষেও অধর্ম্ম, তাহা বাল্মীকি-রামায়ণে নানা স্থানে কথিত হইয়াছে, উদাহরণ স্বরূপ একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি,—

স বভূব কৃশো রাজা মৈথিলী কামমোহিতঃ।
অসম্মানাচ্চ সুহৃদাং পাপঃ পাপেন কর্ম্মণা॥
লঙ্কা ১১শ সর্গ।

পাপিষ্ঠ রাজা রাবণ সীতার প্রতি আন্তরিক অভিলাষে মোহিত এবং পাপাচরণের জন্য সুহৃদগণের অবজ্ঞাত, কৃশ হইয়া পড়িলেন।

অতএব বুঝা গেল—পরদারহরণ রাক্ষসেরও পাপকার্য্য। সেই পাপকার্য্যও ধর্ম্ম নামে কথিত হইয়াছে, কেননা তাহা রাক্ষস-সমাজে প্রচলিত আচার ছিল।

ভট্টিকাব্যে আছে—

অগ্নো দ্বিজান্ দেবযজীন্ নিহন্মঃ
কুর্ম্মঃ পুরং প্রেতনরাধিবাসং।
ধর্ম্মো হ্যয়ং দাশরথে নিজো নো।
নৈবাধ্যকারিষ্মহি বেদবৃত্তে॥ ভট্টি ২য় সর্গ।

অর্থাৎ হে রাম! দ্বিজগণকে ভক্ষণ করি—যজ্ঞধ্বংস করি,—(দেবপূজকগণকে নিহত করি) নগরকে শ্মশান-ভূমি করি—এই আমাদের স্বধর্ম্ম।

প্রশ্ন। এ বচনে সমুদ্রপথে যাত্রাই নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহাই ত আপনার মত ?

উত্তর। এ বচনে সমুদ্রযাত্রাকারীর সহিত সংসর্গ নিষিদ্ধ—ইহাই আমার মত বলিয়াই গ্রহণ কর। হেমাদ্রি প্রভৃতি গ্রন্থে যে "সমুদ্রযাতুঃ স্বীকারঃ" এই পাঠ আছে তাহার অর্থের সমান অর্থ করিবার জন্য—"স্বীকার" শব্দে "সংসর্গ" অর্থ আমি করিয়াছি, আর সমুদ্রযাত্রা—এই পদটীকে তৃতীয়ান্ত

বলিয়াছি। এরূপ বলিবার প্রধান কারণ এই—হেমাদ্রি নির্ণয়সিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে আদিপুরাণের কতিপয় বচন আছে,—এই সকল বচনের কিয়দংশমাত্র রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ধরিয়া বলিয়াছেন,—

"ইত্যাদীন্যভিধায়—

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মানি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥"

রঘুনন্দন 'যে ইত্যাদীনি' বলিয়াছেন, যাহার তাহার নাম করিয়া উল্লেখ করেন নাই, তৎসমুদয় বোধক বচনের মধ্যে—

"দ্বিজস্যাব্ধৌ তু নৌযাতুঃ শোধিতস্যাপি
সংগ্রহঃ।"

এই অংশ আছে—এবং ইহা হেমাদ্রি প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, যে দ্বিজ সমুদ্রে নৌকাযোগে গমন করিবে—কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলেও তাহাকে সমাজ ভুক্ত করা যাইবে না। বৃহন্নারদীয় কথিত "সমুদ্রযাত্রা-স্বীকার" এবং আদিপুরাণ কথিত—

দ্বিজস্যাব্ধৌ তু নৌযাতুঃ শোধিতস্যাপি সংগ্রহঃ"—এই দুই অংশের তুল্য অর্থ হইলে একবাক্যতা হয়।

পক্ষান্তরে—যে অর্থই করা যাউক না কেন, তাহাতে দোষ আছেই।

মরণার্থ, সমুদ্রযাত্রা বলিলে, এক দোষ—স্বীকার পদ নিরর্থক, দ্বিতীয় দোষ,—'জল প্রবেশ' না বলিয়া সমুদ্রযাত্রা বলাতে নদী প্রভৃতির জলে দেহ বিসর্জ্জন নিষিদ্ধ নহে—ইহা স্বীকার করিতে হয়, অথবা সমুদ্র শব্দের লক্ষণা করিতে হয়।

প্রশ্ন। নদী প্রভৃতির জলে দেহ বিসর্জ্জন নিষিদ্ধ নহে—বলিলে ক্ষতি কি?

উত্তর। উদ্দেশ্যের নিষ্ফলতাই ক্ষতি। কলির প্রাদুর্ভাবে ক্রোধ, অভিমান, ঈর্ষ্যা ইত্যাদি লৌকিক কারণে আত্মহত্যা যখন বাড়িতে লাগিল—তখন অগত্যা পূর্ব্ব-প্রচলিত শাস্ত্রসম্মত আত্মহত্যাও নিষিদ্ধ হইল। সেই স্থলে কেবল সমুদ্রে দেহ বিসর্জ্জন নিষেধ করিলে—উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইল না কি?

প্রশ্ন। আত্মহত্যানিবারণই যে উদ্দেশ্য তাহা কেমন করিয়া বুঝিব।

উত্তর। বৃহন্নারদীয় পুরাণবচনে "মহা-প্রস্থান গমনং" নিষিদ্ধ হইয়াছে। আদি-পুরাণে—"ভৃগ্বগ্নিপতনং" বলিয়া উচ্চস্থান হইতে পতন ও অগ্নিপ্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া এবং সমগ্র দেশের আচার দেখিয়া বুঝিতে হয়—সর্ব্ব সাধারণ আত্মঘাত মাত্রেই কলিকালে শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

প্রশ্ন। সহমরণও ত আত্মঘাত—তাহা ত শাস্ত্রনিষিদ্ধ হয় নাই।

উত্তর। সহমরণ সর্ব্বসাধারণ আত্মঘাত নহে। রমণীর পতির মৃত্যু হইবে, তবে ত সে দেহত্যাগ করিবে; ইহাতে সামাজিক অনিষ্ট নাই, বরং ইষ্ট আছে, ইহাই মুনিগণের মত। যে সে মনে করিলেই ত আর সহ-মরণে যাইতে পারে না। অতএব ইহা সর্ব্বসাধারণ নহে। জল-প্রবেশ প্রভৃতি সর্ব্ব সাধারণ। একটু মনঃ কষ্ট হইলেই স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেরই এ সকল আত্মহত্যা ঘটিতে পারে। আত্মঘাতপ্রবৃত্ত ব্যক্তি মনে করিতেন—ইহজন্মের কষ্ট লাঘব হইল, আবার সঙ্কল্প প্রভাবে স্বর্গভোগও হইবে—এমন সুযোগ ত্যাগ করি কেন? এই ভাবের দমন করাই ব্যবস্থাপক মুনি-গণের উদ্দেশ্য ছিল।

প্রশ্ন। তাহাই যদি উদ্দেশ্য, তবে তাহার নিষেধ কৈ? মহাশয়ের মতে সমুদ্রযাত্রা শব্দে ত মরণের জন্য জল প্রবেশ নহে।

উত্তর। বৃহন্নারদীয় বচনটী শুন,—

সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু-বিধারণং।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বাণপ্রস্থাশ্রমস্তথা।
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ॥
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ।
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥

এই বচনে যে মহাপ্রস্থান গমন নিষেধ আছে, ইহার দ্বারাই ঐজাতীয় সকল প্রকার আত্মঘাত নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাকে উপলক্ষণ বলে। এক 'মহাপ্রস্থান গমন' নিষেধ থাকিলেই ঐরূপ উপলক্ষণ বলা চলে, কিন্তু সমুদ্রজলে দেহ বিসর্জ্জন ও মহাপ্রস্থান গমন নিষেধ বলিলে, উপলক্ষণ বিষয়ে একটু ব্যাঘাত হয়। যেমন মনে কর—তোমার মাতা তোমাকে বলিলেন, "দেখ্ ঐ দধি থাকিল—কাকে যেন মুখ না দেয়"। কাক আসিল না, কিন্তু কুক্কুর আসিল, কুক্কুরে যাহাতে দধিতে মুখ দিতে না পারে তাহার জন্য তখন তুমি প্রস্তুত হও। তখন তোমার মনে হয়, মা 'কাকের নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায়, দধিটা নষ্ট না হয়, সুতরাং কাক উপলক্ষণ,—যে মুখ দিলে দধি নষ্ট হইবে, সেই সকল জীবই এখানে বুঝিতে হইবে।

কিন্তু তোমার মা যদি বলেন—"ঐ দধি থাকিল উহাতে যেন কাক বা কাল রংএর কুক্কুর মুখ না দেয়, তাহা হইলে তোমার মনে হয় না কি—সাদা রংএর কুক্কুর মুখ দিলে দোষ নাই, ইহা মায়ের অভিপ্রায়, নিশ্চয়ই হয়। সেইরূপ সমুদ্রে দেহবিসর্জ্জন-নিষেধ ও মহাপ্রস্থানগমননিষেধ বলিলে—অপর জলে দেহ বিসর্জ্জন এক প্রকার অনুমোদিতই হয়—মহাপ্রস্থান গমন আর উপলক্ষণ হইয়া সজাতীয় সর্ব্ববিধ মৃত্যুদ্বারের জ্ঞাপক হইতে পারে না। তাহা না হইলে উদ্দেশ্য নিষ্ফল, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উপ-পুরাণ বচনের বন্ধনে হিন্দুর ঘরে আত্মহত্যা অন্য জাতির হিসাবে এখনও কম আছে। কিন্তু বিপরীত শিক্ষার ফলে, ক্রমেই শৈথিল্য হইতেছে।

প্রশ্ন। আপনি যে "দ্বিজস্যাব্দৌ তু নৌ-যাতুঃ শোধিতস্যাপি সংগ্রহঃ" বলিতেছেন—এ অংশ ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য উদ্ধৃত করেন নাই, অতএব উহা অমূলক।

উত্তর। রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে অনুলোম-বিবাহ যে অকর্ত্তব্য ইহা প্রমাণ করিবার জন্য পূর্ব্বকথিত বৃহন্নারদীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তৎপরেই লিখিয়াছেন—

হেমাদ্রিপরাশরভাষ্যয়োরাদিপুরাণং
(পাঠান্তরে আদিত্যপুরাণং)

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তাকন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মযুদ্ধেন হিংসনম্॥
বাণপ্রস্থাশ্রমশ্চাপি প্রবেশো বিধিদেশিতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষমঘসঙ্কোচনং তথা॥
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকম্।
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
দত্তৌরসেতরেষাস্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
... ইত্যাদীন্যভিধায়—
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।

এখানে যে অংশে অনুলোম-বিবাহ নিষিদ্ধ আছে—সেই অংশই প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক যৎকিঞ্চিদংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহা উক্ত বচনে প্রামাণ্যবুদ্ধি দৃঢ় করিবার জন্য।

যে আচার সমাজে প্রচলিত, তাহার মূল প্রদর্শনই প্রামাণ্যবুদ্ধি দৃঢ়ীকরণের হেতু, সে বচনের সর্ব্বাংশপ্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন বোধে পরিত্যাগ করিয়া, "ইত্যাদীন্তভিধায়" বলিয়াছেন, এই ইত্যাদি অনুসন্ধান করিবার জন্য রঘুনন্দনের অবলম্বিত প্রাচীন হেমাদ্রির নিকট যাইলেই দেখিবে—"দ্বিজস্যাব্ধৌ তু নৌযাতুঃ শোধিতস্যাপি সংগ্রহঃ"—নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থে হেমাদ্রি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রশ্ন। "নৌযাতুঃ" আছে, জাহাজে চড়িলে দোষ কি? জাহাজ ত আর নৌকা নহে।

উত্তর। নৌকা নানা প্রকার, পোতও নৌকাবিশেষ, যন্ত্রযুক্ত পোতই জাহাজ।

প্রশ্ন। সমুদ্রে নৌকায় একটু চড়িলেই কি দোষ হইবে?

উত্তর। ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ বলেন,—একটু চড়িলে দোষ নাই, দ্বীপান্তর-গমনেই দোষ।

অতএব একবাক্যতা করিলে এই হয় যে—তীর্থযাত্রা ব্যতীত বা ধর্ম্মার্জ্জন উদ্দেশ্য ব্যতীত সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ।

আমি। কলিকালে সমুদ্রে তীর্থযাত্রাই "সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ" এই অংশ দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং শঙ্খোদ্ধারাদি তীর্থ কলিযুগে গন্তব্য নহে, এ কথা বলিলে তাহার উত্তর কি?

তর্করত্ন। পরাশর কলিযুগের স্মৃতি—তাহাতে "সমুদ্রসেতুগমনং প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ" সমুদ্রযাত্রা স্বীকারকে সমুদ্রে তীর্থযাত্রা বলিলে পরাশর স্মৃতির বিরোধ হয়, অথচ সমুদ্রে তীর্থযাত্রা এরূপ কল্পনা না করিলে এ বিরোধ হয় না। সুতরাং বাণিজ্যাদির জন্য সাধারণ সমুদ্রযাত্রাই নিষিদ্ধ, তীর্থযাত্রা নহে, এই জন্য দ্বারকা-গমন পুরীধামে সমুদ্রস্নান প্রভৃতির ব্যবস্থা সর্ব্বগ্রাহ্য এবং শিষ্টাচার সম্মত।

আমি। 'বিধবা-বিবাহ' বিচারস্থলে আপনি বলিয়াছেন, পরাশর স্মৃতির ব্যবস্থা দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ। আদিপুরাণের এই বচন দ্বারাই বাধিত, সুতরাং এস্থলেও পরাশর স্মৃতির সমুদ্রযাত্রা ব্যবস্থা বাধিত হউক না কেন?

তর্করত্ন। এস্থলে যদি "সমুদ্রে তীর্থযাত্রা স্বীকার" এইরূপ স্পষ্ট উক্তি থাকিত, তাহা হইলে বরং বলিতে পারিতে, তাহা নাই, তুমি কল্পনা করিয়া বিরোধ ঘটাইবে এবং স্মৃতির বাধা করিবে, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত।

আমি। আমার একটা বড় ভুল হইয়াছে, আপনি যে বৃহন্নারদীয় এবং আদি-পুরাণের বচন দেখাইয়াছেন, তাহাতে সমুদ্রযাত্রাকারীর সহিত সংসর্গ-নিষেধই প্রমাণিত হইয়াছে। সমুদ্রযাত্রা নিষেধ ত প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং তীর্থযাত্রার জন্য সমুদ্রযাত্রায় দোষ আছে কি না? এরূপ প্রশ্ন করাই আমার ভুল, ভুল প্রশ্ন করিয়াও ইহা আপনার উত্তরে বুঝিয়াছি, সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ, ইহা আপনার মত, কিন্তু তাহার প্রমাণ কি?

তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, তোমার আর একটু ভুলও হইয়াছে, স্বীকার শব্দের সংসর্গ অর্থ কিরূপ হইল—তাহা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম—ভুল হইয়াছিল বটে, এখন সেই প্রশ্নই করিলাম, প্রথমে তাহারই উত্তর প্রদান করুন।

তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, স্বীকার শব্দ দুইটী শব্দের যোগে উৎপন্ন—স্ব এবং কার,—

স্ব শব্দের অর্থ আত্মীয়, কার—করা,—স্বীকার শব্দের যোগলভ্য অর্থ—আত্মীয় করা বা আপনার করিয়া লওয়া। ইহার প্রতিশব্দ—আত্মীয়ত্ব স্থাপন, তাহাই সংসর্গ অর্থে ব্যবহার করিয়াছি।

আমি বিনীত ভাবে বলিলাম, আত্মীয় করার ভাবার্থ আত্মীয়ত্ব স্থাপন হইলেও উহা শব্দলভ্য অর্থ নহে, সুতরাং সহার্থে তৃতীয়ায় একটু কষ্ট কল্পনা বোধ হয়।

তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন—অপর ব্যাখ্যায় স্বীকার শব্দ ব্যর্থ হয়, তদপেক্ষা একটু কষ্ট-কল্পনা না হয় করিলাম।

আমি। আপনার নিকট আরও কিছু ভাল ব্যাখ্যা শুনিবার আশা করি।

তর্করত্ন। আচ্ছা তবে শুন ;—

সমুদ্রযাত্রা স্বীকার অর্থে সমুদ্রযাত্রা মানিয়া লওয়া।

সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও দেশাচার হেতু বা অন্য কারণে তাহাকে আচরণীয়রূপে গ্রহণ করাই সমুদ্র-যাত্রার স্বীকার।

সেই স্বীকারের পরিচয় দুইরূপে পাওয়া যায়, স্বয়ং বা প্রবর্ত্তনাদি দ্বারা সমুদ্রযাত্রায় তাহার একরূপ এবং দ্বীপান্তর প্রত্যাগতের সহিত সংসর্গে তাহার অন্যরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই দুইরূপে পরিচিত সমুদ্র-যাত্রা স্বীকারই নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন। মহাশয় বলিয়াছিলেন, সমুদ্রযাত্রা-কারীর সহিত সংসর্গই নিষিদ্ধ, আবার এখন বলিতেছেন, সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ, সমুদ্রযাত্রা-কারীর সহিত সংসর্গও নিষিদ্ধ,—এই দুইটীর মধ্যে কোন্ কথা সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিব ?

উত্তর। সমুদ্রযাত্রায় যে পাপ হয় এ বিষয়ে অন্য প্রমাণ আছে, সুতরাং সমুদ্রযাত্রা স্বীকার ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহা না বুঝাইয়া সমুদ্রযাত্রাকারীর সহিত সংসর্গ বুঝাইলেও অন্যবচনবলেই তাহা (সমুদ্রযাত্রা) নিষিদ্ধ।

পক্ষান্তরে যদি "সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ" অর্থে সমুদ্রযাত্রাই হয়—তাহা হইলেও "দ্বিজস্যাব্ধৌ তু নৌযাতুঃ শোধিতস্যাপি সংগ্রহঃ"—এই বচন দ্বারাই সংসর্গের নিষেধ হইবে।

সমুদ্রযাত্রা কর্ত্তায় তৃতীয়া, সমুদ্রযাত্রা-কারী ব্যক্তির আয়ত্ত হওয়াই বর্জ্জনীয়। সংস্কৃতের অর্থ এবংপ্রকারে নানাবিধ হইতে পারে, যাহা হউক না—সমুদ্রযাত্রা এবং সমুদ্র-যাত্রাকারীর সংসর্গ উভয়ই যে নিষিদ্ধ তাহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব সর্ব্ববিধ অর্থের সিদ্ধান্ত সমানই আছে।

মরণার্থ জল-প্রবেশই সমুদ্রযাত্রা, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মত মানিলেও সমুদ্র-যাত্রায় পাপ এবং সমুদ্রযাত্রাকারীর সংসর্গ নিষেধ—অন্য প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইবে।

প্রশ্ন। সেই প্রমাণ কি ?

উত্তর। শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণগণনা প্রসঙ্গে—মনু বলিয়াছেন,—

আগারদাহী। গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কূটকারক॥
৬ষ্ঠ অঃ ১৫৮।

সমুদ্রযায়ী শব্দের কুল্লুকভট্ট-সম্মত ব্যাখ্যা যথা,—

"সমুদ্রে যো বহিত্রাদিনা দ্বীপান্তরং গচ্ছতি।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমুদ্রে বহিত্র প্রভৃতি দ্বারা দ্বীপান্তরে গমন করে, সে ব্রাহ্মণ অপাংক্তেয়।

প্রশ্ন। বহিত্রাদিনা কি বাহিত্রাদিনা ?

উত্তর। বহিত্রাদিনা।

প্রশ্ন। বঙ্গবাসীকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত আপনার সম্পাদিত মনুসংহিতায় বাহিত্রাদিনা আছে—তাহা কি ভুল ?

উত্তর। যদি থাকে ত ভুল, আমি সম্পাদক নামে পরিচিত, প্রুফ সংশোধন আমার কার্য্য নহে যে, তাহার বর্ণাশুদ্ধি বা বর্ণাগমের জন্যও দায়ী হইব।

প্রশ্ন। বহিত্রাদিনা পাঠ কোন মুদ্রিত পুস্তকে আছে?

উত্তর। আছে বৈ কি? ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রথম মনুসংহিতামুদ্রিত করেন। এখনকার মুদ্রিত মনুসংহিতা সমূহের তাহাই সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় আদর্শ তাহাতে বর্ণাশুদ্ধিও অল্প; ঐ পুস্তকে বহিত্রাদিনা পাঠই আছে।

এই কথা বলিয়া তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন,—'বাহিত্রাদিনা' লইয়া এত প্রশ্ন কেন, বলি বাহিত্র শব্দের অর্থ কি?

আমি বলিলাম, বহিত্রসম্বন্ধীয় বস্তু, বহিত্র শব্দের অর্থ অর্ণবযান; তৎসম্বন্ধীয় বস্তু হাল, দাঁড়।

তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন,—বাহিত্র বলিলে জল, নাবিক, মাস্তুল ইত্যাদি পোতের যাবতীয় উপকরণ বোধ হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় কুল্লুকভট্ট অমন একটা শব্দ প্রস্তুত করিয়া হাল, দাঁড়, বুঝাইবেন কেন? হাল দাঁড়ের কি সংস্কৃত নাম নাই, বা কুল্লুকভট্টের তাহা উচ্চারণ করিতে নাই?

আমি। বাহিত্রই হাল দাঁড়ের যোগরূঢ় নাম। "বাহয়ন্ত্যনেন নৌকাং' এই অর্থে নিপাতনেও সিদ্ধ হইতে পারে।

তর্করত্ন। প্রামাণিক অভিধান, প্রসিদ্ধ প্রয়োগ, অথবা নিপাতনের সূত্র কি আছে? যাক্ এ কথা; বল ত—সমুদ্রে যো বাহিত্রাদিনা দ্বীপান্তরং গচ্ছতি।" ইহার অর্থ কি?

আমি। সমুদ্রে বাহিত্রাদি অর্থাৎ হাল দাঁড় ধরিয়া যে দ্বীপান্তরে যায়। অর্থাৎ নাবিকবৃত্তিসম্পন্ন, যাহার ইংরাজি নাম sailor এইরূপ ব্রাহ্মণই অপাঙ্‌ক্তেয়।

তর্করত্ন বলিলেন—তুমি কাব্যতীর্থ, তুমি এ কি বলিতেছ! "বাহিত্রাদিনা" ইহার অর্থ বাহিত্রাদি দ্বারা হইতে পারে, বাহিত্রাদি ধরিয়া হইবে কিরূপে? আর 'বাহিত্রাদি'—হাল দাঁড় ইত্যাদি দ্বারা দ্বীপান্তরে গমন কেবল নাবিক করে না, আরোহীও করিয়া থাকে। সুতরাং বহিত্রাদিনা পাঠের যে অর্থ, বাহিত্রাদিনা পাঠের সেই অর্থই হয়। অথচ বাহিত্রাদিনা পাঠে ভাষার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, যে ব্যক্তি অশ্ব-শকটে গমন করিতেছে, তাহাকে বুঝাইবার জন্য 'অশ্বেন গচ্ছতি' এইরূপ প্রয়োগ হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি হাল দাঁড় যুক্ত নৌকারোহণে গমন করে, তাহাকে বুঝাইবার জন্য, 'বাহিত্রেণ গচ্ছতি' এমন প্রয়োগও হয় না। প্রয়োগ করিলে ভাষার নিয়ম লঙ্ঘন হয়। আর দেখ, সমুদ্রের নাবিকবৃত্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ অপাঙ্‌ক্তেয়, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন এবং অসঙ্গত; নিষ্প্রয়োজন, কেননা, এই অপাঙ্‌ক্তেয় প্রস্তাবে মনু বলিয়াছেন—

"হিংস্রো বৃষলবৃত্তিশ্চ" (১৬৪) বৃষলবৃত্তি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ অপাঙ্‌ক্তেয়। নাবিকবৃত্তি নিকৃষ্ট সঙ্কর শূদ্রবৃত্তি মধ্যে গণিত। 'দাশং নৌ কর্ম্মজীবিনং' (মনু ১০ম অঃ ৩৪)। অতএব নাবিকবৃত্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ত অপাঙ্‌-ক্তেয় আছেই, তা সে দ্বীপান্তরেই যাক্, আর সমুদ্রের কূলে কূলেই ভ্রমণ করুক, তাহাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করিবার জন্য 'সমুদ্রযায়ী' বলিয়া পৃথক্ নির্দ্দেশের প্রয়োজন নাই। প্রত্যুত এই পৃথক্ নির্দ্দেশ অসঙ্গত, কেননা, যে ব্রাহ্মণ নদীতে নাবিক-বৃত্তি করে, তাহাকে ত অপাঙ্‌ক্তেয় বলা গেল না? ইহা কি অসঙ্গত নহে?

আমি। তৈলিক ব্রাহ্মণও ত শূদ্রবৃত্তি সম্পন্ন, তাহার পৃথক্ নির্দ্দেশ ত ঐ বচনেই আছে।

তর্করত্ন। তৈলিক, 'তিলার্থং তিলাদিবীজানাং পেষ্টা' তৈলের জন্য যে তিলাদি পেষণ করে, এই কার্য্য শূদ্রবৃত্তি বলিয়া মনুসংহিতায় উল্লিখিত নাই। সেইজন্যই পৃথক্ নির্দ্দেশ আবশ্যক। আরও দেখ, কুল্লুকভট্ট টীকাকার, তিনি সরল কথায় ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তিনি কি বলিতে পারিতেন না, "সমুদ্রে যো পোতং বাহয়তি" অথবা "নাবিকবৃত্ত্যা দ্বীপান্তরং গচ্ছতি"। তিনি স্পষ্ট লিখিলেন,—'বহিত্রাদিনা দ্বীপান্তরং গচ্ছতি' যে ব্যক্তি সমুদ্রে বহিত্র প্রভৃতি অর্ণবযানের সাহায্যে দ্বীপান্তরে গমন করে, ইহার উপরেও তর্ক করিতেছি!

আমি বলিলাম,—'সমুদ্রযায়ী' কথা আছে, ইহার অর্থ যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ সমুদ্রে গমন করে, বা সমুযাত্রাই যাহার স্বভাব। সুতরাং একবার সমুদ্রগমনে ত দোষ নাই।

তর্করত্ন। প্রথম কথা এই, এখানে 'ণিন্' প্রত্যয়ের ঐরূপ অর্থ বিবক্ষিত নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই কুল্লুটভট্ট টীকায় পৌনঃপুন্য বা শীল অর্থ গ্রহণ করেন নাই। "আগারদাহী, কুণ্ডাশী" এ সকল শব্দও 'ণিন্' প্রত্যয়নিষ্পন্ন,—এখানেও পৌনঃপুন্য প্রভৃতি অর্থ নহে। কুল্লুটভট্টের টীকা দেবলস্মৃতির অনুরূপ, দেবলঋষি বলিয়াছেন, "অমৃতে জারজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ, যস্তয়োরন্নমশ্নাতি সকুণ্ডাশীতি কথ্যতে"। সধবার জারজপুত্র কুণ্ড, বিধবার জারজপুত্র গোলক। যে ব্যক্তি ইহাদের অন্নভোজন করে, তাহার নাম কুণ্ডাশী, এখানে পৌনঃপুন্য অর্থ বচনে নাই। তবে একাধিকবার অর্থ এখানে হইতে পারে ইহাও বলা যায়। কিছু না মানিয়া পৌনঃপুন্য অর্থ স্বীকার করিলেও, সমুদ্র গমনে দোষ স্বীকার করিতে হয়। যে কার্য্য পুনঃ পুনঃ করিয়া অপাঙ্‌ক্তেয় হইতে হয়, তাহার একবার অনুষ্ঠানে যে দোষ হয় না, ইহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে।

আমি। আর কিছু প্রমাণ আছে কি?

তর্করত্ন। আছে, যথা বৌধায়নঃ,—অর্থ পতনীয়ানি—সমুদ্রযানং ব্রাহ্মণস্য ন্যাসাপহরণং সর্ব্বপণ্যৈর্ব্যবহরণং ইত্যাদ্যভিধায় তেষাং নির্ব্বেশশ্চতুর্থকালমিতভোজনাঃ স্যুরপোঽভ্যুপেয়ুঃ সবনানুকল্পং স্থানাসনাভ্যাং বিহরন্ত এতে ত্রিভির্ব্বর্ষৈ স্তদপঘ্নন্তি পাপম্। ইতি

অর্থাৎ যাহা করিলে পতিত হয়, তন্মধ্যে সমুদ্রযাত্রা প্রথম, ব্রাহ্মণের ন্যস্ত বস্তু অপহরণ দ্বিতীয়, সর্ব্ববিধ পণ্যদ্রব্য (সুরা, মাংস প্রভৃতি) বিক্রয় তৃতীয় ইত্যাদি। এই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত—প্রথম দিন উপবাস, দ্বিতীয় দিনে রাত্রিতে অল্প আহার মাত্র করিয়া থাকিবে, তৎপরদিন আবার উপবাস, তৎপরদিন রাত্রিতে ঐরূপ অল্প আহার, এইরূপ নিয়মে তিন বৎসর কাটাইতে হইবে, এই তিন বৎসর মধ্যে একবারও শয়ন করিতে পারিবে না। দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট অবস্থায় থাকিতে হইবে, প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন স্নান করিবে। তিন বৎসরব্যাপী এই কঠোর ব্রত সমুদ্রযাত্রার প্রায়শ্চিত্ত। হেমাদ্রি হইতে প্রায়শ্চিত্তবিবেক পর্য্যন্ত সকল গ্রন্থেই বৌধায়ন বচন উল্লিখিত। আপস্তম্বের একটী সূত্র দেখিলে, বৌধয়ন সমুদ্রযানে কিরূপ পাতিত্য বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। বৌধায়ন সমুদ্রযানের যে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন, আপস্তম্ব উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের বিমাতৃ-গমন,

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপানেও সেই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন, যথা,—সুরাং পীত্বা গুরুতল্পঞ্চ গত্বা, ব্রহ্মহত্যাঞ্চ কৃত্বা চতুর্থকালমিত ভোজনাঃ স্যুরপোহভ্যুপেয়ুঃ সবনানুকল্পং স্থানাসনাভ্যাং বিহরন্ত এতে ত্রিভির্ব্বর্ষৈরথ পাপং নুদন্তে।” উৎকৃষ্ট বা সগুণ ব্রাহ্মণের কথা ভবিষ্যপুরাণে আছে। তবে বৌধায়ন অন্যত্র বলিয়াছেন, দেশবিশেষে কতকগুলি পাপ-কার্য্য বা অনাচার প্রচলিত, যথা—দক্ষিণদেশে মাতুল-কন্যা বিবাহ প্রভৃতি, এবং উত্তরদেশে সমুদ্র-যাত্রা প্রভৃতি, দেশাচারহেতু সেই সেই দেশে ইহার আচরণ দোষাবহ নহে, অন্য দেশে দোষাবহ।

আমি বলিলাম, মহাশয় অনেক নূতনকথা শুনিতেছি, সংশয় এখনও অনেক, তন্মধ্যে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই দক্ষিণদেশ, উত্তরদেশ বলিলে কোন্ কোন্ দেশ বুঝিব?

তর্করত্ন। ইহাতে বড়ই গোল আছে, কেহ বলেন দক্ষিণাপথ দক্ষিণদেশ, এবং আর্য্যাবর্ত্ত উত্তরদেশ। কেহ বলেন, আর্য্যা-বর্ত্তের দক্ষিণ দক্ষিণাপথ এবং উত্তর হিমালয় পার্ব্বত্য ভূমি।

আমি। ইহাতে আপনার মত কি?

তর্করত্ন। বরাহ বৃহৎসংহিতাতে ভারত-বর্ষকে নয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহাতে অষ্টদিক এবং মধ্য এইরূপে বিভাগ আছে। বৌধায়ন স্মৃতিতে যে দক্ষিণ-উত্তর আছে তন্মধ্যে মলয়, মহেন্দ্র, ভরুকচ্ছ, কোঙ্কণ, কর্ণাট, কাঞ্চী, চোল, ইত্যাদি রাজ্য অসন্দিগ্ধ বা অসঙ্কীর্ণ দক্ষিণদেশ। উত্তর কুরু, কেকয়, বসাতি, ত্রিগর্ত্ত এবং গান্ধাররাজ্য প্রভৃতি অসন্দিগ্ধ বা অসঙ্কীর্ণ উত্তরদেশ। সঙ্কীর্ণ দক্ষিণ-উত্তর ধরিলেও বঙ্গ, উপবঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, মিথিলা, কাশী, উৎকল, গৌড়, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত, প্রাগ্জ্যোতিষ, পাঞ্চাল, মথুরা, মৎস্যদেশ, অযোধ্যাপ্রদেশ, হস্তিনা, কুরুক্ষেত্র, সিন্ধু, দ্রাবিড়, সুরাষ্ট্র, অন্ধ্র এবং অসঙ্কীর্ণ দক্ষিণদেশ মাত্রই কোন প্রকারেই উত্তরদেশ মধ্যে গণনীয় নহে, ইহা আমি বলিতে পারি। এ বিষয়ে প্রমাণ বৃহৎসংহিতা (১৪শ অঃ ২য় শ্লোক হইতে ৩১ শ্লোক পর্য্যন্ত)।

আমার অভিপ্রায় এই—পূর্ব্ব, মধ্য এবং পশ্চিম ব্যতীত যে ৬টী ভাগ বৃহৎসংহিতায় আছে, তাহার ৩টী দক্ষিণ এবং ৩টী উত্তর বলিয়া গণনীয়। তাহার পর দেখিলে সেই দক্ষিণদেশের মধ্যে যে যে প্রদেশে মাতুল-কন্যা বিবাহ প্রভৃতি অনাচার বহুকাল যাবত প্রচলিত এবং উত্তর দেশের মধ্যে যে যে স্থানে সমুদ্রযাত্রা-সুরাপানাদি বহুকাল যাবত প্রচলিত, দেশাচারানুরোধে সেই সেই স্থানে তাহা দোষাবহ নহে।

বর্ত্তমান সময়ে নেপাল, কাশ্মীরপ্রদেশ এবং হিমালয়ের পার্ব্বত্যভূমি ব্যতীত কোন হিন্দুপ্রদেশ এই উত্তর ভাগের অন্তর্গত নহে।

উত্তরদেশ বলিতে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বুঝাইবে এমন সংজ্ঞা বা নিয়ম কোথাও নাই।

আমি। তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে নেপাল বা কাশ্মীরের অধিবাসী ব্রাহ্মণ সমুদ্র যাত্রা করিলে পাপী হইবে না?

তর্করত্ন। পাপী হইবে না এ কথা বলিতে পারি না, কেননা—মীমাংসাদর্শনে বার্ত্তিক-কার কুমারিল ভট্ট ১ম অঃ ৩য় পাদে লিখিয়াছেন,—

সম্প্রত্যয় প্রণীতা হি স্মৃতিঃ সোপনিবন্ধনা।
তস্মাত্তেন বলীয়স্বমাচারান্নির্নিবন্ধনাৎ॥

ভাবার্থ—আচার অপেক্ষা স্মৃতি বলবৎ প্রমাণ,—কেননা আচার-কর্ত্তা অপেক্ষা স্মৃতি-কর্ত্তৃগণ অধিকতর বিশ্বাস্য।

শাস্ত্রদীপিকাতে পার্থসারথিমিশ্র এই কারিকার ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—

সর্ব্বেষাঞ্চ স্মৃতিবিরুদ্ধাচারাণাং মাতুলদুহিতৃ-পরিণয়াদিবিষয়াণাং কামাদি হেত্বন্তরং বিস্পষ্টমেব দৃশ্যত ইতি ন কথঞ্চিদপি শ্রুতিমূলত্বং সংভাবনীয়ম্ ন চাত্র বিকল্পাভ্যুপ-গমনোভয়োরপি প্রামাণ্যং সম্ভবতি বস্তুনি বিকল্পাসম্ভবাৎ ন হি মাতুলদুহিতৃপরিণয়াৎ প্রত্যবায়োৎপত্তিরনুৎপত্তিশ্চ। (৯ম সূত্র) ব্যাখ্যা।

যত স্মৃতি বিরুদ্ধ আচার আছে, যথা—মাতুল-কন্যা বিবাহাদি—তাহার হেতু কামনাদি স্পষ্টই দেখা যায়, তাহার শ্রুতিমূলকত্বের সম্ভাবনাই নাই; যদি বল, বিকল্প স্বীকার করিলে স্মৃতি এবং আচার উভয়েরই প্রামাণ্য থাকে, কিন্তু তাহা অসম্ভব, ফলগত বিকল্প হয় না,—এক মাতুলকন্যা-বিবাহ—তাহার ফলে পাপ হইবে এবং পাপ হইবে না এরূপ হয় না। অতএব স্মৃতি অপেক্ষা আচার দুর্ব্বল।

আমি। আপনি বলিতেছেন, বৌধায়ন বলিয়াছেন, "দেশাচারহেতু ঐ সকল অনাচার দোষাবহ নহে" তাঁহা অপেক্ষা কি কুমারিল ভট্ট বা পার্থসারথিমিশ্র প্রামাণিক ?

তর্করত্ন। দোষাবহ নহে—বলিলে, পাপ হইবে না এরূপ অর্থও হইতে পারে, সামাজিক দোষ হয় না—এরূপ অর্থও হইতে পারে, এখানে শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে—কেহই অপ্রামাণিক হ'ন না।

আমি। একই কার্য্য অবস্থাবিশেষে পাপজনক হয় এবং অবস্থাবিশেষে পাপজনক হয় না, যেমন—গায়ত্রী-পাঠ;—অনুপনীত ব্রাহ্মণ গায়ত্রী উচ্চারণে পাপী হইবে, আর উপনীত হইলে গায়ত্রী পাঠ তাহার পাপ না হইবার হেতু হইবে। সেইরূপ দেশবিশেষেও একই বস্তু পাপজনক হইবে এবং অন্যদেশে পাপজনক হইবে না,—ইহা বলিলে ক্ষতি কি ?

তর্করত্ন। দৃষ্টান্তে বৈষম্য আছে—গায়ত্রী-পাঠ কোন শাস্ত্রেই অনাচার বা পাপজনক বলিয়া কথিত হয় নাই, পরন্তু পাত্রবিশেষে, কেবল পাত্রবিশেষে কেন, দেশবিশেষেও বটে—যথা শূদ্রের সমীপে গায়ত্রী পাঠ নিষিদ্ধ,—সেই নিষেধ-লঙ্ঘনজন্যই পাপ হইতেছে, এখানে বৌধায়ন স্পষ্ট বলিয়া-ছেন, "সমুদ্রযান অনাচার বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ পাপজনক কর্ম্ম, কেবল আচারবশত দেশবিশেষে দোষাবহ নহে" যদি ঐ কার্য্য দেশবিশেষে পাপজনক হইত এবং দেশ-বিশেষে পাপজনক না হইত তাহা হইলে বৌধায়ন তাঁহাকে অনাচাররূপে সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন না। যাহা স্মৃতিশাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ তাহা স্থানবিশেষে আচার মাত্র দ্বারা প্রতিপালিত হইলেও স্মৃতি অপেক্ষা আচারে দুর্ব্বলতা হেতু, অনাচার বা কুকর্ম্মরূপে স্থিরী-কৃত হইবার যোগ্য। প্রবল প্রমাণ স্মৃতি-শাস্ত্র সম্মত নিষেধ দ্বারা যে কার্য্য পাপজনক বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে—আচাররূপ দুর্ব্বল প্রমাণে তাহা যে আর পাপজনক হইবে না এরূপ হইতে পারে না। 'দোষাবহ নয়' ইহার অর্থ পাপজনক নহে, এরূপ হইলে বৌধায়নের কথাই অসঙ্গত হইয়া যায়—তিনি যে সমুদ্রযাত্রাকে পাপকর্ম্ম বলিয়াছেন, তাহা আর সঙ্গত হয় না—এই জন্য কুমারিল ও পার্থসারথিমিশ্রসম্মত অর্থই বৌধায়ন গ্রন্থের প্রকৃতার্থ। স্মৃতি অপেক্ষা আচার দুর্ব্বল প্রমাণ, সুতরাং দেশাচার থাকিলেও সমুদ্রযাত্রায় উত্তর দেশবাসীরও পাপ হইবে;

তাহাতে সংশয় নাই। তবে দেশাচার-পালনে পাপ হয় না—ইহা কোন কোন পূর্ব্বতন পণ্ডিতের মত বটে;—আমি তদপেক্ষা কুমারিল মতকে প্রামাণিক মনে করি। বিশেষতঃ সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে এমন বিশেষ কথা আছে, যাহাতে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বদেশেই পাপ হইবে ইহা মানিতে হয়।

আমি। যদি সমুদ্র-যাত্রা পূর্ব্ব হইতেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ থাকে, তাহা হইলে, বৃহন্নারদীয় পুরাণে "সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ"—এই অংশে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ বা সমুদ্র যাত্রাকারীর সহিত সংসর্গ নিষেধ করা নিষ্ফল। পাপীর সহিত সংসর্গ ত সর্ব্বত্রই নিষিদ্ধ। আমি প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে দেখিয়াছি "যশ্চ যেন পাপাত্মনা সহ সংসৃজেৎ স তস্যৈব প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ—এই বিষ্ণু-বচন আছে, মনুও বলিয়াছেন,—

ন সংসর্গং ব্রজেৎ সদ্ভিঃ প্রায়শ্চিত্তেঽকৃতে দ্বিজঃ।
এনস্বিভিরনির্ণিক্তৈঃ নার্থং কঞ্চিৎ সমাচরেৎ ॥

তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, তোমার এই প্রশ্নে আমি তুষ্ট হইলাম, এখন ইহার উত্তর শুন।

পরাশর বলিয়াছেন,—

কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনে ন তু।
দ্বাপরেত্বর্থমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা ॥

সত্যকালে পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণে, ত্রেতায় পতিত স্পর্শে এবং দ্বাপরে পতিতের নিকট অর্থ গ্রহণে পতিত হয় এবং কলিকালে সাক্ষাৎকর্ম্ম করিলেই পতিত হয়।

আমি—কিরূপ কর্ম্ম?

তর্করত্ন। এ বিষয়ে দুইজন সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম ব্যবস্থাপকের মতভেদ আছে,—

মাধবাচার্য্য বলেন,—"বধ, অপেয় পান, (অভক্ষ্য ভক্ষণ) অগম্যা গমন এবং অপহরণাদি সাক্ষাৎ কার্য্য, ইহাই এস্থলে কর্ম্ম শব্দের অর্থ। কিন্তু ব্রহ্মহত্যা সুরাপান ইত্যাদি কার্য্য করিয়া যাহারা পতিত, তাহাদের সংসর্গে অন্যে পতিত হইবে না।"

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বলেন, "সম্ভাষণ, স্পর্শ ধন গ্রহণ, এই প্রকার লঘুসংসর্গ করিলে, কলিকালে পাপী হইবে না, পরন্তু পতিতের অন্ন ভোজন বৈবাহিকসম্বন্ধ এবং অন্যান্য গুরুসংসর্গ করিলে, পতিতই হইবে," আর ব্রহ্মহত্যাদি কার্য্য যে স্বয়ং করে—সে যে পতিত হইবে—ইহা বলা বাহুল্য।

আদি পুরাণে "সংসর্গদোষঃ পাপেষু"—অর্থাৎ কোন পাপেই সংসর্গ দোষ কলিতে নাই ইহা লিখিত আছে।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মতে—সম্ভাষণ, স্পর্শ ধনগ্রহণ এবং এই প্রকার অন্যান্য লঘু সংসর্গে দোষ নাই।

অন্য পাপে যাহারা পাপী তাহাদের সংসর্গে কলিকালে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও—সমুদ্র যাত্রাকারীর সর্ব্ববিধ সংসর্গেই পাপ হইবে—ইহা জানাইবার জন্যই "সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ" এই বচনে সমুদ্রযাত্রা বা সমুদ্রযাত্রাকারীর সংসর্গ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আমি। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন।

তর্করত্ন। সমুদ্রযাত্রা স্বীকার—এই অংশের ৪ প্রকার অর্থ হইয়াছে।

(১) মরণোদ্দেশে সমুদ্রজলে প্রবেশ।
(২) সমুদ্রে তীর্থযাত্রা।
(৩) বাণিজ্যাদির জন্য সমুদ্রযাত্রা।
(৪) সমুদ্রযাত্রাকারীর সহিত সংসর্গ।

যদি আমার প্রদর্শিত দোষ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পার—(১) বা (২) অর্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে এ বচনে তোমার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

আমি। আমি ত (১) (২) অর্থ সম্বন্ধে কোন আপত্তি করি নাই।

তর্করত্ন। উত্তম (৩) এবং (৪) অর্থ স্বীকার করিলে, "সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ" এই অংশ নিস্ফল হয়—এই তোমার আপত্তি?

আমি। আজ্ঞা হাঁ।

তর্করত্ন। (৩) অর্থে—সমুদ্রযাত্রা দুই প্রকার ইহা মনে রাখিও—উত্তর দেশের ১ প্রকার এবং দক্ষিণ দেশের এক প্রকার। দেশাচার প্রামাণ্য হেতু—উত্তর দেশের সমুদ্রযাত্রা দোষাবহ নহে—এইরূপ বৌধায়ন বচনে আছে, শাস্ত্র নিষিদ্ধ হইলেও এই যে আচারসিদ্ধ সমুদ্রযাত্রা—তাহাই 'সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ' ইহাই কলিতে নিষিদ্ধ। দেশাচারের দোহাই দিয়া যে সমুদ্রযাত্রা করিবে, কলিকালে তাহাও হইবে না—এইজন্যই 'সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ' আছে, কলিকালে এই নিষেধ নিস্ফল নয়।

আমি। আপনি বলিয়াছেন, দেশাচার থাকিলেও—সমুদ্রযাত্রায় উত্তরদেশবাসীরও পাপ হইবে, ইহা কুমারিল ভট্ট প্রভৃতির মত, "সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ" এই নিষেধ দ্বারাও সমুদ্রযাত্রা করিলে পাপ হইবে—এইরূপই বুঝায়; সুতরাং ইহা কি পুনরুক্তি বা ব্যর্থ নহে?

তর্করত্ন। যদি প্রত্যক্ষফল দেখিতে পাই, তাহা হইলে অদৃষ্টফল পর্য্যন্ত অনুসন্ধানের প্রয়োজন করে না, এখানে দেখিতেছি, যেদেশে সমুদ্রযাত্রার আচার ছিল—সেই আচার উঠাইয়া দেওয়া হইল—অতঃপর কেহ সমুদ্রযাত্রা করিলে, সমাজেও নিন্দিত হইবে, —ইহাই নিষেধের ফল। আর একটা কথা স্মরণ করিও—তুমি তখন কুমারিল প্রভৃতির মত মানিতে চাহ নাই, উত্তর দেশবাসী সমুদ্রযাত্রা করিলে পাপী হইবে না এইরূপ ভাব তুমি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলে, এখন ভাবিয়া দেখ, এই নিষেধ দ্বারা তোমার সেই ভাব অকর্ম্মণ্য হইল। অন্যযুগে উত্তর দেশবাসীর সমুদ্রযাত্রার পাপ হইত না বটে, কিন্তু কলিকালে পাপ হইবে কুমারিল ও পার্থসারথির মত না মানিলে—এইরূপে বচনের সফলতা হয়।

আমি। মহাশয়! এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা যায় কি?

তর্করত্ন। শুনিতে চাও ত আর একটা কথা শুন; উত্তর দেশবাসীর অন্য যুগে সমুদ্রযাত্রার পাপ হউক আর নাই হউক, সে বিষয় তুমি ভুলিয়া যাও; যাহা তোমার ইচ্ছা সেই পক্ষই মানিয়া লও, আর দক্ষিণ দেশবাসীর যে পাপ হয়—ইহা মনে রাখ, এরূপ ক্ষেত্রে কলিকালে যে সমুদ্র যাত্রা নিষেধ আছে তাহা অধিক দোষের জন্য, পূর্ব্বযুগে যে পাপ হইত, কলিকালের সমুদ্রযাত্রা উভয় দেশবাসীরই তদপেক্ষা অধিক পাপজনক হইবে—ইহা বুঝাইবার জন্যই সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ এই অংশ আছে। এই আমার কথা। সে অধিক পাপ যে কিরূপ—তাহা আদি পুরাণে স্পষ্টীকৃত; "সমুদ্রযাত্রাকারী দ্বিজ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ব্যবহার্য্য হইবে না" ইহা আদি পুরাণ বচনের অর্থ।

আমি। (৪) অর্থ স্বীকার করিলে, বচন নিস্ফল হয় কি না? তাহাও বলুন।

তর্করত্ন। পূর্ব্বে বলিয়াছি পাপীর সহিত অন্ততঃ কতিপয় লঘু সংসর্গে কলিকালে পাপ নাই, সম্ভাষণ স্পর্শ এবং ধন গ্রহণ তাহার অন্তর্গত। সমুদ্রযাত্রাপাপে পাপীর সহিত সম্ভাষণ, তাহাকে স্পর্শ করা এবং তাহার ধন গ্রহণ করা এই প্রকার আত্মীয়তা স্থাপন বা

সংসর্গ করিলেও পাপ হইবে ইহার জন্ম "সমুদ্র-যাত্রা স্বীকারঃ" আছে, সুতরাং নিষ্ফল নহে।

আমি। উপপুরাণে যে কলিকালে সমুদ্র-যাত্রা স্বীকার নিষেধ আছে—বৌধায়ন তাহারই প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়াছেন, এবং কলি-কালেই দেশাচার হেতু উত্তরদেশবাসীর সমুদ্র-যাত্রায় দোষ নাই, ইহাও বৌধায়নের অভি-প্রায়—এ কথা বলিলে তাহার উত্তর কি?

তর্করত্ন। "কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাঃ"—এবং "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে" অর্থাৎ মনূক্তধর্ম্ম সত্যযুগের পালনীয়, কিন্তু অন্যযুগের স্মৃতিও যদি মনু-বচনের বিরুদ্ধ বাদিনী হয় ত তাহা প্রশস্ত হয় না। সেই মনু—'সমুদ্রযায়ী' ব্রাহ্মণকে অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়াছেন, অতএব সমুদ্রযাত্রা কেবল কলি-কালে নিষিদ্ধ নহে। আর, বৌধায়ন, "অথ পতনীয়ানি সমুদ্রযানং"—ইত্যাদি বচনে পাপকর্ম্মের গণনা করিয়াছেন, তাহার সকল গুলিই সকলযুগের পাপ—আর তাহার সহিত এক পর্য্যায়ে এবং সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত সমুদ্র-যাত্রা কেবল কলিযুগের পাপ—এরূপ বলিতে যাওয়া একান্ত দুঃসাহস। আরও দেখ, দেশাচারবশতঃ উত্তরদেশবাসীর সমুদ্রযাত্রা দোষাবহ নহে" বৌধায়নের এই কথা দ্বারা উত্তর দেশ যদি কলিকালে সমুদ্রযাত্রা-নিষেধের বর্জ্জনীয় ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইত, তাহা হইলে, দক্ষিণ দেশ ত অগ্রেই সেই বর্জ্জনীয় ক্ষেত্রমধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত, কারণ তোমার মতে কলিকালের পূর্ব্বে সমুদ্র-যাত্রায় নিষেধ না থাকায়, সকলদেশেই ত সমুদ্রযাত্রার আচার থাকিবার কথা—বিশেষতঃ সমুদ্রকূলবাসী দক্ষিণদেশীয়দিগের আচার ত অধিকতররূপে থাকিবারই কথা।

পরন্তু বৌধায়ন যখন তাহা করেন নাই, তিনি উত্তরদেশের পক্ষেই দেশাচার বলিয়াছেন, তখন উহা কেবল কলিযুগে নিষিদ্ধ নহে, চিরকালই নিষিদ্ধ বলিতে হয়, দক্ষিণদেশবাসীরা সে নিষেধ মানিতেন, তাই দেশাচার হয় নাই।

আমি। মহাশয়! চণ্ডীতে "স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে" আছে, মহাভারতে সমুদ্রযাত্রার কথা আছে, বিষ্ণুসূত্রে আছে "সমুদ্রযান-সিদ্ধিমাপ্যে" অর্থাৎ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সমুদ্রযানসিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ সমুদ্রযাত্রার অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি হয়। আর অধিক কি ঋগ্বেদে আছে, রাজপুত্র ভুজ্যু সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। তদপেক্ষা উপপুরাণ কি অধিক মান্য?

তর্করত্ন। মনু এবং বৌধায়নের কথা ভুলিয়া গিয়াছ—দেখিতেছি; তা হউক তোমার ভাবের অনুবর্ত্তন করিয়া তোমার ভাষাতেই বলিতেছি; ক্ষেত্রবিশেষে উপপুরাণ অধিক মান্য।

আমি। মহাশয়! বেদাদি অপেক্ষা যে উপপুরাণ অধিক মান্য—তাহা ত কখন শুনি নাই, বরং শুনিয়াছি,—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রুতেঃ স্যাৎ প্রামাণ্যং তয়োর্দ্বৈধে-স্মৃতির্বরা"

শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণের মধ্যে বিরোধ হইলে শ্রুতি মান্য, পুরাণ ও স্মৃতির বিরোধ হইলে স্মৃতি মান্য। আপনি বলিতেছেন—উপপুরাণ অধিক মান্য, অতএব ইহা বিশদভাবে আমাকে উপদেশ দিন।

তর্করত্ন। প্রথম বুঝ, বিরোধ কি? এক শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে যদি অন্য শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন করা হয়; তাহা

হইলেই বিরোধ বলিতে হয়। যথা—অষ্টাচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিবার বিধি স্মৃতিতে আছে এবং বেদে আছে কৃষ্ণকেশ (যাহার কেশ শুক্ল হয় নাই) অর্থাৎ যুবাপুরুষ, নিজের পুত্র জন্মিলে, অগ্নি আধান করিবে। যদি কেহ স্মৃতির আদেশ মান্য করিয়া ৪৮ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করে; তাহা হইলে তাহার পক্ষে বেদের আদেশ লঙ্ঘন করা হয়, তাহার পক্ষে কৃষ্ণকেশ থাকিতে পুত্র-জন্ম ও অগ্নি-আধান ত হইতে পারে না, পক্ষান্তরে শ্রুতির আদেশ মান্য করিলে ৪৮ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবার স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিধি বা আদেশ লঙ্ঘন করা হয়। এইরূপ শ্রুতিস্মৃতি-বিরোধে শ্রুতি মান্য, অর্থাৎ শ্রুতির আদেশ পালনীয়। যাহার অন্য কোন কারণে অগ্ন্যাধানের অযোগ্যতা থাকিবে, তাহার পক্ষে ৪৮ বৎসর বেদব্রহ্মচর্য্য হইতে পারে, নতুবা নহে। তবেই দেখ স্মৃতির সঙ্কোচ হইল। শ্রুতির প্রবলতাহেতু স্মৃতির সঙ্কোচ এইমাত্র, পরন্তু একেবারে "ন স্যাৎ" করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না।

সেইরূপ উপপুরাণের সহিত যদি শ্রুতি বা স্মৃতির বিরোধ হয়, তাহা হইলে উপপুরাণের সঙ্কোচ করিতে হয়। এখানে ত বিরোধ নাই।

আমি। আছে বৈ কি? উপপুরাণে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ রহিয়াছে, বেদে সমুদ্রযাত্রার কথা আছে।

তর্করত্ন। কথা থাকাতে আর নিষেধে বিরোধ হয় না। কথা থাকার নাম বিধি বা আদেশ নহে। বরং যে বিষয়ে বেদে স্পষ্ট বিধি আছে, উপপুরাণে তাহাও নিষিদ্ধ হইয়াছে; যথা—অশ্বমেধযজ্ঞ ইত্যাদি স্মৃতিতে ক্ষেত্রজ-পুত্র-উৎপাদনের বিধি আছে (মনু)। আদিপুরাণে নিষিদ্ধ হইয়াছে, দত্তক এবং ঔরস ভিন্ন পুত্র নাই, মনু অনুলোমজা কন্যার বিবাহ বিধি দিয়াছেন, এই উপপুরাণে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে—অথচ সমাজে তাহাই প্রচলিত; এখানে শ্রুতি স্মৃতি অপেক্ষা উপপুরাণ তোমার ভাষায় কি "অধিক মান্য" হইতেছে না? ফলতঃ কিন্তু ইহাকে "অধিক মান্য" বলে না, কেননা এখানে বিরোধ নাই।

বেদের অশ্বমেধাদিযজ্ঞ বিধি এবং স্মৃতির ক্ষেত্রজ পুত্র বিধি ও অনুলোমজা-বিবাহ-বিধি সত্যাদি যুগত্রয়ের পালনীয়, এবং তাহার নিষেধ কলিযুগে পালনীয়। এককালীন বিধি-নিষেধ নাই বলিয়াই বিরোধ নাই। উপপুরাণের প্রভাবেই এই কালভেদ ব্যবস্থা হইতেছে, এই বলিয়া যদি বল উপপুরাণকে অধিক মান্য করা হইয়াছে, তাহা হইলে আমি তাহা স্বীকার করি—তদনুসারে পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্ষেত্রবিশেষে অধিক মান্য; ফলতঃ ইহা অধিক মান্য নহে, সর্ব্ব প্রমাণের সামঞ্জস্য মাত্র।

আমি। চণ্ডী, বিষ্ণুসূত্রে এবং বেদে যে সমুদ্রযানের কথা আছে—তৎসম্বন্ধে আপনার সমাধান কি?

তর্করত্ন। সমুদ্রযাত্রা—পুরাণ, বিষ্ণুসূত্র এবং বেদে আছে বলিয়া তাহাকে ঐতিহাসিক তথ্যরূপে, না শাস্ত্রের আদেশ-রূপে গ্রহণ করিতেছ?

আমি। শাস্ত্রের আদেশরূপে।

তর্করত্ন। অমুক কার্য্য করিবে এবং অমুক কার্য্য করিবে না—এইরূপ বিধি বা নিষেধ না হইলে তাহাকে শাস্ত্রের আদেশ বলা যায় না। আদেশ না হইলেও কেবল ঘটনা দেখিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করা যায় না। যম-

ভগিনী যমী সহোদরকে আপনার মনোভাব জানাইয়া 'প্রণয়' ভিক্ষা করিয়াছিলেন,— ঋগ্বেদে ইহা আছে, তাহা বলিয়া সহোদরা সহোদরের নিকট 'প্রণয়' ভিক্ষা করিবে এরূপ বিধি কল্পনা হয় না। চণ্ডীতে 'স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে" আছে বলিয়া যে মনে করিবে পোতে সমুদ্রযাত্রা করিতে হয়, তাহা নহে। চণ্ডীতে বৈশ্য যে আপনার "পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ" ধনলোভহেতু অসাধু স্ত্রী-পুত্র কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল, তাহাতে কি বুঝিবে যে স্ত্রী স্বামীকে এবং পুত্র পিতাকে তাড়াইয়া দিবে! বিষ্ণুসূত্রে (৭৮ অঃ) সমুদ্রযান-সিদ্ধিলাভের কথা আছে।

এই অধ্যায়েই ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধ করিলে "ষষ্ঠ্যাং দ্যূতবিষয়ং" (দ্যূতবিজয়ং) দ্যূতলাভের কথা আছে। অথচ দ্যূতক্রীড়ক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে অপাঙ্‌ক্তেয়। যথা মনু,—

জটিলঞ্চানধীয়ানং দুর্ব্বলং কিতবং তথা
যাজয়ন্তি চ যে পূগাং স্তাংশ্চ শ্রাদ্ধে ন
ভোজয়েৎ ॥—৩য় অঃ ১৫১।

অধ্যয়নহীন ব্রহ্মচারী, দুষ্কর্ম্মা, দ্যূতক্রীড়াকৃৎ, এবং বহুযাজী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে ভোজনীয় নহে, অর্থাৎ অপাঙ্‌ক্তেয়।

"পিত্রা বিবদমানস্ত কিতবোমদ্যপস্তথা"
—মনু ১৫৯।

আপনার অর্থে পরদ্বারা যে দ্যূতক্রীড়া সম্পাদন করে সে ব্যক্তিও অপাঙ্‌ক্তেয়।

ব্রাহ্মণ সমুদ্রযানেও অপাঙ্‌ক্তেয়, দ্যূতেও অপাঙ্‌ক্তেয়। ইহা মনু বলিয়াছেন।

বিষ্ণুসূত্রে যখন সেই দ্যূতবিষয়-লাভের কথা আছে, তখন সমুদ্রযানসিদ্ধির কথা থাকিলে ক্ষতি কি? ফলতঃ যে সকল কার্য্য সমাজে ধনলোভী ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা আচরিত হয়, ফলশ্রুতিরূপে তাহারই উল্লেখ আছে; পরন্ত তাহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কি বিহিত, তাহার বিচার ত সেখানে থাকিতে পারে না।

আমি। ঘটনার উল্লেখ দেখিয়া বিধি-নিষেধের অনুমান করা যায়, যদি সমুদ্রযাত্রা কুকর্ম্ম হইত, তাহা হইলে তাহা চলিত থাকিত না।

তর্করত্ন। দ্যূতক্রীড়ার কথা ঋগ্বেদেও আছে, মহাভারতে ত তাহার চূড়ান্ত; তাই বলিয়া তাহাকে কি সৎকর্ম্ম বলিবে? অথবা মনু দ্যূতক্রীড়াফলে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে বেদের বিরুদ্ধবাদী বলিবে? বেদবর্ণিত ঘটনাকে কি ভাবে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা—

"বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ" ইত্যাদি মীমাংসা-দর্শন ১ম অঃ, ২য় পাদ, ৭ম সূত্রের ভাষ্য দেখিয়া বুঝিবে।

ভুজ্যু পিতার আদেশে পোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহার পোত জলমগ্ন হইয়াছিল, অশ্বিনীকুমার দেবতার স্তব করিয়া তিনি তাঁহাদের প্রদত্ত পোত প্রাপ্ত হ'ন। এই ঘটনা-বর্ণনার ফলে, বেদ-বোধিত বিধি এই হইল যে "পিতার আদেশে দুঃসাধ্য এবং দুঃখাবহ কর্ম্মও কর্ত্তব্য।" 'স্বধর্ম্মসাধন উদ্দেশ্য ব্যতীত সমুদ্রযাত্রা কর্ত্তব্য নহে' এবং "বিপন্ন ব্যক্তি বিপদ্ উদ্ধারের জন্য দেবতার স্তব করিবে" অথবা "পোত-ভঙ্গে বিপন্ন ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারের স্তব করিবে।"

আমি। এই সকল বিধি বেদোক্ত ঘটনা হইতে কেমন করিয়া স্থির হইল?

তর্করত্ন। সমুদ্রযাত্রা যে কষ্টসাধ্য এবং বিপজ্জনক, তাহা পোতভঙ্গব্যাপারে বর্ণিত, পিতার আদেশে সেইকার্য্য পুত্র করিয়াছে, অতএব কার্য্য যত কঠিনই হউক পিতার

আদেশে তাহা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য—এই উপদেশ বেদ হইতে প্রাপ্ত হওয়া গেল। যাহা দুঃখজনক, যাহা বিপজ্জনক, সেরূপ কার্য্যে দ্বেষ হইয়া থাকে, দ্বেষের ফল সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্তি; পিতার আদেশ পালন ধর্ম্ম, এইরূপ ধর্ম্ম-অর্জ্জনে উৎকট অনুরাগ না থাকিলে ঐরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্তিই স্বাভাবিক। এই ধর্ম্মভাব হইতেই অশ্বিনী-কুমার স্তবে তুষ্ট হইয়া ভুজ্যুকে রক্ষা করেন। এই বর্ণনায় ধর্ম্মসাধন-উদ্দেশ্য ব্যতীত সমুদ্র-যাত্রা করিবে না—এইরূপ নিষেধের প্রচার। নিষেধের ফল নিবৃত্তি। শেষোক্ত সামান্য বা বিশেষ বিধিরও সূচনা।

যে ভাবে বেদের মন্ত্রভাগ হইতে বৈদিক বিধি-নিষেধের অনুমান করিতে হয়, সেই ভাব অবলম্বন করিলে বেদ সমুদ্রযাত্রার প্রতি-রোধকই হইয়া থাকে। বেদের এইরূপ ভাবই মহর্ষি মণ্ডলী গ্রহণ করিয়াছেন। কথিতরূপে সমুদ্রযাত্রাকারী বেদ-নিষিদ্ধ বলিয়াই মনু সমুদ্রযাত্রীকে অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়াছেন। মনু-বচন বেদের বিরুদ্ধ ত নহেই, প্রত্যুত তাঁহার সমস্ত উপদেশই বেদে নিহিত; যথা—

"যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা
সম্প্রকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো
হি সঃ।"

এবং বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং
হি মনোঃ স্মৃতম্।"

আমি। মহাশয়! ঐ প্রকারে বিধিনিষেধ কল্পনা যাহাই হউক, আমি ঐ পথ পরিত্যাগ করিলাম। ঐতিহাসিক রূপেই দেখিতেছি যখন বেদ হইতে রাজতরঙ্গিণী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রমাণ আছে, বরাবর সমুদ্রযাত্রা দেশে ছিল, তখন ইহা বর্জ্জনীয় হইবে কেন?

তর্করত্ন। বেদ নিত্য অপৌরুষেয় ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র-মীমাংসকের মত, তিনি বেদের ইতিহাসরূপত্ব অস্বীকার করেন. "পরন্তু শ্রুতি সামান্যমাত্রং" (মীমাংসাদর্শন ১।১।৩১ সূত্র) দেখিবে। তথাপি নবীন ভাব অনুবর্ত্তন করিয়াই বলিতেছি, বেদ হইতে রাজতরঙ্গিণী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ত অসচ্চরিত্রতার কথা আছে, তাহারও ঐতিহাসিক তথ্যরূপে মূল্য কম নহে, তাই বলিয়া তাহা কি সমাজে প্রচলিত করিতে হইবে? অসচ্চরিত্রতার মূলে যেমন লোভ আছে, সেইরূপ সমুদ্রযান প্রভৃতি কতিপয় কার্য্যের মূলেও লোভ আছে; প্রথমোক্ত কার্য্যে এক প্রকার লোভ এবং শেষোক্ত কার্য্যে অন্যপ্রকার লোভ, এই যা প্রভেদ। কিন্তু মনে রাখিবে, সংযমে ধর্ম্ম, অসংযমে অধর্ম্ম।

যত সমুদ্রযাত্রা ইতিহাসে আছে, তাহার মধ্যে ধর্ম্মার্থ যাত্রা অতি অল্প। ধনলোভে সমুদ্রযাত্রাই অধিক। যে ধনলোভ দুস্তর সমুদ্র তরণে মানবকে উৎসাহিত করে, তাহা অল্প নহে, তাহা জ্ঞান-প্রধান সংযমী মানবের পোষণীয় নহে। রাজাদিগের ধর্ম্মকার্য্য সাধনোদ্দেশে যে সমুদ্রযাত্রা তাহা তীর্থযাত্রার ন্যায় জানিবে। রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্যই পাণ্ডব সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। তথাপি যে স্থানে যাইবার জন্য স্থলপথ ও সমুদ্রপথ দ্বিবিধ পথ বর্ত্তমান, সে স্থানে ধর্ম্মকার্য্য-সাধনোদ্দেশেও সমুদ্রপথ অবলম্বন কর্ত্তব্য নহে। এইজন্যই কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন—

পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
রঘু পারসীকদিগকে জয় করিবার জন্য স্থলপথে যাত্রা করিলেন। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল বলিয়াই স্থলপথে যাত্রার কথা কবি লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন। আদর্শ ধার্ম্মিক রঘুকে সাধারণ লোকের ন্যায় চিত্রিত করা মহাকবির যে অকর্ত্তব্য। অতএব সিদ্ধান্ত এই, ধর্ম্ম সাধনোদ্দেশ্য ব্যতীত সমুদ্রযাত্রায় পাপ সর্ব্বযুগেই আছে। পরন্তু কলিযুগে সমুদ্রযাত্রাকারী ব্রাহ্মণমাত্র অব্যবহার্য্য থাকিবে, অথবা ব্রাহ্মণেতর জাতিও প্রায়শ্চিত্ত করিলেও অব্যবহার্য্য এইমাত্র বিচার্য্য বা জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে।

আমি। এ জিজ্ঞাস্যও আছে।

তর্করত্ন। অদ্য সে সম্বন্ধে উত্তর দিবার অবসর নাই, সময়ান্তরে দিব।

আমি। কলিকালে সমুদ্রযাত্রা-নিষেধে এত কঠোরতা যে হইয়াছে, এ বিষয়ে কি কোন যুক্তি আছে?

তর্করত্ন। যুক্তি নিষ্প্রয়োজন ও অনুচিত, আজ্ঞাই যথেষ্ট। তবে তুমি জিজ্ঞাসু, তোমার তৃপ্তির জন্য কিছু বলিতে হয়, তাই বলিতেছি শুন; যে সময়ে আমাদের সমাজস্থ বহু সামাজিক লোভে অভিভূত, স্বীয় ধর্ম্মপ্রভাবে দ্বীপান্তরবাসীকে আকৃষ্ট করা দূরের কথা, তাহাদিগের আকর্ষণে স্বয়ং আপনাদিগের স্বল্পাবশিষ্ট ধর্ম্মজ্ঞানেও জলাঞ্জলি দিয়া, অর্থ-কামের সেবায় আত্ম-নিয়োগে তৎপর, সেই সময়ে পুরাতন সমুদ্রযাত্রা নিষেধ অধিকতর দৃঢ়ভাবে প্রচারিত হইল। বর্ত্তমান সময়ের হিন্দু সন্তানগণের লোভ আরও বাড়িয়াছে, ধর্ম্মজ্ঞান স্বল্পতর হইয়াছে। এখন সমুদ্র-যাত্রার ব্যবস্থা প্রকারান্তরে জাতীয় জীবনের উচ্ছেদের কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শ্রীপঞ্চানন কাব্যতীর্থ।

হিন্দু ট্র্যাক্ট

বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটির সমাস কি? রামেশ্বরের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটিরও একাধিক সমাস হয়। বিশ্বের বিদ্যালয় অর্থাৎ যাবতীয় বিদ্যালয়সমূহের সমষ্টিস্বরূপ একটা বিদ্যা-মন্দির কিংবা বিশ্বের বিদ্যার অর্থাৎ যাবতীয় বিষয় শিখিবার একটা আলয় বা স্থল। বিশ্ব-বিদ্যালয় শব্দটির আর একটি সমাসও করা যায়, যথা বিশ্ব-রূপ যে বিদ্যালয়। এই সম্বন্ধেই আজ দু'এক কথা বলিব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্য্য দেখিতে পাই—বৎসর বৎসর পরীক্ষা-গ্রহণ, উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে উপাধি ও পুরস্কার দান ইত্যাদি ইত্যাদি। সংসাররূপ পরীক্ষা-মন্দিরেও আমাদিগকে অনেক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়, এখানেও পাশ-ফেল আছে এবং এই পাশ-ফেলের খেলা অহরহই চলিতেছে।

সংসারের যত দুঃখ ও প্রলোভন, এই বিশ্ব-রূপ বিদ্যালয়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রস্বরূপ আমাদের ভিতরের খাঁটি সোনাটুকু কষিয়া দেখিবার নিকষ পাথর। আমরা যদি চোখ বুজে বসে না থাকি, আমাদের অনেক দর্প অনেক অভিমান, এই সব পরীক্ষায় ভেঙ্গে চূরে যায়, আমাদের প্রকৃতমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে। আমরা প্রকৃত পক্ষে কে কেমন এই সব পরীক্ষাতেই ঠিক করা যায়। দুঃখ ও প্রলোভনের মাঝে যে স্থির থাকিতে পারে সেই ত মানুষ। "বিকারহেতৌ সতি

বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।” “পাগল হরনাথ” * বলেন, যাত্রায় হনুমান্ সেজেও (অর্থাৎ সামান্য পার্ট লয়েও) যারা লোক মুগ্ধ করিতে পারে, জানিবে তাদেরই অভিনয়-শক্তি অনন্যসাধারণ। সংসার পরীক্ষাগার সম্বন্ধে এই পুস্তকের ৩য় খণ্ড ১৪শ পৃষ্ঠা ও অন্যান্য স্থল দ্রষ্টব্য।

ভাল ছেলেরা কখন কখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে প্রশ্ন করে, কে কেমন শিখিল ঠিক করিয়া লয়, আপোষে লড়াই করার মত এইরূপ উপায়ে আপনাদের বল বাড়াইতে চেষ্টা পায়। এ সংসারেও কোন কোন মহাপুরুষ কখন কখন স্বেচ্ছায় এইরূপ দুঃখ—প্রলোভন বরণ করিয়া লন। রামপ্রসাদ গাহিতেন “আমি নহি মা আটাশে ছেলে, ভয় করি না মা চোখ রাঙ্গালে।” প্রাতঃ স্মরণীয়া কুন্তী দেবী বলিতেন, “দুঃখে পড়িলে ভগবান্‌কে বেশী বেশী মনে হয়, অতএব দুঃখ ভগবানের দয়ার দান।” প্রকৃত ভাল ছেলে যারা, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে তারা সদাই সমুৎসুক।

আবার, পরীক্ষার নামে অনেক ভাল ভাল ছেলেরও হৃৎকম্প হয়। জয়-পরাজয় কখন কিরূপ হয় স্থিরতা নাই। এই সংসাররূপ পরীক্ষাগারেও ‘মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম’ ঘটে, অন্যে পরে কা কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শ্রেণীর বালকগণের পরীক্ষাও কঠিনতর। যিনি যে পরিমাণে কঠিন পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ, শিক্ষিত মহলে তাঁর তেমনই সমাদর। একটা পাশ করা ছেলের চেয়ে চারিটা পাশ করা ছেলের দর বেশী। এম্-এ বা ষ্টুডেণ্টশিপ পাস আর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে মর্য্যাদার পার্থক্য আছে। অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই খাঁটি সোনা বাহির হয়। আধ্যাত্মিক জগতেও এই নিয়ম বিদ্যমান। এ সংসারে অনেক নির্দ্দোষী অকারণে দণ্ডিত, অনেক গুণবান্ অকারণে লাঞ্ছিত হন। রবীন্দ্রনাথ নিজগুণে ‘নোবেল পুরস্কার’ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তার উপাধি লাভ করিলেন, ঠিক এমনই সময়ে তাঁহার উপর দিয়া অপমানের কি প্রবল ঝড়ই না বহিয়া গেল। তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা-উপলক্ষে তাঁহার অনন্যসাধারণ বিনয় ও কবিত্বপূর্ণ প্রত্যুত্তরের (হয়ত কৌতুক-ভরেই) যে কদর্থ বাহির হইয়াছে, তাহাতে অকারণে তাঁহার মনে কত ক্লেশই না প্রদান করা হইয়াছে! কিন্তু এইরূপ সব অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার যোগ্যতা না থাকিলে আধ্যাত্মিক রাজ্যেও ডাক্তার উপাধি লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা বিরল। জীবনে সকলকেই অল্পাধিক পরিমাণে এইরূপ সব অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়, তবেই শ্রীরাধিকার কলঙ্ক মোচন হয়, রামের সীতা রামের নিকট সমাদৃতা হন, ভগবানের নিকট সাধকের আদর বাড়ে। সংসাররূপ পরীক্ষাগারে যিনি যে পরিমাণে কঠিন পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ, দেবগণের তিনি সেই পরিমাণে প্রিয়পাত্র।

* “পাগল হরনাথ” বা “শ্রীহরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী”। প্রাপ্তিস্থান, “গৃহস্থ”-স্বত্বাধিকারী ২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা।

পরীক্ষায় পাশ হতে পারিলে, বাপ মা প্রভৃতি গুরুজনের কত না আনন্দ। কোন কোন ভাল ছেলে, ইহাদের মুখ চেয়ে ইহাদিগকে আনন্দিত করিবার লোভে মন দিয়া লেখা পড়া করে ও সাবধানে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজেরা ধন্য হয় এবং আত্মীয়-স্বজন সকলকেই কৃতার্থ করে। আধ্যাত্মিক জগতেও যাঁহারা প্রকৃত সজ্জন, ভগবানের সন্তোষ-সাধনই তাঁহাদের জীবন-ব্রত হয়, অন্যবিধ দণ্ড-পুরস্কার-চিন্তা তাঁহাদের নিকট মূল্যহীন, এবং নিজেরা মুক্ত পুরুষ হইলেও অন্যের মুখ চেয়ে সদাচারণ বিসর্জ্জন দেন না।

কোন কোন ছেলে মুখস্থ বিদ্যার জোরে পাশ হয়, ইহারা পরে তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না। চরিত্র যতদিন প্রকৃত গঠিত না হয় ততদিন বিশ্বরূপ পরীক্ষাগারে পাশ হইতে পারিলেও বেশী কিছু কাজের হয় না। ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে যে ভাল থাকা, সেটা এইরূপ মুখস্থ বিদ্যার জোরে পাশ করার মত।

কোন কোন ছেলে সাফাই গাহে যে, সে প্রশ্নের উত্তর জেনেও একরূপ ইচ্ছা করেই ফেল হয়েছে। এ সব ছেলের অভিভাবকেরা এরূপ সাফাই শুনে সন্তুষ্ট না হইয়া দূর দূর করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। এ সংসারেও আমরা অনেক সময় যাহা উচিত তাহা করি না এবং যাহা অনুচিত তা হইতে বিরত থাকি না। কিন্তু তাই বলিয়া এই সব খারাপ ছেলের মত নিজেরা যদি সাফাই গাহিয়া সাফ হব আশা করি, তা হইলে আমাদের ভাগ্যেও অনুরূপ ফল প্রাপ্তি ঘটিবে, আমাদের সাফাই শুনিয়া ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন না। মুখে জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যত বড় বড় কথাই কহিতে পারি বা শিখি না কেন, পরন্তু তখনও এই বিশ্বরূপ বিদ্যালয়ের অনুত্তীর্ণ ছাত্র বলিয়াই পরিগণিত হইতে হইবে।

পরীক্ষায় পাশ না হইলে প্রোমোশন নাই, অভিভাবকের হাত থেকেও নিস্তার নাই। যতদিন না পাশ হই, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা-দান জন্য পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইতে হয়। তদ্রূপ এই বিশ্বরূপ বিদ্যালয়েও যতদিন না পাশ হইতে পারা যাইবে পুনঃ পুনঃ যাওয়া আসা করিতে হইবে। এটা বুঝিয়া, প্রকৃত বুদ্ধিমান্ যিনি তিনি শীঘ্র শীঘ্র পাশ হইবার চেষ্টা পান, বারবার এই ভাবে যেন যাওয়া আসা করিতে না হয়।

পরীক্ষা-গৃহে পরের লেখা কপি করে কোন কোন অবোধ ছেলে পাশ হবার চেষ্টা পায় ও ধরা পড়িলেই দণ্ডিত হয়। এই সংসাররূপ পরীক্ষাগৃহেও সেইরূপ অনেকে ধার্ম্মিক না হয়েও বক ধার্ম্মিক সাজিয়া সহজ উপায়ে পাশ হইবার চেষ্টা পান, কিন্তু ভণ্ডামি ধরা পড়িলে লাঞ্ছনার অবধি থাকে না, তাঁহার নিকট পরের লেখা নকল করে পাশ হবার আশা বৃথা।

সব ছেলেই কিছু পাশ হতে পারে না, আপন জনের সাহায্যে ও দয়ায় অনেক ফেল হওয়া ছেলেও উত্তর কালে সুখী হতে সমর্থ হয়। মুক্তিরও সেইরূপ একটি মাত্র রূপ বা একটি মাত্র পথ নাই। যিনি অনুপায়ের উপায়, অগতির গতি, গুণবানের ন্যায় অধমেরও তিনিই ভরসা।

যত বড় ভাল ছেলেই হউক, পিতা মাতা অধ্যাপক প্রভৃতি গুরুজনের কৃপাই তাহার কৃতকার্য্যতার মূল। তত্ত্বদৃষ্টিতে আপনাকে দেখিতে চেষ্টা পাও, নিজগুণের বড়াই

একেবারে ঘুচিবে। বুঝিতেপারিবে, সমস্তই "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" "ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ।"

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়

বক্রেশ্বর

প্রকৃতির ক্রীড়াস্থল বীরভূমির উপর কত শতাব্দী কত যুগ যুগান্তর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি সেই বীরভূমি অদ্যাপিও প্রকৃতির অতি প্রিয় নিত্য লীলা ক্ষেত্ররূপে বিরাজমানা। সুপ্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ বক্রেশ্বর সাধারণের নিকট সুপরিচিত; স্বাভাবিক এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত দৃশ্যাবলীর একত্র সমাবেশে স্থানটী অতীব মনোরম; এজন্য সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতীয় নরনারীগণ বক্রেশ্বর দর্শনার্থ আগমন করিয়া থাকেন। বিশ্বেশ্বর-পুরী বারাণসী যেরূপ বরুনা এবং অসীনাম্নী নদী দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া পাপপঙ্কিল পৃথিবী হইতে পৃথক্ ভাবে মুক্তি ক্ষেত্ররূপে বিরাজ করিতেছে, বক্রেশ্বরক্ষেত্রও সেইরূপ দুইটী স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিণী দ্বারা উত্তর পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিকে পরিখাবেষ্টিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যেন উভয়স্থানেই দেবাদি-দেব স্বাধিষ্ঠিত পুণ্য ভূমির কলি কলুষময় কালরাজ্যের সহিত সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সত্য বটে, বিপুলায়তনা বারাণসী নগরী সুদৃশ্য সৌধাবলী এবং বিবিধ পণ্যবীথিকা, কারুকার্য্য খচিত অগণ্য দেবালয় ও চত্বরাদি দ্বারা পরিশোভিত হইয়া মহেশ্বর রাজধানীর মহিমা এবং গৌরব ঘোষণা করিতেছে, এবং তাহার সহস্রাংশের সহিতও তুলনায় বক্রেশ্বর ক্ষেত্র নিম্নতম স্থানে অবস্থিত অথবা সম্পূর্ণ-রূপে অযোগ্য তত্রাচ এস্থানে যে সকল স্বাভাবিক দর্শনীয় বিষয় আছে তাহা একবারে উপেক্ষণীয় নহে। এটী যেন মহিমাময় মহেশ্বরের নির্জ্জনাবাস প্রভু যোগেশ্বর যেন এখানে নির্জ্জনতার সহিত বৈরাগ্য ও যোগসুখ উপভোগ করিতেছেন। প্রকৃতির নিভৃতান্তরালে অবস্থিত বলিয়া এই বক্রেশ্বর ক্ষেত্র 'গুহ্যতীর্থ' (১) অথবা 'গুপ্তকাশী' বলিয়া পুরাণে কথিত হইয়াছে।

এই তীর্থ ক্ষেত্রের পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে বক্রেশ্বর নদ ধীর গতিতে প্রবাহিত হইতেছে; দক্ষিণাংশে পাপহরা নদী; তথায় নিত্য শব সংকার হইয়া থাকে। চতুর্দ্দিকস্থ প্রায় আট দশ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম ও নগর হইতে মৃতদেহ এখানে সংকারার্থ আনীত হয়। পাপহরা যেন মহাকালের অনির্ব্বান চিতায় জীবদেহলয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া জীবজগতে নশ্বরতা ও বিবেক বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদান করিতেছে। নদীর পশ্চিমতীরে অর্থাৎ বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বাংশে একটী বিরল পাদপ বনভূমি, বনের পশ্চিমাংশে বহুসংখ্যক শিবালয় পরিবেষ্টিত বক্রেশ্বর দেবের উন্নত মন্দির। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আটটী স্রোতকুণ্ড, এই কুণ্ডগুলি হইতে উষ্ণ জল বুদ্বুদাকারে অবিরত প্রসূত হইয়া পাপহরা

(১) ......'গুহ্যতীর্থং পরং মহৎ'—বক্রেশ্বর মাহাত্ম্যম্, প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নদীর সহিত মিলিত হইতেছে। মন্দির-প্রাঙ্গণেও শ্বেতগঙ্গা নামে একটী জলকুণ্ড আছে, এতদ্ভিন্ন জীবকুণ্ড নামক আর একটী যোগকুণ্ড আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেটীর জল শীতল। উষ্ণ কুণ্ডের অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী কুণ্ডের জল কি জন্য শীতল তাহার কারণ নির্দ্দেশ ভগবৎভক্তের পক্ষে অতীব সহজ, কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্‌গণের পক্ষে বিষম সমস্যার বিষয়। যোগকুণ্ড এবং বক্রেশ্বর-দেবের অন্যান্য বহুসংখ্যক শিবালয় বক্রেশ্বর-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানে স্থানে মন্দিরবিহীন অনেক শিবলিঙ্গও বিদ্যমান রহিয়াছেন।

শ্বেতগঙ্গা-কুণ্ডের উত্তর-পূর্ব্বকোণে এক প্রকাণ্ড বট (১) বৃক্ষের চারিদিকে কতিপয় বিকলাঙ্গ প্রস্তরময় দেবমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। দাঁইহাট-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সংপ্রতি এই পুণ্যক্ষেত্রে একটী মন্দির স্থাপন করিয়া দুইটী শিবলিঙ্গ এবং একটী কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তিনি তথায় মহামায়ার নিত্যসেবা এবং অতিথি-সেবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই তীর্থক্ষেত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ের অণ্ডাল সাঁইথিয়া কর্ড লাইনের দুবরাজপুর ষ্টেশান হইতে ৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে এবং সিউড়ি ষ্টেশান হইতে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ১৩ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত; উভয়স্থান হইতেই যাত্রীগণের সুবিধার জন্য সুপ্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দিয়াছেন। প্রতিবৎসর শিবচতুর্দ্দশীর সময়ে এখানে সপ্তাহাধিক কাল ব্যাপিয়া মহামেলা বসিয়া থাকে। সে সময়ে বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে যাত্রিগণ ও সাধু-সন্ন্যাসিগণ বক্রেশ্বর দর্শন এবং কুণ্ডস্নান জন্য আগমন করিয়া থাকেন।

ত্রৈলোক্যাধিপ বক্রেশ্বরাধিষ্ঠিত এই পবিত্র গ্রাম দুই ভাগে বিভক্ত। বক্রেশ্বর ও তিহি বক্রেশ্বর। এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বাস। তাঁহাদের অধিকাংশই বক্রনাথের সেবা ও পাণ্ডাগিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ইহা ব্যতীত এ গ্রামে অন্যান্য জাতিরও বাস াছে।

ক্ষেত্রের অবস্থিতি

এই পবিত্র ক্ষেত্রের অবস্থিতি সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরানান্তর্গত স্বয়ম্ভু সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে এই পরম পবিত্র বক্রেশ্বরাখ্য তীর্থক্ষেত্র গৌড়দেশে অবস্থিত। একদিকে পাপহরা, অন্যদিকে জাহ্নবী বেষ্টিত হইয়া, বিশেষতঃ পুন্যপদ বক্রেশ্বর ক্ষেত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া এই গৌড়দেশ পুণ্যের আধার হইয়াছে। এই গৌড়দেশবাসী প্রজাগণ সর্ব্বগুণবান্, ধর্ম্মশীল, কুবেরসদৃশ ধনী,

(১) এই বৃক্ষটী অক্ষয়বট-বৃক্ষ বলিয়া কথিত হয়। অতিশয় স্থূল হওয়ায় ইহার নামাল বা ঝুরি ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করায় তলস্থ সমস্ত বস্তুই মূলমধ্যে নিহিত করিয়াছে। এজন্য কামধেনু, শ্রীমাধব, বৃষ এবং পুরাণোক্ত অন্যান্য মূর্ত্তিগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন সময়ে এই পবিত্রক্ষেত্রে আসিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, কোনও ভক্ত সেই স্থানে চরণচিহ্ন স্থাপন করিয়া পবিত্র স্থানটীকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। একটী ষষ্ঠীমাতার ও কালীমাতার বেদী এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

পরাক্রমশালী এবং সত্যবাদী। এই স্থানে প্রভৃত কুলীন ও লব্ধবর্ণ প্রভৃতি আছেন। (১)

ক্ষেত্রের উৎপত্তি

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ক্ষেত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে অযোনি সম্ভবা লক্ষ্মী দেবীর স্বয়ম্বর সময়ে বৈকুণ্ঠে এক বিচিত্র সভা রচিত হইয়াছিল। (২) তথায় দেববৃন্দ পরিবৃত দেবরাজ পুরন্দর, সশিষ্য মুনিগণ এবং অপ্সর কিন্নর প্রভৃতি শুভাগমন পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠের বিপুল শোভা বৃদ্ধি করেন। আমন্ত্রিত মহোদয়গণের অভ্যর্থনার ভার দেবেন্দ্রের উপর অর্পিত হয়। ক্রমে মুনিশ্রেষ্ঠ লোমশ ও সুব্রত সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ পাদ্যার্ঘ দ্বারা অগ্রে লোমশ মুনির অভ্যর্থনা করিলে সুব্রত অপমান বোধ করিয়া ক্রোধ কষায়িত লোচনে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চৈতন্যোদয় হওয়াতে তিনি তপোভঙ্গ ভয়ে শাপ প্রদানে নিরস্ত হইলেন। যদিও তিনি সঞ্জাত ক্রোধকে প্রশমিত করিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন বটে, তত্রাচ ক্রোধাতিশয্য হেতু তাঁহার দেহ অষ্ট অংশে বক্র বিভক্ত হইয়া গেল। সেই অবধি সুব্রত মুনি অষ্টাবক্র নামে জগতে বিদিত হইলেন। (৩) তিনি

(১) গৌড়দেশে মহৎ ক্ষেত্রং বক্রেশ্বরং সুসঙ্গতং।
যন্নামস্মরণেনাপি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ।
একয়া পাপহারিণ্যা জাহ্নব্যা চ বিশেষতঃ।
বক্রেশ্বরেণ ক্ষেত্রেণ পুণ্যো গৌড়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
গৌড়দেশস্ত স্বভাব-বর্ণনং।—
নানাগুণ-সমাকীর্ণাঃ যত্র সর্ব্বে প্রজাগণাঃ
নানাপুণ্যগণোপেতা ধনিনো ধনদোপমাঃ।
বহবো লব্ধবর্ণাশ্চ কুলীনা বহবস্তথা।
পরাক্রমযুতাঃ শূরাঃ গৌড়দেশ-নিবাসিনঃ।
বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্যম্, প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

(২) পুরা দেবসভায়াস্ত নৃত্যমত্যমনোহরম্।
লক্ষ্মী-স্বয়ম্বরে পুণ্যে ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যসংযুতে॥
তত্র দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।
সমাজগ্মুঃ পরং দ্রষ্টুং কমলায়াঃ স্বয়ম্বরং॥
তত্রামরেশ্বরো দেবঃ শচীনাথঃ পুরন্দরঃ।
অগ্র দদ্যাৎ লোমশায় পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কম্॥
লোমশঞ্চ মহাত্মানং দৃষ্ট্বা চ ভগবান্মুনিং।
সুব্রতেণ শশাপেন্দ্রং তপোভঙ্গভয়ান্মুনিঃ॥
মহাকোপেন চাষ্টাঙ্গে বক্রত্বমগমন্মুনেঃ।
অষ্টাবক্রাভিধেয়ঞ্চ ততঃ প্রাপ দ্বিজোত্তমঃ॥
বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যম্ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।—

(৩) বিশ্বকোষ প্রণেতা নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে 'অষ্টাবক্র সুমতির গর্ভে ও কাহোড়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। উদ্দালকের কাছে কাহোড় শাস্ত্রাদি পাঠ করিতেন। উদ্দালক শিষ্যের সেবাশুশ্রূষায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গে আপন কন্যা সুমতির বিবাহ দিলেন। সুমতির অপর নাম সুজাতা। কিছুকাল পরে সুমতি গর্ভবতী হইলেন। একদিন কাহোড় পত্নীর কাছে বসিয়া বেদ পাঠ করিতেছেন; বেদাধ্যয়ন করিবার সময় তাঁহার ভ্রম হইতে লাগিল সুমতির গর্ভস্থ সন্তান পিতার সেই সকল ভ্রম সংশোধন করিয়া দিল। ইহাতে কাহোড় ক্রোধ করিয়া বলিলেন,—এখনও তুমি ভূমিষ্ঠ হও নাই। গর্ভে থাকিয়াই তোমার স্বভাব এত বক্র, অতএব তুমি অষ্টাবক্র হইয়া জন্ম লইবে। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে সেই শাপে তাহার শরীরের অষ্ট স্থান বক্র হইয়াছিল।—বিশ্বকোষ,—অষ্টাবক্র ৬৫০ পৃঃ।

লজ্জায় অনুতপ্ত হইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন এবং নানা বন, উপবন, মহাপীঠ, উপপীঠ ও তীর্থ ভ্রমণ করিয়া প্রথমে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ঝাঝরাগ্রামে উপনীত হন ও তাহার পশ্চিম প্রান্তভাগে শ্যামা মূর্ত্তিস্থাপন করিয়া কঠোর তপে নিযুক্ত হইলেন।

তপঃ প্রভাবে সেই স্থানে একটী কুণ্ড আবির্ভূত হয় ও তাহা হইতে ভোগবতীর পবিত্র সলিল উত্থিত হয়। (১) কিন্তু অষ্টাবক্র তথায় সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া অবশেষে বক্রেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণমন মুগ্ধ হইয়া গেল; তিনি দেখিলেন যে স্থানটী বিবিধ বনস্পতি সমূহে পরিশোভিত, এবং স্নিগ্ধ শান্তি ও নির্জ্জনতার আধার হেতু সাধনার সম্পূর্ণ উপযোগী। সুব্রত তথায় আশ্রম স্থাপন করিলেন।

প্রকৃতিই তত্ত্বজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসার প্রধান শিক্ষক; সুব্রত বনপাদপ রাজির নিকট হইতে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা এবং আশ্রিতবৎসলতার জাজ্জল্যমান উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন; কুসুমিত-পুষ্পভার-সন্নিধানে পরসেবা এবং ঈশ্বরার্চ্চন অর্জ্জন করিলেন, কোমললতিকা-সকাশে, পরনির্ভরতা, আশ্রয়-নিষ্ঠা শিক্ষা করিলেন এবং কলকণ্ঠ বিহগ-সমীপে মিষ্টভাষিতা এবং সঙ্গীত সাধনা করিলেন। তিনি বনস্পতির ন্যায় সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হইয়া, কৃশাঙ্গী বল্লরীর ন্যায় পরব্রহ্মে আত্মনির্ভর এবং অনন্যাশ্রয় হইয়া সুকণ্ঠ বিহঙ্গমের ন্যায় সামগান পূর্ব্বক কুসুম-ভারের ন্যায় পুষ্পাঞ্জলি ভগবচ্চরণে অর্পণ করিতে লাগিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন যে তিনি এই মহাশিক্ষার স্থান আর পরিত্যাগ করিবেন না। অষ্টাবক্র এইরূপে চঞ্চল মনকে স্থির করতঃ মনোরম লতাকুঞ্জে বসিয়া কঠোর তপে নিযুক্ত হইলেন।

অষ্টাবক্র বহুকালব্যাপী কঠোর তপস্যা করিয়া পার্ব্বতীনাথকে তুষ্ট করিলেন। ভোলানাথ স্তবে মুগ্ধ হইয়া এই বর প্রদান করিলেন যে "অদ্যাবধি তোমার পূজার পর আমার অর্চ্চনা হইবে, তোমার নামেই আমার স্থিতি হইবে" (২) এবং এখন হইতে এই ক্ষেত্র সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাত হইবে।" (৩)

ত্র্যম্বকের এই আদেশ হইবামাত্র বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা নদীর পূর্ব্বতটে অষ্টাবক্রের তপস্যা-স্থানে একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইল। তন্মধ্যে বিরাজিত বৃহত্তর পাষাণ লিঙ্গ-মূর্ত্তিটী অষ্টাবক্রের ও ক্ষুদ্রটী বক্রনাথের। মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণ-অংশে যে প্রস্তর-ফলক খোদিত আছে তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, এই অংশটী বীরভূমাধিপতি রাজা আসদ্-জ্জমান খাঁয়ের দর্পনারায়ণ নামক জনৈক মন্ত্রীর দ্বারা ১৬৮৫ সালিবাহনে (১৭৬১ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে রক্ষিত

(১) ঐ জলরাশিই স্রোতাকারে উত্তরবাহী ধারায় প্রবাহিত হইয়া কিয়দ্দূর গিয়া পরে পূর্ব্বাভিমুখে অজয় নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে উক্ত কুণ্ড মধ্যে সুদীর্ঘ কামিনীকেশ অদ্যাপিও পাওয়া যায়।

(২) "সততং ত্বঞ্চ মক্তক্তোঽপ্যষ্টোধোঽপ্রিয়ভূতে সদা।
কৃত্বা ভবন্নাম চাগ্রণ্যং মম চাত্র স্থিতির্ভবেৎ"॥
—বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যম্—দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(৩) "ইদানীং সিদ্ধ পীঠস্তু লোকে খ্যাতো ভবিষ্যতি"।—
—বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্যম্—দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আরও দুইটী প্রস্তর-ফলকে হালর্ম্মা ও সরাব নামক দুই সহোদরের নাম খোদিত আছে, এবং তাহা হইতেও এই অনুমিত হয় যে, এই দুই ভ্রাতা মন্দিরের এই অংশ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আর একাংশে ১৬৭৭ সালিবাহন (১৭৫৫ খৃষ্টাব্দ) অঙ্কিত, কিন্তু অপরাংশ প্রস্তর-ফলকে অঙ্কিত সাল দেখিয়া মন্দির বা স্থানের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই; যেহেতু ভঙ্গুর জগতে কত ভাঙ্গিতেছে কত গড়িতেছে। বোধ হয় কালক্রমে মন্দিরটী ভগ্নদশা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা সময়ে সময়ে সংস্কৃত হইয়াছে এবং এই সকল প্রস্তর-ফলকে সেই সকল সংস্কারক-গণের নাম ও সময় অঙ্কিত রহিয়াছে। (১)

এই সু-উচ্চ দেবালয়ের উত্তরে ও পশ্চিমে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল ভক্তিমান সাময়িক যাত্রিগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাবক্র-প্রতিষ্ঠিত বক্রেশ্বরের মন্দির ব্যতীত ভগবানের অদ্ভুত লীলাপ্রকাশক কয়েকটী উষ্ণ প্রস্রবণ এই স্থানে বিরাজিত থাকিয়া স্থানের মাহাত্ম্য অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছে। নিত্য প্রবহনশীল তপ্ত উৎসগুলিকে তত্রত্য অধিবাসিগণ "কুণ্ড" বলিয়া থাকে; ইহার মধ্যে জল ফুটিতেছে এবং তদুপরি ধূমশিখা সর্ব্বদা আকাশমার্গে উত্থিত হইতেছে। বীরভূম জেলার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট স্ক্রাইন্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, "পৃথিবীর মধ্যে যতগুলি উষ্ণ উৎস আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের কোনটীই বক্রেশ্বর-প্রস্রবণের সহিত সমকক্ষ হইতে পারে না; এই সকল কুণ্ড সংখ্যায় আটটী এবং তাহাদের জলের উত্তাপ পরস্পর বিভিন্ন। ইহাদের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড নামক প্রস্রবণটী সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ ও তাপমান-যন্ত্রে তাহার উত্তাপ ২০০° ডিগ্রী (ফারনহিট্) প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক কুণ্ডই চতুষ্কোণাকৃতি করিয়া নির্ম্মিত এবং সমতল-ভূমি হইতে দশ ফুট নিম্নে অবস্থিত। সঙ্কীর্ণ সোপানাবলীর সাহায্যে অবরোহণ করিয়া উষ্ণ কুণ্ডের জলস্পর্শ করিতে পারা যায়।" (২) নিম্নে অষ্ট কুণ্ডের নাম প্রদত্ত হইল :—

(১) ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুন তারিখে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বিশ্বকোষপ্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বক্রেশ্বর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং তথায় মন্দির-গাত্রে রক্ষিত অপর একটী প্রস্তর-ফলক হইতে "নরসিংহ" ও এই কয়েকটী মাত্র কথার উদ্ধার করিয়াছেন, অপরাংশ এত অস্পষ্ট যে তাহা পাঠ করা যায় না, এবং তথাকার অক্ষয়বটের মূলদেশে রক্ষিত একটী ভগ্ন হরগৌরীর মূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছেন। সেই মূর্ত্তিটীর উড়িষ্যাদেশীয় প্রাচীন মূর্ত্তির সহিত সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। পার্ব্বতীর কবরী ও অলঙ্কার উড়িষ্যাদেশীয় রমণীগণের ন্যায় এবং তাঁহার মতে বক্রেশ্বরের মন্দিরটীও উৎকলদেশীয় মন্দিরের অনুকরণে গঠিত। এই সকল দেখিয়া তিনি অনুমান করেন যে, রাজনগর-রাজ গাঙ্গেয়বংশসম্ভূতনরপতি অনঙ্গ ভীমের পুত্র নরসিংহদেব গৌড়াধিপ মালিক তুগ্রীল ইতুগাল খাঁকে পরাজয় করিয়া লাকুড় (বর্ত্তমান রাজনগর) অধিকার করিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন; তৎকালে তিনি এই বক্রনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং উপরোক্ত প্রস্তর-ফলকে লিখিত "নরসিংহ" রাজপুরাধিষ্ঠিত নরসিংহদেব ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। তিনিই তৎকালে বক্রেশ্বর মহাপীঠে মূর্ত্তি স্থাপনা করেন। নগেন্দ্র বাবু সংপ্রতি যে ভগ্ন-মূর্ত্তিটী লইয়া গিয়াছেন সেটী নরসিংহদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম।

(১) ...."Southward, the hot springs, to which this mass of buildings owns its renown, send skyward their clouds of sulphurous vapour. They are eight in number of varying temperature; that of the hottest, known as Agnikunda, is not far short of 200° Farht. Each is enclosed in a cistern 10 ft. in depth and of dimension ranging from a square of 9 ft. to a rectangle of 75 by 30". &c.......Skrine on "The Hot Springs of Bakreswar."

(১) ক্ষারকুণ্ড, (২) ভৈরবকুণ্ড, (৩) অগ্নি-কুণ্ড, (৪) সৌভাগ্যকুণ্ড, (৫) জীবকুণ্ড, (৬) ব্রহ্মকুণ্ড, (৭) শ্বেতগঙ্গা, (৮) বৈতরণী। সূর্য্যকুণ্ড নামে আরও একটী উৎস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার নাম পুরাণে লিখিত নাই এবং ঐরূপ না থাকার কোনও কারণ নির্ণয় করিতে পারা যায় না। এই জন্য অনেকেই এই উৎসটীকে আধুনিক বলিয়া বিবেচনা করেন। এই সকল পবিত্র প্রস্রবণের দক্ষিণে সাতঘেটে, চন্দ্রসায়ের ও দামুসায়ের নামক তিনটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। (১) তাহাদের উৎপত্তির বিবরণ অতীতের গভীর গহ্বরে নিহিত হইয়াছে, তবে স্থানীয় পাণ্ডাগণ বলিয়া থাকেন যে, এই সকল জলাশয় প্রতিষ্ঠাতাগণের নামানুসারে অভিহিত।

উপরের লিখিত উষ্ণপ্রস্রবণগুলির পুরাণান্তর্গত উৎপত্তির বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

ভৈরবকুণ্ড—কল্পান্তে মহাপ্রলয়কারী মহাদেব রুদ্রমূর্ত্তিতে ত্রিলোক সংহার করিয়া অশান্তহৃদয়ে সর্ব্বতীর্থে ভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কোন স্থানে শান্তি না পাইয়া অবশেষে বক্রেশ্বর-মহাপীঠে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় স্বহস্তে একটী ক্ষুদ্র-কুণ্ড খনন করতঃ তাহাতে পাপহরার জল-নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই জলে নিমগ্ন হইবামাত্রই তাঁহার সকল জ্বালা নিবারণ হইল। সেই অবধি ইহা "ভৈরবকুণ্ড" নামে অভিহিত হইয়াছে। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে এই কুণ্ডের জলে অবগাহন করিয়া ত্রিলোকপূজিত বক্রেশ্বরকে দর্শন করিলে পুনরায় ভয়াবহ যমালয়ে যাইতে হয় না, এবং নিশ্চিত রাজসূয়-যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। (২)

জীবিতকুণ্ড—পুরাকালে "সর্ব্ব"নামে এক ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণ চারুমতি নাম্নী তদীয় সুশীলা সহধর্ম্মিণীর সহিত একদা তীর্থযাত্রা করেন এবং পথভ্রষ্ট হইয়া এক শ্বাপদসঙ্কুল মহারণ্যে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হয়েন। পতিগতপ্রাণা চারুমতি স্বামী-বিয়োগে অতিমাত্র অধীরা হইয়া পড়িলে এইরূপ দৈবাদিষ্ট হয়েন যে, "তীর্থোত্তম

(১) ...."To the southwest of these are a curious group of three tanks of various sizes, known as the Satkatuli, the Chandra Sayer and Damu sayer. Their origin is lost in the mists of time; but the attendant priests own that they are named after donars by whose expense they were excavated."—Skrine on "The Hot Springs of Bakreswar."

কিন্তু চন্দ্রসায়ের সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রচূড় বা চন্দ্রকেতু নামে এক নরপতি এতদ্দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কুসুমমুলে পরে চন্দ্রপুরে রাজধানী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কুসুমমুল গ্রাম সিউড়ি সদর হইতে উত্তরে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং উহা হেতমপুরের মহারাজ বাহাদুরের জমিদারীভুক্ত; চন্দ্রপুর গ্রাম বক্রেশ্বর তীর্থের তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই চন্দ্রকেতু নরপতির দ্বারা চান্দ্রসায়ের খনিত হয় এবং চন্দ্রপুর গ্রামও তাঁহার নামানুসারে আখ্যাত হইয়াছে।

(২) "চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং সংযতেন্দ্রিয়মানসঃ।
তস্য পানীয়-মুদ্ধৃত্য স্নানং কুর্ব্বন্ বিচক্ষণঃ।
দৃষ্ট্বা বক্রেশ্বরং দেবং তত্র ত্রৈলোক্যপূজিতং॥
যমস্য সদনং নৈতি পুনঃ পাপী ভয়াবহম্।
বাজপেয়ফলঞ্চাপি লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
—বক্রেশ্বর মাহাত্ম্যম্—তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের মন্দিরের পশ্চিমাস্তে যে অমৃতকুণ্ড আছে, শুদ্ধচিত্ত হইয়া তাহাতে মৃত স্বামীর অস্থি নিক্ষেপ করিলে তাহার স্বামী পুনর্জ্জীবিত হইবেন, এবং তৎপরে তাহার বংশ ও সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে।" দৈববাণীর উপর নির্ভর করিয়া চারুমতি ত্বরিত গতিতে বক্রেশ্বর ক্ষেত্রে আসিয়া দেবাদেশ-প্রদর্শিত কুণ্ডে ভক্তি-সহকারে স্বামীর অস্থি নিমজ্জিত করিলেন, তাহাতে সর্ব্ব পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি এই উৎস জীবিতকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই কুণ্ডের নামান্তর সম্বন্ধে পুরাণে আর একটী বিষয় আখ্যাত আছে। মহামুনি অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির তারা নামে এক ভার্য্যা ছিলেন। চন্দ্রদেবের সহিত তারার অবৈধ সম্বন্ধ সঙ্ঘটন হয়। এই কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে বৃহস্পতি সক্রোধে নিশানাথকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করিলেন এবং যুদ্ধকালে ভূতগণ সহ ভূতনাথ ভবানী-পতি বৃহস্পতির সাহায্যার্থ আগমন করিলেন। মহাহবে ক্রোধোন্মত্ত পিনাকীর দারুণ শূলবিদ্ধ নিশানাথ উমাপতির চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। আশুতোষ তাঁহাকে বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রে তপস্যা করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবার আদেশ দেন। শশাঙ্কশেখরের অনুজ্ঞাক্রমে শশাঙ্কদেব এই মহাতীর্থে দশ সহস্র বৎসর কাল কঠোর তপস্যা করিয়া পাপ-মুক্ত হইলে, তথায় একটী কুণ্ড দেখিতে পান এবং অমৃতের দ্বারা পূর্ণ করতঃ শঙ্কর-অর্চ্চনায় লব্ধসিদ্ধ হইয়া ত্রিদেবে গমন করিয়াছিলেন। সেই অবধি "জীবকুণ্ড" "অমৃতকুণ্ড" নামে নামান্তরিত হইয়াছে।

মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীতে এই কুণ্ডে স্নান করতঃ শুদ্ধচিত্তে ভীষ্মদেবের তর্পণ করিলে অপমৃত্যু ও ভ্রূণহত্যাজনিত পাপ ও মৃত-বৎসাদি দোষ এবং অন্যান্য বহুবিধ পাপ বিনষ্ট হয়, ইহা পুরাণে কথিত আছে। (১)

অগ্নিকুণ্ড—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নারায়ণ-বিদ্বেষী হইলে দর্পহারী মধুসূদন নরসিংহ-অবতারে তাহাকে বধ করিলেন, কিন্তু ভগবানের এত অন্তর্দাহ ও মনস্তাপ জন্মিল যে, তিনি উন্মাদের ন্যায় ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিয়াও সেই অশান্তির নিবৃত্তি করিতে পারিলেন না। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যিনি ত্রিতাপহারী, নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন তিনি তাপের প্রতাপে কিরূপে তাপিত হইবেন? ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত ঐ শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপ অনুভব হয় যে, জীবগণ তাহাদের সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম নারায়ণ-চরণে সমর্পণ করিয়া থাকে, এই জন্যই পুঞ্জে পুঞ্জে এই সকল কুকর্ম্ম-জনিত তাপ সৃষ্টির আদিকাল হইতে ভগবচ্চরণে পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল। এক্ষণে হিরণ্য-

(১) "মাঘে মাসি সিতেপক্ষে যাষ্টমী স্যান্মহর্ষয়ঃ।
তস্মিন্ তীর্থে তদুদকমুদ্ধৃত্য ভীষ্ম বর্দ্ধনে।
তর্পয়েৎ পরমভক্ত্যা জলাঞ্জলি ত্রয়েন হি।
বৈয়াঘ্রপদ্য-গোত্রায় সাংকৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় জলং দদ্যাৎ নমোঽস্তু ভীষ্মবর্ম্মনে।
মন্ত্রেণানেন যে বিপ্রাঃ তর্পয়ন্তি সমাহিতাঃ।
শতবর্ষ কৃতং পাপং তৎক্ষণাৎ নশ্যতি ধ্রুবং।
জীবনাখ্যে কুণ্ডবরে কুশাগ্রে রপি সেচনং।
কুর্য্যাৎ সংযতচিত্তাত্মা ন যমালয়মাপ্নুয়েৎ।"
—বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্যম্, তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

কশিপু বধে তাঁহার পর্ব্বতপ্রমাণ তাপ অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় তন্নিবারণার্থ লীলাময় যেরূপ তপস্যাচ্ছলে বারাণসী ক্ষেত্রে মণিকুণ্ডল খসাইয়া "মণিকর্ণিকার" তীর্থ-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ "বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্য" চরাচরে প্রচার করিবার জন্য তাপ-নিবারণচ্ছলে এই কুণ্ডে অবগাহন করিলেন এবং সর্ব্বজ্বালা বিনির্মুক্ত হইয়া মর্ত্ত্যজীবের ত্রিতাপ-হরণ-মানসে এই কুণ্ডে নিজ তেজ অর্পণ করিলেন। বিষ্ণুতেজে কুণ্ড জলিয়া উঠিল। কত যুগযুগান্তর অতীত হইয়াছে, পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু এই কুণ্ডস্থিত জলের জ্বালাময় প্রদাহ এখনও সমভাবে বিদ্যমান। সেই কারণে ইহা অগ্নিকুণ্ড (১) নামে সর্ব্বত্র বিদিত। বৈশাখ মাসে পৌর্ণমাসী তিথিতে এই কুণ্ডে পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃপুরুষগণ বর্ষ বর্ষান্তর তুষ্ট হইয়া থাকেন। (২)

ব্রহ্মকুণ্ড—একদা দেব প্রজাপতি মন্মথ-পীড়িত হইয়া স্বীয় কন্যার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া শঙ্কর রুদ্রমূর্ত্তিতে তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করেন। ব্যথিতহৃদয় ও অনুতপ্ত ব্রহ্মা বক্রেশ্বর-তীর্থে গমনপূর্ব্বক এই এই কুণ্ড খনন করিলেন এবং তাহাতে ঘৃত-সংযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া "ত্র্যম্বক" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিংশতিবৎসর অতিবাহিত হইলে উমানাথ প্রসন্ন হইয়া প্রজাপতিকে সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্মুক্ত করিলেন। ব্রহ্মার নির্ম্মিত বলিয়া এই কুণ্ড "ব্রহ্মকুণ্ড" নামে অভিহিত। ইহাতে স্নান করিলে ব্যভিচার জনিত সমস্ত পাপ খণ্ডন হয়। (৩)

শ্বেতগঙ্গা—সত্যযুগে শ্বেতনামে (৪) এক পুণ্যবান্ নরপতি তদীয় রাজধানী মঙ্গল-কোট (৫) হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী বক্রেশ্বরে আসিয়া প্রত্যহ বক্রনাথের অর্চ্চনা করিতেন। তদ্দর্শনে ভক্তবৎসল অনাদিদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। শ্বেত নরপতি প্রণিপাত করিয়া এই পবিত্র ক্ষেত্রে স্বীয় নাম প্রচারিত হইবার এবং অন্তে ঐ

(১) ইহার অপর একটী নাম জ্বালাকুণ্ড।—

"ততোঽগ্নিকুণ্ডমেতদ্ধি জ্বালাকুণ্ডং ইতি শ্রুতঃ।"

—বক্রেশ্বর মাহাত্ম্যম্ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(২) "বৈশাখ্যাঃ পৌর্ণমাস্যাঞ্চ সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী।
জ্বালাকুণ্ডাৎ সমুদ্ধৃত্য জলং পাত্রে বিসেচয়ন্।
বিমুক্ত সর্ব্বপাপেভ্যোঃ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।
বহ্নিঃ সাক্ষাচ্চ তত্রৈব দহতে পাপসঞ্চয়ম্।
পুষ্পাক্ষতঞ্চ দূর্ব্বাঞ্চ ন দহত্যেব পাবকঃ।"

—বক্রেশ্বর মাহাত্ম্যম্, তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(৩) ব্যভিচারকৃতো দোষো ব্রহ্মকুণ্ডে বিনশ্যতি"।

—বক্রেশ্বর মাহাত্ম্যম্, চতুর্থোধ্যায়ঃ।

(৪) বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত-প্রণেতা শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন "কালের বিধ্বংসী প্রভাবে বক্রেশ্বর কিছুদিনের জন্য জঙ্গলাদিতে পূর্ণ হইয়া অপ্রকট হইলে মঙ্গলকোটের শ্বেতনামক জনৈক রাজা বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্য পুনঃ প্রচার করেন এবং তাঁহার সময় হইতেই এই পবিত্র স্থান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। শ্বেত নামক নরপতি সম্ভবতঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।" কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে শ্বেত-রাজাকে সত্যযুগের লোক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; যথা—"রাজা কৃত যুগে আসীৎ ..."

বক্রেশ্বর মাহাত্ম্যম্, পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

(৫) এক্ষণে মঙ্গলকোট গ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত—বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্যম্, ২৪ পৃঃ টীকা—

শ্রীচরণপ্রান্তে আশ্রয় পাইবার কামনা করিয়া দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন।

বক্রনাথ "তথাস্তু" বলিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন এবং সেই অবধি এই কুণ্ড "শ্বেতগঙ্গা" নামে প্রচারিত হইল। ইহার জল গঙ্গাজলতুল্য পবিত্র, অশেষ পাপ হরণ ইহার মাহাত্ম্য। মহাদেবের অতিপ্রিয় কুণ্ড বলিয়া ইহা তাঁহার মন্দির সন্নিকটে অবস্থিত ও প্রত্যহই এই পুণ্য বারিতে তাঁহার অবগাহন হইয়া থাকে। মাঘ মাসে এই সলিলে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। (১)

ক্ষারকুণ্ড।—পুরাকালে লবণসাগর অগস্ত্য মুনির নিকট ভীত হইয়া এই তীর্থে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সময় এই কুণ্ড ক্ষার-মিশ্রিত হইয়াছিল বলিয়া তদবধি এই উৎসকে ক্ষারকুণ্ড বলিয়া থাকে। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইহার জলে স্নান করিলে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। (২)

সৌভাগ্যকুণ্ড—জীবকুণ্ডের দক্ষিণে সৌভাগ্যকুণ্ড অবস্থিত। শঙ্করের অঙ্গ ও মহামায়া উমাদেবীর স্বেদ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিদূরিত হইয়া লোকের সৌভাগ্যের উদয় হয়। (৩)

বৈতরণী—ব্রহ্মকুণ্ডের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে পুণ্যতোয়া বৈতরণী বিরাজিত। শুদ্ধচিত্তে এই কুণ্ড অতিক্রম করিলে জীব অনায়াসে শমন-শাসন হইতে অব্যাহতি লাভ করে। বক্রেশ্বর নদীর দক্ষিণদিকস্থ স্রোত "পাপহরা" নামে অভিহিত। আদিকালে মেদিনী মহাপ্রলয়ে মগ্ন হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু লোপ পাইয়াছিল। তখন সৃষ্টি প্রকরণের জন্য প্রজাপতি ও রুদ্রদেবের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। ক্রোধে ত্র্যম্বক উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলে অচিরে তদীয় মুখ হইতে এক ভৈরব নিঃসৃত হইলেন এবং পঞ্চানন তাঁহাকে ব্রহ্মার একটী মুণ্ড অবিলম্বে নখাঘাতে ছিন্ন করিতে আদেশ করিলেন। প্রভুর আজ্ঞা তদ্দণ্ডেই পালিত হইল, কিন্তু ব্রহ্মহত্যা করিয়া ভৈরব শান্তিহারা হইলেন; তাঁহার মন সর্ব্বদা পাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। চিত্ত স্থির করিবার জন্য তিনি নানা তীর্থে ও আশ্রমাদিতে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই হৃদয়-জ্বালার উপশম না হওয়ায় অবশেষে শিবদূত বক্রেশ্বরে আসিয়া চন্দ্রমৌলির কঠোর আরাধনা করিলেন। আশুতোষ তুষ্ট হইয়া এই বর প্রদান করিলেন যে, তোমার দুই কর যতদূর প্রসারিত হইয়াছে ততদূর সর্পাকারে প্রবাহিত হইয়া পুণ্যসলিলা পাপহরা নাম্নী নদী তোমার নামের চির ঘোষণা করিবে

(১) "মাঘে মাসি কুহুস্নানং তত্র সর্ব্বাঘনাশনং"।
—বক্রেশ্বর মাহাত্ম্যম্, পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

(২) "তস্মাৎ তৎক্ষারসংযোগাৎ ক্ষারকুণ্ডং প্রতিষ্ঠিতং
তজ্জলং শিরসা ধৃত্বা নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।"
—বক্রেশ্বর মাহাত্ম্যম্, ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

(৩) "সৌভাগ্য কুণ্ডং বিখ্যাতং সর্ব্বপাপ প্রমোচনং"
—বক্রেশ্বর মাহাত্ম্যম্ ষষ্ঠোধ্যায়ঃ।

এবং ইহাতে অবগাহন করিলে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ মোচন হইবে ও অন্যান্য বহুবিধ ফললাভ হইবে। (১)

অতিরিক্ত দৃশ্যাবলী।

প্রবাদ আছে যে প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এই পবিত্র বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রে মানগিরি নামক এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন।

মৌনগিরি গোঁসাঞীর সমাধি

তিনি এই স্থানেই যোগসিদ্ধ হইয়া জীবিতাবস্থাতেই সমাধি গ্রহণকরতঃ ৺কাশীধামে পুনরাবির্ভূত হন এবং তথায় জনৈক বক্রেশ্বরের পাণ্ডাকে দেখিয়া আদেশ করেন যে, তাঁহার বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রের সমাধিস্থলে অচিরেই একটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করিবে। ঐ সমাধি-স্থানের মৃত্তিকা শূল-পীড়িত ব্যক্তিগণ তথায় গিয়া ভক্তি সহকারে ভক্ষণ এবং উদরে লেপন করিলে তাহাদের পীড়া ও বেদনার অচিরে উপশম হইবে। ফলতঃ ঔষধ (মৃত্তিকা) গ্রহণ কালে এক ডোর কৌপীন মানসিক করিয়া ঐ সমাধির উপরে প্রদান করিবে। সচরাচর অনেক রোগীকে ঐরূপে প্রত্যক্ষ ফললাভ করিতে শুনা গিয়াছে। এই সমাধি-মন্দিরটী শ্বেতগঙ্গার উত্তরতট-সংলগ্ন, ঐ তটস্থিত বাঁধা-ঘাটের বামপার্শ্বে অক্ষয়বট-বৃক্ষের নিকট অবস্থিত।

গুহা

বহুকাল পূর্ব্বে দুখুগিরি নামক এক যোগী এই বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া যোগ সাধন করিতেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একদা বক্রেশ্বর নিবাসী জনৈক পাণ্ডার একটী বৃহদাকার বৃষ নিরুদ্দেশ হইলে যোগিবরের আশ্রমে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার অঙ্গীকার করিলে তিনি তিনটী অঙ্গুলি স্ফোটক (তুড়ি) দিবা মাত্রই ঐ গুহা হইতে বৃষটী বাহির হইয়া পড়ে, গুহাটী বক্রেশ্বর-দেবের ও জগদারাধ্যা মহিষমর্দ্দিনী-দেবীর মন্দিরের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় চারিহস্ত, প্রস্থ সার্দ্ধদ্বিহস্ত এবং উর্দ্ধেও প্রায় ইহা সার্দ্ধদ্বিহস্ত।

ভৈরব-বেদী ও শাল্মলী-বৃক্ষ

শ্বেতগঙ্গার অনতিদূরে পশ্চিমোত্তর কোণে একটী অতি প্রাচীন সুবৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষের পাদমূলে নাতি-উচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত গোলাকার বেদীর উপরে ভৈরবের এক প্রতিমূর্ত্তি আছে। উহা স্থানে স্থানে ভগ্ন হওয়ায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত খাকী বাবা (২) তাহা উত্তমরূপে সংস্কার

(১) যাবৎ প্রসাদা বাহুর্দ্ধৌ তপশ্চিন্থ মহামতে।
সর্পাকারে শিবক্ষেত্রে নদী পাপহরাস্তু তে॥
আসীদ্ভোগবতী গঙ্গা সা চ পাপহরা শুভা।
তব ব্রহ্মবধপাপং বিলয়ং যাতুসংশয়ম॥
ব্রহ্মহত্যাদি পাপানি যানি যানি কৃতানি চ
তানি সর্ব্বানি নশ্যন্তু তেন পাপহরা স্মৃতা॥
—বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্যম্, দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(২) ইনি একজন সাধক পুরুষ। ইনি ষষ্টিবর্ষের উর্দ্ধকাল বীরভূমে বাস করিতেছিলেন এক্ষণে কলিকাতায় থাকিলেও অধিকাংশ সময় এ জেলায় ক্ষেপণ করিয়া থাকেন। তাঁহার বয়স নির্ণয় করা যায় না। অতি প্রাচীন লোক মুখেও শুনা যায় যে তাঁহারাও তাঁহাকে বাল্যকাল হইতেও প্রায় ঐরূপ দৈহিক অবস্থায় দেখিয়া আসিতেছেন। তিনি মৃতদেহ ভক্ষণ করেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে "খাঁকী বাবা" বলিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত তিনি যখন প্রথমে এখানে আসিয়াছিলেন তখন তিনি বিবস্ত্র হইয়া থাকিতেন বলিয়া তিনি এ জেলায় নেংটা বাবা নামেও পরিচিত। ইনি যোধপুর রাজবংশোদ্ভব বলিয়া খ্যাত।

করাইয়া দেবীর সম্মুখে একখণ্ড প্রস্তরে নিজের নাম খোদিত করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা-শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব দুর্ব্বিষহ পত্নী-শোকে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উন্মত্তবৎ বিকট তাণ্ডবে চরাচর সন্ত্রাসিত করেন। তখন সহসা প্রলয়কারী রুদ্রতেজ পৃথিবীকে পীড়িত করিয়া শূন্যদেশ সমাচ্ছন্ন করিতে থাকে। তদ্দর্শনে দেবগণ সাতঙ্কে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। নারায়ণ সুদর্শন-চক্রে সতীদেহ একপঞ্চাশৎ অংশে বিভক্ত করতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিক্ষেপ করিলে ঐ বিভিন্ন অংশ যে যে স্থানে পতিত হয়, তাহা এক একটী পীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। বক্রেশ্বরে দেবীর ইন্দ্রিয়-শ্রেষ্ঠ মনঃ (ভ্রূমধ্যস্থ স্থান) পতিত হওয়ায় এই পুণ্যভূমি মহাপীঠ-স্বরূপে চিরপূজিতা। এখানে দেবী মহিষমর্দ্দিনী ও মহাদেব "ভৈরব-বক্রেশ্বর"। (১) এই জন্য এই স্থানটীর নাম বক্রেশ্বর হইয়াছে। এখানে শৃগাল, কুকুর ও গৃধ্রাদির পরস্পর মিত্রভাবে শব-ভক্ষণ দর্শন করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয় এবং ভূতভাবন ভবাণী পতির প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মহারা হইতে হয়। ফলতঃ এরূপ ঐশিক লীলার প্রত্যক্ষদর্শন তীর্থক্ষেত্র অন্য কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় কি না সন্দেহ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষা এবং গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অন্তঃস্থল তরল উষ্ণ ধাতুতে (Soda) পরিপূর্ণ, এজন্য অত্যন্ত উত্তাপময়। ভূগর্ভের বালুকাস্তরে যে জল সঞ্চিত থাকে, তাহা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থান হইতে প্রস্রবণ আকারে বহির্গত হয়। উভয় সিদ্ধান্তই প্রত্যক্ষ পরীক্ষাসিদ্ধ। ধরণীগত সঞ্চিত জলই ভূগর্ভস্থ উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া উষ্ণপ্রস্রবণের উৎপত্তি করিয়া থাকে। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বক্রেশ্বর তীর্থের নিকটবর্ত্তী কুণ্ডগুলির জল সম উষ্ণ নহে কেন? আর একই স্থানে শীতল এবং উষ্ণ জলের প্রস্রবণ কিরূপে সম্ভূত হইল? আর এই সকল কুণ্ডগুলি প্রায় ভূমিভাগের সমতল, কিন্তু ঐ গুলির নিকটে কূপ খনন করিলে তাহা অধিকতর গভীর করিতে হয় কেন? এবং সেই কূপের জল শীতল হইবার কারণ কি?

বৃহত্তর বঙ্গ *

স্বাগত!—বিশ্ববিশ্রুত পাটলিপুত্রের পবিত্র শ্মশানে,—ভারতের অতীত স্মৃতির গৌরব-নিকেতনে আপনার স্বদেশবাসী—অধুনা-উপনিবেশী বাঙ্গালী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত সুহৃৎ-সমিতির প্রতিনিধিরূপে আজ আমি আপনার রাজশ্রীর আবাহন করিতেছি।

আপনি যে রাজকুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন, আপনার সৎকীর্ত্তিশীতরশ্মিকিরণে সেই বংশের গৌরব অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়াছে। আপনি বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ হিতসাধনে সদাই সমুৎসুক। বাঙ্গালার সকল সদনুষ্ঠানে আপনি অগ্রণী,—বহু সৎপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। আপনি নবযুগের নবজাগ্রত বাঙ্গালীর মাতৃযজ্ঞের

(১) বক্রেশ্বরে মনঃ পাতঃ।

* নানাগুণালঙ্কৃত, বিদ্যোৎসাহী, স্বদেশবৎসল, বঙ্গগৌরব, শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পাটলীপুত্রে শুভাগমন উপলক্ষে পঠিত।

অন্যতম ঋত্বিক,—মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক,—স্বদেশবাৎসল্যের প্রতিচ্ছবি। গৌড়-বাসীর নবজীবনের ইতিবৃত্তে আপনার স্বদেশসেবার কাহিনী যে অধ্যায়ে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, আমাদের ভাবী উত্তরপুরুষ গৌরববুদ্ধিসহকারে তাহার অনুশীলন করিবে; উপকৃত হইবে। আপনার সমুজ্জ্বল আদর্শ ধ্রুবতারার ন্যায় তাহাদের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিবে। আপনি সহৃদয়, গুণগ্রাহী, পরোপ-কারী; সমাজের হিতসাধনে, বদান্যতায় অগ্রণী। দেশের ভাষা, সাহিত্য ও শাস্ত্র; কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য; দেশের সমাজনীতি, রাজনীতি; সকল বিষয়েই আপনার অসীম অনুরাগ। আপনার এই অকৃত্রিম অনুরাগ বহুক্ষেত্রে কার্য্যে পরিণত করিয়া আপনি ধন্য হইয়াছেন, দেশবাসীকে ধন্য করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি আপনার মানব-প্রীতি ও ধর্ম্মানুরাগ, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও পূত দেশচর্য্যাব্রত আমাদের আদর্শস্বরূপ।

কিন্তু মহারাজ, কেবল এই সকল কারণেই আমরা আপনাকে আমাদের আতিথ্যস্বীকারের কষ্ট স্বীকার করিতে অনুরোধ করি নাই। কেবল আপ্যায়নমাত্রই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। * * বাঙ্গালার প্রান্তবর্ত্তী এই বঙ্গীয়-উপনিবেশে আপনার শুভাগমনের অন্যবিধ সার্থকতাও বড় অল্প নহে।

বঙ্গবিযুক্ত বিহারের স্কুল-কলেজে এখনও বঙ্গভাষার চর্চ্চা চলিতেছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বিহারের সারস্বত-আয়তনসমূহ হইতে আমাদের মাতৃভাষার নিষ্কাশিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি জেলার আদালত হইতে বঙ্গভাষা নির্ব্বাসিত হইয়াছে। বিহারের কয়েকটি বঙ্গভাষী জেলা বাঙ্গালা হইতে বিযুক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে এ অঞ্চলে বঙ্গভাষার প্রসার-সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। এখন হইতে প্রতীকারের উপায় না করিলে বিবিধকারণসমবায়ে ভবিষ্যতে বিহারে বঙ্গভাষার চর্চ্চা লুপ্ত হইতে পারে। যে ভাষায় প্রথমে 'মা' উচ্চারণ করিয়া ধন্য হইয়াছি, সে ভাষা ভুলিলে প্রবাসী বাঙ্গালী থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা আর বাঙ্গালী থাকিব না। সেই শোচনীয় জাতিগত মৃত্যুর প্রতিষেধকল্পে বিহারের স্থানে স্থানে—

(১) বঙ্গভাষাভাষীদের জন্য স্বতন্ত্র সারস্বত-আয়তনসমূহের প্রতিষ্ঠা,

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার জন্য,—প্রাচীন ও নব্য সাহিত্যের সহিত সংযোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পরিষৎ প্রভৃতির স্থাপন,

(৩) বঙ্গভাষাভাষীদের পরস্পর মিলন, সামাজিক সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতাসাধন প্রভৃতির জন্য মিত্রগোষ্ঠী, আলোচনা, সমিতি ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা,

(৪) এবং এইরূপ বিবিধ পথে উপনিবেশী বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতির সৃষ্টি ও রক্ষা জাতীয় জীবনের পুষ্টি ও বিবর্ত্তের জন্য আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

মহারাজ! 'সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা,' 'নদীমেখলা' বিহগকূজনমুখরা বাঙ্গালার বাহিরেও বাঙ্গালাদেশ বিদ্যমান। Greater Britainএর মত Greater Bengal অতীতের স্বপ্ন নহে, সত্য। আজ বাঙ্গালী অন্ধকূপচারী মণ্ডূকের সহিত উপমিত হইতেছে বটে, কিন্তু অতীত যুগে এই বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষগণ ত্রিকলিঙ্গে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এবং 'নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল—অনিল-বিকম্পিতশ্যামল-অঞ্চল' কলিঙ্গের 'তমাল-তালীবনরাজিনীলা' বেলা হইতে এই

বাঙ্গালীর দিগ্বিজয়ী বংশধরগণ সুদূর যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কাম্বোজ, শ্যাম প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিহারের সারস্বততীর্থ নালন্দার ইতিহাস-প্রথিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী মনীষী জগদ্বাসীকে জ্ঞানরত্ন বিতরণ করিতেন। সুদূর অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইংরেজ-অধিকারের পূর্ব্বেও বাঙ্গালীরা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষকে বাঙ্গালীর প্রভাব ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

মহারাজ! এই 'বৃহত্তর বঙ্গে'র সহিত যোগসূত্র-রক্ষার গুরু-ভার আপনাদের ন্যায় মনস্বী কর্ম্মীদিগকেই বহন করিতে হইবে। যে সকল জ্যোতিষ্কের যশঃপ্রভায় বাঙ্গালা চিরসমুজ্জ্বল, অল্পকালের জন্য তাঁহাদের দর্শন-লাভও আমাদের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর ও সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়, তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে। আপনার শুভাগমনে আমরা অনির্ব্বচনীয় প্রীতি অনুভব করিয়াছি, এবং বঙ্গের বাহিরে যে বৃহত্তর বঙ্গ দেশমাতার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে, তাহার কথাও আপনাকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আমরা প্রবাসী, বিহারের উপনিবেশী বটে, কিন্তু বিহারবাসীর সহিত আমাদের স্বার্থ অভিন্ন বলিলেও, বোধ করি, অত্যুক্তি হইবে না। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব যে জাতির সভ্যতার একমাত্র উদ্দিষ্ট,—"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" যে জাতির ধর্ম্মের উপদেশ, সে জাতি কখনও ভ্রাতৃবিরোধে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। বিহারের ও বিহারবাসীর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সহিত আমাদের ভাগ্য জড়িত হইয়াছে। আমরা—বিহারী ও বাঙ্গালী। সুখ-দুঃখের অংশী হইয়াছি, তাহাও সত্য। তথাপি বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যরক্ষা 'আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অবদানের উত্তরাধিকার আমরা বিস্মৃতির কর্ম্মনাশায় বিসর্জ্জন করিতে পারি না। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের জাতিসমূহ মণিমালার ন্যায় এক সূত্রে গ্রথিত। এই মোহনমালার প্রত্যেক রত্নের বৈশিষ্ট্য কখনও লুপ্ত হইবার নহে। আমরা প্রত্যেক জাতি—আমাদের জাতীয়তার রত্নটিকে শত সাধনায় আরও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিব,—মালা ছিন্ন করিব না,—সে গ্রন্থন যে অচ্ছেদ্য,—তাহাকে আরও দীপ্তিমান, সমৃদ্ধ, শুচি করিয়া দেশমাতার চরণে উপহার দিব। অতএব, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য-রক্ষার চেষ্টা বিরোধের হেতু না হইয়া মিলনের সেতুতে পরিণত হউক। মহারাজ! জাতীয় জীবনবন্ধনে আপনার নৈপুণ্য সর্ব্বজনবিদিত—আমরা এই উদ্দেশ্যসাধনে আপনার পরামর্শ ও উপদেশ ভিক্ষা করিতেছি।

ভাবের আদান-প্রদান, মানস-জগতে সুখ-দুঃখের বিনিময়ই জাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করে। বিহারপ্রদেশেও সেই একীকরণের সূত্রপাত হইয়াছে। হিন্দী ভাষায় বাঙ্গালা-সাহিত্যের সমৃদ্ধি প্রতিবিম্বিত হইতেছে। অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ আধুনিক বাঙ্গালী গ্রন্থকারের গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

হিন্দী ভাষায় বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বৃহত্তর বাঙ্গালার এই অংশের অধিবাসীরাও হিন্দী ভাষার ও সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতেছেন। আশা করা যায়, বঙ্গসাহিত্যেও প্রাচীন হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি অচিরে উপযুক্ত আসন লাভ করিবে।

এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ করিবার জন্য, হিন্দীভাষী বিহারী ও বঙ্গভাষী বাঙ্গালীর হৃদয়ের যোগ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে উভয়ের ভাষার অনুশীলনের ব্যবস্থা উভয় সম্প্রদায়ের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। আমরা যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করি, হিন্দী সেই গবর্ণমেণ্টের অনুগৃহীত ভাষা। অতএব তাহার স্বাভাবিক পুষ্টির পথ প্রশস্ত। কিন্তু বিহারে বাঙ্গালাভাষা সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। সুতরাং বাঙ্গালা-ভাষার ও সাহিত্যের চর্চ্চাকল্পে আমাদের পুরুষকার-প্রয়োগ অপরিহার্য্য বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তিদোষে দুষ্ট হইব না। যাহাতে হিন্দীভাষাভাষীদের মধ্যে বাঙ্গালাভাষার ও সাহিত্যের প্রচার হয়, তাহা এই হিসাবে আমাদের কর্ত্তব্যের অন্যতম।

মহারাজ! আবার বলি,—আপনি আমাদের মাতৃভাষার ও স্বদেশী সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য পৃষ্ঠপোষক। এই বঙ্গদেশে আপনার পূর্ব্বেও ধনকুবেরগণ বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু কালধর্ম্মে আপনার অনুগ্রহে যে অনুরাগের রসায়ন মিশ্রিত হইয়াছে, তাহাকে 'সোনায় সোহাগা' বলিলেও তৃপ্তি হয় না। আপনি শুধু সিংহাসনবিহারী অনুগ্রাহক নহেন,—কর্ম্মক্ষেত্রে ঘর্ম্মাক্তকলেবর কর্ম্মীদের কর্ম্মসঙ্গী। ভারতে যে বিশাল বিরাট মানবতার উন্মেষ হইতেছে,—আপনি সেই ভাবের ভাবুক, এবং সেই জনতন্ত্রতার মহাভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াই আপন ঐশ্বর্য্যের উচ্চচূড় হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী হইয়াছেন। আপনাদের প্রসাদে দেশবাসী বুঝুন,—সমুদ্রের তরঙ্গশীর্ষে যে ফেনকিরীট শোভা পায়, তাহা উদ্দাম, অবিরাম, চঞ্চল, তরঙ্গসঙ্কুল সলিলসঙ্ঘেরই অন্যতম অংশ।

উপনিবেশী বাঙ্গালী-সমাজের পক্ষ হইতে আমরা ভগবানের নিকট আপনার দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য, শান্তি ও স্বস্তি কামনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীমথুরানাথ সিংহ বি, এল্।

ব্রাহ্মণ-সমাজ

[কয়েকমাস পূর্ব্বে মুন্সীগঞ্জ ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের অসত্য বিবরণ 'গৃহস্থে' পত্রান্তর হইতে প্রকাশিত হয়। তজ্জন্য আমাদের অসাবধানতাই প্রধানতঃ দায়ী। এবারকার 'ব্রাহ্মণ-সমাজ'পত্রে দেখিলাম পূজনীয় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তজ্জন্য দুঃখিত হইয়াছেন। আমরা নিবেদন করিতে চাহি যে ব্রাহ্মণ-সভা ইত্যাদি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির সাধারণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ ঐকমত্য আছে। সম্পাদকীয় ত্রুটিবশতঃ যে দোষ ঘটিয়াছে তাহার জন্য আমরা নিতান্তই দুঃখিত। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে যে একটি নূতন অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।]

বিপদ্ ঘনীভূত। আচার ব্যবহার আহার বিহার সর্ব্বত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্ম্মে অবহেলা;—ইহাই সমাজের প্রকৃত বিপদ্।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উপদিষ্ট সনাতন ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মের আদিভূত, অধিকার অনুসারে সনাতনধর্ম্মের এক একটী অংশ মহাপুরুষগণের প্রভাবে একস্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-প্রভাবেই মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের প্রভাব

মন্দীভূত, কল্যাণস্থলে অকল্যাণ—শান্তিস্থলে বিপ্লব এবং সন্তোষস্থলে অসন্তোষ ন্যূনাধিক ভাবে আবির্ভূত হইতেছে।

আদর্শের অধঃপতন, সর্ব্বধর্ম্মের আদিভূত সনাতনধর্ম্মের অবসাদই—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে এই অকল্যাণের হেতু।

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যভ্রংশই সনাতনধর্ম্মের অবসাদ।

এখন অনেকেই জাতীয় অভ্যুদয়ের জন্য সচেষ্ট, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু হইলেও তাঁহাদের ইউরোপীয় শিক্ষানুগত চেষ্টা প্রকৃত অভ্যুদয়ের হেতু নহে।

কলকারখানা শিখিয়া বাণিজ্যনিপুণতালাভ করিয়া অন্নসংস্থানের উপায় করা যাইতে পারে, সামাজিক ব্যক্তিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে, সমাজে ধনের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিলাসের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত করা যাইতে পারে বটে;—কিন্তু তাহা প্রকৃত অভ্যুদয় নহে, তাহা ক্ষুদ্র কাম মাত্র।

ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।

অন্ন সংস্থানে ব্যক্তির মৃত্যু নিবারিত হয় বটে, জাতীয় মৃত্যু নিবারিত হয় না, এই হিন্দুজাতির কত ব্যক্তি ধন মানের লোভে বা প্রাণের ভয়ে জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, ব্রাহ্মণবংশধর পিতৃ-ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া ম্লেচ্ছ হইয়াছে,—ব্যক্তি জীবিত আছে—কিন্তু তাহার জাতি মরিয়াছে। যদি সকলেই এইরূপ স্বধর্ম্মত্যাগী হয়, তখন সেই ব্যক্তিসমূহ জীবিত থাকিলেও জাতীয় জীবনের অবসান হইবে।

ধর্ম্মরক্ষা হইলে জাতির মৃত্যু হয় না। অন্নাভাবে বা পীড়ায় শত শত ব্যক্তি বিধ্বস্ত হইলেও অবশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় জীবন প্রবাহিত থাকে।

যে জাতির ধর্ম্মবল যত অধিক—সে জাতির জীবনী শক্তি তত অধিক। জীবনীশক্তির প্রবলতা থাকিলে—অন্যজাতির সংঘর্ষে কোন ক্ষতিই হয় না, এমন কি অন্যজাতি বাহুবলে বা ধনবলে বলীয়ান হইলেও—জীবন বল-সম্পন্ন জাতির সংস্পর্শে নিষ্প্রভ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে।

ধর্ম্ম কেবল—কতকগুলি আঙ্গিক অভিনয় নহে, ধর্ম্ম বাক্য মন এবং শরীরের আয়ত্ত। ব্রাহ্মণের এই ধর্ম্ম—শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে সম্যক উপদিষ্ট হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ বংশধরগণ যাঁহারা জগতের ধর্ম্মগুরু—সেই ভূদেবগণের সন্তানগণ তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষের সাধনলব্ধ শাস্ত্রে বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রায়শঃ ধর্ম্মভ্রষ্ট। সেই জন্যই বিপদ্ ঘনীভূত।

অনেক ব্রাহ্মণসন্তান আছেন যাঁহারা এই বিপদ্ বুঝিয়াছেন এবং ইহার প্রতিকারের উপায় অন্বেষণ করিতেছেন; কিন্তু সেই সকল সদুপায়ান্বেষী ব্রাহ্মণসন্তানগণ পরস্পর অপরিচিত। বিপদের সময়ে সমভাবে ভাবুক বিপন্ন ব্যক্তিগণের পরস্পর পরিচয়ে শক্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে, মন্ত্রণায় উৎকর্ষ হইয়া থাকে, বিপদের বিভীষিকা মন্দীভূত হয়। সমভাবে ভাবুক ব্রাহ্মণ-সন্তানগণের পরস্পর পরিচয়—ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষাই চরম ও প্রধান উদ্দেশ্য। বিবাহ বিশুদ্ধি ধর্ম্মরক্ষার প্রধান উপায়, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা সামাজিক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার ফলস্বরূপ, বিক্রমপুরে ব্রাহ্মণ-মহা-সম্মিলনীতে রাঢ়ীয় সমাজের কৌলিন্য প্রথার সংস্কার প্রস্তাব এবং বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ বিভিন্ন পঠীস্থিত কুলীনগণের স্বপঠী ও স্বমর্য্যাদা রক্ষা পূর্ব্বক সমীকরণ প্রস্তাব উপস্থাপিত

করিয়াছিলেন, ধর্মশাস্ত্রানুশাসনের অনুকূলে তদ্বিষয়ের সুমীমাংসা ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর অপর উদ্দেশ্য।

(১) অভক্ষ্য ভক্ষণাদি দ্বারা পতিত ব্রাহ্মণ ও অপর বর্ণের হিন্দু সমাজে কিরূপ স্থান, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ও মীমাংসা। (২) ব্রাহ্মণের অবশ্য পালনীয় আচার ও সেই আচার রক্ষার্থ উপায় নির্দ্ধারণ (৩) ব্রাহ্মণেতর কতিপয় জাতির সদাচার রক্ষা (৪) এবং কৃত প্রায়শ্চিত্ত পতিতগণ সমাজে ব্যবহার্য্য কি অব্যবহার্য্য এ বিষয়ে আলোচনা ও মীমাংসা (৫) পতিত ব্রাহ্মণাদির পুত্র কন্যাগণ সমাজে গৃহীত হইতে পারেন কি না এ বিষয়ে আলোচনা ও মীমাংসা, (৬) পুরুষ পরম্পরাক্রমে দ্বিজেতর জাতিরূপে পরিগণিত বিভিন্ন জাতির উপনয়নে (প্রায়শ্চিত্ত করিয়াই হউক অথবা না করিয়াই হউক) অধিকার আছে কি না, এবিষয়ে আলোচনা ও মীমাংসা। এই মহা-সম্মিলনীর কয়েকটী উদ্দেশ্য। সমস্ত ব্রাহ্মণ-জাতি কিরূপ শাস্ত্রানুসারে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, সকল জাতির মঙ্গল কর্ত্তা হইতে পারেন, পৃথিবীর কল্যাণ সাধনে সক্ষম মহাপুরুষ উৎপাদনে সমর্থ হইতে পারেন—তাহার উপায় নির্দ্ধারণ—ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনীর প্রধানতম কর্ত্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধি ও কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য আপাততঃ সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী একটী ব্যবস্থাপকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থাপকমণ্ডলী বিচার পূর্ব্বক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, নিরপেক্ষ মধ্যস্থ পণ্ডিত দ্বারা তাহা সুমীমাংসিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। সমস্ত বঙ্গদেশে এক্ষণেও বহু লক্ষ ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান, এই ব্রাহ্মণগণ সম্মিলিত হইয়া সৎকার্য্যনিরত হইলে সমস্ত পৃথিবীতে নূতন অভ্যুদয়ের—নূতন মঙ্গলের—সঞ্চার হইবে। ব্রাহ্মণ সন্তানগণ জড়তা, অবসাদ, উদাসীনতা পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধন জন্য উদ্বুদ্ধ হউন। জ্ঞান অর্জ্জনে—জ্ঞানালোক বিতরণে—ধর্ম্ম অর্জ্জনে—ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদানে সকলের অসীম উপকার করিতে যত্নবান্ হউন, সেই যত্ন কি যদি জানিতে চাহেন, ত আসুন; এই ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনে উপস্থিত হউন। আমরা একীভূত হইয়া আমাদিগের চিন্তিত উপায় আলোচনা করি, তাহা হইলে সেই যত্নের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। আমাদের রাজা ধর্ম্মের প্রতিকূল নহেন, আমাদের রাজা জ্ঞানের প্রতিকূল নহেন, প্রত্যুত ধর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুকূল, এ সময়ে অব্যাহত ভাবে আমরা বৈধযত্ন করিলে যে সফলতালাভ করিব, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনাদের মধ্যে অনেকেই অনেক বিফল যত্ন করিয়াছেন, অনেকে অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। আর একবার অন্ততঃ পরীক্ষার জন্য যত্ন করিয়া দেখিতে আপনাদিগকে আমরা অনুরোধ করি।

ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর কর্ম্ম শেষ হইলেও ব্যবস্থাপক মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ব্যবস্থাপকমণ্ডলী সমেত ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর অনুষ্ঠান বর্ত্তমানবর্ষে আগামী ২৬শে ফাল্গুন হইতে ৫ দিন হইবে। স্থান ৺কালীঘাট, অধিষ্ঠানের মঙ্গলাচরণ পূজাদি মায়ের মন্দিরেই হইবে। ২৬শে ২৭শে দুইদিন ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর বিচার সভা হইবে। ২৮শে হইতে তিন দিন ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর মহাধিষ্ঠান। শাস্ত্রানুগত ভাবে বিবাহপদ্ধতির সংশোধন, পণ প্রথার সংক্ষেপ কুলপরিচয়রক্ষার সুব্যবস্থা

হিন্দু সন্তানের ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা, সমগ্র ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ সংস্থাপন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত রক্ষার ব্যবস্থা এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইবে।

পাঁচদিন সভাধিবেশনের মধ্যে শেষ তিন দিনে সকল ব্রাহ্মণের সভায় উপস্থিতি প্রার্থনীয়। যিনি এই সভায় উপস্থিত হইবেন, তিনি ৩০শে মাঘের মধ্যে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভায় তাঁহার আগমন বার্ত্তা ও কলিকাতায় তাঁহার অবস্থিতির স্থান আছে কি না, এই সকল বিষয় ৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা, এই ঠিকানায় জানাইয়া বাধিত করিবেন। তাহার পর আমাদিগের নিমন্ত্রণ পত্র ও নিয়মাবলী প্রেরিত হইবে।

এই অনুষ্ঠানপত্র যাঁহার হস্তগত হইবে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার বন্ধুবর্গকে দেখাইয়া মহাসম্মিলনীর সহায়তা করিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার সহকারী সভাপতি—

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন,

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা,

(মহারাজা সুসঙ্গ)

শ্রীদিগম্বর চট্টোপাধ্যায়,

(হাইকোর্টের বিচারপতি)

শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি,

শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়,

(রাজা উত্তরপাড়া)

শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,

(হাইকোর্টের বিচারপতি)

কর্ম্মাধ্যক্ষ

শ্রীচন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার।

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

মফঃস্বলের বাণী

ইউক্যালিপ্‌টাস্ বৃক্ষ

"হাকিম" নামক মাসিকপত্র বলেন,—"এ দেশে ম্যালেরিয়ার কারণ যাহাই হউক না কেন, ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদসাধন ব্যতীত যে বাঙ্গালীর বাঁচিবার উপায় নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং যাহাতে ম্যালেরিয়া প্রশমিত হয়, তাহাই করা আমাদের কর্ত্তব্য। সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়ান প্ল্যাণ্টার্স গেজেট' পত্রে নীলগিরিতে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছের পত্তন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গাছ অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হয়; এবং ইহারই কল্যাণে নীলগিরিতে জ্বালানীর যত সুবিধা আর কোন পার্ব্বত্য সহরে তত সুবিধা নাই। আবার ইহাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রশমিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মের বন-বিভাগ এই গাছের চাষের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ফল জানা যায় নাই। ব্রহ্মে জ্বালানীর অভাব নাই বটে, কিন্তু তথায় এক ম্যালেরিয়ায় যত লোক মরে—কলেরা, বসন্ত, প্লেগ সব রোগে তত লোক মরে না। সুতরাং এই গাছে যদি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রশমিত হয়, তবে ইহার চাষ করা ভাল। বাঙ্গালায় ইউ-ক্যালিপ্‌টাস্ গাছ বেশ বাড়ে—দেখা গিয়াছে। বাঙ্গালায় জ্বালানীকাষ্ঠের যেমন অভাব, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ তেমনই প্রবল। এ অবস্থায় বাঙ্গালার গৃহস্থেরা যদি গৃহসংলগ্ন জমীতে এই গাছ লাগান, তবে ভাল হয়।

মিউনিসিপ্যালিটী ও জেলাবোর্ড রাস্তার ধারে এই গাছ লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহার তৈল সার্দ্দি-কাশীর ঔষধ—ইহার ফুলের গন্ধও ভাল। আমাদের দেশে পূর্ব্বে লোকে নিম্বতরু রোপণ করিত; লোকের বিশ্বাস ছিল—নিম্বতরু দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ করে। কিন্তু প্রাচীন বিশ্বাস, সকারণ কি অকারণ, বিচার না করিয়াই আমরা সে সব কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকি। তাই এখন রাস্তার ধারে রেনট্রি, গোল্ডমোহর ট্রি প্রভৃতির বাহার খুলিতে দেখা যায়। যে সব গাছে লোকের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, সে সব গাছের আদর না করিয়া আমরা পাতাবাহারের ও রঙ্গিলা ফুলের গাছেরই আদর করি—রজত ফেলিয়া রাঙ্গের পশরা মাথায় তুলিয়া লই। প্রাচীন সংস্কার সবই কুসংস্কার—ইহাও যে একটা কুসংস্কার। আমরা জানি, বাঙ্গালার মাটীতে এই গাছ বেশ বাড়িয়া থাকে। এ অবস্থায় ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বাঙ্গালায় যাহাতে এই গাছের চাষ হয়, তাহার চেষ্টা করা বাঙ্গালীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে সরকারের মুখ চাহিয়া থাকিতেও হয় না।"

ইউক্যালিপ্‌টাস্ বৃক্ষের শাস্ত্রীয় নাম ইউক্যালিপ্‌টস গ্লোবিউলস। অষ্ট্রেলিয়া ও ট্যাস্‌মেনিয়ার অরণ্যে জাত মার্টেনী জাতীয় বৃক্ষ। যে জলে ব্যাক্‌টিরিয়া প্রভৃতি জীবাণু থাকে, ইউক্যালিপ্‌টাস্ সংস্পর্শে তাহা বিশোধিত হয়। এমন কি, কোন জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী ইউক্যালিপ্‌টাস্ বৃক্ষের পত্র সেই জলাশয়ে পতিত হইলে, তাহার জল দূষিত হওয়া দূরের কথা, সেই জল পান ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধক। নিম্নতল, আর্দ্র, ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে এই বৃক্ষ রোপিত হইলে সেই স্থান স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। যে স্থানে এই বৃক্ষ থাকে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হয় না। ইউ-ক্যালিপ্‌টাসের পত্র চর্ব্বণ করিলে দন্তের রোগ-জনিত রক্তস্রাব বন্ধ ও দন্ত দৃঢ় হয়। ইহার পত্রের ধূম পান করিলে হৃদরোগজনিত শ্বাসের উপশম হইয়া থাকে।

কাঁসাই নদীতে 'এনিকট' নির্ম্মাণ করায় নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে মেদিনীপুরের মত স্বাস্থ্যকর নগর ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস,—যদি মেদিনীপুরের বড় বড় রাস্তাগুলির ধারে ও আবদ্ধ কাঁসাই নদীর তীরে ইউক্যালিপ্‌টাস্ বৃক্ষ রোপিত হয়, তবে মেদিনীপুরে আর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ থাকে না। যদি ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড মফঃস্বলের বড় বড় সড়ক রাস্তাগুলির উভয় পার্শ্বে ইউক্যালিপ্‌টাস্ বৃক্ষ রোপণ করিবার ব্যবস্থা করেন তবে মফঃস্বলের স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে। যখন সরপাই নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলিত, তখন কাঁথিতে ম্যালেরিয়ার নামগন্ধ ছিল না। সরপাই নদী কেনেলে পরিণত করতঃ তাহা লক দ্বারা আবদ্ধ করার পর হইতে কাঁথিতে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। যদি পূর্ত্ত-বিভাগ কেনেলগুলির উভয়পার্শ্বে ইউক্যালিপ্‌টাস্ বৃক্ষ রোপণ করেন, তবে এ অঞ্চল আবার স্বাস্থ্যকর স্থান হইতে পারে। আমরা এই অত্যাবশ্যক বিষয়ের দিকে মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটির, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ও পূর্ত্তবিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আজকাল ইউক্যালিপ্‌টাস্ বৃক্ষের চারা কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের নর্শারিতে ও চারা-ওয়ালাগণের নিকট পাওয়া যায়। এক একটী চারার মূল্য চারি আনার অধিক নহে। মধ্য-বিত্ত গৃহস্থগণ পর্য্যন্ত এ চারা ক্রয় করিয়া

আপনাদের বাটীর সংলগ্ন ভূমিতে লাগাইতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের বাটীও স্বাস্থ্য-জনক হইবে, জালানীকাষ্ঠেরও অভাব দূর হইবে।

নীহার।

পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক

বঙ্গপল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। একমাত্র ভদ্রতা রক্ষা করিতে গিয়া ইহারা প্রতিপদেই বিপন্ন। শুধু বিপন্ন কেন সম্পূর্ণ পরাধীন। "বাহিরে কোঁচার পত্তন ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন" বলিয়া যে প্রবাদটী চলিয়া আসিতেছে, তাহা পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের উপরই বেশ খাটে। বাটীতে চাকর না থাকিলে ভদ্রতার হানি হয়। ভিতর বাটীতেও চাকরাণীর প্রয়োজন। কিন্তু আজকাল পল্লীর যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে চাকর-চাকরাণী মেলাই কঠিন। পূর্ব্বে অনেক দরিদ্র মুসলমান হিন্দুদিগের বাটীতে চাকুরী করিত। এক্ষণে সমাজের শাসনে মুসলমানগণ হিন্দুর ভাত পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের দ্বারা কার্য্য করাইতে হইলে আপখোরাকী বন্দোবস্ত করিতে হয়। খোরাকী দিয়া যাহাকে পাঁচ টাকায় পাওয়া যাইত, এক্ষণে এই বন্দোবস্তে বার টাকাতে মেলা কঠিন। পল্লীর ভদ্র-লোকদিগের পক্ষে একজনের ঘরে খাইতে দেওয়া সহজ, কারণ সকলেরই খেত-খামার আছে, আর একজন লোক দশের সঙ্গে খাইলে খরচই বা কি লাগে? কিন্তু মাসে মাসে রজত মুদ্রা বাহির করাই কঠিন। তাহা ভিন্ন চাকরদের তিন বেলা বাটীতে যাতা-য়াতেই দিন ফুরাইয়া যায়। ইহা ভিন্ন যাহারা বাটীর উপর রান্না করিয়া খায়, তাহাদের লইয়া ত আরও বিপদ। আজকাল আমাদের পাবনা জিলার অনেক স্থানে মুসলমানগণ হিন্দুর বাটীতে কাজও পরিত্যাগ করিয়াছে এই ত্তাহইল মুসলমানদিগের কথা। আবার হিন্দু চাকরের অভাব আরও বেশী। হিন্দু-দিগের প্রত্যেক জাতির মধ্যে সমাজ-সংস্কারের এক প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত জাতি বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির অন্ন গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিত না, এক্ষণে সমাজের শাসনে তাহা করিতে পারিতেছে না। আবার অনেক জাতি উপরোক্ত জাতির বাটীতে চাকুরীও বন্ধ করিয়াছে। পূর্ব্বে চাকর-মনিবে যে একটা সম্পর্ক ছিল, তাহা এক্ষণে নাই। পূর্ব্বের চাকরেরা মনিবের সমস্ত কাজ নিজের ভাবিয়াই করিত, এক্ষণে এটা পারিব না, ওটা পারিব না প্রায়ই শুনিয়া থাকি। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, আপনার বাটীতে একজন মুসলমান ভৃত্য আছে। আপনাকে কোনও কার্য্যব্যপদেশে অন্যত্র যাইতে হইবে; তাই নিজ ভৃত্যটাকে বলিলেন "ওহে আমার 'ট্রাঙ্কটা' ষ্টিমার ঘাটে লইয়া চলত?" ভৃত্যটী অমনি উত্তর করিবে "মহাশয়, ওটী মুটের কাজ আমার দ্বারা হইবে না।" পূর্ব্বে দেখিয়াছি বাটীর চাকর-গণ সমস্ত দিন কাজ করিয়া বাটীতেই শুইয়া থাকিত। এক্ষণে থাকিতে বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে একটী দাবী করিয়া বসে। বলে 'মহাশয় রাত্রীতে পাহারা দিতে স্বতন্ত্র বেতনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।" আজ-কালকার দিনে চাকর ভদ্রলোকের ভদ্রতার অঙ্গ হইয়া তাহারা ঠাকুরের ন্যায়ই হইয়া উঠিয়াছে।

পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক মাত্রেরই জমি আছে। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কাহারও নিজ হস্তে চাষ-আবাদ করিবার উপায় নাই। স্বদেশী আন্দোলনের হুজুকে দু'চার দিন অনেকেই লাঙ্গলের গুটী ধরিয়াছিল বটে, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। পল্লীর ভদ্রলোকদিগের জমি আছে, কিন্তু ক্ষুধায় পেট জলিয়া যায়। ক্ষেত্র অজন্মা না হইলেও কতকগুলি কারণেই অজন্মা করিয়া তুলিয়াছে। আজকাল চাকরের যেরূপ দর তাহাতে চাকরের দ্বারা আবাদে লাভ হওয়া অসম্ভব। আবার চাকর-

দিগের উপর নির্ভর করিয়াও কোন ফল নাই। চাকরের সঙ্গে নিজে খাটিতে না পারিলে এখনকার দিনে কাজ পাওয়া কঠিন। পল্লীর মধ্যবিত্ত সঠিক ভদ্রলোকর পক্ষে এ ক্ষেত্রে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই ঠেকিয়া অনেকেই বর্গা দিয়া জমি আবাদ করাইয়া থাকেন। আমাদের দেশে কৃষকেরাই বর্গা জমি গ্রহণ করে। আজকালকার দিনে পাটের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রত্যেক কৃষকের কিছু না কিছু জমি হইয়াছে। তাই বর্গাদার নিজের জমিগুলি যেরূপ ভাবে চাষ আবাদ করে, বর্গাজমি সেরূপ ভাবে কিছুই করে না। আবার শস্যাদিও ঠিকভাবে জোতদারকে দেয় না। তাই পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক জোতজমি রাখিয়াও তাহার ফল লাভে অসমর্থ। এ ক্ষেত্রে পেটে ক্ষিদে মুখে লজ্জা লইয়াই পল্লীর ভদ্রসমাজ পস্তাইতেছে।

পল্লীতে ধাত্রী নাই। প্রত্যেক পল্লীতে 'দাই'এরও অভাব। এ 'দাই' কথাটী বোধ হয় ধাত্রী হইতেই হইয়াছে। ৫।৭ খানা গ্রামে একজন দাই আছে। তাহারা সামান্য প্রসব-প্রক্রিয়া জানে বটে, কিন্তু তাহারা নাড়ী-ছেদ ভিন্ন অন্য কার্য্য করিতে বড় একটা আসে না। এই সামান্য কার্য্যটুকু করিয়াই তাহারা একজন ডাক্তারের ভিজিট অপেক্ষাও বেশী চার্জ্জ করিয়া থাকে। 'নাড়ীকাটা' কাজটী অতি সামান্য। প্রসব-কার্য্যই কঠিন। এই প্রসব-সময়ে সকল গ্রামের লোকেরা ইহাদের পাইয়া উঠে না। প্রত্যেক গ্রামেই কতগুলি স্ত্রীলোক ছিল, তাহারাই প্রসব-কার্য্য সম্পাদন করিত। এক্ষণে সমাজের আঁটুনিতে সেটী আর হইবার উপায় নাই। প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেক জাতিই এ কার্য্যটী হীন ভাবিয়া থাকে। এ কার্য্যটী যাহারা করিয়া দু'পয়সা উপায় করিত তাহাদের পথও নষ্ট হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের 'ভদ্রতা' সংশয় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা সূতিকাগারকে নরককুণ্ড ভাবি। ছেলেও ফেলি না, স্ত্রীকেও ত্যাগ করি না। কারণটীকেই ঘৃণা করি। ধন্য আমরা! আমাদের আতু-ঘর নরককুণ্ড বিশেষ! আমাদের সে ঘরটী ছুঁইলেও স্নান করিতে হয়। এত সাধের পুত্র, এত ভালবাসার স্ত্রী তাহা-দিগকে ঐ ঘরে রাখিয়া আমরা মহাসুখে ঘরে থাকি। পূর্ব্বে অনেক লোক তাহাদের প্রহরার জন্য পাওয়া যাইত। এক্ষণে কি মুসলমান, কি হিন্দু কেহই এ কার্য্য স্বীকার করে না। এটী অন্য জাতির উপর (তাহা গড়াইতে পারে নাই) কারণ সকল জাতির মধ্যেই সিদ্ধান্ত আছে, স্বজাতির কাজে দোষ নাই, তাই যাহারা উচ্চ তাহাদেরই দুর্দ্দশার সীমা পাওয়া দায় হইয়াছে। উচ্চ গরীব মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক যাহাদের পদে পদে ভদ্রতার হানি হয়, তাহাদের উপরই এটির প্রভাব বেশী দেখা যাইতেছে।

যে দিক দেখি না কেন, পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের অবস্থাই দিন দিন খারাপ হইয়া পড়িতেছে। আয়টা দিন দিনই কম হইতেছে বটে, কিন্তু ব্যয় হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আজকালকার দিনে সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিতে খরচ অত্যন্ত বাড়িয়া পড়িয়াছে। ঝি-চাকরের দর অত্যন্ত বেশী, পাট মুজুরের মুজুরী বেশী, জমি অজন্মা হইতেছে। তাই পেটে ক্ষুধা মুখে লজ্জা লইয়া ভদ্রসমাজ হা হুতাশ করিতেছে। তারপর স্বর্গীয় কর্ত্তাদের ক্রিয়া-কলাপ রক্ষা না করিলে লোকের নিকট মুখ থাকে না। পিতৃদায় মাতৃদায় ত আছেই, তাহার উপর কন্যাদায় সকল দায়ের উপরে উঠিয়াছে। ঐ দায়ে পড়িয়া অনেক ভদ্রসন্তানের ভিটা-মাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে।

আজকাল ব্যবসায়ীমাত্রেই জোটবদ্ধ হইয়া দর বৃদ্ধি করিতেছে। নাপিতের বেতন বা চাকরাণ পূর্ব্বে যাহা ছিল, এক্ষণে তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট নয়। নগদ পয়সায় কাজ করিতেই ইচ্ছুক। পূর্ব্বে তাহারা যেরূপভাবে ক্ষৌরকার্য্যের পয়সা লইত, এক্ষণে তাহার চারিগুণ আদায় করিয়া থাকে। ধোপা আর বেতন লইয়া কাজ করিতে রাজী নহে। তাহার সহিত 'কুড়ি চুক্তি' দর করিতে হইবে। বেতন দিয়া খাটাইলে মাসে

একবার দেখা দিবে কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে। সূত্রধর দর বৃদ্ধি করিয়াছে। খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। এ সময়ে সমাজ যদি মধ্যবিত্ত-দিগের প্রতি না তাকায় তাহা হইলে সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে।

স্বরাজ

গো-রক্ষা

ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে আমরণ দৈনিক পুষ্টিসাধনে দুগ্ধ আমাদের প্রধান সহায়। কিন্তু দিন দিন দুগ্ধের দুর্ম্মূল্যতা, যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে কিছু দিন পরে, ধন কুবের ভিন্ন অপরের পক্ষে দুগ্ধ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে, এইরূপই আশঙ্কা হয়। শরীররক্ষণ আশায়, কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে যাহা দুগ্ধ বলিয়া ক্রয় করা যায়, তাহাকে "দুগ্ধ" বলিতে লজ্জা বোধ হয়; জল মিশ্রিত হওয়ায় তাহা এতই বিস্বাদ। খাঁটি দুগ্ধের অভাব শিশুগণের অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ। শিশুর অকাল মৃত্যু নিবারণের জন্য, এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীর যাহাতে কৃশ ও নিস্তেজ হইয়া না পড়ে, তাহার জন্য দুগ্ধ ও ঘৃতের একান্ত প্রয়োজন, এবং দুগ্ধ ও ঘৃতের জন্য গাভীর প্রয়োজন; সুতরাং গাভীর সংরক্ষণ যে সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা আর বুঝাইতে হইবে কেন? ভারত কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি কার্য্যের উন্নতি গৌরবে ভারত এক সময়ে জগতের আদর্শ ছিল। এক্ষণে বৈদেশিকগণ কৃষি কার্য্যের উন্নতিসাধন বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন; গবর্ণমেণ্ট কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধনোপযোগী নব নব উপায় অবলম্বন করিতেছেন, করুন; কিন্তু দরিদ্র ভারতে গরু চাষের একমাত্র সহায়, একথা যেন বিস্মৃত হইয়া থাকেন না। জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে, সকল দিক বিবেচনা করিলে, গোময়ের সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। লাঙ্গল টানিবার জন্য উৎকৃষ্ট বলদের প্রয়োজন; বলদ সক্ষম না হইলে, কর্ষণকার্য্য রীতিমত হওয়া সম্ভবপর নহে। লাঙ্গলের জন্য উৎকৃষ্ট বলদের বড়ই অভাব হইয়াছে; এইরূপ বলদের মূল্য গত ৪০ বৎসরের মধ্যে পাঁচ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা গোমাংস খাইয়া থাকেন, তাঁহাদের রসনার তৃপ্তির জন্য, প্রত্যহ কত গরু কসাই হস্তে প্রাণ হারাইতেছে, তাহার হিসাব শুনিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, এক কলিকাতা, ট্যাংরার কসাইখানায় ১৯১২ সালের মার্চ্চ হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসে ষোল হাজার দুইশত সাতটী গোহত্যা হইয়াছে, ইহার মধ্যে বক্‌না বা যে গরু অল্পদিন পরে প্রসব হইবে, এমন গরু বিস্তর হত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝুন, সমগ্র ভারতে বৎসরে, কত গোধন নিধন হইতেছে। স্বাস্থ্যের জন্য গো-রক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। দেশের লোক দিন দিন অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে; ধান্যের মূল্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকল জিনিসেরই মূল্য বৃদ্ধি হয়। প্রচুর ধান্যোৎপাদনের জন্য কৃষির উন্নতি আবশ্যক; কৃষির উন্নতির প্রধান সহায় গরু। দেশে প্রচুর ঘি দুগ্ধের সংস্থান হইলে ও খাদ্যসামগ্রীর দুর্ম্মূল্যতার হ্রাস হইলে, লোকে প্রয়োজন মত আহার পাইয়া শরীরের পুষ্টি সাধনে সমর্থ হইবে। দুগ্ধ ঘৃতের প্রাচুর্য্য গরুর উপর নির্ভর করিতেছে। যাহাতে দুগ্ধবতী ও গর্ভধারণক্ষমা গাভী নিহত না হয় ও যাহাতে ভারতের কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায় ও উপায় —উৎকৃষ্ট বলবান্ বলদের অভাব অনুভূত না হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করুন।

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

পরিশিষ্ট

দোষান্ ব্যাধীংস্তথা মোহমাক্রান্তাভূরনির্জ্জিতা।
বিবর্দ্ধয়তি নারোহেৎ তস্মাদ্ভূমিমনির্জ্জিতাম্ * ॥ ৩৯ ॥
প্রাণানামুপসংরোধাৎ প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ।
ধারণেত্যুচ্যতে চেয়ং ধার্য্যতে যন্মনো যয়া ॥ ৪০ ॥
শব্দাদিভ্যঃ প্রবৃত্তানি যদক্ষাণি যতাত্মভিঃ।
প্রত্যাহ্রিয়ন্তে যোগেন প্রত্যাহারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৪১ ॥
উপায়শ্চাত্র কথিতো যোগিভিঃ পরমর্ষিভিঃ।
যেন ব্যাধ্যাদয়ো দোষা ন জায়ন্তে হি যোগিনঃ ॥ ৪২ ॥

মোহবশে ভূমিজয় না করি যে জন
উন্নত হইতে চায়—ঘটে অলক্ষণ।
দোষ আর বহু ব্যাধি জনমি' নিশ্চয়
অচিরে তাহার দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।
এই হেতু ভূমি জয় না করি' কখন
উন্নত সাধন পথে ক'রো না গমন। ৩৯।
প্রাণের নিরোধ এই সাধনেতে হয়,
এই হেতু প্রাণায়াম সুধীগণ কয়।
যেই ত সাধনে মন ধীর স্থির হয়,
ধারণা তাহারে ব'লে নাহিক সংশয়। ৪০।
শ্রোত্র-চক্ষু আদি যত ইন্দ্রিয়নিকর
শব্দাদি হইতে যাহে হইয়া অন্তর
প্রত্যাহৃত হ'য়ে রহে আপনে আপন
প্রত্যাহার বলি' তা'রে বলে সুধীগণ। ৪১।
যোগীর যাহাতে নহে রোগের উদয়,
পরমর্ষিগণে হেন উপায় নির্ণয়,
করিয়া রাখিলা এই শাস্ত্রের ভিতর
উচিত যোগীর তাহা জানে নিরন্তর। ৪২।

* সাধককে সপ্ত অজ্ঞানভূমি ও সপ্ত জ্ঞানভূমি আয়ত্ত করিতে হয়। যোগবাশিষ্ঠে উৎপত্তি প্রকরণের ১১৭ ও ১১৮ অধ্যায়ে সে কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

সপ্ত অজ্ঞানভূমি—

"বীজজাগ্রৎ তথা জাগ্রন্মহাজাগ্রত্তথৈব চ।
জাগ্রৎস্বপ্নস্তথা স্বপ্নঃ স্বপ্নজাগ্রৎ সুষুপ্তকম্॥"

সপ্ত জ্ঞানভূমি—

"জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা।
বিচারণা দ্বিতীয়াতু তৃতীয়া তনুমানসা॥
সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাৎ ততোঽসংসক্তিনামিকা।
পদার্থভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগা স্মৃতা॥"

সাধক গুরূপদিষ্ট পথে সাধন করিতে করিতে সোপানারোহণের ন্যায় এইগুলিকে উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তিভাক্ হইয়া থাকেন। যোগবাশিষ্ঠে ইহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে; কিন্তু বিনা সাধনে কেবল গ্রন্থপাঠ দ্বারা কিছুই হইবার নয় বলিয়া এ স্থলে সে সব উদ্ধৃত করা হইল না।

যথা তোয়াথিনস্তোয়ং যন্ত্রনালাদিভিঃ শনৈঃ।
আপিবেয়ুস্তথা বায়ুং পিবেদ্‌যোগী জিতশ্রমঃ॥ ৪৩॥
প্রাঙ্‌নাভ্যাং হৃদয়ে চাথ তৃতীয়ে চ তথোরসি।
কণ্ঠে মুখে নাসিকাগ্রে নেত্র-ভ্রূমধ্য-মূর্দ্ধসু॥ ৪৪॥
কিঞ্চ তস্মাৎ পরস্মিংশ্চ ধারণা পরমা স্মৃতা।
দশৈতা ধারণাঃ প্রাপ্য প্রাপ্নোত্যক্ষরসাম্যতাম্॥ ৪৫॥
নাধ্মাতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রান্তো ন চ ব্যাকুলচেতনঃ।
যুঞ্জীত যোগং রাজেন্দ্র যোগী সিদ্ধ্যর্থমাদৃতঃ॥ ৪৬॥
নাতিশীতে ন চোষ্ণে বৈ ন দ্বন্দ্বে নানিলাত্মকে।
কালেষ্বেতেষু যুঞ্জীত ন যোগং ধ্যানতৎপরঃ॥ ৪৭॥
সশব্দাগ্নিজলাভ্যাসে জীর্ণগোষ্ঠে চতুষ্পথে।
শুষ্কপর্ণচয়ে নদ্যাং শ্মশানে সসরীসৃপে॥ ৪৮॥
সভয়ে কূপতীরে বা চৈত্যবল্মীকসঞ্চয়ে।
দেশেষ্বেতেষু তত্ত্বজ্ঞো যোগাভ্যাসং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪৯॥

জলের কারণে যা'র হয় প্রয়োজন,
যন্ত্র-নাল-আদি-যোগে জলের গ্রহণ
করি' সেই, যথা সুখে সদা করে পান
জিতশ্রম যোগী তথা বায়ু করে পান। ৪৩।
প্রথমে নাভিতে, পরে হৃদয়ে, বক্ষেতে,
পরে, কণ্ঠে, মুখে সে নাসাগ্রে—ভ্রূমধ্যেতে।
পরে সে মূর্দ্ধায় হয় বায়ুর গমন
তখনি যোগীর হয় মানস পূরণ। ৪৪।
ইহার পরেতে হয় পরমা ধারণা
অক্ষর-সাম্যতা যাহে—অপূর্ব্ব সাধনা।
এ ধারণা লাভ হয় যেই দশ স্থানে,
কহিনু তা'দের নাম তব বিদ্যমানে। ৪৫।

আধ্মাত, ক্ষুধিত, শ্রান্ত, ব্যাকুল চেতন,
যোগাভ্যাস না করিবে সিদ্ধির কারণ। ৪৬।
অতি শীতে, অতি গ্রীষ্মে, দ্বন্দ্বকালে আর,
বেগবান বায়ুকালে কর পরিহার। ৪৭।
সশব্দাগ্নি যথা, কিম্বা জল সন্নিধান
জীর্ণগোষ্ঠ চতুষ্পথ ত্যজ মতিমান।
শুষ্কপর্ণাবৃত স্থান আর সে শ্মশান,
নদীকূল আর সরীসৃপযুক্ত স্থান। ৪৮।
ভয়যুক্ত স্থান, কিম্বা কূপতীর আর
চৈত্য আর আছে যথা বল্মীক-সঞ্চার।
এই সব স্থান কভু যোগ-যোগ্য নয়;
তত্ত্বজ্ঞ যোগীরা ইহা জানেন নিশ্চয়। ৪৯।

সত্ত্বস্যানুপপত্তৌ চ দেশকালং বিবর্জ্জয়েৎ।
নাসতো দর্শনং যোগে তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫০ ॥
দেশানেতাননাদৃত্য মূঢ়ত্বাদ্যো যুনক্তি বৈ।
বিঘ্নায় তস্য বৈ দোষা জায়ন্তে তান্নিবোধ মে ॥ ৫১ ॥
বাধির্য্যং জড়তা লোপঃ স্মৃতের্মূকত্বমন্ধতা।
জ্বরশ্চ জায়তে সদ্যস্তত্তদজ্ঞানযোগিনঃ ॥ ৫২ ॥
প্রমাদাদ্যোগিনো দোষা যদ্যেতে স্যুশ্চিকিৎসিতম্।
তেষাং নাশায় কর্ত্তব্যং যোগিনাং তন্নিবোধ মে ॥ ৫৩ ॥
স্নিগ্ধাং যবাগূমত্যুষ্ণাং ভুক্ত্বা তত্রৈব ধারয়েৎ।
বাত-গুল্মপ্রশান্ত্যর্থমুদাবর্ত্তে তথোদরে ॥ ৫৪ ॥
যবাগূং বাপি পবনং বায়ুগ্রন্থিং প্রতিক্ষিপেৎ।
তদ্বৎ কম্পে মহাশৈলং স্থিরং মনসি ধারয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
বিঘাতে বচসো বাচং বাধির্য্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ম্।
যথৈবাম্রফলং ধ্যায়েৎ তৃষ্ণার্ত্তো রসনেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

সত্ত্বের অনুপপত্তি ঘটিবে যখন
দেশকাল পরিহার করিবে তখন।
যোগে অসতের কভু না হয় দর্শন,
এ কারণে তাহা সদা করিবে বর্জ্জন। ৫০।
ইথে অনাদর করি' এই সব দেশে
যোগযুক্ত হ'লে বহু বিঘ্ন ঘটে শেষে।
তাহে যেই দোষচয় জনমে নিশ্চয়,
বিস্তারি' বলিব এবে সেই সমুদয়—৫১।
বাধির্য্য, জড়তা হয় স্মৃতিলোপ আর,
মূকত্ব, অন্ধতা ঘটে—হয় জর তা'র। ৫২।
প্রমাদ বশেতে যদি ঘটয়ে এমন
যোগীর চিকিৎসা ভিন্ন, শুনহ রাজন।
যেরূপে সে সব রোগ সদ্য নষ্ট হয়,
সে সব উপায় কহি করিয়া নিশ্চয়। ৫৩।
স্নেহযুক্ত অতি উষ্ণ যবাগূ ভক্ষণ
করিয়া সে রুগ্নস্থান করিবে ধারণ;
ইথে বাত গুল্মরোগ উদাবর্ত্ত আর
উদর রোগের শান্তি কহিলাম সার। ৫৪।
যবাগূ অথবা বায়ু করিয়া গ্রহণ,
ধীরে ধীরে করিবেন উদর পূরণ;
তাহে বায়ুগ্রন্থি নাশ হইবে নিশ্চয়
শাস্ত্রের বচন ইথে নাহিক সংশয়। ৫৪।
যোগীর কখন হ'লে কম্পের উদয়,
মহাশৈল ধ্যানে তাহা যাইবে নিশ্চয়।
বাক্যের বিঘাতে বাক্য করিবে চিন্তন;
বাধির্য্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ে রাখিবেক মন। ৫৬।

যস্মিন্ যস্মিন্ রুজা দেহে * তস্মিংস্তদুপকারিণীম্।
ধারয়েদ্ধারণামুষ্ণে শীতাং শীতে চ দাহিনীম্ ॥ ৫৭ ॥
কীলং শিরসি সংস্থাপ্য কাষ্ঠং কাষ্ঠেন তাড়য়েৎ।
লুপ্তস্মৃতেঃ স্মৃতিঃ সদ্যো যোগিনস্তেন জায়তে ॥ ৫৮ ॥
দ্যাবাপৃথিব্যৌ বায়্বগ্নী ব্যাপিনাবপি ধারয়েৎ।
অমানুষাৎ সত্ত্বজাদ্বা বাধাস্বিতিশ্চিকিৎসিতম্ ॥ ৫৯ ॥
অমানুষং সত্ত্বমন্তর্যোগিনং প্রবিশেদ্যদি।
বায়্বগ্নিধারণেনৈনং † দেহসংস্থং বিনির্দ্দহেৎ ॥ ৬০ ॥
এবং সর্ব্বাত্মনা রক্ষা কার্য্যা যোগবিদা নৃপ।
ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ ॥ ৬১ ॥
প্রবৃত্তিলক্ষণাখ্যানাদ্যোগিনো বিস্ময়াত্তথা।
বিজ্ঞানং বিলয়ং যাতি তস্মাদ্গোপ্যাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥ ৬২ ॥

তৃষ্ণায় সে কণ্ঠকূপ কিম্বা আম্রফল,
চিন্তনে তৃষ্ণার নাশ, না পেলেও জল।
যেই অঙ্গে যেই রোগ হইল উদয়
সে অঙ্গে রাখিলে মন যাইবে নিশ্চয়। ৫৭।
উষ্ণেতে শীতল আর শীতেতে দহন,
ধারণা করিলে যাবে—শাস্ত্রের লিখন।
স্মৃতিলুপ্ত হ'লে কাষ্ঠ-কীলক লইয়া
শিরে রাখি, আঘাত করিবে দণ্ড দিয়া;
লুপ্ত-স্মৃতি যোগীর তাহাতে হ'বে নাশ,
সদ্য ফল লাভ হ'বে—না হবে নিরাশ। ৫৮।
স্বর্গ-মর্ত্ত-বায়ু-অগ্নি যা'দের আশ্রয়,
জীব কিম্বা অমানুষ সত্ত্ব যত হয়,
সে সব হইতে বাধা নাশিবার তরে
সেই সেই তত্ত্ব সদা ধরিবে অন্তরে। ৫৯।
অমানুষ সত্ত্ব যদি যোগীর অন্তরে,
প্রবেশয়ে তবে যোগী তার নাশ তরে
বায়ু অগ্নি † অন্তরেতে করিয়া করিয়া চালন,
অনায়াসে করিবেন তাহার দাহন। ৬০।
এইরূপে নিরন্তর যোগবিৎগণ
সর্ব্বাত্মার রক্ষাকার্য্য করেন সাধন। ৬১।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ হয়,
নর দেহ এ সবার সাধক নিশ্চয়;
প্রবৃত্তি উদয়ে আর বিস্ময় উদয়ে
বিজ্ঞান বিলয় হয় ফলহীন হ'য়ে,
এই হেতু প্রবৃত্তি-নিচয়ে যোগিগণ,
সংযত করেন সদা করিয়া গোপন। ৬২।

* দেশে ইতি বা পাঠঃ।

† শরীরাভ্যন্তরস্থিত, বায়ু ও তেজস্তত্ত্বের চালন দ্বারা সেই সকলকে দগ্ধ করিতে হয়। সাধনসম্পদযুক্ত যোগী এই উপায়ে নিজের ও অন্যের রোগ নাশ করিতে পারেন।

অলৌল্যমারোগ্যমনিষ্ঠুরত্বং
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পম্ ।
কান্তিঃ প্রসাদঃ স্বরসৌম্যতা চ
যোগপ্রবৃত্তেঃ প্রথমং হি চিহ্নম্ ॥ ৬৩ ॥
অনুরাগং জনো যাতি পরোক্ষে গুণকীর্ত্তনম্ ।
ন বিভ্যতি চ সত্ত্বানি সিদ্ধের্লক্ষণমুত্তমম্ ॥ ৬৪ ॥
শীতোষ্ণাদিভিরত্যুগ্রৈর্যস্য বাধা ন বিদ্যতে ।
ন ভীতিমেতি চান্যেভ্যস্তস্য সিদ্ধিরুপস্থিতা ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে অলর্কচরিতে দত্তাত্রেয়ালর্কসংবাদে
যোগনিরূপণং নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অলৌল্য, অরোগ আর অনিষ্ঠুর-ভাব
শুভ গন্ধ, কান্তি আর প্রসন্ন স্বভাব,
অল্পত্ব পুরীষ মূত্রে, স্বরের মাধুরী
যোগ প্রবৃত্তির চিহ্ন রেখো ইহা স্মরি' । ৬৩ ।
সর্ব্ব সত্ত্বে হয় অনুরাগের উদয়,
পরোক্ষে সবার গুণ কীর্ত্তন করয় ;
হেরি' কোন প্রাণী যাহে নহে ভীত মন,
সে যোগীর জেনো এই সিদ্ধির লক্ষণ । ৬৪ ।
অতি শীত উষ্ণে যা'র কষ্ট নাহি হয়,
অন্য হ'তে ভয় প্রাণে না হয় উদয় ।
সেই যোগী অচিরে করিবে সিদ্ধিলাভ,
এই সব শক্তি সেই যোগের প্রভাব । ৬৫ ।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে অলর্কচরিতান্তর্গত দত্তাত্রেয়ালর্কসংবাদে
যোগনিরূপণ নামক একোনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দত্তাত্রেয় উবাচ।

উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে দৃষ্টে হ্যাত্মনি যোগিনঃ।
যে তাংস্তে সম্প্রবক্ষ্যামি সমাসেন নিবোধ মে ॥ ১ ॥
কাম্যাঃ ক্রিয়াস্তথা কামান্ মানুষানভিবাঞ্ছতি।
স্ত্রিয়ো দানফলং বিদ্যাং মায়াং কুপ্যং ধনং দিবম্ ॥ ২
দেবত্বমমরেশত্বং রসায়ন-বয়ঃক্রিয়াম্।
মরুৎপ্রপতনং যজ্ঞং জলাগ্ন্যাবেশনং তথা ॥ ৩ ॥
শ্রাদ্ধানাং সর্ব্বদানানাং ফলানি নিয়মাংস্তথা।
তথোপবাসাৎ পূর্ত্তাচ্চ দেবতাভ্যর্চ্চনাদপি।
তেভ্যস্তেভ্যশ্চ কর্ম্মভ্য উপসৃষ্টোঽভিবাঞ্ছতি ॥ ৪ ॥
চিত্তমিত্থং বর্ত্তমানং যত্নাদ্যোগী নিবর্ত্তয়েৎ।
ব্রহ্মসঙ্গী মনঃ কুর্ব্বন্নুপসর্গাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৫ ॥
উপসর্গৈর্জিতৈরেভিরুপসর্গাস্ততঃ পুনঃ।
যোগিনঃ সম্প্রবর্ত্তন্তে সাত্ত্ব-রাজস-তামসাঃ ॥ ৬ ॥

বলিলেন দত্তাত্রেয়—"শুনহ রাজন,
যোগীর যখন ঘটে আত্মার দর্শন,
সে কালে যে সব উপসর্গের উদয়
বিস্তারি' বলিব এবে শুণ সমুদয়। ১।
কাম্য ক্রিয়া করিবারে মন যেতে চায়,
কর্ম্মের কামনা বহু ব্যস্ত করে তায়,
নারীসঙ্গ, দান ফল, বিদ্যার গৌরব,
মায়ার তাড়ন, ধন-রত্ন আদি সব,
স্বর্গবাস-আশা সে দেবত্ব লাভ আর,
ইন্দ্রত্বের বাসনা অন্তরে আসে তার,
সুস্থির যৌবন আশে বাঞ্ছে রসায়ন,
বায়ু, অগ্নি, জল, যজ্ঞ পেতে চায় মন। ২-৩।
শ্রাদ্ধফল, সকল দানের ফল আর
নিয়মোপবাস অর্চ্চাফলে আশ তা'র। ৪।
এ সব ফলের আশা জাগিলে অন্তরে
মনেরে সংযত যোগী করিবে সত্বরে। ৫।
ব্রহ্মে মন দিলে এই উপসর্গ যায়।
পরে অন্য উপসর্গ ব্যস্ত ক'রে তায়।
সত্ব-রজ-তমঃ এই এই গুণ ত্রয় হ'তে
উপসর্গ জন্মি ব্যস্ত করে বিধি মতে। ৬।

প্রাতিভঃ শ্রাবণো দৈবো ভ্রমাবর্ত্তৌ তথাপরৌ।
পঞ্চৈতে যোগিনাং যোগ-বিঘ্নায় কটুকোদয়াঃ ॥ ৭ ॥
বেদার্থাঃ কাব্যশাস্ত্রার্থা বিদ্যাশিল্পান্যশেষতঃ।
প্রতিভান্তি যদস্যেতি প্রাতিভঃ স তু যোগিনঃ ॥ ৮ ॥
শব্দার্থানখিলান্ বেত্তি শব্দং গৃহ্লাতি চৈব যৎ।
যোজনানাং সহস্রেভ্যঃ শ্রাবণঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৯ ॥
সমন্তাদ্বীক্ষতে চাষ্টৌ স যদা দেবযোনয়ঃ।
উপসর্গং তমপ্যাহুর্দৈবমুন্মত্তবদ্বুধাঃ ॥ ১০ ॥
ভ্রাম্যতে যন্নিরালম্বং মনো দোষেণ যোগিনঃ।
সমস্তাচারবিভ্রংশাদ্ভ্রমঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১ ॥
আবর্ত্ত ইব তোয়স্য জ্ঞানাবর্ত্তো যদাকুলঃ।
নাশয়েচ্চিত্তমাবর্ত্ত উপসর্গঃ স উচ্যতে ॥ ১২ ॥
এতৈর্নাশিতযোগাস্তু সকলাদেবযোনয়ঃ।
উপসর্গৈর্মহাঘোরৈরাবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ ॥ ১৩ ॥

প্রাতিভ, শ্রাবণ, দৈব, ভ্রমাবর্ত্ত আর
উপসর্গ পঞ্চবিধ জনমে তাহার
এই পঞ্চ উপসর্গ যোগ বিঘ্ন হয়।
বিস্তারি' লক্ষণ বলি শুন সমুদয়। ৭।
বেদ-অর্থ, আর কাব্যশাস্ত্র আস্বাদন,
বিদ্যার গৌরব, শিল্প শাস্ত্র আলোচন,
প্রতিভার ফল ইহা "প্রাতিভ" নিশ্চয়,
এ সবেতে দিলে মন যোগ নষ্ট হয়। ৮।
অখিল শব্দার্থ তরে মন সদা ধায়
যোজন সহস্র দূরে শব্দ শোনা যায়;
"শ্রাবণ" নামেতে বিঘ্ন যোগ পথে এই,
ইহাতে ভুলিলে আর সিদ্ধি আশা নেই। ৯।
যে সময়ে হয় তা'র দেবের দর্শন,
হেরে অষ্ট দিকে সদা আছে দেবগণ,
এই বিঘ্ন "দৈব" নামে কহে সুধিগণ,
এই সব হ'তে চাই ফিরাইতে মন। ১০।
কভু দোষ বশে হয় নিরালম্ব মন
বৃথায় বিষয় বহু করে অন্বেষণ;
বৃথা ভ্রমি' ত্যজে যত যোগীর আচার
উপসর্গ—"ভ্রম"-নাম জানিহ ইহার। ১১।
জলের আবর্ত্ত যথা ঘুরে অনুক্ষণ
জ্ঞানের আবর্ত্তে পড়ি' ঘুরে তথা মন।
চিত্ত স্থৈর্য্য নয় তাহে হয়ত নিশ্চয়
"আবর্ত্ত" নামেতে উপসর্গ এই হয়। ১২।
এই সব উপসর্গে যোগভ্রষ্ট হ'য়ে,
পুনঃ পুনঃ জন্মে জীব নানা দেহ লয়ে। ১৩।

প্রাবৃত্য কম্বলং শুক্লং যোগী তস্মান্মনোময়ম্।
চিন্তয়েৎ পরমং ব্রহ্ম কৃত্বা তৎপ্রবণং মনঃ ॥ ১৪ ॥
যোগযুক্তঃ সদা যোগী লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সূক্ষ্মস্তু ধারণাঃ সপ্ত ভূরাদ্যা মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ ॥ ১৫ ॥
ধরিত্রীং ধারয়েদ্‌যোগী তৎসৌখ্যং প্রতিপদ্যতে।
আত্মানং মন্যতে চোর্ব্বীং তদ্গন্ধঞ্চ জহাতি সঃ ॥ ১৬ ॥
তথৈবাপ্সু রসং সূক্ষ্মং তদ্বদ্রূপঞ্চ তেজসি।
স্পর্শং বায়ৌ তথা তদ্বদ্বিভ্রতস্তস্য ধারণাম্ ॥ ১৭ ॥
ব্যোম্নঃ সূক্ষ্মাং প্রবৃত্তিঞ্চ শব্দং তদ্বজ্জহাতি সঃ ॥ ১৮ ॥
মনসা সর্ব্বভূতানাং মনস্যাবিশতে যদা।
মানসীং ধারণাং বিভ্রন্মনঃ সূক্ষ্মঞ্চ জায়তে ॥ ১৯ ॥

এই সব উপসর্গ নাশের কারণ,
মনে মল-হীন করি' করিয়া যতন,
মনোময় সুশুভ্র কম্বলে তার পর
আবরিত করি' যোগী আপন অন্তর
একান্তেতে একতান করি' প্রাণ মন,
নিরন্তর পরব্রহ্ম করিবে চিন্তন। ১৪।
জিতেন্দ্রিয় হ'বে করি' সুলঘু আহার,
যোগযুক্ত র'বে সদা এই যুক্তি সার। ১৫।
ভূ-আদি সে সপ্ত সূক্ষ্ম তত্ত্বের ধারণা
করিবে মস্তকে, ত্যজি' অসার ভাবনা। ১৬।
ধরিত্রী-ধারণা সিদ্ধি হইবে যখন
গন্ধ তন্মাত্রের জ্ঞান হইবে তখন।
ক্ষিতিতত্ত্বাকারিত আত্মায় সেই কালে
গন্ধ অনুভূতি তবে হ'বে অবহেলে
সেই কালে পরিহার করিলে তাহার
অপের ধারণাসিদ্ধি হবে ইহা সার।
রস তন্মাত্রের উপপত্তি সে সময়
হইবে আত্মায় ইহা জানিহ নিশ্চয়
রস-অনুভূতি তবে হ'বে নিরন্তর,
ত্যজিলে তাহারে তেজস্তত্ত্ব তার পর।
রূপতন্মাত্রের উপলব্ধি সে সময়
অনায়াসে হ'বে ইহা জানিহ নিশ্চয়।
চক্ষু-অগোচর রূপ হ'বে অনুভব,
যতনে ত্যজিবে যোগী সেই ত বিভব।
তার পরে বায়ুতত্ত্ব হইবে ধারণা
তাহে স্থিত হ'লে, স্পর্শজ্ঞান হয় নানা। ১৭।
স্পর্শতন্মাত্রের জ্ঞান করি পরিহার
ব্যোমতত্ত্ব-ধারণা হইবে তবে তা'র।
শব্দতন্মাত্রের হবে উপলব্ধি তায়
অশেষ মধুর শব্দ শুনে যোগী যায়। ১৮।
সে সব ত্যজিবে যোগী করিয়া যতন
হবে মনঃ স্থির ক্রমে শুন হে রাজন।
পরে মনস্তত্ত্বের ধারণা হ'বে তা'র,
এ তত্ত্ব বিবৃত অতি জেনো ইহা সার।
সূক্ষ্মতম মনঃতত্ত্বে স্থিতি হ'লে পর
জানিবার শক্তি হয়—সবার অন্তর।
মানসের সূক্ষ্মগতি জনমে তাহায়
ইচ্ছা হ'লে মনের ভাবনা জানা যায়। ১৯।

এস্থলে জন্মকাল পর্য্যন্ত নাক্ষত্রকাল ঘণ্টাদি ৯।১১।৯

৯ ঘণ্টা = অংশাদি ১৩৫ । ০ । ০
১১ মি = " ২ । ৪৫ । ০
৯ সে = " ২ । ১৫
৯ । ১১ । ৯ = ১৩৭ । ৪৭ । ১৫ দশমের সরলোত্থান বা রাইট অ্যাসেন্সান্ অব দি মেরিডিয়ান (R.A.M.C.)

অতএব—

১৩৭ । ৪৭ = দশমের সরলোত্থান (R.A.M.C.)
\+ ৩০
= ১৬৭ । ৪৭ = একাদশের বক্রোত্থান (O.A. XI.)
\+ ৩০
= ১৯৭ । ৪৭ = দ্বাদশের " (O.A. XII.)
\+ ৩০
= ২২৭ । ৪৭ = লগ্নের " (O.A. Asc.)
\+ ৩০
= ২৫৭ । ৪৭ = দ্বিতীয়ের " (O.A. II)
\+ ৩০
= ২৮৭ । ৪৭ = তৃতীয়ের " (O.A. III)

দশম ব্যতীত পাঁচটির স্ফুট পূর্ব্ব সূত্রানুসারে হ'বে। দশমের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম আছে।

এখন লগ্ন কসি—

লগ্নের বক্রোত্থান (O.A. Asc. = ২২৭।৪৭
− ১৮০
= ৪৭।৪৭

অতএব লগ কো-জ্যা (Log. cos.) লগ্নের ব-উ ৪৭।৪৭ = ৯.৮২৭৩২৮
\+ লগ কো-স্প (Log. cot.) অক্ষ ২২।৩৩ = ১০.৩৮১৭০৫
= লগ, কো-স্প (Log. cot.) / ক ৩১।৫৩ = ১০.২০৯০৩৩
—ক্রান্তির পরামক্রম ২৩।২৭
= / খ ৮।২৬

লগ্. কো-জ্যা Log. cos. ক ৩১।৪৩ = ৯.৯৩৪৩৪৯
\+ লগ্. স্প Log. tan. লগ্ন. বউ ৪৭।৪৭ = ১০.০৪২২৬১
৯৭৬৬১০
− লগ. কো-জ্যা. Log. cos. খ ৮।১৬ = ৯.৯৯৫৪৬৪
= লগ জ্যা Log coo লগ্ন ৪৩।৪৫ = ৯.৯৮১১৪৬
\+ ১৮০
৩০ ২২৩।৪৫

৭।১৩।৪৫ সায়ন লগ্ন

এইরূপেই একাদশাদি অপর চারিটি গৃহের স্ফুট নির্ণয় ক'ত্তে হ'বে। দশমের জন্য-

লগ. কো. জ্যা ক্রা. প. (Log coo O. E.) ২৩।২৭ = ৯.৯৬২৫৬২
\+ লগ. কো. স্প. (Log cot) দশম ৪২।১৩ = ১০.০৪২২৬১
= লগ কো. স্প. (Log cot) দশম. ৪৪।৪১ = ১০.০০৪৮২৩

১৮০
− ৪৪।৪১
৩০ | ১৩৫।১৯
৪।৩৩।১৯ দশমস্ফুট।

আমি। এই ছ'টা গৃহ এইরূপে নির্ণয় ক'রে তারপর প্রত্যেকটিতে ছয় যোগ ক'রে সপ্তমাদি অপর ছ'টি গৃহ পাওয়া যা'বে? আচ্ছা আমি অন্য একটা স্থানের লগ্নাদি স্বতন্ত্র ভাবে কস্‌বো। এখন ঐ মেল বোর্ণের বেলা এ ক্ষেত্রে কিরূপ করা হ'বে?

গুরুদেব। কোন্ ক্ষেত্রে, টেবিল অব হৌসেস্ দিয়ে না ত্রিকোণ-মিতির সাহায্যে?

আমি। উভয় উপায়েই।

গুরুদেব। টেবিল দিয়ে কস্‌তে হ'লে র‍্যাফেলের ৩৭ অক্ষের টেবিল দিয়েই কস্‌তে হ'বে। তবে ক্রমের একটু বিভিন্নতা আছে পূর্ব্বলব্ধ নাক্ষত্রকালে ১২ ঘণ্টা যোগ ক'রে, যত পাওয়া যা'বে তা'থেকে যে লগ্নাদি হ'বে তাহারি সপ্তম রাশি লগ্নাদি হ'বে যেমন

জন্ম সময়ে নাক্ষত্রকাল ৯।১১।১৯
+ ১২। ০।০
= ২১।১১।১৯

এই ২১।১১।১৯ ঘণ্টাদি দ্বারা ৩৭° উ অক্ষে পাওয়া যায়—মিথুনের প্রায় ৬ অংশ ৪০ কলা তাহার সপ্তম ধনুর ছয় অংশ চল্লিশ কলাই সায়নলগ্ন। এটা আন্দাজে বল্লাম। আর ত্রিকোণ মিতির জন্য নিয়ম ঐই। এখন একটু অভ্যাস কর, আর ফল বিচারের জন্য একটা জানা রাশিচক্র অঙ্কিত কর।

আমি। আমাদের অবলম্বিত উদাহরণের একটি শকাব্দা ১৭৮০, ২রা কার্ত্তিক, খ্রীঃ ১৮৫৮ অব্দ ১৭ই অক্টোবর। কিন্তু জন্ম সময় ঠিক জানা নাই। অপরাহ্নে জন্ম এইমাত্র জানা আছে। এখন কি করা যা'বে?

গুরুদেব। জাতকের জীবনের দু'একটা প্রধান ঘটনার কাল বল্‌তে পার?

আমি। তা পারি। পিতৃ, বিয়োগ হ'য়েছিল খ্রী ১৮৯৭ অব্দ ১৬ই জুন অপরাহ্ন ৪ টার সময়।

গুরুদেব। আপাততঃ একটা উপায় দেখিতে দিই তার পর অনিশ্চিত সময় শুদ্ধ কর্ব্বার নানাবিধ উপায় বলে দিব।

দেখ পিতৃ বিয়োগ কাল—খ্রীঃ ১৮৯৭।৫।১৬
—জন্ম সময় খ্রীঃ ১৮৫৮।৯।১৭
বর্ষ ৩৮।৭।২৯ দিন

জন্ম দিনের গ্রীণীচি মধ্য-মাধ্যাহ্নিক
মঙ্গল স্ফুট—১০।৩০

সুতরাং অপরাহ্ন সময়ে স্থূলতঃ ১১ অংশ = ১৩ ঘণ্টা ২৮ মিঃ

১ বর্ষ = ১ অংশ = ৪ মি হিঃ

৩৮ বর্ষ—৭ মাস ২৯ দিন = ২ ,, ৩৫ ,,

সমষ্টি ১৬ ,, ৩ ,,

কলিকাতার লগ্ন সারিণীতে পাইতেছি—

১৬ ঘ ৩ মি ৪৮ সে = লগ্ন ১০।২২।৪০

দশম ৮।৩।০

এখন দেখ এই লগ্ন ও দশম কত দূর জাতকের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে ?

আমি। কিরূপে ?

গুরুদেব। লগ্ন হ'লো সায়ন কুম্ভ। আচ্ছা লোকটি বেশ মোটা এবং বরং দীর্ঘাকার বল্‌তে পার কিন্তু বেঁটে নয়; রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গায়ে বল আছে, স্বাস্থ্য ভাল, প্রশান্ত মুখ, ঈষৎ লম্বা, আরক্ত চক্ষু, চুল পাতলা, সৎস্বভাব, ও দয়ার্দ্র হৃদয়।

আমি। প্রায় মিলেছে।

গুরুদেব। গ্রহ-সংস্থান ঠিক ক'রে বিচার না ক'ল্লে প্রায় হ'বে বৈকি! আমি সায়ন কুম্ভের সাধারণ ফল ব'ল্লাম বই ত নয়। আচ্ছা ২০ থেকে ২৫ অংশের মধ্যে লগ্ন হ'লে যে রকম হ'বার কথা তা'বলি, শুন, কি রকম মেলে দেখ। জাতকের প্রকৃতি সৎ কিন্তু সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ, সহজে কাহাকেও বিশ্বাস ক'ত্তে পারে না বহু ভাষায় অল্পাধিক জ্ঞান আছে; নানা বিষয় আয়ত্ব কর্ব্বার জন্য ব্যাকুল, কোন কোন বিষয়ে বেশ বুৎপন্ন। আধ্যাত্মিক তত্ত্বে বিশেষ অনুরক্তি ও তদ্বিষয়ে বেশ প্রগাঢ় জ্ঞান থাকবার কথা। চিত্রাদি বিবিধ কলাভিজ্ঞ। বিজ্ঞানে অনুরাগ আছে। চিন্তাশীল। অধ্যয়নানুরক্ত। বক্তৃতাতেও মন্দ নয়, কিন্তু অপরের মন আকর্ষণের শক্তি অধিক নাই।

আমি। অনেক মিলেছে। বিশেষ ভাষা শিক্ষার কথা। ভাল জ্ঞান না থাক্‌লেও অনেক গুলিই সামান্য রূপ জানা আছে। আর কলা বিদ্যাও দু'চার রকম জানা আছে।

গুরুদেব। আচ্ছা ২৩ অংশের ফলটা দেখা যাক। লা ভোলা স্পেরার (La Volaspera) মতে কুম্ভের ২৩ অংশের দ্যোতক আকৃতি একটি বাঁভার (Bearer) অতল খাদের উপর লম্বিত একটি বৃক্ষ ছেদন ক'চ্চে—ইহা থেকে বোঝা যাচ্চে যে এই অংশে যা'র জন্ম, সে ব্যক্তি লাভ লোকসানের কথা না ভেবে নিরন্তর কাজ করাই ভালবাসে, নিরন্তর কাজ করাই তা'র প্রকৃতি। কোন কাজের ভার পেলে প্রাণপণে তা' সম্পন্ন ক'র্ত্তে যত্ন করে; সহ্য গুণটা খুব বেশী। কাজও প্রায় নিষ্ফল হয় না; কিন্তু ফল ভোগটা তা'র ভাগ্যে ঘটে না সে টা, যা'র

ভাগ্যে তা'র ভাগ্যে। কর্ত্তার পক্ষে কলটা অতলেই যায়। লোকটার যদি বাহাদুর কাঠের ব্যবসা করবার সুবিধা হয় বা ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করবার সুবিধা হয় তবে তাতে লাভ হতে পারে কিন্তু সেটা গ্রহ সংস্থান দেখে বলা যেতে পারে। এবার কি রকম?

আমি। ঐ বাহাদুরী কাষ্ঠ আর ইঞ্জিনিয়ারিং বাদে সব ঠিক মিলেচে বল্‌তে পারি।

গুরুদেব। তা'লে এই ১০। ২২। ৪০ই সায়ন লগ্ন। তাহলে দশম ৮। ৩। যার জন্ম সময়ে দশমে ধনুর ১ থেকে ৫ অংশের মধ্যে কোন অংশ উদিত থাকে, সে ব্যক্তি লোকমান্য লাভ করে অর্থাৎ অনেকেই তা'রে ভালবাসে।

আমি। এটাও মিলেছে।

গুরুদেব। তবে এখন দেখ জন্ম সময় কখন?

আমি। কি রূপে?

গুরুদেব। কেন? জন্ম সময়ে মধ্যাকাশের সরলোত্থান পেলে ১৬। ৩। ৪৮ এবং তদ্দিনের মধ্য মধ্যাহ্নেতে মধ্যাকাশের সরলোত্থান বা নাক্ষত্র কাল পঞ্জিকাতে পাচ্চো ১৩।৪২।৪৮ উভয়ের অন্তর ২।২১ দু'ঘণ্টা ২১ মিনিট নক্ষত্র কাল তাকে মধ্যকাল করবার জন্য দুঘণ্টায় ২০ সেকেণ্ড, আর ২৯ মিনিটে ৩ সেকেণ্ড এই তেইশ সেকেণ্ড বাদ দাও পেলে অপরাহ্ন ২টা ২০ মিনিট ৩৭ সেকেণ্ড সময়ে জন্ম।

আমি। অপরাহ্ন বল্লে যেন এর চেয়েও একটু বেশী বোধ হয় না?

গুরুদেব। যখন আকৃতি প্রকৃতি মিললো তখন আর আপত্তি করবার হেতু কোথায়? যাই হোক এখন রাশিচক্র এঁকে গ্রহ নির্দ্দেশ কর, তা'রপর যদিই দু'চার মিনিট এদিক ওদিক হয় তবে ২৩ অংশ না হয় ২৪ অংশ হ'বে এই বই ত নয়?

আমি। আমি, একটা স্বতন্ত্র বিষয় জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে ইচ্ছা ক'রেছি।

গুরুদেব। জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পার।

আমি। আপনি ইতিপূর্ব্বে অনুপাত দ্বারা মানচিত্র হ'তে আনির্দ্দিষ্ট স্থানের অক্ষাদি নির্ণয়ের যে নিয়ম ব'লেছিলেন, যদি মানচিত্র উপস্থিত না থাকে, কেবল এরকম জান্‌তে পারা যায় যে কোনও প্রসিদ্ধ স্থানের উত্তরে পূর্ব্বে পশ্চিমে বা দক্ষিণে এত দূরে ঐ স্থানটি তা হ'লে কি অক্ষাদি নির্ণয় করা যায় না?

গুরুদেব। তা যা'বে না কেন? কোষ্ঠীর উপযোগী স্থূল অক্ষাংশাদি ও দেশান্তরাংশাদি অল্পায়াসেই নির্ণীত হ'তে পারে। আমার খাতায় ও রকম নির্ণয়ের

একটা টেবিল আছে। এই দেখ—

ভৌগ দূরত্ব সারণী *

উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষ	অক্ষাংশের এক অংশে মাইল	অক্ষাংশের এক কলায় ফুট	দেশান্তরের ১ম অংশে মাইল	দেশান্তরের ১ কলায় ফুট
০ অংশ	৬৮.৭০১৯	৬০৪[illegible]	৬৯.১৭১১	৬০৮৭.১৮
১০ "	৬৮.৭২৩১	৬০[illegible]	৬৮.১২৮৬	৫৯৯৫.৩২
২০ "	৬৮.৭৮৪০	৬০[illegible]	৬৫.০২৬৮	৫৭২২.৩৬
৩০ "	৬৮.৮৭৭৬	৬০[illegible]	৫৯.৯৫৬[illegible]	৫২৭৯.[illegible]৪
৪০ "	৬৮.৯৯২৬	৬০[illegible]	৫৩.০৬৩৯	৪৬৬৯.৬২
৪৫ "	৬৯.০[illegible]৪০	৬০৭[illegible]	৪৮.৯৯৫৮	৪৩১১.৬৩
৫৪ "	৬৯.১১৫৪	৬০[illegible]	৪৪.৫৫২৩	৩৯২০,৬০
৫৫ "	৬৯.১৭৬১	৬০[illegible]	৩৯.৭৬৬৬	৩৪৯৯.৪৬
৬০ "	৬৯.২৩১১	৬০[illegible]	৩৪.৬৭৪৮	৩০৫১.৩৮
৭০ "	৬৯.৩২৫৭	৬১০[illegible]	২৩.৭২৯৮	২০৮৮.২২
৮০ "	৬৯.৩৮৭৫	৬১০[illegible]	১২.০৫১৫	১০৬০.৫৩
৯০ "	৬৯.৪০৯০	৬১[illegible]	—	—

এখন মনে কর কেহ বল্লে কলিকাতা হ'তে অনুমান ত্রিশ ক্রোশ পশ্চিমে ও পনর ক্রোশ উত্তরে কোন স্থানে একটি বালক জন্মেছে, এ অবস্থায় কিরূপ কস্‌বে ?

আমি। কলিকাতার অক্ষ ২২।৩০ উত্তর ও দেশান্তর ৮৮।৩০ পূর্ব্ব স্বীকার ক'রে কস্‌বো কি ?

গুরুদেব। কস্‌বার সুবিধার জন্য ? তা কস।

আমি।—

২০ অংশ অক্ষ = ৬৮·৭৮৪০ মাইলে এক অংশ

৩০ " = ৬৮·৮৭৭৬ " "

১০ ·০৯৩৬ মাইল বৃদ্ধি

·০০৯৩৬ " "

এবং ৩০ কলা = ·০০৪৭ " "

∴ ২° – ৩০′ = ·০২৩৪ " "

এবং ২০ = ৬৮·৭৮৪০

\+ ২° – ৩০′ = ·০২৩৪

= ২২° – ৩০′ = ৬৮·৮০৭৪ মাইল = ১ অংশ বা ৬০ কলা

* এলেন লিও প্রণীত এষ্ট্রলজীকর অল [illegible]

স্থানটি ১৫ ক্রোশ উত্তরে

সুতরাং ৩০ মাইল

∴ ৬৮·৮০৭৪ : ৩০ :: ৬০′ : কত ?

$\frac{৩০ \times ৬০}{৬৮·৮০৭৪}$ = ২৬ কলা।

যদি ফুট ধরে কসি, তবে ১৭৬০ গজ বা ৫২৮০ ফুটে মাইল

. ২০ অক্ষে ৬০৪৭·৬৩ ফুটে ১ কলা।

৩০° " ৬০৫২·৯৮ " "

∴ ১০ অংশে ৫·৩৫ ফুট বৃদ্ধি

১ " ·৫৩৫ " "

২ " ১·০৭ " "

৩০ " ·২৭ " "

২°-৩০ — ১·৩৪ " "

এবং ২০° = ৬০৪৭·৬৩ " "

২—৩০ = ১·৩৪

∴ ২২—৩০ = ৬০৪৮·৯৭ = ১ কলা।

অতএব $\frac{৩০ \text{ মাইল} \times ৫২৮০}{৬০৪৮·৯৭}$ = ২৬ কলা।

২২°—৩০′ + ২৬′ = ২২°—৫৬ উত্তর

সেই দেশের অক্ষাংশ

দেশান্তর জন্য—

২০° অক্ষে ৬৫ · ০২৬৮ মাইলে এক অংশ

৩০° " ৫৯ · ৯৫৬২ " " "

১০ অংশে ৫ · ০৭০৬ মাইল হ্রাস

১ অংশে · ৫০৭০৬ " "

২ " ১ · ০১৪১ " "

৩০ কলায় · ২৫৩৫ " "

২০-৩০′ = ১ · ২৬৭৬ " "

এবং ২০° অক্ষ = ৬৫ · ০২৬৮

+ ২-৩০′ = — ১ · ১৬৭৬

∴ ২২-৩০ = ৬৩ · ৭৫৯ = ১ বা ৬০′

স্থানটি ত্রিশ ক্রোশ বা ৬০ মাইল পশ্চিমে

∴ ৬৩ · ৭৫৯২ : ৬০ : : ৬০ কলা : কত ?

= $\frac{৬০ \times ০৬}{৬৩·৭৫৯২}$ = ৫৬ কলা।

ফুট হিসাবে

২০° অক্ষে ১ কলা = ৫৭২২·৩৬ ফুট

৩০° „ „ = ৫২৭৬·১৪ „

১০° = ৪৪৬·২২ „ হ্রাস

১০° = ৪৪·৬২২ „ „

২° = ৮৯·২৪ „ „

৩০′ = ২২·৩১ „ „

২-৩০′ = ১১১·৫৫ „ „

২০° অক্ষ = ৫৭২২·৩৬ ফুট

+২-৩০ = − ১১১·৫৫ „

২২-৩৩ „ = ৫৬১০·৮১ „

$$\therefore \quad \frac{৬০ \times ৫২৮০}{৫৬১০\cdot৮১} = ৫৬'$$

∴ ৮৮°।৩০′ − ৫৬′ (পশ্চিমে বলিয়া)

= ৮৭°-৩৪′ সেই দেশের গ্রী-প দেশান্তর

গুরুদেব। ঠিক বুঝেছ। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?

আমি। আছে বই কি! লগ্ন করবার জন্য গ্রীণীচ মধ্য-মধ্যাহ্নের নাক্ষত্র-কাল নিয়ে তা’র সঙ্গে আমাদের জাতকের অভীষ্ট দেশীয় মধ্যকাল যোগ কল্লেন এবং তার সঙ্গে ঐ মধ্য কালকে নাক্ষত্র কাল করবার জন্য একটি সংস্কার দিলেন দেখ্‌লাম, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই গ্রীণীচের মধ্যাহ্ন ও অস্মদ্দেশের মধ্যাহ্ন ত সম কালে হয় না, তবে আমাদের দেশের মধ্য মধ্যাহ্নের অনুরূপ নাক্ষত্র কাল নিলেন না কেন? আর নাক্ষত্রকালকে মধ্যকালে পরিণত করবার নিয়ম কি ?

গুরুদেব। উত্তম প্রশ্ন করেছ। স্থানীয় মধ্য মধ্যাহ্ন নিশ্চয়ই গ্রীণীচ মধ্য-মধ্যাহ্নের তুল্য নাক্ষত্র-কাল হ’তে পারে না। ২৪ ঘণ্টায় নাক্ষত্র ও মধ্য-কালের অন্তর ৩ মিনিট ছাপ্পান্ন দাশমিক পাঁচ ছয় সেকেণ্ডে সুতরাং ৩৬০ অংশ আবর্ত্তনে ৩ মি ৫৬·৫৬ সে অন্তর হ’লে এক অংশে ৩।৫৬·৫৬ ÷ ৩৬০ = বিশ্রায় ৬৬৯ সেকেণ্ড অন্তর হয়। এই অনুপাতে যে অঙ্ক হয় সেটা অতি সামান্য ব’লে গ্রহণ করি’ নাই। তবে দেখ প্রাপ্ত জন্ম সময়টাতে ও ত দু’এক মিনিট গোল থাকতে পারে। যাই হোক প্রতি ঘণ্টায় বা ১৫ অংশ ব্যবধানে ৯·৮৬ সেকেণ্ড হিসাবে পূর্ব্ব পশ্চিম বিবেচনা ক’রে সংস্কার দিতে পার। নাক্ষত্রকালকে মধ্যকাল কর্ব্বার সংস্কারও ঐ অঙ্ক. সুতরাং এই টেবিলটা লিখে রাখ্‌লে হিসাবের সুবিধা হবে—

অংশ	কলা	মধ্যকাল ঘণ্টা	মধ্যকাল মিনিট	মধ্যকাল সেকেণ্ড	নাক্ষত্র সংস্কার মিনিট	নাক্ষত্র সংস্কার সেকেণ্ড
০	১	০	০	৪	০	'০১
০	২	০	০	৮	০	'০২
০	৩	০	০	১২	০	'০৩
০	৪	০	০	১৬	০	'০৪
০	৫	০	০	২০	০	'০৬
০	৬	০	০	২৪	০	'০৭
০	৭	০	০	২৮	০	'০৮
০	৮	০	০	৩২	০	'০৯
০	৯	০	০	৩৬	০	'১০
০	১০	০	০	৪০	০	'১১
০	১১	০	০	৪৪	০	'১২
০	১২	০	০	৪৮	০	'১৩
০	১৩	০	০	৫২	০	'১৪
০	১৪	০	০	৫৬	০	'১৫
০	১৫	০	১	০	০	'১৬
০	৩০	০	২	০	০	'৩৩
০	৪৫	০	৩	০	০	'৪৯
১	০	০	৪	০	০	'৬৬
২	০	০	৮	০	০	১'৩১
৩	০	০	১২	০	০	১'৯৭
৪	০	০	১৬	০	০	২'৬৩
৫	০	০	২০	০	০	৩'২৯
৬	০	০	২৪	০	০	৩'৯৪
৭	০	০	২৮	০	০	৪'৬০
৮	০	০	৩২	০	০	৫'২৬
৯	০	০	৩৬	০	০	৫'৯১
১০	০	০	৪০	০	০	৬'৫৭
১৫	০	১	০	০	০	৯'৮৬
৩০	০	২	০	০	০	১৯'৭১
৪৫	০	৩	০	০	০	২৯'৫৭
৬০	০	৪	০	০	০	৩৯'৪৩
৭৫	০	৫	০	০	০	৪৯'২৮
৯০	০	৬	০	০	০	৫৯'১৪
১০৫	০	৭	০	০	১	৯'০০
১২০	০	৮	০	০	১	১৮'৮৫
১৩৫	০	৯	০	০	১	২৮'৭১
১৫০	০	১০	০	০	১	৩৮'৫৭
১৬৫	০	১১	০	০	১	৪৮'৪২
১৮০	০	১২	০	০	১	৫৮'২৮